জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

Jagadish Gupta Rachanavali (Vol II)
(Collected writings of Jagadish Chandra Gupta)

প্রথম প্রকাশ :
৩১শে শ্রাবণ ১৩৬৫

সম্পাদক :
নিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রকাশক :
আনন্দরূপ চক্রবর্তী
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

মুদ্রক :
শুভেন্দু রায়
ঊষা প্রেস
৩২/এ, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলকাতা-৪

সূচীপত্র

উপন্যাস :

গল্পগুচ্ছ :

স্বনির্বাচিত গল্প সংকলন

উপন্যাস

নন্দ আর কৃষ্ণা

নন্দ আর কৃষ্ণা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভবিষ্যতে যাঁরা বড়ো হন তাঁদের মতো অদম্য জ্ঞান-পিপাসার প্রেরণায় নয়, ভদ্রভাবে এবং যথোচিত উদরান্ন সংগ্রহের জন্যই নন্দকিশোর লেখাপড়া শিখিয়াছে ইহা যেমন সত্য, সে-সুযোগ সহজেই মিলিবার নয় ইহাও তেমনি সত্য। কিন্তু নন্দকিশোরের ভাগ্য ভালোই বলিতে হইবে—তার ভদ্রভাবে এবং যথোচিত উদরান্ন সংগ্রহের উদ্যম অংশতঃ সফল হইল মণীন্দ্রবাবুর অনুগ্রহ, এবং অত্যল্প চেষ্টাতেই।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া সে কম্পিত বক্ষে মণীন্দ্রবাবুর সমীপস্থ হইল, এবং দু'একটি প্রশ্ন করিয়াই মণীন্দ্রবাবু তাহাকে তাঁর পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। তার বুকের কাঁপুনি থামিল।

পুত্রের জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা মণীন্দ্রবাবুর একান্ত প্রয়োজন—অনুগ্রহ বিতরণের আকাঙ্ক্ষা বা তাগিদ তার মূলে আদৌ নাই; কিন্তু বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হইয়া এত লোক ঐটুকুর জন্য লালায়িত হইয়া ছুটিয়া আসিলেও তাহাকেই নিযুক্ত করা অনুগ্রহ ভিন্ন আর কি! তিনি অধিকতর গুণবান অপর কাহারো উপর ছেলের শিক্ষার ভার দিলেই পারিতেন—সেখানে তাঁর অবাধ স্বাধীনতা—জবাবদিহির প্রশ্নই উঠে না; কিন্তু তা না দিয়া দিলেন তিনি নন্দকিশোরকে, যার "কলেজ কেরিয়ার" ধর্ত্তব্যই নয়। নন্দকিশোর মণীন্দ্রবাবুর এই অপার সুখময় প্রভৃত অনুগ্রহ সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিল।

"কাজ পাইয়া" অর্থাৎ অন্যান্য কর্ম্মপ্রার্থিগণকে পরাস্ত করিয়া, নন্দকিশোরের যতই পুলক হউক, শুনিলে যে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হইয়া যাইবে যে, মণীন্দ্র তাহাকে মনোনীত করিয়াছেন তার "কলেজ কেরিয়ার" বা গুণাগুণ বিচারপূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া নয়, তার চেহারা দেখিয়া গুণের ওজন বিচারের তুলাদণ্ডে চাপাইলে নন্দ গিয়া ঠেকিত একেবারে মাটিতে—কিন্তু তার চেহারাটা ভালো—আর-সব বাদ দিয়া মণীন্দ্র তার চেহারাটাই পছন্দ করিলেন—তাঁর খোসমেজাজে একটু বাসন্তী বাহারই ফুটিল যেন।

মেয়েলী ছাঁদের সুকোমল আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পুষ্ট চেহারা নন্দর—বড় বড় শান্ত চোখ; চোখ দেখিলেই মনে হয়, সরল বিশ্বাসে পৃথিবীকে আত্মসমর্পণ করিয়া এ সুখী হইয়াছে—মনে গ্লানি কি কপটতা নাই। গোঁফ অতি সামান্যই উঠিয়াছে—একটু বেশী বয়সেই উঠিয়াছে; কিন্তু মুখ পাকিয়া কড়া হইয়া ওঠে নাই; আর দাড়ি নেহাৎ কচি বলিয়াই তার জন্মস্থান কর্কশ আর ঘোরতর কালো কুৎসিত হইয়া ওঠে নাই; ললাট রেখাহীন মসৃণ—গণ্ডস্থলও তা-ই, অর্থাৎ ব্রণ-কলঙ্ক একটিও সেখানে নাই; মণীন্দ্র আরো লক্ষ্য করিলেন, আঙুল আর করতল দিব্য নরম—আঙুলের গিঁঠগুলি রূঢ় পৌরুষে পালোয়ানীভাবে প্রকট হইয়া নাই। ভুরুও ভালো, চোখও ভালো; কিন্তু ঐ দু'টি শোভার আধার যেন পরস্পর বিচ্ছিন্ন, তাদের সমন্বয়ে একটা সৌকুমার্য্যের উদয় হয় নাই, এমন অনেক দেখা যায়। কিন্তু

নন্দকিশোরের তা হইয়াছে, ভুরু আর চোখ যেন ভাবোন্মেষের চিরন্থির আলিঙ্গনে আবদ্ধ আর একাকার হইয়া গভীর সুন্দর স্বচ্ছ একটি প্রেম-পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে ; দেখিলেই মনে হয়, আর মনে ছাপ পড়ে যে, এ আপন হইয়া যাইতে বিলম্ব করে না ; প্রীতির আদানপ্রদানে এ প্রশ্ন কি সন্দেহ কি কার্পণ্য করিতে জানে না। তার উপর, ইহাও দ্রষ্টব্য যে, নন্দকিশোরের ঠোঁট দু'খানিও রমণীসুলভ সরস আর লাবণ্যযুক্ত।

ঐ সব লক্ষ্য করিয়া মণীন্দ্র তাহাকে পছন্দ না করিয়া পারিলেন না ; এবং পছন্দ আর নিযুক্ত করবার পর স্থান, অর্থাৎ গৃহশিক্ষকের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ, নির্জন হইলে নন্দকিশোরকে প্রশ্ন করিয়া তিনি দু'একটি খবর জানিতে চাহিলেন। এই প্রথম অর্থোপার্জনের শুভ পথে পদার্পণ করা ছাড়া নন্দকিশোরের নগণ্য জীবনে অন্যরূপ বৈচিত্র্যেরও সূত্রপাত হইল ; কারণ, মনীন্দ্রের প্রশ্ন শুনিয়া আর তাঁর রকম দেখিয়া এবং তাঁর প্রশ্নের জবাব দিবার সময় সে কেবলমাত্র বিস্মিতই হইল, প্রশ্নের হেতু, আর তাঁর ভঙ্গীর মর্ম্ম তখনকার মতো তার অনুভূতিই রহিয়া গেল, যেমন থাকে ব্যাধি যন্ত্রণাপদ হইয়া প্রকট হইবার পূর্ব্বে ভিতরে তার সঞ্চারটি।

মণীন্দ্র প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি বিয়ে করেছ ?

উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করা লজ্জার বিষয় নহে, তবু নন্দকিশোর লজ্জায় লাল হইয়া রহিল ; অত্যন্ত মৃদুভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, বিবাহ সে করিয়াছে।

—করেছ। বলিয়া নির্নিমেষ চক্ষে মণীন্দ্র কয়েক মুহূর্ত্ত কি যেন ধ্যান করিলেন, বোধ হয় স্ত্রী-পুরুষের নিত্য সম্বন্ধটি।

তারপর বলিলেন, তোমার বয়স কত ?

—তেইশ।

—ছেলেপিলে হয়েছে ?

—আজ্ঞে না।

—বউটি বুঝি ছোট ?

এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে নন্দকিশোরকে একটু থমকিয়া ঢোক গিলিতে হইল, মাথা নামাইয়া খুব সংক্ষেপে প্রশ্নের উত্তর দিল ; বলিল, না।

শুনিয়া মণীন্দ্র পুনরায় পূর্ব্ববৎ নির্নিমেষ চক্ষে কি যেন ধ্যান করিলেন আরো গাঢ়ভাবে ; তারপর চক্ষু মুদ্রিত করিলেন যেন ধ্যেয় সামগ্রীটি তাঁর মুদ্রিত চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বতোভাবে পরিস্ফুট আর অধিকতর উপভোগ্য হইয়া উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

বলিলেন, বেশ। কিশোর আর কিশোরী। বলিয়া এবার আর ধ্যান করিলেন না, চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত করিয়া প্রসন্নবদনে একটু হাসিলেন।

নন্দকিশোর কিছুই বুঝিল না, কেন উনি ঐ প্রশ্নগুলি করিলেন, এবং কোন্ রসের আবেশে তাঁর চোখ বুজিয়া আসিল। নন্দকিশোর কেবল ধন্য আর কৃতজ্ঞ হইয়া রহিল—লেখাপড়ায় দিগ্‌গজ লায়েক লায়েক উমেদারকে এককথায় বিদায় করিয়া দিয়া তাহাদের অভিলষিত পদে তাহাকেই নিযুক্ত করিয়াছেন যে!

নন্দকিশোর পরম অনুগৃহীত হইয়া কেবল সুখানুভবই করিতে লাগিল, আর কিছু না। নন্দকিশোরের ইহাও মনে হইল যে, উহার কথায় বিস্মিত হওয়াই অন্যায় হইয়াছে।

—বেশ, পড়াও মন দিয়ে! বলিয়া মণীন্দ্র তাহাকে তার বাসস্থান দেখাইয়া দিয়া ছেলে রাখালকে ঘনিষ্ঠভাবে তার সম্মুখে বসাইয়া দিয়া এবং কয়েকটি সদুপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন।

নন্দকিশোর কায়েমী হইয়া বসিল।

নন্দকিশোরের বাড়ীতে আছেন বিধবা মা, আর আছে ছোটভাই বিন্টু, আর স্ত্রী মমতাময়ী : কিন্তু তাঁদের জন্য ভাবনা যে খুবই দুস্তর আর নৈরাশ্যজনক হইয়া আছে তা নয় ; তবে পৈতৃক অর্থে হাত দেওয়া অনুচিত, এবং নগদ খরচের জন্য নগদ টাকার দরকার আছে, তা ছাড়া আজকার দিনই ত' চরম দিন নহে—অনন্ত প্রয়োজন আর সুখ-দুঃখের দিন আছে সম্মুখে, তখন চোখে অন্ধকার দেখিয়া হাহাকার করিতে না হয় তাহারই জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। অকেজো হইয়া বাহাত্তুরের মতো সে, সুস্থ সবল, শিক্ষিত লোক, বসিয়াই বা থাকিবে কেন। মমতার সঙ্গে পরামর্শের ফলে এবং মায়ের সম্মতি লইয়া তাই সে মণীন্দ্রবাবুর ছেলেকে পড়াইতে আসিয়াছে।

ছেলেকে সে বাড়ীতে পড়ায়, সঙ্গে লইয়া বাহিরে বেড়ায়, মনের পক্ষে হিতকর আর বুদ্ধির পক্ষে পুষ্টিকর গল্প উপদেশ শুনায়, আনন্দ আর উৎসাহ দেয়, এবং করে নিজের আসল যে কাজ তাই, ভালো একটা চাকরির সন্ধান করে।

এবং আরো কাজ সে করে।

পরম কৃতজ্ঞতাবশে সে ওঁদের সব আদেশই শিরোধার্য্য মনে করিয়া প্রাণপণে করে, আর, বাজারের ভিতর চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দিয়াও তা পালন করে। বাড়ীর চাকর বলরামও সেই সুযোগে নন্দর উপর মাঝে মাঝে একহাত কৌশল খাটায়, তাহার জবানি গৃহিণী আদেশ করিতেছেন বলিয়া নন্দকে দিয়া সে তাহারই কাজ করাইয়া লয়।

এদিকে স্বয়ং মণীন্দ্রবাবু আড়চোখে নন্দকিশোরের শিক্ষাদানের কৌশল, কথাবার্ত্তা, রুচি, সহবৎ, অভ্যাস প্রভৃতি খুব বিজ্ঞভাবে লক্ষ্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া গেছেন।

ছেলেও পাঠগ্রহণে মনোযোগী হইয়াছে।

মণীন্দ্রবাবুর এই ছেলেটি তাঁর প্রথম পক্ষের। তাঁর প্রথম স্ত্রী পরলোকগমন করিয়াছেন। এবং এক্ষণে জনশ্রুতি ইহাই যে, মণীন্দ্র সম্প্রতি অর্থাৎ বছর দেড়েক হইল, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, সহরই তাঁর কর্ম্মস্থল বলিয়া তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার কিছুদিন পূর্ব্বেই সহরেই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া সস্ত্রীক এবং সুখেই বাস করিতেছেন। দেশের তোয়াক্কা তিনি রাখেন না।

আবার রাস্তার লোকেও ইহা জানে যে, মণীন্দ্রবাবুর টাকার অভাব নাই, ন্যায্য কাজে হুঁশ আর মনে উদারতারও অভাব নাই। নন্দকিশোরের কাছে তাঁর হুঁশের আর উদারতার অকাট্য প্রমাণ ইহাই আছে যে, মাসিক আটটি টাকা বেতনের অংশ তিনি সর্ব্বদাই তাহাকে দিতে রাজি ; বলেন, হাত খরচের দরকার হলেই চেয়ে

নেবে ? বুঝলে ? উপরন্তু "খাওয়াদাওয়া" করিতে দেন অন্তঃপুরেই। নন্দকিশোর ভর্ত্তি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে অন্তঃপুরে লইবার অনুমতি অবশ্যই তিনি দেন নাই, কারণ অজ্ঞাতকুলশীলস্য ইত্যাদি হিতোপদেশটি তাঁর অজানা নয়; কিন্তু নন্দকিশোরের কুলশীল অর্থাৎ প্রকৃত পরিচয় চারিত্রিক নির্ম্মলতা প্রভৃতি, বেশীদিন অজ্ঞাত রহিল না, নন্দকিশোর ঠাকুরের ডাকে তখন অন্তঃপুরে রন্ধনালয়ে গিয়া আহার করিতে লাগিল ! দিন তার সুখেই যায়।

মণীন্দ্রবাবুকে নন্দকিশোর ভালো করিয়াই দেখিয়াছে—তাঁর চেহারা তার কণ্ঠস্থ হইয়া গেছে; এবং এই একটা আক্ষেপ তার আছে যে, মণীন্দ্রবাবু গোঁফ যদি অত ছোট করিয়া না ছাঁটিতেন তবে চেহারাটা দেখিতে আরো ভালো হইত, খুলিত—নাকের নীচে আর উপরের ঠোঁটের উপর গোঁফগুলি প্রাণপণে খাড়া হইয়া থাকে, তা অর্থাৎ খোঁচা মারার ভাবটা, না থাকিলেই যেন নিস্তেজ হওয়ায় নিখুঁত হইত, দর্শকের চোখে ব্যাঘাত জন্মাইত না।

মণীন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে, এই গৃহের গৃহিণীকেও নন্দ দেখিয়াছে; খুব সুন্দরী তিনি; অন্তঃপুরে কি সামনাসামনি দেখে নাই, দেখিয়াছে অন্তঃপুরের বাহিরে, যখন তিনি স্বামীর সঙ্গে বাহির হন আর ফিরিয়া আসেন, অর্থাৎ তাঁর অতিশয় সুসজ্জিত অবস্থায়; কৃত্রিমতা, আর, তাঁরই একটা অভিনয়ের ভঙ্গীর ভিতর দূর হইতে তাঁহাকে নন্দ দেখিয়াছে।

খুবই সুন্দরী তিনি—

আধুনিকতম বেশ আর সপ্রতিভ গতিভঙ্গী এবং দুনিয়াকে নিতান্ত অবহেলা করিয়া তাঁর দৃষ্টিচালনা নন্দ দেখিয়াছে, আর, মনে মনে কত যে বিস্মিত হইয়াছে আর প্রশংসাও করিয়াছে তাহার লেখাজোখা নাই; কিন্তু ধন্য নন্দ ! মণীন্দ্রবাবুকে ঈর্ষা করিবার কি তাঁর স্ত্রীর প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার মতো ইতর মন তার নয়, অত সাহসীও সে নয়; দৃশ্য হিসাবে অনিন্দনীয় আর আনন্দপ্রদ, এ বিষয়ে এই মাত্র তার চেতনা, সজ্ঞান অনুভূতি।

ঐ সঙ্গে তার খুবই মনে পড়ে স্ত্রী মমতার কথা, নাম তার মমতাময়ী, এবং সত্যিই সে মমতাময়ী।

এঁর তুলনায় মমতার রূপ প্রণিধানযোগ্যই নয়, তর্কের অবসর না দিয়া তা বলা চলে না; কিন্তু পার্থক্যও আকাশ পাতাল। নন্দ জানে রূপ ত' প্রসাধন আর মার্জন-সাপেক্ষ কৃত্রিম বস্তু নয়, দেহলগ্ন বাহিরের বস্তু তা নয়। সে দেখিয়াছে ইঁহার বাহিরের রূপ; কিন্তু উদ্ভিন্ন উন্মুখ অন্তরের দ্যুতিতে দীপ্ত হইয়া প্রেমের যে-রূপটি দেহে বিকশিত হয় তাঁর সে-রূপটি নন্দ দেখে নাই—কল্পনাও করে না—সে দুষ্টবুদ্ধি তার নাই। ইঁহাকে যখনই সে দেখে তখনই দেখে ইঁহার রূপের অর্থাৎ রূপসজ্জার বিলাসবিভঙ্গ, এমন একটা চঞ্চল মূর্ত্তি যার স্বাদ নাই; কিন্তু মমতার রূপ প্রসাধনপটুতা আর বেশ রচনার দুরূহ অন্তরাল হইতে উগ্র লীলায়িত হইয়া তার সম্মুখে নাই।

মমতাকে ভাবিতে যাইয়া সে ভেলকি দেখে না; মমতা অতি সহজ, অতি সুবোধ্য, খুব স্বাভাবিক; আর তার মন অজানা আধারে লুক্কায়িত নহে বলিয়াই তাহাকেই ভাবিতে নন্দর সবচাইতে ভালো লাগে—মনে হয়, এমন মধুর, এমন

গভীর একাত্মতার অনুভূতি দেওয়া পৃথিবীর মধ্যে কেবল মমতার দ্বারাই সম্ভব।

নন্দকিশোরের আরো মনে হয়, ইনি হয়তো খুবই শিক্ষিতা, "কলেজ কেরিয়ার" হয়তো তারই সমান ; হয়তো খুবই বাক্‌পটু, খুবই প্রেমময়ী, খুবই আদরিণী ইত্যাদি ; এবং ইহার পদক্ষেপ যেমন ক্ষিপ্র, অর্থাৎ অশান্ত, মুখের কথাও হয়তো অত্যন্ত স্পষ্ট ঋজুতম আকারে তেমনি ক্ষিপ্রবেগে নির্গত হইতে থাকে।

ভাবিয়া নন্দর মনে হয়, ভারি জটিল ; আর তার ভয় হয়।

কিন্তু তার অদৃষ্ট ভালো, মমতার তা নয়—মমতার মুখের কথা চমৎকার অস্পষ্ট, আর চমৎকার মৃদু, তার এই অস্পষ্টতা আর মৃদুতা এমন মুগ্ধকর যে, ভুলিতে পারা যায় না, ভাবিতে গেলে স্নেহে মন উদ্বেল হইয়া ওঠে। তবু সে রসিকা, নিজের ধরণে সে বেশ রসিকা, হাসায় সে খুব, কিন্তু যেন অজ্ঞাতসারে ; তার চোখের চেহারা কি ঠোঁটের ভঙ্গী দেখিয়া অনুমান করিবার কিছুমাত্র উপায় থাকে না যে, সে মনে মনে তৈরী হইয়া আছে ; কিন্তু সে কথার জবাব দেয় এমন স্থিরভাবে, আর, হাসির কথার সঙ্গে তার শান্তমুখের এমন অপূর্ব্ব অসামঞ্জস্য দেখা যায় যে, তাকে ভারি নিরীহ, ভারি নির্দোষ, আর, ভারি ভদ্র সরল মনে হয়। চোখে তার আবেগ নাই, চঞ্চলতা নাই, বিলাস নাই, তীক্ষ্ণতা নাই, অথচ আলস্য নাই, নির্ব্বুদ্ধিতাও নাই, আছে কেবল কোমল একটা ভাষা, অসীম মাধুর্য আর নির্ভরতা, তার চোখের ভাবের সঙ্গে মুখের কথার অপূর্ব্ব মধুর অসঙ্গতি।

আর ভারি ভীরু সে।

স্বামীর আদর গ্রহণ করিতে করিতে সেও আদর করে—দুহাতে স্বামীর হাত জড়াইয়া ধরিয়া অধিকতর নিকটবর্তী হইতে হইতে—স্বামীর আঙ্গুলগুলি লইয়া খেলা করিতে করিতে হঠাৎ সে সরিয়া যায়।

নন্দ বলে, ও কি, অমন ক'রে ত্যাগ করে গেলে যে।

মমতা বলে, তুমি যদি রাগ করো!

—রাগ করবো কেন! এ সুখের কথা না রাগের কথা!

—যদি অন্যায় মনে করো।

মমতার মুখের এমনি টুকটাক কথাগুলি নন্দর ভারি মিষ্টি লাগে, আর তার ভারি হাসি পায়।

বলে, অন্যায়ের জ্ঞান তোমার কিছুই নেই।

মমতা তখন হাসিয়া বলে, বাঁচলাম।

কিন্তু তার আচরণ কেহ অন্যায় কিংবা তাহাকে কেহ প্রগল্‌ভ মনে করিবে এই ভয়ে সে সর্ব্বদা সতই সাবধান—স্বামীকে সঙ্গ আর আনন্দদানেও তার বাড়াবাড়ি কোথাও নাই।

তবু সে মাঝে মাঝে ইয়ারকি দেয়, বলে, অমন ক'রে তাকিয়ে আছ যে?

নন্দ বলে, একটু ইয়ারকি দেব ভাবছি।

—উঁহুঁ, ভয় পেয়েছ।

নন্দ বুঝিতে পারে না যে, তাঁহাকে ডিঙ্গাইয়া মমতাই ইয়ারকি সুরু করিয়াছে। বলে, তার মানে?

—সেদিন রান্নাঘরে একটা বেড়াল কেবলি ছোঁক-ছোঁক করছিল, 'হেই' বলে ধমক দিতেই সেটা খানিক পিছিয়ে ঠিক তোমার মতো করে তাকিয়ে থাকল।

নন্দর মুখে হাসি দেখা দেয়; বলে, তারপর?

—আবার 'হেই' করতেই দিল পিটটান। আমি ত' তোমাকে কিছু বলিনি যে পালাবে!

নন্দ তখন হাসিয়া উল্লাসে আকুল হইয়া যায়, আগাইয়া গিয়া তাহাকে ধরে—দু'হাতের চাপের ভিতর তাহাকে জড়ো করিয়া লয়, চোখ বন্ধ করিয়া তার নিজের আর মমতার রক্তের উত্তপ্ত নাচন অনুভব করে।

মমতা চিঠি লেখে—

নন্দকিশোরও লেখে; নন্দকিশোর চিঠিতে চুম্বন জানায়, কিন্তু মমতা তা জানায় না। তৃষিত নন্দ মনে মনে খুঁৎখুঁৎ করিয়া একবার অপরিসীম তৃষ্ণা জ্ঞাপন করিয়া ঐ বস্তুটি ভিক্ষা চাহিয়া আর অনেক মিনতি ও কাতরোক্তি করিয়া এক পত্র ডাকে দিল।

"পুনশ্চ" দিয়া লিখিল, "চাই কিন্তু"।

কিন্তু মমতা লিখিল: "যদি হঠাৎ কেউ চিঠি দেখে ফেলে তবে সে মনে করবে কি! তোমরা লিখতে পারো; কিন্তু মেয়েরা কথাটা লিখলে কেমন যেন অন্যায় আর 'অভদ্দর' মনে হয়।"

ঐ অন্যায় আর 'অভদ্দর' শব্দটা পত্রে ব্যবহার না করার কারণ দেখাইয়া মমতা অনেক কথাই লিখিতে পারিত—লিখিতে পারিত যে, হাতে-কলমে সত্যিকার জিনিষই যখন চাওয়ামাত্র দিয়ে থাকি তখন পত্রের মারফৎ নিরবয়ব বস্তুর দরকার কি? তার জন্য অনর্থক এত লোলুপতা কেন? এসে নিয়ে যাও, একবার নয়, দু'বার নয়, অগুণতি, যত ইচ্ছে তত—

কিন্তু তা সে লেখে নাই।

কয়েক সপ্তাহ পরে অনেক ইতস্ততঃ করিয়া নন্দ একদিন বাড়ী যাইবার অনুমতি চাহিল।

নন্দকিশোর বিবাহিত মণীন্দ্র তা জানেন—প্রথম দিনই প্রথম সাক্ষাতেই, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া তা জানিয়া লইয়াছিলেন।

নন্দ বাড়ী যাইবার অনুমতি চাহিলেই তিনি আগে মুচকি হাসিলেন; তারপর নন্দর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, বাড়ী যাবে? যাও, কিন্তু দু'রাত্রির বেশি নয়।

দিনের কথা না বলিয়া মণীন্দ্র বলিলেন রাত্রির কথা, কোন্ দিকে তিনি ইঙ্গিত করিলেন নন্দকিশোর তা পরিষ্কার বুঝিল, একটু থতমত খাইয়া গেল।

তারপরই মণীন্দ্র বলিলেন, অত শীগগির চলে আসতে মন চাইবে না; না? বৌটিকে এখানে নিয়ে এলেও ত' পারো!

মনে হইতে পারে, বধূটিকে এতদিনেও তাঁহার গৃহে আনয়ন না করায় মণীন্দ্র মৃদু অনুযোগ করিলেন, এবং এই নিমন্ত্রণে এই অমায়িক ভদ্রলোকটির নিষ্পাপ হৃদ্যতা ব্যতীত ভিতরে আর কিছুই নাই।

নন্দকিশোর মনে করিল তা-ই এবং সে সুখী হইল ; বলিল, মাকে একা থাকতে হয়, আর—

মনীন্দ্র বাধা দিয়া বলিলেন, এদিকে তুমি যে একা থাকো ! বয়স কত তোমার ?

– তেইশ।

—তেইশ। তেইশ বছর বয়সে বিয়ের পরও একা থাকা কত কষ্ট তা যারা থাকে তারাই জানে। তোমাকে আমি আটকাবো না, শাপ লাগবে।—নিয়ে এসো, আনন্দে থাকা যাবে। বলিয়া মণীন্দ্র যেন জরুরী একটা তাগিদই দিলেন।

তাঁর আনন্দ কিরূপ, কোথায় এবং কেন, অর্থাৎ গৃহশিক্ষকের আনন্দেই অনুকম্পাশীল অভিজ্ঞ ঐ ব্যক্তির আনন্দ কি না তাহা নন্দ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

কুণ্ঠিতভাবে বলিল, যাবো ?

—যাও ; কিন্তু—

—আজ্ঞে, পরশুই চলে আসব।

—দু'রাত্রি পাবে ?

নন্দ জবাব দিল না—

মণীন্দ্র বলিলেন, দিনে গাড়ী কখন ?

—তিনটেয়।

—তা হলে দুপুরটাও পাচ্ছ। বলিয়া মণীন্দ্র সম্পর্ক-বিগর্হিত এবং বয়সের তারতম্য হিসাবেও অত্যন্ত অনুচিত একটা ইঙ্গিতের হাসিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন।

ছুটি পাইয়া নন্দকিশোর বাড়ী আসিল। মা বলিলেন, ভালো ছিলি ?

—হ্যাঁ, মা, যত্ন পাচ্ছি।

মমতা বলিল, আসতে দিলে ?

—হ্যাঁ।

—লোকটি ত' ভালো।

—হ্যাঁ, দয়া আছে। তেইশ বছরের যুবক স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকতে যে কষ্ট পায় তা তিনি জানেন। বলিয়া নন্দ হাসিল ; বলিল, কষ্ট সত্যিই খুব—

মমতা জানিতে চাহিল, তিনি যে জানেন তা তুমি জানলে কেমন করে ?

—বললেই স্পষ্ট ; দরদ দেখালেন খুব। বললেন, বৌকে নিয়ে এস এখানে—তেইশ বছর বয়সে বৌ-ছাড়া হয়ে থাকা যে কত কষ্ট তা কেবল ভুক্তভোগীই জানে।

মমতা অবাক হইয়া বলিল, তোমার সঙ্গে ঐ সব কথা হয় নাকি ?

—হ'ল এবার, মানে, তিনিই বললেন।

—বয়স কত তাঁর ?

—প্রায় চল্লিশ। দ্বিতীয় পক্ষ।

—তাই নাকি। দ্বিতীয়াকে দেখেছ ?—কেমন ?

— খুব সুন্দরী।

মমতার মুখ হঠাৎ ভারি বিমর্ষ হইয়া উঠিল, ওখানকার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটি খুব সুন্দরী বলিয়া নয়, আর তিনি বৃদ্ধের ভার্য্যা এবং স্বামী অনাত্মীয় যুবক এবং সেই গৃহবাসী বলিয়াও নয়, অন্য কারণে; তার মনে হইল, ভদ্রসন্তান আর গৃহশিক্ষক হিসাবে একটি ব্যক্তির যে মর্য্যাদা অবশ্যপ্রাপ্ত সে মর্য্যাদা তার স্বামীকে দেওয়া হয় নাই, আর, ভদ্র ব্যক্তি এবং বয়সের পার্থক্য হিসাবে যে সংযম আর গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা মানুষের উচিত তাহা রক্ষিত হয় নাই, হয় নাই অতি জঘন্য কারণে; পরস্ত্রী সম্বন্ধে কুণ্ঠাহীন আলোচনায় রত হইয়া তিনি সেই শিষ্ট রীতি লঙ্ঘনপূর্ব্বক আত্মসম্মানের কথাটা বিস্মৃত হইয়াছেন, তিনি অগৌরবজনক নির্লজ্জতা আর আত্ম-সংযমের অভাব দেখাইয়া অমার্জনীয় অন্যায় করিয়াছেন।

বলিল, তুমি ওখানে আর থেকো না।

—কেন?

—ভদ্রলোক লোক ভালো নয়।

নন্দ তা বুঝিয়াছে—

এবং শিশুপ্রকৃতি মমতাও তা বুঝিয়াছে দেখিয়া নন্দকিশোর ভারি বিস্মিত আর পুলকিত হইয়া গেল; বলিল, আমার অনিষ্ট তিনি কিছু করতে পারবেন না। তুমি যাবে সেখানে?

—দশ বছর তোমার দেখা না পেলেও নয়।

শুনিয়া নন্দকিশোর উৎসাহে আর প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া মমতাকে আরো ভালবাসিল।

একটা উৎকণ্ঠা লইয়াই নন্দকিশোর মণীন্দ্রবাবুর বাড়ীতে তার কর্ম্মস্থলে, আজ ঠিক দুদিন বাদেই প্রবেশ করিল। মণীন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা হইবেই; এবং দেখা হইলে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া তাহার কাছে তিনি অনেক কথা জানিতে চাহিবেন কিনা, এবং ছুটি মঞ্জুর করিবার সময় তিনি যে সমুদয় কথা বলিয়াছিলেন সেই কথার তন্তুমালা আরো প্রসারিত আর সূক্ষ্ম করিয়া লইয়া ঘটনার অন্বেষণ করিবেন কিনা এবং টিপ্পনী কাটিবেন কি না কে জানে! যদি করেন।

নন্দর একটু বিরক্তি বোধই হইল। কিন্তু নন্দ অস্বস্তি বোধ করিলে কি হইবে! মণীন্দ্রের কথা স্থির হইয়া শ্রবণ করা এবং স্থিরভাবে তাঁহার কথার জবাব দেওয়া তার অনিবার্য্য অদৃষ্ট। তার অনুমান সত্য হইল, অব্যর্থভাবে দেখা গেল নন্দকিশোরের পারিবারিক অস্তিত্বকে মণীন্দ্র আদৌ ভুলিতে পারিতেছেন না, ভুলিতে পারিতেছেন না বলিলে সবটা বলা হয় না, আরো নিবিড়তা তিনি চান।

দুদিন বাদে নন্দকে পাইয়া তিনি পরম বিস্মিত হইয়া গেলেন, বিস্ময়ে চোখ বড়ো করিয়া বলিলেন, কথা ঠিক রেখেছ দেখছি। তোমার দিব্যি, আমি ভেবে-ছিলাম, একটি দিন চুরি তুমি করবেই; তুমি না করো তোমাকে দিয়ে করাবে একজন।

কে তাহাকে আসিতে দিবে না, দিন চুরি করাইবে তাহা নন্দ বুঝিল, এবং

একটু হাসিল, হাসিয়া সে মাসিক আট টাকা বেতনদাতা আর রোজ দুবেলাকার অন্নদাতার মান রাখিল, প্রায় অর্থহীনভাবে বলিল, আজ্ঞে না!

মণীন্দ্র জানাইলেন, তোমার এই বয়সে আমি এ বিষয়ে খুব হাভেতে হ্যাংলা ছিলাম, তারপর বলিলেন, কিন্তু বৌকে আনলে না যে? বলিয়া পরক্ষণেই বলিলেন, সখীর মতো দু'জনে থাক্‌তে ভালো। একা থাকে ত' সর্ব্বদাই।

কথাটা সংস্কৃত, এবং নন্দ শুনাইল না। নন্দ তৎক্ষণাৎ মিথ্যা উক্তি সাজাইয়া তুলিল; বলিল, মা বললেন; বিন্টুর পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তারপর না হয় যাবে।

তারপর মণীন্দ্র আনন্দ আহরণের বিষয়বস্তু পরিবর্ত্তন করিলেন—

তোমার বোনের বুঝি বিয়ে হয়ে গেছে? বলিয়া তিনি পুনরায় ভারি লিপ্ত হইয়া উঠিলেন, নন্দর মেয়েলী ছাঁদের স্বচ্ছ মসৃণ সুগঠিত মুখের দিকে তিনি স্থির চক্ষে তাকাইয়া রহিলেন, কি তিনি কল্পনা করিতে লাগিলেন তাহা তিনিই জানেন; বোধ হয় ইহাই যে, নন্দর ভগিনীর স্বাস্থ্য নিবিড়, যৌবন সমাগত, মন প্রফুল্ল, মুখ সহাস্য এবং রূপৈশ্বর্য্য অপরিসীম হওয়াই সম্ভব।

কিন্তু নন্দ তাঁহাকে হতাশ করিল; বলিল, বোন আমার নেই।

নন্দকিশোরের বোনের ঝঞ্ঝাট নাই শুনিয়া মণীন্দ্র যেন সঙ্গে সঙ্গে বাঁচিয়া গেলেন। বলিলেন, যাক্, বেঁচেছ। কিন্তু আর ছুটি শীগ্‌গির পাবে না বলে দিচ্ছি।

বলিয়া নন্দকিশোরকে তিনি শাসাইয়া রাখিলেন এবং ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন; স্ত্রীর সঙ্গে তার দীর্ঘ বিচ্ছেদের ভয় দেখাইয়া তিনি যেন একটা দুর্ম্মূল্য আর পবিত্র কৌতুকরসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

নন্দ কেবল বিস্মিত হইতেই পারল—

মণীন্দ্রের এই অস্বাভাবিকতার আওতায় সে বিস্মিত হইয়া বসিয়া রহিল, মণীন্দ্র চলিয়া গেলেন।

রাখালকে নন্দ খুব পড়ায়, কিন্তু মণীন্দ্রের মতো চৌকস পিতার পুত্র রাখাল জড়বুদ্ধি ছেলে, পাঠ্য বিষয় তার মস্তিষ্কে যেন ঠেলিয়া ঠেলিয়া ঢুকাইতে হয়।

চাকর বলরাম আহ্লাদে গোছের, কথা বলিবার সময় দাঁত বাহির করিয়া কেবলই গা দোলায়, আর, ঠাকুর হরেরাম গোবেচারী, যা বলো তাতেই সায়, তাতেই রাজি।

"ছেলে কেমন পড়ছে মাষ্টার?"

জিজ্ঞাসা করিয়া ছেলের পড়িবার অর্থাৎ নন্দর থাকিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া মণীন্দ্র চেয়ারে উপবেশন করেন।

নন্দ বলেন, বুঝতে কিছু দেরী হয়, কিন্তু আগ্রহ আছে।

মণীন্দ্রের নাকের নীচেটা, অর্থাৎ গোঁফজোড়া, নড়িয়া ওঠে, তিনি হাসেন আর বলেন, তোমারও কিন্তু বুঝতে দেরী হয়, আর আগ্রহও নেই। তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না ত'?

—আজ্ঞে না।

—ঘরটাকে আর একটু সাজানো দরকার; ছেলেমানুষ তুমি, কিন্তু ধরণ তোমার বুড়োর। তোমার শখ কিছু নেই। তুমি জানো না বোধ হয়, বুড়ো

মানুষ আমি একেবারেই পছন্দ করিনে, বুড়ো মানুষের দিকে চাইলেই আমার বুকে যেন ঠাণ্ডা লাগে।

মনিবের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে বিনয়ের অবতার নন্দকিশোর একটু হাস্য করিল।

মণীন্দ্র বলিলেন, হাসলে তুমি, বোধ হয় ঠাণ্ডা লাগার কথায়। কিন্তু দেখ, আমার বাড়ীতে যারা আছে তারা সবাই যুবক।

নন্দ তা স্বীকার করিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কেন বলো ত'? দেখি তোমার বুদ্ধি।

বুদ্ধির পরীক্ষায় নন্দ ফেল করিল, বলিল, তা ত' জানিনে।

—জানো না। আর, সবাই বিবাহিত, লক্ষ্য করেছ? ঠাকুর, চাকর, আর অদৃষ্টক্রমে তুমিও। বিয়ে করে দায়িত্ববোধ বেড়েছে বলে কাজ ভালো পাব এ আমার উদ্দেশ্য নয়।

কি তাঁহার উদ্দেশ্য তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে, তিনি তা প্রকাশ করিবেন এই আশায়, শিষ্টাচারী নন্দ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

উদ্দেশ্য প্রকাশ করিবার পূর্বে উদ্দেশ্যকে জোরালো এবং হৃদয়গ্রাহী করিবার উদ্দেশ্যে মণীন্দ্র একটু হাসিলেন, অকিঞ্চিৎকর হাসি নয়, খুব নিপুণ আর উচ্চস্তরের আত্মগরিমার হাসি।

হাসিয়া বলিলেন, ঘরে যুবতী স্ত্রী যার আছে সে সুখী নয় কি? সুখী। আমি তার সুখের অংশ গ্রহণ করি।

নন্দ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, কেমন করে?

—মনে মনে ছাড়া আর কেমন করে। একেবারে বালক। বলিয়া মণীন্দ্র এমন একটা ভঙ্গী করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন যেন নন্দর সঙ্গে কথা কহিয়া সুখ পাওয়া যাইতেছে না।

কিন্তু তাঁর ঐ চাঞ্চল্য ক্ষণিকের, তারপরই তিনি যেন তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আমার পন্দা নিরাপদ। বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

নন্দকিশোর ভাবিয়া পাইল না, মনে মনে কেমন করিয়া অপরের সুখের অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

পরীক্ষায় রাখাল এই প্রথম সকল বিষয়ে পাশ করিয়া প্রমোশন পাইল, মণীন্দ্র কলরব করিয়া শিক্ষক নন্দকিশোরকে অভিনন্দিত করিলেন; বলিলেন, "সাবাস মাষ্টার"। তারপর হর্ষ সংবরণ করিতে না পারিয়া নন্দকিশোরের বেতন দু টাকা বাড়াইয়া দশ টাকা করিয়া দিলেন। পটভূমিকা এই পর্যন্ত একেবারে দোষমুক্ত; কিন্তু মণীন্দ্রনাথ সত্যিকারের যাদুকর, রূপ বদলাইয়া অন্য পটের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িতেও তাঁর বিলম্ব হইল না এবং ছেলের উন্নতিসূচক অত্যন্ত শান্তিপ্রদ সুখাবহ নির্মল ব্যাপারটাই তাঁর মানসিক তৎপরতা এবং একটা তৎপরায়ণতার ফলে হইল নন্দকিশোরের পক্ষে অন্যতম বিক্ষোভের কারণ।

বেতনবৃদ্ধি জ্ঞাপন আর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া মণীন্দ্র জানিতে চাহিলেন, খুশী ত'?

নন্দ খুশী বই কি, বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কিন্তু মণীন্দ্র তখন একটা সুচিন্তিত অভিলাষবশত খুব খোশমেজাজে আছেন, বলিলেন, তুমি ত' খুশী এখানে; ওখানে তোমার বউকেও আমি খুশী করতে চাই। তাকে একখানা নীলাম্বরি কিনে দিও। দিও, বুঝলে? টাকাটা চেয়ে নিও।

মণীন্দ্রের এই ব্যাকুল আগ্রহ দেখিয়া অবাক নন্দ দ্বিগুণ অবাক হইয়া গেল, ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিতেও তার মন সরিল না, তার এই অবিচলতা অবাধ্য প্রতিবাদের মত দেখাইতেছে বুঝিয়াও সে অবিচলিতই রহিল।

তার স্ত্রী মমতা, নীলাম্বরি পরিধান করিলে এই মানুষটির ইচ্ছার সার্থকতা কিসে? নন্দর খুবই মনে হইল, লোকটি অদ্ভুত, এবং ইঁহার আচরণ যেন হৃৎকম্পজনক, প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমশঃ উদ্‌ঘাটিত হইয়া যেন দুঃসহ হইয়া উঠিতেছে। তার স্ত্রীর সম্বন্ধে ইঁহার মনোভাব আর যেন আবছা সন্দেহের বিষয় নহে, ইনি তাহাকে আকাঙ্ক্ষাই করেন। নন্দকিশোরের মনে হইল, মমতাকে সে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে, মণীন্দ্র তার অনিষ্ট করিতে পারিবেন না; কিন্তু তা ভুল, এখানে থাকা সত্যই নিরাপদ নয়, কুসংসর্গে বুদ্ধি বিপথে চালিত এবং আত্মা অধোগামী হইবেই। নারী-প্রসঙ্গে মানুষের এমন নির্লজ্জ দুর্নিবার লোলুপতা কেমন করিয়া আসে আর প্রকাশ পায় তাহা সে কল্পনাই করিতে পারিল না, এমনই তা অভদ্র।

মণীন্দ্র জানেন না যে, তিনি নীলাম্বরি উপঢৌকন দিয়া একটি নারীকে খুশী করিতে চাহিয়া তার স্বামীর মনে বিদ্রোহী উত্তাপের সঞ্চার করিয়াছেন, সে তাঁহাকে জঘন্য মনে করিতেছে।

তিনি তখনও নিজের আনন্দেই বিভোর—সেখানে বসিয়া মানসচক্ষে দেখিতেছেন, নীলাম্বরি পরিহিতা রমণী অভিসারে যাত্রা করিয়া জ্যোৎস্নালোকে পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

কিন্তু নন্দকে শীঘ্রই ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতে হইল, মণীন্দ্রের অরূপ রসের উপদ্রবে নয়, অন্য কারণে।

মণীন্দ্র তাহাকে টাকা দেন, খাইতে দেন, আর দেন পীড়া। পীড়া সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, অভীষ্টসাধনের উপায় হিসাবে মণীন্দ্রকে মধ্যে রাখিয়া, আর, তাহাকে পুনঃ পুনঃ কার্যকর উৎসাহ দিয়া অদৃষ্ট যেন নন্দকিশোরের সহিষ্ণুতার পরীক্ষা করিতেছে।

পরীক্ষার ফল কি দাঁড়াইত এবং কবে দেখা দিত তা কেউ জানে না, কিন্তু সেদিকে একটা ফল দাঁড়াইবার এবং দেখা দিবার পূর্বেই অন্য দিকে যা ঘটিল তাহাও ফলোৎপাদক—তাহারই ফলে প্রচণ্ড বেগযুক্ত একটা ধাক্কা খাইয়া নন্দকিশোর অচিরেই একদিন পলায়ন করিল।

একদিন বৈকালে নন্দকিশোর বলরামকে খুঁজিয়া পাইল না, সচরাচর সে কাছাকাছি কোথাও থাকে না, আজ এখনও নাই, ঠাকুর তার গ্রাম হইতে আগত এক ব্যক্তির কাছে বাড়ীর খবর জানিতে গেছে—তাহাকে বলিয়াই গেছে, এখনও সে ফেরে নাই। তৃতীয় ব্যক্তি রাখাল—কিন্তু তাহাকে তাহার জনৈক বন্ধু ডাকিয়া লইয়া কোথায় গেছে তারও ঠিক নাই।

বাবু আছেন "ওপরে"—

এদিকে টেলিগ্রাম পিওন আসিয়া টেলিগ্রাম লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তার সবুর সহিবার উপায় নাই—আর, 'কাম শাপ" ছাড়া আর কোন সংবাদই 'তারে' আসে না ; সুতরাং নন্দ সিদ্ধান্ত করিল যে, পরিস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ।

'বাবু' বলিয়া চীৎকার করাও অসম্ভব—লজ্জা করে ; অতএব এখন সাংঘাতিক জরুরী ব্যাপারে উপরে গিয়া সংবাদ দিতে বা সাক্ষাৎ করিতে বাধাটা কি ! বাবু তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না নিশ্চয়ই—

গবেষণাপূর্ব্বক, এবং কর্ত্তব্যপালনে মানুষের যে সাহস থাকা দরকার সেই সাহস তাহারও আছে ইহাই মনে করিয়া নন্দ, বাবু যে ঊর্ধ্বলোকে রহিয়াছে সেই ঊর্ধ্বলোকের অর্থাৎ দ্বিতলের অভিমুখে রওনা হইল। তার লক্ষ্য বাবু, এবং হাতে টেলিগ্রামের লেফাফা আর রসিদের কাগজখণ্ড।

সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় নিষ্পাপ মন, দুরভিসন্ধির অভাব এবং কর্ত্তব্য পালনের সৎসাহস সত্ত্বেও তার বুক একটু একটু কাঁপিতে লাগিল ; যেন অদৃষ্টের উপর শুভাশুভের ভার দিয়া অপরিচিত আর সংকটসংকুল স্থানে সে চলিয়াছে—এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া সে সিঁড়ি ভাঙ্গিতেছে ক্রূর নিয়তির বশে যেমন খাদ্য অন্বেষণ করিতে করিতে ব্যাং গিয়া লাফাইয়া পড়ে সাপের একেবারে মুখে।

মমতা শুনিলে স্বামীর ভীরুতায় হাসিবে নিশ্চয়ই ; কিন্তু পরের অন্তঃপুরে প্রবেশ উদ্যম নন্দর পক্ষে এমনিই ভয়ঙ্কর।

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া সম্মুখেই প্রশস্ত চৌকোণ বারান্দা দুদিকে, বাঁয়ে এবং সম্মুখে প্যাসেজ, প্রত্যেক ঘরে প্রবেশের দরজা ঐ প্যাসেজে—কিন্তু নন্দ দেখিল, সবগুলি ঘরের দরজা বন্ধ। মাত্র একটি ঘরের দরজা খোলা আছে বলিয়া তার মনে হইল , সম্মুখের প্যাসেজ দিয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়া গেলে দক্ষিণে সেই দরজা পাওয়া যাইবে, এবং ঘরের অভ্যন্তরটা দেখা যাইবে।

কিন্তু এ ঘরেই বাবু আছেন কি না কে জানে।

পরক্ষণেই তার ত্রাস জন্মিল, গৃহিণী যদি হঠাৎ বাহির হইয়া তাহাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া ওঠেন। তখন চক্ষের পলক না ফেলিতেই অবস্থাটা কি দাড়াইবে ! মানুষের সে অবস্থা ভাবিতেই পারা যায় না।

অপরাধ হাল্কা করিয়া আনিতে নন্দ ডাকিল, বাবু ?

মণীন্দ্রকে নন্দ কোন সম্পর্ক ধরিয়া কি কিছু বলিয়াই ডাকে না, ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বাবু বলিয়া ডাকিল। কিন্তু আহ্বান তার ভয়ে সংকোচে এত ক্ষীণ যে, আহ্বানে ফলোদয় হইল না—বাবুর সাড়া আসিল না।

কিন্তু আসিল মধুর একটি গন্ধ, দামী সাবানের উৎকৃষ্ট ঘ্রাণ—

টেলিগ্রাম পিওন কঠোরস্বরে বলিয়া দিয়াছে, বাবু, জলদি করুনা—

নন্দ আর দু'পা অগ্রসর হইয়া গেল—অনুমান করিল, সাবানের ঘ্রাণ আসিতেছে ঐ খোলা দরজা দিয়া, বাবু ঐ ঘরে বসিয়াই অভিজাত সাবান-সহযোগে বৈকালিক ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিতেছেন—

তারপর সে আরো বুক বাঁধিল ইহাই মনে করিয়া যে, যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ গৃহিণীর সম্মুখে সে পড়িয়া যায় তবে সে কাতরস্বরে বলিবে, "ঠাকরুণ, এই

টেলিগ্রাম এসেছে—অত্যন্ত জরুরী বলেই আমি নিয়ে এসেছি—নীচে আর কেউ নেই! আমাকে ক্ষমা করুন।"

স্বয়ং বাবুর হাতেই টেলিগ্রাম পেঁছাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে প্রায় নিঃসন্দেহ হইয়া নন্দ খোলা দরজা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইল এবং দরজার সম্মুখে পেঁছিয়াই, পরমুহূর্ত্তেই, হাতের কাগজ ফেলিয়া দিয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল—হুঁশ রহিল না, এখন সে কোথায়, চারিদিকে আলো না অন্ধকার, সিঁড়িতে পা দিয়া, না গড়াইয়া সে নামিতেছে, আর কোথায় সে চলিয়াছে।

এক মুহূর্ত্তে ফলগর্ভ এতবড় দৈবযোগ ইতিহাসে আর ঘটে নাই।

কিন্তু আসিল সে ঠিক পথেই, পেঁছিল সে নিজের ঘরেই, এবং ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল নিজের চেয়ারটিতেই—

তখন ঘামে তার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেছে, মাথার ভিতর কেমন করিতেছে, সেই কেমন করাটা অসাড়তা, না যন্ত্রণা, না ঘূর্ণন তাহা উপলব্ধ হইতেছে না; এবং মস্তিষ্কের সেই অবর্ণনীয় অবস্থার দরুণ তার চিন্তাশক্তি, এবং নিজেকে হৃদয়ঙ্গম কারবার সম্বিৎ লোপ পাইয়া গেছে।

টেলিগ্রাম পিওনের প্রশ্ন তার কানে গেল না।

তারপর জন্মিল দুঃসহ প্রবল ত্রাস—

মা'র খাইয়া বিদায় লইতে হইবে—মারিবে জুতা, না বেত।

নন্দর চক্ষু দেওয়ালের দিকে নিষ্পলক হইয়া রহিল, ক্রোধে আগুন হইয়া শাস্তিদাতার ক্ষিপ্ত অবতরণের বিলম্ব আর কত?

যাহা দেখিবার নয় নন্দকিশোর দৈবাৎ তাহাই দেখিয়াছে সন্দেহ নাই; মূঢ়তার বশে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ সে করিয়াছে; অসাধুতার নয়, মূঢ়তার শাস্তি তাহাকে পাইতেই হইবে।

বাবু ঐ ঘরেই আছেন, কেবল উৎকৃষ্ট সাবানের গন্ধ পাইয়া তাহা অনুমান করা বুদ্ধির চূড়ান্ত জড়তা, অথবা যে-নিয়তির বশে খাদ্যান্বেষণে নির্গত ব্যাং লাফাইতে লাফাইতে গিয়া পড়ে সাপের একেবারেই মুখে সেই নিয়তির ক্রীড়া ছাড়া আর কি?

সে জানিত না যে—

কিন্তু অপরাধ চিরকালই অপরাধ, আর না জানিয়া অপরাধ করিলে সর্ব্বদাই তার ক্ষমা আছে, এবং ফলভোগ করিতে হয় না, এমনও নয়, যথা, আগুনে আঙুল পড়িলে আঙুল পুড়িবেই—আগুনে আঙুল দৈবাৎই পড়ুক, কি জানিয়া শুনিয়াই দাও। বিধি লঙ্ঘনের মতোই নিজের মনের নিষেধ লঙ্ঘনেও ঝুঁকি যথেষ্ট।

ছি ছি—

নিন্দা লজ্জা ঘৃণা ধিক্কার ইত্যাদি সূচক ঐ শব্দ দুটি নন্দকিশোর, আতঙ্কে অভিভূত হইয়াও পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিল।

সর্ব্বনেশে সেই টেলিগ্রামকে মনে হইয়াছিল দুঃসংবাদের বাহক—কারো শেষ মুহূর্ত্তের ডাক, সে-ই করিল এই সর্ব্বনাশ! আর আরো মাটি করিয়াছে সাবানের সেই গন্ধ। সাবানের গন্ধের অনুসরণ করিয়াই ত' সে দরজায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিল—

মনে করিয়াছিল, বাবু খেউরি করিতেছেন, কিন্তু দরজায় গিয়া দাঁড়াইতেই দেখা গেল অন্য লোক—"একেবারে যাচ্ছেতাই ব্যাপার"।

প্রভুপত্নী, তরুণী রমণী মাত্র একখানি তোয়ালে কটিতট হইতে বিলম্বিত করিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—দীর্ঘ কেশদামে পৃষ্ঠদেশ আবৃত, ধৌত চুলে চিরুণী লাগাইয়া তিনি হাত তুলিয়া চিরুণী টানিয়া আনিতেছেন পিছনের চুলের ভিতর—দাঁড়াইয়া আছেন দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া, এবং সুবৃহৎ দর্পণের পটভূমিকায় তাঁর সর্ব্বাঙ্গের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

এক-পলকে নন্দ তাহা দেখিল না, দেখা অসম্ভব, নন্দ আরো দেখিল যে, তাহারও প্রতিবিম্ব পড়িল সেই পাপ দর্পণেই, প্রভু-পত্নীর বহু পশ্চাতে।

আর সে দাঁড়ায় নাই, আর-কিছু সে দেখে নাই, তারপর সেখানে কিছু ঘটিল কিনা তাহা সে জানে না, কিন্তু পরিণামে কি ঘটিতে পারে, অর্থাৎ ফলভোগ কিরূপ হইবে তাহা সে জানে—হৃদ্‌পিণ্ডে তাহা অনুভূত হইতেছে।

সে পলাইবে নাকি! থাক্ বাক্স-বিছানা বেতন—মানরক্ষা সর্ব্বাগ্রে।

কিন্তু মানরক্ষার্থে পলায়ন করিবার পূর্ব্বেই, অর্থাৎ মিনিট পাঁচ-ছয় পরেই, যাহার সম্মুখ হইতে পলায়নের কথা সে ভাবিতেছিল সেই মণীন্দ্রেরই পদশব্দ আসিল সিঁড়ি হইতে—অপমানিত প্রভু মৃত্যু-বিভীষিকার রূপ ধারণ করিয়া অনিবার্য্য রুদ্রমূর্ত্তিতে অবতরণ করিতেছেন।

নন্দর মনে হইল, তিনি যেন চীৎকার করিতেছেন, কই সে ব্যাটা?

নন্দ ছিটকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কোণের দিকে সরিয়া গেল, তখনই সরিয়া আসিল বৃহদাকার টেলিগ্রাম পিওনের পশ্চাতে।

মণীন্দ্র আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন, চৌকাঠ পার হইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, আর নন্দকিশোরের কম্পমান প্রাণ কণ্ঠে উঠিয়া আরো বেগে কাঁপিতে লাগিল।

ক্রোধে যে ব্যক্তি একেবারে নিঃশব্দ হইয়া যায় সে-ই হয় আরো ক্ষমাহীন।

কিন্তু "কই সে ব্যাটা?" বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া মণীন্দ্র তাহাকে খুঁজিলেন না, সহজ লোক যেমন সহজভাবে কথা কয় তেমনি সহজভাবে তিনি বলিলেন, এই নাও। একটু দেরী হ'ল। বলিয়া তিনি পিওনের হাতে রসিদ দিলেন।

পিওন চলিয়া গেল—

তৎক্ষণাৎ দেখা দিল চরম সংকট, নন্দর কণ্ঠাগত প্রাণ বোঁ করিয়া ওষ্ঠাগত হইল; তাহার আর তাঁর মাঝখানে অন্তরাল আর নাই, বৃহৎ শরীর লইয়া সে প্রভুর চোখের উপর দাঁড়াইয়া আছে!

আড়ষ্ট নন্দ কষ্টে একটা ঢোঁক গিলিল।

যে-মেঘ দেখিয়া লোকে ঝঞ্ঝাসহ বজ্র শিলা আর বারিপাতের প্রতীক্ষা করে সে-মেঘে তা কিছুই ঘটে না এমন ঢের দেখা গেছে—তেমনি ঘটিল এখানেও, দুর্য্যোগ আসিল না। মণীন্দ্র তাহাকে দেখিয়াই কলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, আরে, তুমি ছিলে কোথায়? টেলিগ্রাম বুঝি তুমি দিয়ে এসেছ ওপরে!

স্বীকার করিতে গিয়া নন্দকিশোরের শুষ্ক কণ্ঠ এবং শুষ্ক জিহ্বা আরো আড়ষ্ট হইয়া গেল, ঠোঁটের ফাঁক দিয়া শব্দের স্থানে খানিক বায়ু বাহির হইল কেবল।

মণীন্দ্র বলিলেন, রাখাল কি বলরাম ছিল না এখানে ?

নন্দ আগে দিল একটু গলা খাঁকারি, উহাতে বাক্‌শক্তি সামান্য কার্যকর হইলে সে উচ্চারণ করিল, আজ্ঞে না।

সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িতে হিল্‌-উঁচু জুতার খট্‌খট্‌ দ্রুত শব্দ উঠিল, গৃহিণী আসিতেছেন। নন্দকিশোর আর কিছু বলিতে চেষ্টা করিল না, করিলে সে দেখিতে পাইত, তার বাক্‌শক্তি পুনরায় লুপ্ত হইয়া গেছে ; কারণ গৃহিণী আসিতেছেন ; তাহার সম্মুখেই তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ স্বামীর কাছে করিবেন এবং প্রতিকার চাহিবেন এমন দৃপ্ত তেজে আর এমন ক্রুদ্ধ হইয়া যে তখন –

কিন্তু কিছুই ঘটিল না, তিনি তা করিলেন না, স্বামীর জন্য তিনি দাঁড়াইলেন না পর্যন্ত, একাই অগ্রসর হইয়া গেলেন রোজ যেমন যান ; মণীন্দ্র তাঁর অনুগমন করিলেন, বলিয়া গেলেন, তুমি বুঝি বেড়াও না, মাষ্টার ? বেড়িও, নইলে ও চেহারা থাকবে না।

নন্দকিশোর তখন মুহূর্ত্ত দুই নিশ্চেষ্ট অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া সরিয়া যাইয়া চেয়ারে বসিল, একেবারে গা ছাড়িয়া দিয়া অবিলম্বেই একটা নিঃশ্বাস মুক্ত করিয়া দিল এবং সেই নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার জ্বালা যন্ত্রণা উৎকণ্ঠা আতঙ্ক প্রভৃতি অশুভজনিত সমুদয় গ্লানি বহিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল, ওঝার ফুঁ-এ বিষের মতো, তারপর ক্রমে সে খুশী হইয়া উঠিল ; এমনি ক্ষমাই ত' মানুষকে করা উচিত, অজানত দৈবাৎ যে-অপরাধ ঘটিয়া যায় যথার্থ ভদ্রলোক নিজেরই মনে তার উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করে, বাহিরের শাস্তি কখনো অতিরিক্ত, কখনো অত্যাচার।

যে ব্যাপার সংক্ষোভে তুমুল এবং মারাত্মকভাবে ক্ষতিজনক হইয়া উঠিতে পারিত তাহা ক্ষমাময় উদার নির্লিপ্ততার ভিতর দিয়া নিঃশব্দে শেষ হইয়া গেছে। অন্য দিক্‌ দিয়া তাহার আর গুরুত্ব রহিল না, কেবল রহিল নিষ্কৃতিদানের দরুণ ওঁদের প্রতি অপার কৃতজ্ঞতা আর, অতুল একটা আনন্দ।

পরদিন দ্বিপ্রহরে মণীন্দ্র আহারান্তে তাঁর কাজে বাহির হইয়া গেলেন। আজকাল তাঁহাকে কাজে একটু বেশি ব্যস্তই দেখা যাইতেছে।

নন্দকিশোর রান্নাঘরের দুয়ারের দিকে মুখ করিয়া আর একটা দেয়াল ঘেঁষিয়া খাইতে বসিয়া গেছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া ঠাকুর কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, ডালটা কেমন হয়েছে, বাবু ?

ভালো না হইলে নন্দ ভালোই বলিত, বলিল, ভালো হয়েছে।

—ঝোল্‌টা ?

—ঝোল্‌টাও ভালো হয়েছে।

ঠাকুরের ইচ্ছা, মাহিনা বাড়াইবার প্রস্তাবটা মনিবের কাছে আজকালই করে, একটু দুঃখিতভাবেই বলিল, কিন্তু বাবু ত' কিছু বললেন না।

মণীন্দ্র রোজ তারিফ বা নিন্দা করেন।

নন্দ তাহাকে সান্ত্বনা দিল, বলিল, ভুলে গেছেন হয়েতো।

বলিয়াই নন্দ অনুভব করিল, ঘরের ভিতর একটা ছায়া পড়িল, ছায়া

ভৌতিক নয়, মনুষ্যদেহের, কারণ, পরক্ষণেই কণ্ঠস্বর শুনা গেল : ঠাকুর, বলরাম কোথায় ?

শুনিয়াই বুঝা গেল, কণ্ঠস্বর নারীর, এবং তা শুনিয়াই নন্দকিশোর অধোমুখ, শশব্যস্ত, ত্রস্ত এবং মনে মনে পলায়নোদ্যত হইয়া উঠিল, মুখে ভাতের গ্রাস তোলার চাঞ্চল্য বন্ধ হইয়া গেল, এবং দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন গৃহিণী।

ঠাকুর বলিল, তাকে আমি একটু বাজারে পাঠিয়েছি, মা, এক পয়সার পান আনতে।

ঠাকুর বড্ড পান খায় ; এবং একটি করিয়া পয়সা সে রোজ পান-খরচা পায়।

কিন্তু গৃহিণী তখন মাষ্টারবাবুকে লক্ষ্য করিতেছেন, লক্ষ্য স্থির রাখিয়াই ঠাকুরকে বলিলেন, ঠাকুর, এ-বাবুকে গাদার মাছ দিয়েছ যে ?

ঠাকুর হাত কচলাইতে লাগিল।

গৃহিণী ঠাকুরকে আদেশ করিলেন, পেটির মাছ দেবে। —খান্ আপনি, খাওয়া বন্ধ করলেন কেন ?

ঠাকুরকে যেমন তাহাকেও তেমনি আদেশই তিনি করিলেন ; নন্দকিশোরের মনে হইল, আদেশ মান্য করিতে সে বাধ্য, লজ্জায় চোখ-মুখ লাল করিয়া আর ছোট ছোট গ্রাস ধীরে ধীরে মুখে পুরিয়া নন্দ তাঁর আদেশ মান্য করিতে লাগিল।

গৃহিণী পুনরায় আদেশ করিলেন, ঠাকুর, দু পয়সার মিছরি নিয়ে এস ত' শীগ্‌গির। যে মিছরির ওপর মাছি বসে আছে দেখবে তা খবরদার এন না। যাও। আমি এঁর খাওয়ার কাছে দাঁড়াচ্ছি।

নন্দকিশোরের মনে হইল, গৃহকর্ত্রীর আদেশ করিবার ক্ষমতা অস্বস্তিকর হইলেও তাঁর এ আচরণটি খুবই অনুকম্পাময়, খুবই শিষ্ট, খুবই দায়িত্ববোধের পরিচায়ক !

ঠাকুর পয়সা লইয়া মিছরি আনিতে গেল।

এবং একা পড়িয়াই নন্দকিশোরের বুক আবার বেজায় ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল, গৃহকর্ত্রীর অনুকম্পা, শিষ্টতা এবং দায়িত্ববোধ যতই স্নিগ্ধ আর শান্তিদায়ক হউক, স্নিগ্ধতা আর শান্তির সেই আবহাওয়া টিকিতে পারিল না, অপরাধের স্মৃতি সজীব, আর কর্ত্রীর উপস্থিতি সেই মুহূর্ত্তেই নিদারুণ উদ্বেগজনক হইয়া উঠিল।

সে এতক্ষণে যেন তার একটা ভুল বুঝিতে পারিল : নিজেরই হাতে যথেচ্ছ আর অবিসম্বাদিত শাসনক্ষমতা থাকিতে ইনি ঘটনার যথাযথ এবং আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা দিয়া স্বামীর কাছে অকারণে লজ্জা পাইতে যাইবেন কেন! পাপীকে দণ্ড দিবার হক্ তাঁর আছে, তাই দিতে তিনি আসিয়াছেন।

কিন্তু সব তার আগাগোড়া ভুয়ো ভুল, আর, ভুসোর মত কালো আর হাল্‌কা। নন্দ যাঁহাকে চণ্ডিকা, শাসনকর্ত্রী, আর দণ্ডদাত্রী মনে করিয়া ভয়ে লজ্জায় ক্ষোভে এতটুকু হইয়া গেছে আর অনর্গল ঘামিতেছে, তিনি তখন তার অবনত মুখের দিকে তরল চক্ষে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

হাসিটুকু নন্দ দেখিতে পাইল না, কিন্তু স্বর শুনিল—দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী বলিলেন, কাল হঠাৎ অমন করে এসে দাঁড়ানো আপনার উচিত হয়নি।

খুঁজিলে ভৎসনার সুর ঐ কথার ভিতর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে।

ক্ষমা-ভিক্ষার সুযোগ পাইয়া নন্দর কথা ফুটিল, নিজেকে যেন সে সেখানে লুটাইয়া দিয়া বলিল,—আজ্ঞে, সেজন্যে আমি অপরাধী আর অনুতপ্ত। আমাকে ক্ষমা করুন।

প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করিয়াও নন্দ তীব্রতম তিরস্কারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, আর তার তখনকার কাতরতাকে অবিশ্বাস কেহ করিতে পারিবে না।

অপরাধী আর অনুতপ্ত নন্দকিশোরের কাতর ক্ষমা-প্রার্থনা বিফলে গেল, ক্ষমা করিতে তিনি রাজী কি নারাজ তা তিনি জানাইলেন না, বলিলেন, আমি তখন কেবল গা ধুয়ে এসে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ আয়নার ভেতর আপনাকে দেখলাম, আপনার ছায়া পড়ল।

নন্দ তা জানে, মর্ম্মান্তিকভাবেই জানে।

উনি বলিলেন, কিন্তু অমন করে ছুটে পালিয়ে গেলেন ভয়ে, লজ্জায় না ঘৃণায়?

এ প্রশ্নের উত্তর কি থাকিতে পারে! নন্দ কথা কহিল না, উঠিবার উপক্রম করিল।

—ভয় পাবার কি ছিল। ঘৃণাই বা করবেন কেন! দোষ ত' আপনারই। লজ্জা পেয়েছিলেন বুঝি? ও কি! খাওয়া শেষ না হতেই উঠছেন যে? আমি তবে যাই এখান থেকে।

বলিয়া তিনি গেলেন না, বোধ হয় যে মিছরিতে মাছি বসে নাই সেই মিছরি না লইয়া তিনি যাইবেন না।

নন্দ উঠিল না, অবসন্ন হস্তে ভাত তুলিয়া মুখে দিতে লাগিল।

—আপনার বিয়ে হয়েছে?

নন্দ ধীরে ধীরে মাথা কাত করিয়া জানাইল, তার বিবাহ হইয়াছে।

—তবে ত' বোঝেনই সব। কিন্তু আর কখনও যদি ওপরে আসেন তবে খবর দিয়ে আসবেন।

উপরে আসিতে তিনি নিষেধ করিলেন না। খবর দিবার লোক যখন থাকে না তখন টেলিগ্রাম আসিলে কি করিতে হইবে তাহাও তিনি বলিলেন না।

খবর দিতে অতিশয় সম্মত এবং তৎসহ ধন্য হইয়া নন্দ বলিল, আজ্ঞে।

—তা-ই করবেন। আর একটা কাজ করবেন, আমার হুকুম—

বলিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

আদেশ গ্রহণ করিতে মনে মনে মাথা পাতিয়া নন্দ নিজের অজ্ঞাতেই যেন হঠাৎ মুখ তুলিয়া চাহিল। সম্মুখবর্ত্তিনীর মুখের উপর তার দৃষ্টি পড়িল, তাঁহাকে না দেখিয়া সে পারিল না, দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরাইবার পূর্ব্বেই যে একটিমাত্র চকিত মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইল, সেই একটি মুহূর্ত্তেই তাঁর সমস্ত মুখ-মণ্ডল তার দর্শনেন্দ্রিয় প্রত্যক্ষীভূত হইল, পরিহার করা গেল না; সে দেখিল, এবং তার হৃদয়ঙ্গম হইল যে রূপ অজস্র, এত যে, আর, এমনি বিভ্রম ঘটানো তার শ্রী উজ্জ্বলতা যে, দৃষ্টি রূপ দেখিতে দেখিতে রূপ দেখিতে ভুলিয়া গিয়া রূপের দিকেই নির্নিমেষ হইয়া থাকিতে চায়।

তবু সে তাড়াতাড়ি চোখ নামাইল, কর্ত্রী বলিলেন, আমার হুকুম মানবেন ত'?

নিতান্ত বশংবদ নন্দ যেমন করিয়া বিবাহের কথা স্বীকার করিয়াছিল, ভয়ে ভয়ে মাথা কাত করিয়া হুকুম মানিতেও সে তেমনি রাজি হইল, কিন্তু সেটা যে এমন হাসির কথা হইবে তা কে জানিত! কর্ত্রী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; তাহাতে মধুবৃষ্টি কতটা হইল এবং মুক্তা ঝরিল কি না তা নন্দ জানে না, সে কেবল কর্ত্রীর কাছে নির্বোধ বনিয়া অপ্রস্তুত হইল।

তারপর, যে আদেশ মান্য করিতে নন্দ মাথা কাত করিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে সেই আদেশবাক্য তিনি উচ্চারণ করিলেন, বলিলেন,—পালাবেন না; আমাকে আয়নায় যেমন দেখেছেন, তেমনি দেখা আমার ভালো লাগে. আপনাকে আরো - আপনি নির্ব্বোধ, তাই দিশে পান না, পালান।

বলিয়া তিনি থামিলেন।

পলায়নের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইল। নন্দ সাষ্টাঙ্গে মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াও সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া অনুভব করিতে লাগিল যে, তিনি দুই চক্ষুর দৃষ্টির দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর, অল্প অল্প হাসিতেছেন।

পরক্ষণেই তাঁর কাপড়ের খসখস শব্দ উঠিল, তিনি প্রস্থান করিলেন, যে মিছরিতে মাছি বসে নাই সেই জরুরী মিছরির কথা তিনি বোধ হয় তখন ভুলিয়াই গেছেন।

তারপর নন্দ কি করিল, কেমন করিয়া করিল; উঠিয়া না বসিয়াই রহিল; খাওয়া শেষ করিল কি না, কোথা দিয়া সময় যাইতেছে; কেমন করিয়া আর কোন পথে আসিয়া সে তার তক্তাপোষে আছড়াইয়া পড়িল তাহা সে জানে না।

সর্ব্বপ্রকার উপসর্গের অতীত একটা তুরীয় অবস্থায় কিছুক্ষণ বেহুঁশ অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকিবার পর সময়ের শুশ্রূষায় ক্রমে তার চোখে দৃষ্টি, বুকে নিঃশ্বাস, মস্তিষ্কে চিন্তার চৈতন্য এবং হাত পা নাড়িবার সামর্থ্য ফিরিল, তখনই সে উঠিল যেন বহুদিন পরে রোগশয্যা ছাড়িয়া নন্দ উঠিয়া বসিল।

বলিল, পালাই। কারো কাছে সে বলিল না, মনের কথাটা মুখে ফুটিল। চামড়ার ব্যাগটি লইয়া নন্দ বাড়ীর বাহির হইয়া গেল, বাক্স বিছানা আর একুশ দিনের বেতন ফেলিয়া সে চলিয়া আসিল।

মাকে বলিল, তাড়িয়ে দিলে। বলিয়া প্রণাম করিল।

মমতাকে বলিল, পালিয়ে এলাম। বলিয়া গভীর আগ্রহে তার মুখচুম্বন করিল।

পুত্রের পথশ্রম দূর হইলে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাড়িয়ে দিলে কেন?

নন্দকিশোর এদিকে সাদাসিদে আর সাধু যতই হউক ওদিকে মিথ্যা কথা বলিতে সে রাজী আছে; বলিল, আমার বিদ্যে অল্প; বেশী বিদ্যের লোক পেয়ে গেছে বোধ হয়।

—তা'তেই তুই সর্ব্বস্ব ফেলে রেখে চলে এলি?

নন্দকিশোর বলিল, কতবড়ো অবিশ্বাসের কাজটা করলেন তিনি তা বুঝতে পারছ না? রাগ হয় না? একটু মেজাজই দেখিয়েছি, মা। বলিয়া নন্দ হাসিল।

—কিন্তু তাঁর ত' তলে তলে কাজ হাসিল করার কারণ দেখিনে!

—কি জানি, তাঁর প্রকৃতিই ঐ রকম ; সাধারণ কথাই তিনি স্পষ্ট করে বলেন না।

—জিনিসগুলো পাবি ত' ?

—পাবো, মা। কিছু ভেবো না।

মমতার সঙ্গে আবার দেখা হইতেই মমতা বলিল, পালিয়ে ত' এলে। কিন্তু তল্পিতল্পা ফেলে কেন ?

— তুমিই ত' চলে আসতে বলেছিলে !

—কিন্তু—বলিয়া মমতা থামিয়া গেল ; তারপর বলিল, জিনিসগুলো নিয়ে আসার সময় হ'ল না, এ কেমন চলে আসা ! তোমার রাগ এত তা ত' জানতাম না। গুরুতর কিছু ঘটেছে নিশ্চয়ই।

—ঐ যে বললাম, একটু মেজাজই তাঁকে দেখিয়েছি। তাঁর রোখ দেখে দেরী করতে সাহস হ'ল না।

—তা হবে। বলিয়া মমতা তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

খানিকটা সময় নন্দর ভাবনার ভিতর দিয়াই কাটিল ; মা এবং মমতা তার এই চলিয়া আসাটা যেন সম্পূর্ণ পছন্দ করেন নাই। জেরা করিয়াছেন খুব। কিন্তু মায়ের আর স্ত্রীর জেরা, যদি অবুঝও হয় তবু, মানুষকে উদাস কি আনমনা করে না—নন্দকিশোরকেও করিল না। যা মানুষকে উদাস আর আনমনা করে, নন্দকিশোরের বেলায় আজ তাই ঘটিল রাত্রে, নন্দর নিদ্রিতাবস্থায়।

নারীর রূপ আর আকর্ষণ, বিভ্রান্তিকর সেই মোহন ইন্দ্রজাল, পুরুষ অত সহজে আর অত সত্বর ভুলিতে পারিলে পৃথিবীর বুক হাল্কা, কাব্য ক্ষুণ্ণ, এমন কি মরণশীল, পুরাণ অপাঠ্য, আর পাগলের সংখ্যা চৌদ্দ আনা হ্রাসপ্রাপ্ত হইত। তা যা'তে না হয় সেইজন্যই বোধ হয় নন্দকিশোর সেই রাত্রেই এক অভাবনীয় স্বপ্ন দেখিল।

স্বপ্ন ব্যাপারটাই অলীক, অর্থাৎ অমূলক, লোকে সাধারণতঃ তা-ই বলে ; কিন্তু যার মূলের সন্ধান আপাততঃ প্রথম দৃষ্টিতেই পাওয়া গেল না তাহাকেই অমূলক বলা বোধ হয় সমীচীন নয়। মানুষের বিস্মৃত অন্বেষণ, যাচঞা, যত্ন, অপূর্ণ ইচ্ছা, মুহূর্তের কি যুগব্যাপী গোপন আকাঙ্ক্ষা, শোনা গল্প, দেখা ঘটনা, অর্থশূন্য কল্পনা ইত্যাদি জোড়াতাড়া দিয়া জথাখিচুড়ি স্বপ্নও নাকি লোকে দেখে, ভালো দেখে, মন্দ দেখে, একটানা দেখে, ভাঙা ভাঙা দেখে ; কোনোটার মানে হয়, কোনোটার তা হয় না ; কিন্তু মূলে থাকে দ্রষ্টার চেতন কি সুপ্ত মনের গতি আর ক্রিয়া, তা যেমনই হোক, যতদিনকারই হোক ! জ্ঞানতঃ থাক কি অজ্ঞাতে থাক, অর্থাৎ স্বপ্ন অমূলক নহে বলিয়াই স্বপ্নতত্ত্বজ্ঞের বিশ্বাস।

নন্দকিশোরের মতো বাহ্যতঃ নির্ব্বিকার ঠাণ্ডা মানুষের বুকেও বোধ হয় রূপের অর্চ্চনা করিবার প্রচ্ছন্ন অভিলাষ ছিল, কিন্তু যে অনুপম আশ্রয়ে স্বপ্নের সৃজন হইবে তাহা আগে সে দেখে নাই বলিয়াই বোধ হয় আগে সে স্বপ্ন দেখে নাই। আজ স্বপ্ন-সৃষ্টির সেই অনুকূল পাইয়া সে স্বপ্নটা দেখিল।

দেখিল, মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রী, অনুপমা পুরনারী, যাঁর ভয়ে সে বাক্স বিছানা এবং একুশ দিনের বেতন ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছে, তিনি একখানি অতিশয় উজ্জ্বল সিংহাসনে বসিয়া আছেন, পদযুগল সংস্থাপিত করিয়াছেন অতি শুভ্র গজদন্তনির্ম্মিত আর ক্রমনিম্ন একখানা পাদপীঠের উপর, অস্তমিতপ্রায় সূর্য্যের লোহিত দীপ্তির তুল্য গাঢ় রক্তবর্ণ বসন প্রান্ত তাঁর গুল্ফ চুম্বন করিয়াছে; আর, বিশ্বাস করুন যে, সে, অর্থাৎ নন্দকিশোর তাঁর পদপ্রান্তে বসিয়া দ্বিরদরদ-নির্ম্মিত শুভ্রাসন আর বসনের লোহিতরাগযুক্ত প্রান্ত লক্ষ্য করিয়া অক্লান্তভাবে পুনঃ পুনঃ পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতেছে।

নন্দ আরো দেখিল যে, তাঁর মুখখানা বিষণ্ণ, এবং তা বিষণ্ণতার ছায়া ম্লানিমার অনুলেপনে চমৎকার অভয়প্রদ আর স্নিগ্ধ দেখাইতেছে।

ঐ চরণে পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতে করিতে স্বপ্ন কখন বিলীন হইয়া গেছে তা নন্দকিশোর জানে না। এ-স্বপ্ন তেমন স্বপ্নও নয় যাহাতে বুক ধড়ফড় করিয়া রোমাঞ্চিত কি উত্তেজিত অবস্থায় মানুষের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। স্বপ্ন-দর্শনের পরই নন্দকিশোরের ঘুম ভাঙ্গিল না; এবং সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিবার পরও স্বপ্ন বৃত্তান্তই যে তাহার মানসিক সকল বিষয়ের সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী হইয়া উদিত হইল তাহাও নয়। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক করিবার পর এবং মা ও বিষ্টুর সঙ্গে দু' চারবার কথোপকথনের পর মুখ ধুইতে বসিয়া খড়িমাটি দিয়া দাঁত মাজিতে মাজিতে অকস্মাৎ তার মনে পড়িয়া গেল যে, সে স্বপ্ন দেখিয়াছে। স্বপ্নটা মোটেই বড় নয়—মাত্র ইহাই যে, একটি নারীমূর্ত্তির পায়ে সে ফুল দিতেছে; কিন্তু নারীটি যেমন, স্বপ্নের সেই অংশটাই স্বপ্নে প্রত্যক্ষে একাকার হইয়া একেবারে ঝক্ মক্ করিয়া উঠিল—নন্দকিশোরের অন্তর যেন আলোকিত হইল—

দন্তধাবন সে দ্রুতবেগেই করিতেছিল। স্বপ্ন ঐ ভাবে মনে পড়িয়া যাইতেই তার হাতের সে কাজটা মুহূর্ত্তেকের জন্য বন্ধ হইয়া গেল, তারপর শ্লথভাবে চলিতে লাগিল, এবং তারপর একটা অপরাধ হইতেছে মনে করিয়া নন্দকিশোর পূর্ব্বের চাইতেও দ্রুতবেগে দাঁত মাজিতে লাগিল।

ত্রিলোকপূজ্য দুর্জ্জয় দেবগণ এবং তাঁদেরও বরেণ্য মহাতপা মুনিগণ যে বিষয়ে ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক অন্যথাচরণ করিতে পারেন নাই—লজ্জাহীনের মতো পরাভব স্বীকার করিয়াছেন - নন্দকিশোর, মাটির মানুষ, সেই কার্য্যসাধন করিতে গেল হুঁ হুঁ শব্দ দাঁত মাজিয়া—দাঁত মাজিয়া সে রূপের প্রভাব পরিবেশ ভগ্ন বা অতিক্রম করিবে!—সে অঘটন ঘটিল না; রূপের প্রভাব আর পরিবেশের মধ্যেই তার চিত্ত বিচরণ করিতে লাগিল। অপরাধ হইতেছে জানিয়াও সে অনুভব করিতে লাগিল সাবানের সেই ঘ্রাণটি, যা তাহাকে মরীচিকার মতো ভুলাইয়া ভুলপথে লইয়া গিয়াছিল।—বায়ুবাহিত সেই ঘ্রাণের অনুসরণ করত অগ্রসর হইতে হইতে তার

গতি আচম্বিতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে দৃশ্য দেখিয়া সে-দৃশ্য তার এখনই মনে পড়িল না, কিন্তু বরবর্ণিনীর যে অঙ্গ-সৌরভ তাঁর অঙ্গচ্যুত হইয়া তার নাসিকায় প্রবেশ করিয়া বহুক্ষণ স্থিতিলাভ করিয়াছিল, স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তির শান্ত কোমল বিষণ্ণতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইয়া আর ঘনীভূত হইয়া, সেই সৌরভটুকু যেন তার চৈতন্যের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল, এবং তাহা ঘটিতে লাগিল যেন বলপূর্ব্বক দ্রুতহস্তে দাঁত মাজিয়া তাহাকে নিবারণ করা গেল না।

ছোট ভাই বিণ্টু আসিয়া বলিল,—দাদা, বৌদি বলছে, তোমার মুখ ধুতে আজ বড়ো দেরী হচ্ছে।

—যাই। বলিয়া স্ত্রৈণ নন্দকিশোর তাড়াতাড়ি কুলকুচা করিতে লাগিল।

বিণ্টু বলিল, চা ভিজিয়েছে।

নন্দকিশোর পুনরায় বলিল, যাই।

নন্দকিশোর রান্নাঘরের ভিতরে মমতার সম্মুখে বসিয়াই চা খায়। মুখ ধুইয়া সেখানেই সে গেল—চা খাইতে লাগিল, আর, তার মুখে মৃদু একটু হাসি লাগিয়াই রহিল।

তার সে হাসির দিকে চাহিয়া মমতা জানিতে চাহিল, হাসছ যে অমন করে?

—কেমন করে?

—বদমতলবী লোক মতলব ঠিক করে ফেলার পর ঐ রকম একটা দুষ্টু ফুর্ত্তির হাসি হাসে।

নন্দকিশোর মমতার চাতুর্য্যে অবাক না হইয়া পারিল না, এবং তার মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে ছায়াচ্ছন্ন হইয়া গেল, তারপরই সে হাসিয়া বলিল, আমি ভাবতাম, তুমি বুঝি সরল অনভিজ্ঞ লোক; তা ত' নয়! বদমতলবী লোক মতলব ঠিক করে ফেললে তার মুখের চেহারা কেমন হয় তা জানো দেখছি।

মমতা হাসিয়া বলিল, নিজের চোখেই দেখেছি যে অনেকবার।

—কোথায়?

—বাড়ীতেই। বড়দা মেজদাকে জব্দ করার ফিকিরেই থাকে; ফিকিরটা খাটাবার আগে সে ঐরকম অল্প অল্প হাসে। বাবা মা কতদিন তার চালাকি ধরে ফেলেছেন তার ঠিক নাই। আমরা কতদিন তা-ই নিয়ে হাসাহাসি করেছি।

—তা'ই বলো, ঘরোয়া নির্দ্দোষ ব্যাপার! কিন্তু আমি ত' বিণ্টুকে—

—তা ত' নয়ই। আমাকে নয় ত'?

—উঁহুঁ। আমি হাসছিলাম কেন জানো?

—কেন?

নন্দ মিথ্যা কথা খুব বলে, বলিল, সাপ স্বপন দেখেছি।

—অজগর না হেলে?

—কিংবদন্তী তা কিছু বলে না, সাপ হ'লেই হল।

—বাজে কথা যাক্। ওরা তোমার খোঁজ করবে না?

—না করাই সম্ভব।

—মণীন্দ্রবাবু করতে পারেন।

— কেন ?

—যে কারণে তিনি তোমাকে বাহাল করেছিলেন ; বেশি বেশি পাশ করা বড় বড় লোককে তিনি চান নাই। কেন বলো ত' ?

—আমার সঙ্গে আমার স্ত্রীর কথা নিয়ে উল্লাস করার সুবিধে ভেবে হয়তো ; কিম্বা—

বাধা দিয়া মমতা বলিয়া বসিল, খুব হালকাভাবে, যাহাকে বলা হইতেছে, সে কিছু মনে না করিতে পারে এমনি নির্লিপ্তভাবে হাসিতে হাসিতেই বলিল,—তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে তুমি উল্লাস করতে যাওনি ত' ?

পরস্ত্রী তাহাকে কামনা করিয়াছে, স্বীয় স্ত্রীর কাছে সজ্জন নন্দকিশোর তাহা বলিতে পারিল না ; নিজে সে দোষী নয়, সুতরাং কেবল বলিল, যাঃ।

—আর কি বলতে যাচ্ছিলে বলো।

কিম্বা অপেক্ষাকৃত অনুপযুক্ত লোককে কাজে লাগালে কাজ হারাবার ভয়ে সে খুব মন দিয়ে পড়াবে এই জন্যেও হ'তে পারে। বেশি পাশ করা লোকের আরো বড় বড় জায়গায় ডাক হ'তে পারে, কিন্তু আমার মতো লোকের সে সুযোগ নাই, যা পেয়ে গেলাম তা-ই যথেষ্ট মনে করে এক জায়গায় টিকে থাকার ইচ্ছাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক। ভগবান জানেন কি তাঁর উদ্দেশ্য।

নীলাম্বরির ব্যাপারটা এই সূত্রে নন্দর মনে পড়িল ; তখনও ভালো লাগে নাই, এখনও কৌতুকাবহ মনে হইয়াও সে হাসিতে পারিল না, ঘটনাটা শিক্ষাপ্রদও বটে, যেন তাহাকে চির-রহস্যের তীরে আনিয়া একটা কুহক-সুন্দর আবেদনের দিকে তাহার চোখ ফুটাইয়া দিয়াছে।

নন্দকিশোর উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিল, কিন্তু বড় লোকের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আর যাচ্ছিনে। বলিয়া চায়ের পেয়ালা প্রায় উপুড় করিয়া শেষ-চুমুকটা দিয়া সে বাহির হইয়া আসিল ; এবং তার বেজায় মনে পড়িতে লাগিল স্বপ্নের সেই বিশিষ্ট অংশটা যাহাতে সে সিংহাসনাসীনা রমণীর পায়ে ঘন ঘন পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে।

চমকপ্রদভাবে হঠাৎ তাঁর আবির্ভাব হইয়াছিল, মুহূর্তের জন্য সে চোখ তুলিয়াছিল ; তাঁহার মুখচ্ছবি অনিন্দ্যসুন্দর মনে হইয়াছিল। কিন্তু মস্তিষ্ক এমনি চতুর, বিশ্বাসঘাতক, আর ধারণাক্ষম যে, মুহূর্তের সেই ঝলকটিকে একটা গুপ্ত কোটরে সে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, নিদ্রার সুযোগ আবদ্ধ ছবিকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে, অর্থাৎ স্বপ্নে তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। মস্তিষ্কের বজ্জাতির দরুণই স্বপ্নে তাঁহাকে সে পুনরায় দেখিয়াছে। তিনি অত্যন্ত মহিমময়ী বলিয়াই তাঁহাকে না হয় সিংহাসনে বসানো হইয়াছে, পাড়ের রং যেমনই হোক্ বসন একখানা থাকিবেই ; কিন্তু পায়ে ফুল দিবার তাৎপর্য্যটা কি ? তা আবার একটা দুটো না, অঢেল। ঐ ফুল দেওয়াতেই পরস্ত্রীর রূপের সম্মুখে পরাভব আর নতি স্বীকার করা হইয়াছে, এবং মনের জঘন্যতা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। স্বপ্নের এ স্থানটা একেবারেই অমূলক। সে সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। আর একবার দেখিবার বাসনা, কি ভোগের কামনা, ঘুণাক্ষরেও তার সম্বিতে অঙ্কুরিত হয় নাই ত'।

ভয়ঙ্কর বিস্মিত হইবার পর নন্দকিশোর মাকে ডাকিয়া বলিল,—মা, আমি একটু বেরুলাম।

—বিষ্টুকে পড়াবিনে? তোর কাছে পড়বে বলে বই নিয়ে বসে আছে।

—আসি এখন একটু ঘুরে, সারাদিনই পড়াবো।

জামা জুতা পরিয়া বাহির হইবার সময় নন্দকিশোরের মুখে হাসি ছিল; ছ্যাঁৎ করিয়া তার হুঁশ হইল, সে হাসিতেছে, ব্যস্ত হইয়া সে এদিক ওদিক তাকাইল; তখন তার হাসি দেখিয়া মমতা মন্তব্যসহ, আর, কেমন করিয়া একটা তীক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া, কারণ জানিতে চাহিয়াছিল; এখন আবার তার হাসি দেখিলে পাগল মনে করিবে।

কিন্তু মমতা তখন হেঁসেলে ব্যস্ত।

২

একটু ঘুরিতে বাহির হইয়া নন্দকিশোর অনেক ঘুরিয়া অনেক বিলম্বে বাড়ী ফিরিল। এতটা সময় সে আর কিছু চিন্তা করে নাই, কেবল চিন্তা করিয়াছে এবং অনুভব করিয়াছে মণীন্দ্রবাবুর বাড়ীতে তার নিজের আচরণ; নিজের আচরণ এবং তার হেতু বিশ্লেষণ করিয়া সে আবিষ্কার করিল যে, সেখানে সে ভয় পাইয়াছিল, এত ভয় যে তার ইয়ত্তা নাই। মণীন্দ্রবাবু তার অন্নদাতা প্রতিপালক বলিয়া নয়, তিনি শক্তিশালী লোক বলিয়া, এবং বাড়ীর ভিতর তাহার প্রতি যথেচ্ছ আচরণ করিবার ক্ষমতা তাঁর আছে বলিয়া, তার দুর্ব্বল চিত্তে সহজাত যে ত্রাস প্রচ্ছন্ন ছিল, একটুখানি অপরাধবোধের সূত্রেই তাহা অসাধারণ উৎকট আকার লাভ করিয়া প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার ঘাম ছুটাইয়া ছাড়িয়াছিল; তার পবিত্রতা কালিমালিপ্ত হইতেছে বলিয়া সে আদৌ ক্ষুব্ধ হয় নাই, এমন কি, তা হওয়া না হওয়ার কথা তার মনেই পড়ে নাই। মণীন্দ্রবাবুর কথাবার্ত্তা কেমন যেন রহস্যময়, আর, অহেতুক বলিয়া প্রলাপ মনে হইত কেমন একটা অন্ধকারের ভিতর হইতে, তার অগোচর স্থান হইতে, তিনি যেন উঁকি মারিতেন; উহাতেই, ব্যাপারটা দুর্ব্বোধ্য বলিয়াই তার ভয় করিত। তার স্ত্রীর প্রসঙ্গে তাঁকে কিছু অতিরিক্তই আগ্রহান্বিত দেখা যাইত; কিন্তু সেটা তেমন ভয়ের কারণ হইয়া ওঠে নাই, যথার্থ ভয়ের কারণ ছিল মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রীর উগ্রতা, আধুনিক ভাব-ভঙ্গীর তীব্র প্রকাশ, মাত্রাধিক্য। মমতার মৃদুতার আর কোমলতার এবং তাহারই ভিতর তার অশেষ প্রণয়বিহ্বলতার তুলনা নাই; সে কেবল মৃদু আর কোমলই নয়, সে যেন তাহারই জীবন্ত ছায়া, জীবনের পক্ষে এত অনুকূলে এমন সুস্থ আন্তরিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া সে নিজে থাকে এবং তাহাকে রাখে যে, তাহাকে পরম আপন মনে করিয়া আরামের অন্ত থাকে না; কিন্তু মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রী যেন অজ্ঞাত লোকাভিমুখিনী ক্ষিপ্র একটি জ্যোতির স্রোত, তাহাকে স্পর্শ করাই বিপদ, তাহাতে অবগাহনের কথা ত' চিন্তা করাই যায় না।

কিন্তু স্বপ্নে দেখা মুখখানা অতিশয় বিষণ্ণ, তাহার প্রত্যাখ্যান তাঁর পক্ষে মর্ম্মান্তিক হইয়াছে বুঝি! স্বপ্নে কত তত্ত্ব, কত সত্য, কত তথ্য জানা যায়, ইহা ত' সবাই বলে। তাঁর অন্তরের এই ব্যথাটুকু এই করুণ নিগূঢ় তথ্যটি, সত্য বলিয়াই জাগ্রত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাকে দেখা দিয়াছে, মানুষের মনের

সর্ব্বজ্ঞতা স্বপনযোগে কাজ করিয়াছে। তারপর বিষণ্ণ মুখে নিস্তব্ধ হইয়া পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণও খুবই আশাপ্রদ এবং উৎসাহজনক নম্রতা, ভাবিতে ভালই লাগে ; এমন কি, মনে মনে তাঁর নিকটবর্ত্তী হইতেই যেন ইচ্ছা হয় !

তারপর নন্দকিশোরের মনে পড়িল, একটি চঞ্চল উদ্‌ভ্রান্ত মুহূর্ত্তের জন্য উর্ধমুখ হইয়া সে সেই অপরিমেয় রূপরাশির দিকে নেত্রপাত করিয়াছিল, ভাবিতেই নন্দকিশোরের মনে দাহজনক অনুতাপ এবং তাহারই পাশে অস্থিরকর তৃষ্ণার সঞ্চার হইল। বহুক্ষণ তাকাইয়া থাকিলেও তিনি কিছু মনে করিতেন না, তিনি দেখা দিতেই আসিয়াছিলেন ; সে নির্ব্বোধ এবং দুর্ব্বলচিত্ত বলিয়াই ভয়ে দিশাহারা হইয়া গিয়াছিল। এক মুহূর্ত্তে যাহা সে দেখিয়াছিল তাহা অনন্তকাল-স্থায়ী অপূর্ব্ব উপভোগ্য সঞ্চয় বলিয়া এখন সে মনে করিতে পারিল না।

স্বপ্নের মূর্ত্তির সঙ্গে সে মূর্ত্তির মিল নাই ; দ্বিতীয় মূর্ত্তি রক্তহীন দেহের মতো, তার নিজস্ব চাহিদা নাই, কিন্তু সেই মূর্ত্তির তা ছিল, পুরুষের চিরাভিলষিত দান লইয়া তিনি সম্মুখে অবতরণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু বড় স্থূলভাবে, আর, অত্যন্ত অকস্মাৎ, এবং স্থূল আর আকস্মিক বলিয়া যেন নিঃশ্বাসরোধকর একটা আঘাত হানিয়া মৃদুতা আর মন্থর কোমলতার সঙ্গে সে আত্মসমর্পণ আসে, তাহাই হয় অনিবার্য ; শিবের জটায় গঙ্গাবতরণের মতো দুর্জয় বেগ সংবরণ তার অসাধ্য বলিয়াই তার ত্রাস উপস্থিত হইয়াছিল ; কিন্তু পরম সুখের বিষয় ইহাই যে, স্বপ্নে তিনি দেখা দিয়াছেন কমনীয় কোমল স্তিমিত মূর্ত্তিতে। সম্ভবতঃ তাঁর ঐ মূর্ত্তিটাই স্বাভাবিক মূর্ত্তি, ক্ষিপ্র অধীরতা কেবল লোক দেখানো বহিরঙ্গ, চমক্ লাগাইবার আর শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য প্রতিপাদনের উপায় মাত্র। তিনি যার একান্ত আপন এবং যার বশবর্ত্তিনী তার কাছে নিশ্চয়ই তিনি অবনত, তার কাছে ক্ষুদ্রতর আর শিথিল হইয়া এবং নিঃশেষে বিলীন হইয়া তার সঙ্গে মিশিয়া থাকাই চরম সার্থকতা ইহা তিনি নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম এবং অনুভব করিয়া থাকেন।

এখানে একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস মোচন করিয়া দিয়া নন্দকিশোর ভারি হাল্‌কা বোধ করিতে লাগিল।

বিষ্টু তখন তার হেপাজতের অধীনে বসিয়া পড়িতেছে, স্বার্থপর মানে যে অন্যের ইষ্টানিষ্ট না ভাবিয়া কেবল নিজের ইষ্ট খোঁজে।

নন্দকিশোর জানিতে চাহিল, স্বার্থপরের ইংরেজী কি ?

—সেল্‌ফিস্‌।

তারপর বিষ্টু মুখস্থ করিতে লাগিল, লোক মানে মনুষ্য।

বিষ্টুর পড়া চলিতে লাগিল, এবং নন্দকিশোরের মনের চারি প্রান্তেই একটা অপরূপ আলোকে দীপ্ত করিয়া জাগিয়া রহিল একটি অলৌকিক রূপবৈভবসম্পন্না নারীর করুণমূর্ত্তি, এবং তাঁর যে মূর্ত্তি বিষণ্ণ নয়, প্রফুল্ল সেই মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতি-বিম্বিত করিয়া লইয়া আসিবার অপরিমেয় লালসা, একেবারে স্থির সংকল্প হইয়া আর অপরাজেয় নিরঙ্কুশ মন লইয়া তাঁহাকে উত্তমরূপে, নিষ্পলক চক্ষু মেলিয়া, নিরবকাশ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে হইবে ; সেই রূপের ছবি দিয়া প্রাণ মণ্ডিত এবং বক্ষকুহর পূর্ণ করিতে হইবে।

৩

দ্বিতীয় রাত্রে নন্দকিশোর স্বপ্নে কাহাকেও বা কিছুই দেখিল না; কিন্তু মনে মনে পূর্ব্ববৎ ভারি সজাগ থাকিয়া দিনের দু'টা পর্য্যন্ত শুইয়া বসিয়া কাটাইল, রূপসন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষার একটা স্রোত নিরন্তর বহিতেই লাগিল।

মণীন্দ্রবাবুকে যদি অসন্তুষ্ট দেখা যায় তবে তাঁহাকে অনুরোধে বশীভূত, কৃপাপ্রার্থনায় দ্রব, স্তবে তুষ্ট এবং পরমেশ্বরের অজস্র অনুগ্রহে তাঁর শ্রীবৃদ্ধি আরো হোক্, তার উপরে আরো হোক্ এবং তার উপরেও আরো হোক, ত্রিগুণিত এই আশীর্ব্বাদ অফুরন্তভাবে করিতে হইবে, কারণ সে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব এবং মণীন্দ্রবাবু দত্তোপাধিক কায়স্থ সে দীন হীন, তিনি লক্ষ্মীমন্ত।

অসময়ে হঠাৎ যেন সে মনঃস্থির করিয়া ফেলিয়াছে এমনি ব্যস্তভাবে নন্দকিশোর বেলা দু'টার সময় মাকে ডাকিয়া বলিল, মা, তিনটের গাড়ীতেই আমি সেখানে একবার যাবো।

মা বলিলেন, যাও জিনিসগুলো আর মাইনেটা নিয়ে এস। মাইনে চাওয়ার মুখ রেখেছ ত'?

নন্দকিশোর হাসিয়া বলিল, তা আছে মা। আমি তেমন কিছু দুর্ব্ব্যবহার তাঁদের সঙ্গে করিনি।

—না করলেই ভালো। লোকে গরীব মনে করুক, অল্প বিদ্যের মানুষ মনে করুক, কিছু যায় আসে না; কিন্তু যেন অভদ্দর মনে না করে।

নন্দকিশোর হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিল, কথা কহিল না।

ভদ্র বলিয়াই সে ভীরু, এবং ভদ্র আর ভীরু বলিয়া যে-বস্তু সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে তাহার তুলনা নাই, তার তুল্য বন্ধন, অত্যাজ্য সম্পদ সংসারে আর নাই। স্বেচ্ছায় নিবেদিত সে বস্তু ত্যাগ করিতে পুরুষ কদাচ পারে নাই, অভদ্র প্রতিপন্ন হইবার, বিধাতা বিমুখ হইবার, রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিবার, সমাজ হইতে বিতাড়িত হইবার, এবং কল্পনাতীত আরো অনেক প্রতিফল পাইবার ভয়েও পুরুষ নিরস্ত হয় নাই, রূপৈশ্বর্য্য হস্তগত করিতে সে সর্ব্বস্ব বিসর্জন দিয়াছে, প্রাণপণ করিয়াছে; সর্ব্বনাশের ভয় কেউ করে নাই; রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইয়াছে, মুনিগণ জপ তপে আর দেবতারা ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, ভদ্রভাব মোটেই দেখান নাই।

মানুষের মন আকাশের চাইতেও উদার, ততোধিক প্রশস্ত কত লোককে সমাদর করিয়া সেখানে স্থান দান করা যাইতে পারে এবং যথাযোগ্য আসন দিয়া আনন্দ উপভোগ করা যাইতে পারে তাহার ইয়ত্তাই নাই। কত লোককে ধারণ করিয়া মন নিয়ত আপনাকে সার্থক করিতেছে, সার্থক করিতে চাহিতেছে, এবং আঁরও তৃষ্ণাপহারক কত সত্তার সন্ধান করিতেছে তাহা ভাবিলে অবাক হইয়া থাকিতে হয়। প্রতি দিনের হঠাৎ-ভাল-লাগার চঞ্চল গতায়াত আনন্দ হইতে শুরু করিয়া চিরদিনের প্রিয় বস্তু, আর ধ্যানের বস্তু, আর সুখের বস্তু, আর আশার বস্তু, প্রভৃতি অসংখ্য বস্তু একই সঙ্গে মনের ক্ষেত্রে আপন আপন স্থানে বিহার করিতে পারে না কি? নন্দকিশোর মীমাংসা করিল যে তা পারে, সুন্দরভাবেই পারে।

ষ্টেশন নিকটেই, গাড়ীরও সময় আছে—

নন্দকিশোর চিন্তামগ্নভাবে উঠানে পায়চারি করিতে করিতে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল, মমতা মায়ের সাহায্যে এবং উপদেশে দিশা পাইয়া কি একটা সেলাইয়ের কাজ চালাইতেছে।

মমতার কাছে অবিশ্বাসী হইতে অবশ্যই সে চাহে না; মমতার কাছে সে অবিচ্ছিন্নভাবে ঋণী; কারণ, মমতা ভারি স্নিগ্ধ, সুখদায়িনী আর প্রিয়বাদিনী আর ভারি অকপট। তার স্থান হৃদয়ে অটুটই রহিল এবং রহিবে; মমতা চন্দ্র; তার গৌরব তার নিজস্ব; তার মর্য্যাদা স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত আছে, তবে, একটি সুপ্রভাতে অরুণোদয়কে বরণ করিতে বাধা কি, নিষেধ কোথায়!

কিন্তু মমতা একটু ম্লান এই হিসাবে যে সে কখনো হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দিয়া কলকণ্ঠে আহ্বান করে নাই, স্বামীর প্রতি তার যা অবিস্মরণীয় কর্ত্তব্য তাহাই সে মনঃপ্রাণ নিবিষ্ট করিয়া নিষ্ঠার সহিত কায়মনোবাক্যে দিবারাত্রি পালন করিতেছে; সে অধর্ম্মাচরণ করে না, কিন্তু আকাঙ্ক্ষার উদ্দাম বেগ আর প্রাপ্তির পরমোল্লাস সে সৃষ্টি করে নাই, হিংসালু চৌর্য্যপ্রবৃত্তি, যা নিয়ত সম্বিতে ক্রিয়াপরায়ণ রহিয়াছে বলিয়াই অভিনব কত চিন্তার উদ্ভব, নব নব কত আনন্দের বিকাশ হইতেছে, আর কত শত কর্ম্মের প্রেরণা জাগিতেছে, তাহাকে সে ঠেলিয়া জাগাইয়া দেয় নাই, যে জাগাইয়া দিয়াছে, জ্যোতিকিরীটিনী সেই রূপময়ীকে প্রাণ ভরিয়া একবার দেখিতেই হইবে।

যাত্রাকালে নন্দকিশোর জিজ্ঞাসা করিল, মা, যদি থাকতে বলে?

মা তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিল, থাকতে যদি বলে তবে থেকো। ঐ কাজ যখন একটা দরকার, তখন ওটা ছেড়ে দেয়া উচিত কি না তা তুমিই বুঝে যা হয় করো। আর একজনকে ঠিক করেছে বলেছিলি না?

নন্দকিশোর বলিল, যদি সে না এসে থাকে! এমনও ত' হয়। কথা দিয়ে এল না। যাই! বলিয়াই রওনা হইয়া গেল। মাকে প্রণাম করিল না, কুণ্ঠাবশতঃ করিতে পারিল না। যে উদ্দেশ্য লইয়া এবার সে যাত্রা করিতেছে তাহাতে সিদ্ধির জন্য প্রণামান্তে মায়ের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করা মাকেই এমন অসম্মান করা যে সে অপরাধের ক্ষমা নাই।

বিণ্টু হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিল, দাদা, আমি ইষ্টিশনে যাবো তোমার সঙ্গে?

মা বলিলেন, কাজে বেরুচ্ছে, অমনি পিছু ডাকলি!—তারপর নন্দর কুশল কামনা করিয়া তাহারই উদ্দেশ্যে বলিলেন, ষাট্, ষাট্।

ওদিকে সাড়ে তিন আনা পয়সা দিয়া একখানা টিকিট কিনিয়া নন্দকিশোর গাড়ীতে উঠিল, এবং উঠিয়াই শুনিল, যুগ্মকণ্ঠে চমৎকার সঙ্গীত চলিতেছে। অন্ধ ভিখিরী একটি বালকের সঙ্গে গলা মিলাইয়া গান করিতেছে, গানের মর্ম্ম ইহাই যে, অন্ধকে দান করিলে ভগবান তার, দাতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। অন্ধ হাত পাতিয়া যাত্রিগণের সম্মুখীন হইতে হইতে তাহার সম্মুখে আসিতেই নন্দকিশোর একটি পয়সা তাহার হাতে দিল; ভিখারী আশীর্ব্বাদ করিল, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক বাবা। এই মামুলি আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া তার দান সার্থক হইল; বোধ হয় সে কিছুক্ষণ খুশী হইয়াই থাকিত, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল

একটা অকৃত কার্য্যের কথা, আসিবার সময় মমতাকে কিছু বলিয়া আসা হয় নাই, তাহার কাছে বিদায় লইয়া আসা হয় নাই, ভুল হইয়া গেছে, মন যতই উদার প্রশস্ত হোক, আর ধারণক্ষম হোক, সেখানে একই সঙ্গে দু'টি বস্তুর অবস্থান ঘটিলে একটিকে প্রাধান্য দিতেই হয়, একটিকে আবৃত করিয়া অপরটি প্রোজ্জ্বল উন্নত হইয়া ওঠেই। মনে মনে অপরাধ স্বীকার করিয়া নন্দকিশোর ভারি অনুতপ্ত হইল, বেচারী মমতা মনে করিতেছে কি। মাকে লুকাইয়া চোখে চোখে চাহিয়া বেশ বিদায় লওয়া যাইত, তা' লওয়া হয় নাই; হয়তো তার চোখে জলই আসিয়াছে। একই সঙ্গে দু'টি কিংবা বহু সত্তাকে চিন্তা আর অনুভব করা যায়, কিন্তু ব্যবহারের বেলায় মনোনিয়োগে তারতম্য দেখা দেয়ই। তার উপর নন্দকিশোরের মনে পড়িল, মমতা ঠাট্টার ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "পরস্ত্রী লইয়া উল্লাস করিতে যাও নাই ত'? অর্থাৎ সেই অপরাধের দরুণ তাড়াইয়া দেয় নাই ত'? তার সেখানে হইতে রওনা হইয়া বাড়ীতে আসিয়া উঠার রকমটা সত্যই যেন কেমন। ক্রুদ্ধ হইয়া লম্ফঝম্ফ করা কি বেখাপ কিছু করিয়া ফেলা তার স্বভাবই নয়, সবাই তা জানে; কাহারো উপর চোখ রাঙ্গাইয়া কটমট্ করিয়া তাকাইতেই মমতা তাহাকে দেখে নাই। এই প্রকৃতির লোকটি চাকরি বুঝি যায় এই আশঙ্কা কি সন্দেহের বশে ধনী মনিবের সঙ্গে চটাচটি করিয়া বাক্স বিছানা আর বেতন ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিনই। কুকর্ম্মের দরুণ তাড়া খাওয়ার পর বিপদের ভয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়নের মতোই তার চলিয়া আসার রকম। লক্ষণ দেখিয়া যা বুঝা যায় সেইরকমই বুঝিয়া মাও জেরা করিয়াছিলেন, কিছুই অবিচার করেন নাই। স্বামীর স্বাস্থ্য উন্নতি সুখ সুবিধা সম্বন্ধে স্ত্রীর যেমন উদ্বেগ আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সীমা নাই, তেমনি একটি বিষয়ে সন্দেহও প্রচুর, সেটা হইতেছে চরিত্র। চরিত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিবার এবং সতর্ক করিবার সময় মেয়েদের বুদ্ধিও খুব খোলে, কথাও খুব ফোটে। সে যাহাই হউক, মমতার কাছে বিদায় না লইয়া আসা ভারি অনুচিত কাজ হইয়াছে, তাহাকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, ব্যথা দেওয়া হইয়াছে।

চিন্তাগুলি অস্বস্তিকর।

অন্যমনস্ক হইবার অভিপ্রায়ে নন্দকিশোর এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল, দৃশ্য বা ঘটনা হিসাবে চিত্তাকর্ষক কিছু চোখে পড়িলেই সেই দিকে সে মনোনিবেশ করিবে; কিন্তু তেমন কিছু চোখে পড়িবার আগেই তার চোখে পড়িল তারই এক বন্ধু, নিজেকে এক গণনা করিয়া চতুর্থ ব্যক্তিই তার বন্ধু, দুই পায়ের ফাঁকের ভিতর ছাতাটা দিয়া বেশ স্বচ্ছন্দভাবে বসিয়া আছে।

বন্ধুর সঙ্গে দৃষ্টির মিলন হইল, নন্দকিশোর বলিল, চলেছ?

—হুঁ। তুমিও চলেছ দেখছি।

—হুঁ।

—বিদ্যাদান করছ ত'?

—করছি।

—নিজের কিছু বাড়ছে?

—হ্যাঁ, দু'টাকা।

—না, না, তা বলছিনে, বিদ্যে।

—নন্দকিশোর হাসিয়া দৃষ্টি টানিয়া লইল।

তারপর সে হিসাব করিয়া দেখিল যে, তার একুশ দিনের বেতন সাত টাকা মাত্র। ঐ সাত টাকা মণীন্দ্রবাবুর কাছে মুখ ফুটিয়া চাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ, কারণ, সে না বলিয়া না কহিয়া চোরের মতো আচমকা গা-ঢাকা দেওয়ায় সে ভদ্রতার এবং কর্ম্মত্যাগের রীতি লঙ্ঘন করিয়াছে। স্তবে তুষ্ট এবং অনুরোধে বশীভূত করিবার পূর্ব্বেই হয়তো তিনি উদরান্নের জন্য তাহাকে এবং তত্তুল্য গৃহশিক্ষক সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া এমন নিদারুণ কটূক্তি বর্ষণ করিবেন যে, অপমানের চূড়ান্ত হইয়া যাইবে। শুধু অপমানিত হইবার ভয়ে মণীন্দ্রবাবুর গৃহে পূর্ব্বেই সে এত কাণ্ড করিলেও এবং অকথ্য দুঃখ পাইলেও বেতন সম্পর্কে কটূক্তির আর মানহানির ভয়টাকে সে তেমন তেজালো হইতে দিল না, কারণ, টাকা আর অন্তঃপুরিকায় স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ ঠিক ততটা তফাৎ যতটা তফাৎ ভ্রূভঙ্গী আর ফাঁসিতে ; প্রথমটির সম্বন্ধে নিয়ম অমান্য করিবার পর ত্রুটি বা অজ্ঞানতা স্বীকার করিয়া শাস্তি লঘু করিয়া আনা যাইতে পারে, ক্ষমা চাহিবার পথ থাকে ; কিন্তু অপরটি সম্বন্ধে গণ্ডি অতিক্রম করিয়া অবোধ সাজা চলে না, কৈফিয়ৎ সাজানও চলে না।

সুতরাং টাকা চাহিলে মণীন্দ্র কিরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবেন সে উৎকণ্ঠা দমন করিয়া গাড়ীর ঝাঁকানি আর আওয়াজের মধ্যেই নন্দকিশোর ধ্যানস্থ হইল, ধ্যানযোগে সে দর্শন করিল বিষণ্ণ অতুলনীয় একখানি মুখ, দু'খানি পা আর সেই শুভ্র সুকুমার পদপল্লবদ্বয়ে অগণিত পুষ্পের স্তূপ পুনঃ পুনঃ অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া সে-ই ঢালিয়া দিয়াছে।

নন্দকিশোরের আনন্দ আজ উদ্বেল হইল।

তারপর সে দেখিল, ধ্যানযোগেই দেখিল, তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন, চঞ্চলতা আর কাঠিন্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি নিষ্কম্প শিখার মতো স্নিগ্ধোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে পথ চাহিয়া আছেন। তাঁর এই মূর্ত্তিখানিই সে একবার অকম্পিত চক্ষে এবং অকুণ্ঠ চিত্তে অবলোকন করিবে, তৃপ্ত হইবে ; তারপর সে বাক্স বিছানা বেতন লইয়া চলিয়া আসিবে, কিংবা থাকিবে, যেরূপ অবস্থা দাঁড়ায় তদনুসারে কাজ করিবে, মায়ের অনুজ্ঞাও তা-ই।

রূপই যদি ন দেখিলাম তবে এতবড়ো চোখ দুটা আর প্রচুর দৃষ্টিশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি কেন ? কেবল পুস্তকের অক্ষর দেখিবার আর হোঁচট এড়াইবার জন্য ? মনে হইতেই নন্দকিশোর একটু হাসিল এবং বিধাতাও বোধ হয় হাসিলেন।

৪

নানান তরঙ্গে মাথায় নাচিতে নাচিতে থামিয়া ট্রেণ-জার্নিটা কাটাইয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিবার পর মনীন্দ্রবাবুর বাড়ীর উদ্দেশে চলিতে চলিতে নন্দকিশোরের পা থামিয়া আসিতে লাগিল। আপন গৃহের অভ্যন্তরে এবং খোলা জায়গায় নন্দকিশোরের যে চিন্তা, ইচ্ছা আর কল্পনা উল্লসিত হইয়া

যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতেছিল, মণীন্দ্রবাবুর বাড়ীর সমগ্র ছবিটা আর আবহাওয়া মনে পড়িতেই তার মনের সেই স্বেচ্ছাচারিতা যেন একটি বলয়ের বেষ্টনের ভিতর আবদ্ধ হইয়া গেল আর সে বলয় যেন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতে লাগিল, এক কথায়, নন্দকিশোরের প্রাণে ভয় দেখা দিল। যত অল্প সময়ের জন্যই হউক, সে পরস্ত্রীর রূপদর্শন করিতে চলিয়াছে; কিন্তু তাহাতে তার অধিকারই বা কি, তার সুযোগই বা কোথায়! এমনও ত' হইতে পারে, যাঁহাকে দেখিতে সে চলিয়াছে তিনি হয়তো মনের অত্যন্ত বিকল অবস্থায় দু'চারটা বেহিসাবী বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন; তজ্জন্য এখন তিনি অসহ্য অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন, তাহাই সম্ভব, এবং তাহার দরুণ অধিকতর প্রখরা হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁর প্রখরতাই তাকে ত্রাসে অন্ধ করিয়া দিয়াছিল। স্বপ্নে দেখা মূর্ত্তি শান্ত কোমল সন্দেহ নাই; কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই; নিশ্চিত আর প্রলুব্ধ হইবার পক্ষে স্বপ্নাদেশ ছাড়া আর কি আছে? আগে এ-বিষয়ে নন্দ কি প্রণালীতে চিন্তা করিয়াছিল তাহা তার একবিন্দুও মনে পড়িল না।

তবু, এই কষ্টকর অবস্থাতেই নন্দকিশোর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং মণীন্দ্রবাবুর দরজার অদূরে পৌঁছিতেই তার সাক্ষাৎ হইয়া গেল রাখালের সঙ্গে। রাখাল দরজাতেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে দেখিয়াই লাফাইয়া রাস্তায় নামিল, এবং দৌড়াইয়া আসিয়া তার হাত ধরিল।

রাখালের এই আচরণটা মধুর লাগিয়া নন্দকিশোর হাসিমুখে দাঁড়াইয়া গেল।

রাখাল বলিল, আসুন মাষ্টার মশায়; কোথায় গিয়েছিলেন? বাবা আপনাকে খুঁজেছেন খুব। আমাদের ইস্কুলের একটা ছেলে বললে, মর্গ-এ দেখো গিয়ে, পাবে। মর্গ কি মাষ্টার মশায়?

নন্দকিশোর তার হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে বলিল, যেখানে বেওয়ারিশ মড়া রাখা হয় তাকেই বলে মর্গ।

রাখাল খুব রাগিয়া গেল; বলিল, দেখুন অন্যায়, আপনার মতো মানুষকে বলে মরেছে!

—তা বলুক। তোমার বাবা বাড়ীতে আছেন?

—আছেন, ওপরে আছেন। আপনি এসেছেন শুনলে এখুনি নামবেন।

এতক্ষণ পরে নন্দকিশোরের মনে হইল, হঠাৎ চলিয়া যাইবার একটা সমীচীন কারণ ত' ভাবিয়া রাখা হয় নাই। ভারি অন্যায় হইয়া গেছে।

রাখাল তাহাকে ঘরে তুলিল, চেয়ারে বসাইল, এবং উপরে খবর দিতে দৌড়াইয়া গেল; আর, অশান্তি দুরন্ত হইয়া উপস্থিত হইল নন্দকিশোরের প্রাণে, কিরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে, এবং তাহার কর্ত্তব্য আর বক্তব্য তখন কি দাঁড়াইবে। নন্দকিশোরের ধ্যানজগৎ ঘোলা হইয়া গিয়াছিল খানিক পূর্ব্বেই, এখন সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া গেল।

মণীন্দ্রবাবু নন্দকিশোরকে বেশিক্ষণ অমনি বসাইয়া রাখিলেন না, খবর পাইয়াই দেখিতে আসিলেন, বা দেখা করিতে আসিলেন, এবং আসিলেন হাসিতে হাসিতে, গুম্ফযুগল বিস্তৃত করিয়া।

তিনি দরজায় আসিতেই নন্দকিশোর সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, নমস্কারও

করিল, কিন্তু মণীন্দ্র তার নমস্কার লক্ষ্যও করিলেন না ; তাঁর সে অবকাশই যেন নাই ; বলিলেন, আরে, ছিলে কোথায় ? আমি তোমাকে খুঁজেছি ঢের, অবশ্য চীৎকার করে নয়। চম্পট দিয়েছিলে যে ? বলিয়া তিনি যাইয়া চেয়ারে বসিলেন, নন্দকিশোর বসিল তার তক্তাপোষে।

বসিয়া মণীন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, অমন করে একবস্ত্রে চম্পট দিয়েছিলে যে ? জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি নন্দকিশোরকে যেন পরীক্ষা করিতেছেন এমনি নিবিষ্ট চক্ষে তার মুখের দিকে তাকাইয়া অল্প অল্প হাসিতে লাগিলেন।

নন্দকিশোর বলিল, বাড়ীর জন্যে মনটা বড় উতলা হয়েছিল।

মণীন্দ্রবাবুর গোঁফ জোড়াটা হাসিতে ভরিয়া উঠিল ; বলিলেন, তা হওয়া সম্ভব, কারণ, বাড়ী মানে স্ত্রী। কিন্তু বলে যেতেও ত' পারতে।

নন্দকিশোর চুপ করিয়া রহিল।

মণীন্দ্র বলিলেন, তুমি যথেষ্ট সুশীল, অমায়িক, আর, ভদ্র তা জানি ; কিন্তু দেখছি মিথ্যে কথা বলতে তোমার বাধে না। সত্যি কি না ?

শুনিয়া নন্দকিশোর ক্ষণিকের জন্যে দৃষ্টি অবনত করিল, এবং অনুভব করিল, তার মুখমণ্ডলের স্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া ঈষৎ লাল হইয়াছে।

মণীন্দ্রের গোঁফ আরো খানিক উত্তোলিত হইল, বলিলেন, এই ত' ধরা পড়লে বাপু! চোখ নামালে আর লাল হয়ে উঠেছ! সত্যবাদী লোক কখনো চোখ নামায় না। বলিয়া মাথা নাড়িলেন, যেন বুদ্ধির পাল্লায় তাঁরই জিত হইতেছে, ও পক্ষের মনের কথা তিনি ধরিয়া ফেলিয়াছেন ; তারপর বলিলেন, বলোই না কারণটা কি ?

নন্দকিশোর ভারি কাতর হইয়া বলিল, আমাকে মাপ করুন।

—মাপ আমি করেছি। তোমাকে সম্ভাষণের স্বর শুনেও তুমি বুঝতে পারলে না, মাপ আমি করেই বসে আছি। কারণটা আমি জানি।

এমন অতর্কিতে আর এমন অনায়াসে এতো বড়ো সাংঘাতিক কথা বলিতে কেবল মণীন্দ্রই পারেন ; চক্ষের পলকে মুখ আর তালু শুকাইয়া নন্দকিশোর আপাদমস্তকে ভারি নির্জীব হইয়া উঠিল। কারণটা উনি জানিবেন কি করিয়া ? কি অনুমান করিয়া বসিয়া আছেন! স্ত্রীর মুখে তিনি বিপরীত কিছু শোনেন নাই ত'! দণ্ড দিয়া তাহাকে ধূলিসাৎ করিয়া শেষ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে খানিক খেলাইয়া মজা দেখিতেছেন না ত' ?

কিন্তু তা নয়, মণীন্দ্রনাথের উৎফুল্লতা স্বভাবতঃই অপরাজেয়।

তিনি উৎফুল্ল থাকিয়াই বলিলেন, শুকিয়ে আদ্দেক হ'য়ে উঠলে যে, মাষ্টার! আমার স্ত্রীর উৎপাত। নয় ?

মণীন্দ্রের এ প্রশ্ন এমনি যে তাহাকে অতিক্রম করা মানুষের সাধ্যাতীত, মানুষকে অস্থির সে করিবেই, কথা সে বলাইবেই, কথা যেমনই হউক, যাহাই হউক।

নন্দও অস্থিরভাবেই মুখ তুলিয়া তাকাইল, জবাব দিতে নয়, প্রশ্নকর্ত্তাকে উপলব্ধি করিতে। উৎপাতের অর্থ কি তাহা কাহারো না বুঝিবার নয়। সেই রকম উৎপাত করিয়া একটি পরপুরুষকে স্ত্রী গৃহ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছে, সেই প্রসঙ্গে এমন উৎফুল্লতা কেমন করিয়া মানুষের আসিতে পারে ;

কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, মণীন্দ্রের তা অপর্যাপ্ত মাত্রায় আসিয়াছে। ইঁহার ধৈর্যের তারিফ করিতে হয়, না ইঁহার বীভৎস অসাড়তার দরুণ ইঁহাকে অবজ্ঞা করিতে হয়।

শক্ত হইয়া বসিয়া থাকা ছাড়া নন্দকিশোরকে আর কিছুই করিতে হইল না, হাঁ, না, কোনো জবাবই দিতে হইল না ; নিজের প্রশ্নের আরো যা ব্যাখ্যা আছে তা উদ্‌ঘাটন করিলেন মণীন্দ্রই।

বলিলেন, তুমি দাঁতে দাঁত চেপে আছ বেশ ; থাকো। তুমি হয়তো ভাবছো, আমার সন্দেহবাই আছে, তা-ই টোকা মেরে একটু পরীক্ষ করছি ; কিংবা সবই আমার মিথ্যে কথা আর আমি খুব নির্লজ্জ। তবে শোনো এক মজার কথা ; প্রথমেই জানাই যে, উনি আমার স্ত্রী নন।

প্রথমেই এই খবরটা জানাইয়া, অর্থাৎ একটা ধাক্কা দিয়া, নন্দকিশোরের চোখের আঁতকানোটা তিনি সস্মিত মুখেই উপভোগ করিলেন ; তারপর বলিলেন, তোমার কাছে এ-সব কথা বলছি কেন জানো ?

নন্দকিশোর মাথা নাড়িল, তাহাকে গুহ্য কথা কহিবার কারণ সে জানে না।

মণীন্দ্র তা জানাইলেন।

বলিলেন, আমার বয়স চল্লিশ, তোমার বয়স তেইশ, আর, তুমি পালিয়েছ বলে। আমি কিন্তু ধরে নিলাম, আমার স্ত্রীর উৎপাতেই পালিয়েছিলে। কাজেই তুমি আমার পরম বিশ্বাসভাজন, তোমার শুভ আমি একান্তভাবেই চাই। তারপর শোনো, উনি আমার স্ত্রী নন। তবে কে ? নিশ্চয়ই তা জানতে তোমার কৌতূহল হয়েছে। উনি আমার খুড়তুতো ভগিনী।

বাক্য আর ভঙ্গীর সংযম প্রভুর সম্মুখেই শূন্যে উড়াইয়া দিয়া নন্দকিশোর বলিয়া উঠিল, "বলেন কি" ? নন্দ যেন লাফাইয়া উঠিল।

কিন্তু মণীন্দ্রের স্নায়ু সাপের গায়ের চাইতেও ঠাণ্ডা ; তিনি হাসিয়া পরিহাসের সুরে বলিলেন, আরে, আরে থামো। তুমি যে সেই কোবরেজের বড়ির মতো করলে। তার বড়ি নাকি শিশির ভিতর খালি লাফাত। লাফিও না অত, খুড়তুতো ভগিনী শুনেই তুমি লাফিয়ে উঠলে যে। স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস ত' না-ও করতে পারি।

নন্দকিশোর লজ্জা পাইল।

মণীন্দ্র বলিলেন, যত পার লজ্জা পাও, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মতোই আমরা বাস করি। খুড়তুতো ভগিনী বটে বললাম তা-ই, কিন্তু কেমন খুড়ো কেমন খুড়ী তা ত' কিছুই জানো না।

নন্দকিশোর হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

মণীন্দ্র বলিতে লাগিলেন, খুড়ো আমার বাবার সহোদর ভাই খুড়ো নন, বাবার মামাতো ভাই, সে মামা আবার মায়ের সহোদর নন, মায়ের মামাতো ভাই।

এত ঘুরিয়া সম্পর্কটা কিরূপ দাঁড়াইল তা নন্দকিশোরের মাথায় ঢুকিল না, সে পূর্ববৎ কেবল মণীন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

মণীন্দ্র বলিলেন, এমন খুড়ী। খুড়ীর কেচ্ছা শোনো। আমার ঐ খুড়োর ছিল একটি বুঝলে ?

খুব অল্প সময়ের জন্য মাথাটা অতি সামান্য একটু কাত করিয়া নন্দকিশোর বুঝিতে দিল যে, ব্যাপারটা সে বুঝিয়াছে। খুড়ো গিয়ে তাকে অধিকার করার আগেই তার একটি মেয়ে হয়েছিল, সেই মেয়েই ইনি। বলিয়া মণীন্দ্র নিজের অন্তঃপুরির উদ্দেশে চোখের ইঙ্গিত করিলেন; বলিলেন, তারপর, আমি সম্পর্কে সেই খুড়ীর বাড়ীতে যেতাম; এবং তারপর সেই মেয়েটি বড় হ'লে, আর আমার স্ত্রীবিয়োগ হ'লে, যাক্, অত খুঁটিনাটিতে কাজ নেই। আশ্চর্য্য সুন্দরী; আমি লোভ সংবরণ করতে পারিনি, তুমি পেরেছ। ধন্য ছেলে বটে তুমি! তোমার এখন যৌবনের পুরো জোয়ার, আর, রূপ আছে; আমি প্রৌঢ়। তোমাকে তিনি আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, সত্যি কি না?

নন্দকিশোর মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিল নৈতিক লজ্জায় নহে, অপ্রয়োজনীয় উত্তরটা মুখে উচ্চারিত হইল না বলিয়া।

মণীন্দ্র উঠিতে উঠিতে বলিলেন, এখানে থাকবে, না, নিয়ে থুয়ে বাড়ী যাবে?

নন্দকিশোর থাকিবে বলিয়াই আসিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গেই সে সাগ্রহে সম্মত হইল; বলিল, থাকবো।

উপস্থিত সংকট কাটিয়া যাওয়ায় একদিকে নিরুদ্বিগ্ন এবং উনি এঁর বিবাহিতা স্ত্রী নয় শুনিয়া অন্যদিকে কোথায় যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইবার হেতু পাইয়া নন্দকিশোরের নাক দিয়া একটা টানা নিঃশ্বাস নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

মণীন্দ্র উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, এই ত' বাহাদুর ছেলের কথা! থাকো। আসছে মাস থেকে তোমার মাইনে হ'ল পনরো। তারপর জানিতে চাহিলেন, তোমার ছেলেপিলে হয়নি বুঝি?

—আজ্ঞে না।

—তুমিই থাকো বাইরে বাইরে। বলিয়া, যেন সম্পূর্ণ ধাতস্থ হইয়া মণীন্দ্র হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেলেন; পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন, যে-সব কথা তোমায় বললাম তা যেন বাইরে না যায়।

নন্দকিশোর দাঁতে জিব কাটিল—

মণীন্দ্র আবার 'উপরে' গেলেন।

৫

নন্দ তক্তাপোষে বসিয়া রহিল, বিরহের পর কাঠের এই তক্তাপোষখানাকে তার খুব আপন আর দৃঢ় একটা আশ্রয় বলিয়া মনে হইল, দুই হাত তাহার উপর শক্ত করিয়া চাপিয়া দিয়া সে সুখবোধ করিল, সুখবোধ করিতে করিতে তার আনন্দ জন্মিল; সংযমের পুরস্কার হিসাবে তার পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। নন্দকিশোর মনে মনে হাসিল।—মণীন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁর মুখে তাঁর পারিবারিক খণ্ডকাব্য শুনিতে শুনিতে স্বেদ রোমাঞ্চ আতঙ্ক বিস্ময় প্রভৃতি বিপর্য্যয় উপর্য্যুপরি দেখা দিলেও, এখন তাঁর কথাগুলি আবোল-তাবোল মনে হইয়া নন্দকিশোর একটু ঠোঁট বাঁকাইল, সেই খণ্ডকাব্যর ভিতর সেও আছে; মণীন্দ্রের বর্ণনার মধ্যে সে প্রকাশ্যেই আছে, এবং অধুনা নির্ব্বিঘ্নেই আছে, এবং

কা।১সম্ভবতঃ শীঘ্রই খুব গুপ্তভাবে প্রচুর প্রাধান্যই লাভ করিবে।

নন্দকিশোর মনে মনে আরো খানিকটা হাসিল, মণীন্দ্রেরই কথার আলোড়নে তার অভীপ্সা আরও ফেনিল হইয়াছে, ঘূণাক্ষরেও তিনি তা অনুমান করিতে পারেন নাই, পারিবেন কেমন করিয়া ? পরচিত্ত চিরদিনই অন্ধকারময়।—মণীন্দ্রের যে চঞ্চল ভঙ্গী, অশোভন বাক্যালাপ, স্ত্রীলোক সম্পর্কে প্রগল্‌ভতা, ইত্যাদি অর্থাৎ যে ছ্যাবলামি নন্দকিশোরের অশ্রাব্য তিক্ত মনে হইত, তাহাই যেন এখন তাহাকে আসান দিল; তিনি রাশভারি লোক হইলে তার মন মাথা তুলিতেই পারিত না, মণীন্দ্র সলিতা ঠেলিয়া দিয়া দীপ উজ্জ্বলতর করিতেছেন, রস নিবিড় করিয়া তুলিতেছেন। ফিরিবার কারণ তিনি জানিতে চাহেন নাই; বোধ হয় তিনি ধরিয়া লইয়াছেন টাকার ব্যাপারটাই। ফ্রী আহার ও বাসস্থান সহ মাসে মাসে বসিয়া দশটা টাকা উপার্জনের মায়া ত্যাগ করিয়া ধ্যুৎ বলা আর চলিয়া যাওয়া দরিদ্রের পক্ষে সম্ভব নহে; হয়তো ওঁকেও তিনি সাবধান করিয়া দিয়াছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নন্দ এই তৃতীয়বার মনে মনে হাসিল।

মনে মনে হাসা খুবই সহজ, চতুরেও হাসে, বোকারাও হাসে; লোকে বুঝিয়াও হাসে, না বুঝিয়াও হাসে; এবং কখনো কখনো সেই হাসি ঘা খাইয়া চাপা পড়িতেও বিলম্ব হয় না।

নন্দকিশোরের মনের হাসিটাকে আঘাত করিবার জন্যই বোধ হয়, পরদিন, বেলা ন'টা সাড়ে ন'টার সময় হঠাৎ একটা আবরণের আবির্ভাব হইল; বলরাম দাঁত মেলিয়া তার ঘরের ভিতর একবার উঁকি মারিল, তারপর ঘরের চৌকাঠে দু'টি পেরেক মারিয়া পুরু একখানা পর্দ্দা টাঙাইয়া দিয়া গেল। নন্দকিশোর বিস্মিত হইয়া নিষ্পলক চক্ষে তাকাইয়া তাকাইয়া বলরামের কাজটা দেখিল, এবং অত্যন্ত আগ্রহ হইলেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, কার হুকুমে তার চোখের সামনে দৃষ্টিনিরোধক এই পর্দ্দা বিলম্বিত হইল। অযথা পরের কথায় থাকা তার পছন্দসই নয়। কিন্তু কাপড়ের পর্দ্দা এমন কিছু অন্তরায় নয় যার অপসারণ ইচ্ছুক মানুষের পক্ষেও অসম্ভব, কিংবা দরকার হইলেও যা ঠেলিয়া ঠেলিয়া ভিতরের মানুষ বাহিরে আসিতে কি বাহিরের মানুষ ভিতরে যাইতে পারে না, তথাপি ঐ পর্দ্দা একটি কঠিন নিষেধ, আর এক্ষেত্রে যেন কারো অপরাধের নির্ম্মম সাজা। নন্দকিশোরের মনে মনে হাসাটা চাপা পড়িল।

নন্দকিশোর যথাসময়ে স্নান করিল; পরিপাটি করিয়া চুল আঁচড়াইল; একটা গেঞ্জিও গায়ে দিল।

বলরাম আসিয়া ডাকিল, খেতে আসুন, বাবু।

রান্নাঘরেই সে খাইত, রান্নাঘরের দিকেই সে অগ্রসর হইতেছিল, বলরাম বলিল, এদিকে আসুন বাবু, ওপরে ঠাঁই হয়েছে। বলিয়া খানিক গা দুলাইল, যেন নন্দকিশোরকে উপরে লইতে আসিয়া সে কৃতার্থ হইয়াছে।

বলরামের অনুসরণ করিয়া সে উপরে উঠিল, দেখিল, প্রশস্ত বারান্দার এক স্থানে তার আহারের ঠাঁই হইয়াছে, আয়োজন রাজকীয়; সুবৃহৎ গালিচার আসন পাতা রহিয়াছে, আসনের গায়ে ফুলের অক্ষরে লেখা রহিয়াছে, "পেট ভরিয়া

খান, লজ্জা করিবেন না।" তা ছাড়া, যে-থালায় ভাত দেওয়া হইয়াছে তাহাও প্রকাণ্ড এবং ব্যঞ্জনাদি দেওয়া হইয়াছে বাটিতে বাটিতে।

সমারোহ আর সমাদর দেখিয়া নন্দকিশোর খুশী হইতে পারিল না, যেন একটু বিদ্রূপমুখী।

সে যাহাই হউক, নন্দকিশোর আরো দেখিল, একটি প্রৌঢ়া পরিচারিকা সেখানে উপস্থিত, অদূরে দাঁড়াইয়া আছে, সেমিজের উপর ধপ্‌ধপে থান কাপড় পরা, দিব্যি গিন্নিবান্নীর মতো সুস্থির চেহারা। এটিকে আগে সে দেখে নাই ; অনুমান করিল, বোধ হয় কাল কি পরশু নিযুক্তা হইয়াছে।

নন্দকিশোর আসনের সম্মুখে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল, ঝিয়ের দিকে তাকাইল, যেন, জানিতে চায়, এ-আয়োজন কি তাহারই জন্য ?

ঝি বলিল, বসুন। তারপর যেন আপন মনেই বলিয়া উঠিল, মা ঠাকরুণ ঐ পর্দ্দার ওদিকেই আছেন।—অর্থাৎ তিনিও তার আহারের তদ্বির করিতে অন্তরালে হাজির আছেন। কেবল ঝিয়ের উপর ভার দিয়া তিনি নিশ্চিত নন।

নন্দকিশোর ভারি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, একটা ষড়যন্ত্রের আভাস যেন পাওয়া যাইতেছে।

কিন্তু তা নয়।

সে আসনে বসিয়া ভাতে হাত দিতেই ঝি বলিল, আপনি রান্নাঘরে খেতেন ; বাবু বলছেন, আপনাকে রান্নাঘরে যেন বসানো না হয়, আপনি সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে।

ঝিয়ের মুখে শুদ্ধ ভাষা শুনিয়া নন্দকিশোর বিস্মিত হইল ; বলিল, কিন্তু রান্নাঘরই আমার পক্ষে কাছে হয়।

ঝি মুখ টিপিয়া হাসিল ; বলিল, দূরে খেতে আপনার আপত্তিটা কি ?

নন্দকিশোর চট্‌পট্ উত্তর দিল, পরিশ্রম বেশি, অনর্থক কতকগুলো সিঁড়ি ভাঙতে হয়।

কর্ত্তা ও কর্ত্রীর সঙ্গে অবাধে কথা বলিতে তার যে সঙ্কোচ আছে, ঝিয়ের সঙ্গে কথা বলিতে তা তার নাই। তার উপর তার আহার আর আপ্যায়নের জন্য এই সুসজ্জিত আয়োজন তার ভালো লাগে নাই।

ঝি বলিয়াছিল, কর্ত্রী পর্দ্দার ওদিকেই আছেন। কথাটা সত্য। নিঃশব্দে খাইতে খাইতে সে হঠাৎ তাঁহারই কণ্ঠঝঙ্কার শুনিয়া চমকিয়া উঠিল ; শুনিল কর্ত্রী বলিতেছেন, আপনি দু'দিন অনুপস্থিত থাকায় ছেলের পড়ার ক্ষতি হয়েছে। আর বিনা অনুমতিতে কাজে অনুপস্থিত থাকলে মাইনে কাটা যায়, তা কি জানেন না ?

নন্দকিশোর আবারও মনে মনে হাসিল, কথা কহিল না। বেতনকর্ত্তন সম্বন্ধে সে নির্ভয় ; তার উপর তার মনে হইল, এমনি করিয়া ভৎর্সনার সুরে কথা বলা এ-গৃহের গৃহিণীর রঙ্গ-প্রিয়তারই অন্তর্গত, কিংবা রূপগৌরবের একটা ভঙ্গী ; এবং গা সিরসির করিয়া তার আরো মনে হইল, তার ফিরিয়া আসা সার্থক হইয়াছে ; উনি রূঢ়স্বরে কথা কহিতেছেন, আর, ভারি তারল্যের সহিত মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

গৃহিণীর কণ্ঠস্বর আবারও শুনা গেল ; তিনি বলিলেন, কথা না বললে, লোকে গোবেচারা মনে করতে পারে ; তাতে মাইনে কাটা বন্ধ থাকে না। কিন্তু আবার এলেন যে বড়ো ?

রক্ত তোলপাড় করিয়া একটি উত্তর নন্দকিশোরের জিহ্বাগ্রে নাচিয়া উঠিল, "তোমাকে দেখতে—"

কিন্তু নন্দকিশোর পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দই রহিল।

গৃহিণী বলিতে লাগিলেন, শেষ কথা বলছি ; শুনে রাখুন আমার হুকুম। নির্ব্বোধের মতো অমন করে আর কখনো পালাবেন না। পালিয়ে গিয়ে ফিরে আসায় কি মনে হচ্ছে জানেন ?—যে কারণে আপনি পালিয়েছিলেন, দিন দুই বাড়ীতে থেকে ভেবে চিন্তে দেখে তাতে রাজি হয়েছেন। গৃহশিক্ষকের অত আপন খেয়ালে চলা ঠিক নয়।

তিনি চুপ করিতেই নন্দকিশোরের হুঁশ হইল যে, এত কথার উত্তরে একটি কথাও না বলা বোধ হয় ন্যাকামি হইতেছে ; সুতরাং সে রা কাড়িল . বলিল, যে আজ্ঞে।

তারপর আর কোনো কথা কেহই কহিল না, নন্দকিশোর মাঝখানে হরেরামের জিজ্ঞাসার উত্তরে কেবল মাথা নাড়িয়া জানাইল, ভাত এবং ব্যঞ্জনাদি কোনোটিই সে আর চায় না। আহার শেষ করিয়া সে নামিয়া গেল, কিন্তু দর্পণে একটি প্রতিবিম্ব যেদিন সে দেখিয়াছিল সেদিনকার মতো অজ্ঞানাবস্থায় শূন্যপথে হুড়মুড় করিয়া নয়, অত্যন্ত ধীরপদে, সজ্ঞানে, কঠিন পদার্থের উপর পা ফেলিয়া আর, আনন্দের উত্তাল তরঙ্গবেগ প্রশমিত করিতে করিতে।

হরেরামের রাঁধা ভাত নন্দকিশোরের আজ ভারি ভালো লাগিয়াছে, আজ সে প্রকৃতই তৃপ্ত।—একটি উদ্গার তুলিয়া নন্দকিশোর তার চেয়ারে বসিল। বলরাম পান দিয়া গেল ; পান চিবাইতে চিবাইতে নন্দকিশোর ভাবিতে লাগিল, উনি যে বলিলেন : "পালিয়ে গিয়ে ফিরে আসায় কি মনে হচ্ছে জানেন ? যে কারণে আপনি পালিয়েছিলেন, দিন দুই বাড়ীতে থেকে ভেবে চিন্তে দেখে তাতে রাজি হয়েছেন।" ইহাতে কি বুঝায় ?—প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়া নন্দকিশোর অত্যন্ত পুলকিতচিত্তে নিজেরই সঙ্গে ছলনা শুরু করিয়া দিল, প্রশ্নের উত্তরটিকে এড়াইয়া এড়াইয়া মনের কাছে তাহাকে পৌঁছিতেই দিল না, ইহাতে যা বুঝায় তা বুঝিয়া ফেলিলেই যেন অপূর্ব্ব রোমাঞ্চকর একটা স্বাদ নষ্ট হইয়া যাইবে।

তারপর নন্দকিশোর তাঁর মুখশ্রী মনে করিতে যাইয়া মনে করিতে পারি । না প্রাণপণে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াও পারিল না, একটা কুজ্ঝটিকার অভ্যন্তরে যেন তার সমগ্রতা ঢাকা পড়িয়া গেছে, কেবল একটা প্রস্ফুটিত অপরূপত্বের অনুভূতি আছে, সংবিৎ সেই দিকে চুম্বক-শলাকার মতো স্থির হইয়া থাকিতে পারে, আবেগে থরু থরু করিয়া কাঁপেও কিন্তু ধারণ করিবার বস্তুর সন্ধান পায় না, অন্যগতি মন তাহাতে সরসও হয়, জ্বালাও সহে।

অতিশয় চঞ্চল কয়েকটি মুহূর্ত্ত ঝলকিত করিয়া চক্ষু বিদ্যুৎবিদ্ধ করিয়া,

আর জীবনস্থানে জ্বলন্ত রেখা একটি টানিয়া দিয়া, রূপরাশি অন্তর্হিত হইয়াছিল, যেমন বিস্ময়ের অন্ত পাওয়া যায় নাই, তেমনি তাহাকে ছুঁইতে পারাও যায় নাই। তখন নন্দকিশোরের অবজ্ঞার সঙ্গে ক্ষোভ জন্মিয়াছিল মমতার তুলনায় তাঁহাকে অস্বাভাবিক আর ভয়ানক মনে হইয়া—এখন তার যন্ত্রণার সঙ্গে ক্ষোভ জন্মিল—অঞ্জলির ভিতর ফুলের মতো মানসপুটে তাঁহাকে ধরিতে না পাইয়া।

আহ'রে বসাইয়া যখন এত কথা কহিলেন, আর এতই যখন আকর্ষণ, তখন পর্দাটা একটুখানি দক্ষিণে বামে সরাইয়া ধরিলেও ত' পারিতেন।—দেখিতাম। নন্দকিশোর মুখখানা ভার করিয়া রহিল।

তন্দ্রাকর্ষণ হওয়ায় নন্দকিশোর চেয়ার ত্যাগ করিয়া তার তক্তাপোষে গেল; তিনটা বালিশ পর পর সাজাইয়া লইয়া তার উপর মাথা রাখিয়া শুইল, তারপর ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙিবার পর যখন আলস্য দেহে আছেই তখন নন্দকিশোর সবিস্ময়ে দেখিল বলরাম উঁকি মারিয়া পর্দা সরাইয়া ঘরের ভিতর মাথা ঢুকাইয়া দিয়াছে, পরক্ষণেই তার সমগ্র দেহ প্রবেশ করিল, তার এক হাতে চায়ের পেয়ালা, অন্য হাতে খাবারের ডিস্। ঐ সব লইয়া বলরাম তাহারই কাছে গেল।

নন্দকিশোর জানিতে চাহিল, এ-সব কি?

দাঁত মেলিয়া বলরাম বলিল, মা পাঠিয়ে দিলেন, বাবু বলেছেন দিতে। বলিয়া নন্দকিশোরের সম্মুখে তার জলযোগ নামাইয়া দিল।

চা ত' আমি খাইনে! নন্দকিশোর আপত্তি করিল।

—আমি ত' বলেছিলাম, বলেছিলাম যে মাষ্টার মশায় চা খান না। তাতে মা আমার ওপর বিষম খাপ্পা হয়ে উঠলেন; বললেন, তুই নিয়ে যা, খাবেন; খেতে তাঁকে হবে, আমার হুকুম। তাঁর হুকুমে নিয়ে এলাম, তাঁর হুকুমেই খেতে হবে, খান।

- রাখো, খাই। বলিয়া নন্দকিশোর হুকুমজারির চোট্ দেখিয়া সামান্য একটু হাসিল, জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কোথায়?

বলরাম বলিল, ন'টায় খেয়ে বেরিয়ে গেছেন, টাঁকশালে সভা করতে গেছেন।

-- টাঁকশালে?

—না, না, টাঁকশালে নয়; ব্যা, ব্যা ব্যা।

নন্দকিশোর শেষ করিয়া দিল: ব্যাঙ্কে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেখানেই বটে!

—একটু জল চাই যে!

—আনি।

বলরাম জল দিয়া চলিয়া গেল, নন্দকিশোর চোখে মুখে জল দিয়া খাবার খাইল; তার পর তাঁর হুকুমে চা খাইতে বসিল।

প্রথম যে দিন সে 'আমার হুকুম' শুনিয়া "তটস্থ" হইয়াছিল সেদিন যা মনে হয় নাই আজ চা খাইতে খাইতে সেইটাই তার মনে হইতে লাগিল।

মণীন্দ্র তাহাকে যে খণ্ডকাব্য শুনাইয়াছেন তাহা সত্য নিশ্চয়ই; সে হিসাবে

তাহাকে খর্ব্ব করিবার অধিকার ও'র যেন নাই। তারপর তার মনে হইল, হয়তো ঐ কথাটা বলা তাঁর মুদ্রাদোষ, সেবকগণকে হুকুমের উপর রাখিয়া হুকুম জাহির করা মজ্জাগত অভ্যাস দাঁড়াইয়া গেছে; পাত্রাপাত্র হিসাব বড় করেন না; অসম্মান করার উদ্দেশ্যও বোধ হয় থাকে না, তবে, শ্রুতিকটু বাক্য উচ্চারণ না করাই ভালো।

তারপরই, চা-পান শেষ হইবার বহু পূর্ব্বেই নন্দকিশোরের ভুল আপনিই ভাঙ্গিল, মানুষকে হুকুম করার দর্প যদি দুনিয়ার কাউকে সাজে তবে একমাত্র তাঁকেই, রূপের পশ্চাতে পৃথিবী ছুটিয়াছে, রূপের ইঙ্গিতে ত্রিলোক চালিত হইতেছে, তিনি যে রূপরাজেন্দ্রাণী। সিংহাসনে বসাইয়া পায়ে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের কথাটা ভুলিলে চলিবে কেন!

নন্দকিশোর পরম পরিতুষ্ট হইয়া চায়ের কাপ নামাইয়া রাখিল।

বলরাম পান লইয়া আসিল।

তারপর আসিল রাখাল।

রাখালকে সঙ্গে লইয়া নন্দকিশোর বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল।

অন্যায় কার্য্য কত প্রকার এবং মূর্খ কত প্রকার, বেড়াইতে বেড়াইতে নন্দকিশোর ছাত্রকে তা বুঝাইয়া দিল। পরের গাছের ফুলটি, পরের দিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ ইত্যাদি তেমনি অন্যায় কার্য্য যেমন অন্যান্য কার্য্য হইতেছে পরীক্ষার সময় অন্যের লেখা নকল করা। মূর্খের সম্বন্ধে বলিল যে, মূর্খ এ কশত প্রকারের ত' আছেই, সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিলে সম্ভবতঃ তার বেশিই পাওয়া যাইবে।

রাখাল বিস্মিত হইয়া বলিল, এত?

—হ্যাঁ, এতই।

—বলুন না, মাষ্টার মশাই, কি কি রকম।

—অত বলতে পারবো না, দুটো একটা বলি।

মাসিকপত্রে পড়া বৃত্তান্ত সামান্যই নন্দকিশোরের মনে ছিল, বলিল, ভেবো না যে মূর্খ যাকে বলা হয় সে সব বিষয়েই মূর্খ, একেবারে অকেজো গর্দ্দভ, তা কিন্তু নয়। বললেই বুঝবে, যথা: নীরসে গুণবিক্রয়ী; দুঃখে দর্শিত দৈন্যার্ত্তিঃ, স্বাস্থ্যে বৈদ্য ক্রিয়ান্বেষী; লোভেন স্বজনত্যাগী; রোগী পথ্যপরাঙ্মুখঃ, আর শুনবে?

—শুনব।

—বুঝলে কিছু?

রাখাল অনুনয় করিয়া বলিল, বুঝিয়ে দিন, মাষ্টার মশায়।

—দেব ক্রমশঃ। স্বল্পে ভোজ্যোতিরীতিরসিকঃ; শ্লাঘায়ৈ স্বল্পভোজনঃ; মর্ম্মভেদী প্রিয়োক্তিভিঃ; বাচা মিত্রবিরাগকৃৎ; রাজ্যার্থী গণকস্যোক্তেঃ; নৃপানুকারী মানেন; মন্যুমান্ ভোজনক্ষণে; লাভকালে কলহকৃৎ; লোকোক্তৌ ক্লিষ্টসংবৃতঃ; পুত্রাধীনে ধনে দীনঃ।

অনেক চেষ্টায় মনে করিয়া করিয়া নন্দকিশোর মূর্খ কাহাকে বলে তাহারই ঐ নির্দ্দেশ দিল; তারপর পুনরায় মনে করিয়া করিয়া বেকুবির ধাত আর ভাবগতিক বাংলা ভাষায় বুঝাইয়া দিতে লাগল।

এবং তাহাতে সন্ধ্যা লাগিয়া আসিল, ফিরিবার সময় হইল।

৬

সন্ধ্যার পরই বেড়াইয়া ফিরিয়া রাখাল গেল 'উপরে', মূর্খদের চিনিয়া ফেলিয়া সে ভারি আনন্দ পাইয়াছে।

এবং সেই মূর্খ-তত্ত্বেরই খানিক রস লইয়া নন্দকিশোর তার ঘরের চৌকাঠ পার হইল, আর তখনই মূর্খ-তত্ত্বের আমোদ তাকে ভুলিতে হইল; নন্দকিশোর চৌকাঠের কাছেই থমকিয়া রহিল, এ কি তাজ্জব। এ কোথায় আসিলাম! এ যে ইন্দ্রপুরী!

ইন্দ্রপুরী বলিলেই অবশ্যই বর্ণনায় অতিশয়োক্তি দোষ বটে; তবে ইহা সত্যই যে, আমূল পরিবর্তিত করিয়া ঘরটিকে চমৎকার সুখপ্রদ আর সুশোভিত করা হইয়াছে, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নন্দকিশোর দেখিতে লাগিল, আর-একখানা চেয়ার, নূতন চেয়ার, এবং আর-একখানা টেবিল, নূতন টেবিল আনা হইয়াছে, টেবিলের উপর রাখা আছে 'হ্যারিকেন' নয়, সুবৃহৎ আর অত্যুজ্জ্বল একটা টেবিল ল্যাম্প, তার আলো কি! কাজেই, হীনাবস্থ আর অনভ্যস্ত নন্দকিশোরের মনে হইল, সে যেন ঠিক ইন্দ্রপুরীতেই প্রবেশ করিয়াছে।

অবাক হইয়া নন্দকিশোর দাঁড়াইয়া আছে এমন সময় দেখা দিল বলরাম; একগাল হাসিয়া বলরাম বলিল, দেখছেন কি, বাবু, আপনার ভালো হ'য়ে যাবে!

—তার মানে?

—আপনি বাবুর নেকনজরে পড়ে গেছেন। এ-সব বাবুর হুকুমেই হচ্ছে। একটুখানি এদিক ওদিক হ'লেই বাবু অম্বথ করবেন বলেছেন।

—কাকে বলেছেন?

—আমাকে আর ঠাকুরকে। মাকেও বোধ হয় কিছু বলেছেন; তিনিও খুব শ—শ—শ, কথাটা বলতে পারলাম না, খুবই ব্যস্ত আর কি!

—শশব্যস্ত?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, শশব্যস্ত।

—তাই নাকি?

—তবে বলছি কি। ইস্।

—কি হ'ল?

—ভাগ্যিস্ মনে পড়েছে! বলিয়া বিস্মৃত মারাত্মক বিষয়ের উদ্দেশে বলরাম শশব্যস্তে প্রস্থান করিল।

রাখাল পড়িতে আসিল।

তাহাকে পড়ানো শেষ হইল, সমুজ্জ্বল আলোকাধারের সম্মুখে বসিয়া পাঠনে নন্দর মন বসিল বেশি।

একা একা বসিয়া নন্দকিশোর একটু আনমনা হইয়া রহিল; ভাবিতে লাগিল, "হল ভালো"।

সুদৃশ্য আরামপ্রদ আবাসস্থানটির দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া তার মনে হইতে লাগিল, তাহাকে অন্য কলেবরে রূপান্তরিত, আর, আদ্যন্ত সংশোধিত করিবার

ইচ্ছাই বুঝি মণীন্দ্রবাবুর! বাবু তাহাকে নিরুপদ্রবে রাখিবেন এবং বাবু তাহার ভালো করিবেনই, তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, বলরাম বোধ হয় ঠিকই বলিয়াছে।

বলরামেরই উচ্চকণ্ঠ পর্দ্দার বাহিরে শুনা গেল; বলরাম বলিতেছে, "হুঁশিয়ার ঠাকুর"।

তারপরই দেখা গেল, বলরাম পর্দ্দাটা একধারে অনেকটা টানিয়া ধরিয়া আছে, এবং ঠাকুর গা বাঁচাইয়া প্রবেশ করিতেছে; তার একহাতে সোপকরণ একথালা ফুলকো লুচি, আর, অপর হাতে বড় একটা বাটি।

ভোজ্য সম্ভারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নন্দকিশোর বড়ই কুণ্ঠিত হইয়া গেল; বলিল, এখানে যে? আর, এ-সব কি!

ঠাকুর টেবিলের উপর থালা আর বাটি অত্যন্ত সাবধানে নামাইয়া দিল; নন্দকিশোরের প্রশ্নের জবাব দিল বলরাম; বলিল, বাবুর হুকুম। বললাম কি তখন! নেকনজরে পড়ে গেছেন।

নন্দকিশোরের মুখখানা গম্ভীর এবং মনটা সেই অনুপাতে ভারি হইয়া উঠিল। এ-সব তার সংযম আর ত্যাগের সম্মান না আর, সম্বর্দ্ধনা, আর, মণীন্দ্রের সুখের স্বীকৃতি; পুরস্কার অকপট এবং অজস্র, কিন্তু সে ত' মনে মনে চরম বিশ্বাসঘাতক আর অকৃতজ্ঞ।

মনের গুপ্ত গুহাশয়ী গভীর কলঙ্কযুক্ত একটা ভাষাবিন্যাস সহসা প্রবল হইয়া তাহারই সম্মুখে যেন উঠিয়া দাঁড়াইল, লজ্জার অবধি রহিল না।

এখন কেবল রূপদর্শন করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা তার অভিলাষ নয়; তার আরো অধঃপতন ঘটিয়াছে, সে আরো চায়।

কিন্তু, "দৈন্যে বিস্মৃতভোজনঃ" অর্থাৎ শোক বা তাপ পাইয়া যিনি আহারের কথা বিস্মৃত হন, তাঁহাকে মূর্খ বলিতে পারা যায়।

সুধী নন্দকিশোরের প্রাণে আত্মগ্লানির দহন চলিতে লাগিল, এবং সে লুচি ছিঁড়িয়া মুখে দিতে লাগিল, মন এবং হাত যুগপৎ নিযুক্ত থাকিতে পারিবে না কেন!

তা-ই আছে বলিয়া নন্দকিশোরের গ্লানি মিথ্যা নয়।

মণীন্দ্রের মন অশুচি হইলেও হৃদয় প্রশস্ত, তাঁর মন দিয়া দরকার নাই, তাঁর অভ্যাস দস্তুর ইত্যাদি এবং যা কিছু দোষাবহ বিচ্যুতি তাঁর আছে, সবই অবান্তর, দ্রষ্টব্য যা, তা এই যে, তাঁর নিরহঙ্কার উদার হৃদয় হইতে প্রচুর দান নির্গত হইয়া তাহাকে, বলিতে গেলে, অর্চ্চনাই করিতেছে; এমন কি, চরিত্রগৌরবে তাহাকেই শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া তিনি তাহারই সম্মুখে নিজেকে খর্ব্ব করিয়া দেখিয়াছেন। অসাধারণ মহত্ত্ব না থাকিলে ইহা সম্ভব হইত না। কিন্তু সে এমনই পাপাত্মা যে, এমন উৎকৃষ্ট ব্যক্তির অন্নদাতা প্রতিপালকের, একটি সাধের আর সুখের বস্তু অপহরণ করিবার প্রবৃত্তি আর উদ্যম লইয়া বসিয়া আছে।

নারীর রূপ আর দেহ এমনই অপার দুর্লঙ্ঘ্য জিনিষ যে তাহাকে অতিক্রম করিয়া কামনা আর জ্ঞান অপর কোথাও আনন্দের সন্ধান পাইবে না! মনুষ্যত্বের বিনিময়ে, ধর্ম্মকে নাকচ করিয়া দিয়া, আর, চোখ বুজিয়া সমুদয় অন্তর-সম্পদ ধরণীর ধূলায় নিক্ষেপ করিয়া তাহার সেই নকসাকাটা কাচখণ্ড, পাইতেই হইবে।

এই ধরণে আরো খানিক ধিক্কারমূলক চিন্তা, এবং জাগতিক নশ্বর ঘৃণিত ব্যাপার সমুদয় বিশ্লেষণ অর্থাৎ কুকর্ম্মকে অশ্রদ্ধা আর সৎকর্ম্মকে সাধুবাদ দিয়া, অনুতপ্ত নন্দকিশোর, একটা জগদতীত নিষ্কাম অবস্থায় উপনীত হইল; দিব্যদৃষ্টি লাভ, বিবেককে ঠাণ্ডা, এবং আহার শেষ করিল।

মানুষের জন্মাবচ্ছিন্ন সত্য মধুময় সুখ আর নিত্য অনাবিল শান্তি দুরভিসন্ধির লালনে নহে, দুশ্চেষ্টায় মত্ত হওয়ায় নহে, দুষ্প্রবৃত্তির পোষণে নহে, ইহার ঠিক উল্টা দিকে, এ কথা যিনি মানুষকে শুনাইয়াছেন তিনি ধন্যবাদার্হ।

ঐ উক্তির মহামতি কর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিয়া নন্দকিশোর আরো উপকৃত আর শুদ্ধ হইল, আরো কি হইত বলা যায় না; কিন্তু বলরাম আসিয়া দাঁড়াইল, নন্দকিশোরের আহার শেষ হইয়াছে দেখিয়া তার হাতে পান দিল; জিজ্ঞাসা করিল, পানে চুন খয়ের ঠিক হয় ত', বাবু?

—হয়।

—না হলে বাবুকে যেন বলবেন না, তৎক্ষণাৎ আমাকে বাবু তাড়িয়ে দেবেন।

নন্দকিশোর জিজ্ঞাসা করিল, বাবু এসেছেন?

বাবুর তল্লাস লইতে নন্দকিশোরের আজ এখন একটা নূতন রকমে ভাল লাগিল।

বলরাম বলিল, উঁহুঁ। ফিরতে রাত কতো হবে ঠিক নাই, বারটাও হ'তে পারে, বলে গেছেন, বলিয়া বলরাম থালা বাটি তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

নন্দকিশোর আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িল।

আহারাদির পর বাতি নিবাইয়া শুইয়া পড়িতেই যখন দেখা যায়, নিজস্ব চিন্তার ফলে চিত্ত উত্তেজনাহীন আর বিক্ষোভশূন্য হইয়াছে, শান্তি অগাধ, আর গ্লানিশূন্য অন্তর যে কতো নির্ভীক আর কতো মধুর তাহা উপলব্ধি হইতেছে, তখন প্রবাসী বিবাহিত ব্যক্তি চিন্তা করিতে থাকে, ভবিষ্যৎ নয়, চাকরি নয়, স্বাস্থ্য নয়, অর্থ নয়, কোনো দৃশ্য নয়, পুরাতন প্রসঙ্গ নয়, স্ত্রীকে। তদবস্থ নন্দকিশোর সেই নিয়মের অধীনে আসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল মমতাকে; তার সম্বন্ধে একেবারে সার আর শেষ কথাটাই সে চিন্তা করিতে লাগিল; "অমনটি আর হয় না, সুশীতল আর সুশোভনা।" যেদিক হইতেই বিচার করো, ঐ একই উত্তর "অমনটি আর হয় না, সুশীতল আর সুশোভনা।"

সুশীতল আর সুশোভনা মমতার হৃদয়-মাধুর্য্য তাহাকে বিভোর করিয়া রাখিল বোধ হয় অর্ধ ঘণ্টা।

তারপরই হঠাৎ এক সময় দুরু দুরু বুকে অস্থির আর প্রাণপণে উৎকর্ণ হইয়া সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল, পর্দ্দার দিকে চক্ষু নির্নিমেষ হইয়া রহিল, এবং ইতঃপূর্ব্বেকার নিষ্কণ্টক পরিশুদ্ধ সমুন্নত আর প্রসাদসম্পন্ন চিত্ত কল্লোলিত আর মহাবেগে মথিত হইতে লাগিল।

এমন স্নায়ুৎপাটক বিপ্লব ঘটাইয়াছে, আর কিছু নয়, একটুখানি শব্দ; নন্দকিশোরের কানে একটা শব্দ আসিয়াছে, সিন্দুক বা কপাট ভাঙ্গার শব্দ নয়, পদশব্দ, কে যেন সিঁড়িতে মৃদু মৃদু শব্দ করিয়া পা ফেলিতেছে, অর্থাৎ অবতরণ করিতেছে।

চট করিয়াই নন্দকিশোরের মনে হইল, তিনি আসিতেছেন, আর কেহ নয়, আর কিছু নয়, তাহারই মনের প্রতিধ্বনি নয়, অর্থাৎ ভ্রম নয়, তিনিই আসিতেছেন, দুর্নিবার হইয়া এ-প্রত্যয় তার তৎক্ষণাৎ জন্মিল। উর্ব্বশী, চির যৌবনা উর্ব্বশী, জগতের মনোমন্দিরবাসিনী চিরবাঞ্ছিতা অনুপমা উর্ব্বশী, অভিসারে নির্গত হইয়া দেবরাজের শয়নমন্দিরে আসিতেছেন, সকল প্রেরণার যা মূল, সকল চৈতন্যের যা ব্যঞ্জনা, সকল প্রাপ্তির যা শ্রেষ্ঠ, সকল বস্তুর যা নির্যাস আর সকল সম্পদের যা শিরোমণি সেই অনন্ত রূপসম্ভার লইয়া তিনি আসিতেছেন, ঐ সতর্ক পদশব্দ তাঁরই, উৎক্ষিপ্ত আত্মা মূর্চ্ছাহত হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবে।

রাখাল তার পর্দ্দার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, স্যার কি ঘুমিয়েছেন ?

নন্দকিশোর শুইয়া পড়িল, সে তখন হাঁপাইতেছে, কণ্ঠস্বর একটু বিলম্বে ফুটিল ; বলিল, না, কেন ? তারপরই জিজ্ঞাসা করিল, চোরের মতো অমন আস্তে আস্তে এলে যে ?

রাখাল আস্তে আসার কারণ যা বলিল তা ন্যায্য ; বলিল, মা বলে দিলেন যে আস্তে আস্তে নামতে। বললেন, মাষ্টার মশায় বিশ্রাম করছেন, দুপ্-দাপ্ করে নামিসনে, শব্দ করলে তিনি বিরক্ত হবেন।

শুনিয়া নন্দকিশোরের জীবনে বীতস্পৃহা ধরিয়া গেল, কি বলতে এসেছ বলো।

রাখাল বলিল, মা বললেন, ঠাকুর আর বলরাম কোথায় যাত্রা শুনতে যাবে, ছুটি নিয়েছে। তারা বেরিয়ে গেলে সদর দরজাটা বন্ধ করে দেবেন। আর, বাবা এসে ডাকলে খুলে দেবেন। কিছু মনে করবেন না যেন !

কিছু মনে না করার ভাণ করিয়া নন্দকিশোর বলিল, না, না, পাগল !

—তারপর দরজার ছিটকিনিটা লাগিয়ে দেবেন। চোরের অসাধ্য কাজ নাই। বলিয়া রাখাল চলিয়া গেল।

নন্দকিশোরের মনে হইল, নাঃ, ভারি কঠিন বস্তু ; পাওয়াও কঠিন, ত্যাগ করাও কঠিন। কিন্তু আমি একটা কি ! যেমন নির্ব্বোধ তেমনি নারকী আমি, পাপিষ্ঠ একটা। এত সংকল্প সাধু চিন্তা পদশব্দেই চূর্ণ হইয়া গেল ! অথচ এখন সবে 'সন্ধ্যারাত্রি', কিন্তু আর না।

কিন্তু 'আর না' বলিয়া নিজেকে তিরস্কার আর দুচারবার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলেই অদৃশ্য হইবে এ-দুশমন তেমন অশক্ত ছায়ারূপী নহে, এ আগে পাঠায় দুর্ব্বার ঝঞ্ঝা ; সংসার নিঃশব্দে তোলপাড় করিয়া এ সাড়া দেয় ; 'আর না' বলিয়া মুক্তি অন্বেষণ করিলে সঙ্গে সঙ্গেই তা পাওয়া দুষ্কর।

একটা বেদনা অনুভব করিয়া অতিশয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও নন্দকিশোর ভাবিতে লাগিল, সে আহত হইয়াছে।

এই আঘাত বিষমুক্ত করিতে পারে মমতা, কাজেই নন্দকিশোর বিশল্যকরণী মমতাকে মনের গভীর আলিঙ্গনের ভিতর টানিয়া আনিল, আর ধরিয়া রাখিল।

বিবাহিত জীবনই শ্রেয়ঃ, যেমন মঙ্গলপ্রদ নিরাপদ, তেমনি ধর্ম্মাচরণের অনুকূল।

মূর্তিমান প্রতিকূল দশার মতো বলরাম আসিয়া জানাইল, বাবু, আমরা চললাম।

নন্দকিশোর উঠিল, তাহারা বাহির হইয়া গেলে সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল, তারপর বাবু আসিলে যাইয়া খুলিয়া দিল।

মণীন্দ্র ক্লান্ত ছিলেন।

নন্দকিশোরের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন কেবল, কথা কহিলেন না।

বিস্কিট এবং জেলি চায়ের সঙ্গে খাইয়া নন্দকিশোর সকালবেলা রাত্রিব্যাপী উপবাস ভঙ্গ করিল।

রাখাল পড়িতে আসিল।

এবং তারপরই দেখা দিলেন মণীন্দ্রবাবু, বলিলেন, মাষ্টার, ভারি ব্যস্ত হে আমি। যার নাম ল্যাঠা তারই নাম ঠ্যালা। কাল রাত্রে যখন আমি বাড়ী ঢুকলাম তখন চোখ বুজে আছি, এত ক্লান্ত। কমনু ব্যাংক লিমিটেড্ বুঝি টেঁসে যায়। আমি আবার তার একজন হর্ত্তাকর্ত্তা লোক, দায়িত্ব নিয়ে বসে আছি। গণেশ যা'তে উল্টে না পড়েন, চেষ্টাচরিত্তির করে তা-ই করতে হ'চ্ছে। আচ্ছা, পড়াও। পড়ছে ত' মন দিয়ে?

—মন দিয়েই পড়ছে।

—অমনোযোগ দেখলেই চাবকাবে, আমার বলা রইলো।

নন্দ সামান্য একটু হাসিল।

—আমি যাই। মাথার ভেতর সর্ব্বদা যেন ব্যাংকটাই ঘুরছে। কাল রাত্রে অযথা পুলিস স্বপ্ন দেখেছি। তোমার অসুবিধে হ'চ্ছে না ত' কিছু?

—আজ্ঞে, না।

—হ'লেই বলবে, একটুও ইতস্ততঃ ক'রবে না। তুমিও এই বাড়ীরই লোক, যেমন আমরা। ঠাকুর চাকর যেমন আমাদের তেমনি তোমারও। আচ্ছা, যাই। শুনলাম, তুমি খাও খুব কম। খুব খাবে, পেটের খোল চুপসে গেলেই মলে'। আচ্ছা, পড়াও। বাড়ীর চিঠি পেয়েছ?

—এখনও সময় হয়নি পাওয়ার।

—ভালই আছে সবাই। আজ কি বার?

—বৃহস্পতিবার।

—শনিবারে বাড়ী যেও।

ব্যস্তভাবে অনেক কথা বলিয়া মণীন্দ্র ব্যস্তভাবেই চলিয়া গেলেন। নন্দকিশোরের মনটা বড় ছলছল করিতে লাগিল। বড় ভাল লোক, ভারি সুন্দর, অন্তঃকরণ খুব উচ্চ, সুবিবেচক, স্নেহপরায়ণ। ইহাকে ক্ষুদ্র মনে করা তার ভুল হইয়াছিল। ইহার আশাভঙ্গের কারণ হইয়া যদি ইঁহাকে সে মনঃকষ্ট দেয় তবে তা অমানুষিক হইবে, অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইবে, পাপের পরাকাষ্ঠা হইবে।

মণীন্দ্রের কথা সে অনেকক্ষণ ভাবিল। কিন্তু এই বিকারপরবশ নন্দকিশোর নগণ্য প্রাণপুত্তলিটিকে লইয়া বিধাতার পরীক্ষামূলক কৌতুকের, আর, মানুষের কৌতুকমূলক ক্রীড়ার, অর্থাৎ লোফালুফির, যেন অন্তই নাই।

যথাসময়ে নন্দকিশোর স্নান করিল, বলরামের আহ্বানে উপরে গেল; দেখিল, আয়োজন কল্যকার মতোই এবং সেই শুভ্রবসনা স্ত্রীলোকটি, বোধ হয় তার আহারের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়া, অদূরে দাঁড়াইয়া আছে।

নন্দকিশোর আসনে বসিল, কাল সংকোচবোধ হইয়াছিল, আজ তা হইল না, মণীন্দ্রবাবুর অধিকতর হৃদ্যতা আর ভদ্রতায় তার হৃদয় উন্মোচিত হইয়া গেছে; তার মনে হইয়াছে, ভদ্রলোক হিসাবে সে ইঁহাদের সমতুল্য, খাতির আর যত্ন তার প্রাপ্য।

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুরের রান্না আপনার ভাল লাগে ত'?

নন্দকিশোর বলিল, ঠাকুর মন্দ রাঁধে না ত'।

—আপনি জাত মানেন? ছোট বড়, হাতে খাওয়া যায়, যায় না, এমনি বিচার আপনি করেন?

—আগে করতাম, এখন কেউই করে না দেখে আমিও করিনে।

একালের সৌখিন ঝি কি না; কথাবার্ত্তা গা-ঘেঁষা মতো। বলিল, ভালই করেন। তারপর হঠাৎ সে জানিতে চাহিল, বলুন ত' আমি এ বাড়ীর কে?

নন্দকিশোর ইহাকে ঝি মনে করিয়াছিল; কিন্তু তার অনুমানটা কি তা জিজ্ঞাসা করিতেই কথার সুরেই নন্দকিশোরের মনে হইল, তার অনুমান মিথ্যা। বলিল, তা জানিনে।

—আমি এ-বাড়ীর কুটুম।

শুনিয়া নন্দকিশোর মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে তাকাইল কৌতূহলবশতঃ নহে, এ-বাড়ীর কুটুম্বিনীকে সম্ভ্রম দেখাইতে; এমনি ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাইয়াও নির্ব্বিকার থাকিলে মানুষকে অগ্রাহ্যের ভাব দেখানো হয়, নন্দকিশোর তা জানে। তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া সে দেখিতে পাইল, তঁাহাকে তিনি গভীরভাবে নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাঁর মুখমণ্ডলে যে আভিজাত্যের ছাপ আছে তাহাও নন্দকিশোর এখন হৃদয়ঙ্গম করিল। এই পরিচ্ছন্ন মহিলাটিকে এ-বাড়ীর দাসী মনে করা ভুলই হইয়াছিল। দৃষ্টিশক্তির অভাবের দরুণ নন্দকিশোর নিজের কাছে লজ্জিত হইল।

ঠাকুর তল্লাস লইতে আসিল, ভাত তরকারী প্রভৃতি কোনোটি বাবু আর চাহেন কি না; চাহেন না শুনিয়া সে চলিয়া গেল।

তারপর মহিলাটি বলিলেন, আমি কাছেই একটা বাড়ীতে থাকি। বিপদে-আপদে ডেকে পাঠালে যাবেন। আমি একা মানুষ।

একা মানুষ বিপদে-আপদে কত অসহায়, নন্দকিশোর তা বোধ করিল, খুশীর সঙ্গে সম্মত হইয়া বলিল, নিশ্চয়ই যাবো, খবর পেলেই যাবো।

দেখা গেল মহিলাটি স্নেহপ্রকাশ করিতে বেশ পারেন, প্রচুর আর পরম উপাদেয় বাৎসল্যের সহিত বলিলেন, খুব সুখী হ'লাম শুনে; কিন্তু আপনি অত অল্প খান কেন? জোয়ান মানুষ আপনি, আপনাকে খাইয়ে লোকে পেরে উঠবে না; তা নয়, এ যেন পক্ষীর আহার।

কিন্তু এই অকিঞ্চিৎকর পক্ষীর আহারই সুস্থির চিত্তে গলাধঃকরণ করা নন্দকিশোরের বরাতে নাই; এমন সুন্দর স্নেহশীতল আবহাওয়া সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া হৃদয়হীন বিধিবিড়ম্বনা শুরু হইয়া গেল সেই ক্ষণেই, অতিশয় মৃদু একটু সুঘ্রাণ কোথা হইতে ভাসিয়া আসিয়া ছড়াইতে ছড়াইতে বৃহৎ দু'টি রন্ধ্র পাইয়া গেল নন্দকিশোরের নাসিকায়, সেখানে সেই ঘ্রাণ অবাধে প্রবেশ করিল।

গন্ধটা গন্ধতেলের, বকুলের গন্ধ এবং কাহারো কেশপাশ হইতেই বাতাস এই সুবাস আহরণ করিয়াছে, আর, বহন করিয়া আনিয়াছে ইহা নিশ্চয়।

সঙ্গে সঙ্গেই নন্দকিশোরের স্মৃতিপট প্রদীপ্ত হইয়া দুলিয়া উঠিল, তার মনের গাঙে ঢেউ উঠিল, তার সম্বিৎ উজান দিকে প্রবাহিত হইয়া দ্রুতবেগে সেই ঘ্রাণের স্রোত বাহিয়া চলিয়া গেল আর একদিনের একটা দেখার মাঝে যেদিন সে সাবানের গন্ধের অনুসরণ করিয়া গিয়াছিল নিষিদ্ধ একটা দ্বারে, সেখানে সেদিন সে যাহা দেখিয়াছিল তাহা যেন এই মুহূর্ত্তে অধিকতর সমারোহে সমগ্রতা লাভ করিয়া আর অধিকতর স্ফুট ফুল্ল হইয়া তার পুরোভাগে জাগিয়া উঠিল, সমস্ত স্নায়ু শিরা তাহার নর্ত্তনে আকর্ষণে থরথর করিতে লাগিল, একটা অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

নন্দকিশোর পর্দ্দার দিকে চোখ তুলিল, কি করিয়া তুলিল, আর, কেন তুলিল, তাহা জানে না, চোখে দেখিতে পাইল কি পাইল না তাহাও সে জানে না, কিন্তু মনে হইল দৃষ্টি নিঃশেষ হইয়া পেঁাছিবার পূর্ব্বেই যেন একটি চক্ষু, একটুখানি ললাট, এবং কেশের খানিক কৃষ্ণ আভা পর্দ্দার অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়া গেল, পর্দ্দাটা নড়িতেছে তা স্পষ্টই চোখে পড়িল।

নন্দকিশোরের এ-হুঁশ থাকার অবস্থা নয় এবং রহিলও না যে, একটি ব্যক্তি তার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছে; কিন্তু তার হুঁশ হইল সেই ব্যক্তিরই কণ্ঠস্বর কানে যাইয়া; তিনি বলিলেন, এরই মধ্যে হঠাৎ আপনার হল কি? অসুস্থ বোধ করছেন?

নন্দকিশোরের আনত মুখ আকর্ণ আগুন হইয়া উঠিল; "না"। বলিয়া হতচেতনের মতো সে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

কুটুম্বিনী সবিস্ময়ে জানিতে চাহিলেন, উঠে পড়লেন যে?

প্রশ্নটা নন্দকিশোরের কানেও গেল না, কেবল সম্মুখের দিকে অস্পষ্ট দৃষ্টি মেলিয়া সে ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

৭

ত্যাগ-ভোগের কোনোটাতেই নিজেকে রাজী করিতে না পারায় অর্থাৎ অচল ভূমির উপর দাঁড়াইবার একটা স্থান করিয়া লইতে না পারায়, নন্দকিশোরের নিজের উপর এত রাগ হইল যে তা বলিবার নয়; সেই রাগে সে ঘরময় ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং নিজেকে যেন কশার আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া ছাড়িয়া দিতে লাগিল।

তার মনে হইল, আবার পালাই।

এমন ঘোর সঙ্কট আর বিভ্রমের মাঝেও নন্দর সৃষ্টিছাড়াভাবে একটু হাসিই পাইল; সেবার পালাইয়াছিল আতঙ্কতাড়িত হইয়া পরের কবল হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে, এবার সে পলাইতে চায় দোটানায় বিপন্ন হইয়া নিজের কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে। দু'টিতে কত প্রভেদ!

নন্দকিশোরের নাক দিয়া একটা অসহায় দীর্ঘনিঃশ্বাস পতিত হইল;

পালানো হয় না ; পুনরায় তার অর্থ দাঁড়াইবে বিশ্রী কদর্য্য, এমন বিশ্রী কদর্য্য যে, মণীন্দ্রবাবু উহাকে বোধ হয় আর আস্ত রাখিবেন না। অপরাধ যাইয়া পড়িবে তাহারই ঘাড়ে, পড়া অনিবার্য্য ; কারণ, মণীন্দ্রবাবু তাহার দ্বারা স্বীকারোক্তি করাইয়া লইয়াছেন যে, অপরাধ নারীরই ; মণীন্দ্র একবার তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছেন, বোধ হয় পায়ে ধরিয়া ভদ্রলোকের নিকট হইতে ক্ষমা আদায় করিয়া লইতে হইয়াছে, হয়তো বাক্যবাণে ক্লিষ্টা আর গলদশ্রুলোচনা হইয়া তিনি অনেক কাঁদিয়াছেন।

তাহারই প্রণয়াকাঙ্ক্ষার অপরাধে শাসিতা হইয়া সুন্দরী রমণী অশ্রুমুখী হইয়াছে, এই চিন্তা হঠাৎ ভারি মনোরম হইয়া উঠিল ; এবং তাহারই পাশে কাঁটার মতো খচ্ করিয়া বিঁধিল একটা ব্যথা, উনি লাঞ্ছিতা হইয়াছিলেন তাহারই নিন্দনীয় মানসিক দুর্ব্বলতার কারণে, তাহারই ভয়বিহ্বলতার জন্য। পলায়ন না করিয়াও সেই ব্যাপারটাকে পরিহার করা যাইত, যাহাকে তখন অকারণেই দুঃসহ দুর্ব্বিপাক মনে হইয়াছিল, পলায়ন না করিয়া সোজাসুজি বলা যাইত যে, আপনি দয়া করিয়া আমাকে দেখা দিবেন না এবং ও-হেন প্রস্তাব ভুলিয়াও করিবেন না, আমি উহা আদৌ পছন্দ করি না ; দ্বিতীয়ত আমি পেটের দায়ে এখানে আসিয়াছি, তাড়াইবেন না। ঐ কথাগুলি স্পষ্ট বলিয়া দিলেই তিনি সাবধান হইতেন, উদ্ঘাটিত হইতেন না, লাঞ্ছনা বা শাসনের হেতুই দেখা দিত না।

তাঁহাকে ততোধিক এবং যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিতা হইতে হইবে যদি আবার তেমনি পালাই, তাঁহাকে কেবল খোঁটার উপর রাখিয়া মণীন্দ্র তাঁহাকে চিরজীবনের জন্য দুস্তর কণ্টকশয্যায় তুলিয়া দিবেন ! সর্ব্বনাশ ! যদি বলিয়া কহিয়া যাই তাহা হইলেও পরিণাম তাহাই ঘটিবে, মণীন্দ্র কদাচ তাঁহাকে রেহাই দিবেন না, জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলিবেনই। নন্দকিশোরের প্রাণে ভারি করুণার উদ্রেক হইল, এবং তাহারই ঘোরে সে খানিক বিভোর হইয়া রহিল।

তারপর তার দেহ কণ্টকিত হইল ইহাই স্মরণ করিয়া যে, তিনি লুকাইয়া, সংসারের একেবারে অগোচরে, তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, খুব ভালো না লাগিলে এবং খুব ভালো না বাসিলে, অর্থাৎ প্রাণসংশয়কর তৃষ্ণা অনুভব না করিলে কেহ অমন করিয়া লুকাইয়া দেখে না। আজ পর্য্যন্ত তাহার মনে তাহারই যে জীবনেতিহাস প্রোথিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং পরে ক্রমশঃ গ্রথিত হইতে থাকিবে, সেই ইতিহাসে এই ঘটনাটাই থাকিবে উজ্জ্বলতর গভীরতম মধুরতম আর স্মরণীয়তম হইয়া, জরা-মরণজয়ী হইয়া তাহার জীবন্ত সত্যটি স্থিতিলাভ করিবে, অলোকসামান্যা রূপসীর অতি দুর্লভ আর পরম কাম্য অনিরুদ্ধ তীব্র ভালোবাসা।

ভালোবাসা পাইয়া নন্দকিশোরের সশরীরে স্বর্গারোহণ ঘটিতে লাগিল, তার অর্থ এই যে, পরম উল্লাসকর প্রাপ্তির পুলকে তার অঙ্গ শিহরিত হইল, এবং তার জগৎ কুসুমিত হইল, এবং তার জগৎ প্লাবিত করিয়া পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মতো সুনির্ম্মল ভালোবাসা তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল।

এই ব্যাপারে দীর্ঘশ্বাস খুব প্রাধান্য লাভ করে।

নন্দকিশোরেরও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রূপ-যৌবন অর্থাৎ নশ্বরত্ব বাদ দিয়া নিরবয়ব এবং নিরুত্তেজক চিরজীবী

ভালোবাসার আবির্ভাব হইতেই তার মনে হইল, সে বড়ো একা, এবং তিনিও তেমনি তাহারই মতো বড়ই একা। ইস্, হৃদয়ে হৃদয়ে সংযোগবশতঃ অনুকম্পার দারুণ প্রকোপে নন্দকিশোরের মুখ দিয়া ঐ ক্লেশসূচক শব্দটি সশব্দেই নির্গত হইয়া গেল; হইবারই কথা, কারণ মণীন্দ্রবাবুর এই গৃহে অধিষ্ঠিত যক্ষ এবং যক্ষাঙ্গনার মাঝে ব্যবধান অতি অল্প, আর, এক-লাফেই পার হওয়া যায় বলিয়া, সংকীর্ণ জলপ্রবাহের মিলনপ্রয়াসী এপার ওপার দু' তীরের যন্ত্রণার মতো এই বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা সত্যই অপার।

সামান্য বাধাটা পার হইয়া অপার যন্ত্রণা ঘুচানো যায় কি উপায়ে তাহা নন্দকিশোর চিন্তা করিত কি না বলা যায় না, কারণ সেই সময়টিতেই পর্দা ঠেলিয়া প্রবেশ করিল অবাঞ্ছিত বলরাম; বলিল,—ও, জেগেই আছেন! একবার দরজায় আসুন ত'।

—কেন?

—ডাক্ছেন আপনাকে। বলিয়া বলরাম দাঁত বাহির করিল।

ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া কে ডাকিতেছেন?

বলরামের দাঁত দেখিয়া বিরক্ত হইবার অবসর নন্দকিশোরের হইল না, চক্ষের নিমেষে সে লাফাইয়া উঠিল, এবং চক্ষের নিমেষেই পর্দার বাহিরে আসিয়া দেখিল, 'এ-বাড়ীর কুটুম্ব' সেই মহিলাটি দাঁড়াইয়া আছেন, সৌজন্যজনিত প্রফুল্লতার মাঝে তাঁহাকে চমৎকার সৌম্য দেখাইতেছে।

মহিলাটি হাসিয়া বলিলেন,—আমি যাচ্ছি। ডেকে পাঠালে যাবেন; আলাপ করবো; যাবেন কিন্তু।

—যাব বই কি! বলিয়া নন্দকিশোর কৃতার্থ হইয়া রহিল।

'কুটুম' চলিয়া গেলেন।

৮

সেইদিন সন্ধ্যার পর আবার একটি প্রস্থান ঘটিল।

মণীন্দ্রবাবু ঢুকিয়া পড়িলেন, বলিলেন,—এই আসছি হে। ওপরে যাইনি এখনো। কমন ব্যাংক লিমিটেড বোধ হয় টিঁকে গেল। আজ রাত্রেই এলাহাবাদ যাচ্ছি। আরো কয়েকজন যাচ্ছেন, ঐ ব্যাংকেরই কাজে। বেশি কথা বলার সময় নেই। তুমি রক্ষক হ'য়ে থাকলে। খুব সাবধানে থেক। কবে ফিরবো জানিনে। তুমি ভক্ষক নও তা জানি। নিমক-হারাম লোককে দেখলেই আমি চিনতে পারি। কিন্তু, আর একটা কঠিন কথা: শনিবার তোমার বাড়ী যাওয়া হল না। শাপবে না ত'? ও-শাপ বড় লাগে। বুড়ো বাল্মীকি নাকি কেঁদে ফেলে ব্যাধ বেটাকে শেপেছিল!

নন্দকিশোর হাসিয়া ফেলিল।

—শাপলে ত' বয়ে গেল। আচ্ছা, চলি। খেয়েই ছুটতে হবে। আর পারিনে। আচ্ছা, বলিয়া মণীন্দ্র প্রস্থানোদ্যত হইতেই নন্দকিশোর দু'হাত তুলিয়া নমস্কার করিল; মণীন্দ্র প্রতিনমস্কার করিলেন না; বলিলেন, বাহ্যাচারের

ধার ধারিনে ; আমার সম্বন্ধে তুমিও ধেরো না। বুঝলে মাস্টার, ও কেবল কাজ বাড়ানো। আচ্ছা, যাই। এসে যেন দেখিনে, তুমি আবার পালিয়েছ।

শুনিয়া নন্দকিশোর হঠাৎ অধোবদন হইল, মণীন্দ্র চলিয়া গেলেন।

মণীন্দ্রের শেষ কথা ক'টির ভিতর বেদনা ছিল, নন্দকিশোরকে তা আঘাত করিল।

কুটুম্বিনী চলিয়া গেছেন নিকটবর্ত্তী নিজের বাড়ীতে এবং মণীন্দ্রবাবু চলিয়া গেলেন বহুদূরবর্ত্তী এলাহাবাদে, গৃহ প্রহরীহীন, অভিভাবকহীন, যতটা বাঞ্ছনীয় ততটা জনশূন্য হইয়া গেল এবং পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া এমন একটা স্থানে দাঁড়াইয়া গেল যেখানে বাস করায় নন্দকিশোরের পক্ষে সুখ আছে. স্থান যত নির্জ্জন প্রাণিহীন তত প্রাণহীন এ-কথা সব সময়েই সত্য নহে, সত্য যে নহে তাহার প্রমাণ আজ এই বাড়ীটা। নন্দকিশোর মর্ম্মে মজ্জায় চৈতন্যে এই নির্জ্জনতার গভীর সঙ্গসুখ অনুভব করিতে লাগিল ; তার মনে হইতে লাগিল, এই বাড়ীর বায়ু স্বেচ্ছাবিহারী অবাধ প্রাণে পূর্ণ হইয়া গেছে তাহার প্রাণে এবং তাঁহার প্রাণে পরিপূর্ণ হইয়া বায়ু নিঃশ্বাসে উত্তপ্ত, বক্ষঃস্পন্দনে তরঙ্গিত, প্রতীক্ষার আবেগে কম্পমান, আর, বেদনায় আতুর হইয়া উঠিয়াছে, আর, পঞ্চশরের অলক্ষ্য দ্যুতিতে মুহুর্মুহুঃ তাহার ভিতর যেন ফুলের প্রাণ ফুটিয়া ফুটিয়া মিলাইয়া যাইতেছে।

ঐরূপ চঞ্চল কিন্তু উত্তম আবহাওয়ায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে নন্দকিশোর হঠাৎ জ্ঞানসঞ্চয়ে মন দিল ; কিন্তু আধুনিক বঙ্গ-ভাষার অভিধান 'চলন্তিকা' তার চিত্তের আক্ষেপ এবং বিক্ষোভ কতটা নিবারণ করিল তাহা সে-ই জানে এবং দ্রুতহস্তে পাতার পর পাতা উল্টাইয়া কতকগুলি শব্দের অর্থ সে চক্ষুগোচর করিল তাহাও সেই জানে।

গৃহকর্ত্তা বাহিরে গেলেন ; তিনি রওনা হইয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত বাড়ীর সবারই একটু ব্যস্ততা ছিল ; কাজেই নন্দকিশোরের লুচি আসিতে আজ রাত্রি বেশি হইয়াই গেল, প্রায় দশটা।

লুচি খাইতে খাইতে নন্দকিশোর ভাবিতে লাগিল মণীন্দ্রবাবুর কথা, বাবু ভাগ্যবান বটে, অগাধ টাকা, কিন্তু টাকা যাক চুলোয়, অপরূপ নারীরত্ন তাঁর ; সেই আনন্দেই প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁর স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিতেছে। ঘটিবে না কেন! উদ্বেগ-হীন একাধিপত্য যে! অমরবাঞ্ছিত যে রসায়ন তিনি হৃদয়পুটে পাইয়াছেন তার ক্রিয়া অমোঘ, রূপসম্ভোগই মানুষের জীবনের উৎস এবং উৎসব, সুধাময় উপচার। ভালোবাসা তিনি পান নাই, চাহেনও না বোধ হয় ; কিন্তু অনিন্দ্য রূপের স্বর্গ হইতে ক্ষরিত অনাবিল মধুধারা তিনি অহরহ নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে গ্রহণ করিতেছেন। ভালোবাসা গৌণ লক্ষ্য, জীবনের দ্বিতীয় ধারা ; আদিভূত যে-রসের নাম ভোগসুখ তাহা তিনি অপর্য্যাপ্তই পাইয়াছেন এবং পাইতেছেন। গায়ে মাংস লাগিবে না কেন। রঙে জলুস দেখা দিবে না কেন! তাঁর প্রাণে রাসোৎসব এবং মুখে কথার স্রোত চলিবে না কেন!

আলো নিবাইয়া নন্দকিশোর শুইল।

টাকা এবং ভালোবাসা যখন একই সার্থকতা দান করিতেছে তখন টাকার অভাবের দরুণ আপশোস কি আছে! যার টাকা অল্প তার কি সবই অল্প!

তার আয়ু, তেজ, আশা, উদ্যম, শ্রী, স্বপ্ন প্রভৃতি, এবং সর্বোপরি প্রণয়াকাঙ্ক্ষা আর, তা-ই লাভ, এ-দুটো অল্প না-ও হইতে পারে।

অর্থাল্পতার দুঃখ যা মাঝে মাঝে দেখা দেয়, নন্দকিশোর তা তখনকার মতো ভুলিল; কিন্তু কেবল অর্থাল্পতার দুঃখ ভুলাইয়া দিবে, আজকার এই পরিবেশ সে-রকম স্থূল, লৌকিক এবং নিরীহ নহে।

তারপরই পুলকে নন্দকিশোরের অঙ্গ অবয়ব যেন মনের অনুসরণ করিয়া অন্তরীক্ষের দিকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

এই শয্যা আজ ধন্য হইবে, ইহা সত্য। সুষুপ্তা নিশীথিনী আজ যৌবনসহ যৌবনের রূপের সঙ্গে রূপের, আর, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মিলনোল্লাস আপন বক্ষে চিহ্নিত অক্ষয় করিয়া রাখিবে।

কেন এরূপ অবশ্যই ঘটিবে, প্রতিবন্ধক দেখা দিবে না, নন্দকিশোর নিশ্চয়ই তা বলিতে পারিবে না; কিন্তু তার চৈতন্যে এই বিশ্বাস পুঞ্জীভূত হইল, রক্তে তাহা সঞ্চারিত হইল, আর মস্তিষ্ক ব্যাপিয়া তাহা ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।—দৈবী কাণ্ড নিশ্চয়ই, বিপদ যেমন ছায়াময় পূর্বাভাষ নিক্ষেপ করে, সুখ-সম্পদও তেমনি বোধহয় কল্লোলময়ী অলকনন্দার আলোক আর তরঙ্গ প্রেরণ করে।

কতক্ষণ নন্দকিশোর ভাবাবিষ্ট, আনন্দে আত্মহারা, আর 'আসার আশায়' মগ্ন ছিল, কে জানে, কাছেই কোথাও হঠাৎ একটা গুরুভার দ্রব্য পতনের শব্দে সে ভয়ানক চমকিয়া উঠিল।

কঠিন চমকানি; যে-কথাটা আস্তে বলিলেই চলিত, চমকিত নন্দর মুখ দিয়া সেই কথাটাই যেন আর্তনাদের মতো বাহির হইল; নন্দকিশোর জানিতে চাহিল, কে?

উত্তর আসিল, আজ্ঞে আমি, বলরাম।

—শব্দ হ'ল কিসের?

—আজ্ঞে, খাটিয়া ফেললাম।

—কোথায়?

সিঁড়ির মুখ আর আপনার দরজার মধ্যেখানে।

—কেন?

—বাবু বলে গেছেন পই পই করে। চোরের ভয় তাঁর বেজায়। বলিয়া বলরাম শব্দ করিয়া হাসিল, বলিল, বাবু বললেন, তোরা আসার পথ পাবিনে, কিন্তু চোরগুলো ঠিক পাবে। সেইটাই ওদের বাহাদুরী। সিঁড়ির দোতলার দরজায় ডবল তালা লাগিয়ে এসেছি। ভূমিকম্প হলে কিন্তু মুশকিল। বলিয়া বলরাম আবার শব্দ করিয়া হাসিল।

ইহকালীন ধ্বংসজনক দুর্ঘটনা কেবল ভূমিকম্পই নয়। উপস্থিত দুর্ঘটনার প্রথম ধাক্কাটা নন্দকিশোর শুইয়া শুইয়াই সামলাইল; তারপর কয়েক মুহূর্ত পরেই, সে দুর্বলদেহ রোগীর মতো কষ্টেসৃষ্টে উঠিয়া বসিল। নিষ্পলক চক্ষে যেদিকে সে তাকাইয়া রহিল সে দিকটা অন্ধকার, কেবল আলোকশূন্য বলিয়া অন্ধকার নয় নিষ্প্রাণ বলিয়াও অন্ধকার, আর, অধিকতর সূচীভেদ্য। অসাড়-

প্রাণে অন্ধকারটা সে দেখিল, এবং তারপরই সম্বিৎ উৎক্ষিপ্ত করিয়া, জন্মিল নয়, জ্বলিয়া উঠিল প্রচণ্ড ক্রোধ, মণীন্দ্রের বিরুদ্ধে, নন্দকিশোরের সেই ক্রোধ মণীন্দ্রের উপর নিপতিত হইলে তিনি বাঁচিতেন না।

মণীন্দ্র তখন গাড়ীর ভিতর।

কলিকাতার প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটের সন্নিকটবর্ত্তী একটা স্থান হইতে প্রয়াগযাত্রার একটি হাতে-মুখে খড়িচূর্ণ মাখা সঙ্গিনী সংগ্রহ করিয়া লইয়া তিনি গাড়ীর দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বসিয়া আছেন, এবং তাহাকে, সেই সঙ্গিনীকে, মিসেস রায় বলিয়া সম্বোধন করিয়া বিস্তর আনন্দ করিতেছেন এবং সহযাত্রী বন্ধুত্রয়ের বিস্তর আনন্দের কারণ হইতেছেন।

কাজেই নন্দকিশোরের ক্রোধের শিবতাণ্ডব আর যন্ত্রণা চলিতে লাগিল কেবল তাহারই বুকে, এবং আগুনের মূর্ত্তি ধরিয়া আবর্ত্তিত হইতে লাগিল তাহারই মস্তিষ্কে।

—বলরাম?

বলরাম ঘুমায় নাই; সাড়া দিল, আজ্ঞে।

—বাবু ফিরবেন কবে?

উত্তর চাহিয়া নন্দকিশোর অনর্থক ঐ প্রশ্ন করিল। বাবু ফিরিলে সে কি করিবে তাহা সে ভাবেই নাই।

বলরাম বলিল, সঠিক কিছু ব'লে যান নাই, বাবু।

নন্দকিশোরের একটি নিঃশ্বাস পড়িল, এ নিঃশ্বাসটি মামুলী নিঃশ্বাস নয়। তার এই নিঃশ্বাসটি অভিসম্পাতেরই প্রকারান্তর। নন্দকিশোর তাহার এই সর্ব্বনাশকর নিঃশ্বাসটিকে মণীন্দ্রের অদৃষ্টকে লক্ষ্য করিয়া তাঁর পশ্চাতে ছুটাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল।

লোকটা, ঐ মণীন্দ্র, অতিশয় দুশ্চরিত্র, ক্রূর, অতিশয় নির্লজ্জ, অতিশয় অভদ্র, এবং আরো বহু ন্যক্কারজনক দোষের আধার। ঐ লোকটি তাহারই, একটি ভদ্রলোকের স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া তাহারই সম্মুখে যেরূপভাবে লোলুপতা এবং দুঃসাহস প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে মনুষ্যপদবাচ্য কোনো ব্যক্তিরই কোনো কারণেই তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা অনুচিত, এমন কি অসম্ভবই। বলিহারি যাই সেই ধৃষ্টতার। সেই অমানুষের অসাধ্য দুষ্কার্য্য কি আছে!

নন্দকিশোর পূর্ব্বে যাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই, নিজের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া সেই জিনিসটা সে বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিল। মণীন্দ্র বলিয়াছিলেন, ঘরে যার যুবতী স্ত্রী আছে তার সুখের অংশ মনে মনে আমি গ্রহণ করি। শুনিয়া তখন সে অবাক হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু এখন নন্দকিশোরের জ্ঞান হইয়াছে যে তা পারা যায়। বর্ত্তমানে তার যত আক্রোশ মণীন্দ্রের প্রতি, তার নিজের প্রতি নয়; কাজেই নন্দকিশোরের পুনঃ পুনঃ মনে হইতে লাগিল, অত্যন্ত লম্পট জঘন্য ব্যক্তি না হইলে পরস্ত্রী সম্বন্ধে মানুষের অত আসক্তি থাকে না, মণীন্দ্র তা'-ই; এবং সেই কারণেই তিনি তাহার মাহিনা বাড়াইয়া দিয়া রাত্রে লুচির ব্যবস্থা করিয়া দিলেও তিনি ঘৃণ্য। তিনি নিজেই অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে নিজের স্বরূপ অনাবৃত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, নারী

সম্পর্কে তিনি খ‍ুব হ্যাংলা। ভদ্রলোক তা কখনো প‍ুত্রের বয়সী গ‍ৃহশিক্ষকের সম্মুখে মুখ ফুটিয়া বলে নাকি! তাঁর বাহাদ‍ুরির আর-কিছু নাই। গ‍ৃহশিক্ষক বলিয়া সে যেন মান‍ুষই নয়! অত্যাচারী, ভণ্ড, কুৎসিত।

মণীন্দ্রকে গালি পাড়িয়া নন্দকিশোর খানিক যেন বেহ‍ুঁশ হইয়া রহিল।

তারপর তার কলিজা ক্ষতবিক্ষত আর প‍ুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল অন্য কারণে, এবার দোষী সে নিজে।

তাহার জন্যই প্রমোদিত অতুলন এক রাসমঞ্চ রচিত হইয়াছিল, ভাগ্যশ্রী হাসিম‍ুখে তার ম‍ুখের দিকে নেত্রপাত করিয়াছিলেন, পাত্র প‍ূর্ণ করিয়া সুধা লইয়া তাহারই উদ্দেশে যাত্রা একজন করিয়াছিল; কিন্ত‍ু সে নিজে অন্ধ ম‍ূঢ় ভীর‍ু, অনন্ত র‍ূপ আর যৌবন দ‍ূরে ঠেলিয়া দিয়া সে পরিত্রাহী ডাক ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল ঠিক পাগলের মতো।

তিনি বলিয়াছিলেন, আপনি নির্ব্বোধ, তাই দিশে পান না, পালান।

আতিথ্যগ্রহণ এবং আনন্দদানের জন্য ভোগস্বর্গে আর প্রেম-বৈকুণ্ঠে অম‍ৃতময় এই অবারিত আমন্ত্রণের অনিবার্য্যতা আর দ‍ুর্লভতা সে অন‍ুভবই করিতে পারে নাই, এমনই সে দৃষ্টিহীন অসাড়, ক্লীব।

আজকার এই শাস্তি তারই কর্ম্মফল, তার প্রাপ্য। সে পলায়ন করিয়াছিল বলিয়া মণীন্দ্র তার কারণ একটা অন‍ুমান করিয়াছিলেন; এবং অন‍ুমান করিয়াছিলেন ঠিকই, ঘটনার সত্যতা সে স্বীকারও করিয়াছিল, তাই তাহাকেই নিরাপদে রাখিবার জন্য মণীন্দ্রের সতর্কতার সীমা নাই।

দ‍ুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক স্থাপন তার বির‍ুদ্ধে নয়, তাঁরই তথাকথিত প্রণয়িণীর বির‍ুদ্ধে! তার ক্র‍ুদ্ধ হইবার কারণ কি আছে! নিজের পায়ে এমন করিয়া কুঠারাঘাত আর কেহ কখনো করে নাই, নন্দকিশোরের ইচ্ছা করিতে লাগিল, ব‍ুকে কুঠার মারিয়া নিজের ভবলীলা সে এখনই সাঙ্গ করিয়া দেয়। নিষ্ফল অস্তিত্ব, আর, অন‍ুতাপপ‍ূর্ণ অতৃপ্ত বেদনাময় জীবন বহন করিয়া কাজ কি! অযোগ্য কাপ‍ুর‍ুষের ম‍ৃত্যুই মঙ্গল।

স্বহস্তের কুঠারাঘাতে নিজের ত্বরিত ম‍ৃত্যু কামনা করিয়া নন্দকিশোর একটা শান্তি গ্রহণ করিল বটে, কিন্ত‍ু বিন্দ‍ুমাত্র শান্তি পাইল না, কারণ তাহার সঙ্গে আর একজন জড়িত ও সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। চক্রবাক নিজেকে বাদ দিয়া চক্রবাকীকে চিন্তা করিতে পারে, কিন্তু চক্রবাক কে বাদ দিয়া নিজের চিন্তা করিতে পারে না; শত্র‍ু অথবা অদৃষ্ট ব্যাঘাত আর বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে, কিন্ত‍ু বাবচ্ছেদ করা তার সাধ্যাতীত, প্রেম যেখানে প্রাণে প্রাণে মিলিত করিয়াছে সেখানকার নিয়মই তাই!

নন্দকিশোর মানসচক্ষে একটি চিত্র দেখিতে লাগিল, যাহার তুল্য জীবন্ত আর কর‍ুণ সংসারে আর কিছু নাই; কাতরা বিপন্না নারী ক্রন্দনবেগ নিরোধ করিয়া ক্লান্তি আর অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন, নিদ্রার নামগন্ধও তাঁর চোখে নাই, জলে তা ধ‍ুইয়া গেছে; লক্ষ্মীছাড়া যমপ‍ুরীর অন্ধকারে বন্দিনী বিপন্না নারীর হিয়া কেবলি মথিত হইতেছে, গ‍ুমরাইতেছে। তাঁর কম্পিত সঘন নিঃশ্বাসের সাথে তার প্রাণের বেগ আর দেহের সুষমা নিঃস‍ৃত হইয়া যাইতেছে, কখনো স্পন্দন

কখনো শৈত্য সেই দেহে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে—রক্তমাংসে নির্ম্মিত সেই কুসুমকোমল দেহ আর সহিতে পারিতেছে না।

যে-ব্যক্তি ইহার হেতু, এই দুর্ভোগের যে মূল, পারিজাতের বুকে যে শেল হানিয়াছে, সংসারের মর্ম্মস্থলে যে নির্ঘাত আঘাত করিয়াছে, সেই দুর্ব্বৃত্ত দানবকে সংসার ক্ষমা করিবে না।

সংসার সেই দুর্ব্বৃত্ত দানবকে ক্ষমা না করিলে অকল্যাণযুক্ত দশদশার কোনটি সেই দানবকে পীড়িত করিবে তাহা ভাবিবার দরকার বোধ হয় নাই; নন্দকিশোর সংসারের সুবিধার জন্য তা বাছিয়া দিল না। কিন্তু আশ্চর্য্য হইল ইহাই ভাবিয়া যে, সে পীড়িত হইতেছে সংসারের কোন বদখেয়ালে!

কিন্তু তাহার চাইতেও আশ্চর্য্য ঘটনা ইহাই যে, দু' চোখ ভাঙ্গিয়া নন্দকিশোরের ঘুম পাইতে লাগিল, বাহিরে বলরামের নাকে কাঁকর পিষিয়া রথ চলিতেছে, ভিতরে সে, তার রক্ত আর মন ফুটিতেছে, মগজে লাগিয়াছে আগুন! তবু তার ঘুম পাইল।

৯

সকালবেলা নন্দকিশোরের যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বলরাম তার দুস্তর খাটিয়া লইয়া চলিয়া গেছে এবং তখন নন্দকিশোরের প্রাণে তিলমাত্র সুখ নাই, মনে এমন বিতৃষ্ণা আর আলস্য যে, পৃথিবীর দিকে তাকাইতে ইচ্ছা করিতেছে না—

ষড়রিপুর একটিও যখন প্রতাপশালী নহে, তখনও মনে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ঘোর তিক্ততা দেখা দিতে পারে। বলরাম যখন চা ইত্যাদি লইয়া আসিল তখন তাহার দিকে চাহিয়া নন্দকিশোর তিক্ততা অনুভব করিল এবং রাখাল যখন পড়িতে আসিল তখন তাহার দিকে চাহিয়া সেই তিক্ততা আরো বাড়িয়া গেল।

বেগার ঠেলার মতো সে পড়াইয়া গেল, রাখালের পাঠ-বিষয়ক প্রশ্নের জবাব সে অস্পষ্ট দিল।

পড়িতে পড়িতে রাখাল হঠাৎ বলিয়া উঠিল, বাড়ীর চিঠি পেয়েছেন?

—না, কেন?

—মা জানতে চেয়েছেন।

সমস্ত তিক্ততা আর অরুচি ডুবাইয়া অপূর্ব্ব মধুর রস তৎক্ষণাৎ উথলিয়া উঠিল; নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত করা ছাড়া এ-জিজ্ঞাসার আর কোনো অর্থই নাই; তার মুখ হইতে একটি জবাব লইয়া তাহাকেই, তার দেহ আর মনকে, তিনি নিজের কাছে স্থান দিতে চান, মনে মনে একটু স্পর্শ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর।

নন্দকিশোরের স্বর গদগদ হইয়া উঠিল; বলিল,—তাঁকে বলো' যে, চিঠি পাইনি। আর-কিছু বলেছেন?

—বলেছেন।

—কি বলেছেন? নন্দকিশোর উত্তরটা শুনিবার জন্য ঘাড় বাড়াইয়া দিল।

—রাত্রে একা একা ভয়ে তাঁর ঘুম হয় নাই।

শুনিয়া নন্দকিশোর ভাবে মশগুল হইয়া গেল—'একা একা' শব্দ দুটি প্রচুর অর্থ বহন করিতেছে, পার্শ্বে মণীন্দ্রের অভাব নিশ্চয়ই কঠোর হইয়া ওঠে নাই।

বলিল, ঘুম আমারও হয় নাই। প্রায় সারারাতই জেগে ছিলাম।

তাঁর ঘুম হয় নাই—

তারও ঘুম হয় নাই—

নন্দকিশোরের বুকের ভিতরটা কেমন করিতে লাগিল যেন—একবার বেদনায় মুচড়াইয়া উঠিতে লাগিল, একবার আনন্দে নাচিয়া উঠিতে লাগিল, এবং রাত্রিব্যাপী তার সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা নূতন রকমের স্বাদসংযুক্ত, আর সুষ্ঠু হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল, সর্বোপরি আশার সঞ্চার এত হইল যে, স্বল্পপরিসর মাটির জগতে তাহা রাখিবার ঠাঁই না পাইয়া নন্দকিশোর চক্ষু নিমীলিত করিয়া ধ্যানের অনন্তলোকে তাহা ছাড়িয়া দিল আর ছড়াইয়া দিল।

গাঢ়স্বরে বলিল, ভয়ের কারণ কিছু নেই—তাঁকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলো'। আমি আছি, ভয় কি! কাল আমি জেগেই ছিলাম; আজও থাকব। যথেষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে মনে করিয়া নন্দকিশোর খানিক যেন বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থায় নিঃশব্দ হইয়া রহিল।

পড়া শেষ করিয়া রাখাল উপরে গেল—

নীচে বসিয়া নন্দকিশোর হাঁটু নাচাইতে নাচাইতে কল্পনা করিতে লাগিল, রাখালের মুখে বাড়ীর চিঠির অনাবশ্যক খবর আর জাগিয়া থাকার অত্যাবশ্যক খবর, দ্বিবিধ খবরই তিনি শুনিতেছেন—রাখালের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া, এবং যাহার খবর শুনিতেছেন সেই অকিঞ্চনকে স্মরণ করিয়া, উৎফুল্লভাবে তিনি তার মুখের ভাষার আবৃত্তি দু'কান ভরিয়া শ্রবণ করিতেছেন।

কিন্তু উহাও তুচ্ছ।

সিঁড়িতে দুমদাম শব্দ করিয়া রাখাল দ্রুতবেগে নামিয়া আসিল, দৌড়াইয়া ঘরে ঢুকিল; বলিল, মা বললে, জেগেই যেন থাকেন, কখন কি ঘটে বলা যায় না। বলিয়াই রাখাল তেমনি করিয়া চলিয়া গেল।

আর নন্দকিশোরের মনে হইতে লাগিল, সে ভূমিসাৎ হইতেছে, নিজেকে ধারণ করিতে সে অক্ষম; স্বর্গ, মর্ত্ত্য, চন্দ্র, সূর্য্য স্থানভ্রষ্ট হইয়া তাহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, বসুন্ধরা দুলিতেছে, হৃদয়পিণ্ডের স্পন্দন আর রক্তের গতি স্থগিত হইয়া গেছে এবং তথাপি, হৃদপিণ্ডের আর রক্তের নিরুদ্ধ অবস্থাতেই, তার তেজের অসাধ্য কার্য্য এখন কিছুই নাই।

জাগিয়া সে আছে এবং থাকিবে, গতিশীল কালের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত এবং তার নেত্রপল্লবের প্রতিটি নিমেষ তাহারই প্রতীক্ষমান সতর্ক জাগরণে উদ্ভিন্ন আর উন্মীলিত হইয়া আছে এবং থাকিবে।

তারপর নন্দকিশোর খুব অন্যমনস্ক হইয়া রহিল, তেল মাখিতে বসিয়া তার তেলমাখা শেষ হয়ই না। শরীরের যে স্থানে একবার তেল দিয়াছে সেখানে সে আরো দু'তিনবার দিল; স্নান করিতে যাইয়াও ঠিক তেমনি অন্যমনস্ক—গাত্র-মার্জনা পুনঃ পুনঃই করিতে লাগিল—গায়ে মাথায় জল ঢালিতে শুরু করিল ত' একঘাই ঢালিতেই লাগিল।

আজও উপরেই আহারের ঠাঁই হইয়াছে। ঠাঁই হইয়াছে শুনিয়া সে উপরের উদ্দেশে পা বাড়াইতেই তাহাকেই চমকিত করিয়া তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। খুব গম্ভীরভাবে সিঁড়ি ভাঙিয়া নন্দকিশোর উঠিয়া গেল—সিঁড়ি ভাঙিতে কষ্টবোধ করিল না; দেখিল, সমুদয় ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ এবং নির্দ্দোষ; পরিবর্ত্তন এইটুকু যে শ্রদ্ধেয়া সৌম্যমূর্ত্তি কুটুম্বিনীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে দন্তসর্ব্বস্ব অপরিষ্কার বলরাম।

প্রথম নজরে দেখা গেল বলরামকে; এবং দ্বিতীয় নজরে দেখা গেল যে, তার দক্ষিণ দিককার দরজায় যে-পর্দ্দা গা মেলিয়া দিয়া ঝুলিয়া থাকিত তাহাকে গুটাইয়া একপাশে সরাইয়া রাখা হইয়াছে, ঘরের ভিতরটার অনেকখানি দেখা যাইতেছে, এবং আরো যা দেখা যাইতেছে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব গৌরব যথেষ্ট। এ-ঘরেও একখানা প্রকাণ্ড আয়না রহিয়াছে, দরজার দিকেই তার মুখ। নন্দকিশোরের স্মৃতি উদ্দীপিত হইল।

দর্পণে ছায়া পড়ে—এই আছে এই নাই, এমনি ঘটে লক্ষবার। কিন্তু ছায়ার নিকটে ছায়ার পতনে স্বাতন্ত্র্য আছে, সর্ব্বদাই তা নিমেষের ব্যাপার নয়, নিমেষেই তার বিলুপ্তি ঘটে না—তা অমর হইয়া থাকে স্মৃতিপটে, স্মৃতিপথ বহিয়া সে ছায়ার সঞ্চারণ চলিতেই থাকে।

কাজেই, দর্পণের দিকে চোখ পড়িতেই নন্দকিশোরের ক্ষুধার চাইতে চতুর্গুণ প্রবল হইয়া উঠিল স্মৃতি; এবং নন্দকিশোর মনে মনে নিজের গালে কয়েকটা চড় বসাইয়া দিল। মুহূর্ত্তেক সেখানে সে দাঁড়ায় নাই—সদ্যঃধৌত অনাবৃত অতুলনীয় যৌবনব্যাপ্ত দেহ আর সর্ব্বাঙ্গের অবারিত সৌন্দর্য্য, তার ছায়া, পশ্চাতে ফেলিয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছিল, যষ্টির ভয়ে সারমেয়ের মতো, আতঙ্কে অন্ধ হইয়া; কিন্তু সেই ক্ষতি আর অতৃপ্তি আজ বুঝি ঘুচিবে, সবারই অজ্ঞাতে ঐ দর্পণের অভ্যন্তরে তিনি দেখা দিবেন এবং দেখিবেন। সেই দর্পণের দিকেই নন্দকিশোর ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, এই সহজ কথাটা তার মনেই রহিল না যে, তার এই আচরণ বলরামের অদ্ভুত এবং আপত্তিকর মনে হইতে পারে।

গৃহিণী কখন বলরামকে ইঙ্গিতে ডাকিয়াছেন তাহা নন্দকিশোর টের পায় নাই, হঠাৎ একবার চোখ তুলিয়া সে দেখিল, বলরাম ও-ঘরের পর্দ্দার কাছে দাঁড়াইয়া বোধ হয় কর্ত্রীর হুকুম শুনিতেছে।

সম্ভবতঃ উনি বলরামকে স্থানান্তরে পাঠাইতেছেন, সেদিন যেমন ঠাকুরকে মিছরি, যে-মিছরিতে মাছি বসে নাই সেই মিছরি আনিতে দোকানে পাঠাইয়াছিলেন, তারপর তাকে তাঁর মনের কথা বলিয়াছিলেন। সেদিনকার ঘটনার চরম পরিণতির সম্ভাবনায় নন্দকিশোরের বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল—তিনি কি বলিবেন, আর সে কি বলিবে! যে-হাতে করিয়া নন্দকিশোর মুখে ভাত তুলিতেছিল তার সেই হাতটা কাঁপিতে লাগিল।

কিন্তু বলিতে বা শুনিতে হইল না কিছুই, এবং হাতের কাঁপুনি হইল অপ্রাসঙ্গিক; কারণ, ঘটনা ঘটিল এই মাত্র যে, বলরাম ওদিককার পর্দ্দার নিকট হইতে এই পর্দ্দার নিকটে আসিয়া গুটানো পর্দ্দা নন্দকিশোরের চোখের উপর সটান করিয়া মেলিয়া দিয়া তার জায়গায় যাইয়া দাঁড়াইল। নন্দকিশোরের মুখ

লাল হইয়া উঠিল, তাহাকে যেন কেউ ইচ্ছা-পূর্ব্বক সহসা অপ্রস্তুতে ফেলিয়াছে। অপ্রস্তুতে পড়িয়া নন্দকিশোরের অল্প সময়ের জন্য অসন্তোষের উদ্রেক হইয়া একটু অশ্রদ্ধাই জন্মিল ; বিবাহিতা স্ত্রী ত' নন। শাসনের ভয়ে প্রেমাস্পদের সম্পর্কে পদ্দা'র অতো কড়াকড়ি না করিলেও চলিত।

কিন্তু সব সত্যের উপর এই সত্যই প্রবল যে, আশা আর আয়োজন করে মানুষ, ব্যবস্থা আর চালনা করেন ভগবান।

যেমন-তেমন করিয়া খাওয়া শেষ করিয়া নন্দকিশোর নামিয়া গেল অত্যন্ত অন্যমনস্কের মতো—পান হাতে লইয়া গালে দিতে তার ভুল হইয়া গেল, এবং গালে দেওয়া হইলই না, মমতার চিঠি আসিয়া তার হাতে পেঁাছিল—

মমতা লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু,

কয়েক দিন যাবৎ পত্র লেখ নাই। কেমন আছ জানিবার জন্য আমরা বড় উতলা হইয়াছি, মা বড় ভাবিতেছেন। পোষ্টকার্ডে একখানা পত্র লিখিতে বেশী সময় লাগে না। সে সময়ও কি নাই ? এত ব্যস্ত কোন কাজে জানি না। পত্রপাঠ তোমার সংবাদ দিবে।

আমরা ভালই আছি। ইতি—

সেবিকা মমতা।

যথাবিহিত ভৎ'সনা মমতার ঐ পত্রে ছিল, নন্দকিশোর পত্রের দিকে চাহিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া রহিল ; কাজটা অন্যায়ই হইয়াছে, খবর না দেওয়া উচিত হয় নাই। মা উৎকণ্ঠার যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন, মমতাও করিতেছে। উহাদের সে সর্ব্বস্ব, মনে হইতেই নন্দকিশোরের কোমল অন্তঃকরণ কাহার উপর অভিমান করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, এবং কেন চোখে জল আসিল, তাহা সে জানে না। তৎক্ষণাৎ সে ডাকঘরে ছুটিল ; ডাকঘরে দাঁড়াইয়াই পেনসিলে পত্র লিখিল মাকে ; লিখিল, সে ভালোই আছে ; পত্র না লেখার অপরাধ তিনি যেন মার্জনা করেন ; আর কোনদিন এরূপ ভুল হইবে না। পত্র পাইতে দু একদিন দেরী হইলেও তাঁহারা যেন ভাবিত হইয়া কষ্ট না পান। শরীর খারাপ হইলে সে অবশ্যই সংবাদ দিবে।

পত্র ডাকে দিয়াই নন্দকিশোরের মন হালকা হইয়া গেল ; ক্ষমা প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তব্যচ্যুতির অপরাধ এমন বাষ্পের মতো লঘু হইয়া গেল যে, অনুভব করার উপযুক্ত অস্তিত্বই তার রহিল না।

নন্দকিশোর ঘুমের আয়োজন করিতে লাগিল, অচিরেই ঘুমাইল এবং তিনটার পর ঘুম ভাঙিয়া আলস্যবশতঃ খানিক বিছানাতেই সে বসিয়া রহিল।

চাকরির চেষ্টা করা হইতেছে কই ! কর্ত্তব্যকর্ম্মে এত অবহেলা ত' ভালো নয় ! ভবিষ্যৎ আছে। এখানকার পনর' টাকা আজ আছে কাল নাই, পদ্মপত্রে বারিবিন্দুর মতো ; এটা ত' উপায় মাত্র, লক্ষ্য নয়। কিন্তু সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে।

যে-লক্ষ্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়া উচিত ছিল, তাহাকে ত্যাগ করিয়া সে পলায়ন করিয়াছিল। মনস্তাপ সহিতে হইতেছে কত ! মণীন্দ্র তাহাকে রক্ষা করিতে

যাইয়া বন্দী করিয়াছেন, হত্যা করিতেই উদ্যত হইয়াছেন। তবু উভয়ের চেষ্টায় পথ পাওয়া যাইবেই।

এখানে আসিয়াছিল বলিয়াই ত'।

ঠোঁট মুচড়াইয়া নন্দ একটু হাসিল, হাসিটুকু মুখে লইয়াই সে ঘরের বাহির হইয়া কল-ঘরে মুখ ধুইতে গেল, যাতায়াতে কল-ঘরটা একটু দূরেই পড়ে, প্যাসেজের মোড় ঘুরিয়া সেখানে ঢুকিতে হয়, কিন্তু শব্দ ঢোকে সোজা পথে! নন্দও ঢুকিল শব্দও উঠিল, সিঁড়িতে হিলউঁচু জুতার অতি-পরিচিত খটখট শব্দ; শব্দ দ্রুতবেগে নামিতেছে, নন্দকিশোর চমকিয়া উঠিল, তার সর্ব্বাবয়ব শক্ত হইয়া উঠিল, মন হইল সূচ্যগ্রের মতো তীক্ষ্ণ, একটা কিছু করিবার জন্য সে সচেষ্ট হইবার পূর্ব্বেই শব্দ মিলাইয়া গেল।

নন্দকিশোর ভাঙিয়া-চুরিয়া একবারে বসিয়া পড়িল। একি নির্ম্মম দৈব! অদৃষ্টের প্রবঞ্চনা ইহার চাইতে সাংঘাতিক কেমন করিয়া হইতে পারে! দু'মিনিট পূর্ব্বে নয়, দু'মিনিট পরে নয় ঠিক যে-সময়টিতে অনুপস্থিত থাকিলে সে দর্শনে বঞ্চিত হইবে, সেই সময়টি দেবতা তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছেন, কি কৌশলে জানাইয়াছেন তাহা সেই দেবতাই বলিতে পারেন। বিধাতা সত্যই বাম। অভিমানে নন্দকিশোরের ভারি কান্না পাইতে লাগিল, পৃথিবী শুষ্ক, বাসের অযোগ্য হইয়া গেল, এবং সে নিজে যে একজন পরম ভাগ্যহীন ব্যক্তি, তাহাও সে বিশ্বাস করিল।

আর, মুখ ধুইয়া আসিয়া দেখিল, তের-চৌদ্দ বছরের একটি সুখদর্শন কান্তিযুক্ত বালক তার দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে দেখিয়াই ছেলেটি পকেটে হাত ভরিল; একখানা ক্ষুদ্রায়তন কাগজ বাহির করিয়া তার হাতে দিল।

—কি এ?

—চিঠি।

উৎসুক হইয়া নন্দকিশোর চিঠির ভাঁজ খুলিল এবং পড়িল;

"কল্যাণীয়েষু,

ডাকিয়া পাঠাইলেই আপনি আসিয়া দেখা করিবেন, এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। আজ ৫টা হইতে ৫॥টার মধ্যে আসিবেন। কথাবার্ত্তা কহিব। ইতি।"

নিম্নে ঠিকানা ও তারিখ দিয়াছেন, কিন্তু নাম বা এমন কোন পরিচয় দেন নাই যাহাতে সেই কুটুম্বিনীকে পত্রলেখিকা মনে করা যায়।

'পুনশ্চ' দিয়া লিখিয়াছেন; "এই ছেলেটি ঐ সময়ে আমার দরজায় থাকিবে।"

নন্দকিশোর ছেলেটির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, আচ্ছা।

—নমস্কার। বলিয়া ছেলেটি কপালের কাছ বরাবর হাত তুলিয়া চলিয়া গেল এবং নন্দকিশোরের মনে হইতে লাগিল, ইহাকে' কোথায় যেন সে দেখিয়াছে, ইহাকেই কিংবা অনুরূপ চেহারার কোন বালককে। কিন্তু কোথায় দেখিয়াছে, গাড়ীতে না পথে না কারো বাড়ীতে তাহা মনে করিতে পারিল না। চোখ বুজিয়া নন্দকিশোর একটা স্থানকাল হাতড়াইতেছে এমন সময় কণ্ঠস্বরে তার মনোযোগ আকর্ষণ করিল বলরাম: "এমন আর দেখি নাই।"

নন্দকিশোর ধীরে ধীরে চোখ খুলিয়া দেখিল, বলরাম স্বাভাবিকভাবে দাঁত মেলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল ?

—যা মুখে এল তাই বলে গেলেন, গাল দিলেন খুব।

—কে ?

—কর্ত্রী।

—কেন ?

—বারান্দার রেলিং-এ শাদা কি লেগে ছিল ; বললেন, তুই চুন মুছেছিস্ এখানে। আমি বললাম, না। তিনি বললেন, মিছে কথা ফের যদি বলবি তবে অপমান হবি। মুছে ফ্যাল্ এখুনি। কিন্তু সেই শাদা জিনিসটা কি তা জানেন ?

—কি ?

—চড়ুইয়ের গু।

—কিন্তু তিনি ত' বাড়ীতে নেই ! বেরিয়ে গেলেন বলে মনে হ'ল।

—এখন নেই, তখন ছিলেন। আমি তখনকার কথাই বলছি।

—কোথায় গেলেন ?

—বাবুর খবর জানতে, বাবুরই এক বন্ধুর বাড়ী, সে-বাবু এ-বাবুর সঙ্গেই গেছেন। সেখানে যদি খবর এসে থাকে মেয়েদের কাছে ! বাবু ত' এখানে খবর দেন নাই !

ও। বলিয়া নন্দকিশোর নিঃশব্দ হইয়া রহিল। এঁর পরিচয় সেখানে অজ্ঞাত নাকি ! যে-মেয়েদের কাছে খবর জানিতে গিয়াছেন সে মেয়েরা কেমন ঘরের ? এদিকে ত' বাবুর টানও আছে দেখছি।

বলরাম বলিল, ঘুম পাচ্ছে। ঘরে ঘরে বড় বড় তালা লাগিয়েছেন, আমি লাগালাম সিঁড়ির দরজায়। গু তুলতে ঝাড়া একটি ঘণ্টা লেগেছে। অনেক ছিল জায়গায় জায়গায়। সব তুলেছি। দেখুন দেখি মজা, দোষ করবে চড়ুই, আর গাল খাব আমি।

—আচ্ছা, এস। বলিয়া নন্দকিশোর মুখ ফিরাইয়া হাই তুলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

কাঁটায় কাঁটায় সোয়া পাঁচটার সময় আহূত নন্দকিশোর সুসজ্জিত হইয়া স্নেহপূর্ণ আহ্বানের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বাহির হইল। তিনি যে-বাড়ীর 'কুটুম', নন্দকিশোর সেই বাড়ীরই প্রিয় গৃহশিক্ষক ; তাহার সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করা কিংবা তাহাকে সহায় গণ্য করা কিছুই বিচিত্র নয়। সুতরাং নন্দকিশোর বাহির হইল। আগে একদিন সে টেলিগ্রাম লইয়া বাবুর সন্ধানে যাত্রা করিয়াছিল সেই নিয়তির বশে যে-নিয়তির বশে খাদ্যান্বেষণে নির্গত ব্যাং লাফাইতে লাফাইতে

গিয়া পড়ে সাপের একেবারে মুখে! আজ সে-রকম কোন দুর্দৈবের আশঙ্কা নাই।

নিঃশঙ্ক নন্দকিশোরের পত্রোক্ত ঠিকানায় পৌঁছিতে পথ ভুল হইল না, দেরীও হইল না; এবং সুস্থচিত্তে সেই নম্বরের দরজায় উপস্থিত হইয়া সে দেখিল, কুটুম্বিনী কথা রাখিয়াছেন, সেই ছেলেটিকে দরজায় রাখিয়া দিয়াছেন।

"আসুন"! বলিয়া সে ব্যগ্রভাবে অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা করিল, সঙ্গে সঙ্গেই অগ্রসর হইল, নন্দকিশোর অসঙ্কোচে তার অনুসরণ করিল এবং কিছুতেই নিঃসন্দেহ হইতে পারিল না। ইহাকে কিংবা ইহার প্রতিরূপ আগে সে দেখিয়াছে কিনা।

নীচেকার যে ঘরটা দেখা যাইতেছে তাহাকে দুই দিকে বেষ্টন করিয়া প্রশস্ত দরদালান, সেই দরদালানের অপর প্রান্তে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি। ছেলেটি তাহাকে সিঁড়ির মুখে আনিয়া বলিল,—আপনি ওপরে উঠে যান্। সদর দরজা খোলা আছে, দিয়ে আসি। বলিয়া সে ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল।

নন্দকিশোরের ব্যস্ততার কারণ নাই।

এ-বাড়ীতে আসা যেন তার ব্যক্তিগত অবিরোধী অধিকার, এমনই একটা অকম্পিত ভাব লইয়া নন্দকিশোর সিঁড়ি ভাঙিতে লাগিল, কষ্টবোধ করিল না। উপরে উঠিয়া সে বারান্দায় পা দিতেই দরজা ছাড়িয়া সেই মহিলাটি প্রফুল্ল মুখে তাহার দিকে আগাইয়া আসিলেন; সাগ্রহে বলিলেন, আসুন, আজ কি ভাগ্য আমার! আমি পথ চেয়ে বসে' ছিলাম।

কণ্ঠস্বরের অকপট কোমলতায় তাঁর স্নেহের স্পর্শ পাইয়া নন্দকিশোর মুগ্ধ হইয়া গেল; বলিল,—আমাকে 'আপনি' বললে আমাকে খুব লজ্জা দেয়া হয়।

—তুমিই বলব এখন থেকে। তোমাকে সত্যিই পর মনে করিনে। ছেলের ওপর মায়ের যেমন তেমনি তোমার ওপর আমার মমতা জন্মেছে।

তাঁর স্নেহস্নিগ্ধ চোখের দিকে চাহিয়া নন্দকিশোর ভাবিতে লাগিল, এই অতুলনীয়া মাতৃমূর্ত্তির পদধূলি লইবে কি না! মায়ের ত' জাতিবিচার নাই, সন্তানের কেন থাকিবে! পদধূলি লইবার উদ্যম মনে হইলেও হাতের অবসর হইল না, যে হাতে পদধূলি লওয়ার নিয়ম তিনি তার সেই ডান হাতখানাই খপ্ করিয়া চাপিয়া ধরিলেন: বলিলেন, এস, বসবে। বলিয়া তিনি নন্দকিশোরকে এক রকম টানিয়াই ঘরে লইয়া গেলেন।

হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, বসো' চেয়ারে।

কিন্তু বসিবার পূর্ব্বে নন্দকিশোর খুব অবাক হইয়া গেল, ঘরের আসবাব প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্যের প্রশস্ততা আর উচ্ছল সৌন্দর্য্য আর কারুকার্য্যের যেন অন্ত নাই, চেয়ার রহিয়াছে, টেবিল রহিয়াছে, আলনা রহিয়াছে, আয়না রহিয়াছে, পালঙ্ক রহিয়াছে, সবগুলিরই চাকচিক্য যেন চোখ ধাঁধাইয়া মুহুর্মুহুঃ ঠিকরাইয়া উঠিতেছে, কেবল শোয়া-বসার আরামের জন্য টাকাকে টাকা জ্ঞান না করিয়া কাঠের উপর ঢালা হইতেছে!

কিন্তু সকলের চাইতে দ্রষ্টব্য ঐ পালঙ্ক, আড়ে-বহরে বিপুল ব্যাপার; আর তদুপরি বিস্তৃত শয্যা আরো দেখিবার মতো, যেন ফুলকাটা দুধের ফেনা ঢেউ

খেলিতেছে! বালিশ চাদর ওয়াড় এমনই বাহারের যে, আর গদি তোষোক এমনই পুরু যে, লাফাইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে, শখ মিটাইতে একবারের জন্য নয়, চিরদিনের জন্য।

লাফাইয়া নন্দকিশোর সে-বিছানায় পড়িল না; বলিল, আপনিও বসুন। বলিয়া সে চেয়ারে বসিল, তার শরীরের চাপে চেয়ারের গদি চার ইঞ্চি বসিয়া গেল।

—না, বাবা, বসবো না এখন। সারাদিন এত বসে থাকি যে, মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থেকেই ভারি আরাম পাই। বলিয়া মহিলাটি দাঁড়াইয়া থাকার কারণ দেখাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নন্দকিশোর বলিল,—তা বটে। এবং তারপরই সে দেখিল, তিনি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন; যেন একটা উৎকণ্ঠা লইয়া তাহার দিকে খানিক একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া বিষণ্ণস্বরে বলিলেন,—একটা কথা বলি তোমাকে।—না, থাক, এখনই বলবো না। একটু মিষ্টিমুখ করো আগে, তারপর শুনো। আগে শুনলে মিষ্টি মুখে দিতে তোমার ইচ্ছে হবে না। চা খাও ত'?

—আগে খেতাম না; ও-বাড়ীতে এসে এখন অভ্যাস হয়েছে।

কিন্তু কথাটা কি! শুনিলে আহারে অরুচি জন্মিবে, এমন কি-কথা ও'র থাকিতে পারে! অমঙ্গলের ভয়ে নন্দকিশোরের বুকে একটু কাঁপুনি দেখা দিল।

—বস একটু। একা থাকতে সংকোচ ক'রো না। আমি শীগ্‌গিরই আসছি। বলিয়া তিনি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

তারপর এক মিনিটও যায় নাই, নন্দকিশোর শুনিল, তার পিছন দিককার দরজা হইতে কে বলিতেছে: "মাষ্টার মশাই দেখুন, কে এসেছে?"

শিশুসুলভ সুকোমল নির্ম্মল কণ্ঠস্বর, কোনো শিশু যেন লুকাইয়া থাকিয়া আনন্দভরে তাহাকে কৌতুক ক্রীড়ায় আহ্বান করিতেছে।—কিন্তু তা নয়।

সুকোমল নির্ম্মল কণ্ঠস্বর কানে যাইয়া নন্দকিশোর মনের কোণে একটু হাসি ভাব লইয়া চোখ ফিরাইতেই বিদ্যুতের ঝলক লাগিয়া তার চোখ মুহূর্ত্তের জন্য যেন দৃষ্টিহীন হইয়া গেল।

তাহারই বাঞ্ছিতা, সেই রূপ, যে-রূপ সম্মুখে আসিলে চক্ষু রূপ দেখিতে দেখিতে রূপ দেখা বিস্মৃত হইয়া রূপের দিকেই নিষ্পলক হইয়া থাকিতে চায়।—নন্দকিশোরের চক্ষু যত অল্প সময়ের জন্যই হোক, নিষ্পলক ত' হইলই, তার উপর এমন কিছু বিপর্য্যয় ঘটিল যা যন্ত্রণা ভোগ করিতে অনিচ্ছুক মানুষের অদৃষ্টে যত কম ঘটে ততটা ভালো; তার নাসিকা ও কর্ণযুগল সমেত সমগ্র মুখমণ্ডল লাল হইয়া আগুন ছুটিতে, আর, জ্বালা করিতে লাগিল, ত্বকের নিম্নভাগ রক্তপ্রবাহে ফাটফাট করিতে লাগিল, হৃদপিণ্ডের অবস্থা যা হইল তা অবর্ণনীয়, শরীরের সমুদয় রক্ত ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছুটিয়া যাইয়া আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল তাহাতেই।

দেহাভ্যন্তরের ঐ ক্ষিপ্ত উদ্দামতা সহ্য করিতে করিতে একরকম অচেতন অবস্থাতেই নন্দকিশোর তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে নতচক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু নন্দকিশোরের ওঠা তাঁর মনঃপূত হইল না, হাসিয়া হাসিয়া আপত্তি প্রকাশ করিলেন; বলিলেন, উঠে দাঁড়ালেন যে হঠাৎ? পালাবেন নাকি?

নন্দকিশোর ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল, চেয়ারের গদি এবার চার ইঞ্চিরও বেশি বসিয়া গেল ; নন্দকিশোর তা টেরও পাইল না।

—হ্যাঁ, বসুন। বলিয়া তিনি অদূরবর্ত্তী একখানা চেয়ারে যাইয়া বসিলেন ; ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, একবার পালিয়ে যে শাস্তি দিয়েছেন আমাকে !

নন্দকিশোরের সংকট হইল বেজায়। যে রূপ নিষ্কম্প-প্রাণে প্রাণ ভরিয়া এবং নিষ্কম্প চক্ষে চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া আত্মাকে তৃপ্ত করিবার লালসায় সে মাকে প্রণাম না করিয়া এবং মমতার কাছে বিদায় লইতে বিস্মৃত হইয়া ছুটিতে ছুটিতে মণীন্দ্রবাবুর গৃহে আসিয়া উঠিয়াছিল সে রূপ এখন সম্মুখে বিরাজিত।

কল্পনার অঙ্কুশতাড়না চলিয়াছিল তখন, এখনও একটা অঙ্কুশতাড়না চলিতে লাগিল তার মনে, কিন্তু নন্দ চোখ তুলিতে পারিল না, তার সমস্ত উদ্যম আর অভীপ্সা যেন স্পষ্ট সত্য জাগ্রত জগতে নিস্তেজ হইয়া গেছে।

উঁহার অভিযোগ শুনিয়া নন্দকিশোরের আনত দৃষ্টি আরো ম্লান হইয়া গেল।

উনি বলিতে লাগিলেন, বাবু আমাকেই সন্দেহ ক'রে কত যে সাবধান হয়েছেন তা ত' দেখেইছেন। বাবুর ঘটে বুদ্ধি বড় কম।—আপনি যদি আমার দিকে চোখ তুলে না তাকান্ তবে আমি কথা বলব না। চোখ তুলুন, হুকুম শুনুন।

নন্দকিশোর নিষ্কম্প চক্ষু তুলিয়া তাঁর মুখের দিকে চাহিল, দৃষ্টি নিবিষ্ট হইয়া রহিল, সত্যই প্রাণ জ্যোৎস্নায় অমৃতে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

তাকিয়ে থাকুন, আমি কথা বলি। বাবু বলেন, "তুমি যখন কথা বলো তখন তোমাকে আরো সুন্দর দেখায়, এত সুন্দর যে স্থির থাকতে পারিনে।" আপনারও কি সেই মত ! স্থির থাকা কঠিন ?

নন্দকিশোরের মুখ ফুটিল ; বলিল, হ্যাঁ।

—কিন্তু অস্থির হ'লে ত' চলে না।—বলছিলাম বাবুর কথা। আমাকে না ধমকে, তাড়ানো উচিত ছিল আপনাকে, আপনি যখন ফিরে এলেন। আমার লোভেই ফিরে এসেছিলেন, নয় ? বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিলেন, এমনি ভঙ্গীতে সে-হাসি ফুটিল যে, নন্দকিশোর ভয় পাইয়া গেল, সেই হাসির আকর্ষণ ছিন্ন করিতেই হঠাৎ চোখের পাতায় পাতায় মিলাইয়া তাহাকে যেন সে তার জীবনের বাহিরে একটা অন্ধকারে রাখিয়া দিল, নিজেকে তার বিশ্বাস নাই।

তবু নন্দকিশোরের মুখ পুনরায় ফুটিল ; বলিল, হ্যাঁ।

অর্থাৎ সত্যই তাঁহারই লোভে সে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

—কিন্তু বাবু তা মোটেই বুঝতে পারেননি ; তিনি কেবল পাহারা বসাতে আর তালা লাগাতেই ব্যস্ত।—বলিয়া তিনি অতি মনোহর অনুচ্চ একটু হাসির লহরী তুলিলেন। উঠিয়া যাইয়া পালঙ্কে বসিলেন, তাকিয়া টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িলেন।

নন্দকিশোর তাকাইয়া তাকাইয়া তা দেখিল ; আর দেখিল যে, তাঁর দেহ অলস, বাহুযুগল স্কন্ধ পর্যান্ত অনাবৃত, অত্যন্ত শিথিল, আর, অত্যন্ত সুগঠিত, শয়নভঙ্গী স্বচ্ছন্দ।

মদিরচক্ষে দৃষ্টি হানিয়া তিনি বলিলেন, আগের দিনে ছিল ভালো ; মুনি ঋষিরা বনে জঙ্গলে বাস করতেন, আর দরকার বোধ করলে কুয়াশা কি অন্ধকার সৃষ্টি করে নিতে পারতেন। তা-ই না ?

নন্দকিশোর বলিল, পারতেন।

—আপনি যদি তা পারতেন তবে এখন কি সৃষ্টি করতেন, কুয়াশা না অন্ধকার ? বলিয়া তিনি এবার খিলখিল করিয়া হাসিলেন।

নন্দকিশোরের মুখমণ্ডল অসহ্য রক্তের চাপে যেন টাটাইয়া উঠিল।

—উঠি। আপনাকে সামনে ক'রে শুয়ে আছি দেখলে মা আবার ভাববে বেয়াদপি করছি।

—কৃষ্ণা ?—ভৎর্সনায় কঠিন হইয়া অতি নিকটেই সেই মায়েরই কণ্ঠ ধ্বনিত হইল।

নন্দকিশোর এতদিন পরে জানিতে পারিল, মেয়েটির নাম কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা অস্থিরভাবে উঠিয়া বসিল, কিন্তু ভৎর্সনায় লজ্জিত হইয়া কি ভয় পাইয়া নয়, হাসিতে হাসিতে পালঙ্কের ধার হইতে পা ঝুলাইয়া দিয়া ছেলেমানুষের মতো মনের সুখে পা দুলাইতে লাগিল।

মুহ্যমান অবস্থায় চোখ নামাইয়া নন্দকিশোর বসিয়াছিল—দোদুল্যমান পদপল্লব দুটি তার চোখে পড়িল, দুটি লীলায়িত অপরূপ শ্বেতপদ্ম যেন এই পায়েই সে স্বপ্নে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিল।

"শয়তান মেয়ে, তোমাকে এ-ঘরে আসতে আমি বারণ করিনি"—বলিতে বলিতে কৃষ্ণার মা একহাতে খাবারের থালা এবং অপর হাতে চা লইয়া নন্দকিশোরের সম্মুখে আসিলেন। তাঁর মন যে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে তাঁর মুখ চোখ দেখিয়া তা স্পষ্টই বুঝা গেল ; খাদ্য এবং পানীয় তিনি ধীরে ধীরে টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিলেন ; বলিলেন, বাবা এস, একটু মিষ্টিমুখ করো ; আমার ইচ্ছা পূর্ণ করো, অনুরোধ রাখো।

কোথায় যেন একটা অথই পাথারে নিমজ্জিত দিশেহারা নন্দকিশোর মুহূর্ত দুই নিজেকে, অর্থাৎ নিজের কোনো অংশকেই সঞ্চালিত করিতে পারিল না ; তারপর বলিল,—দিন।

কৃষ্ণা হঠাৎ নামিয়া দাঁড়াইল।

কৃষ্ণার মা কঠোর কণ্ঠে বলিলেন,—যাও। যাও এখান থেকে।

কিন্তু কৃষ্ণা মায়ের আদেশ ভ্রুক্ষেপও করিল না ; চমৎকার আনন্দের সঙ্গে নন্দকিশোরের ডান হাতখানা দুই করতলের ভিতর তুলিয়া লইয়া অসীম আগ্রহের সঙ্গে সে বলিল, আমাকে ক্ষমা করতে হবে। আপনার এই তরুণ বয়েস। আপনাকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু তা জানাবার সুযোগ কই !—বলিয়া নন্দকিশোরের হাত নন্দকিশোরের দিকেই ছুড়িয়া দিয়া সে চলিয়া গেল, দরজার কাছে যাইয়া বলিল—এখানে মা, ওখানে মণিবাবু।

তারপর আর কৃষ্ণাকে দেখা গেল না।

মণীন্দ্রের মুখে শোনা গল্প নন্দকিশোরের সমক্ষে স্বচ্ছ চাক্ষুষ বৃত্তান্তে

দাঁড়াইয়া গেল ; কৃষ্ণা যার মারফৎ মণীন্দ্রের খুড়তুতো ভগিনী তিনিই ইনি, কৃষ্ণার গর্ভধারিণী। অতর্কিতে তার ইহাও মনে পড়িল যে, সে বেশ্যালয়ে বসিয়া আছে।

নন্দকিশোর ধীরে ধীরে খাবারে হাত দিল, খাবার মুখেও তুলিল।

কৃষ্ণার মা বলিলেন,—"আমি কৃষ্ণার মা বটে, কিন্তু কৃষ্ণার আচরণে তাকে আমি প্রাণের ভেতর থেকে মেয়ে বলে স্বীকার করতে পারিনে, বড় বাধে। সে লোক ভালো নয়। তোমাকে দেখে অবধি তোমার ওপর কি যে একটা মায়া পড়েছে তা বলতে পারিনে। তোমার মুখখানা নেহাত ছোটছেলের মতো কাঁচা আর সরল। আমি মণির বাড়ীতে গিয়ে তোমাকে সেখানে দেখেই ভারি ভয় খেয়ে গেলাম। আমার মেয়ে কৃষ্ণা ঐ বাড়ীতেই থাকে, আমার ভয়ের কারণ হ'ল তাই। তোমাকে বলবো কি বাবা, মেয়েটা চিরকাল শয়তান। মণির বাড়ীতে যাবার আগে সে অবশ্য এখানে আমার কাছেই থাকত—তা হবে না, খাবার সবগুলো তোমাকে খেতে হবে : মাথার দিব্যি আমার।"

নন্দকিশোর খাবার খাওয়া বন্ধ করিয়া চায়ের দিকে হাত বাড়াইতেছিল, 'মাথার দিব্যি' শুনিয়া সে হাত ফিরাইয়া আনিয়া নিমকি একখানা তুলিয়া লইল।

কৃষ্ণার মা বলিতে লাগিলেন,—"ওকে আয়ত্তে রাখতে গিয়ে কত যে নাস্তানাবুদ হয়েছি তা বলবার নয়। ভারি নিষ্ঠুরের মতো স্বভাব ওর। রূপ আছে, রূপের জোরে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে মজা দেখা ওর মজ্জাগত অভ্যাস। কতজনকে যে মিছি-মিছি পাগল করেছে তার ইয়ত্তা নাই। মনে হয়, কাউকে ভালোবাসে না, বাসতে পারেই না, ঈশ্বর ওকে সে ক্ষমতা দেন নাই। তোমাকে মণির বাড়ীতে দেখে আমার তৎক্ষণাৎ মনে হ'ল, আর, ভারি ভয় হ'ল যে এই ভালো ছেলেটাকে বজ্জাত মেয়ে আমার কষ্ট না দিয়ে কিছুতেই ছাড়বে না। কষ্ট যে তুমি পাচ্ছ তোমার ধরণ দেখে তা-ও কতকটা আঁচ করতে পারলাম। তোমাকে সাবধান করতেই তোমায় ডেকেছিলাম। কিন্তু দৈব তোমার বিপক্ষে ব'লেই মেয়ে এসে হাজির হয়েছে, তুমি আসার কিছু আগেই তোমার যন্ত্রণার কারণ যা ও হয়েছে তা বলবার নয়। কিন্তু সব ভালো যার শেষ ভালো, এর পর আর তুমি যন্ত্রণা পাবে না, তোমার মন ফিরে গেছে, তুমি বুঝেছ সব, মণির ছেলেকে পড়াতে থাকো, আর তোমার ভয় নেই, দুঃখও থাকবে না। কেমন করেছি চা টা?"

নন্দকিশোর বলিল, ভালোই লাগছে।

—"আমাদের পরিচয় যে তুমি জানো তা আমি জানি। তুমি ও-বাড়ী থেকে পালালে মণীন্দ্র যা সন্দেহ করেছিলেন তা ঠিকই। তিনি কৃষ্ণাকে ধমকে বলেছিলেন, সে-ভদ্রলোক যদি আসে তবে তাকে আমি বলবই তুমি কে এবং কি, তাহ'লে আর তাকে নাচাবার আর কাঁদাবার সুবিধা হবে না। সে-লোকটা প্রকৃত সৎলোক, পরিচয় শুনলে ঘেন্নায় সে মুখ দেখতে চাইবে না ; কিন্তু।"

তিনি চুপ করিতেই নন্দকিশোর আবার তাঁর মুখের দিকে তাকাইল। তিনি বলিলেন, "কিন্তু তুমি তা পারো নাই। পারা কঠিনই। কৃষ্ণাকে বিশ্বাস করে, তুমি কষ্টই পেয়েছ।"

চা পান শেষ করিয়া নন্দকিশোর উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, আমি এখন যাই।

—আচ্ছা, এস। চেনাশোনা হয়ে গেল, এস মাঝে মাঝে। আমাকে ঘেন্না করো না ত' ?

—না। আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন, শৃঙ্খলমুক্ত করে নবজীবন দান করেছেন, সুখী করেছেন। ঘেন্নার ভাব মনে রাখলে আমার চরম অকৃতজ্ঞতার পাপ হবে। বলিয়া নন্দকিশোর দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

তখন তার প্রাণে একমাত্র সত্য হইয়া উঠিয়াছে তাহারই মমতা ; মমতার মুখচ্ছবি অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া আছে, তার কণ্ঠ জিহ্বা হৃদয় ব্যাপিয়া নিঃশব্দে ধ্বনিত হইতেছে মমতারই স্নিগ্ধ নামটি।

———

রোমন্থন

পরিচ্ছেদ—১

সত্যেন্দ্র দত্তের ষ্ট্রীটের ১৭ নং বাড়ীতে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেছে…

রামহরি, লছমন আর কেদার উপর্য্যুপরি একতালা হইতে তেতালায় অধিরোহণ করিয়া তখনই অপর ফরমাইসে একতালায় অবতরণ করিতেছে।

রাশিকৃত চট কিনিয়া চেয়ার প্রভৃতি কাষ্ঠাসনগুলি মুড়িয়া সেলাই করান হইয়াছে—'লরি' ডাকিয়া সেগুলিকে রেলওয়ে ষ্টেশনে লইয়া বুক' করিয়া দিলেই হয়।

সঙ্গে কোন কোন দ্রব্য লইতে হইবে তিন ভাই তার তিনটি স্বতন্ত্র ফিরিস্তী করিয়া পরস্পর মিলাইয়া লইতেছিলেন…

বড়বাবু বলিলেন—পিন-কুশনটা আমাদের কারো ফর্দ্দে'ই নেই—ও একটা দরকার।

ছোটবাবু বলিলেন,—নিশ্চয়। ওরে—

তৎক্ষণাৎ লছমন আসিয়া দাঁড়াইল। ছোটবাবু বলিলেন,—একটা পিন-কুশন নে আয়, আর এক সেট পিন।

"যো হুকুম" বলিয়া পয়সা লইয়া লছমন পিন-কুশন আর পিন আনিতে গেল।

কাচের গ্লাস, তোয়ালে, ফাউণ্টেন পেন, কালির দোয়াত 'হাফ এ ডজন', বুরুশ (মাথার, জুতার আর দাঁতের)—তিনখানা করিয়া, স্নো, হেয়ার অয়েল, রেজর, টুথ পেষ্ট 'পিয়ার্স' সোপ, জুতার কালি প্রভৃতি খুচরা জিনিষ গুছাইয়া দিবার ভার বড় বউয়ের উপর আছে।

তিনি ফর্দ্দে'র সঙ্গে মিলাইয়া প্রত্যেকটি দফায় ঢেঁরা দিয়া দিয়া তিনটি এ্যাটাচিতে সমস্ত জিনিষ তুলিয়া দিয়াছেন; ও-দিকটায় একরকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে।

ইঁহাদের উদ্যোগ উদ্বেগ আড়ম্বর দেখিয়া মনে হয়, কোথাও যুদ্ধ বাধিয়াছে—ইঁহারা তিন ভাই সেই যুদ্ধে চলিয়াছেন, এবং বরফ ও আইসক্রীম সদ্যঃই সঙ্গে লওয়া যাইতেছে না বলিয়া ইঁহাদের মনস্তাপের অন্ত নাই।

মা আসিয়া বলিল,—সঙ্গে নিচ্ছিস কাকে?

বড় পুত্র বলিলেন,—রামহরি যাবে।

—ও আবার নড়াচড়ার কাজে তেমন পটু নয়। শিল নোড়া দিয়ে ওকে বসিয়ে দাও তিন-সের তেজপাতা পিষে তুলবে।

—সেখানে ত' ছুটোছুটির কাজ বিশেষ থাকবে না।

মা বলিলেন,—ঝিকে মসলা বাছতে বসিয়ে দিয়েছি। ধুয়ে বেছে দেবে।

বড়বাবু হাসিয়া বলিলেন,—ও-সব থাক, মা। ওতে ত' আমাদের শেষ পর্য্যন্ত চলবে না।

—ফুরুতে ফুরুতে সরকার-মশাইকে দিয়ে আবার পাঠিয়ে দেব। যে নোংরা ডালপালা সমেত জিরে-মউরীগুলো বিক্রী হয়, তা খেলেই অসুখ করবে।

ছোটবাবু বলিলেন,—কিছু মাখন নিলে হ'ত।

অমনি রামহরিকে ডাক পড়িল—

কাহারো ইচ্ছা এখন অপূর্ণ থাকিলে যেন একটি দুঃখের দহন আমরণ সহ্য করিতে হইবে…

রামহরি টাকা লইয়া কৌটার মাখন আনিতে গেল…তখন-তখনই আনিতে হইবে—বিলম্বে বিস্মৃত হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

মেজবাবু বলিলেন,—বিছানার চাদর, রুমাল আর বালিসের অড়গুলো ধুয়ে এসেছে ত', মা?

মা বলিলেন,—এসেছে; বড় বৌমার হাতে দিয়েছি। বড় বৌমা ত' তার বায়না এখনো থামায়নি রে। সে যাবে বলছে।

বড়বাবু বলিলেন,—পরে। আমরা গিয়ে রকম-সকম বুঝি, তারপর লিখব; গিয়ে কিছুদিন থেকে আসবে।

—তোদের খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হবে। ছোটর ত' বিছানার চাদর শোবার আগে ঝেড়ে না দিলে সে রাত্রে আর ঘুম হয় না। তুই কেন যাচ্ছিস—তুই থাক। বলিয়া গৃহিণী ছোট ছেলের দিকে আকুল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

ছোটবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—ঐ করেই ত' তোমরা মায়েরা বাঙালী ছেলের মাথা খাও…

যেন সে মাথা খাইবার চেষ্টাকে চিরকাল প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছে, অর্থাৎ আদর লইতে চাহে নাই।

গৃহিণী হাসিতে লাগিলেন; বলিলেন,—ভাল করে ভেবে দেখ—কিছু দরকারী জিনিষ নিতে ভুল হ'ল না ত'। সেখানে গিয়ে আবার মুসকিলে পড়বি।

তিন ভাই-ই সমস্বরে বলিলেন,—কিছু ত' মনে পড়ছে না।—

বড়বাবু স্বতন্ত্রভাবে বলিলেন,—সেবার—বলিয়া সুরু করিয়া তিনি যাহা বলিলেন, তাহার সারাংশ এই যে, সেবার শিলং-এ যাইয়া যাত্রার পূর্ব্বকালীন তাঁহারই দূরদর্শিতাবশতঃই কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নাই; সেই সূত্রে বড়বাবু কিছু আত্ম-প্রশংসাও করিলেন—

কিন্তু তাঁর দর্পহারী ভগবান ছিলেন তাঁর মায়ের মনে; মা বলিলেন,—সানলাইট সোপ নিয়েছিস?

বড়বাবু জিব কাটিলেন—

মা বলিলেন,—ঐ দেখ…রুমাল তোর দু'বেলা কাচতে হয়—কি মুসকিলেই পড়ে যেতিস।

তৎক্ষণাৎ দু'ডজনের দাম দিয়া কেদারকে দোকানে পাঠান হইল।

এই ভুলটা ধরা পড়ায় তিনজনেই চিন্তান্বিত হইয়া বৈঠকখানায় নামিলেন—তবে এখনও ছত্রিশ-ঘণ্টা সময় হাতে আছে।

ব্যাপার যৎসামান্যই—

কিন্তু হুলস্থূল তোড়জোড় দেখিলে তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

বাবু-তিনটির পিতৃদেব জীবিত নাই; জ্যেষ্ঠতাত আছেন এবং তিনি আজ একযুগ—বার বৎসরে একযুগ—ইংলণ্ডে প্রবাসী। পত্রযোগে তিনি কুশল সংবাদ

প্রদান এবং গ্রহণ করেন। পূর্ব্বের ডাকে তাঁহার যে পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে, তিনি পার্লামেণ্ট মহাসভার আসন প্রার্থী হইতেছেন।

এবং সেই পত্রেই, কি কারণে কে জানে, ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে তিনি আদেশ করিয়াছেন—"পল্লীগ্রামে ফিরিয়া যাও।" সেখানে যাইয়া কি করিতে হইবে তাহার "প্রোগ্রাম অর্থাৎ খসড়া এবং ছক" তিনি গ্রামের ঠিকানাতেই পরে পাঠাইবেন লিখিয়াছেন।

কলিকাতা হইতে বিয়াল্লিশ মাইল দূরে মাননগর গ্রামে ইঁহাদের আদি নিবাস, ইঁহাদের পিতামহ সেই পল্লীভবনের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি এবং তাঁহার পত্নীও চিতায় ওঠেন কলিকাতায়—কৃতী পুত্রের গৃহে কর্তৃত্ব করিতেন তাঁহারাই।

যাহা হউক, চিরকুমার এবং অত্যন্ত ধনবান জ্যেষ্ঠতাত বিলাত হইতে যে আদেশ করিয়াছেন তাহা অমান্য করা যায় না।

কলিকাতা কম্পিত করিয়া তাই এই আয়োজন আর দৌড়াদৌড়ি, আর তার সঙ্গে এই জগদ্ব্যাপী দুশ্চিন্তা।

তিন ভাই বৈঠকখানায় নামিয়া দেখিলেন, কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে পাঁচটা, আর ডাক্তার মনোজবাবু এবং 'বাস-ওয়ালা' ক্ষিতিনাথবাবু আসিয়া বসিয়া আছেন, প্রত্যহই তাঁরা সাড়ে-পাঁচটায়, যেখানেই থাকুন, এইখানে আসেন।

ডাক্তারের সাইকেল দেখিয়াই ছোটবাবুর মনে পড়িয়া গেল, তাঁহাদের সাইকেল তিনখানা 'ওভারহল' করিতে দোকানে দেওয়া হইয়াছে।

লছমনকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি দোকানে পাঠাইয়া দিলেন; বলিয়া দিলেন, কড়া তাগিদ দিয়ে আসবি—কাল বিকেলেই চাই।

মনোজবাবু বলিলেন,—যাচ্ছ ত' আশা করে আর আড়ম্বরে করে, আবহাওয়া জান কি দেশের?

বড়বাবু চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন,—কেন, কি রকম আবহাওয়া সেখানকার?

—জানিনে তা, তাই জিজ্ঞাসা করছি; সে দিকে খোঁজে নিয়ে যাচ্ছ কি না! "লুক্ বিফোর ইউ লিপ।"

মেজবাবু বলিলেন,—মায়ের ভুল হবার যো নেই। তিনি সরকার-মশাইকে পাঠিয়ে খোঁজ নিয়েছেন, সেখানকার স্বাস্থ্য ভালই চলছে।

মনোজবাবু বলিলেন —কিন্তু 'জার্ম" লোকের বিছানাতেই বজ্‌বজ্ করছে—বিছানা ত' কাচে না, রোদে দেয় না কোনো কালে!—আত্মীয়তা করে হঠাৎ তাদের বাড়ীতে গিয়ে উঠো না যেন।

বড়বাবু বলিলেন,—না, তা উঠবো না।

—কিছু ওষুধ নিয়ে যেও; পিত্তনাশক আর মৃদু-বিরেচক ওষুধ দিয়ে কুইনিনের কয়েকটা পিল করে দেবখন, নিয়ে যেও।

বড়বাবু বলিলেন,—তা যাবো।

—মশারি নিতে ভুলো না—পাড়া-গাঁয়ের মশা খুব সেয়ানা! খুব শক্ত মশারি নিও, যেন সুতো ঠেলে ঢুকতে না পারে।

বড়বাবু বলিলেন,—আচ্ছা।

—চানও করো গরম জলে, জল ফুটিয়ে।

বড়বাবু বলিলেন,—হ্যাঁ।

ক্ষিতিনাথ বলিলেন,—শুনেছি পাড়াগাঁয়ে এমন ইঁদুর আছে যার ন্যাজের রোঁয়ায় রোঁয়ায় বিছুটির বিষ—ন্যাজটা যদি একটিবার মানুষের গায়ে ছোঁয়াতে পেরেছে তবে গা চুলকেই মানুষ বেচারা মারা যাবে।

ডাক্তার মনোজবাবুর ডাক্তারী কথায় বড়বাবু অবোধের মতো সায় দিয়া চলিতেছিলেন—যেন বৃহত্তর ব্যক্তির নিকট বালক প্রথম শিক্ষালাভ করিতেছে—কোনো কথায় 'না' বলিলেই শিক্ষক চোখ রাঙাইবেন।

কিন্তু ক্ষিতিনাথবাবুর ইঁদুরের কথায় বড়বাবু হাসিয়া ধমক দিয়া প্রতিবাদ করিলেন; বলিলেন,—ধেৎ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার অভিজ্ঞতা তোমাদের মতো নয়; তোমাদের পশ্চিম তো লিলুয়া আর পাড়াগাঁ বিদ্যেসাগর বাটী। আমার মামার শালার বাড়ী যজ্ঞিনগর—আমি গিয়েছি সেখানে, দেখেছি সে ইঁদুর। বর্ণনা নেও না আমার কাছে—সমস্ত গা কটাসে—পিঠের ওপর তিনটে কালো দাগ, ন্যাজ এই ঝাঁকড়া…তার চোখের তারা কপালের সিকি ইঞ্চি ওপরে—

মনোজবাবু বলিলেন,—তুমি কাঠবেড়ালী দেখেছিলে—তাদেরই পিঠের ওপর কালো তিনটে দাগ থাকে।

ক্ষিতিনাথ কিছুমাত্র দমিলেন না—বলিতে লাগিলেন,—তা ছাড়া বুনো বেড়াল আছে আবার একরকম, চিড়িয়াখানায় সে 'স্পিসিস' নেই—তার থাবার এমনি জোর যে, কাঁটাল গাছের গুঁড়ি ধরে নাড়া দেয় আর এঁচড়গুলো বোঁটা ছিঁড়ে ধপ্ ধপ্ করে মাটিতে পড়ে।

বড়বাবু শুষ্কমুখে বলিলেন,—মানুষ মারে তারা?

—বাগে পেলে ছাড়ে কি! আমার মামার শালার আট বছরের ছেলে ন্যাড়াটাকে তাড়া করেছিল। বলিয়া ক্ষিতিনাথ বাঘ লাফাইয়া শিকারের উপর যেমন করিয়া পড়ে তাহারই একটা অক্ষম অনুকরণ করিলেন।

ছোটবাবু বলিলেন, বন্দুকটা নিতেই হবে।

চা আসিয়া পড়িল। এবং দু'-এক মিনিট অগ্রপশ্চাৎ গণনাথ, ক্ষেত্রমোহন, সতীভূষণ প্রভৃতি আসিয়া পড়িলেন, চায়ের সভায় নিত্য তাঁহারা উপস্থিত থাকেন।

গণনাথ চায়ের কাপ তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—তোমার জ্যাঠামশায়ের উদ্দেশ্যটা কি?

ভ্রাতুষ্পুত্রগণ কি জবাব দিতেন তার ঠিক নাই।

তাঁহাদের হইয়া মনোজ ডাক্তার বলিলেন,—পার্লামেন্টে সিট্ না পেলে তিনি দেশে ফিরবেন; ইণ্ডিয়ায় এসে কলকাতায় তিনি বাস করবেন না, দেশের বাড়ীতে থাকবেন; ভাইপোদের দিয়ে আগে তার স্বাস্থ্য পরখ করে নিচ্ছেন: আর বাড়ীটাতে বহুদিন লোক বাস করেনি, তারও একটা ঠেকা আছে, তাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে কিছুদিন মানুষ বাস করিয়ে নিচ্ছেন। শুনিয়া তিন ভাইয়ের তাক লাগিয়া গেল।

বড়বাবু বলিলেন,—তাই কি !

—কিম্বা এখানকার খবরের কাগজের হুজুগটা তিনি ধরে নিয়েছেন ; দেশের উপর তাঁর দরদ আছে যথেষ্ট জানি। বলিয়া সতীভূষণ পুনরায় বলিলেন, পল্লী-গ্রামে নিরিবিলি আরাম কত ! তবে টেকা কঠিন, সহরের লোক পাড়াগাঁয়ে গিয়ে কেবল তুলনা করে কষ্ট পায়, তার অর্ধেক আত্মা পড়ে থাকে সহরে। তার অসুখ বিসুখে।

—কলকাতা থেকেই ডাক্তার চালান দে'য়া যেতে পারে, এই ত' বিয়াল্লিশ মাইল রাস্তা ! আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক যে সংকটে আছে তার অংশ দেখেই অত ভয় পাওয়া ঠিক নয়। বলিয়া ক্ষেত্রমোহন হাসিতে লাগিলেন।

জ্ঞানচন্দ্র বলিলেন,—আমি একবার গিয়েছিলাম কলকাতার বাইরে একটা কাজে, অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম, সকাল বেলা পেঁাছে বৈঠকখানায় বসে আছি, গৃহকর্ত্তাও আছেন, তিন চারটে ছেলে-মেয়ে এল, বোধ হয় আমাকেই দেখতে ; কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করলেন, ওরে পিলু খেয়েছিস ? তারা কেউ বললে, একটা খেয়েছি, কেউ বললে, দুটো খেয়েছি। "এখন মুড়ি খেগে যা"—বলে কর্ত্তা তাদের ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন।

ছোটবাবু বলিলেন,—আপনি জ্বর নিয়ে ফিরে এসেছিলেন বুঝি ?

—হ'ত, কিন্তু দৈবাৎ বেঁচে গিয়েছিলাম। কর্ত্তা বললেন, আপনি চান করবেন না, আমি বললাম, চান না করে আমি খেতে পারিনে। চান করতে গেলাম, খুব ঘটা করেই যাওয়া গেল ; ভদ্দরলোক তাঁর চাকরটাকে আমার সঙ্গে দিলেন। আমার টাওয়েল আর ধুতি আর চটি বগলে করে সে আমার সঙ্গে এল। পুকুরের ঘাটে দাঁড়িয়ে খানিক কি ভাবলাম জানিনে, জল টলটল করছে দেখলাম, আর গা সিরসির করছে বোধ হ'ল, কিন্তু জলে পা-নামাতেই তলা থেকে কি উঠতে লাগল জানিনে, জলে নামার নিষেধ জলের তলাতেই ছিল। প্রথমে জলের নীচের একটা বিজবিজ শব্দ হ'ল, তারপর খানিকটা কালো রঙের পাঁক উঠে জলটা ঘুলিয়ে গেল, আর এমন একটা গ্যাঁজা-গন্ধ নাকে এল।

বলিয়া জ্ঞানচন্দ্র নাক সিটকাইয়া রহিলেন।

—তারপর ?

—চান করা আর হ'ল না, পরের ট্রেনেই দে দৌড়।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, জলের কথায় আর একটা কথা মনে পড়ে গেল, পাড়াগাঁয়ে আর একটি উৎপাত আছে।

ছোটবাবু—কি উৎপাত ?

—তোমাদের বাড়ী কি নদীর ধারে ?

—হুঁ।

—জলে নেম না খবরদার ! এক চাষী কোথায় যেন পাট ধুয়ে জল থেকে উঠে দেখে একটা জোঁক তার নাইয়ে এক মুখ লাগিয়ে কোমর বেড়ে ও-মুখটাও নাইয়ে লাগিয়াছে, আর এত রক্ত খেয়েছে যে, লোকটা অল্পক্ষণ পরেই অজ্ঞান হ'য়ে গেল।

মেজবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—ড্যাঙায় ওঠে না তারা।

—না।

সতীভূষণ বলিলেন,—ঘাসে ঘাসে বেড়ায় এক রকম জোঁক ; তারা অত মারাত্মক নয়, গরু-বাছুরের নাকে থাকে খুব।

মনোজ ডাক্তার বলিলেন, বেতো-রুগীর ব্যথার জায়গায় জোঁক লাগায় শুনেছি, সে বোধ হয় ঐ জলের জোঁক, যত টানো তত সে লম্বা হবে।

—আহা, কেন ভয় দেখাচ্ছ ওদের ! বলিয়া ক্ষিতিনাথ হাসিতে লাগিলেন।

বড়বাবু বলিলেন, না না ; আর কি কি বিষয়ে সাবধান হ'তে হবে, যার যা জানা আছে বলো। বলিয়া বড়বাবু উপদেশের জন্য সকলেরই মুখের দিকে চাহিলেন।

গণপতি বলিলেন, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ক'রো। তবে সেখানকার মানুষ কেমন তা কারুরই জানা নেই, তারা উল্টে কেৎকা না হ'য়ে ওঠে এইটে দেখো।

ছোটবাবু বলিলেন,—মানুষকে আমাদের ভয় নেই।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, তোমরা এগোও, আমরা সদলবলে গিয়ে পড়ব একদিন, শিকার খুব মেলে শুনেছি, বালুহাঁস চকা, জংলা-শুয়োর।

ছোটবাবু বলিলেন,—বন্দুক আমি নিচ্ছি।

মনোজ ডাক্তার বলিলেন, থার্ম্মমিটার নিয়েছ ত' একটা ?

—ইস্‌।—কেদার ? লছমন ? রামহরি ? লছমন ছিল না।

কেদার আর রামহরি দু'দিক হইতে দৌড়াইয়া আসিল।

ছোটবাবু বলিলেন,—মা'কে বলু গিয়ে, একটা থার্ম্মমিটার নিতে হবে।

বড়বাবুর সেই শিলং যাত্রার পূর্ব্বকালীন দৃষ্টি-কুশলতা নাই। তিনি মনস্থ করিলেন, আর একবার তিনজনে মিলিয়া ধীরচিত্তে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

চা-পান শেষ করিয়া এবং 'বিভু'য়ে' উহাদের খুব সাবধানে থাকিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া বন্ধুগণ প্রস্থান করিলেন।

রাত্রে বড়বৌ বড়বাবুর কাছে ধন্না দিয়া ফল পাইলেন না, তাঁর আয়ত চক্ষু দু'টি জলপূর্ণ হইয়া রহিল, এবং বড়বাবুর রাক্ষস-প্রকৃতি জোঁকের গল্পে তিনি কর্ণপাতও করিলেন না।

বড়বৌ, বড়বৌ হইলেও তাঁর বয়স মাত্র সপ্তদশ বৎসর।

পরিচ্ছেদ—২

"লোক্যাল" ইস্ত্রালয় ইষ্টকালয়ে রাজমিস্ত্রী এবং উঠানে মজুর লাগিয়াছে দেখিয়া অভয় ভিতরে গেল ; দেখিল, একখানি বহুমূল্য পালঙ্কে বার্ণিস্‌ লাগান হইতেছে। দেখিয়া অভয়ের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিল, কিন্তু হাসি সেটা নয় ; হাসির আভা থাকে, প্রবাহ থাকে, বিস্তৃতি থাকে ; কিন্তু অভয়ের ঠোঁটের সেই আন্দোলনে সে সব কিছু নাই, যেন ভিতরের একটি অনির্ব্বচনীয় ভাব-নির্গমের একটা নির্ব্বিকার পথ সেটা ; বিকার যা তা ভিতরে।

অভয়ের পিতা অঘোর প্রথম বয়সে হাসিয়াছিল, তাহাকে হাসি বলা যায়। সুকুমার ঋজু স্বচ্ছ রেখাপাত করিয়া সে হাসি স্ফুটিত, আয়াসহীন অথচ প্রচুর, সে হাসি বিকশিত হইয়া মানবাত্মার চিরন্তন সন্তোষের মাঝে একটি কল্যাণের মূর্ত্তিতে মুদ্রিত হইয়া যাইত। জগৎলক্ষ্মীর হাসি সেই হাসির অঙ্গে প্রতিফলিত হইত; সে হাসিতে কপট কলাবত্তা ছিল না, কিন্তু উন্মোচিত বক্ষের অহৈতুকী উদারতা ছিল।

সে হাসি তার প্রৌঢ়াবস্থায় বক্র হইয়া উঠিয়াছিল। হাসির শৈশব আছে, যৌবন আছে, বার্দ্ধক্য আছে; কিন্তু হাসি যখন অসহায় হইয়া আতঙ্কে বাঁকিয়া চুরিয়া দেখা দেয়, হাসির তখন মুমূর্ষু অবস্থা, অঙ্গুরীর মতো চতুর্দ্দিকে নিরন্ধ্র কারায় বেষ্টন করিয়া অন্ধকার যখন দীপশিখাটিকে বায়ুর তীর মারিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ আঘাত করিতে থাকে, এ হাসি তখনকার সেই দীপশিখাটির মতো, মৃত্যুর দিকে চলিয়াছে।

চিতার অঙ্গারে একবিন্দু অগ্নির মতো নির্জীব এবং করুণ একটি হাসি পুত্রকে প্রদান করিয়া অভয়ের পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছিল—ঐটিই ছিল তার উন্মথিত জীবনের সার বস্তু।

পিতার দেওয়া হাসিটি অভয় ধারণ করিয়াছে। এই হাসিটি বহুদিনের, প্রায় পঁচিশ বৎসরের পুরাতন। অভয়ের পিতা সত্তর বৎসর বয়সে পরলোকগমন করে; কিন্তু নিজের এই দীর্ঘায়ু করুণাময়ের শুভ-দান বলিয়া আদরের চক্ষে অঘোর তাহাকে দেখে নাই। অভয় দেখিত কেবল বাপের মুখের তীব্র হাসির ভঙ্গীটি, যমের কর্ণে কুণ্ডলের দ্যুতির মতো ভয়াবহ সেই হাসি।

এরা চাষী পরিবার। মাটিই ইহাদের লক্ষ্মী, জননী। জননীর স্তন্যের মতো মাটির বুকের শ্যামল রস-উৎসই উহাদের জীবন, যখন আনন্দ আসে তখন মাটির স্বর্ণোজ্জ্বলা মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আসে—যখন লুটাইতে হয় তখনও এই মাটির উপরেই বুক চাপিয়া লুটায় তারা, মাটি তাদের চোখের জল, বুকের আগুন শুষিয়া লয়। ত্রাসে অন্ধকার দেখিয়া চোখের পাতা যখন অবশ হইয়া বুজিয়া আসে তখনও মাটির জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তিরই তারা ধ্যান করে।

জগন্মাতাকে মনে করিতে তাদের মাটিকেই মনে পড়ে। দশভুজা প্রতিমা মৃত্তিকার; কালী, তিনিও মাটির; সব একাকার—মাটি ছাড়া আর কিছু নাই।

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলে মাটির রূপে স্বর্গ আলোকিত হয়; দশভুজার দশহস্ত দশদিকে প্রসারিত হয়। কিন্তু সেদিন আর নাই, সেদিনের কথা ভাল করিয়া স্মরণই হয় না; মাটির ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া তার রুক্ষ মূর্ত্তিই দিগন্ত পর্য্যন্ত ধ্বক্ ধ্বক্ করিতেছে, তাহাতে প্রাণ নাই।

অভয়ের পিতা পৃথিবীর এই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া কেমন করিয়া একটু হাসিত, দেখিয়া লোকে ভয় পাইত; কিন্তু অভয় মানুষকে ভয় দেখাইতে বাপের স্মরণীয় হাসিটি আপন ওষ্ঠে স্থাপিত করে নাই, ভিতর হইতে সে হাসি আপনিই আসিয়াছে।

বাপ যখন মারা যায় তখন অভয় বুঝিত সবই; পয়সার অভাবে রোগীর চিকিৎসা হয় নাই, রোগী উপযুক্ত পথ্য পায় নাই।

অভয় শুনিয়াছিল, বাবুরা তিনভাই তাঁহাদের পল্লীভবনে আসিবেন।

যে লোকটি পালঙ্কে বার্ণিশ লাগাইতেছিল সে একবার মুখ ফিরাইয়া অভয়কে দেখিল ; তারপর নিজের কাজের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—বস, শুয়ে একটু ঘুমোবে কেবল, তারই জন্যে খরচ কত, তার তোয়াজ কত।

অভয় চৌকাঠের উপর বসিয়া বলিল,—হবে না ! ও'রা ভাবেন কত !

অভয়, গুজব নয়, ভুক্তভোগীর মুখেই শুনিয়াছিল, বাবুরা কলিকাতায় থাকিয়াও পল্লীর কথা ভাবিয়া একদিকে গলদ্‌ঘর্ম্ম অন্যদিকে দিশেহারা হইয়া যান—হামেসাই তাঁদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়।

রঙের মিস্ত্রী বলিল,—ভাবেন বই কি। মাথা আছে ভাবেন ; পা থাকলে ছুটতেন, হাত থাকলে লুফতেন···

—কি ?

—কদলী। বলিয়া লোকটি অভয়ের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল,—ভাল করে বস। তামাক খাই।

কিন্তু অভয়ের আর বসিবার ইচ্ছা রহিল না। বাবুদের প্রতি তার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব না থাকিলেও এমন অন্ধ-আক্রোশ নিশ্চয়ই ছিল না যে, প্রকাশ্যে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে সে কদলী প্রদর্শন করিতে পারে। তার ভদ্র-অন্তরের কাছে বেতনভোগী মিস্ত্রীর এই অকারণ কটূক্তি অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে হইল ; বলিল,—তুমি খাও, আমি আসি। বলিয়া সে উঠিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

—চল্লে ? এই গ্রামেই বুঝি তোমার বাড়ী ?

—হুঁ। তোমার ? আমার বাড়ী গোয়াড়ী। এই জঙ্গলে আমায় পাঠিয়েছে খাটে বার্ণিশ আর কাঠে রং করতে ! তাতেই ত' রাগ করছি। না আছে খাবার দিশে, না আছে শোবার সুখ। মশা কত। দিনমানেও—সত্যি সত্যিই উঠলে যে হে !

—হ্যাঁ, যাই। বাবুরা আসছেন কবে ?

মিস্ত্রী মুখে কিছু বলিল না ; রং-মাখা হাত নেতি সমেৎ উল্টাইয়া দিশেহারার ভঙ্গী করিল···তারপর জিজ্ঞাসা করিল,—এ বাড়ী কতদিনের জান ?

—একশ' বছরের হবে।

দৃষ্টি ঊর্ধ্বদিকে একবার উৎক্ষিপ্ত করিয়া মিস্ত্রী বলিল,—সেকেলে কাঠ কিনা—কড়ি বরগা ঠিক আছে। এ বাড়ীতে লোক ঢোকেনি কতদিন ?

—বছর দশ-বার হবে।

এবার যে বড় দয়া হ'ল। গরজ আছে বুঝি ! বলিয়া চতুর ঠাট্টার সাড়া না পাইয়া মিস্ত্রী উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, আগন্তুক চলিয়া গেছে।

বাবুদের আসিবার কথাটাই ভাবিতে ভাবিতে অভয় বাড়ীর দিকে চলিল··· কাহারও দরদ কেহ যাচিয়া চায় না, কেহ কাহারও উপকার যাচিয়া করিতে আসে না।

অভয় হাঁটিতে হাঁটিতে যাইয়া নদীর ধারে দাঁড়াইল। দক্ষিণে বামে দুইদিকে তার সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর ব্যাপিয়া ব্যর্থ কৃষিকার্য্যের অখণ্ড শূন্যতা

ধু ধু করিতেছে…যে ফসল জন্মিয়াছিল তাহা পণ্ডশ্রম করিয়া কাটিবার প্রয়োজন হয় নাই ; গরু লাগাইয়া দিয়া লোকে তাহা কাঁচাই খাওয়াইয়া দিয়াছে—ভোজনাবশিষ্ট শুষ্ক ডাঁটা আর লতা ক্ষেত্রের উপর লুটাইয়া আছে—অভয়ের চোখ ছলছল করিতে লাগিল—পাছে আশাহত সন্তানের সঙ্গে চোখোচোখি হইয়া যায় এই ভয়েই যেন ভূমিলক্ষ্মী সর্ব্বাঙ্গের উপর আবরণ টানিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু আগে এমন ছিল না—ভূমিলক্ষ্মীর মুখ লুকাইবার হেতু ঘটিল না… সর্ব্বসম্পদের পুরোভাগে আর সর্ব্বসুখের সমষ্টির কেন্দ্রে তিনি প্রধানতম স্থানটিতে অধিরোহণ করিয়া বিরাজ করিতেছে।

বাল্যকালে নদীর ধার– এপার আর ওপার—তাদের অতি প্রিয় ছিল

এখনও হাতে কাজ নাই, তখনও হাতে কাজ থাকিত না। অভয় ও-পারের দিকে চাহিয়া রহিল।

ওই খানটিতে জলের ধারে বরাবর উজান দিকে রসিকপুরের বাঁকের মুখ পর্য্যন্ত ঝাউয়ের বন ছিল, বর্ষার জলের কাদা গাছের সরু ডাঁটায় শুকাইয়া থাকিত…ঘাটে বাঁধা পরের নৌকায় অকারণেই নদী পার হইয়া সেই ঝাউ বনে তারা বিচরণ করিত ; তার ভিতর লুকোচুরি খেলা বেশ চলিত…সিরু সিরু শব্দটা যে উঠিত, কোথাকার একটা ম্রিয়মাণ সুরের সঙ্গে তার মিল থাকিত…নদীর ধারে বসিয়া জলের স্রোতের ভিতর হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দিয়া বসিয়া থাকা—অশেষ কৌতুক তাতে…স্রোতের টানে পায়ে টানু লাগিয়া রক্তে যেন সুড়সুড়ি লাগিত·· ভাবিতে ভাবিতে আসিয়া কোথাকার আবর্জ্জনা পায়ের সঙ্গে জড়াইয়া আটকাইয়া পড়িত…একটা লম্বা খড় পা বেড়িয়া দুই মুখ স্রোতের দিকে ভাসাইয়া দিয়া থরথর করিয়া কাঁপিত। সে ঝাউবন নাই—

অভয়ের মনে হইল পল্লীর ক্রোড় নিঃস্ব করিয়া যত কিছু সামগ্রী একে একে বিচ্যুত হইয়া গেছে, তাহাদের সকলের বড় বাল্যকালের সেই ঝাউবনটি।

স্মৃতি কত আসে, কিন্তু তারা নিরীহ ; নির্জীব বাহু বাড়াইয়া আলিঙ্গন করিতে চায়—প্রেতমূর্ত্তির সে মূক মুখে তার ভাষা নাই—মনকে সে বিচলিত করে না।

তখন কত ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু ইচ্ছার কল্পলোক এখন অন্ধকার, অচঞ্চল—যখন সুখের দেবতা মৌনাবলম্বী হইয়া একেবারে মুখ ফিরান নাই, তখন কৈশোরের স্মৃতি এতটুকু হাসির আকারে, গানের দু'টি কলির সুরে চমক দিয়া যাইত—একটি রেখায় জীবনের এই দু'টি যুগ যুক্ত ছিল—উষার সঙ্গে অপরাহ্ণের যেমন দৃষ্টির যোগ থাকে। তখন সে স্মৃতির শক্তি ছিল।

কিন্তু আজ তার মূল্য নাই ; মৃতের আত্মা যেমন দূর হইতে পরিত্যক্ত দেহটাকে দেখে তেমনই নিরর্থক দৃষ্টি লইয়া মাঝে মাঝে স্মৃতির জগতে চিত্ত ধাবিত হয়। সেদিন আবার যদি ফিরিয়া আসে! মনে হইতেই অভয় শিহরিয়া উঠিল…সেই রৌদ্র আর নদীতীর চিরদিন নীরব ; হঠাৎ সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মানুষের হাহাকার নদীর দুই তীর হইতে নদীর বুকে আছড়াইয়া পড়িল…তার নির্গমের পথ নাই—উপরে আকাশ, নিম্নে মাটি—মধ্যবর্ত্তী স্থানটি পরিপূর্ণ করিয়া সেই হাহারব অভয়ের চক্ষের সম্মুখে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল—

অভয়ের মনে হইল, সেদিন ফিরিয়া আসিলেও তার নাগাল পাওয়া যাইবে না —মধ্যে একটি শুষ্ক হাহাকারের মরুভূমি রহিয়াছে। প্রকৃতি গতায়ুঃ—তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মনে হয়, মৃতের ছবি দেখিতেছি ; সে-ই অবয়ব ; কিন্তু তাহার সঙ্গে হৃদ্যতা চিত্তবিনিময় ঘটে না—

ইহার স্বকীয়ত্ব আর সৌন্দর্য্যের অনুভূতি মনকে তখন বিজড়িত করিত না—করিত ইহার সাহচর্য্যের পরিবেশন ; কিন্তু ভূমিলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে এ-ও কৃপণ হইয়া অমৃতের পাত্রপুট টানিয়া লইয়াছে—সেকালের সঙ্গে একালের গ্রন্থি তখনই কাটিয়া গেছে—ইহার আন্দোলন আর ধ্বনির সঙ্গে একাকার হইবার পথ মানুষ খুঁজিয়া পাইতেছে না।

যেদিন আকাল আসিল, সেদিন সে কেবল অতৃপ্ত ক্ষুধারই যন্ত্রণা দিল না—অন্তরস্থ আশ্রয় বস্তুকে সে কাড়িয়া লইল—যে ধারাবাহী চিন্তায় থাকিয়া থাকিয়া শিহরণ ফুটিত তাহা আগে আলোড়নে পল্বলের মতো কর্দ্দমাক্ত, পরে শুকাইয়া কঠিন হইয়া গেল—তার ফাটল দিয়া এখন বাসুকীর বিষের জ্বালা ওঠে।

অভয়ের বয়স এই বত্রিশ—

এই বয়সেই সে পুরাতন জগতের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। কেন এমন ঘটিয়াছে এ প্রশ্নের শেষ উত্তর কোথাও বোধ করি আছে ; বালকে যেমন করিয়া ধুলা ছিটায়, একটা অস্বাভাবিক অস্পষ্টতা অদৃষ্ট তেমনি করিয়া ছিটাইয়া রাখিয়াছেন ; তাহার ঊর্দ্ধে প্রশ্নের সমাধান হয় তো আছে—

পূর্ব্বপুরুষগণের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল, স্বার্থ ছিল, অভিমান ছিল, অহংকার ছিল,—এই বিস্তীর্ণ পশ্চাৎপটের উপর তাঁরা লীলা করিয়া গেছেন—

কিন্তু আসল কথা এই যে অভয় সংসারে যখন প্রবেশই করে নাই—দ্বারের নিকট হইতেই বিতাড়িত হইয়াছে—

তখনও বিপদ আসিত ; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন জীবনের পথে প্রাচীরের মতো নয়—একটি অকিঞ্চিৎকর উপলসৃষ্ট বাধার মতো—আর এখন ?

অভয় চোখের উপর কাপড় বুলাইয়া কি মুছিল কে জানে, কিন্তু চোখে তার জল ছিল না।

পথে দেখা কালোশশীর সঙ্গে—

ধড় বড় পা ছোট কালোশশী তড়্‌বড়্‌ করিয়া চলিতেছিল ; অভয়কে দেখিয়া সে দাঁড়াইল ; স্ফূর্ত্তির সহিত বলিল,—চলেছি রামমোহনের কাছে ; গেট্ করবো - -তার দুটো বাঁশ চেয়ে রেখে আসিগে।

অভয়ের চোখে বিস্ময় দেখিয়া কালোশশী না থামিয়াই বলিল,—বাবুরা তিন ভাই আসছেন যে।

অভয় বলিল,—জানি, শুনেছি।

—জানবে বৈ কি, না জানার ত' কথা নয়। বলিতে বলিতে টপ্ করিয়া অভয়ের হাত ধরিয়া কালোশশী বলিল—এস, এস, এ আমারও কাজ, তোমারও কাজ। বলিয়া অভয়কে সে গন্তব্য স্থানের দিকে টানিতে লাগিল।

অভয় বলিল,—যাচ্ছি, ছাড়।

কালোশশী তৎক্ষণাৎ তার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল,—এখন পেলে বাঁচি ; রামমোহনটা যে কঞ্জুষ !

—তোমার নিজেরও ত' ঝাড় আছে।

কালোশশী চোখ মট্‌কাইয়া বলিল,— তুমিও যেমন ! দাতার ডাব, বাঁথলের বাঁশ। ·· যা শত্রু পরে পরে।

অভয় কালোশশীর শত্রু-বিদায়ের সঙ্গী হইল বটে ; কিন্তু তেমন উৎসাহ তার দেখা গেল না ; বলিল,—দুটো টাকা দেবে ধার ?

— দেব ; দিন বেছে যাত্রা আর লোক বেছে উপকার আমি করিনে। তবে সে পরের কথা পরে হবে।

দু'চার পা যাইয়াই অভয় বলিল,—আমার যে এখনই চাই।

—এ খ-ন ই ! চলো দিচ্ছি গিয়ে—এই বাঁশের কথাটা বলে যাই। তুমি না হয় ফেরো, বাড়ী হ'য়ে এস গে।

কালোশশী নিতান্ত পরিচিত লোক, অভয় ইঙ্গিতটা তাই এক নিমেষেই বুঝিয়া ফেলিল ; বলিল,—কিছু পাট দিতে পারি—আর কিছু নেই।

কালোশশী যেন হঠাৎ আহত হইয়া চম্‌কিয়া উঠিল ; পরম দুঃখের সঙ্গে বলিল, —কেবল তোমার নয় কারো ঘরেই কিছু নেই, রইল না। ···এ বছর পাট কেনা আর টাকা জলে ফেলা সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ···আর কিনবই বা কত ! কিনে রাখিই বা কোথায় !·· গাঁয়ের পনর আনা লোক কেবল পাটই আনছে মাথায় করে করে। তা তুমি যাও, পাট পাটই সই। বলিয়া দাক্ষিণ্যের একশেষ দেখাইয়া কালোশশী অভয়ের দিকে চাহিয়া ছাঁটা গোঁফ নাকের দিকে তুলিল ; তারপর সুমধুর একটু হাসিল।

এত সংক্ষেপে টাকা পাওয়া যাইবে অভয় তা ভাবে নাই ; সে-ও কালোশশীর মুখের দিকে চাহিয়া সত্যিকার হাসিই একটু হাসিল—এবং নিজের হাসি দেখিয়া সে নিজেই বিস্মিত হইয়া গেল।

বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষার একাগ্রতাই পশুর যথার্থ পরিচয়। কন্যাকার অনাহার যন্ত্রণা অভয়রা ভুলিয়া যায় বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তা ভোলে না ; গত দিনটি পাথরের মতো পশ্চাতের পাথারে তলাইয়া যায়। তাহাকে চোখের সম্মুখে উত্তোলিত করিয়া পুনরায় নিরীক্ষণ করিতে কেবল সাহস তাদের নাই। শুধু বর্ত্তমানই তাদের কাছে সজীব, সে-ই আসিয়া 'দাও' বলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়ায় ; যে-কোনো দক্ষিণা দিয়া তাহাকে বিদায় করিতে পারিলেই ভার নামিয়া যায়। স্বাভাবিক মানুষের মতো দিকে দিকে সে তার সত্তার শিখা প্রধাবিত করিয়া দেয় নাই ; একটি মাত্র বিন্দুর উপর সকল রশ্মি নিপতিত হইয়া তাহাকেই অসাধারণ উত্তপ্ত আর উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। আর সব শীতল ও অন্ধকার।

মরিব না, বাঁচিব। এই সংস্কারের প্রভাব দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে বলিয়াই ওদের জীবনের গতি বাহির হইতে এমন সহজ আর সরল মনে হয়। যাহা হইলে হইতে পারিত তাহার একটি প্রতিবিম্ব বাষ্পাচ্ছন্ন দর্পণের অভ্যন্তরস্থ ছায়ার মতো অস্পষ্ট চোখে পড়ে। ক্রিয়ারত সাবলীল যে

বস্তুটিকে জীবন বলা হয় সে এমন কারাবরুদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে। ইহা আশ্চর্য্য বটে ; তার আর সব অভিব্যক্তি নিদ্রিত ; কেবল প্রহরীর দৃষ্টির মতো একটি চৈতন্য একই দিকে নিবদ্ধ হইয়া আছে। আজিকার দিনটি।

চিন্তার অসাড়তা আনিয়া দিয়া প্রকৃতি তার উপকার করিয়াছে। উদ্বুদ্ধ মস্তিষ্ক জীবনের এই বিভীষিকা সহ্য করিতে পারিত না ; সম্বিৎ একই দিকে একাগ্র হইয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। সে আত্মহত্যা করে না।

অতি কষ্টে কালোশশীর বাঁশের যোগাড় হইয়াছে ; বাঁশ কাটিয়া ঝাড়েই রাখিয়া আসিয়াছে, দু'তিন জন লোককে ধরিয়া কঞ্চি ছাঁটিয়া বাঁশ ঝাড়ের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিতে হইবে।

অভয় যখন ত্রিশ সের পাট লইয়া কালোশশীর বাড়ীতে উঠিল, তখন বেলা দেড়টা আর কালোশশীর মেজাজ প্রফুল্ল হইয়া আছে।

কিন্তু পাট দেখিয়া সে মুখ সিটকাইল ; বলিল, তোমার পাটের ' কোয়ালিটি" খারাপ হে। আঁশে "প্লেজ" কই ! দালালে সঙ্গে সঙ্গে "রিজেক্ট" করে দেবে। সাতসিকের বেশী দিতে পারিনে।

কালোশশী ভাবিয়াছিল, খানিক টানা-হেঁচড়া করিতে হইবে, কিন্তু অভয় সঙ্গে সঙ্গেই বলিল, তাই দাও, সাতসিকেই দাও।

কালোশশী অবাক হইয়া গেল ; মনটা তার তিরতির করিতে লাগিল। দেড় টাকাতেই দিত বোধ হয়। বলিল,—ডাঁহা লোকসান হইয়া গেল, আনা চেরেক ত' বটেই। বলিয়া কিছুক্ষণ ভ্রূভঙ্গী করিয়া থাকিয়া যেন লোকসানটা সে সহ্য করিয়া লইল। তারপর, কেবল এই বৎসরের জন্যই পুরাতন টিন দিয়া নূতন নির্ম্মিত পাটের গুদামের দিকে চাহিয়া সরল হাস্যের সহিত কালোশশী বলিল,—যাক গে, আর ভাবি কেন !

সাতসিকার চারসিকির দরুণ পুরা একটি টাকা আর তিনসিকির দরুণ কয়েকটি রেজকি দিয়া কালোশশী অভয়কে বিদায় করিল ; কিন্তু দেখিয়া লইলেই অভয়ের চোখে পড়িত, রেজকির একটি সিকি খারাপ।

পরিচ্ছেদ—৩

বাবুরা আসিতেছেন।

বাড়ীর চারিদিকেই বড় বড় গাছ ; তাদের হরিৎ-আলিঙ্গনের মাঝে অট্টালিকার শ্বেত-মূর্ত্তিটা কতকটা নির্লজ্জ দম্ভের মতো দেখাইলেও ফুটিয়াছে বেশ।

এদিককার আয়োজন, অভয় জানিত না, কালোশশী বলিল, "কমপ্লিট", গেট প্রস্তুত। বাবুদের "বেয়ারা" আর বসিবার চেয়ার আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বেতের তিনখানি, তার উপর প্রায় শোয়া যায়। দুই পা দুইদিকে টানা টানা করিয়া মেলিয়া দিবার সুবন্দোবস্ত আছে ; ছোট-খাট তিন চারিটি মানুষকে তার

আয়তনের ভিতর ডুবাইয়া রাখা যায়। কালোশশী বেতের বয়ন-কৌশল দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। টিপিয়া দেখিল, নোয়ান কঠিন।

তারপর কাপড় লাগান চেয়ার, তাতেও অর্ধেক শোয়া যায়। ইচ্ছা করিলে দোল খাওয়াও যায়।

অভয় বলিল,—বাবুরা কেবল শুতেই আসছেন!

—না, না; বলিয়া কালোশশী প্রতিবাদ করিয়া তৃতীয় প্রকারের চেয়ার দেখাইয়া দিল, যাহার উপর কেবল বসা যায়, পিঠ খাড়া বলিয়া শুইবার উপায় নাই। তারপর বলিল,—বাবুরা শুয়ে শুয়ে যে মেহন্নৎটা করে, তোমার আমার ভুঁই চষার চেয়ে তা আকাশপ্রমাণ বেশী।

—তা হবে।

—তা-ই হয়েছে। মজুর আর বাবুতে তফাৎ ত' ঐখানেই। তুই সারা দিন খেটে ছ'-আনা পাবি, বড় জোর সাত আনা, বাবুরা মাথা খাটিয়ে হাকিমের সামনে একটি কথা বলে দেবে, তার দাম দিতে হবে তোকে চারটি টাকা।

কালোশশীর মনে মহকুমার বড় উকিল নারায়ণবাবুর চিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তিনি কথা বলেন কম, দু'টি কি একটি, তাতেই কিন্তু মামলা ফয়সালা হইয়া যায়। সে কথার নড়চড় নাই। কালোশশী দেখিয়াছে, নারায়ণবাবু ঐরকম একটা চেয়ারে প্রায়ই শুইয়া থাকেন। শায়িত মানুষের ওপর অভয়ের মতো কালোশশীর তাই অশ্রদ্ধা নাই। অভয়ের ছোট উকিলের শুইবার অবসর নাই।

কালোশশীও আগে চিনিত না এমন অনেক জিনিষের সঙ্গে বাবুদের "বেয়ারা" রামহরি তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিল। গ্যাস ষ্টোভ, ইকমিক কুকার, হ্যাট-র‍্যাক, টয়লেট টেবিল, শেভিংষ্টিক, সলটেড্ বাটার, এবং আরো অনেক।

কিন্তু কালোশশী তাহাদের একটি নামও দুই মুহূর্তের বেশী মনে রাখিতে পারিল না।

তার অবাক মুখের দিকে চাহিয়া রামহরি পুনশ্চ বলিল, বাবুদের টিফিনে খাবার পাউরুটী ইংরেজের দোকান থেকে রোজ ডাকে আসবে।

কালোশশী এমন কি অভয়ও এ শুভ-সংবাদটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল। পুলকে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কালোশশী অভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বাবুরা যেন তাহারই যত্নকৃত সম্পত্তি? সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি দেখ!

কালোশশী জিজ্ঞাসা করিল,—বাবুরা কি সস্ত্রীকই আসবেন?

বাজে লোক হইলে এই প্রশ্নে দাঁতে জিব কাটিত, কিম্বা কৌতুক করিত; কিন্তু বাবুদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া রামহরির চিত্তসংযম আসিয়াছে; শুধুই বলিল না, তাঁরা আসবেন না।

শুনিয়া গ্রামের অযোগ্যতা সম্বন্ধে অভয়েরও সন্দেহ রহিল না, এবং কালোশশীর সেদিনের তদ্বির ঐখানে শেষ হইল।

কালোশশী উপযাচক হইয়া কেন এত সমারোহ করিতেছে তার কারণ মানুষের তেমন চোখে পড়ে না। কেহ তাহাকে সে ভার দেয় নাই; নিজের স্কন্ধে অভ্যর্থনার দায়িত্ব লইয়া বাবুদের প্রীতিলাভ-করিয়া বিশেষ লাভবান হইবে এ সম্ভাবনাও নাই—তবু সে মাতিয়াছে।

বাবুদের সমকক্ষ সে কোনো দিক দিয়াই নয়। বাবুরা ছাড়া-কাপড় যাহার উপর ফেলিয়া রাখেন, সে বস্তুটার নাম সে জানে না। কাঠের পালিশ দেখিয়াই তার চমক লাগিয়া গিয়াছিল। বাবুদের কুকুর যাহা খায় সে গুরুপাক দ্রব্য কালোশশীর পেটে গেলে চোঁয়া ঢেঁকুর উঠবে বার ঘণ্টা দমসম ঠেকিবার পর।

তবু বাবুদের সঙ্গে তার ঐক্য আছে। একটা আলাহিদা স্থানে উভয় পক্ষের মনে মনে ধর্ম্ম সমন্বয় ঘটিয়াছে; সেই একটি মাত্র দৈবজ আবহাওয়ার মাঝে বাবুদের সঙ্গে কালোশশী একত্র অবস্থান করে।

দুই পক্ষই তুচ্ছ কারণে স্ফূর্ত্তি পায়। যে ভাগ্যহীনের দল জীবনের এই স্ফূর্ত্তিটুকু জন্মের মতো হারাইয়াছে, কালোশশী তাহাদের সঙ্গে বাস করিয়াও তাহাদের নয়। তার স্তর স্বতন্ত্র। মানুষ সবাই এক-একটি অস্তিত্বের বিন্দু; এই বিন্দুটি বিস্তৃতি লাভ করিতে মানসিক যে স্ফূর্ত্তির প্রয়োজন তাহা কালোশশীর আছে, অভয়ের বিলুপ্ত হইয়া গেছে। কালোশশীর ভ্রমেও মনে হয় না যে, পৃথিবীর বুকের উপর তার সংস্থাপন বিধাতার নিয়মের ব্যতিক্রম, পরন্তু সৃষ্টিশৃঙ্খলার একটি সম্যক দৃষ্টান্ত সে; নিজের জীবনের বাহিরের রূপ যাহা নিত্য নিয়মিতভাবে তার চোখের সম্মুখে লীলায়িত হইতেছে, কালোশশীর মনে হয়, সে তার আত্মার দিব্য-দ্যুতিরই রূপ।

তার ঐ দিব্য-বস্তুটি প্রাণ-প্রবাহের বিপরীত মুখে দাঁড়াইয়া অভয়কে যেমন, তাহাকে তেমন করিযা অধঃপতিত করে না। কালোশশীর চোখের উপর একটা বীভৎস অভিনয় নিয়তই অনুষ্ঠিত হয় না।

পৃথিবীর গর্ভাবাস লুণ্ঠন করিয়া ছায়ামূর্ত্তি দলে দলে তীরের মতো ছুটিয়া দিগন্তের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে; তাহাদের কাহারো হাতে অপহৃত স্বর্ণপিণ্ড, ছায়ামূর্তির নাসিকাগ্রে শ্বেতচন্দনের তিলক রেখার মতো সোনার আভা পড়িয়াছে।

তাহাদের কাহারো হাতে রসপূর্ণ পাত্র,—"গেল গেল" রব তুলিয়া মানুষ যে আর্ত্তনাদ করিতেছে, তস্করেরা তাহাতে কর্ণপাত করিতেছে না।

দেখা যায়, দুঃসাহসী কে একজন তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল, ছুটিতে ছুটিতে দুই বাহু ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া মাটি ছাড়িয়া সে লাফাইয়া উঠিল,—মুখ হা, তাহার ভিতর গোঙানি। মাটিতে পৌঁছিয়া দাঁড়াইয়া টলিতে-টলিতে সে পড়িল। খানিক কাঁপিয়া স্থির হইয়া রহিল, মরিয়াছে।

কালোশশীর এমন দুরদৃষ্ট নয় যে, এসব তার চোখে পড়িবে। তাই স্ফূর্ত্তি আছে, বাবুদের সঙ্গে মিল আছে।

বাবুদের বিশ্রাম আছে, কালোশশীরও আছে, অভয়ের নাই। দিনের পর দিন অভয় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, না হয় লক্ষ্যহীন হইয়া পথে পথে ঘাটে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু কাজ নাই বলিয়া বিশ্রাম তার নাই। পলে পলে যাহার সুদূরে দূরত্ব বাড়াইয়া এই অবসর মুহূর্ত্তগুলি—স্বতঃসিদ্ধ, সহজে অনুভূত হয় এমন আর কিছুই নয়, কেবল একটানা লক্ষ্য একটি মৃণাল-তন্তু প্রসব করিয়া চলিয়াছে, সেই বিলীয়মান বস্তুটির বিচ্ছেদ-বেদনায় তাহার তিলমাত্র বিশ্রাম নাই।

তন্তুটি কাটে না।

দেহ দুর্ব্বহ, দেহ যেন পাতলা একটা আবরণ। প্রাণান্তকর নিঃশব্দ আর্ত্তনাদের উপর বিছান রহিয়াছে, এই বহনক্লেশ আর যাহাই দিক, বিশ্রাম দেয় না।

কালোশশী তার বিশ্রামকে ভূষিত করিতে চায়। তা নইলে তার চলে না।

পরিচ্ছেদ—৪

বাবুরা বৈকালে আসিয়া পেঁাছিলেন।

মাইল দুই রাস্তা "সাইকেলে" আসিতে হইয়াছে বলিয়া তাহাদের কাটা-কাপড়ের পোষাক—আর তা এমন মজবুৎ করিয়া আঁটা যে, তাঁহাদের প্রকৃষ্ট উপকরণ সম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না।

গাড়ীর সময় ধরিয়া কালোশশী গেটের সম্মুখেই ওৎ পাতিয়া ছিল—তিন ভাইকে পর পর নমস্কার করিয়া সে সাইকেলত্রয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিল—

বাবুরা বুঝিলেন, এই ব্যক্তি তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিল—

কালোশশী দেখিল, তিন ভাইই সুপুরুষ, নধর গঠন, ধনীর দুলাল বটে।

প্রাণনাথ ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন, বাবুদের বহিঃপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া টেবিল চেয়ারের বাহুল্য দেখিয়া তাঁর অসন্তোষ জন্মিতেছিল, তারপর বাবুদের দেখিয়া তাঁর হতশ্রদ্ধার অন্ত রহিল না—এটা কি সুন্দরবন। বাঘের ডাক শুনিয়া গাছে উঠিতে হইবে নাকি যে কাছ-কোঁচা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে।—প্রাণনাথের আরো মনে হইল, ইহারা আহ্নিক করে না, গায়ত্রী ইহাদের মুখস্থ নাই—যদি থাকে তবে—আমার এই টিকি—

কিন্তু পারত্রিক টিকিটি কঙ্কালী-দেবীর দুয়ারে বাঁধা দিবার পূর্ব্বেই প্রাণনাথ শিহরিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইলেন—

রামহরি বাক্স খুলিয়া বন্দুক বাহির করিতেছে।—যাহাদের সংস্পর্শ হইতে শত হস্ত ব্যবধানে থাকিতে হইবে বলিয়া সৎপরামর্শ দেওয়াই আছে, আগ্নেয়াস্ত্র তাহাদের তালিকাভুক্ত না হইলেও জনৈক শিকারীর মুখে শোনা কথাটা প্রাণনাথের মনে ছিল—বন্দুকের গুলী নাকি সার্দ্ধদ্বিশত হস্ত দূরবর্ত্তী বস্তুকেও বিদ্ধ করিতে পারে।

কিন্তু রামহরি কেবল একটি ফাঁকা আওয়াজ করিল—ইটি ছোটবাবুর সখ, পারিলে আওয়াজের সংখ্যা বাড়াইয়া বোধ হয় গেপ্পেট করিয়া দিতেন। আগে হইতেই আদেশ দেওয়া ছিল; ছোটবাবু চেয়ারে বসিয়াই রামহরিকে ইঙ্গিত করিলেন—রামহরি করিল "ফায়ার"।

প্রাণনাথ আওয়াজটার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু চমকিয়া উঠিতে হইল; এবং তারপরই তিনি মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন।

আগমনবার্তা লোহমুখে বিঘোষিত হইল, কিন্তু প্রাণনাথ ক্রুর ব্যক্তি—শব্দে বায়সকুল শঙ্কিত হইয়া কা কা রবে ইতস্ততঃ পলায়নপর হইয়াছে দেখিয়া তিনি মনে মনে বলিলেন, উহারা দুর্জনকে পরিহার করিতেছে ; প্রাণ বাঁচাইবার জন্মগত বুদ্ধিবলে উহারা সর্ব্বদাই সতর্ক ; উহারা তাই চিরজীবী, কিন্তু মানুষের সে সাধ্য নাই—আমি, আসিয়া দাঁড়াইয়াছি একেবারে নিকটে কিঞ্চিৎ প্রণামীর আশায়, কেঁড়ে ধরিতে কালোশশী আসিয়াছে ; ওদিকে যে-শব্দে বায়সের ত্রাসের সীমা নাই সেই শব্দেই আকৃষ্ট আর কৌতূহলী হইয়া কয়েকটি বর্ব্বর বালক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মূলতঃ কথাটা ইহাই যে, বাবুদের 'ধরণ-ধারণে' তাঁর মনে হইতে-ছিল, প্রণামী প্রাপ্তির আশা পনর আনা নাই, মাত্র এক আনা আছে—তাই তাঁর এই রাগ।

কালোশশী দ্বিচক্রের পশ্চাতে খানিক ছুটিয়া হাঁটিয়াই আসিতেছিল ; বন্দুকের শব্দে আবার দৌড়াইয়া সে শীঘ্রই পেঁছিয়া গেল। তখন গতির সম্মুখে প্রণামটা চলনসই গোছের হইয়াছিল—এবার বাবুদের অন্যমনস্ক দৃষ্টির সম্মুখে কালোশশী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইল।

বাবুরা স্মিত-মুখে প্রণাম গ্রহণ করিলেন ; অসরল চিত্ত প্রাণনাথ ভাবিলেন, উভয় পক্ষই কপট। বাবুরা টেবিলের ধারে চেয়ারে চেয়ারে বসিয়া গেলেন—

বড়বাবু রামহরিকে দিয়া বেঞ্চি আনাইয়া অভ্যাগতকে বসিতে বলিলেন ; প্রাণনাথের রাগটা একটু কমিল অর্থাৎ আশা জন্মিল—এবং কালোশশী অল্প অল্প হাসিতে লাগিল—যেন না হাসিলেই বাবুরা তাহাকে গেঁয়ো স্বভাবের অপ্রতিভ লোক বলিয়া ভুল করিয়া বসিবেন।

বড়বাবু বলিলেন —আপনাদের এখানে দেখে বড় খুশী হ'লাম।

কালোশশী প্রত্যুত্তরে কৈফিয়ৎ দিল ; বলিল,—আজ হাটবার, সবাই হাটে গেছে ; ফিরলেই সবাই এসে দর্শন করে যাবে ; আপনারা আজই পদার্পণ করবেন তা সবাই জানে।

মেজবাবু প্রশ্ন করিলেন,—কেমন করে জানলে সবাই ?

—গেট প্রস্তুত যখন করি—

—আপনি করেছেন ?

কালোশশী কিশোরী-সুলভ লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল ; কোনো রকমে উত্তর একটা উচ্চারণ করিল,—না, না, ও কিছু নয়।

বড়বাবু আর মেজবাবু হাসিয়া কালোশশীকে আরো কুণ্ঠিত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন—

কিন্তু ছোটবাবুর মেজাজ যেন কেমন! তিনি বলিলেন,—দলে দলে লোক আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসুক এ আমরা চাইনে, আমরা অপার্থিব কিছু নই, হট্টগোল আমরা পছন্দ করিনে। কথাগুলি রূক্ষ শুনাইল—

বড়বাবুর মনে পড়িয়া গেল, এখানে আসিবার পূর্ব্বে বন্ধু গণপতি তাঁদের বলিয়াছিলেন, মানুষগুলি উল্টাইয়া কোৎকা হইয়া না দাঁড়ায়, ইহা দেখিও। তিনি পিঠাপিটই হাসিয়া বলিলেন,—আমরা তাদের ভালবাসি তাই জানাতেই এসেছি—

তাদের কাছে গিয়েই আমরা তা জানিয়ে আসব—তারা এসে বিব্রত হবে এটা ঠিক নয়। তাই নয় কি?

প্রাণনাথ আর কালোশশী এক সঙ্গেই বলিয়া উঠিল,—আপনি কি আর ভুল বলবেন।

প্রাণনাথকে স্বীকার করিতেই হইল যে, বড়বাবু মিষ্টভাষী ও মেজবাবু প্রভৃতি সকলেই হৃদয়বান সন্দেহ নাই।

মেজবাবু বলিলেন,—কাল সকাল বেলাই ঘুরে আসতে হবে একবার।

শুনিয়া কালোশশীর দেহে রোমাঞ্চ জাগিল; বলিয়া উঠিল,—যাবেন একবার; আমি আপনাদের দেখিয়ে শুনিয়ে আনব। কিন্তু বলব কি বাবু, পরিচয় করিয়ে দিতে লজ্জা বোধ হয়।

যেন গ্রামটি কালোশশীর পেটের সন্তান -সন্তানের অপরিচ্ছন্ন হতশ্রীতে তার লজ্জা আছে।

কোঁচার খুঁটটি গায়ে জড়াইয়া অভয় আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রাণনাথ পৈতা মাজিয়া আসিয়াছিলেন—সাবানের জলে ভিজা পৈতা শুকাইয়া চাদরের নীচে খরখর করিতেছিল। "পৈতে কালো, বামুন ভালো, পৈতে সাদা, বামুন গাধা"—লোকে এককালে বলিত বটে, কিন্তু সেদিন আর নাই। কাহাকেও বুঝিতে না দিয়া গায়ের চাদরটা সাবধানে সরাইয়া যজ্ঞোপবীত গুচ্ছ বাবুদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত করিয়া দিবার আয়োজন প্রাণনাথ তলে তলে করিতেছিলেন, এমন সময় অভয়ের আগমনে তিনি ছাড়া আর চারিজনের চোখ অভয়ের দিকে পড়ায় ব্রাহ্মণের বিলম্বিত কর্ম্মটি সংক্ষেপে শেষ হইয়া গেল—এবং ফলও ফলিল—

বড়বাবু উপবীত দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; সসম্ভ্রমে বলিলেন,—আপনি ব্রাহ্মণ। প্রণাম হই; বয়োজ্যেষ্ঠ আপনি। বলিয়া হাত জুড়িয়া কপালে ঠেকাইলেন; বলিলেন,—আপনার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলিনি,—ভারি অন্যায় হ'য়ে গেছে। আর আমাদের এমন বেবন্দোবস্ত যে তামাকের যোগাড় নেই। ওরে?

রামহরি শুনিতেছিল; তামাকের কথা বলিয়া সাড়া দিল না।

প্রাণনাথ বলিলেন,—থাক, ব্যস্ত হবেন না; আমি তামাকে তেমন অভ্যস্ত নই।

কিন্তু তাঁহার পাশ হইতে ব্যস্ত হইয়া লাফাইয়া উঠিল কালোশশী; বলিল, আমি তামাকের যোগাড় দেখছি। অতিশয় ভদ্রব্যক্তি ও'রা; আমাদের মতো তো নয়। একটু ত্রুটিতেই ও'দের।

"মাথায় বজ্রাঘাত হয়" না বলিয়া কালোশশী বলিল, মনে হয়, বুঝি মানী ব্যক্তিকে অপমান করা হ'ল, তামাক আমি দেখছি। বলিয়া সে চক্ষের পলকে কোন দিকে অন্তর্হিত হইল কে জানে।

ভুলের দরুণ আক্ষেপ ছিল, বড়বাবু তাই ঘোরতর সমাদর করিয়া অভয়কে বসিতে বলিলেন, এবং মাটিতে তাহাকে কিছুতেই বসিতে দিলেন না; উপরন্তু চেয়ার হইতে প্রায় অর্দ্ধেক উঠিয়া অভয়কে ভড়কাইয়া দিলেন। অভয় বেঞ্চিরই একধারে বসিল।

প্রাণনাথের দিকে চাহিয়া বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ক'ঘর আছেন আপনারা?

প্রাণনাথের মনে হইল, যত বেশী ব্যস ব্রাহ্মণের তত কল্যাণ দেশের, এইরূপই বাবুর মনোভাব। বলিলেন, ছিলাম পাঁচঘর ; বর্ত্তমানে টিকে আছি আমরাই একঘর ; আমরাও আর বেশী দিন নেই। আগে পৌরোহিত্য করতাম, দিন ভালই চলত, পাওনা ছিল ; এখন আমি ভিক্ষোপজীবী। কঠিন আত্ম-পরিচয়টি ব্যক্ত করিয়া প্রাণনাথ ভাঙিয়া পড়িতে পড়িতে কায়ক্লেশে রহিয়া গেলেন।

আপশোষের কথাই, এবং বিবিধ আকারেই তাহা প্রকাশ করা যাইত ; কিন্তু অপরে কেহ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই ছোটবাবু বলিয়া বসিলেন,—উঃ। ব্রাহ্মণকে কিছু দেওয়া উ চত, বড়দা।

শুনিয়া প্রাণনাথের প্রাণ গোপনে নৃত্য করিতে লাগিল, কিন্তু বড়বাবু হঠাৎ লাল হইয়া উঠিলেন। কথাটা বলা অবিবেচনার একশেষ হইয়াছে, ভিক্ষোপজীবী বলিয়া নিজেকে পরিচিত করিলেই তাহাকে তখনই ভিক্ষা দিবার প্রস্তাব করা। ব্রাহ্মণ হয়তো অপমানিত বোধ করিয়াছেন।

বড়বাবু বিজ্ঞ, তিনি উচ্চবাচ্য করিয়া ছোট ভাইকে লজ্জিত আর ব্রাহ্মণকে আরো অপমানিত করিলেন না। অতিশয় কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে প্রাণনাথের চোখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রাণনাথ তাহা দেখিলেন ; ভাবিলেন, এই যাইবার সময়, উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহাস্য-মুখে বলিলেন, যাই এখন, আহ্নিকের সময় হয়েছে। যতদিন থাকবেন এখানে, আপনাদের যথাসাধ্য সেবা করব। সেবা মানে কেবল হাত-পা টিপে দেয়া কি তামাক সাজা তা ত' নয় ; মানুষের সঙ্গও ত' আপনাদের চাই—যদিও কথা বলতে জানিনে, আর কথা বলবার বিষয়েরও তেমন সম্বল নেই, তবু আসব।

বাবুরা তিনজনেই হাত তুলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ; কিন্তু কালোশশীর প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তাঁহাকে বসিতে বলিতে কাহারও হুঁস হইল না। বড়বাবু অভয়কে বলিলেন,—তোমার নামটি কি ?

—আমার নাম শ্রীঅভয়চরণ দাস, জাতিতে মাহিষ্য।

কালোশশী "ব্যস্ত-সমস্ত" হইয়া আর হুঁকো কলুকে এবং কলুকের উপর আগুন লইয়া রাস্তার মোড় ঘুরিতেই অভয়ের কথা তার কানে গেল। বাবুরা অভয়ের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন !

কালোশশী রাস্তার মোড় হইতেই বলিল, ভারি সৎলোক বাবু। গ্রামের ইতর-ব্রাহ্মণ সবারই অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়ে গেছে, কেবল ও-ই খাঁটি আছে। বলিতে বলিতে হুঁকা হস্তে কালোশশী সভাস্থ হইল।

একাদিক্রমে ইতর ব্রাহ্মণ জনসাধারণের স্বভাব নষ্ট হইবার সংবাদে বাবুরা ক্ষুণ্ণ হইয়া গেলেন ; কিন্তু কালোশশী ইঙ্গিতজ্ঞ লোক ; বলিল, ধার নিয়ে না শোধা, দোকানীকে তার প্রাপ্য মূল্য না দেয়া, মিথ্যে কথা, প্রবঞ্চনা, এ সবও নষ্ট-স্বভাবের কাজই, বাবু। তারপর চমকিয়া উঠিয়া বলিল, কই, ঠাকুর কই ? বলিয়া পিছন দিকেও চাহিয়া দেখিল।

মেজবাবু বলিলেন, - ঠাকুর চলে গেছেন। কি মনে করে গেলেন কি জানি। হয়তো আমাদের অসভ্যই ঠাউরে গেলেন।

ঘোরতর প্রতিবাদ নিশ্চয়ই করা উচিত—মনে করিয়া হুঁকোটাকে কোথায়

নামাইবে কালোশশী তাহা ভাবিয়া পাইতেছে না, এমন সময় যে সায়াহ্ন-শান্তি পল্লীভবনে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল, ভাঙ্গিয়া তাহা খান্ খান্ হইয়া গেল।

সমুদ্রে যেমন জলস্তম্ভ ওঠে, একটা আর্ত্তকণ্ঠ সন্ধ্যার অন্ধকারের উপরে সহসা তেমনি সচল হইয়া উঠিয়াছে। কালোশশী হুঁকা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, বাবুরা আৎকাইয়া উঠিলেন—অভয় মাথা নোয়াইল।

পরিচ্ছেদ—৫

ক্রন্দন স্বর বহিতে লাগিল।

একটা অনৈসর্গিক গ্রামে উপনীত নারী-কণ্ঠের অনতিতনু দীর্ঘ সেই স্বর সূক্ষ্ম ছন্দে আনত উন্নত হইয়া গড়াইয়া চলিল—মনে হইতে লাগিল, একই নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে নহে। মাটি হইতে আকাশে উঠিবার উর্ধ্ব অধঃ দক্ষিণে বামে যেখানে যে রন্ধ্র দিয়াই শব্দ উঠিতেছে—মুহুর্মুহুঃ নিঃসৃত বহুশব্দ একটা নিরবচ্ছিন্ন নিনাদে স্ফীত হইতেছে।

কান্নার শব্দ মাঝে মাঝে কর্কশ শুনাইতেছে,কে যেন তাহাকে ভাঙ্গিয়া নামাইতে চায়, তবু তার বিরাম নাই।

বাবুরা ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

রোদনরোল তাঁরা শোনেন নাই এমন নয়, কিন্তু এমন স্বতন্ত্র করিয়া কদাচ শোনেন নাই, সহস্র জাতীয় শব্দের মধ্যে সে ও একটি শব্দ, ঐ শব্দ মাত্রই।

কিন্তু এখানে ঐ একটি মাত্র নক্ষত্র, দূরে কাহার কুটীরে একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলিতেছে। নয়নপল্লবে আগত নিদ্রার মতো সুনিবিড় স্পন্দনহীন অন্ধকার পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে - তাহারই মাঝে হঠাৎ এ কি ' কে যেন সূচীতীক্ষ্ন শরবর্ষণ করিয়া ভয়কল্পিত অন্ধকারের প্রতি রোমকূপে প্রবেশ করাইয়া দিতেছে।

হঠাৎ মনে হয়, এই রোদনধ্বনি নিষ্ফলে যাইবার নয়, কেহ না কেহ ঐ শব্দের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁর বেগসম্বরণের চেষ্টায় থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, তার চক্ষুর পল্লবান্দোলন বন্ধ হইয়া আছে।

বিপন্নের ক্রন্দন এ নহে, সাহায্য করিতে কাহাকেও সে ডাকিতেছে না, কোথায় গেল সে, এই তার প্রশ্ন কেবল।

পল্লী 'দ্রুমদলশোভিনীং' বটে, কিন্তু সেই দ্রুমদল যে পরলোকের ছায়ায় সুন্দরের ছদ্মবেশ ছাড়িয়া ফেলিয়া হঠাৎ গা মেলিয়া দিয়া এমন নিরালম্ব নির্ম্মম রূপান্তর গ্রহণ করিতে পারে তাহা কে জানিত। কপট বন্ধুর ভয়াবহ মূর্ত্তির সম্মুখে বাবুদের গায়ে কাঁটা দিল।

ইহা সত্যই যে, বাবুরা দেশের অবস্থাটা 'সরজমিনে' স্বচক্ষে দেখিতে আসেন নাই; কোনো বিংয়ে পল্লীকে তাঁর নাম ধরিয়া জানেনই না, এবং মানুষ কতস্থানে আহত হইতে পারে এ ধারণা তাঁহাদের নাই!

সে একখানি প্রশ্নপত্র অনাদি পুরুষের সম্মুখে ধরিয়া আছে। এই জনশ্রুতি তাঁহাদের শুধু কৌতূহলী করিয়াছে, অনুপ্রেরণা দেয় নাই। পল্লীর একটি ভাবমূর্ত্তি তাঁহাদের দৃষ্টিপথে বিচরণ করিত, তাহার সঙ্গে প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট মূর্ত্তিটির অবিকল ঐক্য হওয়ায় তাঁহাদের কল্পনা তৃপ্ত আর চিত্ত সরস হইয়া উঠিয়াছিল। পল্লীর আলিঙ্গন সুকোমল, তার শান্তিময়তা অনির্ব্বচনীয় বটে, কিন্তু আচমকা নিটোল পল্লী ছিটাইয়া ছড়াইয়া পড়িল, বাবুরা দমিয়া গেলেন।

এদিকে পৃথিবীতে যত ছিল হতাশা আর যত ছিল চক্ষুলজ্জা, বাবুদের সম্মুখে সযতনে উপবিষ্ট কালোশশীর মুখমণ্ডলে তা সবই ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে কাঁদছে?

কালোশশী ক্ষমাপ্রার্থীর মতো সকরুণ স্বরে বলিল, আজ্ঞে, আবদুলের মা বলে একটি বিধবা মুসলমানী আছে; সে-ই গণেশতলার হাটের দিনে ঠিক এই সময়ে আব্দুলের কবরের ওপর বসে কাঁদে।

এই সূত্রে সুখ-দুঃখের দু'একটি কথা কেহ হয়তো কিছু বলিতেন, কিন্তু তাঁহাদের পরম হিতৈষী কালোশশী কাহাকেও সে অবসর দিল না; বলিল— আমরা প্রায় নিত্যিই শুনি এই কান্না, শুনে শুনে আমাদের সয়ে' গেছে; কিন্তু আপনারা যে এসেই শুনবেন, আর আপনাদের মন খারাপ হয়ে যাবে এ বড়—

কালোশশীর কথায় মেজবাবুর কি কারণে আত্মগ্লানি জন্মিল, তাহা নিজেও জানেন না; বলিলেন, ইডিয়ট।

কালোশশী কৃতার্থ হইয়া গেল; বলিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ছোটবাবু ঠোঁট মুচড়াইয়া ঘরে উঠিয়া গেলেন; তাঁর মনটা "খিচড়াইয়া" গিয়াছিল; তিনি "অর্গ্যান" খুলিয়া বসিলেন। আর দু'জনেরও সেখানে আর মন টিকিল না, উঠিয়া পড়িলেন; কালোশশীও উঠিয়া দাঁড়াইল; অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া সে বিদায় গ্রহণ করিল; বলিয়া গেল—প্রায় রোজই হাট বসে দু'পাঁচ মাইলের মধ্যে; শাক-সব্জী তরকারীর অসুবিধা তেমন নেই। আপনাদের লোক সঙ্গে যাবে, আমি কিনে কেটে দেব। আজ গণেশতলার হাট গেল, কাল মাধবপুরের হাট; ছোট হাট; কিন্তু ডিমও পাওয়া যায়।

বড়বাবু বলিলেন,—আচ্ছা, আমরা এখন কাপড়-চোপড় ছাড়িগে।

বাবুরা ঘরে উঠিয়া গেলেন। কালোশশী তাঁহাদের প্রণাম জানাইয়া বাড়ী গেল। বসিয়া রহিল কেবল অভয়।

পুত্রের কবরের ধারে বসিয়া অকালমৃত্যুর শোকে জননী ক্রন্দন করিতেছে। তাহার ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া বাতাসে যেন মানুষের নিঃশ্বাস বায়ু ধারণ করিবার স্থান নাই।

অভয়ের প্রথম পুত্রটি ছয় বছরের হইয়া মারা গিয়াছিল। জননীর এই ক্রন্দন তার নিজের ছেলের মৃত্যুদৃশ্যের উপর একটা একাগ্র অতি উজ্জ্বল আলোকপাত করিতে লাগিল। মাংসভুক কঙ্কাল শিশুর দেহের সমুদয় মাংস ধীরে ধীরে উদরসাৎ করিয়া চর্ম্মাবরণ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিয়াছিল। গণ্ডাস্থি অতি প্রকট, দাঁতের ধবল-আভা অতি প্রখর, চক্ষু অতি নির্জীব। শ্বাসের স্পন্দন যখন কণ্ঠ হইতে অবতরণ করিতেছে তখনও তাহার মনে হইয়াছিল, বাবা বলিয়া ডাকিবে বুঝি।

তাহার স্ত্রী তখন কাঁদিয়াছিল। কিন্তু সে কান্না ভাল করিয়া তার কানে যায় নাই, দূরে কোথায় কে যেন কাঁদিতেছে। শব্দ আকাশের দিকে খানিক উঠিয়াই নিঃশব্দে থিতাইয়া নামিতেছে। পৃথিবীর যেখানে সচল-অচল সজীব-নির্জীব যে বস্তু আছে তাহারই অভ্যন্তরে নিঃশব্দে সে ধ্বনি প্রকাশ করিতেছে, তারা ছাই হইয়া উড়িতেছে।

সব চলিতেছে, কেবল নির্বাপিত চক্ষু দুটি স্থির—এত জমাট স্থির যে, তার কূল-কিনারা মাপ-পরিমাপ ওজন-ইয়ত্তা নাই। স্ত্রীর দিকে চোখ ফিরাইতে তখন সাহস হয় নাই। বুঝি এমন কিছু চোখে পড়িবে যা সে চেনে না।

স্ত্রীর ক্রন্দন শুনিতে শুনিতে হঠাৎ তার মনে হইয়াছিল, ছেলে তোমার মরিয়াছে সত্যই; কিন্তু এত মৃতের মধ্যে একটি মাত্র মৃত্যুর জন্য তুমি শোক করিতেছ কেন? জান না, প্রতিদিনই পৃথিবীর শেষ দিন! তার পা ঠাণ্ডা; শিখর হইতে শরীর মুড়িয়া আসিতেছে। মুমূর্ষু পৃথিবীকে ঘিরিয়া উদ্বিগ্ন দেবতারা কণ্ঠাগত প্রাণে চুপ করিয়া আছে, তারা এত ভীত যে কাঁদিতে পারিতেছে না! সূর্য্য প্রতিদিন তার শরীরে উত্তাপ দিতেছে; কিন্তু পৃথিবীর মৃত্যুর শৈত্যে হি হি কম্পন কমে না, এই বিরাট মৃত্যুর সম্মুখে তোমার ছেলে কতটুকু।

তারপর শ্মশানের দৃশ্য।

আগুনের সে কি শব্দ। আহার্য্য পাইয়া আগুন নাচিয়া উঠিয়াছিল।

ছেলের অস্থি গ্রন্থি সন্ধিগুলি জমিয়া দেহ একখানা কাঠের মতো আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আগুনের আঁচে দুমড়াইয়া বাঁকিয়া-চুরিয়া উঠিয়াছিল; মনে হইয়াছিল, আগুনের আঁচ তার সহিতেছে না, পলাইতে চায়! আরো মনে হইয়াছিল, নিশ্চয়ই দেবতারা ইহা লক্ষ্য করিতেছেন, তাঁহাদের কেহ চিতাগ্নির উপর হইতে শিশুকে তুলিয়া লইয়া যাইবেন। মুখে একটিমাত্র ফুৎকার দিয়া বাঁচাইয়া তাহাকে ফেরৎ দিবেন। কে একজন বলিয়াছিল,—ওঠো, এক কলসী জল আন।

জল আনিয়া অভয় দেখিয়াছিল, কালো অঙ্গারের ভিতর সাদা অস্থিখণ্ডগুলি ঝক ঝক করিতেছে। তখন মনে হইয়াছিল, দেবতা অক্ষম।

—কে?

সে যে-কুশাসনখানা শ্মশানে পাতিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল, তাহারই উপর উপবেশন করিয়া শ্মশানচারী শম্ভু যেন প্রশ্ন করিতেছেন।

অভয় চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখে কথা ফুটিল না।

—যে-ই হও, বাড়ী যাও। বলিয়া প্রশ্ন-কর্ত্তা দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

পরিচ্ছেদ—৬

কাল গণেশতলায় হাট গিয়াছে, আজ মাধবপুরের হাট। অভয় আধ মণ পাট লইয়া হাটে গিয়াছিল।

স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ এইরূপ ছিল যে, সিকি-পাঁচেক যা পাওয়া যাইবে তাহাতে দু'চার পয়সার মাছ, আট আনার চাল ; মেয়েটির পেটের অসুখ, তার জন্যে দু' পয়সার বার্লি, লংকা আর তরকারী কিছু, আর নুন সওয়া সের ; বক্রী পয়সা সে ফেরৎ লইয়া আসিবে।

কিন্তু অভয় লইয়া আসিল এক টাকা দিয়া একটি ইলিশ মাছ, টুকটাক তরকারী, সামান্য চাল, যা'তে একবেলা কষ্টেসৃষ্টে হয়, আর লবণ আর লংকা, পাঁচ সিকাই খরচ হইয়া গেছে, একটি আধলাও ফেরে নাই।

দাওয়ায় তরকারীর পুটুলী আর মাছ নামাইতেই অভয়ের স্ত্রী মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, মাছটা কত হ'ল ?

—এক টাকা।

—ফেরৎ পয়সা ?

—নাই।

মাধবী একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল ; তরকারী প্রভৃতি চালের সঙ্গে গামছায় বাঁধা ছিল, খুলিয়া দেখিয়া মাধবী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

মেয়ে ক্ষেণী আসিয়া মাছের কাছে থপ করিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল ; বলিল, মা, আমি মাছ দিয়ে বার্লি খাব। মায়ের মুখে উত্তর না পাইয়া সে বাবাকে ডাকিয়া বলিল, বাবা, আমি মাছ দিয়ে বার্লি খাব ; এবং বাপের মুখেও উত্তর না পাইয়া বলিল, আমি খাবই।

ছেলে রসময়ও মাছ দেখিতে আসিয়াছিল ; সে বলিল, তোর যে অসুখ।

ক্ষেণী ঝংকার দিয়া বলিল, তবে কি তুই একা খাবি ? হাবাতে ছোঁড়া।

—বাবা খাবে, মা খাবে, আমি খাব। তুই—

ক্ষেণী ছুটিয়া যাইয়া দাদার হাত কামড়াইয়া ধরিল, একটা ছেঁড়া-ছেঁড়ি লাগিয়া গেল।

দাওয়ার মাটিতে মাছটা পড়িয়া আছে, তার সম্মুখেই অন্যান্য সওদা, চাল আর তরকারী, আর নিস্তব্ধ মাধবী।

ততক্ষণে অভয়ের ঘোর কাটিয়া গেছে ; মনে পড়িয়াছে আজকার মতো অন্যায় কাজ জীবনে সে আর করে নাই, ইহার বাড়া কাণ্ডজ্ঞানহীনতার কাজ মানুষের দ্বারা সম্ভবে না।

কিন্তু সত্য কথা এক যে, টাকা দিয়া একটা ইলিশ মাছ অভয় ঠিক সজ্ঞানে কেনে নাই।

আধ মণ পাটের বোঝাটা মাথায় করিয়া হাটের পথে হাঁটিবার সময় অকারণেই হঠাৎ তার মনে পড়িয়া গিয়াছিল, মানুষের "যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।"—অভয় তাদেরই দলের একজন যারা অতীত দিনটিকে অলীক মনে করে, আর আগামী দিনটির প্রতি সন্ধানী-দৃষ্টি নাই, রাত্রে শুইবার সময় মনে হয় একটা দিন কাটিল, এই অতি সুলভ সুখটিই তাহাদের দিনের অর্জন। অভয়ের স্ত্রী আছে, সন্তান আছে, স্বার্থও আছে, জীবনকে ফুটাইবার আর খেলাইবার পটভূমি তাহার সম্মুখে সুবিস্তৃত; তবু সে কোথাও মূল প্রেরণ করিতে পারে নাই, মাটির উপর আলগোছে দাঁড়াইয়া সে কোনো দিকেই চাহিয়া নাই।

মনেও পড়ে না, ইহার সুরু করে।

দুর্নিবার দুঃখের প্রথম শায়কটির স্পর্শ কবে তার স্বাভাবিক চেতনায় বিষ ঢালিয়া দিয়া তাহাকে মূচ্ছিত করিয়া দিয়াছিল তাহা স্মরণ নাই। তখন হয়তো মনে হইয়াছিল, পটের ঈষৎ বদল ঘটিতেছে, এমন ঘটিয়া থাকে, সংগ্রামে মাতিয়া উঠিতে হইবে ভাবিয়া হয়তো তখন চূড়ান্ত করিয়া দেখিবার সহিবার উৎসাহে তার অজ্ঞাত স্নায়ুকেন্দ্রগুলি উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল, হয়তো সর্ব্বান্তঃকরণ পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত হইয়া দুনিয়ার সঙ্গে একাকার হইয়া অপরিসীম চাঞ্চল্যে থরথর করিত।

তারপর একদিন বিস্মিত হইবার দিন আসিল।

অনশনের জহরব্রত সুরু হইল, দুঃখের প্রথম স্পর্শটি ক্রমাগত ঠেলিয়া ঠেলিয়া পথ করিয়া গভীর হইতে গভীরতর স্থান খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু তখনও মনের সেই বিদ্যুৎ প্রবাহ একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই, মুক্ত বায়ুর শীতল স্পর্শ থাকিয়া থাকিয়া অনুভূত হইত, মন অচিন্ত্যনীয়ের অভিমুখে ছুটিত, পৃথিবীর ভাষা দুর্ব্বোধ্য কাকলীর মতো কানে আসিত।

কিন্তু সে কতক্ষণ!

তারপর সুরু হইল সম্বিতের চতুরতা, মস্তিষ্ক পর্যন্ত কিছুই পৌঁছায় না, তবু পাশ কাটাইতে পারে, প্রস্তুত না হইয়াই পারে, প্রস্তুত হইতে হইবে এই সতর্কতা মনে জাগিবার পূর্ব্বেই পারে। সংকট পার হইয়াই সে বিস্মিত হইয়া যাইত, ধ্বংস এবার অপরিহার্য্য হইয়াছিল, কেমন করিয়া উত্তীর্ণ হইলাম! দিনগুলি স্বতন্ত্রভাবে সাড়া দিয়া যায় না, একটা অনভিব্যক্ত মিছিলের মতো কুয়াশার ভিতর দিয়া বহিয়া যায়, কোনো আকর্ষণেরই বশীভূত সে নয়; স্পষ্টতঃ কিছু দিয়া যায় না, স্পষ্টতঃ কিছু হরণ করে না।

সুবৃষ্টির দিনে হঠাৎ এক একটা মুহূর্ত্তে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রবাহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়, সে-ও অনিশ্চিত কিন্তু পরিস্ফুট, জীবনের আদ্যন্ত মণ্ডিত করিয়া সে ছড়াইয়া পড়ে, সুখস্বপ্নে কানের কাছে কার মৃদু মধুর আশ্বাস-বাণী গুঞ্জরিত হইতে থাকে, মন দোলায় শুইয়া দোল খায়।

কিন্তু সুদিনের সে অনতিদান ভোগ করে উত্তমর্ণ।

এখন সে কথাও মিথ্যা হইয়া গেছে।

সে নিজের কাছে বিদায় লইয়াছে, সংসারের রূপের, চাঞ্চল্যের, প্রগতির, বিশ্বাসের, প্রয়াসের বিরুদ্ধ দিকে তাহার যাত্রার শেষ আসে নাই, দেহ-আধারে প্রাণ আছে তাই চলিতে ফিরিতে হয়, চলিতে চলিতে বিভ্রান্ত হইয়া যায়, মনে হয়, দৈবাৎ বাঁচিয়া আছি!

যে দিনটি প্রথম তার অনাহারে কাটিয়াছিল, সেদিন রাত্রিও তার অনিদ্রায় কাটিয়াছিল, ক্ষুধার জ্বালায় নহে, ততোধিক কঠিন একটা অনুভূতিতে। সে কি অদ্ভুত উদ্বেগ, তার বর্ণনা নাই; সমস্ত স্নায়ুশিরা টানিয়া ধরিয়া তার মেরুদণ্ডটিকে দুই হাতে দুমড়াইয়া কে যেন তাহাকে জ্যা-যুক্ত করিয়া ছাড়িয়া ছাড়িয়া দিতেছিল, সেই উৎক্ষেপের শ্রমে একাসনে বসিয়াই ঘামে তার গা ভিজিয়া উঠিয়াছিল।

তখন তার চোখ যদি কেহ দেখিত তবে সে চমকিয়া উঠিত।

দেহ নিশ্চেষ্ট ; কিন্তু দুঃসহ-ত্রাসে দৃষ্টি এখন পলায়নপর, যেন দেহটাকেও উপড়াইয়া সে সঙ্গে লইতে চায়।

সময়ে সময়ে কোলাহল করিয়া যে হরিনাম হয় তাহার আশ্রয়ে সে শান্তি পাইত, মনে হইত, গা গুটাইয়া কোথায় সে নিরুদ্দেশ হইয়া গেছে, পৃথিবী তার সন্ধান জানে না, সে নিরিবিলি স্থানে আছে, কিন্তু এ আশা অর্থহীন।

পৃথিবীকে লেহন করিয়া তার পৃষ্ঠের উপর করাতের মতো কর্কশ জিহ্বার চিহ্ন অংকিত খনিত করিয়া যে স্রোতটি তাহাকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করিতেছে, সে অভয়কে ছুঁইয়া ফেলে, তাহাকে লেহন করে।

কিন্তু কাহার অভিশাপে এমন ঘটে কে জানে ; এই ক্ষত এমন গুরুতর নহে যে প্রাণ দেহ-বিযুক্ত হয়, এমন লঘু নহে যে সয় তবু তাহাকে বহন করিতেই হয়।

সে একা নয়। কিন্তু তাহারা কেহ কাহারও নির্ভর নহে, সহায় নহে, কেবল পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া মনে করে, কি ঘটে যদি ও মুখ খুলিয়া চীৎকার করে।

পাটের বোঝাটা মাথায় করিয়া হাটের দিকে যাইতে যাইতে অভয় দেখিতে পাইল, তাহাদের কেউ কেউ, এবং দু'চারজনকে দেখিয়াই তার মনে হইল, তারা সবাই একটি করিয়া ইলিশ মাছ হাতে ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেছে।

দাম ?

কেহ বলিল, এক টাকা ; কেহ বলিল, আঠার আনা ; কেহ বলিল, তারও বেশী—পাঁচ সিকি। অভয়ের শ্রান্ত মন ক্ষত-যাতনা ভুলিয়া প্রবাহিনীর স্রোতে গা ভাসাইয়া দিল, অন্তরের আদি-মধ্যহীন যে ক্ষুধাকে অমনোযোগের অভ্যাসে সে ভুলিয়া গিয়াছিল, জনস্রোতের মাঝখানে তাহাকে হঠাৎ তার মনে পড়িল, কিন্তু হাহাকার করিয়া উঠিল না ; সমষ্টির সঙ্গে একাকার হইয়া এমন একটা প্রশান্ত প্রফুল্লতা আসিল যাহার স্বাদ জীবনে আর সে পায় নাই, মন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, মুক্তিস্নানের পর যেন সে নাসারন্ধ্র পূর্ণ করিয়া টানিয়া টানিয়া নিঃশ্বাস লইতে লাগিল।

মনের বিন্যাস নষ্ট হইল সত্য, কিন্তু সন্তান গর্ভচ্যুত হইয়া আসিলে জননীর উল্লাসের কাছে গর্ভের বিন্যাস শৃঙ্খলা অতি তুচ্ছ।

কিন্তু মাধবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া এখন তার মনে হইতে লাগিল, মানুষের দেখাদেখি সে অতীব কুকার্য্য করিয়াছে, হঠকারী দুষ্কৃতির সংস্পর্শে তার দুষ্কার্য্যে মতি জন্মিয়াছিল।

পাটের দাম এক টাকা চারি আনা মুঠার ভিতর লইয়া সে মাছের দোকানে ছুটিয়া আসিয়াছিল ; দেখিয়াছিল, গন্তব্য স্থানটি দুষ্প্রবেশ্য, তার চারিদিকে লোকের পর লোক ঝুঁকিয়া পড়িয়া জমাট বাঁধিয়া আছে, মাছ একটি হাতে লইবার ব্যাকুলতায় তাহাদের গামছা-কাছার ঠিক-ঠিকানা নাই ; সবুর সহিবার যন্ত্রণায় কাহাকেও পদদলিত করিতেছে কি না সে কাণ্ডজ্ঞানও তাহাদের লোপ পাইয়া গেছে।

অভয়ের আজন্মের অভ্যাসে বশীভূত মনের বাঁধন শিথিল হইয়া গেল, সে ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

কিন্তু এত ব্যাপারের মাধবী কি জানে! সে জানিবেই বা কেমন করিয়া! সে জানে না যে, মানুষের মন দিগ্বলয়ের দিকে চাহিয়া মহাকালের হস্তান্দোলন দেখিতে দেখিতে একবার তার ছেদের অবসরে সূর্যাস্তের আলোক-প্লাবন দেখিয়া মোহের আবেশে মৃত্যুকে বিস্মৃত হইতে পারে, সলিলাবর্ত্তের মাঝে ঘুরিতে ঘুরিতে তলাইয়া যাইবার সময় মন চাঁদের দিকে চাহিয়া সে পথের কথা মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া যাইতে পারে, যে-পথে মৃত্যু তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, রাক্ষসের মুষ্টির ভিতর হইতেও মানুষ প্রিয়জনের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিতে পারে, সব অভিমান আর অনুভূতি নিষ্ক্রান্ত হইয়া মানুষ যখন কেবল পশুর ধর্ম্ম পালন করিয়া চলে, তখন লুপ্ত-চৈতন্য যদি একবার ফিরিয়া আসিতে পায় তবে দানবীয় অন্ধ-উল্লাসে একটি তরঙ্গ আসে! মাধবী কখনো ভাবিয়া দেখে নাই, দৈবের উপর অনন্ত নির্ভরতা মানুষকে কত নিঃস্পৃহ করিয়া তোলে, যে মরিলেই চুকিয়া যায়, দৈবক্রমে বাঁচিয়া সে একই লক্ষ্যের দিকে অনুক্ষণ দৃষ্টি রাখিতে পারে কি না, পলক-পাতের দৃষ্টি হঠাৎ বেঁকিয়া যাইতেও পারে! মাধবীর মনে হয় না, নিজেকে আর নিজস্বকে নির্নিমেষে আগুলিয়া থাকিতে থাকিতে প্রহরায় দৈবাৎ শৈথিল্য আসিলে তাহা মার্জ্জনীয়, যে মানুষ দৈবের হাতে আর মানুষের হাতে পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছিত হইয়াও অন্তরের জ্বালার ফেণভার রক্ত-লিপ্সায় মুক্ত করিয়া দেয় নাই সে বরণীয়।

আকুঞ্চিত হৃদপিণ্ডের যন্ত্রণায় যে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, সে যদি হঠাৎ-বওয়া একটু হাওয়া পাইয়া তাহাতে অবগাহন করে সে ত' ভালই! জাগরণের ক্লান্তিতে একটুখানি অন্যমনস্ক হইয়াছে বলিয়াই কি রক্ত-মাংসের মানুষের পক্ষে দুর্নিবারণীয় সেই অপরাধের জন্য মানুষকে প্রাণদণ্ড দিতে হইবে!

স্বামীকে মাধবী ধীর স্থির দেখে।

কিন্তু বুঝিতে পারে না, বসিয়া থাকিতে কেন সে হাত বাড়াইয়া ঘরের খুঁটি চাপিয়া ধরে। নিশ্চয়ই মাধবী জানে না, নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে পঙ্কের উদ্গার, বুদ্বুদের মতো স্বামীর মনের উপর অতিশয় স্বচ্ছ একটি ইচ্ছার উদ্ভব হয়, তাহাকে ইঙ্গিত করে, আঁধার-নিমজ্জিত দূরান্তবর্ত্তী তটের দিকে পুনঃ পুনঃ তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সংজ্ঞা অলস হইয়া আসে, রক্ত চনচন্‌ করে, ভূতগ্রস্ত হইয়া ছুটিতে যাইয়াই সে কাঠের খুঁটি দু'হাতে চাপিয়া ধরে।

মাধবী তাহা জানে না। মাছ লইয়া সে ঝগড়া বাধাইয়া দিল।

পুরুষ বলবান এবং সমর্থ, এই কারণে তার কর্ত্তৃত্বের অনুগমনের সঙ্গে করুণা মিলিত করিয়া যাহারা স্বামীকে একান্ত বিশ্বাস করে, আর তার উপর বেপরোয়া নির্ভর করে, অভয়ের স্ত্রী মাধবী অভয়ের তেমন ধারা স্ত্রী নহে, স্বামী বলিয়া স্বামীর উপর তার ভক্তি আছে, কিন্তু রক্ষক হিসাবে আস্থা নাই, সব জানিয়াও নাই; প্রথম পুত্রটির মৃত্যুর পরই তাহা নিরবশিষ্ট হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেছে, প্রতিপালক হিসাবে স্বামীর কতটা 'মুরদ' তাহা প্রতিদিনই দেখা যাইতেছে। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুঝিয়া স্বামীর দেহ ক্ষয় হইতেছে, তাহা মাধবীর চোখে পড়ে; কিন্তু বুঝিয়াও নিজেদের মনের যন্ত্রণার তাড়নায় নিরুপায়ের প্রতি তার ধৈর্য্য থাকে না।

মাধবী জানে, স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণে অক্ষমতার মার্জনা স্ত্রী-পুত্রের কাছেও নাই।

রত্নাকর তাই ঠ্যাঙাইয়া মানুষ মারিত। হাত পা জড় করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া সে ভাবিতে বসিয়া যায় নাই।

এদিকে হঠাৎ একটি কৈফিয়ৎ অভয়ের মিলিয়া গেল।

অভয় দেখে, ঘরে খাদ্য থাকিতেও ক্ষুধার সময় সন্তানের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য মাধবীর মোটেই ব্যগ্রতা নাই। যতক্ষণ তারা ক্ষুধা সহ্য করিয়া থাকিতে পারে, ততক্ষণই যেন তার সময়ের লাভ। স্ত্রীর সন্তানপালনের এই পদ্ধতিটাকে মনে মনে কোনোদিনই সে অনুমোদন করিতে পারে নাই। স্ত্রীকে নির্ম্মম মনে হইলেও সে কথা বলে নাই। তারপর দেখিতে দেখিতে সহিয়া যাইয়া ভাল-মন্দ কিছুই মনে হইত না। যেন স্বভাবের গতিই এই। ছেলেটি আর মেয়েটি মৎস্য ভক্ষণের উল্লাসে নাচিতেছে। সেই দিকে চাহিয়া অভয় তৃপ্তিভরে কহিল,—দেখ।

মাধবী চাহিয়াও দেখিল না।

অতিশয় তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুরে বলিল,—দেখেছি। তুমিও ওদের মতো একজন নাকি। তুমি আমাকে ওই দেখাতে মাছ এনেছ সাড়ে ষোল আনা দিয়ে।

অভয় তবু হাসিল ; বলিল,—তা বৈ কি। ওদের তুমি খেতে দিতে পার না তা ত' আমি চোখেই দেখি। ক্ষিধের সময় ওরা তোমার পিছু পিছু কেঁদে কেঁদে বেড়ায়।

—ইলিশ মাছ খেলেই ওদের ক্ষিদের কান্না জন্মের মতো থেমে থাকবে—নয় ? এর বদলে চারটি মুড়ির চাল আনলে অনেকদিন ওদের কান্না শুনতে হ'ত না।

অভয়ের মনে হইল, ইহার আর উত্তর নাই। মাধবী অতিশয় সত্য কথাই বলিয়াছে। আপশোষে তার মন পুড়িতে লাগিল।

মাধবী বলিতে লাগিল,—ঐ ক গাছা পাটের অংশ নিয়ে ভেবেছ ওতেই তোমার চিরকাল যাবে। পাগল কি গাছে ফলে। ভগবান দেন না শুনি, যা দিয়েছেন তারই এই গতি। বেশী দিলে আরো কত দেখতে হ'ত।

ভুলু দাস রাস্তার উপর হইতে হাঁকিল,—অভয় আছ ?

—আছি।

—কিছু দেবে ?

—না।

—বেশ। বলিয়া প্রত্যাখ্যানে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া ভুলু দাস চলিয়া গেল।

ভুলু দাস প্রত্যহই একবার করিয়া হাঁকিয়া যায়। প্রতিদিনই উত্তর পায়— "না।" বলে –"বেশ।"

বড় ছেলেটির চিকিৎসার জন্য পঁচিশ টাকা কর্জ্জ দিয়া ভুলু দাস অভয়কে অসময়ে আসান দিয়াছিল। এখন সুদের টাকা "আসলে" গণ্য হইতেছে। ভুলু দাসের টাকার জন্য বাড়াবাড়ি তাগিদ কিছু নাই। অভয়কে সময় দিয়া অভয়ের বাড়ীখানির চারিদিকে সে জাল ফেলিতেছে। জালের রশি টানিতে সুরু করিলেই আঠার কাঠা মাটি সহ "মায় সাজসরঞ্জাম" ঘর দু'খানা অমনি উঠিয়া আসিবে।

মাধবী বলিল,—দাও না বাড়ীখানা ওকেই লিখে। রাস্তায় দাঁড়াই গে; একদিন ত' দাঁড়াতেই হবে; তুমি থাকতে থাকতে দাঁড়াতে পারলে চোখে দেখেই যেতে পারতে।

শুনিয়া দুরন্ত-ক্রোধে অভয়ের মাথায় রক্ত ঝমঝম করিতে লাগিল। মনে হইল, মাধবী তার বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী। যে প্রাণান্তকর সমস্যা লইয়া সে কালাতিপাত করে, তার বিশ্বাস ছিল, তার অর্ধেক মাধবীর—কিন্তু তা নয়, স্ত্রী-সম্পর্ক সে যেন স্পষ্টই অস্বীকার করিতেছে।

বলিল,—মানুষ বিয়ে করে এই জন্যে না কি ?

—কি জন্যে ?

—আমি যে খেতে দিতে পারিনে এইটে আমায় মনে করিয়ে দিতে ?

—এই কথা। সব লোকের কথা বলছ কেন তা হ'লে ? ঢাকাঢাকির ত' কোনো কথা নেই; পার না এ ত' তুমিও জান, আমিও জানি, সবাই জানে—এরাও। বলিয়া মাধবী ছেলে-মেয়েকে দেখাইয়া দিল।

মায়ের অঙ্গুলি তাহাদের দিকে উঠিল দেখিয়া অবোধ মেয়েটি সহসা যাইয়া অভয়ের হাত ধরিল, বলিল,—বাবা, মাছ আমি খাবই; দাদা—

কিন্তু কথা তার শেষ করা হইল না।

স্ত্রীর মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইতেই অভয়ের মনের ততখানি শূন্য আবহাওয়ায় ঝড় বহিতেছিল তাহার বেগে সে কাঁপিতেছিল। নিজেই বোধ হয় মাটিতে পড়িত, কিন্তু মেয়েরই কণ্ঠস্বরে পতন সম্বরণ করিয়া সে হঠাৎ দু' পা পিছাইয়া আসিল, আসিয়া মেয়েটির গালে প্রবল একটা চড় বসাইয়া দিল।

তাহারই দিকে উত্তোলিত কৃপাপ্রার্থী চক্ষু দু'টি নিমেষের জন্য নিমীলিত হইয়া গেল। রোগে ক্ষুধায় মেয়েটির দুর্ব্বল দেহ অবশ হইয়া পড়িতে পড়িতে একবার খাড়া হইবার চেষ্টা করিয়াই জ্ঞান হারাইয়া মাটিতে পড়িল এবং পরক্ষণেই সেই আধা অন্ধকার অপরিসর উঠানে, ক্ষুধার রোগের চিন্তার যাবতীয় জড়তা মর্দ্দিত করিয়া যে কোলাহল উত্থিত হইল তার বর্ণনা নাই।

মাধবী চীৎকারের পর চীৎকার করিতে লাগিল,—মেরে ফেললে মেয়েটাকে, মেরে ফেললে, মেরে ফেললে।

ছেলেটি ভয় পাইয়া ততোধিক উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল,—খুকীকে মেরে ফেললে বাবা। ওগো তোমরা কে আছ দেখে যাও।

এই অবিশ্রান্ত আর্ত্ত চীৎকার চারিদিককার ঘন জঙ্গলে ধাক্কা খাইয়া সেই উঠানেই ফিরিয়া আসিতে লাগিল। তাহাদের কাছাকাছি কাহারও ঘর-বাড়ী নাই, কেহ সাহায্যার্থে দৌড়িয়া আসিল না।

রাস্তা দিয়া কান্ত বিশ্বাস যাইতেছিল। সে মিনিট খানেক রাস্তাতেই দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শব্দগুলি শুনিল। তারপর সে কি ভাবিয়া চেনা পথেই অন্ধকারেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল।

অভয় তখন মেয়ের মাথায় জল দিতেছে।

পরিচ্ছেদ — ৭

বাবুরা কাল বৈকালে আসিয়াছেন, তখন গ্রামের সবাই হাটে। মাঝে একটি রাত্রি মাত্র অতিবাহিত হইয়াছে।

খুব ভোরে উঠিয়া গ্রামের প্রান্তে যাইয়া সূর্যোদয় দেখিবার অভিলাষ তাঁহাদের ছিল, পরস্পর তাঁরা শুনিয়াছিলেন যে, ঘোর রক্তবর্ণ একখানা থালার মাতা অতিশয় জাঁকাল চেহারা লইয়া সূর্য প্রথমে উদিত হন। তখন তাঁহার দিকে চাওয়া যায়। কিন্তু অভ্যাসবশতঃ উঠিতে দেরী হইয়া গেছে।

ছোটবাবু বলিলেন,—এ্যালার্ম টাইম্‌-পিস্‌টা আনতে ভুল হ'য়ে গেছে।

মেজবাবু বলিলেন,—আমার ঘুম ঠিক সময়েই ভেঙেছিল, কিন্তু উঠতে কেমন ভয় করতে লাগল, চারিদিক এমন কালো।

বাবুরা কালি আর কাজল ছাড়া ব্যাপক কালোর সঙ্গে পরিচিত নন।

বড়বাবু বলিলেন,—শুনেছে বাবুরা এসেছেন, টাকাকড়ি নিশ্চয়ই কিছু সঙ্গে আছে। বাইরে বেরোওনি ভালই করেছ।

ছোটবাবু বলিলেন,—বন্দুক আমার শিয়রে হাতের কাছেই ছিল। পল্লীগ্রামে চোরের উপদ্রব, তাহার প্রতিকার বন্দুক এবং বিলাতী দস্যুর তুলনায় এখানকার চোর-ডাকাত কত অকিঞ্চিৎকর সেই সম্বন্ধে আরো কিছুক্ষণ আলোচনার পর চা-পান শেষ করিয়া বাবুরা উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় বাহিরে কালোশশীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—বলিতেছে,—দাঁড়াও এখানে তোমরা, গোল ক'রো না, বাবুদের বিশ্রামের ব্যাঘাত না হয়।

শুনিয়া বড়বাবু বাহিরে আসিয়া দর্শন দিলেন; কালোশশী দেখিল, তাঁহার মুখে ক্লান্তির কোনো নিদর্শন নাই। কালোশশীরা একে একে আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিল। বেলা তখন প্রায় সাতটা, কিন্তু কালোশশী আশ্চর্য হইয়া বলিল,—বাবু উঠেছেন এত সকালেই। তারপর সগর্বে বলিল,—দেখলি ত'?

অর্থাৎ প্রাতঃকালেই শয্যাত্যাগ করিবার অভ্যাস তাদেরই ছ'জনের একচেটিয়া নয়!

বড়বাবু বলিলেন,—উঠেছি অনেকক্ষণ। কি খবর তোমাদের?

—এরা সব আপনাদের কাছে একটু দরবারে এসেছে।

—আমাদের কাছে কি দরবার?

—আপনাদের কাছেই ত' দরবার ওরা করবে, বাবু। বলিয়া কালোশশী তার মুখভরা হাসি উপস্থিত ব্যক্তিগণের মুখের দিকে চাহিয়া ছড়াইয়া দিল। তারপর বলিল,—নানা রকমের কষ্ট ওদের বাবু। ওদের মুখেই দয়া ক'রে শুনুন।

অগত্যা রাজি হইতে হইল। এতগুলি লোক কষ্টের কথা শুনাইতে আসিয়াছে। ইহাতে প্রীত হইবেন না এমন সৃষ্টিছাড়া মানুষ ও'রা নন। তার উপর, কথার "ইতর বিশেষ" অবগত না হইয়াই প্রত্যাখ্যান করিলে অহঙ্কারী নাম রটিয়া অপ্রিয় হইতে হইবে। তাহাও, আর যেখানেই হোক এখানে শোভন হইবে

না। অতএব চেয়ার চৌকি দক্ষিণের রোয়াকে নামিল। তিন বাবু আর সাত মক্কেল দরবারে বসিয়া গেলেন।

বসিয়া বড়বাবু বলিলেন,—কি তোমাদের কথা বলো।

কালোশশী বলিল,—বলো নির্ভয়ে বলো।

কিন্তু লোকগুলি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। কে আগে সুরু করিবে তাহাও যেন সমস্যা!

মেজবাবু দেখিলেন, বৃথা কালব্যয় হইতেছে। তাঁহার মনে হইল, ইহাদের প্রধান দোষ দীর্ঘসূত্রতা। দীর্ঘসূত্রতা ইহাদের মজ্জাগত। হাঁটায়-বসায়, চোখের চাউনিতে পর্য্যন্ত ইহাদের এমন মন্থরতা আর "যাই-যাচ্ছি আড়ামোড়া" শৈথিল্যের ভাব, যেন কেউ নেহাৎ টানে বলিয়াই নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে এরা চলে, দুরবস্থার মূল আর কোথাও নয়, এইখানেই। মেজবাবুর অভক্তি জন্মিয়া গেল।

বড়বাবু বলিলেন,—কার কি বলবার আছে বলো, আমাদের সময় কম।

—সে ত' ঠিক কথাই, আপনাদের সময়ের দাম কত! বলিয়া সাউকাড় কালোশশী লোকগুলিকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল, 'তোদের এখানে এনে আমিই যে আহাম্মুক বনে গেলাম বাবুদের কাছে। বোকারা সব—ভেবেছিস কি বাবুরা তোদের তাঁবেদার! তোদের মুখের কথা শোনবার জন্যে হাঁ ক'রে বসে থাকবেন? তোরা থাক—আমি চললাম বাবুদের অনুমতি নিয়ে।' বলিয়া কালোশশী হাঁটুতে হাত চাপিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই, জয়নাবের দায়টা ছিল বড়, অবলম্বন সরিয়া যায় দেখিয়া, সে-ই মরিয়া হইয়া তার ক্লেশের কাহিনী সুরু করিয়া দিল।

সংক্ষেপে তাহা এইরূপ—

তার দুর্দ্দান্ত এবং অধার্ম্মিক শ্যালকেরা তার "বিবাহের" স্ত্রীকে নিজেদের বাড়ীতে বলপূর্ব্বক আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিছুতেই ছাড়িয়া দিতেছে না, আনিতে গেলে মারপিটের ভয় দেখাইতেছে। এইরূপ আজ প্রায় ছয় মাস চলিয়া আসিতেছে। অধুনা কষ্ট অধিকতর হইয়াছে এই কারণে যে, পিত্রালয়ে যাওয়ার সময় জয়নাব-পত্নী অন্তঃস্বত্ত্বা ছিল। পনর দিন হইল সৌভাগ্যবতী একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়াছে, কিন্তু পিতার সঙ্গে পুত্রের "চাক্ষুষ" হইতে দুর্ব্বৃত্ত শ্যালকেরা দেয় নাই। আজও।

বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন এমন করে?

জয়নাব বলিল, হুজুর ব'লব কি। আমার শ্বশুরের সম্পত্তির পাঁচ আনা দু' গণ্ডা দু' কড়া দু' ক্রান্তি অংশের মালিক আমার স্ত্রী। সেইটে ওরা লিখিয়ে রেজেষ্ট্রী ক'রে নেবে এই ওদের মৎলব। সে আসতে চায়, কিন্তু তার ভাইয়েরা দলীল না হওয়া পর্য্যন্ত তাকে আটকে রাখবে।

কালোশশী বলিল,—আস্পর্দ্ধা কত!

বড়বাবু মেজবাবুকে জিজ্ঞেস করিলেন— তা কি হয়? স্বামী আর ছেলে থাকতে ভাইকে সম্পত্তি লিখে দিলে সে দলীল কেমন ক'রে 'ভ্যালিড্' হবে! আইনজ্ঞ এঁরা সবাই।

মেজবাবু বলিলেন,—আইন কি তা জানিনে। তবে সামাজিক ব্যবস্থা এই যে, স্ত্রী স্বামীর কাছেই থাকবে; স্ত্রীর সম্পত্তি স্বামীই ভোগ করবে। আইন যদি

কাণ্ডজ্ঞানের নির্ঘণ্ট হয় তবে তাতেও তাই আছে বলে আমার বিশ্বাস। বলিয়া মেজবাবু খুব সপ্রতিভভাবে চেয়ারের হাতলের উপর অঙ্গুলির আঘাত করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন ক্রান্তির পরও ক্ষুদ্র কিছু আছে কি না।

আইন তাহারই অনুকূলে শুনিয়া জয়নাব কাঁদ কাঁদ হইয়া উঠিল; বলিল,—আপনারা থাকতে আইন-আদালত আমরা চিনিনে, হুজুর। খরচান্ত কাজ; ওদিকে যেন কেউ না যায়। যদি হুকুম করেন ত' তাদের একবার ডেকে আনি হুজুরের কাছে। কালোশশীর মন দুলিতে লাগিল।

কোনদিকে টানিয়া কথা বলিলে বিচক্ষণতা বেশী প্রকাশ পাইবে? বাবুরা কি সালিশী করিতে আসিয়াছেন! অথবা, যাও, শীঘ্রই ডাকিয়া আন; এমন সুবিধা আর পাওয়া যাইবে না। মনে মনে তর্ক করিতে করিতেই সময় ফুরাইয়া গেল, ছোটবাবু বলিলেন,—কি দরকারে? দাঙ্গা বাধাতে? তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে দিক বলে তাদের ওপর আমরা জুলুম করতে পারব না। আজকাল সবাই এক আইন ছাড়া আর সবারই পক্ষে স্বাধীন। সে যদি আমাদের কথা গ্রাহ্য না করে। কি জোর আছে তার ওপর আমাদের?

প্রশ্ন শুনিয়া কালোশশী শিহরিয়া উঠিল।

অপরিচ্ছন্ন দাঁত দুটি বাহির করিয়া জিব কাটিয়া বলিল, ছি ছি, অমন কথা বলবেন না—কারো ঘাড়ে—

একাধিক মস্তক নাই ইহা সত্য, কিন্তু মেজবাবু হাত তুলিয়া নির্ঘ্যাতিত কালোশশীর বাক্যোচ্ছ্বাস দমন করিয়া দিলেন।

কালোশশী ঢোক গিলিল, জয়নাব মুখ নামাইয়া রহিল।

কালোশশী বলিল,—মুকুন্দ, তোমার মামলাটাও ফয়সালা করে নাও এই বেলা, তোমার আসামী ত' হাজির।

যেন জয়নাব চূড়ান্ত বিচার পাইয়া নির্ব্বিবাদ হইয়া গেছে।

মুকুন্দের সুদের নালিশ।

পাওনাদার খতের নালিশ করিয়াছিল, ডিক্রীও পাইয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাবুরা যদি অনুগ্রহ করিয়া এই ব্যক্তিকে বুঝাইয়া সুজাইয়া সুদ কিঞ্চিৎ ত্যাগ করাইতে পারেন, তবে গরীবের গরু ক'টি বজায় থাকে।

শুনিয়া পাওনাদার অল্প একটু হাসিল।

এবং বড়বাবু তাহার মামলাও সঙ্গে সঙ্গে "ফয়সালা" করিয়া দিলেন; বলিলেন,—আদালতে ডিক্রীর ওপর হাকিমী করবার অধিকার আমাদের নেই; আমাদের কথা শুনতে ও বাধ্য নয়।

মেজবাবু বলিলেন, শুনতে আমরা বলতেই পারিনে, তার এক কারণ, উভয় পক্ষের বিবরণে আদালতে যে বৃত্তান্ত আমরা অনবগত। তোমাদের উভয় পক্ষেরই সাক্ষী ছিল ত' আদালতে?

—ছিল হুজুর।

—তবে?

হারজিত যারই হোক, বাবুদের ন্যায়বুদ্ধির সংস্কৃত রূপ দেখিয়া পল্লীগ্রামের লোক কয়েকটি বিস্মিত হইয়া গেল, অত ঘুরাইয়া নাক সেকেলে লোক দেখাইত না।

"কেন করবিনে', 'কেন হবে না,' 'কেন দিবিনে'—ইত্যাদি দু'টি একটি হুংকারেই তখন মহা মহা বিবাদ ব্যাপার ঠাণ্ডা হইয়া যাইত, তার দ্বিরুক্তি ছিল না। "আমি বলছি"—বলিয়াই পূর্বেকার কর্তা ব্যক্তিরা আপামরের মধ্যে নিজেকে একাধিপত্যে অটল আর অমেয় করিয়া রাখিতেন। এই মিহি কর্তব্যবোধ আর ঔচিত্য-নিষ্ঠায় উদারতা আর গুণপণা যতই থাক্, সেকেলে দরাজ স্থূল-শক্তির তুলনায় ইহা কাপুরুষতারই নামান্তর; ইহাতে দরদ নাই, নির্মুক্ত প্রসন্নতা নাই।

অপ্রস্তুতে পড়িয়া মুকুন্দ প্রভৃতি দরখাস্তকারিগণ কালোশশীর মুখের দিকে বিমূঢ়-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—কালোশশীই এই কাণ্ডের গুরু, একরকম ভজাইয়াই লোকগুলিকে হাজিরা সে দেওয়াইয়াছে।

কিন্তু কালোশশী তাহাদের মুখের দিকে চাহিল না। বাবুদের বিচারবিমুখ দেখিয়া উহারা ক্ষুণ্ণ হইয়া গেলেও কালোশশীর খুসী হইতে বাধে নাই, বাবুরা সাবেকী আর মামুলী পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া "কাজের খতম" করেন নাই, পল্লী-আসরে একটি চমকপ্রদ সুচারু বৈশিষ্ট্য দিয়াছেন। অথচ কথাগুলি যা বলিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। বটেই ত'। সরকারী মহামান্য আদালত বারমাস খোলা থাকে, কিঞ্চিৎ 'ফিস্' দিলেই অবারিত প্রবেশ-পত্র পাওয়া যাইবে, ওরা এ সবের কি জানেন!

বলিল,—তখনই বলেছিলাম, বাবুদের তোরা বিরক্ত করিসনে; ওদের কাছে নিয়ে আয় আইনের তর্ক, ব্যাখ্যা করে জলের মতো বুঝিয়ে দিবেন। আদালতের জ্ঞাত মারফতে যা শেষ করেছ তার ওপর হাত দেয় গোঁয়ারে—ওঁরা তা পারেন না॥ বুঝ্লি ত'? এখন যা।

ওরা ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল, কিন্তু সরল সত্যটি কালোশশীকে কেহ বলিয়া যাইতে পারিল না, তুমিই ত' আমাদের আনিয়াছ। তুমিই মিথ্যাবাদী।

ছোটবাবু আকাশের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

এমন অপরিমেয় অখণ্ডতা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বস্তু; এমন আনন্দে উদ্বেলিত করিয়া তোলে, যেন অনন্ত আত্মবিলয় ব্যতীত ইহার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিবার অন্য উপায় নাই। এই আকাশই যেন মানুষকে নাচিতে শিখাইয়াছে, ইহার দিকে চাহিয়া মানুষের পা ছন্দধৃত ভঙ্গিমায় উত্থিত পতিত হইয়া, কখন নখাগ্রে ভূমি স্পর্শ করিয়া টিপিয়া টিপিয়া সম্মুখে পশ্চাতে, দক্ষিণে বামে আলোড়িত হইয়াছিল; কখন বাহুযুগল সম্মুখে প্রসারিত করিয়া, কখন ঊর্ধ্বে উচ্ছৃত করিয়া, কখন দেহ দুলাইয়া, কখন দেহ নমিত করিয়া, সংকুচিত করিয়া, ঊর্ধ্বায়িত করিয়া, লতায়িত করিয়া সে প্রথম নৃত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

তারপর গতি—সূর্য্যালোকে সে পথ দেখিয়াছিল।

পাখীর গানের সঙ্গে সে এমন গান গাহিয়াছিল, যার ভাষা নাই, যার ভাষার প্রয়োজন নাই।

অত্যাশ্চর্য্য নীল-ব্যাপ্তিকে খণ্ডিত করিয়া আর অলংকৃত করিয়া লঘু হস্তের স্পর্শের মতো খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ ভাসিয়া চলিতেছে।

দেখিয়া পৃথিবীকে এমন শান্ত নির্ব্বিকার নিরাপদ মনে হয়, যেন পৃথিবী কেবল এখনই ভূমিষ্ঠ হইল, এখনও তার চোখ ফোটে নাই।

অবাধ চমৎকার রৌদ্র দিক্‌সীমা পর্য্যন্ত মৃত্তিকার অঙ্গ পুলকিত করিয়া তুলিয়াছে।

প্রথম রৌদ্রচ্ছটা দেখিয়া মানুষ কি করিয়াছিল। ইহার ঔজ্জ্বল্য তাহাকে বিস্মিত করিয়াছিল নিশ্চয় নিষ্কম্প নিষ্পলক দীপ্তি তাহাকে ভীত করিয়াছিল, না কৌতূহলী করিয়াছিল বেশী।

ছায়ায় দাঁড়াইয়া সে ভয়ে ভয়ে পা বাড়াইয়া এক পায় দুই পায় ছায়ার সীমায় যাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তারপর অতি সন্তর্পণে রৌদ্রের ভিতর পা দিয়াই গরম লাগায় তাড়াতাড়ি পা টানিয়া লইয়াছিল। একবার লাফাইয়া রৌদ্রে পড়িয়া তখনি ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল! এমনি করিয়া কতক্ষণ সে রৌদ্র-ছায়ায় খেলা করিয়াছিল ঠিক কি! অবশেষে দেখা গেল রৌদ্র ক্ষতি কিছু করে না। ক্রমে একেবারে নির্ভয় হইয়া রৌদ্রে যাইয়া সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোথা হইতে এই অপূর্ব্ব বস্তু আসিতেছে! যে এমন জিনিষ এই শীতল মৃত্তিকায় পাঠাইয়াছে, তাহাকে স্তব কর, সূর্য্যই মানুষের আদি-দেবতা হওয়া উচিত। আকাশের নিম্নে আর রৌদ্রের অভ্যন্তরে দাঁড়াইয়া তাহার কণ্ঠ দিয়া যে অব্যক্ত আনন্দনাদ নির্গত হইয়াছিল, তাহাই বোধ হয় ওম্।

এদিকে কয়েকটি এক আউন্স ওজনের পাখী কি কাজে মাতিয়া উঠিয়াছে তাহার উদ্দেশ নাই। একটি বৃক্ষবীথিকার দুধার পল্লবে অন্ধকার, মাঝখানে বিহসিত আলোর অচঞ্চল ধারা।

পাখীগুলি তাহার মাঝে সরিয়া আসিয়াছে, একই পরিবারের কয়েকটি, তীর-বেগে তারা ছুটাছুটি করিতেছে। যেন কোথায় কি ঘটিতেছে তাহা তখনই তাদের জানা চাই-ই—একই সময়ে সর্ব্বস্থানে উপস্থিত থাকিতে না পারিলে দেখাটা বাদ পড়িয়া যাইবে, সোজা পথে তাই এক নিমিষের বেশী সময় ছুটিবার উপায় নাই, এই ডাইনে, এই বাঁয়ে, এই উপরে, এই নীচুতে; মুহুর্ম্মুহুঃ দেখা দিয়া তারা পাশেই কোথায় অন্তর্হিত হইতেছে।

একটি প্রজাপতি উড়িতেছে।

ছোটবাবু বিস্মিত হইলেন, অত সূক্ষ্ম পক্ষ দুটি অত আন্দোলন সহ্য করিতেছে কেমন করিয়া! মানুষের সুখ, বিচরণের লালসা আছে, আর সৌন্দর্য্যের সন্ধানী সে, কিন্তু আজও সে প্রজাপতিটির রূপের অনুকরণ আর অন্তরের অনুসরণ করিতে পারে নাই। বোঁ করিয়া একটা বোলতা কানের পাশ দিয়া উড়িয়া গেল, ছোটবাবু চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন—তারপর?

মেজবাবু হাসিয়া বলিলেন,—কিসের তারপর। তারা সবাই চলে গেছে!

কিন্তু তারা চলিয়া গেলেও অপরে আসিতেছিল, তখনই একটা বুক-ফাটা চীৎকার শোনা গেল,—দোহাই বাবুদের—গরীবের মা-বাপ।

বাবুরা উদগ্রীব হইলেন।

চীৎকার শব্দ অগ্রসর হইতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে নিকটবর্ত্তী হইয়া বাবুদের সম্মুখস্থ হইয়া দাঁড়াইল।

বাবুরা দেখিলেন, লোকটি প্রৌঢ় এবং তাহার হাতে ধারাল একখানা কাটারি রহিয়াছে।

—কি খবর?

প্রশ্নের উত্তরে লোকটি যাহা বলিল তাহা এই, সে তার গাভীটি খুঁজিয়া পাইতেছিল না, কাল দ্বিপ্রহর হইতে। আজ প্রাতঃকালে দক্ষদমন সিকদারের কথায় তাহার বিস্মৃত কথা মনে পড়িয়া যায় এবং দেখিতে পাওয়া যায় যে, দক্ষদমন সিকদারের দেওয়া সংবাদ সত্য, গরু খোঁয়াড়ে আছে। তাহার নাম মদন, কিন্তু গগন নামে এই গ্রামে একটি লোক বাস করে, যাহার কাজ কেবল পরের গরু তাড়াইয়া লইয়া খোঁয়াড়ে ঢুকাইয়া পয়সা লওয়া, ইহাকে দিনে ডাকাতি বলিতেই হইবে। গগনের অত্যাচার অসহ্য হইয়াছে; বাবুরা ইহার 'বিহিত' না করিলে সে কাটারির সাহায্যে নিজেই অন্যায়ের প্রতিকার যতদূর পারে করিবে, বাবুরা যেন তখন তাহাকে দুষ্ট লোক মনে করিয়া অপরাধী করিয়া না বসেন। অভিযোগ নিবেদন করিয়া এবং কাটারি রাখিয়া মদন বাবুদের শ্রীচরণে ভক্তিভরে প্রণত হইল, কিন্তু তাহার নাক দিয়া যে ফোঁস ফোঁস শব্দটা নির্গত হইতেছিল তাহা ক্ষান্ত হইল না।

মেজবাবু প্রশ্ন করিলেন, গরুটি ছাড়িয়ে আনতে তোমার কত লেগেছে?

—পাঁচ আনা, বাবু।

—পাঁচ আনার জন্যে তুমি মানুষকে কাটারি দেখাচ্ছ! তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।

ছোটবাবু বলিলেন, তুমি ছেলেমানুষী করছ। মেজাজ ঠাণ্ডা করে আমাদের সামনে তোমার দুঃখ জানালে একটা উপায় বলে দিতে হয়তো পারতাম; কিন্তু তুমি আস্ফালন করে আমাদের মন বেঁকিয়ে দিয়েছ। বুঝলে?

মদন বুঝিতে পারে নাই যে, আর কেউ না হোক, ছোটবাবু তাহার ক্ষতিতে নয়, তাঁহাদের সম্মুখে অসংযত আচরণে দুঃখিত হইয়া গেছেন।

মদন কথা কহিল না, কেমন অপ্রতিভ হইয়া রহিল।

বড়বাবু বলিলেন, তোমার কথা সত্যি তা কেমন করে জানব?

বড়বাবুর মনে হইতেছিল, সমগ্র ব্যাপারটা খুব প্রকাণ্ড হইয়া উঠিতে পারে।

মদন বলিলও তাই।

—আমি গাঁয়ের লোক সবাইকে ডেকে এনে প্রমাণ দিচ্ছি, বাবু, যে ওর স্বভাবই ঐ।

ছোটবাবু শিহরিয়া উঠলেন; বলিলেন, থাক। আমরা বিচার করবার কে! সে ভার আমাদের নিতে যাওয়া অনাবশ্যক। যদি আর কোনো কথা না থাকে তবে যেতে পারো।

মদন কাটারিখানা তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

এবং সেই পথেই আর পরক্ষণেই যে ব্যক্তি প্রবেশ করিল, দেখা গেল, তাহার হাতে একটি চারা-গাছ রহিয়াছে, চারাটির মূলে একটি সিক্ত মৃত্তিকা-স্তূপে প্রোথিত।

ছোটবাবু দেখিলেন, পাতাগুলি তার চমৎকার সতেজ। লোকটি মৃত্তিকা-

স্ত‍ূপসহ চারা গাছটিকে রোয়াকের উপর খাড়া করিয়া বসাইয়া দিল ; তারপর মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, বিলিতি আমড়ার চারা, বাব‍ু ; আপনাদের দেব বলে এনেছি। বলিয়া লোকটি নিজের দানের গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল, বলিল, এমন আমড়া এ-গাছে ফলবে যা বলতে নেই, আম ফেলে খাবেন। কোথায় বসাব।

বাব‍ুদের হাসি পাইতে লাগিল, কিন্তু কেহ হাসিলেন না।

মেজবাব‍ু মিষ্টকণ্ঠে বলিলেন, তোমার বাড়ীতে বসাও গিয়ে, আমরা আজ আছি কাল নেই।

—ছি ছি, তা কি হয়! দেব বলে এনেছি, ফিরিয়ে নিয়ে যাব না। বলিয়া সে দ‍ু'বার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, তা নিয়ে যাব না। আর আজ আছি কাল নেই, ও-কথা বলতে নেই। আপনারা চিরদিন বজায় থাকুন ধনে-প‍ুত্রে। এই গাছে আমড়া ফলবে, আপনাদের ছেলেমেয়েরা ঝোল-অম্বল খাবে আর বলবে, গিরি কেওটের গাছের আমড়ার ঝোল-অম্বল খাচ্ছি। বসিয়ে দিয়ে যাই, বাব‍ু! বলিয়া গিরি কেওট অতিশয় সকর‍ুণ-দ‍ৃষ্টিতে বাব‍ুদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, যেন এই অপার সংকটে ত্রাণ তার চাই-ই।

এই উপঢৌকনের সামগ্রী অপ‍ূর্ব, তাহা লওয়াইবার জিদও অপ‍ূর্ব, লোকটির আশাও অপ‍ূর্ব।

এবং প্রত্যাখ্যান করিলে তাহার হতাশাও অপ‍ূর্ব হইবে মনে করিয়া ভীত হইয়া বড়বাব‍ু বলিলেন, তা বেশ, তোমার ইচ্ছে হয়েছে যখন তখন র‍ুয়ে দিয়ে যাও, যেখানে তোমার খ‍ুশী।

অন‍ুমতি লাভ করিয়া গিরি কেওটের দেহ যেন আনন্দে দীর্ঘতর হইয়া উঠিল।

আরও ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া সে স্ম‍ৃতি-চিহ্ন রোপণ করিতে চলিয়া গেল।

বাব‍ুরা হাসিতে লাগিলেন।

তিনজনেই দেখিলেন, একটি শীর্ণদেহা কুক্ক‍ুরী ছুটিয়া আসিল, পশ্চাতে তার পাঁচটি স্তন্যপিপাস‍ু সন্তান, কুক্ক‍ুরী অদ‍ূরে পা মেলিয়া দিয়া মাথা খাড়া করিয়া শ‍ুইল ; বাচ্চাগ‍ুলি স্তনে মুখ লাগাইবার শশব্যস্ত ব্যাকুলতায় কাহার ঘাড়ে কে চাপিল, তাহার ঠিক রহিল না, সকলে মুখ না লাগাইতেই জননী উঠিয়া পড়িল, বাচ্চাগ‍ুলিকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইল।

ছোটবাব‍ু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তাঁর মনে হইল, পরিত্যক্ত সন্তানগ‍ুলির পেট ভরা দ‍ূরে থাক, গলাই ভেজে নাই। তিনি উঠিয়া রোয়াকের উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন।

দ‍ূরে কোন বাদ্যব্যবসায়ীর গ‍ৃহে সানাইয়ের শব্দ হইল, শিক্ষানবিশের ফ‍ুৎকারে যন্ত্র দিয়া যে আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল তাহা মধ‍ুর কিছুতেই নয়, সানাইয়ের আশে-পাশে ঢোলেও কয়েকবার কাঠি পড়িল।

একটি বায়সী তার সন্তানের গলার ভিতর খাদ্য প্রবেশ করাইয়া দিতেছে, বাচ্চার এতবড় হাঁ, ভিতরটা লাল ; তার ক্ষ‍ুধার যেন ইয়ত্তা নাই, মায়ের মুখ হইতে আহার্য গ্রহণ করিতে তার এমনি কলরব আর অস্থিরতা।

সানাইয়ের শব্দ বন্ধ হইয়া গেল।

কোথায় একটা কোলাহল সুরু হইয়াছিল—সানাইয়ের শব্দে চাপা পড়িয়া বোধ হয় তাহা কর্ণে প্রবেশ করে নাই ; সানাই থামিতেই তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

স্বীয় পল্লী অন্তর স্পর্শ করিতেছে না, ক্ষুণ্ণ এবং আনমনা হইয়া তিনজনেই ইহা ভাবিতেছিলেন, এবং সম্ভবতঃ একটা আলোচনার সৃষ্টি হইত, কিন্তু ঐ কোলাহল শুনিয়া তিনজনেই উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন।

ছোটবাবু যাইয়া রোয়াকের প্রান্তে দাঁড়াইলেন ; সেখান হইতে কালোশশী কর্তৃক নির্ম্মিত গেট দেখা যায়, কিন্তু বেণুবন ও আম্র-বাগিচার অন্তরালে কি ঘটিতেছে তাহা জানিবার উপায় নাই।

বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—গোলমাল কিসের ?

মেজবাবু বলিলেন, আমরা কেউই তা জানিনে।—এমন অপ্রত্যাশিত ব্যাপার সব দেখতে হচ্ছে যে, আমি ত' অবাক হয়ে গেছি। বলিতে বলিতেই ছোটবাবু তাড়াতাড়ি আসিয়া আপন আসনে বসিয়া পড়িলেন।

—কি ? বলিয়া মেজবাবু উৎকণ্ঠিত হইলেন।

ছোটবাবু বলিলেন, অনেকগুলি লোক এদিকে আসছে।

—আসুক। বলিয়া মেজবাবু, তাহাদের আসিবার সম্ভাবনা যেদিক হইতে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন।

বড়বাবু বলিলেন, কিছুই ভাবতে দিচ্ছে না।

তৎক্ষণাৎ যে ব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইল, বাবুরা দেখিলেন, সম্পূর্ণ নগ্ন হইয়া যাইতে তার অল্পই বাকি আছে, বস্ত্র বলিয়া যে আবরণ সে ধারণ করিয়াছে তাহা এমনি ক্ষুদ্র ; কিন্তু তার কাঁধের লাঠিখানা খুবই বড় আর বলিষ্ঠ।

লোকটি খুব উত্তেজিত হইয়াই আসিয়াছিল। কিন্তু বুঝা গেল, সুস্থির হইয়া সে কথা বলিতে চায়।

ছোটবাবু শঙ্কায় আশায় মিলিত একটা ভাব লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন ; কিন্তু আর কেহ দেখা দিল না। খানিক নিঃশব্দ থাকিয়া এবং সম্ভবতঃ ক্রন্দন দমন করিয়া সে বড়বাবুর সৌম্য-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বলিল, এ গাঁয়ে আর থাকা গেল না, বাবু, গাছের ফল লুটে নিতে লেগেছে, আপনাদের দুয়োরে এসে দাঁড়ালাম—আমি বিচার চাই আপনাদের কাছে।

কাংস্য এবং মৃৎপাত্রের মতো পরস্পরের এই অবিরাম ঠোকাঠুকি এবং একজনের গাত্রে অনিবার্য্য ছিদ্র হওয়ার কাহিনী ভাল লাগিবার কথা নয় ; তবু বড়বাবু মিষ্টস্বরে বলিলেন, কি হয়েছে তোমার বলো !

কিন্তু শুনিয়া উহাদের মনে হইল, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই হয় নাই !

লোকটি বলিল, তাহার সুপারি গাছে উঠিয়া প্রতিবেশী মেহেরের ছেলে আদু রাশীকৃত সুপারি ছিঁড়িয়া লইয়া গেছে ৮।১০টি খুব হইবে। অপক্ব সুপারি যাহা সে গাছের তলদেশে ফেলিয়া গেছে, তাহার নমুনা সে হাতে করিয়াই আনিয়াছিল, বাবুদের সে তাহা দেখাইল। ইহা ছোটখাট চুরি নহে ; দিবাভাগে ঘটিয়াছে বলিয়া ইহা দুঃসাহসিক ডাকাতি, এবং পিতামাতার প্ররোচনায় ঘটিয়াছে

এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ আছে বলিয়া ইহাকে প্রশ্রয় দিবার ফল আরো ভয়ংকর, চোরের বাপের মায়ের কথায় যে বিশ্বাস করে সে অখাদ্য খায় ; তাহারা যত পারে অস্বীকার করুক, বাবুরা যেন তাহা ঘৃণাক্ষরেও প্রত্যয় না করেন। তাহারা সবাই মিলিয়া একই সুরে তাহাকে গালি দিয়াছে, এবং তাহাদের মনে যে পাপ আছে তাহার অকাট্য প্রমাণ এই যে, বাবুদের সম্মুখীন হইতে তাহাদের সাহস হয় নাই।—এখন, বাবুরা কি সুবিচার করেন তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে—

অতিশয় বাহুল্যদোষযুক্ত ভাষায় এবং অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে এই অভিযোগ এবং কাঁচা সুপারিটি বাবুদের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া সে রোয়াকের উপর উঠিয়া পা ঝুলাইয়া বসিল।

ছোটবাবু বলিলেন, তোমার সঙ্গে যারা আসছিল তারা কই ?

লোকটি হঠাৎ নামিয়া দাঁড়াইল ; বলিল, তারা ফিরে গেছে, বাবু।—সাক্ষী আমার আছে, বাবু ; বলেন ত' ডাকি।

—না, দরকার নেই।—আমরা বলি, তুমি আদুকে ক্ষমা করো ; সামান্য ৮।১০টি সুপারি ত' !—বলিয়াই মেজবাবু দেখিলেন, লোকটির চোখে বিস্ময়ের যেন অন্ত নাই।

এবং বাবুত্রয়কে বিস্মিত করিয়া সে বলিল, আপনারা বুঝলেন না আমার কথাটা, ভগবান নারাজ, যারা ভাল করতে পারে তাদের মনও তিনি কেড়ে নিয়েছেন ; আমাদের জন্যে রাখেন নাই।—বলিয়া লোকটি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল ; বাবুরা প্রশ্ন করিবার সময়ই পাইলেন না।

বড়বাবু কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, কি অপরাধ করলাম।

—তা জানিনে বড়দা , শেষ করো। বলিয়া মেজবাবু উঠিলেন।

রামহরিকে ডাক পড়িল, চেয়ার চৌকি ঘরে উঠিল ; বাবুদের বিশ্রামের অবসর মিলিল।

পল্লীকে কমনীয় নম্র শান্তিনিকেতন কল্পনা করিয়া ইঁহারা তাহাকে বিচার নয়, প্রশংসা নয়, সম্ভোগ নয়, কেবল একখানি অত্যাশ্চর্য ছাঁচের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতেন, কিন্তু তাহার যথার্থস্বরূপ দেখিয়া বিব্রত কি বিস্মিত হইলেন না, হতাশ হইয়া গেলেন—তাঁহাদের অনিন্দ্য ভাবমূর্ত্তির বিকৃতি যেন তাঁহাদের আত্মকৃত পাপে পরিণামের মতো সুপ্রত্যক্ষ হইয়া দেখা দিল।

মাত্র গুটিকতক সুপারির জন্য অত বড় আলোড়ন উপস্থিত করা শুধু আধ্যাত্মিকতার অভাবেরই লক্ষণ নহে ; অত্যন্ত নির্লজ্জ স্বার্থোপাসনার পরিচয়।

মেজবাবুর মনে হইল, পল্লীর শান্তি পল্লীরই শান্তিপ্রিয়তার রচনা নহে, আবহাওয়ার গুণ নহে, তার নিঃসঙ্গ নিমজ্জমান অন্তরের বেদনা নহে, কেবল কুঁড়ের যা দোষ—সেই ঝিমুনি। আরো তাঁর কষ্ট হইতে লাগিল ইহাই উপলব্ধি করিয়া যে, পল্লীর নিজস্ব মাদকতা নাই, কেবল কঠিন আত্মপরায়ণতা মানুষগুলির প্রত্যেককে যেমন করিয়া আপন আপন গণ্ডীর ভিতর স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে, যে ইহার সংস্রবে তাহাকেই তেমনি চারিদিককার অজ্ঞাত স্থান হইতে বিশীর্ণ আঙুল বাড়াইয়া যেন ফাঁদে জড়াইয়া গ্রাস করিয়া ফেলিতে চায়!

তিনি দেখিতে ভুলিয়া গেলেন যে, শ্রুতি-উৎপীড়ক যত গণ্ডগোল এ-পর্য্যন্ত তাঁহারা শুনিতে পাইয়াছেন, তার প্রত্যেকটিই অর্থসমস্যামূলক—এবং তাহা অতি গভীর। যাহার সুপারি চুরি গিয়াছে, ঐ সুপারি ক'টিই ছিল তার অন্ততঃ এক সপ্তাহের নুন-তেলের সংস্থানের উপায়, সুপারির পয়সায় পাঁচটি। গগন প্রামাণিক বনাম মদনচন্দ্র মামলাতেও তা-ই—ঐ পেটের দায়. মদন নির্দ্দোষ গরুকে লইয়া খোঁয়াড়ে দিয়া কিঞ্চিৎ নুন-তেলের পয়সা করিয়াছে—এবং মদনের পাঁচ আনা অপব্যয়িত না হইলে ঐ পাঁচ আনায় কত কি যে হইতে পারিত তাহার ইয়ত্তাই নাই। ফন্দ করিয়া লটকানা দোকানে দিলে ঐ পাঁচ আনায় পঁচিশটি ছোট-বড় মোড়ক পাওয়া যাইত। স্ত্রীর সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিয়া যাহাকে শ্যালকেরা পথে বসাইবার উদ্যোগ করিতেছে সে ভাবিতেছে, স্ত্রীর ঐ পাঁচ আনা ছয় গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি অংশ তাহার আয়ত্তে থাকিলে তার অভাব কমিবে, শ্যালকেরা ভাবিতেছে, ভগিনীর ঐ অংশটুকু যে-সে করিয়া লিখিয়া লইতে পারিলেই কিছু আয় বাড়িবে।

আশু প্রয়োজনের অতিরিক্ত এতটুকু এককণা তাহাদের কাহারো ভাণ্ডারে নাই, মনের ভুলেও নাই, যাহার যতটুকু যাক্ ততটুকুই অমূল্য ও অত্যাজ্য, মনের তরতিব ভাঙ্গিয়া তাহাতেই তার পাগল পাগল ঠেকে। তাহাদের অবিরাম মনে হয়, যেন কাহারো অনুপস্থিতির সুযোগে আসিয়া বসিয়াছে. সে আসিলেই উঠিয়া যাইতে হইবে ; তাই তাহাদের ধৈর্য্য এত কম।

ছোটবাবু ভাবিলেন, প্রকৃতির প্রসন্নতা, ক্রীড়াশীলতা ও সাত্ত্বিকতা ইহাদের চোখের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াও ইহাদের মনের গুহায় প্রবেশ করিতে পারে নাই ; তাই এরা এত সংকীর্ণ।

বড়বাবু ভাবিলেন, দৈববিড়ম্বনায় কোনো কাজই যেন মনের মতো সুষ্ঠু হইতেছে না, লোকগুলি তাঁদের অপরিপক্ব মনে করিতেছে কি অকালপক্ব মনে করিতেছে কে জানে? জ্যাঠামশায় কি বিপদেই ফেলিয়াছেন। লোকটার হাতের কাটারিখানা কি ভয়ংকর! লোকগুলির দৃষ্টির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা গেল, কখন একনিবিষ্ট, কখন বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, কখন প্রবীণোচিত গম্ভীর কিন্তু নিঃস্পৃহ ; কিন্তু চোখের তারা কোণের দিকে আনিয়া যখন পাশের দিকে চায়, তখন ভয় করে, অত্যন্ত ধূর্ত্ত চাহনি, দুঃসাহসী আর নির্ম্মমও বটে, মানুষের যে কোনো হানি যে কোনো সময়ে যে কোনো কারণে করিতে পারে!

কিন্তু ইঁহাদের এবং ইঁহাদের তুল্য কলিকাতাবাসী বাবুদের সম্বন্ধে কালোশশীর গোপন মতামত অবগত হইলে ইঁহারা এবং তাঁহারা সমান অবাক হইয়া যাইবেন। কালোশশী একবার কলিকাতা যাইয়া অনেকের বাসস্থান এবং কর্ম্মস্থল দেখিয়া আসিয়াছিল।

প্রথমেই তার মনে হইয়াছিল, ইহাদের দুবেলা ক্ষুধা হয় না নিশ্চয়ই ; "পায়রাখুপীর" মধ্যে আবদ্ধ জীবগুলি মাথায় হাড় না ভাঙিয়াও এদিক ওদিক কেমন করিয়া বেড়ায় তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও পারিপাট্য প্রশংসনীয় বটে, দিব্যি ফিটফাট্। মানুষের কথা ছাড়িয়া দিলেও, গরুটি কি বাছুরটি যে একবার লেজ তুলিয়া দৌড়াইয়া আসিবে সে স্থান লোকালয়ের কাছে কোথাও নাই ;

গরু বাছুরেরই কষ্ট বেশী—শীতে ঠিরঠির করিয়া কাঁপে ; একটু রৌদ্র পায় না। লোকের ঐশ্বর্য্য খুব, তিরিশ হাজার মটর গাড়ী দিনরাত ছুটাছুটি করিতেছে—গণিয়া কেহ দেখিতে পারে না ; গাড়ীর সম্মুখে ও পশ্চাতে নম্বর থাকে। বাবুর নীচের গদি, তাঁর কোমর হইতে মাথা পর্যান্ত গদির উপর বসান থাকে. বাবু মোটরের ভিতর বসিয়া থাকেন, আর সংবাদপত্র পাঠ করেন ; যাতায়াতের ঐ সময়টাই তাঁর পাঠের অবসর। বাড়ীর পর বাড়ী গায়ে গায়ে লাগা, সম্মুখে বাড়ী, পশ্চাতে বাড়ী, মানুষ যে চোখ মেলিবে তাহার একটু ফাঁক নাই।

দেখিবার জিনিষ ? ঢের আছে ; কিন্তু আমরা তার কি বুঝি ! তবে হ্যাঁ, ব্যবসার স্থান বটে, জাহাজ, নৌকা, রেল, ষ্টিমার মটর, গো-যান যাহা চাও পয়সা দিলেই প্রস্তুত। তিন দিন তিন রাত্রি ছিলাম, দিনে ক্ষুধা পায় নাই, রাত্রে নিদ্রা হয় নাই, গ্রামে আসিয়া শরীরে বাতাস লাগাইয়া তবে বাঁচি।

বাবুরা ? এ-বাবুতে সে-বাবুতে কলিকাতায় তফাৎ কিছু নাই, ভিড়ের ভিতরে সবাই সমান নগণ্য আর বোধ হয় অপদার্থ, তবে যাহার কাছে যাহার খাতির তাহার কাছেই সে বড়।

পল্লীগ্রামে আসিয়া ইহারা কেহ কেহ একটা অদ্ভুত ভাব ধারণ করেন, মনে ভয়, মুখে বাচালতা, যার নাম দিতে চান সপ্রতিভতা ; তাঁরা মনে করেন, নির্ব্বোধেরা তাঁহাদের অস্বাচ্ছন্দ্যের অস্থিরতা ধরিতে পারিতেছে না। তাঁহাদের চতুরতা, বুদ্ধি, আর যে কোনো ব্যাপার চক্ষের পলকে বুঝিয়া ফেলিবার অসাধারণ ক্ষমতার কাছে ইহারা একেবারে বেচারা। কিন্তু ধরা পড়িয়া যান কথায়।

এক বাবু কালোশশীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তোমরা জল খাও কোথাকার ?

কালোশশী এই বাহুল্য প্রশ্নের উত্তরে মনে মনে কৌতুকী হইয়া প্রকাশ্যে ঘাড় হেঁট করিয়া বলিয়াছিল,— আজ্ঞে, নদীর জল।

—এই মরা নদীর নোংরা জল খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে হে ? আমাদের কলের জল খাওয়া অভ্যাস, বুঝলে ?

কালোশশীর মনে হইল, বাবু একটি আর্ত্তনাদ চাপিয়া গেলেন ; সে ঘাড় আরো নোয়াইয়া বলিয়াছিল, আজ্ঞে, তা বই কি ; আপনারা যে এদিকে আসেন সে ত' প্রাণ একেবারে হাতে ক'রে ! আপনাদের দয়া অগাধ তাই ত' আসেন। বলিয়া কালোশশী পরম দয়ালুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় গদগদ হইয়া গিয়াছিল। বাবুরা যেন পল্লীবাসীর সৌভাগ্যশালী জ্ঞাতি-পুরুষ, অধঃপতিত আর বহুদূরবর্ত্তী এ-পুরুষের সঙ্গে মাত্র একটা গোত্রের সম্বন্ধ আছে ; তাহা যিনি চক্ষুলজ্জায় লুকাইয়া রাখিতে চান না, তিনি দরিদ্রের কৃতজ্ঞতাভাজন।

বাবুটি বলিয়াছিলেন,—হ্যাঁ, আসব বই কি ! পল্লী ছাড়া কি আমাদের গত্যন্তর আছে ? ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আমরা খুব ভাবছি : আর চাষের কথাও আমাদের সভায় মাঝে মাঝে আলোচিত হয়—বিশেষজ্ঞ আছেন। খবরের কাগজে দেখে থাকবে।

কালোশশী সময় বুঝিয়া কোট পরিয়া দেখা দিলেও খবরের কাগজে কি থাকে তাহা কস্মিনকালেও জানে না ; কিন্তু অম্লানবদনে বলিয়াছিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ ; আপনার নাম আমি বহুবার খবরের কাগজে দেখেছি।

শুনিয়া বাবুটি কালোশশীকে নিজের পাশে বসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

বলিয়াছিলেন,— কিন্তু মুস্কিল কি জান। সব পল্লীরই এক সমস্যা নয়, কারো জলাভাব, কারো রোগ, কারো দারিদ্র্য, কারো আবার গো-সঙ্কট; আবার সে বৎসর একটা গ্রামে গিয়েছিলাম। পর্ব্বতাকার মাটির ঢিপির ওপর তারা ঘর বেঁধে বাস করে, আর বর্ষাকালে কোন একটা খাল দিয়ে নদীর জল ঢুকে ধান-পান নষ্ট করে ফেলে, তাদের সমস্যা ঐ খালটা, জলের বেগে কোন বাঁধই টিকছে না। কারো আবার তিন মাইল লম্বা এক খাল কেটে দিতে পারলে সুবিধে হয়, বর্ষার জল বেরিয়ে গিয়ে আবাদ চলতে পারে। দেখ কি দুরূহ ব্যাপার। তবে আমরা সাধারণভাবে শ্রেণীবিভাগ করে নিয়েছি, ম্যালেরিয়া আর গোচারণভূমিই আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে। একটিকে তাড়াব, আর একটাকে তৈরী করব। জিজ্ঞাসা করবে, কেমন ক'রে তৈরী করব? ফসলের জমি যদি ফসল বেশী দেয়, ঢের বেশী, তবে লোকে খানিকটা জমি গরুর জন্যে উদ্বৃত্ত করে রেখে দিতে অক্লেশেই পারবে। ভূমিকে উর্ব্বরা করো—সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কি বলো তুমি?

কালোশশী বলিয়াছিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। একদিন মাথা ধরায় বাবুটি গ্রামের উর্ব্বরা ও অনুর্ব্বরা ভূমির আনুমানিক পরিমাণ লিখিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিয়াছিলেন। মুর্গীর ডিমের দাম এখনও রহিমতুল্লার পাওনা আছে।

তার পর তিন বৎসর কাহাকেও এদিকে দেখা যায় নাই। এবার বাবুরা আসিয়াছেন!

সেই দিনই—

তিন ভাই নদীর ধারে ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে ছোটবাবু সহসা বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, "গোধূলি" শব্দটা তাঁর মনে পড়িয়া গেছে, দিনান্তে প্রতিদিনই এই মনোরম লগ্নটা নিশ্চয়ই আসে, এখানে সেখানেও; কিন্তু কলিকাতার পার্কে বেড়াইবার সময় ঐ শব্দটা কদাপি তাঁর মনে পড়ে নাই। সূর্য্য এখন কোথায় তার ঠিক নাই, কিন্তু তাঁর বিপরীত প্রান্তে মেঘে মেঘে যে অগণিত বর্ণের মুহুর্ম্মুহুঃ গ্রহণ আর মোচন ঘটিতেছে তাহা কেবল আকাশের নয়, চোখের নয়, মনেরও সম্পদ।

ছোটবাবু হাসিয়া বলিলেন, বড়-দা, আমি কবিতা লিখতে পারি বোধ হয়, দিন কতক এখানে থাকলে না লিখে পারব না।

—হঠাৎ?

—দেখছি তাই। 'গোধূলি' কথাটা ভারি মনে পড়ে গেল; আর মনে পড়ে ভাল লাগছে।

মেজবাবু ইংরেজিতে প্রকাশ করিলেন,—ভাল লাগার কারণ, মনে তোমার গোধূলির রূপ একটা ছিলই; সেইটে এই সময়ে বাইরে তোমার নজরে পড়েছে, এটাকে কাব্যের উদগার বলা যায়। এ সময়ে অনেকের বিয়ের কথাও মনে পড়ে যেতে পারে।

বড়বাবু বলিলেন,—আমার ভয় হচ্ছে, আমরা কিছুদিন এখানে থাকলে লোকে প্রকাশ্যেই আমাদের ঘৃণা করবে। আমরা এদের সঙ্গে মিশতে পারছিনে।

—তার বাধা ওরাই। বলিয়া মেজবাবু হাতের ছড়ি প্রবলবেগে ঘুরাইতে লাগিলেন।

—না বলেই মনে হয়। ওরা যে সকাল বেলা এসেছিল, ঠিকই এসেছিল; আমরা তাদের মনের ইচ্ছেটা ধরতে না পেরে তাদের ক্ষুণ্ণ করেছি। আমরা হস্তক্ষেপ না করায় যে জিতে গেছে সে-ও সন্তুষ্ট হয় নি।

ছোটবাবু হাসিয়া বলিলেন, কি করে ভেতরকার এত কথা জানলে ?

—যে সুদের টাকা কমাতে এসেছিল, সে ডিক্রীদারকেও সঙ্গে এনেছিল, অত সহজে সে মুস্কিলে পড়তে আসত না যদি মনে মনে একটা কিছু সম্ভোগের আশা তার না থাকত। আমরা প্রচণ্ড একটা কথা কাটাকাটি ঝগড়ার পর তাকে জিতিয়ে দিলে সে লাফাতে লাফাতে যেত, জিতে তার সুখ হয় নি। ঢোঁড়া সাপকে দেখে মানুষ হাসে; অতি নিরীহ লোককে মানুষ অবজ্ঞা করে, বলে ঢোঁড়া; কিন্তু গোখরোকে দেখে ভয় পেলেও তার উগ্রতাকে ভালবাসে।

মেজবাবু বলিলেন, তুমি মনস্তত্ত্ববিদ তা জানতাম না—এবার কেউ এলে 'ফুল বেঞ্চে' ফেলে খানিক লাঠালাঠি করে কাজের গৌরব বাড়িয়ে অবশেষে তাকে ছুবলে দেওয়া যাবে।

ছোটবাবু বলিলেন, তা দিও; কিন্তু এদিকে আমি যে দেউলে হ'য়ে যাচ্ছি।

—কিসে ?

—নদীতে যদি স্রোত না থাকে, তবে বড় শোচনীয় হয় না! মনে হ'চ্ছে গ্রামটারই যেন নাড়ী বসে গেছে, গেছেও তাই। এমন সুন্দর সময়ে নদীর ধারটিতে কেউ বেড়াতে আসে নি—ঘরে বসে মশার কামড় খাচ্ছে।

বড়বাবু বলিলেন, তারা আঁতুড়-ঘর থেকে বেরিয়েই নদীর ধার দেখছে, রোজ রোজ কি আর নূতন জিনিষ দেখতে আসবে।

শুনিয়া ছোটবাবু ভাবিলেন, ইহাদের একটি চক্ষুষ্মাণ অভিভাবক চাই, যে নিজের চক্ষে দেখিয়া উহাদের দেখাইবে প্রকৃতির এই চরম প্রফুল্লতা।

বড়বাবু বলিতে লাগিলেন, এখানকার ডাকঘরের কেমন বন্দোবস্ত জানিনে, কাগজখানা পেলাম না। 'এ্যাপ্রুভারের কনফেসনটা' বেশ 'ইন্টারেষ্টিং' হচ্ছে।

মেজবাবু—কোন কেসটায় ?

বড়বাবু উত্তর-ভারতের একটি প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্রের মামলার নামোল্লেখ করিলেন; বলিলেন, 'এ্যাসটাউণ্ডিং ডেভালপমেন্টস' হবে বলে মনে হচ্ছে।

মেজবাবু বলিলেন, চল কলকাতায় ফিরে যাই। জ্যাঠামশায় অসন্তুষ্ট হলে কি আর করা যাবে।

সংবাদপত্র না পাওয়ায় বড়বাবু সায় দিলেন; বলিলেন, আমারও যাবারই ইচ্ছে। এখানে বসে তিনদিনেই আমরা এত পিছিয়ে যাব যে, কলকাতায় গেলে মণ্টু আমাদের নতুন খবর দেবে।

মণ্টু বাবুদের পাঁচ বৎসর বয়স্কা ভগিনী-কন্যা।

এ-কথাটা সবারই মনঃপূত হইল।

নূতন নূতন আবিষ্কারের সংবাদ আর দেশ-বিদেশের মণীষিগণের বাণী নিত্য প্রচারিত হইতেছে, তাহার একটি একবার অজ্ঞাতে ঘটিয়া গেলে বিশ্বের নাগাল

আর পাওয়া যাইবে না, 'ফ্যাসানে' পিছাইয়া পড়ার মতো বর্বরতা আর কিছু নাই।

তিনজনেই সমান শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

একটা ছাগল চরিয়া বেড়াইতেছিল। সে পেট ভরাইবে সংকল্প করিয়া বাহির হইয়াছিল; তার সে সংকল্প সারাদিন চরিবার পরেও তেমনি সতেজ আছে বলিয়া মনে হইতেছে। দূরের একটা ঘাটে নামিয়া দুইটি স্ত্রীলোক জল লইয়া যাইতেছে, দূরে নদীর যেখানে বাঁক ঘুরিয়াছে সেখানে কয়েকটি বাবলা গাছ, তার নীচে একটি বাঁশ আর একটা বালিশ পড়িয়া আছে।

ছোটবাবু বলিলেন, সে স্ত্রীলোকটি আজ আবার কাঁদলে আমি তার কাছে গিয়ে তাকে দেখে আসব।—মড়া কান্নায় হঠাৎ ভয় করে, কিন্তু এমন করে জড়িয়ে ধরে না।

সেই অন্ধকারই আসন্ন দেখিয়া তিন ভাই নিঃশব্দে বাড়ী ফিরিলেন।

বাড়ী ফিরিয়া চা-পানের সময়েও এখানকার কথাই চলিতে লাগিল।

মেজবাবু বলিলেন, লক্ষ্য করেছ, বড়দা, এখানকার সকলেরই মুখের চেহারা যেন একই রকম।

বড়-দা বলিলেন, হ্যাঁ, তারপরই বলিলেন, তা অত লক্ষ্য করিনি—কেন এমন হ'ল।

—সবাই সমান নির্বোধ বলে।—সব গরুরই মুখের ছাঁদ একই রকম, সব গরুই সমান গরু বলে – বুদ্ধির তারতম্য থাকলে চেহারাও আলাদা আলাদা হ'ত।

বড়বাবুর তখন মনে হইল, কথাটা ঠিক।

মেজবাবু পুনরায় বলিলেন, তুমি তখন বলছিলে, ওদের অভিযোগের বিচার করে দিইনি বলে ওরা ক্ষুণ্ণ হ'য়ে গেছে। কিন্তু, আমরা একজনকে আতঙ্কিত করে আর একজনের কার্যোদ্ধার করে দেব এর কোনো যুক্তি আছে কি!

বড়বাবু স্বীকার করিলেন তা নেই।

ছোটবাবু বলিলেন, আমি নাস্তিক নই, কিন্তু মনে করি, মানুষ নিজেকে কোনোদিন একেবারে অসহায় মনে না করলে ভগবানের অস্তিত্ব কল্পনা করত না। লোকগুলি ভগবানের একটি গুণ আমাদের প্রতি আরোপ করেছে, তিনি ত্রাতা।

মেজবাবু বলিলেন, ত্রাণ করবে কাকে!—খবরের কাগজ পড়ে তা জানতে পারি, আর যতদূর শোচনীয় মনে হয়, স্বচক্ষে দেখে তেমন মনে হচ্ছে না ত'!—কাগজে লেখে, এরা মৃত্যুর গ্রাসে পতিত, কিন্তু কই! একটা ছোট ছেলে কবে মরেছিল তার মায়ের কান্না শুনলাম, আর ত' কেউ মরার কথা বললে না।

বলে নাই সত্য! কিন্তু তল্লাস করিলে চিত্রগুপ্তের খাতার কি খবর বাহির হইয়া পড়িতে পারে তাহা জানিবার কথা কাহারও মনে পড়িল না—পড়িলেও, কার্যানুরোধে অঙ্কপাত আর গবেষণার শ্রম, আর ঐ হিসাবের অনুসন্ধানে কাল-চক্রের অনুধাবন করা সম্ভবপর হইত কিনা সন্দেহ।

বড়বাবু ভাবিতেছিলেন; বলিলেন, চেহারার কথা কি বলছিলে? সব একরকম? তা কি হয়!—তবে শিক্ষা পায়নি বলে তাদের মুখ আমাদের পছন্দ হয় না। কালোশশীর দেখা পাওয়া যায় নাই সমস্ত দিন।

ছোটবাবু বলিলেন, চমৎকার 'টাইপ', গাঁয়ের লোক নিজেকে চালাক মনে করলে ঐ রকমই দাঁড়ায়, গরু চরানর মতো করে মানুষ চরাতে চায়—আমাদের চরাবার চেষ্টাটা দেখেছ ত' !—ওর ওপর নির্ভর করাও যায় না, নির্ভর না করেও উপায় নেই - বেশ কিন্তু !

মেজবাবু বড়বাবু উভয়েই হাসিয়া বলিলেন,—হুঁ।

এবং সেই সময়েই কালোশশী, হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া আর হাঁটুর উপর পর্যন্ত ধূলা মাখিয়া আসিয়া দাঁড়াইল—গরুর গাড়ী ধূলা উড়াইয়া চলিয়া গেছে—মাঠের ধূলা কালোশশীর চুলে আর ভুরুর উপরেও স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়াছে।

বড়বাবু বলিলেন, এই যে ! তোমার কথাই হচ্ছিল।

কালোশশী পুলকে আপ্লুত হইয়া গেল ; বলিতে লাগিল, পরম সৌভাগ্য আমার ; ধন্য আমি।—এই আসছি সাত কোশ পথ হেঁটে আসা যাওয়ায় একদিনে আঠাশ মাইল ; আপনারা গাড়ী ঘোড়ার দেশের মানুষ—আঠাশ মাইল রাস্তা হেঁটে এসেছে শুনলে বোধ হয় অবাক হয়ে যাবেন। কিন্তু আমাদের ছেলেবেলা থেকে এই অভ্যাস। বলিয়া কালোশশী বাবুদের তুলনায় নিজেকে ক্ষুদ্র প্রমাণিত করিয়া হাসিতে লাগিল।

ছোটবাবু বলিলেন, বসো।

—না, বাবু, বসব না এখন—আপনারা কেমন আছেন তা-ই এক নজর দেখতে এলাম। ভালই আছেন দেখে খুশী হ'ল মনটা। আপনারা দেশের লোক হলেও আমাদের ত' চেনেন না, আমরা তাই অতিথি মনে করে ভাবছি, সৎকারের ত্রুটি না হয়।—সরাসর তা-ই এখানেই এলাম।

—আবার আসবে ত' একবার ?

—কিন্তু ততক্ষণ আপনাদের বোধ হয় আহারাদি শেষ হয়ে যাবে।—যদি তাড়াতাড়ি করে আসতে পারি।

—না তাড়াতাড়ি করতে হবে না—এই টাকা পাঁচটি সেই ঠাকুর মশায়কে দিও, কাল যিনি এসেছিলেন।

—তাঁকেই।

- তাঁর অসুখ করেছে শুনলাম।

—তবে দেন আমাকেই—এই পায়েই তাঁকে দিয়ে যাব। অসুখ-বিসুখেই দেশটা গেল।—বলিয়া কালোশশী পাঁচ টাকার নোটখানি লইয়া, আবার মৌখিক বিদায় লইয়া এবং আবার প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

সে অদৃশ্য হইতেই ছোটবাবু হঠাৎ হা-হা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। কালোশশীর আকার ক্ষুদ্র - কিন্তু কেমন করিয়া সে আশ্চর্য তৎপরতার সহিত এক সময়েই চারি-চতুর্দ্দিককে জড়েজীবে নিজেকে চিহ্নিত করিয়া ফিরিতেছে—ধূর্ত্তের সর্বঘটে স্থিতিই ছোটবাবুর হাসির বিষয়।

পরিচ্ছেদ—৮

সন্ধ্যার পর বাতাস উঠিল।

ওদিকে অভয় কন্যাকে লইয়া সঙ্কটাপন্ন।

এদিকে কোথাকার একটা ছিদ্রের ভিতর সবেগে বায়ু প্রবেশ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া সিটির মতো বাজিতেছে। অন্ধকারে গাছের পাতার আন্দোলন দেখা যাইতেছে না। একটা খরুখরু শব্দ উঠিয়া কখন হঠাৎ, কখন ক্রমে ক্রমে মৃদুতর নিশ্চুতি হইয়া যাইতেছে—নিকটে একটি সুরু করিতেই যেন অসংখ্য প্রাণ সেই পুলকে সরব হইয়া উঠিল। বাবুরা জানিতেন না যে, শৃগালের স্বভাবই ঐ।—দূরের একটা জঙ্গল হইতে আর একদল তার "উতোর গাহিয়া" গেল।

ছোটবাবু মনে মনে হাসিতে লাগিলেন।

একটা জোনাকি ঘরের ভিতর উড়িয়া আসিয়া ছোটবাবুর টেবিলের উপর বসিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিল, ছোটবাবু দেখিলেন, তার নীলাভ আলোটা নিবিয়া নিবিয়া জ্বলিতেছে।

নাড়া পাইয়া গাছ হইতে একটি ফল টপ্ করিয়া মাটিতে পড়িল—শব্দটা ছোট, কিন্তু চারি দেয়ালের ধাক্কায় সে ঘরের ভিতর স্ফীত হইয়া উঠিল।

ছোটবাবু বলিলেন, এখানে ভৌতিক শব্দের খুব প্রাদুর্ভাব দেখছি ; আমাদের ত্রিসীমানায় জীব আছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু শব্দ হচ্ছেই।

মেজবাবু মাসিকপত্র পাঠ করিতেছিলেন ; তিনি কথা কহিলেন না ; বড়বাবু কলিকাতার চিন্তায় অন্যমনস্ক ছিলেন, তিনিও কথাটা কানে তুলিলেন না।

ছোটবাবু "অর্গ্যান" বাজাইয়া একটি গজলু গাহিলেন, তাহাতে মিনিট পনর গেল ; তারপর কি করা যায় ভাবিতেছেন, এমন সময় একটি স্ত্রীলোক ঘরের আলো যেখানে শেষ হইয়াছে আর বাহিরের অন্ধকার সুরু হইয়াছে ঠিক সেই সন্ধিস্থলে দাঁড়াইল।

—কে ?—ছোটবাবু প্রশ্ন করিলেন আগন্তুককে ; বড়বাবু এবং মেজবাবু প্রশ্ন করিলেন তাঁহাকে,—কে !

—স্ত্রীলোক একটি।

শুনিয়া উভয়ে একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন।

স্ত্রীলোকটি নিঃশব্দে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া আসিল ; কাহাকে যেন বলিল, ওদের সবাইকার পায়ের ধুলো নে। আমি ছোঁব না, আছাড়া কাপড়ে ;—

আট কি নয় বছরের একটি সুদর্শন ছেলে স্ত্রীলোকটির পশ্চাদ্দিক্ হইতে সম্মুখে আসিয়া সলজ্জ মুখে এক এক করিয়া বাবুদের পায়ের ধুলা লইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাবুরা চাহিয়া দেখিলেন, স্ত্রীলোকটি বিধবা, অর্ধ-অবগুণ্ঠিত মুখের শ্রী যতটা লক্ষিত হইল ততটা অসুন্দর নয়, চপলও নয়।

বড়বাবু কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি চাই তোমার ?

স্ত্রীলোকটি কিয়দ্দূরে মেঝের উপর বসিল—বাবুরা বুঝিলেন, দুই-এক কথায় শেষ হইয়া যায় এমন রহস্য কি সমস্যা লইয়া সে আসে নাই—কিছু সময় লইবে ; না বলিতেই তাই বসিল।

কিন্তু স্ত্রীলোকটি সহসাই তার বক্তব্য সুরু করিতে পারিল না—কিয়ৎক্ষণ অধোমুখে নিঃশব্দ থাকিয়া অধোমুখেই সে বলিল,—অপরাধ নিও না, বাবা, আমি গরীব বিধবা।—বলিয়া সে দুই করতল একত্র করিয়া একটি প্রণাম নিবেদন করিল, কি মার্জনা ভিক্ষা করিল, তাহা ঠিক পরিষ্কার হইল না—কিন্তু তার কণ্ঠস্বর শুনিয়াই ওঁদের মনে হইল, যাহাই বলুক, গুছাইয়া বলিবে।

প্রণামান্তর সে বলিতে লাগিল,—আমি যে কথা তোমাদের কাছে বলতে এসেছি, বাবা, প্রাণের ব্যাকুলি অসহ্য না হলে মানুষে তা পরের সুমুখে মুখে আনে না।— সে কথা বলবার নয়—

বড়বাবু ইতিপূর্ব্বে মনে মনে শপথ করিয়াছিলেন যে, বক্তব্য ব্যক্ত করিবার কাজে কাহাকেও বাধা দিবেন না, শেষ পর্য্যন্ত শুনিবেন—নিজের আবেগে বক্তা যাহাই বলুক, যতই তা অসংলগ্ন, শ্রুতির অযোগ্য হউক।

স্ত্রীলোকটি বলিতে লাগিল,—সে কথা বলা কেবল ঘরের লজ্জার কথা বলা নয়, তোমাদের সাদা মনে কলঙ্কের ছাপ দেয়া হবে। —বলিয়া স্ত্রীলোকটি থামিয়া বোধ করি ঘৃণ্য কাহিনী বলিবার স্পষ্ট অনুমতির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

বড়বাবু বলিলেন,—তোমার যত কিছু বলবার আছে বলো, শুনতে আমাদের আপত্তি বা অনিচ্ছা নেই। তুমি স্ত্রীলোক হয়ে অসঙ্কোচে যা বলবে তা খুব অশ্রাব্য হয়তো হবে না।

স্ত্রীলোকটি মৃদু একটু হাসিল ; বলিল,—আমারই মেয়ে আর জামাইয়ের কথা—

—জামাই বুঝি নেয় না মেয়েকে ? বলিয়া ছোটবাবু অর্গ্যানের ডালা বন্ধ করিলেন।

তাঁহারই দিকে এক মুহূর্ত্ত দৃষ্টি তুলিয়া স্ত্রীলোকটি বলিল, নেয় না, কিন্তু তাই আমার বলবার কথা নয়।

—বল্‌বার কি তা বলো।---বলিয়া ছোটবাবু অর্গ্যানের টুল ছাড়িয়া চেয়ারে আসিয়া বসিলেন —মেজবাবুর সেই 'ফুল বেঞ্চ' জাঁকিয়া উঠিল।

—আমার মেয়ের যখন বিয়ে দিই তখন তার বয়েস মাত্তর এগারো, আর জামাইটির বয়েস ছত্রিশ। জামাইয়ের ঘর দুয়ারের অবস্থা ভাল, আর ক্ষেত-খামার আছে ; ভেবেছিলাম, মেয়ে সুখেই ঘরকন্না করবে ; কিন্তু অদেষ্টের আপদ যে সঙ্গেই ছিল তা জানতাম না।— বলিয়া স্ত্রীলোকটি ক্ষণেক থামিয়াই বলিল,—জামাইয়ের একটি—বলিয়া স্ত্রীলোকটি থামিয়া রহিল—

বড়বাবু শালীনতা অতল জলে নিক্ষেপ করিয়া চোখ বুজিয়া বলিলেন,—রক্ষিতা ছিল ?

—ছিল বাবা ; বহুপূর্ব্ব হতেই। জামাইয়ের ঘর আর আমাদের ঘর আর তার ঘর এই গ্রামেই ; তবু আমরা তা জানতাম না। মেয়ে শ্বশুর-ঘরে দু'মাস

থাকে, আমার কাছে আসে, আবার যায়, আবার আসে।—মেয়ের বয়েস বাড়তে লাগল, কিন্তু বয়েস তার গায়ে ফুটল না—

মেজবাবু কথাটা বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন,—তার মানে?

কিন্তু ছোটবাবু আর বড়বাবু বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ কাহারো চোখের দিকে চাহিতে পারিলেন না—

স্ত্রীলোকটি বলিল,—বেটাছেলের বয়স হলে গোঁফ-দাড়ির রেখা দেয়, মেয়ে-ছেলেরও গায়ে তেমনি—

মেজবাবু বলিলেন,—ও। তারপর? বলিয়া কথাটাকে ফিরিয়া দিয়াও লাল হইয়া উঠিলেন।

—মেয়েকে সে একবার মেরে-ধরে তাড়িয়ে দিলে; আমি গেলাম বলতে-কইতে—আমাকেও সে হাত তুলে মারতে এল।

ছোটবাবু প্রশ্ন করিলেন,—তার মা, বাবা নেই? অর্থাৎ তোমার মেয়ের শ্বশুর শাশুড়ী নেই?

—শ্বশুর নেই, শাশুড়ী আছে; কিন্তু সে না থাকারই মধ্যে—সে অন্ধ। তার সোয়ামীর পারার দোষ ছিল—

ছোটবাবু চোখ নামাইয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন,—যাক্।—আসল কথাই বলো। —বলিয়া ছোটবাবু মনে মনে শপথ করিলেন, পাশে খাল কাটিয়া গল্পের মূলস্রোতের শাখা বাহির করা ঠিক নয়, অতএব আর করিবেন না।

—খুব একটা সোরগোল হয়ে গাঁয়ে ঢি ঢি পড়ে গেল—মনের লজ্জায় মানুষের সামনে তখন আমি মুখ তুলতে পারিনে।—দশজনের কথায় জামাই মোটে আমল দিল না—বললে, করতে হয় একঘরেই করো, তবু ঐ কেটো-পুতুলকে আমি ভাত-কাপড় দিয়ে পুষব না—বলে সে তার জিনিষপত্তর নিয়ে তুললে সেই মেয়েটির বাড়ীতে, এ বাড়ী তালাবন্ধ রইল।—দশজনের পরামর্শে তখন মেয়েকে দিয়ে জামাইয়ের নামে খোরপোষের নালিশ করালাম; নুটিশ পেয়ে জামাই গিয়ে জবাব দিলে যে, ওর চরিত্তির ভাল নয়, ওকে আমি ত্যাগ করেছি।—বাড়ীর ছোটলোক-বাগ্দী রাখালের সঙ্গে ওর প্রেণয় আছে।—কিন্তু আদালতের হাকিম তা শুনলেন না—বললেন, সব মেয়েকেই সতী বলে ধরে নিতে হবে—অসতী প্রেমাণ করতে এমন প্রেমাণ চাই যার আর কাটাই নেই।—পরিবারকে খাওয়া-পরা দিতে সোয়ামী বাধ্য—আর চৌকিদারের এজাহারে পষ্ট জানা যাচ্ছে ঐ লোকটা ঐ বাড়ীতে রাত্রে যাওয়া-আসা করত—এখন সর্ব্বদাই থাকে। আর স্ত্রীর উপর যদি তার ভালবাসাই থাকবে তবে শত্তুর সেই বাগ্দীটাকে এখনো রেখেছে কেন?—বলে হাকিম আমার মেয়েকে মাসে মাসে আট টাকার খোরপোষের বরাদ্দ করে দিলেন—বাংলা মাসের পয়লা টাকা দিতে হবে—মেয়ের দাবিও ছিল তা-ই; পাঁপরের মামলার খরচাও তাকে দিতে হ'ল অনেকগুলো টাকা—সে সরকারের টাকা, তখনি তারা আদায় করে নিয়েছে।—

মাসে মাসে আটটা করে টাকা গুণে দেয়া বড় কঠিন। জামাই তখন আমার কাছে এসে কেঁদে পড়ল; হাত-পা জড়িয়ে ধরে বললে,—আমার অপরাধ হয়েছে, মা, ক্ষমা করো; তোমার মেয়েকে তুমি পাঠিয়ে দাও—আর আমি তাকে কিছু বলব না।

আমি বললাম, বাপু, তুমি ফাঁদে পড়েই পা ধরতে এসেছ। আমার মেয়েকে তুমি

যে কলঙ্ক দিয়েছ তাতে তোমার মুখ দেখতেই নেই—তোমাকেও ধিৎকার, আমার মেয়ের অদেষ্টকেও ধিৎকার।—মেয়েও বললে, ও-র ঘরে আমি আর যাবো না।

জামাই সেদিনকার মতো মুখ বুজে চলে গেল; তার পরদিনই আবার এল প্রাণনাথ ঠাকুরকে সঙ্গে করে। ঠাকুরকে আপনারা জানেন—আপনাদের কাছে তিনি এসেছিলেন শুনেছি।—তিনিই ছিলেন জামাইয়ের দক্ষিণহস্ত – তাঁর বুদ্ধি নিয়েই জামাই মেয়ের নামে বাগ্দী অপবাদ দিয়েছিল; মামলাতেও তিনি জামাইয়ের হয়ে সাক্ষী দিয়েছিলেন—প্রধানই ছিলেন তিনি।

মিনিট-দশেক আগেই এই পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণকে পাঁচ টাকা সাহায্য পাঠান হইয়াছে—মেজবাবু আর বড়বাবু ছোটবাবুর উপর একবার সঙ্কেতময় দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়াই দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিলেন—

ছোটবাবু একটু হাসিলেন মাত্র—

জ্যেষ্ঠদ্বয়ের অসাক্ষাতে এই দানটা না করিলেও দান সম্বন্ধে কালব্যয় করা ইংরেজি প্রবচন অনুসারে ক্ষতিকর মনে করিয়া তিনি ইচ্ছার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইচ্ছাকে পূর্ণ করিয়াছিলেন—দাদাদের পরামর্শ লযেন নাই, পরামর্শের ব্যাপারই বা কি এমন।

স্ত্রীলোকটি বলিতে লাগিল,—প্রাণনাথ ঠাকুরও অনেক নরম নরম করে মেয়েকেও রাজি করালেন, আমাকেও রাজি করলেন! বললেন, তোরা এখনও একঘরে হয়ে আছিস ত'? তোদের আমি জাতে তুলে দিচ্ছি দাঁড়া।

আমি বললাম, তুমি একবার জামাইয়ের টাকা খেয়ে আমাদের একঘরে করেছিলে, এখন আবার তারই টাকা খেয়ে ঘরে তুলতে এসেছ!—ঘর আমরা চাইনে; তবে অত করে যখন বলছ তখন মেয়ে পাঠিয়ে দেব, কেননা শ্বশুরঘরই মেয়েমানুষের তীর্থ্য।

জামাই নিজের বাড়ীর তালা খুলে তার জিনিস-পত্তর এই বাড়ীতে আনলে, মেয়েকে আমি বুঝিয়ে স্থঝিয়ে পাঠিয়ে দিলাম, আজ তিনদিন হ'ল পাঠিয়ে দিয়েছিলাম; কিন্তু মেয়ে আজ দুপুরে আবার কেঁদে-কেটে আমার ঘরে পালিয়ে এসেছে।

মেজবাবু বলিলেন,—মেরেছে বুঝি?

স্ত্রীলোকটির চোখে জল টল্‌টল্ করিতে লাগিল—বলিল,—মার ত' ভালই, বাবা; হাজার গুণে ভাল—আপন পরিবারকে কে না মারে? পাড়াগাঁয়ে পরিবারকে মারা এমন গা-শিউরণো কথা নয়। কিন্তু—

বলিয়া স্ত্রীলোকটি একটু থামিয়া মুখ ফিরাইয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া লইল; তারপর বলিল—সেই ছোটলোক বাগ্দীটা, জামাইয়ের গরুর রাখাল সে বেটা—তার নামের সঙ্গে মেয়ের নাম জড়িয়ে জামাই খোরপোষের মামলায় জিততে চেয়েছিল, সে বেটা স্থবিধে পেয়ে গেল—মেয়ের মুখের দিকে সে কেমন করে তাকায়, তাকিয়ে কেমন করে হাসে—মেয়ে তা সইতে পারল না—

—জামাইকে বলেছে?

—সে জানে। তারই উস্‌কানিতেই বাগ্দীটা করছে ওকাজ, নতুবা সাহস পাবে কোথায়। —বলিয়া স্ত্রীলোকটি নীরব হইয়া রহিল।

ছোটবাবুর ক্রুদ্ধ অন্তরে অজ্ঞাতা বধূর ক্রুদ্ধ অন্তরের ধিক্ ধিক্ প্রতিধ্বনি

বাজিতে লাগিল ; এবং স্ত্রীলোকটির এই ক্ষেত্রে যাহা যাচঞা তিনিই তাহা প্রকাশ করিলেন ; বলিলেন,—এমন অভদ্র আচরণের কথা আমরা আগে কখনো শুনিনি —সম্ভব যে তা-ও হঠাৎ মনে করতে পারছিনে।—তোমার জামাইকে আর বান্দীকে ডেকে শাসন করে দেব এই কি তোমার ইচ্ছে ?

স্ত্রীলোকটি মাথার কাপড় আরো একটু টানিয়া দিয়াছিল ; মাথা নাড়িয়া জানাইল, ঐ তার ইচ্ছা বটে।

—তোমার গ্রামের লোকে তাকে শাসন করতে পারে না কেন ?

—ধমক্ ধামক্ দিতে পারে ; কিন্তু সুক্ষ্ম কথাকে তারা ছোট মনে করে, আর চোখের ইসারাকে তারা সূক্ষ্ম মনে করে···

মেজবাবু অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—ছিঃ, ছিঃ।—এই স্থানে জ্যাঠামশায় আমাদের বাস করতে পাঠিয়েছেন ! তারপর ছোটবাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন,—তুমি উত্তেজিত হ'ও না।

ছোটবাবুও নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন—

বিসর্জনের পর সুগঠিতা বহুবর্ণা প্রতিমাকে জলের উপর টানিয়া তুলিলে যেমন দেখা যায়, তাঁহাদের শ্রীময়ী ভাবমূর্ত্তি তেমনি শ্রীহীনা হইয়া এই নীরবতার মাঝখানে বিরাজ করিতে লাগিল—অন্তঃস্রোতে তার সমুদয় বর্ণ-অলঙ্কার রূপ পরিচ্ছদ ধুইয়া গেছে···শুধু রূপহীনতাই তার চরম দুর্গতি আর বিকৃতি নহে—তার অভিশপ্ত দেহ যেন দুরারোগ্য ক্ষত লইয়া দেখা দিয়াছে।

গোধূলিজাত রসাত্মক বাক্যের পিপাসা ছোটবাবুর আর অনুভূত হইতেছে না ; স্ত্রীলোকটিকে শেষ ও সুসঙ্গত কি কথাটা বলিতে দেওয়া যায়, বড়বাবু তাহাই চিন্তা করিতেছেন এবং মেজবাবু নিরপরাধী জ্যেষ্ঠতাতের প্রতি ক্রোধ দমন করিতেছেন, এমন সময় কান্ত বিশ্বাস চেনা পথ দিয়া অন্ধকারেই ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াই চোখে হঠাৎ প্রখর আলো লাগায় থমকিয়া চোখ পিট্‌পিট্ করিতে লাগিল···মুখে বলিল,—ধাঁ করে আলোটা বড় চোখে লেগেছে। বলিয়া স্পষ্ট করিয়া চোখ খুলিয়া বলিল,—বাবু শীগ্‌গির আসুন—অভয় তার মেয়েকে খুন করেছে। বলিয়া বাবুদের মুখের দিকে নিষ্পলকচক্ষে চাহিয়া সে ক্রমাগত হাঁপাইতে লাগিল···এই হাঁপানিটাও অবশ্য গল্প-গঠনের উপাদানের মধ্যেই—

সংবাদটা সহসা প্রবেশ করিয়া বাবুদের মনের কোথায় যাইয়া পড়িল তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন ; কিন্তু যা রুদ্ধ হইলে মানুষ একেবারে বাঁচে না সেই নিঃশ্বাস ব্যতীত সচেষ্ট প্রাণময়তার লক্ষণ তাঁহাদের আর কিছুই রহিল না···

সেই স্ত্রীলোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল—

কান্ত বিশ্বাস বলিল,—অভয় নদী সাঁতরে পালিয়েছে দেখেই আমি আসছি··· আমি চললাম, কালোশশীকে ডেকে নিয়ে আসি আপনাদের কাছে। বলিতে বলিতে যেমন হঠাৎ সে আসিয়াছিল তেমনি হঠাৎ বাহির হইয়া গেল···বাহির হইয়া সে ফিক্ করিয়া একটু হাসিল।

স্ত্রীলোকটি বাবুদের মুখের দিকে একবার চাহিয়া সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল··· তার আর কিছু শুনিবার কি বলিবার নাই—পিতা কর্ত্তৃক পুত্রী হত্যার কাছে জামাতৃ কর্ত্তৃক কন্যার নিগ্রহ অনুপাতে একেবারে তুচ্ছ হইয়া গেছে। তিন ভাই কেবল

বসিয়া রহিলেন, একটা পতঙ্গের গুঞ্জরণ ঘরের ভিতরটা পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল, একোদ্দিষ্ট একটা ফলকের মতো বাতাসের শিসটি যেন চোখের সম্মুখে উন্মীলিত হইয়া রহিল…পাতার শব্দ উতরোল হইয়া একটানা বহিতে লাগিল…

কিন্তু সংবাদটা মিথ্যা বলিয়াই বোধহয় ভগবান তাঁহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন, বুকে ধড়ফড়ানিযন্ত্রণাটা দিলেননা, "খুন" শব্দটা বার্ত্তাবহ যে ভঙ্গীতে উচ্চারণ করিয়াছিল সেই ভঙ্গীটা ছোটবাবুর চোখের সামনে মূর্ত্ত হইয়া ভাসিতে লাগিল…মেজবাবুর মনে পড়িতে লাগিল, কালোশশী সংলোক বলিয়া প্রশংসাপত্র দিয়া একটি চুপচাপ লোককে অভয় বলিয়া পরিচিত করিয়া দিয়াছিল…

কিন্তু সকলের চেয়ে সাংঘাতিক অবস্থা হইল বড়বাবুর—

একজনের হাতের ধারাল কাটারি, আর একজনের তুঙ্গ কণ্ঠ, তৃতীয় ব্যক্তির হস্ত —সবগুলি জড়াইয়া একটি ত্রিশৃঙ্গ ত্রিশূলের মতো এককর্ম্মা একধর্ম্মী হইয়া যেন একই ক্ষেত্রে হত্যারঙ্গে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে…তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন…

খানিক পরে ছোটবাবু বলিলেন,—বড়দা, প্যাক করতে বলি ?

বড়বাবু আর মেজবাবু উভয়েই বলিলেন,—বলো।

রামহরিকে ডাকিয়া ছোটবাবু জিনিসপত্র গুছাইতে বলিয়া দিলেন, আর বড়বাবু বলিয়া দিলেন, কেহ যদি ডাকে তবে হাঁকাইয়া দিবি।

পরিচ্ছেদ—৯

তিনজনে সাইকেলে উঠিতেছেন, এমন সময় জামাই-কন্যা-কাহিনী-উক্ত প্রাণনাথ ঠাকুর উত্তরীয়ে অসুস্থ দেহ এবং সুবর্দ্ধিত টিকি আবৃত করিয়া আসিয়া দেখা দিলেন…

তখন সকাল ছ'টা—

কিন্তু পথ চলতি লোকের মুখে পাড়াগাঁয়ে সংবাদ খুব ত্বরিত বেগেই রটে।

ছোটবাবু হাসিয়া বলিলেন,—যাচ্ছি ঠাকুর। টাকা ক'টি পেয়েছেন ?

টাকার কথাটা না বলিলে বাবুদের যাইবার কারণানুসন্ধান করিয়া সময়োপযোগী ক্ষোভ প্রকাশ প্রাণনাথ ঠাকুর নিশ্চয়ই করিতেন ; সে আক্কেল তাঁহার আছে ; কিন্তু টাকার কথায় তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং মানুষের এই আসিয়া এই যাওয়ার দুঃখটা সেই চমকে বিদ্ধ হইয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিল— বলিলেন,—টাকা ! কই না !

—কালোশশীর হাতে দিয়েছি।

শুনিয়া ঠাকুরের হতাশার কিছু বাকি রহিল না—মুখ চোখ বসিয়া গেল ; রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—কালোশশীর হাতে দিয়েছেন ! সে আর পাব না, বাবু। কালোশশীর হাতে টাকা পড়লে সে টাকা আর বেরোয় না।

বাবুদের সাইকেল চলিতে লাগিল।

রতি ও বিরতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

জীবনের শেষ অধ্যায়ে রাম প্রথম কবে ভিক্ষা-পাত্র হাতে করিয়া যাত্রা করিয়াছিল কেহই তাহা স্মরণ করিতে পারে না, বেশী দিনের কথা সে নয়, তবু কাহারো তাহা মনে নাই। যাচ্ঞার প্রধান শাস্তি ইহাই যে দু' দিনেই সে পুরাতন, চক্ষুঃশূল হইয়া ওঠে ; মানুষের মনে হয়, যেন অনাদিকাল হইতে এই একই ব্যক্তি এমনি করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহারই কাছে হাত পাতিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেছে, ইহার লজ্জা নাই। বিদ্রূপ এ গায়ে মাখে না। মারিতে উঠিলে সরিয়া দাঁড়ায় না।

রামের জীবন-কথা অতি ক্ষুদ্র—তার নিজেরও সব কথা মনে নাই, মনে করিবার সময়ও নাই, কিন্তু সকল দিনের চাইতে উজ্জ্বল একটি দিন ঊর্ধ্বের ঐ বিরাটায়তন সস্মিত আকাশের মতো তাহার মনশ্চক্ষুর পুরোভাগে অক্ষয় চিরস্থির, আর উদ্ভাসিত হইয়া আছে। সাগর মন্থন করিবার সময় যে দিনটাতে অমৃত পাওয়া গিয়াছিল আর লক্ষ্মী উঠিয়াছিলেন তেমনি স্মরণীয় সে-দিনটি ।

অসংখ্য দিন-প্রবাহের মাঝে সে দিনটি জ্বলন্ত একটি বুদ্বুদের মতো উত্থিত হইয়াছিল—এখনও যেন তাহা চোখের সম্মুখে দিবারাত্র হীরকের মতো জ্বল জ্বল করিতেছে।

সেদিনে রামের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

তখন সে ভিক্ষোপজীবী নয়, সে খাটিয়া খায়। কিন্তু সকলের আগে মানুষ নিজেকে ভালবাসে। নিজেকে নিশ্চিন্ত আর নির্বিঘ্ন রাখিতে মানুষ শক্তির সন্ধানে অহরহঃ দিকে দিকে দৃষ্টি হানিয়া ফিরিতেছে। দৈবের বিরুদ্ধে তার সতর্কতার অন্ত নাই। যার মজুত টাকা ঢের, হিসাবের অঙ্কের দিকে চাহিয়া তার আর ভয় থাকে না। তেমনি ঐ ছেলেটি যেন দরিদ্র রামের গৃহে সেই অঙ্কুরের উদ্গম, যে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া অপরিমেয় মজুত টাকার কাজ দিবে, একেবারে নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্ন অকুতোভয় করিয়া দিবে।

ছেলে বাড়িতেছে···দিন দিন তিল তিল করিয়া তার চৈতন্যের উদয় হইতেছে··· মুষ্টিবদ্ধ হাত আর মুদিত চক্ষু খুলিয়া যাইতেছে। ···ছেলে হাসে, গয়ামণি আনন্দ করে···ছেলে হাসিতেছে···রামও হাসে।

ছেলের অসুখ হইল—গয়ামণি তাহাতে কাঁদিয়া ভাসাইল। অসুখ ভাল হইয়া গেল – গয়ামণি অবিলম্বে দেবতার ঋণ শোধ করিল।

ছেলের দাঁত উঠিতেছে—কিন্তু সে এক মহা উন্মাদনার ব্যাপার। গয়ামণি অঙ্গুলির অগ্রভাগে তাহাকে স্পর্শ করিল যত, ছেলের ঠোঁট তুলিয়া তাহা তাকাইয়া দেখিল তত...

ছেলে শান্ত হইয়া ঘুমাইলে গয়ামণির মনে হয়, এমন শান্ত কোনো ছেলে নয় ; দৌরাত্ম্য করিলে মনে হয়,এমন দুরন্ত ছেলে আর নাই.···কথা রাখিলে মনে হয়, মায়ের বাধ্য এই ছেলে যেমন, তেমন আর কাহারো ছেলে নয় ; না রাখিলে মনে হয়,

এমন অবাধ্য ছেলে যেন কোন মায়ের পেটে না আসে।···নক্ষত্রের গণনায় যেমন শেষ নাই, আর, ভুল হইবেই, ছেলেকে মূলধনের স্থানে স্থাপিত করিয়া রামের আর গয়ামণির তেমনি ক্ষণ-বিহারী খণ্ড খণ্ড সুখ-চিন্তার শেষ থাকে না, আর মাঝে মাঝে তেমনি সব হিসাব গোলমাল হইয়া যায়।

কিন্তু এই অশেষ আর গোলমেলে আর হাসিকান্নার ব্যাপারটাকে কে যেন একদিন তাল পাকাইয়া ঊর্ধ্বে ছুড়িয়া দিল। সূর্য্য যেখানে উদিত হইয়া অস্ত যায়, নক্ষত্রপুঞ্জ অন্ধকারে দেখা দিয়া আলোকে অদৃশ্য হইয়া যায়, একদিন অকস্মাৎ উৎক্ষিপ্ত হইয়া চক্ষের নিমেষে সেও সেই সুদূরতম স্থানে অদৃশ্য হইয়া গেল। অর্থাৎ ব্যাপারের যে মূল তার আত্মা গেল পরলোকে উঠিয়া, আর দেহ গেল নদীর জলে ভাসিয়া।

লব জন্মিবার আট বৎসর পরে একদিন রাত্রে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, আর বাতাস হু-হু শব্দে বহিতেছিল।

রাম সপরিবারে নিদ্রামগ্ন।

তৃতীয় প্রহর রাত্রে লবের নিদ্রা হঠাৎ ভাঙিয়া গেল···বিদ্যুতের মতো দ্রুত আর তীব্র একটা যন্ত্রণা মস্তিষ্কে অনুভব করিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"মা, আমাকে কিসে কামড়ালে"···

এক ডাকেই কাহারো ঘুম ভাঙিল না।

"ঐ আবার"···বলিয়া চীৎকার করিয়া লব কাঁদিয়া উঠিতেই রামের ঘুম ভাঙিয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিল,—কিরে?

লব বলিল,—আমাকে কিসে কামড়ালে।

ইহার পর জাগ্রত ব্যক্তির চক্ষে নিদ্রার প্রভাব স্থায়ী হইবার কথা নয়,—রাম কণ্ঠাগত প্রাণে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিয়া বালিশের তলা হাতড়াইয়া দিয়াশলাই এবং তারপর তার কাঠি বাহির করিয়া ঘর্ষণ করিতেই দুর্ব্বল কাঠি জ্বলিয়া উঠিল এবং জ্বলিতে জ্বলিতেই ভাঙিয়া ছিটকাইয়া মাটিতে পড়িয়া নিবিয়া গেল।

একটি নিমিষের জন্য ঘরে আলো হইল। সেই মুহূর্ত্তস্থায়ী আলোকেই যে বস্তু রামের চোখে পড়িল তাহাতে প্রাণ দেহে থাকে না। রাম দেখিল, লবের শিয়রে ঠিক তার ঘাড়ের কাছে একটি সুবৃহৎ ফণা বিস্তৃত হইয়া আছে। শিয়রে বিষধর সর্প···গৃহ অন্ধকার···পুত্র বিষের যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে।

ত্রাসে রামের সমগ্র চেতনা হঠাৎ ঝিমাইয়া পড়িয়াই যেন কত কাল পরে জাগিয়া উঠিয়া ভয়ংকরের কোলের ভিতর টলিতে লাগিল।

দিয়াশলাইয়ের দ্বিতীয় কাঠিটাতে বারুদ ছিল না। সেটা জ্বলিল না। তৃতীয় কাঠিটা যখন জ্বলিল কাজ শেষ করিয়া ফণী তখন ফণা গুটাইয়া নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইয়াছে। লব উঠিয়া বসিয়াছে···কিন্তু গয়ামণির ঘুম ভাঙে নাই।

রাম কুপী জ্বালিল। কুপীর প্রচুর আলোকে দেখা গেল, ছেলের বুকে দন্তাঘাতে ছিদ্র হইয়া ছিদ্র দিয়া ঝিরঝির করিয়া রক্ত পড়িতেছে।

রাম হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

স্ত্রীর গায়ে ধাক্কা দিয়া বলিল, ওঠো, ওঠো—দেখো—লব আমাদের বুঝি ছেড়ে' যায়।

গায়ে ধাক্কা পাইয়া গয়ামণি ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল—আলো সত্ত্বেও ঘরের কোনো বস্তুই তার চোখে পড়িল না···রামের হাতের ধাক্কায় সে জাগিয়াছিল, কিন্তু রামের কথা তার কানে যায় নাই।

ঢুলিতে ঢুলিতে জিজ্ঞাসা করিল,—কি বল্‌ছ ?

যাহা বলিয়াছিল সেই কথাগুলি রামের মুখ দিয়া আর বাহির হইল না।

লব বলিল, মা, আমাকে সাপে কামড়েছে, বড় জ্বল্‌ছে।...বলিয়া শুইয়া পড়িল।

গয়ামণি চোখ না খুলিয়াই বলিল,—সাপ না হাতী, ইঁদুর—

শুনিয়া রাম আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—না গো না, সাপ—দেখেছি ·· একেবারে কাল···

পরক্ষণেই গয়ামণির অতল নিদ্রার আর চিহ্নও রহিল না—

সে দেখিতে চাহিল, দংশন কোথায় হইয়াছে; রাম দেখাইয়া দিল বুকে হইয়াছে।

তারপরই গয়ামণি পুত্রের বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া পুনঃ পুনঃ তীব্র আর্ত্তনাদে যেন নিজের বুক ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ছড়াইতে লাগিল।

রাম ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ওগো, কে আছ শীগ্‌গির এস, আমার লবকে সাপে খেয়েছে।

চৌকিদার মহেশ ও-পাড়ায় হাঁক দিয়া এদিকে আসিয়াছিল, রামকে সে চিনিত, ক্রন্দনরোল আর চীৎকার শুনিয়া সে ছুটিয়া আসিল।

এবং তাহারই হাঁকে ডাকে দেখিতে দেখিতে যখন রামের ঘরের সম্মুখে শশব্যস্ত ইতর ভদ্রের ভিড় জমিয়া উঠিল, তখন আর আশা নাই।

বিষহর অব্যর্থ মন্ত্র জানে বলিয়া প্রকাশ এমন লোকও একজন আসিল। কিন্তু এই ব্যক্তি সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই লবের ওষ্ঠাধর নীলবর্ণ হইয়া গেছে, নাক দিয়া রক্ত পড়িয়াছে, দেহ নিস্তেজ তন্দ্রালু হইয়া আসিয়াছে। মন্ত্র-প্রয়োগের মধ্যেই লব প্রাণত্যাগ করিল—লোকে অজস্র জল আনিয়া মৃত বালকের মাথায় ঢালিতে লাগিল। উঠানে জলের স্রোত বহিতে লাগিল। মানুষের পায়ে পায়ে জল কাদা হইয়া উঠিল।

কিন্তু লব আর চোখ খুলিল না। অবশেষে বেলা যখন এক প্রহর তখন লবের দেহ তাহার মায়ের বুকের ভিতর হইতে কাড়িয়া লইয়া কলার ভেলায় তুলিয়া দিয়া তাহারা নদীর জলে ভাসাইয়া দিল। ওস্তাদ তাহার জটা সমেত মাথা নাড়িয়া আর ললাট দেখাইয়া চলিয়া গেল।

গর্ত্তটা আবিষ্কৃত হইয়াছিল—যে গর্ত্ত দিয়া সাপ উঠিয়াছিল·· পরে পলায়ন করিয়াছিল, ঘরের মেঝের সে গর্ত্তটা লোকে দেখিয়া গেছে—রাম দেখিয়াছে, গয়ামণিও দেখিয়াছে।

সেই গর্ত্তের দিকে চোখ পড়িলে শিহরিয়া উঠিতে হয়, কিন্তু রাম তাহা বুজায় নাই, বুজাইতে দেয় নাই।

কত আশা করিয়া তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে সেই গর্ত্তের ধারে মাথা রাখিয়া প্রত্যহ শয়ন করে। রাত্রের সুদীর্ঘ অন্ধকার আর নিদ্রার সুদীর্ঘ সুযোগ বহিয়া যায়···কিন্তু সাপ সে পথে আর আসে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিস্মৃতির শূন্যতার মাঝে সর্ব্বান্তকরণে একটা ভাররোধ লইয়া রামের নিদ্রাভঙ্গ হয়--তার পরই ছ্যাৎ করিয়া মনে হয়, লব নাই—

রোগে নয়, বিষে জর্জ্জরিত হইয়া সে গেছে—সেই হলাহল এখনও সেই যমের দাঁতে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে—তার একটি বিন্দু সে কেন তাদের ব্রহ্মরন্ধ্রে ঢালিয়া দিয়া গেল না!

অর্ধঘণ্টা না যাইতেই সুকোমল দেহ তেমনি সুস্থ থাকিতে থাকিতে নীল হইয়া শীতল হইয়া গিয়াছিল।

কলরব করিয়া আর মায়ের ধমক খাইয়া বাপের সঙ্গে বসিয়া সে "ডালে-চালে-ঘোঁটা ভাত" খাইয়াছিল—তারপর বেশীক্ষণ জাগিয়া থাকিতে পারে নাই—একখানি আম-কাটা ছুরির জন্য আবদার করিতে করিতে বাপের কোলের কাছে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—

চিরনিদ্রা ছাইয়া আসিবার পূর্ব্বে তার রাত্রের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল রক্তে বিষ ঢালিয়া দিয়া—এত দ্রুত আর এত তীব্র সেই বিষ, আর এমন অমোঘ তার ক্রিয়া, আর এমন হঠাৎ—

রাম সেই গর্ত্তটার দিকে নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া থাকে। এই বিবরের অভ্যন্তরেই কোথাও সে বাস করে।

একদিন গভীর রাত্রে ভগবান তাহাকে আদেশ করিলেন, "সাপ, তুমি রামের ছেলে লবকে দংশন করিয়া আইস, তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে।"

এই আদেশে পাতালপুরীর অন্ধকারে নিদ্রিত সর্পের কুণ্ডলীকৃত অলস দেহের আদ্যোপান্তে চেতনা তরঙ্গিত হইল—কুণ্ডলী খুলিয়া খুলিয়া দেহ ধীরে ধীরে সচল হইয়া উঠিল—তাহার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে তাহার সম্মুখের মাটি ঝরিয়া ঝরিয়া অবাধ সরল একটি পথ প্রস্তুত হইল—সর্ব্বাগ্রে তার স-দন্ত মাথাটা বিবরের বাহিরে আসিল—যেখানে লবকে লইয়া তাহারা নিদ্রিত ছিল সেই দিকে তার মুখ ফিরিল—ধীরে ধীরে সমগ্র মসৃণ দেহটা অতি নিঃশব্দ নির্গত হইল—

ঘর অন্ধকার—

কিন্তু তাহার পথ চিনিতে ভুল হইল না; যাহাকে তাহার চাই তাহাকেও চিনিয়া লইতে ভুল হইল না; দংশন লক্ষ্যচ্যুত হইল না—বিষ পড়িল—

নিশ্চয় ভগবানের আদেশই সে প্রতিপালন করিয়াছে, নতুবা সামান্য বুকে-হাঁটা সরীসৃপ এত তেজ আর এমন নির্ভুল গতি আর এমন অব্যর্থ লক্ষ্য কোথায় পাইবে?

গয়ামণি ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দেখে, সে মরে নাই —

গর্ত্তের দিকে সেও নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বলে, "আজও ওঠে নাই!"

রাম বলে, "না।"

গয়ামণি তখন সেই গর্ত্তের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া ওঠে।

তিন দিন নিরন্ন রাম স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া দা-খানা হাতে করিয়া কাজে বাহির হইল; কিন্তু পুত্রের শোকে, আর, না মরিতে পাইয়া গয়ামণির মাথা বেঠিক্ হইয়া গেল।

ভেলা স্রোতে ভাসিয়া পুত্র লবকে লইয়া যেদিকে গেছে গয়ামণি নদীতীরে যাইয়া একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে —নদীর গতি ঐ দূরে বনান্তরালে বাঁক ফিরিয়াছে—ফুল্লরার ধারা তার পর আর চোখে পড়ে না—কিন্তু নদীর শেষ ওখানেই হয় নাই; কত পল্লী, কত নগর, কত জনপদ, কত হাট ঘাট, কত বাজার বন্দর, কত ক্ষেত্র, কত অরণ্য দুধারে দেখিতে দেখিতে এই ফুল্লরা আকাশের সীমান্ত ছাড়াইয়া গেছে—

ভেলাটাকে সে বুকে করিয়া ভাসাইয়া লইয়া গেছে --

কত লোক সেই ভেলাটার পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছে···ভেলা যাহাকে বহন করিতেছে তাহাকে দেখিয়াই লোকে বুঝিয়াছে···মনে মনে হয়তো বলিয়াছে, আহা, কার কচি ছেলেটি!...কিন্তু এমন কোনো গুণীর চোখে কি সেই ভেলা পড়ে নাই যে মরা মানুষ বাঁচাইতে পারে! এ দেশে না হোক্ অন্য দেশে, কিংবা আরও দূর দেশে, আরো দূরে, আরো দূরে—সেখানে মানুষ সবাই গুণী!

সকল গুণীর দেশে ভেলা পেঁাছিয়া সকলের সেরা গুণী যে ঘাটে প্রাতঃকালে মুখ ধুইতে আসেন সেই ঘাটে যাইয়া লাগিল। প্রাতঃকালে ঘাটে মুখ ধুইতে আসিয়া গুণী দেখিলেন, একটা ভেলার উপর একটি কিশোর বালকের মৃতদেহ রহিয়াছে—মুখ ধোওয়া তাঁর হইল না—দু'হাতে করিয়া তিনি সেই দেহটিকে তুলিয়া লইয়া ঘরে আসিলেন—স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার জন্যে সুন্দর একটা ছেলে এনেছি গো!" বলিয়া ছেলেকে ছায়ায় নামাইয়া রাখিলেন।

স্ত্রী তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল—ওমা, এ যে মরা ছেলে —আহা, কার সর্ব্বনাশ হয়েছে গো!

গুণী হাসিয়া বলিলেন, "এখনই বাঁচিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও।"

বলিয়া তাঁহার চেনা, পৃথিবীর আর সকলের অচেনা, একটা লতার শিকড় কোথা হইতে আনিয়া ছেঁচিয়া রস এক ঝিনুক বাহির করিলেন—মাথার চামড়া চিরিয়া সেই রস একটু লাগাইয়া দিলেন—পায়ের তলায় হাতের তলায় আর জিহ্বায় মাখাইয়া দিলেন, নাকে দু' ফোঁটা দিলেন, দুই কানে দুই ফোঁটা রস দিয়া তিনি দূরে বসিয়া একদৃষ্টে রোগীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে শরীরের রং বদ্লাইতে লাগিল—জলের পাণ্ডুরতা ঘুচিয়া রক্তের আভা দেখা দিল—স্পন্দনহীন চোখের পাতা ঈষৎ স্পন্দিত হইল—ওষ্ঠাধর যেন মুহূর্ত্তের জন্য কঁাপিয়া উঠিল—

আবার সেই রস, সেই সেই স্থানে—

তারপর আবার—

জীবনের লক্ষণ স্ফুটতর হইতেছে—বুকের উত্থান পতন যত অল্পই হউক, তাহাতে এখন আর সন্দেহ নাই—

এখন চোখ খুলিলেই হয়—

গুণীর প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে—

গুণী লোক ভাল ; কত দিনের সঞ্চিত ক্ষুধা আর তৃষ্ণা লইয়া বালক পরলোক ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে তাহার ঠিক কি !

তিনি স্ত্রীকে দুধ গরম করিতে পাঠাইয়া দিলেন—যেন ছেলে ঘুমাইয়া উঠিয়া খাইবে।

গুণী তখনও ছেলের দিকে চোখ রাখিয়াছেন—

দুধ গরম করা হইয়াছে—

গুণীর স্ত্রী বলিল,—দুধ আনব ?

—সবুর।—গুণীর মুখ দিয়া কথাটা বাহির হইতে না হইতে ছেলে "মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া একেবারে উঠিয়া বসিল—তারপর অপরিচিত গৃহ আর লোক দেখিয়া চুপ করিয়া অবাক্ হইয়া রহিল—

মহাদেবের মতো কান্তিযুক্ত সেই গুণী বলিলেন,—বাবা, আমিও তোর বাবা ; এই তোর আর এক মা।

শুনিয়া ছেলে ছুটিয়া যাইয়া গুণীর স্ত্রীকে দু'হাতে জড়াইয়া ধরিল—ছেলের মুখচুম্বন করিয়া ক্রোড়ে বসাইয়া গুণীর স্ত্রী তাহাকে দুগ্ধ পান করাইতে বসিল—

ছেলের দুগ্ধ পান শেষ হইল। গুণী এখন ছেলের হাত ধরিয়া যাত্রা করিবেন, যে মা তাহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিল সেই মায়ের ক্রোড়ে তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে—

গুণীর গুণবতী স্ত্রী নূতন ছেলেকে ছাড়িয়া দিতে নারাজ হইয়া কত কাঁদিল আর কতবার যে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল তাহার ইয়ত্তা নাই—গুণী এই অপরূপ মায়া দেখিয়া প্রশান্তচিত্তে হাসিতে লাগিলেন—

ছেলের হাত হাতের মধ্যে লইয়া গুণী যাত্রা করিলেন—এই নদীর ধার দিয়া, এই নদীর বাঁকে বাঁকে ঘুরিয়া, নদীর তীরের বন ভেদ করিয়া, শ্মশান ডিঙাইয়া —নদীর শাখা স্রোত উত্তীর্ণ হইয়া—

মায়ের কাছে আসিতেছে বলিয়া ছেলের মুখে হাসি ধরিতেছে না ; তাহার বুকের ভিতর কেমন করিতেছে কে জানে ! ছট্‌ফটানির কি অন্ত আছে !—পা আস্তে পড়িতে চাহিতেছে না—গুণী তাহাকে নিবারণ করিতেছেন—

পথের লোক প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে,—এ কার ছেলে, প্রভু ?

গুণী বলিতেছেন,—সাকুলীপুরের গয়ামণির ছেলে।

"কোথায় লইয়া যাইতেছেন ?"

"এই ছেলের মা গয়ামণির কাছে।"

ছেলের মনে কৌতূহলের উদয় হইতেছে—

একবার হয়তো জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "আমি তোমার বাড়ীতে এলাম কেমন ক'রে?

গুণী দিব্য চক্ষে ছেলের আর তার মায়ের অন্তরের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ভগবান তোমার হাত ধ'রে আমার বাড়ীতে রেখে এসেছিলেন, যেমন আমি তোমার হাত ধ'রে তোমার মায়ের কাছে রেখে আসতে চলেছি।"

গয়ামণির মনে হইল, যদি আমি আগাইয়া যাই তবে ক্ষতি কি! মধ্যপথেই হয়তো দেখা হইয়া যাইবে।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই একদিন নদীতীরে দাঁড়াইয়া গয়ামণির আগাইয়া যাইবার ইচ্ছা দুর্দ্দম হইয়া উঠিল।

শ্রাবণের নদীর স্রোত খরবেগে যেদিকে বহিতেছে, আর সেই স্রোতে ভাসিয়া ভেলা যেদিকে গিয়াছে এবং যেদিক হইতে ছেলের হাত ধরিয়া গুণী এদিকে আসিতেছেন সেই পূর্ব্ব দিকেই সে যাত্রা করিল।

কিন্তু কোথাও না পেঁাছিতেই গয়ামণিকে ফিরিতে হইল। পরিচিত এক ব্যক্তি তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে জানিতে চাহিল, রামের বউ এদিকে এত সকালে একা একা কোথায় চলিয়াছে?

গয়ামণি বলিল,—কেন, ছেলেকে আনতে।—ছেলেকে সেই গুণী আনছে যে।

যেন সেই গুণীর কথা আর গুণীর কীর্ত্তি-মহিমা এতক্ষণে সবারই জানা উচিত।

লোকটি বলিল,—ছেলে আসছে না। ফিরে ঘরে চলো।

গয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল—দূর মিথ্যুক।

—না, না, মিথ্যে নয়।—তারপর কি ভাবিয়া বলিল,—যদি আনে ত' তোমার ঘরেই আনবে। তোমার যাবার কি দরকার? চলো, ফেরো।

—আমি না গেলেও আনবে ত'?

—হ্যাঁ।

—কখন?

— এই এল ব'লে।

গয়ামণি নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত বলিল,—তবে ফিরি। বলিয়া সে ফিরিল না—নির্বাক হইয়া পূর্ব্বাকাশের লোহিতোচ্ছ্বাসের দিকে চাহিয়া রহিল—

সূর্য্য তখন উদিত হইয়াছেন—বনরেখার অন্তরাল হইতে স্রোতের উজান বহিয়া তাঁহার লোহিত কিরণ জলের উপর ঢলিয়া পড়িয়াছে—তাঁহার প্রতিবিম্ব বহুদূরে জলতলে কাঁপিতেছে—

—দেখছ কি? ফেরো। বলিয়া হিতৈষী লোকটা ধমকাইয়া উঠিল।

গয়ামণি ফিরিল—

তাদের বাড়ীর ঘাটে তাহাকে পেঁাছাইয়া দিয়া সে লোকটি তার পথে চলিয়া গেল।

ঘাট তখন নির্জ্জন।

গয়ামণি জলের ধারে যাইয়া পা ছড়াইয়া বসিল—

নদী শান্ত—মাতৃক্রোড়ে নিদ্রিতা কিশোরী কন্যার মতো আনত সৌম্যনীলিমার

স্নেহস্নিগ্ধদৃষ্টির নীচে সে যেন সুপ্তিমগ্ন—আনন্দোজ্জ্বল পিতৃরূপী সূর্য্য তার শিয়রে দাঁড়াইয়া মনোহর লাবণ্য-ধারা কন্যার সর্ব্বদেহে মাখাইয়া দিয়াছে—দূর বনানীর নিস্পন্দ শ্যামলেখাবিন্যাস যেন কিশোরীর অচঞ্চল বেণীর মতো, অলস হইয়া উপাধানে পড়িয়া আছে—

বর্ষার জল কাণা ছাপাইয়া এখনও ওপারের তীরভূমি প্লাবিত করে নাই—স্রোতের তীক্ষ্ন চুম্বনরেখা মৃত্তিকার অঙ্গে কাটিয়া বসিতেছে।

একখানা ছোট নৌকা মাঝ-নদী দিয়া স্রোতের টানে আর তিনখানি দাঁড়ের ঠেলায় তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে—

গয়ামণি চেঁচাইয়া বলিল,—মাঝি আমায় নিয়ে যাও—ছেলের সঙ্গে যেখানে দেখা হবে সেখানে আমায় নামিয়ে দিও।

নৌকা চলিয়া গেল।

গয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; এক ঝলক হাওয়া লাগিয়া তার রুক্ষ কেশ পিঠের উপর ছড়াইয়া গেল। দূরগত নৌকার দিকে চাহিয়া সে আপন মনেই বলিল,—নিলে না—ওরা আমায় ডাঙা দিয়ে যেতে দেবে না, এরা নৌকায় নেবে না। জলে জলেই আমি যাব—নৌকার মতো শীগগির পেঁছে যাব। বলিয়া সে জলে নামিল ·· "জয় মা"—বলিয়া পতিতোদ্ধারিণীকে স্মরণ করিয়া সে আরও খানিকটা নামিল···

শ্রাবণের বেগবতী ফুল্লরার অগাধ জলরাশি অবিশ্রান্ত সেইদিকেই বহিতে লাগিল যে দিকে সেই ভেলা গেছে।

নদীর ধারে কাঁঠাল গাছওয়ালা যে বাড়ীটা, তাহার একটা জানালায় একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া নদী দেখিতেছিল · সে আৎকাইয়া উঠিয়া ছুটিয়া গিয়া মায়ের কাছে খবর দিল, "মা, রামের বৌ জলে পড়েছে।"

···রাম সংবাদ পাইয়া দৌড়াইয়া আসিয়া নদীর তীরে দাঁড়াইয়া জলের দিকে চাহিয়া হতভম্ব হইয়া রহিল; এবং যৎকিঞ্চিৎ আন্দোলনের পর সবাই বলিল, "গেছে ভালই হয়েছে; ও অবস্থায় না থাকাই ভাল।"

খোঁজা বৃথা—ডুবিতে না ডুবিতে এই "চুলছেঁড়া" জলের টানে দেহ কোথায় গিয়া উঠিয়াছে তাহা অনুমান করাই যায় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রামের লব গেল।

রামের স্ত্রী গয়ামণি গেল তাহাকে আনিতে।

নির্ব্বিকার ফুল্লরার সাগরাভিমুখী স্রোত বহিয়া তাহারা নিতান্ত নির্লিপ্ত পরের মতন অকস্মাৎ আর অকাতরে উত্তীর্ণ হইয়া গেল। শোকে দুঃখে অনাহারে স্বল্পাহারে দুর্ব্বল হইয়া রাম আর কাজের মানুষ রহিল না। রাম কাজের

চেষ্টায় দাখানা হাতে করিয়া বাহির হয় বটে, কিন্তু তাহাকে কেহ সিকি মজুরী দিয়াও নিযুক্ত করিতে চাহে না…যে পয়সা দিবে, রামের চেহারা দেখিয়াই তার মনে হয়, এক ঘণ্টার কাজ ও সমস্ত দিনে সমাপ্ত করিতে পারিবে কি না সন্দেহ।

তবু একদিন সে এক বাবুর বাগানের আগাছা তুলিয়া ফেলিবার কাজ পাইল।

কিন্তু দিনান্তে কাজের তদারক করিতে আসিয়া ক্রুদ্ধ গৃহস্বামী তাহাকে পয়সা না দিয়া ঠেলিয়া দিলেন—বাঁধান সিঁড়ির সঙ্গে ঠোক্কর লাগিয়া রামের মাথায় একটু রক্তপাত হইল।

*   *   *   *

ক্রমশঃ রামের বুকের হাড় প্রকট হইয়া উঠিল, দাড়ি বাড়িয়া গেল, পরণে নেংটি উঠিল—কাঁধে নিল সে ভিক্ষার ঝুলি—হাতে নিল সে নারিকেলের মালা।

চারিদিকেই পরিপূর্ণতা।—

আকাশ পরিপূর্ণ নীল ; তার আর চাই না ; গৃহে গৃহে পরিপূর্ণতা—সেখানে আরো পাইবার ক্ষুধিত ক্রন্দন নাই ; পথের দুধারে অগণিত পণ্যশালা, দ্রব্য সম্ভারে পরিপূর্ণ—আরো লইয়া রাখিবার স্থান সেখানে নাই ; গাছে গাছে ফুল ফুটিয়াছে, আরো ফুটাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার নাই, গৃহচূড়ায় কপোতের কূজন শুনিয়া মনে হয়, ক্ষুধাহীন পরিপূর্ণতায় তাহা বিহ্বল।…শিশুর মুখে পরিপূর্ণ নির্লিপ্ততা, বালকের মুখে ক্রীড়াসক্তির পরিপূর্ণ আনন্দ, যুবকের মুখে পরিপূর্ণ সুখ, বৃদ্ধের মুখে পরিপূর্ণ শান্তি…

সহস্র সহস্র লোক চলাচল করিতেছে—পরিপূর্ণতার গর্ব্বে তাহারা দৃপ্ত ; পরিপূর্ণতার বার্ত্তা পরস্পরকে জানাইবার ব্যগ্রতায় তাহাদের দাঁড়াইবার ধৈর্য্য নাই।

কেবল যত ক্ষুধা রামের উদরে !

রামের হাতের ভিক্ষাপাত্র দেখিয়া লোকে আতঙ্কিত হয়…তাদের মনে হয়, ইহার ভিক্ষাপাত্র এ-জীবনে ভরিবার নয়…এই ত' সেদিনও দিয়াছি।

কিন্তু সেদিন দিয়াও আজ আবার দিতে চায় এমন গৃহস্থও আছে।

তাহাকে দেখিয়া কি কারণে এই গৃহলক্ষ্মীটির মমতা জন্মে তাহা রাম জানে না—'মা' বলিয়া ডাক দিয়া দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইলেই তিনি মেয়েকে ডাকিয়া বলেন—"মাধু, রামকে দে ত' মা, দু' মুঠো চাল।"

মাধুই একদিন জিজ্ঞাসা করিয়া রামের নামটি জানিয়া লইয়াছিল।

মাধু একখানা সরায় করিয়া চাল আনে—রামের ঝুলির ভিতর অতি সাবধানে ঢালিয়া দেয়—একটি চাল মাটিতে পড়ে না।

রাম ভাবে, যেমন মা তেমনি মেয়ে—দেহ যেমন সুশ্রী মন তেমনি কোমল—ইহারাই স্নেহশীতলা অন্নপূর্ণার সন্তান !

ওদিকে রামভজন আগরওয়ালার আড়তে গিয়া দাঁড়াইলেই তাকিয়ার উপর হইতে ঘাড় তুলিয়া রামভজন বলে—"সরকার, ইসকো পয়সা দেও একঠো।"

আরো ওদিকে গাঙ্গুলীর হোটেলে গেলে ভাত থাকিলেই দেয়।

কিন্তু যে দেয় তাহারই কাছে নিত্য যাইতে লজ্জা করে ; যে দেয় না, লক্ষ্মীর

ভাণ্ডারগৃহে যে বন্দী, সে যদি দৈবাৎ দেয় এই আশাতেই দানকুণ্ঠের সম্মুখে নিত্যই হাত পাতিতে হয়।

আজ রামের ভিক্ষা ভালই মিলিয়াছে; মনে হইতেছে, আর চাই না...যে পরিপূর্ণতার আনন্দ চতুর্দ্দিকে তরঙ্গে তরঙ্গে ছুটিতেছে তাহা যেন রামের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ছল ছল করিতে লাগিল...

রাম হৃষ্টচিত্তে সকাল সকাল ঘরে ফিরিতেছিল।

এমন সময় সদর রাস্তার উপর একটি বৃহৎ বাড়ীতে কলরব শুনিয়া সে দাঁড়াইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যার ভাগ্য ভাল তার এমনিই হয়। নীলকণ্ঠ মজুমদারের ভাগ্য ভাল—সোনার সঙ্গে মাটি মিশিয়াছে, অথাৎ জঙ্গীপুরের মাতুল-সম্পত্তি তাঁহাতেই বর্ত্তিয়াছে; সে সম্পত্তির পরিমাণ ঢের—একটা জমিদারীই। নীলকণ্ঠ নিজে অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী; স্বাস্থ্যের আনন্দের উপর মাসিক তিন শত টাকা পেন্সন তিনি ভোগ করেন; সহরের বুকের উপর পাঁচটি ভাড়াটিয়া ইষ্টকালয় তাঁহারই ভাগ্যগর্ব্বে শির উচ্চ করিয়া আছে—একশত টাকার ডাক না দিলে সকলের ছোটটিও মানুষের অর্থাৎ নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করে না। নীলকণ্ঠের একটি কন্যা; কন্যার বিবাহ হইয়া গেছে; সুতরাং যে শত্রুরা বাঙ্গালীর ভিটায় ঘুঘু ডাকিয়া আনে তারা নীলকণ্ঠের আর নাই; জামাই পশ্চিমের একটি কলেজের অধ্যাপক; বড় আর মেজ ছেলে যথেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়া লাট দপ্তরের বড় দুখানি চেয়ারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বসিয়া আছে—শূন্য হইলেই যাইয়া বসিয়া পড়িবে।—নীলকণ্ঠ বড় ছেলের বিবাহ দিয়াছেন যাঁর কন্যার সঙ্গে সেই বেয়াই এত বড় ডাক্তার যে ভিজিট্ ছ'বৎসরে ষোলগুণ বাড়াইয়াও তাঁর বিশ্রামের সময় নাই; মেজ ছেলের শ্বশুর কোন এক স্বাধীন নৃপতির রাজস্বসচিব—সেই নৃপতি কলিকাতায় আসিলে কেল্লায় তোপ পড়ে।

আরো সুখের বিষয় ইহাই যে, নীলকণ্ঠ শোক পান নাই—আঁতুড় হইতে আজ পর্য্যন্ত তাঁর সন্তানেরা ভালই আছে। তার উপর তাঁর স্ত্রী এবং বধূ দু'টি রূপে গুণে আশাতীত উৎকৃষ্ট...

ভাগ্যলক্ষ্মী মানুষকে আর কি দিতে পারে!

সুখের উপর দ্বিগুণ সুখের একটি কারণ সম্প্রতি ঘটিয়াছে—নীলকণ্ঠের বাড়ীতে আজ সকাল হইতে রসন-চৌকি বাজিতেছে—তাঁর বড় ছেলে শৈলেন্দ্রের প্রথম পুত্রের আজ অন্নপ্রাশন। কুটুম্ব আর অভ্যাগতে বাড়ী পরিপূর্ণ হইয়া ভারি সমারোহ লাগিয়া গেছে, নীলকণ্ঠের রান্নাবাড়ী হইতে বাহির-বাড়ী অনেকটা পথ—

এতটা জায়গায় লোক একেবারে ঠাসা...দেখিয়া মনে হয় না, এ বাড়ীর বাহিরে আর মানুষ আছে।

এক কথায়, পৃথিবীর মর্ম্মগত মহানন্দ ধ্বনি যেন শত মুখে উৎসারিত হইয়া নীলকণ্ঠের গৃহের চতুঃসীমা পর্যন্ত ছড়াইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে।

আহ্লাদিত আর কাজে ব্যস্ত সবাই—

কিন্তু স্ফূর্ত্তি বেশী একটি লোকের—

পশ্চিম দেশীয়া ধাই লক্ষ্মীর মা প্রসূতিকে "খালাস" করিয়াছিল—সেই গৌরবে সে একখানি হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র পরিয়া আসিয়াছে। কৃষ্ণবর্ণ ত্বকের উপর খানিক অনাবশ্যক তেল ঢালিয়া যার-তারই মুখের দিকে চাহিয়া সোহাগের অনাবশ্যক হাসি এত হাসিতেছে যে তত আর কেউ নয়; আর সে হাসি কিছুক্ষণ দেখিলে করুণা জন্মে...

পাত্রাপাত্রজ্ঞান হারাইয়া কেবলি হাত পাতিয়া সে বলিতেছে "কি দেবে দাও।" যেন নীলকণ্ঠ নাতি পাওয়ায় ধাই ছাড়া অপর মানুষের পাওয়ার ইচ্ছা ঘুচিয়াছে—এখন মানুষের কেবল দেওয়ার দিন।

তার আশা আবার অল্প নয়---

হাতী ঘোড়ার আবশ্যক নাই—ঐ দু'টি ছাড়া আর সবই তাহাকে দেওয়া হোক্‌—একখানি বাড়ী পর্য্যন্ত!

ওদিকে লক্ষ্মীর আট বছরের মেয়ে রত্নাকে আনিয়া লক্ষ্মীর মা ভাঁড়ার ঘরের পরচালার নীচে ছোট্ট একটা ঢোলক দিয়া বসাইয়া দিয়াছে, সে এদিক্‌ ওদিক্‌ চাহিয়া ঢুক্‌ঢুক করিয়া সেটিকে বাজাইতেছে···

এই আনন্দবর্দ্ধন, পরিশ্রম এবং বিবেচনার জন্য সে যাইবার সময় "বিদায়" পাইবে।

যাহাই হউক, উৎসব জমিয়াছে বেশ—এবং খোকা স্বর্ণালঙ্কারে প্রায় আবৃত হইয়া গেছে।

জঙ্গীপুরের মিহি চালের এবং বাজারের চিনি ময়দার একটি দানারও অপচয় হইবার যো নাই—ভাঁড়ারে আছেন নীলকণ্ঠের স্ত্রী হৈমবতী নিজে। তিনি রীতিমত ওজন করিয়া চাল ময়দা চিনি ছাড়িতেছেন। ·· ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা রসগোল্লা চাহিয়া প্রতিবারই হতাশ হইয়া ফিরিতেছে না বটে, কিন্তু হৈমবতী রসটা নিংড়াইয়া রাখিয়া রসগোল্লা বিতরণ করিতেছেন—রস দোকানে ফেরৎ লয়।

নীলকণ্ঠের যিনি একেবারে লাগোয়া নিকটতম প্রতিবেশিনী তিনি ভর্তৃহীনা এবং দরিদ্রা। দু'টি পুত্র সন্তানের জননী হইবার পর হরিপ্রিয়া বিধবা হন। নীলকণ্ঠের বিরাট গৃহের পশ্চাদ্দিকে গলির ধারে খোলার ঘরে হরিপ্রিয়া বাস করেন···এই খোলার ঘরের লেজের উপর ভর রাখিয়াই যেন নীলকণ্ঠের ইটের অজগর মণি-উজ্জ্বল ফণা তুলিয়া বুক ফুলাইয়া খাড়া হইয়া আছে।

হরিপ্রিয়ার সঙ্গে হৈমবতীর যে ভাবটা তাহাকে ঠিক প্রণয় বলা চলে না—বুকের সে অমৃতসর ঘনীভূত হইয়া উঠিতে পারে নাই।—হরিপ্রিয়া কখনো প্রত্যাশী হইয়া হৈমবতীর দুয়ারে দাঁড়ান নাই; তবু সখীত্বের অসঙ্কোচ মেলা-মেশার পথে অতি সূক্ষ্ম মানসিক যে একটা অন্তরায় আছে বলিয়া তিনি অনুভব

করিয়াছেন তাহাকে কোনো দিনই ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই—হৈমবতীর তরফ হইতেও তাঁহাকে আরো কাছে টানিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা কোনো দিনই প্রকাশ পায় নাই।

আজিকার এই উৎসবে হৈমবতী নিজে হরিপ্রিয়াকে আহ্বান করেন নাই বোধ হয় মনের ভুলে!

রাখাল বলিল,—বড় বাড়ীতে সানাই বাজছে; দেখে আসি, মা?

মাখনও সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—আমিও যাই, মা, দাদার সঙ্গে?

হরিপ্রিয়া বাহির হইয়া আসিলেন—

মাখন আর রাখাল তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হরিপ্রিয়া দেখিলেন, যেন পরস্পরের উপর আপ্রাণ নির্ভর করিয়া দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে—কিন্তু বিলম্ব আর সহিতে পারিতেছে না—বাঁশীর সুরে তাদের শিরায় শিরায় টান পড়িয়াছে—মুখাবয়ব উদ্‌গ্রীব, চক্ষু চঞ্চল।

একটুখানি হাসি হরিপ্রিয়ার মুখে ফুটিতে আসিয়া ফিরিয়া গেল—বলিলেন, যাও, কিন্তু কিছু চেয়ে বস' না যেন, বাইরে থেকে দেখে এস।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল,—আমাদের নেমন্তন্ন হয়নি, মা?

—না।

বড়বাড়ীর অনলস উৎসবের বিচিত্র আনন্দধ্বনি অবিরাম কানে আসিতেছে—হঠাৎ সেইটাই কেমন একটা নির্মম অসঙ্গতির মতো হরিপ্রিয়ার কানে বাজিল। যে একটু সুষ্ঠু ঐক্যবোধ একটি শিশুতনুকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে ভিতরে ভিতরে আনন্দ দিতেছিল, ছেলের প্রশ্নে সেই ঐক্যের সূত্র ছিঁড়িয়া তিনি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন—এই বিচ্ছেদের বেদনা তুচ্ছ নহে।

ছেলেরা সানাই শুনিতে বাহির হইয়া যাইবে এমন সময় বাহিরের দরজার কড়াটা ঝমু ঝমু বাজিয়া উঠিল।

রাখাল বলিল,—কে?

—আমি। দরজা খোলো।

দরজা খুলিয়া দেখা গেল, নীলকণ্ঠের সরকার নিত্যানন্দ ভৌমিক আসিয়াছে—

নিত্যানন্দ বলিল,—তোমাদের দু' ভাইয়ের নিমন্ত্রণ রইল; নীলকণ্ঠ বাবুর বাড়ীতে আজ মধ্যাহ্নভোজন করবে—তাঁর পৌত্রের অন্নপ্রাশন। বলিয়া ফর্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিত্যানন্দ অন্য দরজার কড়া নাড়িতে চলিয়া গেল।

রাখাল দরজার বাহিরে পা বাড়াইয়া বলিল,—মা, যাই?

—যাও।

রাখাল বলিল,—আয়, মাখনা।

রাখাল আসিয়া খবর দিল,—মা, সতু বললে, বারোটার সময়ই খাওয়া হবে। আর বললে, আরো বাজনা আসবে, ব্যাণ্ড আসবে; প্রোসেসনের সঙ্গে আমাকেও যেতে বলেছে। বললে, তোদের ডেকে নিয়ে যাবো। তখন যাবো, মা?

হরিপ্রিয়া অনুমতি দিলেন—যেও।

রাখাল পুলকিত হইয়া চলিয়া গেল; সতুকে সু-খবরটা দিতে হইবে যে, মায়ের অনুমতি পাওয়া গেছে।

মাখন আসিয়া সংবাদ দিল,—যে-খোকার ভাত হবে তার গায়ে যে গয়না পরিয়েছে, মা, সে ঢের! সতু বললে, আরো আছে—গায়ে জায়গা নেই ব'লে পরান' হয় নি।

শুনিয়া হরিপ্রিয়া আনন্দিত হইয়া মাখনের মুখের ঘাম আঁচলে মুছিয়া লইলেন।

তখনি রাখাল পুনরায় বার্ত্তা লইয়া আসিল যে, লুচি আর পোলাও দু'রকম দামী খাদ্যই প্রস্তুত হইতেছে, এখন ভোক্তার যেটি ইচ্ছা।

এমনি সব খবর শুনিতে শুনিতে হরিপ্রিয়া বিব্রত হইয়া উঠিলেন…একবার বলিলেন,—সব শুনলাম ত'! এখন তোরা চান করে দু'টি ভাতে ভাত খেয়ে নে দিকি। সেই কোন বেলায় ভোজ খাবি—

রাখাল বলিল,—এখন কিন্তু খুব পেট ভরে খাব না, মা!

মাখন বলিল,—আমিও তাই, নয়, দাদা?

রাখাল বোধ হয় ক্লান্ত হইয়া কিছুক্ষণের জন্য ছুটি লইয়াছিল, মায়ের কোলের কাছে মাদুরে শুইয়া সে বিশ্রাম করিতেছিল—মাখন একটা জরুরী খবর মুখে করিয়া হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল—লাফাইতে লাফাইতে বলিল,—এখুনি প্রোসেসন বেরুবে দাদা, চলো। ব্যাণ্ড এসেছে।—বলিয়া ছটফট করিতে লাগিল—

ব্যাণ্ড তখনই বাজিয়া উঠিল—ব্যাগপাইপ তার পিছনে।

রাখাল তড়াক করিয়া উঠিয়া পড়িল, কিন্তু হরিপ্রিয়া বাধা দিলেন, বলিলেন, —ডাকবে বলেছে, একটু দাঁড়া।

রাখাল আর মাখন আকুলনেত্রে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া থমকিয়া রহিল।

হাওয়াগাড়ী ভক্ ভক্ শব্দ করিল—রাখালরা তা শুনিল—মেয়েরা হুলুধ্বনি করিলেন—ব্যাণ্ড, ব্যাগপাইপ, ঢোল, সানাই একসঙ্গে অত্যন্ত কলরব করিয়া উঠিল। রাখালরা ছটফট করিতে লাগিল—কিন্তু মায়ের মুখে অনুকূল চিহ্ন দেখা গেল না।

সতুও ডাকিতে আসিল না।

বুঝা গেল, বাদ্যের শব্দ ধীরে ধীরে প্রস্থান করিতেছে। রাখাল আর মাখন, ঐ আসে ঐ আসে করিয়া প্রাণান্তকর উদ্‌গ্রীবতায়, দরজার দিকে চক্ষু কর্ণ পাতিয়া রহিল, কিন্তু সতু তখনও ডাকিতে আসিল না, সে ভুলিয়া গেছে।

বাজনার আওয়াজ আরো দূরে চলিয়া গেল—

হরিপ্রিয়া মুখ ফিরাইয়া শুইয়া ছিলেন, ছেলেদের চোখের জল তার চোখে পড়িল না।

বেলা প্রায় দুইটা। নীলকণ্ঠের বাড়ীতে ভোজ আরম্ভ হইয়া গেছে। কোলাহল ব্যস্ততা আর ডাকহাঁক দৌড়াদৌড়ির অন্ত নাই। প্রকাণ্ড আঙিনা আর বারান্দা জুড়িয়া লোক বসিয়া গেছে—সব বড় বড় লোক, ধনে মানে নীলকণ্ঠের সমকক্ষ; তাঁরা সবাই সগোষ্ঠী আর সবান্ধবে আসিয়াছেন।

নীলকণ্ঠ একখানা চেয়ার পাতিয়া রাখিয়া তাহাতে না বসিয়া সম্মুখেই দাঁড়াইয়া

আছেন, শৈলেন্দ্র তাঁর পাশেই।

পিতা পুত্র উচ্চকণ্ঠে কেবলি হাঁকিতেছেন, "ঐ পাতে, ঐ পাতে"—

তাঁরা আরো বলিতেছেন—"দাও, ঠাকুর"—

আপত্তি শুনিয়া আপ্যায়নের তেজ আরো বাড়িয়া যাইতেছে, বলিতেছে, "নষ্ট হবে? তা হয় হোক্, দাও ঠাকুর।"

গরম পোলাও ঠাণ্ডা হইয়া অরুচি ধরিয়া গেলে, গরম গরম আরো চার-হাতা লইয়া তার তিন-হাতাই ঠাণ্ডা করিয়া লোকে ফেলিয়া রাখিল।

নীলকণ্ঠ যদি বলেন—"আর দুটো দিক?"—শৈলেন্দ্র বাড়াইয়া বলে, "খেয়ে ফেলুন—ঠাকুর, আর দুটো দাও।"

কিন্তু ঠাকুর দেয় আরো চারটে। লোক শেষে রসগোল্লা প্রভৃতি চিবাইয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

দেখিয়া নীলকণ্ঠ আর শৈলেন্দ্রের আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না—ইহারই নাম লোক-খাওয়ানো।

—খাবার জল চাই।

—ঠাকুর, খাবার জল দাও। বলিয়া হাঁক ছাড়িয়াই দৈবাৎ পিছন ফিরিয়া নীলকণ্ঠ দেখিলেন, তাঁরই সতু সিতুর সমবয়সী সুকুমার দুইটি বালক ছিটের পোষাকে সাজিয়া আসিয়া কাছেই দাঁড়াইয়া আছে।

শৈলেন্দ্র পাশেই ছিল -

নীলকণ্ঠ ছেলে দু'টিকে ভ্রূভঙ্গীর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া শৈলেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এরা কারা?

শৈলেন্দ্র বলিল,—পিছনের ঐ খোলার বাড়ীর।

—ওদের কি বলা হয়েছিল?

অষ্টপৃষ্ঠাব্যাপী ফর্দে'র ভিতর ৺মধুসূদন রায়ের পুত্রদ্বয়ের উল্লেখ ছিল কি না শৈলেন্দ্রের তাহা মনে পড়িল না; বলিল,—না বোধ হয়; জানিনে ঠিক—সরকার মশাই—

নীলকণ্ঠ বলিলেন,—লোকে বেশ সুবিধে পেয়ে গেছে দেখছি। বলিয়া নিঃস্পৃহ হইয়া গেলেন।

মাখন কিছু বুঝিল না—কিন্তু রাখাল কিছু বুঝিল ···

যিনি জল চাহিয়াছিলেন, ইত্যবসরে তিনি জল পাইয়াছেন—পরস্পরের নিঃশব্দ অনুমতি লইয়া সকলে উদ্‌গার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন।

গোলমালের মধ্যে রাখাল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মাখনের হাত ধরিয়া বলিল,—আয়।

—হরিপ্রিয়া দুভাইকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—গেলি আর ফিরে এলি যে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাখাল আর মাখন গেল আর ফিরিয়া আসিল। তারপর জননীর প্রশ্নের উত্তরে তাহারা কি বলিল এবং সেই ক্ষুদ্র গৃহে কি বেদনার সৃষ্টি হইল সে কথা যাক্।

কিন্তু নীলকণ্ঠের গৃহে ভোজনান্তে এইবার বিদায় লইবার পালা—নিমন্ত্রিতেরা কস্তুরীগন্ধযুক্ত পান লইয়া একে একে, দলে দলে প্রস্থান করিতেছেন।

যাইবার আগে রায় বাহাদুর নিরঞ্জনপ্রসন্ন সর্ব্বাধিকারী নীলকণ্ঠকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন,—ভায়া, একবার ভেতরে চলো।

বুঝা গেল খোকাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন—

ঘটিলও তাই ; রায় বাহাদুর একটা 'ফুল' গিনি দিয়া খোকাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং অধিকন্তু খোকাকে শ্যালক সম্বোধন করিয়া গৃহিণীকে তাহার অঙ্কে সমর্পণ করিবার নির্ঘাৎ প্রস্তাব করিয়া বসিলেন—

তাঁহার সাহস দেখিয়া খোকা বিচলিত হইল না ; কিন্তু তাহার স্বার্থত্যাগের প্রস্তাবে নীলকণ্ঠ প্রমুখ সকলেই প্রচুর হাস্য করিলেন—

লক্ষ্মীর মা বলিল—বাবুজির কি কথা! বলিয়া সকলের হাসির চতুর্গুণ হাসি সে একা হাসিল।

রায় বাহাদুরের গৃহিণীও সেখানে ছিলেন—

খোকার সম্মুখস্থ রৌপ্যপাত্র মামুলী রৌপ্যমুদ্রায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে—কে একজন একটি স্বর্ণাঙ্গুরীও দিয়াছে, তাহার আনুমানিক মূল্য সাড়ে পাঁচ টাকার বেশী নয়—কিন্তু গিনি পড়িল মাত্র ঐ একটি -

অম্বিকা দেবী সেই কারণে হাফ-ঘোমটার আড়ালে গর্ব্ব অনুভব করিতেছিলেন —খোকার অঙ্কশায়িনী হইতে তিনি মাথা নাড়িয়া রাজী হইলেন—

ইহাতেও সকলে লক্ষ্মীর মায়ের সঙ্গে হাস্য করিলেন।

হৈমবতী একটি ছেলেকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, রায় বাহাদুর খোকার একটি পসন্দসই নাম রাখুন।

লক্ষ্মীর মা বলিল,—হাঁ, একটা পয়মন্ত নাম।

রায় বাহাদুরের মুখে চোখে হর্ষ বিকশিত হইল—কিন্তু গিনি দেওয়া যত সহজ, নাম রাখা তত সহজ নহে—অনেক হাতড়াইতে হয়।

বলিলেন,—দেখে শুনে রাখব একটা—চলো হে। বলিয়া তিনি নত হইয়া খোকার চিবুক স্পর্শ করিলেন এবং নীলকণ্ঠকে হাতের একটা ঠেলা দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

লক্ষ্মীর মা বলিল,—পরে রাখবেন নাম, এখন না। বলিয়া এমন আহ্লাদিত হইয়া উঠিল যেন অবলম্বনের জন্যে ঢলিয়া কাহারো গায়ে পড়িতে চায়।—তার পাশেই একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া ছিল—"আ-মর"—বলিয়া সে নাক কুঁচকাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

নীলকণ্ঠের বহির্ব্বাটী হইতে রাস্তায় পৌছিতে একটা কক্ষ অতিক্রম করিতে হয় ; সেটার উপরে নীলকণ্ঠের বৈঠকখানা—নীচেটা ভৃত্যবর্গের বিশ্রাম কক্ষ—

এই কক্ষ দিয়াই পথ ; পাচটা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠান হইতে সেই ঘরে উঠিতে

হয়। রায় বাহাদুর নিরঞ্জনপ্রসন্ন সর্ব্বাধিকারী সেই সিঁড়ির দু'ধাপ উঠিতেই, অপর যে ব্যক্তি সেই সিঁড়ি দিয়াই উঠানে নামিতে উদ্যত হইয়া একেবারে দরজার মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তার চেহারা বীভৎস—মুখে এক মুখ দাড়ি গোঁফ; চুলগুলি আন্দাজে আর অপটু হস্তে নিজেই কাটিয়াছে বলিয়া মাথাটা বড় অপরিপাটী হইয়া উঠিয়াছে, পরিধানে মলিন বস্ত্রখণ্ড; কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি—অশেষ জীর্ণ সংস্কারের দরুণ তাহা বিবিধ বর্ণের আর বিবিধ আকারের কাপড়ে কাপড়-হাটার নমুনার মতো দেখাইতেছে; হাতে একখানা বাঁশের লাঠি আছে—

এই মূর্ত্তি সম্মুখে পড়ায় রায় বাহাদুর বাধা পাইলেন সিঁড়ির উপরেই তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন—

অস্ত্রে যেমন ধার থাকে তেমনি রায় বাহাদুরের পাশেই ছিলেন নীলকণ্ঠ; তিনি চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কে রে তুই?"

রাম বলিল—আজ্ঞে,আমি রাম। বলিয়া রাম নিজের পরিচয় সসংকোচে নিবেদন করিল, কিন্তু মতিভ্রমবশতঃ রায় বাহাদুরকে পথ দিয়া সে সরিয়া গেল না।

নাম-সম্পর্কে পিছন হইতে একটি ইস্কুলের ছেলে বলিল,—তুমি আরে রাম।

এই কথায় একটি হাস্যধ্বনি উঠিল—

রামের ধৃষ্টতায় আগুন হইয়া নীলকণ্ঠ হাস্যধ্বনিকে আবৃত করিয়া বজ্রকণ্ঠে হাঁকিলেন - তেওয়ারী?

তেওয়ারী নীলকণ্ঠের দ্বারোয়ান, সে পোলাও পরিবেশন করিয়া গায়ের ঘাম মুছিয়া পৈতার ঘাম নিংড়াইতেছিল—আহ্বান ধ্বনিত হইতেই 'হুজুর' বলিয়া সাড়া দিয়া সে ভোজপুরী বিক্রমে লাফাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

নীলকণ্ঠ তর্জনী নাড়িয়া তাহার কাছে জানিতে চাহিলেন, বেতনভুক এত ভৃত্য বিদ্যমান থাকিতে রায় বাহাদুরের সম্মুখে এই লোক পড়ে কেন?

কিন্তু তেওয়ারী কৈফিয়ৎ দিবার পূর্ব্বেই ততক্ষণে কাজ সুরু হইয়া গিয়াছে—অর্থাৎ নীলকণ্ঠের কোচম্যান শিউসেবক আসিয়া পরম তৎপরতার সহিত রামের গলদেশ চাপিয়া ধরিয়াছে—এবং রাম আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে—

রায় বাহাদুর এতক্ষণে কথা কহিলেন কোচম্যানকে রামের গলদেশ হইতে হাত তুলিয়া লইতে আদেশ করিলেন—

আদেশ প্রতিপালিত হইল দেখিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া নীলকণ্ঠকে বলিলেন,—আহা, শুভদিনে কেন হাঙ্গামা করছ!

ফরিয়াদি মামলা তুলিয়া লইতেছেন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়া শান্তি স্থাপিত হইল—নীলকণ্ঠ রুদ্রমূর্ত্তি সংবরণ করিলেন।

রায় বাহাদুর রামকে আরো নিকটে ডাকিয়া পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিতে গেলেন—

রাম তখন থরু থরু করিয়া কাঁপিতেছিল—

কম্পিত করতল পাতিয়া সে দান গ্রহণ করিল—

রায় বাহাদুর নীলকণ্ঠকে পুনরায় বলিলেন,—কিছু খাবার টাবার দিয়ে একে বিদেয় করো। আহা, আজ শুভদিনে কি মারধোর করতে আছে!—বলিয়া তিনি এবার নির্ব্বিঘ্নে কক্ষ অতিক্রম করিয়া রাস্তায় মোটরের কাছে পৌঁছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রায় বাহাদুরের ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থাই নীলকণ্ঠ করিলেন—

রাম একটি টাকা পাইয়াছিল ; পরে ছ'খানি লুচি পাইল। নীলকণ্ঠ তর্জনী নাচাইয়া তাহাকে আস্তাবলের জলের চৌবাচ্চার ধারে বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন —তেওয়ারী হাতে করিয়া ছ'খানা লুচি আনিয়া দাঁড়াইতেই রাম লাঠিখানাকে পাশে শোয়াইয়া রাখিয়া দুই হাত বাড়াইয়া অঞ্জলি পাতিল—

তেওয়ারী নিজে আলগোছ থাকিয়া উপর হইতে লুচি তাহার অঞ্জলির উপর ছাড়িয়া দিল।

রায় বাহাদুর অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া গেছেন বলিয়াই বোধ হয় রাম ইহার উপরেও তেওয়ারীর কাছে একখানা "বড় কাগজ" চাহিয়া পাইল ; সেই কাগজে লুচি ছ'খানি জড়াইয়া লইয়া তাহা ঝুলির ভিতর রাখিয়া রাম লাঠি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—

আর কাহাকে ভোজনে বসাইতে হইবে তাহাই তদারক করিতে শৈলেন্দ্র এদিকে আসিয়াছিল।

ঝুলি আর লাঠি নামাইয়া উপুড় হইয়া রাম তাহাকে প্রণাম করিল।

শৈলেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল,—তুই কে রে ?

রাম বলিল,—আজ্ঞে, আমি রাম।

—খাবার পেয়েছিস ?

শুনিয়া রাম গদগদ হইয়া মনে মনে কত যে হাসিল তার ইয়ত্তা নাই,—খাবার সে পাইয়াছে।

শৈলেন্দ্রের মুখের দিকে চোখ তুলিয়া বলিল,—পেয়েছি, বাবু।

—খাবিনে ?

রাম বলিল,—খাব। বাড়ীতে গিয়ে খাব।

নীলকণ্ঠের গৃহ হইতে রাম যখন নিষ্ক্রান্ত হইল, তখন তার চিত্ত আনন্দিত—অশক্ত দেহে অপূর্ব্ব একটি শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে—জনস্রোতের দিকে পুলকিত নেত্রে চাহিতে চাহিতে রাম পথ চলিতে লাগিল—

পৃথিবী কেন আনন্দধাম, এই প্রশ্নের উত্তরটি, এবং সানন্দে পথ চলিবার যে গূঢ় কারণটি লুকাইয়া রাখিয়া মানুষ এতদিন তাহাকে ঠকাইতেছিল আজ তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে—পৃথিবীর অর্দ্ধেক মানুষ আহরণ করিতে ছুটিতেছে—অপর অর্দ্ধেক আহরণ করিয়া ফিরিতেছে—

কিন্তু যে যতই আহরণ করুক তার মতো অমূল্য আহরণ আর কাহারো নহে—

রামের পা দু'খানা দ্রুততর চলিতে লাগিল—ঐ অমূল্য আহরণ অর্থাৎ টাকাটা লইয়া ঘরে পৌঁছিতে পারিলেই তাহা যেন তার সত্যকার আপনার হইবে।

সকল আনন্দ লুপ্ত আর সকল চিন্তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিয়া হঠাৎ একটা বড় কঠিন কথা রামের মনে পড়িল ; যে দাতা তাহাকে টাকাটা দান করিয়াছে সে-ই আবার টাকাটা কাড়িয়া লইতে পশ্চাতে লোক ছুটাইয়া দেয় নাই ত' ?

এত বড় বস্তু দান করিয়া অকাতর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে এমন ত্যাগী মহানুভব ব্যক্তি পৃথিবীতে নাই বোধ হয়—

শঙ্কায় রামের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল—এমন সাহস হইল না যে পশ্চাদ্দিকে একবার চাহিয়া দেখে।

এমনও ত' অক্লেশে ঘটিতে পারে যে, হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া চোর বলিয়া পুলিশে ধরাইয়া দিবে—বিশ্বাস নাই—এমন হয়—

ত্রাসে অন্ধ হইয়া পলায়নোদ্দেশ্যে ছুটিতে যাইয়াই রাম বাধা পাইল ; কে যেন কোন দিক হইতে গর্জন করিয়া উঠিল—"এইও"—

সে পৌঁছিয়া গেছে—দয়ালু লোকটি দানের জন্য অনুতপ্ত হইয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইতে কি ধরাইয়া দিতে যে বলবান আর অত্যাচারী ভোজপুরী দ্বারবানকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন সে দৌড়াইয়া আসিয়া তাহার নাগাল পাইয়াছে।

কিন্তু তাহা নয়।

"চাপা পড়লে যে।"—বলিয়া সদয় কণ্ঠে ভর্ৎসনা করিয়া একটি বাবু তাহাকে পাশের দিকে টানিয়া লইলেন।

রাম দেখিল, সম্মুখেই গোরুর গাড়ী—থামিয়া আছে ; গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান এবং আরো দু'চারিজন দর্শক দাঁড়াইয়া তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া হাসিতেছে—

গোরুর গাড়ী চলিয়া গেল, যাহারা দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহারাও চলিয়া গেল—কিন্তু তীব্র ত্রাসের বিদ্যুতে আহত হইয়া ক্ষণিক মূর্চ্ছার যে আঘাত সহ্য করিয়া রাম এইমাত্র জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার অবসাদ ঠেলিয়া সে তখনই চলিতে পারিল না।

কিন্তু শুনিতে আশ্চর্য, রামের বুকের এই ঝটিকার বেগ দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল—ভয়ের কোনো কারণই বিদ্যমান নাই জানিতে পারিয়াই রামের কণ্ট ঘুচিয়া ক্লান্তি দূর হইয়া প্রাণে পুনরায় স্ফূর্ত্তি দেখা দিল।

ভৃত্য শ্রেণীর একটি যুবক বাটিতে করিয়া সেরখানেক ঘি, আর পাতার ঠোঙায় করিয়া সের দেড়েক ময়দা লইয়া যাইতেছিল—

রাম তাহাকে ডাকিয়া দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঘিয়ের কি দর আজকাল ?"

রামের দিকে চাহিয়া হাসিয়া সেই লোকটি উত্তর দিবার পূর্ব্বে জানিতে চাহিল, "মণের দর না সেরের দর ?"

রাম বলিল, "সেরের দরই শুনি।"

—সাত সিকে।

রাম বলিল,—দাম বেড়েছে। বলিয়া চলিতে লাগিল।

রামের আজ কিছুই অপ্রাপ্তব্য নাই—কোন ভোগ্য বস্তু হস্তগত করিবার আশা দুরাশা নয়।

ঘরখানিকে রাম এখনো বাসোপযোগী মনে করে কিনা বলা যায় না, কিন্তু তাহাকে সে ভালবাসে।

মাইল দেড়েক পথ অতিক্রম করিয়া সহর হইতে ঘরে পৌঁছিতে আগে তার

হাঁটু ভাঙ্গিয়া শরীর দুমড়াইয়া পড়িত, কিন্তু ঝুলির ভিতর ছ'খানা লুচি আর একটি টাকা লইয়া সে আপন গৃহে চলিয়াছে বলিয়া, দৈবদণ্ডস্পর্শে রোগমুক্তির মতো, কি একটা শক্তিমন্ত্র যাদুর খেলায় আজ তাহার পা কাঁপিল না।

রাম গৃহে পেঁৗছিল—

দুয়ারে দাঁড়াইয়া একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল—তারপর দরজা শিকল খুলিয়া রাম ঘরে ঢুকিল—ঝুলিটা মেঝের মাটিতে নামাইতে যাইয়া তাহার জ্ঞান জন্মিল, মাটির সঙ্গে লুচি আর টাকার স্পর্শ ঘটানো সঙ্গত হইবে না—আর একটু আগ ইয়া রাম দেয়ালের পেরেকের সঙ্গে তাহাকে ঝুলাইয়া রাখিল—

তারপর রাম বসিয়া বসিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিতে চাহিতে আপন মনেই অনেক হাসিল…

যেন ঐ টাকাটা মন্ত্র জানে—

সে হাসিতেই মাটির হাঁড়িটা, সরাটা, এনামেলের ফুটা বাটিটা পর্য্যন্ত যেন হাসির রজতচ্ছটা ছড়াইতেছে…

রামের মনে হইল, আর ভিক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই—ছেলে মরিয়া গেছে বলিয়া আর একা বসিয়া কাঁদিবে না!…

তার ছেলের মৃত্যুর কথা কেহ বিশ্বাস করে, কেহ করে না—মিথ্যাবাদী বলিয়া ভৎর্সনা করে…তবু একটি নিঃশ্বাস তার পড়িল।

রাম ধীরে ধীরে উঠিয়া ঝুলিটা পাড়িয়া আনিল—তাহাকে কোলের উপর রাখিয়া ঝুলির মুখ খুলিয়া অতি সন্তর্পণে তাহার ভিতর হইতে কাগজে মোড়া লুচি ক'খানা বাহির করিল…গামছাখানা মেঝেয় পাতিয়া তাহার উপর মোড়কটা রাখিয়া ধীরে ধীরে কাগজের আবরণ খুলিয়া ফেলিল…যেন রৌপ্য নির্ম্মিত একটি পরম উপাদেয় দৃশ্য তার পরিতৃপ্ত চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া রহিল।

রাম তখন ক্ষুধার্ত্ত—

কিন্তু লুচির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার দিনব্যাপী ক্ষুধাবোধ অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ঝুলির ভিতর হাত ভরিয়া টাকাটা সে বাহির করিয়া আনিল…নির্নিমেষ চক্ষে সে টাকাটার দিকে চাহিয়া রহিল…কোথা হইতে অপূর্ব্ব একটা আলোক লাভ করিয়া তার দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

টাকার উপর একটি মুখাবয়ব অঙ্কিত রহিয়াছে—রাজার মুখ, কিন্ত কোন্ রাজার মুখ তাহা সে স্বপ্নেও জানে না। উল্টাইয়া দেখিল, অন্যদিকেও ছবি রহিয়াছে; অক্ষরগুলিকে সে অক্ষর বলিয়া চিনিতে পারিল না।

একটা লোক, ধর যদি সে-ই, এই রকম একটা টাকা তৈরী করিতে বসে তবে তাহাকে পরিশ্রম করিতে হয় বিস্তর—যন্ত্রপাতিও অনেক সময় লাগে বোধ হয়—ভাবিয়া রাম বিস্মিত হইল।

টাকাটা বৃদ্ধাঙ্গুলি আর তর্জনীর মাঝে ধরিয়া রাম তাহাকে স্নেহ ও সম্ভ্রমের সহিত একবার কপালে ছুঁয়াইল; তারপর তাহাকে মুষ্টির ভিতর আবদ্ধ করিয়া মুষ্টি ক্রমশঃ দৃঢ়তর করিয়া তাহাকে অনুভব করিতে লাগিল…হাত গরম হইয়া

উঠিল ; মুষ্টি খুলিয়া চাহিয়া দেখিল, টাকাটা রহিয়াছে···দেখিয়া সে নূতন করিয়া আর একবার অবাক্ হইল।

পুনরায় মুঠা বাঁধিয়া তার মনে হইল, যদি এইবার হাত খুলিয়া দেখা যায়, একটি টাকা দু'টি হইয়াছে।—মনে হইতেই রামের গা সির্‌সির্ করিয়া উঠিল।—তাহা কি একেবারেই অসম্ভব। ভগবান দয়ালুর হাত দিয়া একটি টাকা দিয়াছেন ; তিনি পুনরায় দয়াপরবশ হইয়া কি একটিকে দু'টি করিতে পারেন না ? এমন কি ঘটে না ? ঘটিতে পারে না, ভগবানের রাজ্যে এমন কিছু নাই ? এমনি করিয়া টাকা যদি বাড়িতে থাকে !···রামের চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিল।

চোখ খুলিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিয়া রাম হতাশ হইয়া ভাবিতে লাগিল, ঘরে এমন স্থান নাই যে, টাকা রাখা যায়···কিন্তু পরক্ষণেই রামের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—টাকা হইলে সেই টাকাতেই ত' ঘর হইতে পারিবে, সিন্দুক হইতে পারিবে। রামের মনে অতঃপর টাকার স্রোত বহিতে লাগিল।—

এক সময় সে মুষ্টি খুলিয়া দেখিল, টাকা একটাই আছে, দ্বিগুণ হয় নাই।

কি মনে করিয়া সে পরম লালসার সঙ্গে জিহ্বা বাহির করিয়া টাকাটার এপিঠ ওপিঠ দু'বার চাটিল···তারপর তাহাকে লুচির স্তূপের পাশে অতিশয় যত্নের সহিত নামাইয়া রাখিল।

একটি একটি করিয়া তুলিয়া সে লুচি ক'খানা গণিয়া দেখিল--ছ'খানা।···একখানার এক টুকরা ভাঙিয়া মুখে দিতে যাইয়া একবার অঙ্গহীন লুচিখানার দিকে একবার টুকরাটির দিকে চাহিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল হঠাৎ সে চমকিয়া দেখে, লুচির টুকরাকে কখন সে আনমনায় মুখের ভিতর পৌঁছাইয়া দিয়া চিবাইতে সুরু করিয়া দিয়াছে। যেন নিজের হাতে নিজের পায়ে কুঠার মারিতে গিয়াছিল, হুঁস ফিরিলে প্রলোভনের বস্তুকে পরিহার করিতে এমনি শশব্যস্তে রাম উঠিয়া দাঁড়াইল এবং প্রকৃতিস্থ হইতে তার কিছু সময় লাগিল।

তারপর বসিয়া লুচি ক'খানা আবার কাগজে মুড়িয়া চক্ষুর অন্তরালে হাঁড়ির ভিতর রাখিয়া দিল—হাঁড়ির মুখে সরা চাপাইয়া সে পুনরায় ভিক্ষায় বাহির হইয়া গেল—

নূতন হাঁড়ি আর সরা কিনিবার পয়সা তাহার চাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাঘডাঙ্গার শ্রীবাস সরকার পুত্রের বিবাহ দিয়া বধূ, বর এবং বহু অনুচর আর প্রচুর প্রাপ্তিসহ দেশে ফিরিতেছেন। তাঁর হিসাবরক্ষক হীরালাল ব্যতীত আর সবারই বিশ্বাস, শ্রীবাস পয়সাওয়ালা লোক ; সুতরাং সেই বিশ্বাসটা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তদ্বিষয়ে সতর্ক হইয়া বৈবাহিকের টাকায় তিনি বিবাহে ঘটা করিয়াছেন আশাতীত।

যাহা হউক তিনি ফিরিতেছেন, এবং বৈবাহিকের ব্যবহারে খুশী হইয়াই ফিরিতেছেন। খানিকটা পথ রেলগাড়ীতে যাইতে হইবে—তাই তিনি হাতে 'কিছু" সময় রাখিয়া গাড়ীর সময়ের বহু পূর্বেই ষ্টেশনে পৌঁছিয়া সম্প্রতি বিশ্রাম করিতেছেন।

কয়েকজন সেকেলের লোক ছাড়া বরযাত্রীরা গো-যান হইতে অবতরণ করিয়াই আয়না চিরুণী ও ব্রুসের সাহায্যে যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনি করিয়া চুলগুলিকে পুনরায় পরিপাটি করিয়া লইয়াছে—এদিক ওদিক হইতে দেয় নাই।—সকলেই সাজিয়া গিয়াছিল—সাজিয়াই ফিরিতেছে; সুতরাং জামার, জুতার, বোতামের, চাদরের, রুমালের, কোচার, আংটির, চুলের, ঘড়ির, চেনের, চশমার, এমন কি পুরুত ঠাকুরের পৈতার এবং পরামাণিকের দর্পণের আর সৃষ্টিধরের লাঠির মাথার রূপার চাকচিক্যে থার্ডক্লাশ ওয়েটিং শেডকে থার্ডক্লাশ ওয়েটিং শেড বলিয়া চিনিবার উপায় নাই।

শ্রীবাসের মন সন্তুষ্ট হইয়া আছে—

বধূটি সুন্দরী এবং বৈবাহিক সৎলোক·· ইহা তিনি পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন; আবার ইহাও সত্য যে, লোকে কস্মিনকালেও বলিতে পারিবে না যে, শ্রীবাস সরকার গরীবের ঘরের 'হাভেতে' মেয়ে আনিয়াছে, কিংবা ধনীর ঘর হইতে কুৎসিত বউ আনিয়াছে।

তাঁহার এ-কথায় পুরোহিত দশরথ, পরামাণিক যুধিষ্ঠির এবং প্রতিবেশী সৃষ্টিধর একমত—না বলিতে পারে নাই।

সুতরাং শ্রীবাস আরো খুশী হইয়া গেছেন, এবং আলপাকার কোটের উপর ফরাসডাঙ্গার চাদর ফেলিয়া সকলের সঙ্গে সস্মিতমুখে আলাপ করিয়া সুখ-সুবিধার তদারক করিয়া বেড়াইতেছেন–অতি সামান্য কথাতেই হাস্যবেগে তাঁর বোতাম-আঁটা ভুঁড়ি নাচিতেছে।

সতরঞ্চ কম্বল প্রভৃতি বিছানা বিছাইয়া লওয়া হইয়াছে–কেহ শুইয়া পড়িয়াছে, কেহ কেহ এই ফাঁকে দু'দশ বাজি তাস খেলিয়া লইতে বসিয়াছে।

পুরুত ঠাকুর জলশূন্য হুঁকায় কলার পাতার নল লাগাইয়া তামাকু সেবন করিতেছেন—তাঁহাকে, কেবল তাঁহারই শয়নোপবেশনের জন্য, স্বতন্ত্র গালিচা দেওয়া হইয়াছে।

ওদিকে, দলের যিনি প্রসিদ্ধ গায়ক তিনি বিস্তর লোক সমাগম দেখিয়া একটি গান গাহিলেন—গানের সঙ্গে ডবল-রিড্ হারমোনিয়াম বাজিল।

এক কথায়, যত আনন্দ তত ধ্বনি, যত তামাক তত পান, যত বিড়ি তত চা—তার উপর জলখাবার—যত পারো গ্রহণ করো। শ্রীবাসের মনে আজ লেশমাত্র কার্পণ্য নাই—কোনো বে-আদবি তিনি গ্রাহ্য করিতেছেন না।

কম্বল তফাতে টানিয়া লইয়া যাহারা খেলিতে বসিয়াছিল তাস খেলা তাহাদের আর ভাল লাগিল না–আজ তিনদিন কেবল ঐ কর্ম্ম চলিতেছে। তাহারা তাস গুটাইল।

বসন্ত পঙ্কজের হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল—এবং ঠিক সেই সময়েই একটি নর-কঙ্কাল তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বসন্তের ধারণা, বরের সঙ্গে আসিলে ফাজিল না হইলে চলে না।

কণ্ঠস্বর ভারী আর জড়িত করিয়া নেশা করার ভঙ্গীতে সে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি কে বাবা ?

রাম বলিল,—আজ্ঞে, আমি রাম।

বসন্ত কাটিয়া কাটিয়া বলিতে লাগিল,—রাম ! অযোধ্যাপতি ! সীতাপতি সুন্দরো। প্রজানুরঞ্জনকারী। তা কি আজ্ঞা হয় ?

রাম বলিল,—আমি ভিক্ষুক।

—ছুরি থাকে ত' আমাদের এই চারজনের গলায় বসিয়ে দিয়ে দেখতে পারো—দেখবে, রক্ত যত চাও বেরুবে, কিন্তু পয়সা একটি বেরুবে না বাবা।—তারপর মাথাটা একটু তুলিয়া আঙ্গুল বাড়াইয়া বসন্ত বলিল,—উই দেখ আমাদের কর্ত্তা—ষ্টিল ট্রাঙ্কের উপর কালো জামা পরে পশ্চিমদিকে মুখ ক'রে বসে আছেন—

রাম সেইদিকে তাকাইল—

বসন্ত আবার পূর্ব্বোক্ত হাঁটুর উপর শুইয়া পড়িল ; বলিল,—দেখতে পেয়েছ ত' ? ও'র কাছে যাও—দেখতে পাবে, নাকের রং বোধ হয় আর্সেনিকে লাল আর গালের রং মেচেতায় কালো—উনি এই চিত্রকূটের রাজা তুমি যখন রাম তখন ও'র কাছেই—

পংকজ বাধা দিয়া বলিল—ছিঃ, গুরুজন।

বসন্ত বলিল,—আরে লেঃ। বলিয়া সে খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

রাম ফিরিয়া আসিল—

তারপর বহু ভ্রমণ করিয়া সে বহু ব্যক্তির সমীপস্থ হইল, কিন্তু প্রত্যেকেই দেখাইয়া দেয় আর একজনকে—যেন নিজের বলিতে কাহারো কাছে কিছু নাই, পরের জিম্মায় তাহাদের পরস্পরের সর্ব্বস্ব রাখা আছে।

ঘুরিতে ঘুরিতে রাম সেই ষ্টিল ট্রাঙ্কের উপর উপবিষ্ট শ্রীবাসের চক্ষুর গোচরে যাইয়া ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইল—তাহার ভয় হয়তো হইত না ; কিন্তু ভিক্ষা দিতে পরাঙ্মুখ ব্যক্তি অপর দানকুণ্ঠ ব্যক্তির কাছে তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া সে হতাশ হইলে মজা পাইয়াছে, ভিক্ষা-জীবনের এ অভিজ্ঞতা তার আছে—যে ব্যক্তি ভিক্ষা চাহিলে ভিক্ষুককে মারিতে উদ্যত হয়, প্রলোভন দেখাইয়া তাহারই সমীপে উপনীত করিয়া দিয়া লোকে তাহার লাঞ্ছনা উপভোগ করিয়াছে, এ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

* * * *

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীবাসের মন প্রফুল্ল ছিল, রামের দিকে নেত্রপাত করিয়া তিনি কেবল বলিলেন,—হুঁ।—তারপর আলপাকার কোটের পকেটে হাত ভরিয়া দিলেন ; কিন্তু হাত বাহিরে আসিতে বিলম্ব করিতে লাগিল—জপের মালার থলির ভিতর হাত ভরিয়া লোকে যেমন করিয়া আঙ্গুল নাড়ে বলিয়া মনে হয়, দেখা গেল তিনি পকেটের ভিতর তেমনি একটি প্রক্রিয়া করিতেছেন—পকেটের কাপড়টা আন্দোলিত হইতেছে।

কিছুক্ষণ আন্দোলিত হইবার পর হাত যখন বাহির হইয়া আসিল তখন রাম দেখিল, শ্রীবাসও নিঃসন্দেহ হইয়া দেখিলেন, একটি চতুষ্কোণ দু'আনি আসিয়াছে—বুঝা গেল, তিনি বহু রেজকির ভিতর হইতে উহাকে বাছিয়া বাহির করিয়াছেন—এবং তজ্জন্যই আঙ্গুল নাড়িতেছিল, আর বিলম্ব ঘটিয়াছে।

শ্রীবাস দু'আনিটা রামের দিকে ছুড়িয়া দিলেন, কিন্তু শূন্যের জিনিষ লুফিয়া লওয়ার তৎপরতা রামের ছিল না—দু'আনিটা তাহার হাত এড়াইয়া মাটিতে পড়িল—

রাম শ্রীবাসের পদতলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইল—তারপর দু'আনিটা কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। আজ রামের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, তার প্রাতরুত্থান সার্থক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"আঁটকুড়ির বেটা এখানে রয়েছে—আর গাঙ্গুলী ঘরে হামলে ম'ল।"

সৌভাগ্যের স্বর্গে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির মতো পরম সুখে আর নিশ্চিন্ত প্রাণে গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে রাম পথ চলিতেছিল—তাহার মনে নাই যে, কখনও উপবাসী থাকিয়া তাহার দিন কাটিয়াছে—কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও তাহার ক্ষুধাবোধ হইয়াছিল, তারপর পেট জ্বালা করিয়াছিল, তারপর পেট পাকাইয়া মুখে জল উঠিয়াছিল এখন কণ্ঠ শুকাইয়া আছে—

নিজের দৈহিক যন্ত্রণা আর দৌর্ব্বল্য সে রজতের কৃপায় বিস্মৃত হইয়া গেছে -

কিন্তু আদরের ঐ সম্ভাষণে সে যেন এখন ভূতলে পদার্পণ করিয়া দাঁড়াইল—চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, গাঙ্গুলীর হোটেলের বৃদ্ধা ঝি মালতী তাহার দিকে এমন করিয়া চাহিয়া আছে যেন ধাপ্পাবাজের ধাপ্পা সে ধরিয়া ফেলিয়াছে।

মালতীর ডান হাতে একটি কাঁসার গেলাস—বাঁ হাত গেলাসের মুখে চাপা দিয়া তাহার ভিতর ধূলা-বালি এবং কীট-পতঙ্গ প্রবেশের উপায় সে রাখে নাই।

রাম তাহার দিকে চাহিতেই মালতীর ক্রোধ বাড়িয়া গেল, হাত নাড়িবার জো ছিল না বলিয়া সেই অক্ষমতাবশতঃ আস্ফালনে অসুবিধা হইলেও সে মনের কথা বলিতে লাগিল,—পোড়ারমুখো মিনসে, তোকে গাঁয়ে গাঁয়ে খুঁজতে আমার কি গরজ?—এসেছিলাম গয়লার ঘরে দুধ নিতে—আমাকে নইলে গাঙ্গুলীর দুধ নেয়া চলে না—আমাকে ছাড়া কাউকে তার বিশ্বেস নেই! আমিও বলি, তা-ই হোক্—গরুর বাঁটের খাঁটি দুধ নইলে যখন তোর চলে না, তখন আমি এনে দিলাম ত' কি হ'ল! আমার গতর তাতে ক্ষয়ে যাবে না—

তারপর হঠাৎ গলার স্বর নামাইয়া মালতী যেন রামের কানে গোপনীয় কথা বলিতে লাগিল,—তোকে গাঙ্গুলী সেই থেকে খুঁজছে রে হারামজাদা।—খুঁজে তোকে কে ভাত দেয় রে হাভেতে?—এই ডাঙর করা ভাত রয়েছে মজুত—দৌড়ো, দৌড়ো, এতক্ষণে বুঝি কুকুরে বেড়ালে খেয়ে গেল।—বলিয়া রামকে দৌড়াইবার দিকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে হাত তুলিতে যাইয়াই মালতী নিজের মনের ভুল বুঝিতে পারিয়া দাঁতে জিব কাটিল; বলিল,—হয়েছিল এখুনি!

কিন্তু খাঁটী কথা এই যে, উচ্ছিষ্ট অন্ন যখন রামের জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখা হয় তখন কুকুর কিম্বা বিড়ালের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা হয় না—মালতী তাহা জানে। কুকুরে বিড়ালে খাওয়া ভাত খাইতে তাহার নিজের যে ঘৃণা আছে, রামের সেই ঘৃণা আরোপ করিয়া সে তাড়াতাড়ি করে নাই—

কেবল সেই সক্‌ড়ি স্থানটাকে গোবর জল দেওয়া তাড়াতাড়ি দরকার—স্থানটা না শুকাইলে সেখানে লোক বসিবে না এবং মিছামিছি তাহাকেই ডাকাডাকি করিবে।—আবার গাঙ্গুলীও এমন একগুঁয়ে দাতা যে শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া অত ভাত ফেলিতে দিবে না!

মালতীর ব্যগ্রতা সত্ত্বেও রাম তাড়াতাড়ি করিল না—

মালতী বলিতে লাগিল,—তুই আমার সঙ্গে যাবি ভেবেছিস? আমার যেতে এখনও ঢের দেরী। আধসেরি গেলাসে দেড় পো দুধ রয়েছে—পা টিপে টিপে চলেছি—জোরে পা ফেললেই দুধ উছ্‌লে পড়ে যাবে।—তারপর দু' পয়সার কলা নেব—দুধে কলায়—

রাম বলিল,—তবে চল্লাম।—বলিয়া রাম গাঙ্গুলীর হোটেল যে প্রান্তে অবস্থিত সেই দিকে ফিরিল।

হোটেলের সম্মুখস্থ নর্দ্দমা, একটি শায়িত কুকুর, দু'খানা এঁটো পাতা ডিঙ্গাইয়া আর দরজা ঠেলিয়া রাম যখন হোটেলের উঠানে পৌঁছিল তখন গাঙ্গুলীর "অন্নভবন" নির্জ্জন—গাঙ্গুলী একা বসিয়া দেওয়ালগিরি আর হাত লণ্ঠনের কাচ মুছিয়া এরূপ অবস্থায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে যাহা করা উচিত তাহাই সম্পাদন করিতেছে।

রামকে দেখিয়া গাঙ্গুলী বলিল,—এসেছ, রাজা? বস তোমার ঐ সিংহাসনে; বলিয়া লণ্ঠনের কালিমাখা ন্যাকড়াখানা উড়াইয়া উঠানে-পাতা ধোয়া-বাসন নামান ইষ্টক চতুষ্টয় দেখাইয়া দিল—

রাম যখন আসে ঐখানেই বসে!

রাম বলিল,—ঝি বললে, ঢের ভাত আছে; দাও খাই।

গাঙ্গুলী কাচ মুছিতে মুছিতে মুখ তুলিয়া হঠাৎ তার পেটের দিকে চাহিল; দেখিল, বুকের দুই পংক্তি পঞ্জরাস্থির সর্ব্বনিম্নের যে-দুখানি উদরের ধারে আসিয়া বেঁকিয়া গেছে তাহা যেন অভ্যন্তরস্থ প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্রকে ঠাসিয়া বসাইয়া দিয়া নীচের পানে ঝুলিয়া পড়িয়াছে—পেট পেটের আকারের নয়; বুকের সেই হাড় দু'খানা আর তলপেটের মধ্যবর্ত্তী স্থান ব্যাপিয়া সে একটি গভীর গহ্বর কেবল; পেটের চামড়া তলাইয়া পিঠে লাগিয়াছে।

বলিল,—বোস্‌। দি'।—আরো সকাল সকাল এলিনে কেন? বলিতে বলিতে গাঙ্গুলী উঠিল; কিন্তু হাত ধুইল না—কেরোসিনের গন্ধযুক্ত এবং কালিমাখা দুই হাতে ধরিয়া শালপাতায় রাখা ভাত আনিয়া "সিংহাসনের" সম্মুখে নামাইয়া দিল।

গাঙ্গুলী ভাত দিয়াছে এবং রাম ভাত খাইতেছে—ভাত এমনই জিনিষ যে তাহা পাওয়ার ভাগ্যই যথেষ্ট—ভাত কেমন এবং খাদ্যোপকরণ কি তাহা চাহিয়া দেখিবারেও দরকার নাই। দাতা আর গ্রহীতা যদি দান করিয়া আর গ্রহণ করিয়া

নিজের নিজের তরফে অমলিন প্রসাদ লাভ করে তবে অপর কাহারো কিছু বলিবার থাকে না।

গাঙ্গুলী লণ্ঠনের কাচ আর কলেবর পরিষ্কৃত করিয়া দেয়ালের দিকে সরাইয়া রাখিয়া রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিল—

রাম খাইতেছে—ক্ষুধার্ত্ত বলিয়া গোগ্রাসে নয়, ছোট ছোট গ্রাস তুলিয়া ধীরে ধীরে চিবাইয়া চিবাইয়া খাইতেছে—

গাঙ্গুলী বলিল,—সব ক'টি ভাত খাস্‌ রাম ; ফেলিস্‌ নে।

এই স্নিগ্ধ আমন্ত্রণে কৃতার্থ হইয়া রাম বলিল, আচ্ছা।

শ্রীবাসের দেওয়া দু'আনি ভাঙাইয়া রাম হাঁড়ি আর সরা কিনিল—মনে মনে অনেক তর্ক বিতর্ক তোলাপাড়ার পর আধুলোর তামাক, ঐ মূল্যের টিকে এবং ঐ মূল্যের দিয়াশলাই এবং ঐ মূল্যেরই একটি কলিকা কিনিয়া রাম যখন বাড়ীর দিকে পা চালাইল তার বহু পূর্বে'ই তাহার মন যাইয়া পড়িয়াছে লুচির হাঁড়িতে—যাইয়া দেখিতে পাইবে কিনা ঠিক কি।

যথাসাধ্য দ্রুতপদে ঘরে ফিরিয়া রাম সর্ব্বাগ্রে দরজার মাথাটা লক্ষ্য করিল—শিকল চড়ানই আছে—শিকল খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, হাঁড়ির আবরণ ঠিক আছে—এবং আবরণ তুলিয়া দেখিল, লুচিও আছে।

শান্তির, তৃপ্তির এবং স্বস্তির একটি গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া রাম বিশ্রাম করিতে বসিল।

নবম পরিচ্ছেদ

রামের দিন যাইতেছে।

চাল সিদ্ধ করিবার নূতন হাঁড়ি আসিয়াছে ; সুতরাং লুচিগুলিকে স্থানভ্রষ্ট করিতে হয় নাই।—তিন রাত্রি না যাইতেই পরিষ্কার সুখাদ্য লুচিগুলি পরস্পরের বুকে পিঠে সংলগ্ন হইয়া একটি নিরেট পিণ্ডে পরিণত হইল ; আগে পচিয়া দুর্গন্ধময়, পরে শুকাইয়া নির্গন্ধ হইল ; এবং তারপর আরো শুকাইয়া ঝরিয়া ঝরিয়া গুঁড়া হইয়া গেল—কিন্তু রাম সরা তুলিয়া আর তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল না—আছে, তাহার নিজস্ব স্বেচ্ছাভোগ্য হইয়া তাহা মজুত আছে—ইহাই মনে করিয়া রাম ক্ষুধার সময়ও সুখ পায়।

কিন্তু ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রাটির দেহ কঠিন—তাহার দেহ পচিয়া উঠিল না।

রাম প্রত্যহই নিয়মিত ভিক্ষায় বাহির হয়—

বাহির হইবার পূর্ব্বে টাকাটা হাতে লইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া একাগ্রচিত্তে নিরীক্ষণ করে—জিব দিয়া আর ঠোঁট দিয়া তার দুই পিঠ বারবার চাটে—তারপর তাহাকে আবার ঝুলিতে ফেলে—

টাকা পচিয়া উঠিল না ; কিন্তু লেহনদোষে তাহার দু'পিঠের ছবি আর লেখা ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল—

এমনি ক্ষয়রোগের রাহুগ্রাসে পড়িয়া একেবারে নিঃশেষ হইয়া যাওয়া টাকার অদৃষ্টের কথা নয়, কাজেই একদিন বড় দুর্দ্দৈব ঘটিয়া গেল। যে-পেরেকটার সঙ্গে ঝুলিটা টাঙ্গান থাকিত সেই পেরেকটা ঝুলি ঝুলাইবার আর ঝুলি পাড়িবার টান-টানিতে-নোনা-লাগা মাটীর ভিতর কবে ঢিলা হইয়া গিয়াছিল রাম তাহা ঘুণাক্ষরেও টের পায় নাই।

ঝুলি সে দিন ভারি ছিল—

পেরেকে ঝুলি ঝুলাইয়া রাখিয়া রাত্রে রাম নিদ্রা যাইতেছিল—ইত্যবসরে ঝুলির ভারে পেরেক খুলিয়া পেরেক সমেত ঝুলি কখন ভূপতিত হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই—

সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ মেলিতেই যে দৃশ্য রামের চোখে পড়িল ঝুলির ভূপতন তাহার সবটা নয়—ঝুলির কেবল ধরাপৃষ্ঠে পতনের ফলও তেমন সাংঘাতিক নয়, কিন্তু সাংঘাতিক ব্যাপার এই যে, দেখা গেল, ঝুলির গা ঘেঁষিয়া ইঁদুরের মাটী রাতারাতি পর্ব্বতাকার হইয়া উঠিয়াছে।

রামের শরীর সেদিন ভাল ছিল না—

ঝুলির ভিতর টাকা আছে; সেই ঝুলি ইঁদুরের গর্ত্তের মুখে পড়িয়া আছে দেখিয়া আতঙ্কে উদ্বেগে রামের প্রাণ যত দ্রুতবেগে ধড়ফড় করিতে লাগিল তত দ্রুতগতি সে গা তুলিতে পারিল না।

ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া সে ঝুলির কাছে আগাইয়া গেল ঝুলিটাকে টানিয়া তুলিল—ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া পোয়াটেক্‌ চাল ইঁদুরের মাটীর উপরেই স্তূপীকৃত হইয়া পড়িল…রাম তাহা অঞ্জলি ভরিয়া তুলিয়া পাশের দিকে রাখিয়া দিল।

টাকাটা ছিল চালের নীচে—

রাম তাড়াতাড়ি ঝুলির ভিতর হাত ভরিয়া দেখিল টাকা নাই—ছিদ্র রহিয়াছে; ঝুলি হাতড়াইতে যাইয়া ছিদ্রের ভিতর আঙ্গুল ঢুকিয়া আটকাইয়া গেল…

ঝুলি উল্টাইয়া লইয়া সে দু'হাতে করিয়া সেটাকে বাতাসের উপর আছড়াইতে লাগিল—চালের গুঁড়া তার চতুর্দ্দিকে উড়িতে লাগিল—তার চোখে মুখে প্রবেশ করিল, কিন্তু টাকা পড়িল না—

রাম ঝুলি ফেলিয়া পাগলের মতো ছুটিয়া বাহির হইল…তার ভোঁতা দা-খানা কোথায় পড়িয়াছিল—সেই দা আনিয়া, দুই হাতে ইঁদুরের মাটী সরাইয়া রাম মেঝের মাটী খুঁড়িতে বসিয়া গেল।

কিন্তু সুড়ঙ্গ কোন অতলে প্রবেশ করিয়াছে দুই হাত গর্ত্ত খুঁড়িয়াও তাহা আবিষ্কৃত হইল না।

ক্লান্তিতে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল—দা রাখিয়া রাম অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে গহ্বরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল—বিসর্পিত রেখায় প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য স্থানে আড়কাঁষির মতো নিজেকে ভেদ করিয়া যাইয়া সেই সুড়ঙ্গের যেখানে শেষ হইয়াছে সেই অতি দুর্গম দূরে আয়ত্তাতীত একটা অন্ধকার স্থানে মূষিক-বাহিত টাকাটা পড়িয়া ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে, রাম পুনঃ পুনঃ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অবাধ ঋজু দৃষ্টিতে তাহা যেন স্পষ্ট দেখিতে লাগিল—

বসিয়া থাকিতে থাকিতে একবার মাত্র একটা অদ্ভুত বিকৃত শব্দ করিয়া রাম চীৎকার করিয়া উঠিল—

চীৎকার শুনিয়া কয়েকটি বালক এবং দুইটি বয়স্ক ব্যক্তি ঘটনা কি দেখিতে আসিয়া দেখিতে পাইল, তাহাদের পরিচিত রামের ঘরের মাটী উলট পালট হইয়া আছে—রাম সেই মাটীর উপর গড়াইতেছে—এবং থাকিয়া থাকিয়া দুই হাতে নিজের শ্বাসনালী চাপিয়া ধরিয়া যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ করিতেছে।

বয়স্ক ব্যক্তিদ্বয়ের একজন জিজ্ঞাসা করিল,—কি হয়েছে রাম? রাম মাটীর ভিতর মুখ গুঁজিয়া স্থির হইয়া রহিল, কথা কহিল না—

দ্বিতীয় দরদী বলিল,—রামের বৌ মরেছে জলে ডুবে, রাম যাবে কবরে, তাই—

—নিজেই বুঝি নিজের উপর মাটী চাপা দেবে? রাম কবরে প্রবেশ করো, দেখে যাই!

ইহাতেও রাম শব্দ করিল না—

প্রথম ব্যক্তি বলিল,—টাকার সন্ধান পায় নাই ত'? ইঁদুরে একটা টাকা মুখে করে তুলে এনেছে হয়তো—রাম ভেবেছে এক হাঁড়ি টাকাই বুঝি পোতা আছে ইঁদুরের মাটীও দেখছি।

অসম্ভব নয় মনে করিয়া উভয়েই পরস্পরের চোখের দিকে চাহিল এবং চৌকাঠ পার হইয়া ঘরের ভিতরে যাইয়া দাঁড়াইল—

কিন্তু একটু বুদ্ধি খরচ করিলেই বুঝা যাইবে যে, মৃৎপাত্র পূর্ণ করিয়া টাকা মাটীর ভিতর কাহারো রাখিয়া যাওয়া এবং রামের তাহা পাওয়া এক্ষেত্রে একেবারেই অসম্ভব। রামের এই ঘর যেখানে অবস্থিত সে স্থানটা পনর বৎসর পূর্ব্বেও নদীগর্ভে ছিল, অর্থাৎ নদীর চল্লিশ হাত গভীর জল এই স্থান দিয়াই বহিত এবং এই স্থানটাই ছিল দ'—কালক্রমে ফুল্লরার গতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া স্রোতের খাত উত্তর দিকে বহুদূরে সরিয়া গেছে—

এই নূতন জমি কাহার এই প্রশ্নের মীমাংসা এখনও আদালতে মুলতুবী রহিয়াছে—

বৈষ্ণবযুগল বৈষ্ণবীযুগল সহ বিবদমান উভয় পক্ষের অনুমতি লইয়া এই ঘরখানা তুলিয়াছিল—তারপর তারা উঠিয়া গেছে—এবং রাম সেই ঘরে বাস করিতেছে—

সুতরাং এই ঘরের মাটীর তলায় আসিবার পথ টাকা আজ পর্য্যন্ত পায় নাই।

রাম মাটীর ভিতর হইতে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল,—তোমরা যাও।

একজন বলিল,—যাই, কিন্তু আশে পাশেই থাকলাম—টাকার হাঁড়ি তুললেই আবার এসে দাঁড়াবো।

আর একজন বলিল,—বল্ না ভাই, দিব্যি করে, সত্যি কথাটা কি?

রাম আর যাই হোক, বে-হুঁসিয়ার নহে—

বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়া ইঁদুরের পশ্চাদ্ধাবন করিলেও এই সময়ে তার এই বুদ্ধিটুকু খেলিল যে, তাহার এই মাটী খোঁড়াখুঁড়ির অর্থ সৌখীনতার বশে কবরে প্রবেশ করিয়া মৌলিক উপায়ে মৃত্যুবরণ করা নহে—তাহা ওরা জানে—যে অনুমান উহারা করিয়াছে তাহা যে কাহাকেও চব্বিশ ঘণ্টা একই স্থানে বসাইয়া রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট—

কিন্তু সে একা থাকিতে চায়।

রাম উঠিয়া বসিল—

বলিল,—আমার টাকা হারিয়েছে, ভাই! ইঁদুরে নিয়েছে।—বলিয়া সে প্রমাণ প্রত্যক্ষ করাইল—ঝুলি দেখাইল, ছিদ্র দেখাইল, ইঁদুরের মাটীর সঙ্গে মিশ্রিত চাল দেখাইল—

দেখিয়া ওরা হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল; জিজ্ঞাসা করিল,—টাকা কোথায় পেলি রে?

রাম সে বৃত্তান্তও বলিল।

শুনিয়া ওরা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

রাম আজ ভিক্ষায় বাহির হইল না—

অভুক্ত অবস্থায় শুইয়া শুইয়া তাহার মনে পড়িতে লাগিল, সেই দাতাকে; দাতার সর্ব্বাঙ্গের দিকে সে ভাল করিয়াই চাহিয়া দেখিয়াছিল—চমৎকার গৌরবর্ণ; বয়স সাতচল্লিশ আটচল্লিশ হইবে; চুল পাকে নাই, কিংবা প্রচুর চুলের ভিতর সাদা দু' একটি চোখে পড়ে নাই; গোঁফ দু' একটি পাকিয়াছে; গায়ে মূল্যবান কোট ঝকঝক্ করিতেছে; গণ্ডদ্বয় স্থূল—মনে হয়, যেন গালের নীচে বড়-পারা কিছু রহিয়াছে। সুপুষ্ট অঙ্গুলিগুলি দেখিতে মোলায়েম, একটি অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ও রহিয়াছে—তাহার উপর উজ্জ্বল একখানি পাথর বসান; পরিধানে জমাট বুনান মিহি একখানি কোঁচান ধুতি—থাকে-থাকে ভাজ পড়িয়া প্রস্থে ক্রমশঃ বাড়িয়া একটি পরিমাণ পারিপাট্যে কোঁচাটি সুন্দর দেখাইতেছে—দুর্গাপ্রতিমার কার্ত্তিকের কাপড় ঐ রকমই কোঁচান থাকে; বুকে কোটের উপর সোনার মোটা চেন ঝুলিতেছে—খানিকটা ধনুকের মতো বাঁকা, খানিকটা তীরের মতো সোজা হইয়া ঝুলিতেছে—সোজা অংশের সঙ্গে আধুলীর আকারের একটি চাক্তি রহিয়াছে; মানুষটির ঠোঁট দুখানি পাতলা, লাল; চোখ বড় কিন্তু হাস্যময় নয়, গম্ভীর; ভুরু সরু, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ; পায়ের জুতা দর্পণের মতো মসৃণ।

সুপুরুষের এই চেহারাখানা যেমন সেইদিন দেখিয়াছিল তাহাই রাম বহুক্ষণ ধরিয়া ধ্যান করিয়া কি রস পাইল তাহা বলা কঠিন।

তারপর তিনি টাকাটা তার হাতে দিলেন—

রামের মনে পড়িতে লাগিল, তিনি জামার পকেটে হাত দিলেন—টাকাটা বাহির করিয়া আনিলেন—তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাতের দিকে চাহিলেন—তাহার হাত কাঁপিতেছিল—পাঁচটি আঙুল জড় করিয়া তিনি টাকাটা ধরিয়া ছিলেন—টাকাটা তিনি ছাড়িয়া দিলেন—তাহার হাতের উপর পড়িল—স্পর্শ ঘটিল—স্পর্শের অপরিমেয় অনুভূতি মস্তিষ্ক হইতে পদতল পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে এক নিমেষে ছড়াইয়া গেল—

ধ্যান করিতে করিতে রাম কখন ঘুমাইয়া পড়িল—

স্বপ্নে দেখিল, আকাশে মেঘ করিয়া আছে—তাহাতে বিদ্যুৎ নাই, সে গর্জ্জন করিতেছে না, কেবল ক্রমান্বয়ে আরো ভারি দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতেছে—মেঘের রং এত কাল যে, অতদূরে রহিয়াছে বলিয়াই তাহা সহ্য করা যাইতেছে—নামিয়া যদি কাছে আসিয়া দাঁড়ায় তবে বুক ফাটিয়া খানখান্ হইয়া যাইবে—

রাম স্পষ্ট দেখিল, মানুষ যেমন করিয়া ঘরের বন্ধ দরজা খোলে ঠিক তেমনি করিয়া যেন দুখানি মুখে-মুখে-লাগিয়া-থাকা মেঘ অত্যন্ত ধীরে ধীরে ফাঁক করিয়া ষোলকলায় পরিপূর্ণ অতি উজ্জ্বল সকলঙ্ক পূর্ণিমার চাঁদ দেখা দিল—কিন্তু মেঘের রং বদলাইল না—অন্ধকার ঘুচিল না—

কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল, চাঁদ যেন চাঁদ নয়—তার সেই হারান টাকাটি, তাহার দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া আছে; চাঁদের কলঙ্কলেখা যেখানে দেখা যাইতেছিল—সেখানে রাজার মুখাঙ্কন রহিয়াছে—

রাম সেইদিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতেই রূপান্তর ঘটিয়া গেল—টাকা আর রাজার মুখ অন্তর্হিত হইয়া আর একখানি মুখ—শুধু মুখখানা—ফুটিয়া উঠিল—হাস্যোজ্জ্বল মুখখানিতে চক্ষুযুগল কৌতুকে হাসিতেছে—অতদূরে রহিয়াছে, তবু তার প্রত্যেকটি রেখা অতি জীবন্ত, আর সে এত স্পষ্ট যেন রামের চোখ আর সেই মুখের মাঝে স্থানের ব্যবধান নাই—হাত বাড়াইলেই স্পর্শ করা যায়—

মুখখানা কার তাহা যেন মনে পড়িতেছে না, অথচ বেদনায় বুক টনটন করিতেছে—

হঠাৎ মনে পড়িল, মুখ লবের—

তৎক্ষণাৎ ঘুমের ঘোরেই রাম হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া ব্যগ্র ব্যাকুল দুই বাহু বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে উঠিতেই সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেল—একটা দুঃসহ ঝাঁকি খাইয়া রাম জাগিয়া কাঁদিতে কাঁদিতেই একেবারে উঠিয়া বসিল—বসিয়া সে কাঁপিতে লাগিল—

দুই হাত দু'পাশে মাটির উপর চাপিয়া রাখিয়া সে নিজেকে জীবিত রাখিতেই সম্মুখে পশ্চাতে দুলিতে লাগিল—বহুক্ষণ এমনি করিয়া কাঁদিয়া কাঁপিয়া দুলিয়া রাম যখন চোখের জল সম্বরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল তখন অপরাহ্ণ।

রাম নদীতে স্নান করিয়া আসিয়া রান্নার আয়োজন করিতে বসিল।

ফ্যান-সমেত ভাত লবণ-সহযোগে উদরস্থ করিয়া রাম তার দাওয়ায় স্থবিরের মতো জড় হইয়া বসিল।

আকাশে তখন ক্ষণজীবী একটা অপ্রফুল্লতার সঞ্চার হইয়াছে—সেদিকে চাহিলে একটা নিঃসঙ্গতার বেদনা হঠাৎ নিবিড় হইয়া উঠে—একটিমাত্র নক্ষত্র দেখা দিয়াছে—একটি বায়স ডাকিয়া গেল—একটি বাদুড় উড়িয়া গেল—একখানি মেঘ ভাসিয়া আসিল—

দিবসের নিষ্পলক প্রহরা শেষ করিয়া বিশ্রামে বসিবার পূর্বে ক্লান্ত অর্ধমুদিত নয়নের একটি স্তিমিত দুর্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কে যেন বিষণ্নমুখে বিদায় লইতেছে—তাহার স্থানে যে আসিবে সে আসিয়া পেঁছায় নাই—

হঠাৎ কে যেন নিঃশ্বাস ছাড়িল—

একটা স্থূলপল্লব বৃক্ষ থরথর করিয়া উঠিল—সে যেন কথা কহিল—সে কথা বৃক্ষান্তরে পেঁছিল—দ্রুতবেগে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লাফাইয়া লাফাইয়া সে-কথা পশ্চিম দিগন্তের দিকে ছুটিতে লাগিল।

বসিয়া থাকিতে থাকিতে রামের মনে হইল, টাকাটার ইতিহাস নির্মল নহে—

পাপের কলঙ্ক তাহার অঙ্গে লিপ্ত হইয়া আছে, একটা জিঘাংসু অভিসম্পাত নিশ্চয় টাকার পশ্চাতে ছুটিতেছে।—পঙ্ক হইতে উঠিয়া সে রসাতলে নামিয়া নামিয়া গেছে—ভালই হইয়াছে—নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে, নতুবা কত পাপের স্পর্শ দিয়া তাহার আত্মার অনিষ্টসাধন সে করিত বলা যায় না।

কিন্তু রামের অদৃষ্ট মন্দ—

টাকারই অদৃষ্টের কথা মনে মনে অনুধাবন করিতে করিতে সে একবার চোখ তুলিয়া দেখিল, প্রতিদিনের মতো আজিও ঐ বহুদূরবর্ত্তী দ্বিতল অট্টালিকার একটি গবাক্ষ কক্ষের ভিতরকার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া আছে—

উপরে নক্ষত্র পুঞ্জে পুঞ্জে ফুটিয়াছে—নিম্নে আর সবই অন্ধকারে নিমজ্জিত, কেবল ঐ গবাক্ষটি জুড়িয়া একটি আলোকমণ্ডল সঞ্চিত দৃশ্যমান হইয়া আছে—

স্থিরনেত্রে রাম সেই আলোকের দিকে চাহিয়া রহিল—

বহু পুরাতন বহু বিস্মৃত কিন্তু অতি গোপনীয় আর অবিস্মরণীয় একটি উপাখ্যান ধীরে ধীরে তাহার মনে উন্মোচিত হইতে লাগিল—

শ্রাবণ সন্ধ্যায় একদিন বৃষ্টি নামিয়াছিল—অমন নিরেট, অমন প্রবল, আর অমন অবিরাম বৃষ্টি লোকে আগে কখন দেখে নাই—গৃহবাসীরা গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়া দিল—পথচারীর সাধ্য রহিল না সেই জলরাশি অবতরণের পথে এক মুহূর্ত্ত তিষ্ঠিয়া থাকে—

পথ জনশূন্য হইয়া গেল। লোকালয়ে জাগরণের আভাস পর্য্যন্ত রহিল না, কিন্তু রাখহরি কর্ম্মকার তার কাজ বন্ধ করিয়া তেমন দিনেও একটু সকাল সকাল গৃহে গেল না। নালার জল নালা ছাপাইয়া পথ প্লাবিত করিয়া বহিতে লাগিল…ভেকের ডাক উচ্চতায়, পরিমাণেআর নিরবচ্ছিন্নতায় মেঘ-গর্জনকে পরাস্ত করিয়া ছাড়িল… সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া কখন রাত্রি প্রবেশ করিল তাহা কেহ অনুমান করিতেই পারিল না।

রাখহরির দোকান ছোট একখানা দো-চালা মেটে ঘর…একটিমাত্র জানালা, আর একটিমাত্র দুয়ার; রাখহরি সেই দুয়ারের একখানা কপাট চৌকাঠের সঙ্গে ঠাসিয়া দিয়াছে, এবং অভগ্ন একখানি ইট সেই কপাটে দিয়া তাহার খুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা রাখে নাই…মাটীর প্রদীপের মোটা সলিতাটা জ্বলিতেছে রাখহরি মাঝে মাঝে উস্কাইয়া দিয়া শিখার প্রাণ বাচাইতেছে; একটা মাথা-ভাঙা বোতল কাৎ করিয়া তৈলাধারে দু'বার সে তেলও ঢালিল।

রাত বাড়িতে লাগিল।

কিন্তু রাখহরির কাজের বিরাম নাই। নক্‌সি-কাঠের উপর বেলুন চাপাইয়া গালা-দিয়া-আটকান একটা রূপার বালায় সে পেন্সিলের আঁক-বরাবর সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্য করিতেছে। তাহা ছাড়া রাখহরির আরো একটা কাজ ছিল। সে কখন কখন বন্ধ কপাটের আড়াল হইতে মুখ বাড়াইয়া রাস্তার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল, যেন কাহারো আসিবার কথা আছে; কিন্তু কখন আসিবে তাহার ঠিক নাই। রাখহরির এই ব্যগ্র প্রতীক্ষা দেখিলে মনে হয়, যে আসিবে সে নিজেকে বিঘোষিত করিয়া আসিবে না, নিষ্প্রয়োজনে আসিবে না, এবং নিজের এই পথ-চাওয়ার সুদীর্ঘ তপস্যা-ক্লেশকে রাখহরি নিষ্ফল হইতে দিবে না।

রাখহরির বয়স হইয়াছে—প্রায় পঞ্চাশ ; অত্যন্ত শুষ্ক চেহারা ; দিবারাত্র উবু হইয়া একদৃষ্টে বসিয়া থাকিতে থাকিতে তার মেরুদণ্ড বাঁকিয়া গেছে—চক্ষে একটা ছলছলে নিষ্প্রভ অল্পদৃষ্টি দেখা দিয়াছে। চিরকাল রাখহরি দরিদ্রের রূপার অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়াছে—ছোটখাট অলঙ্কার রাখিয়া দায়গ্রস্তকে টাকা দিয়াছে—এই টুকটাক আয় তেমন নির্ভরযোগ্যও নহে, অবহেলারও নহে। রাখহরি মনে মনে ছটফট করে।

ছেলে দু'টি মানুষ হয় নাই ; সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া সামান্য উপজীবিকা অবলম্বন করিয়া তাহারা কেবল বজায় আছে ; তাহারা পিতার শ্রম, অর্থব্যয় আর চেষ্টাকে সার্থক করিতে পারে নাই, অপদার্থ পুত্রের পিতৃত্বের বিড়ম্বনায় রাখহরি নিজেকে হতভাগ্য মনে করে।

কিন্তু রাখহরিকে যারা জানে তাহারা ইহাও জানে যে, রাখহরির হাতে অফুরন্ত কাজ চিরকাল ; চিরকাল সে রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত দীপ জ্বালিয়া বসিয়া থাকে। তার খুটখুট্ হাতুড়ির আওয়াজ ঘুমন্ত যামিনীর নিত্যসঙ্গী।

কিন্তু আজও সে বাড়ী যায় নাই।

পথ নির্জন—কুকুরটি পর্য্যন্ত বাহিরে নাই—চেনা-পথ চেনা-বাড়ী ভুল হইয়া যায় এমনি অন্ধকারের মাঝে দুর্য্যোগ বহিয়া চলিয়াছে।

রাত্রি সাড়ে এগারটা বাজিল। বৃষ্টি তখন কিছু কমিয়াছে, কিন্তু পথের জলের কলধ্বনি সমানে চলিতেছে। কলিকাতা হইতে আসিবার শেষ গাড়ীখানা ছাড়িয়া গেল—তার আওয়াজ রাখহরির কানে আসিল।

গাড়ী হইতে দু'টি লোক নামিয়াছিল। একজন গোমস্তা শ্রেণীর ভদ্র ব্যক্তি, প্রৌঢ় এবং ক্ষীণকায়, আর একজন তার ভৃত্য বা শরীররক্ষী—অত্যন্ত বলবান।

ষ্টেশনের ছাদের নীচে দাঁড়াইয়া ভদ্রব্যক্তি বলিলেন, সদা, দেখছিস ত' দুর্য্যোগ।

সদা বলিল, দেখছি ত'—

বিদ্যুতের ছুটাছুটির দিকে চাহিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন,—তোর বাড়ী ত' কাছেই, তুই বাড়ী যা ; আমি রাত্তিরটা এখানে কোথাও কাটিয়ে সকাল বেলা কাছারীতে বাবুর সঙ্গে দেখা করব।—এখন এই জলে যাওয়া অসম্ভব।

সদা বলিল,—আমিও বাড়ী না যেয়ে আপনার সঙ্গেই যাই না কেন!

—না। আমি যেখানে থাকব সেখানে দু'টি লোকের স্থান হওয়া কঠিন। দু'-দুটি লোকের খাওয়া-শোওয়া নিয়ে তারা খুব বিব্রত হবে—তুই যা।

সদা জিজ্ঞাসা করিল,—সেই রাখহরির কাছে যাবেন ত'?

—ইচ্ছা তাই, কিন্তু এখন আরো কয়েকটি স্থানের কথা স্মরণ হইল—ভদ্রব্যক্তি বলিলেন,—বেরুই ত'—

রাখহরির বাড়ী সদা চেনে। এই বাবুরই সঙ্গে সে রাখহরির বাড়ীতে অনেকবার বসিয়া গেছে।

বলিল,—আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি?

—না রে, না।

সদা তবুও আপত্তি করিল ; বলিল,—আপনার একা যাওয়া কি ঠিক হবে?

ভদ্রলোকটি সদার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন,—কিছু ভয় নেই রে ; আর দেরী করিসনে। সকালে উঠে আমাকে তোর খুঁজে নেবার দরকার নেই—তুই সোজা চলে যাবি বাবুদের কাছারীতে। আমার আগেই যদি তুই পেঁছে যাস তবে বাবুকে আমার কথা বলবি যে তিনি আসছেন। বাবু যেন ভাবিত না হন। সব ঠিক আছে।

সদা তবু আরও একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাড়ীর দিকে গেল—

মদনমোহন সিংহ ছাতাটি খুলিয়া ষ্টেশনের সাঁকো পার হইয়া অন্যদিকে চলিতে লাগিলেন।

রাত্রিটির মতো নিরাপদ একটা স্থানে আতিথ্য যাচঞা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে—অনেকের কথাই তখন মনে হইয়াছিল ; কিন্তু জুতো হাতে করিয়া আর প্রায় কোমর অবধি কাপড় তুলিয়া পথে চলিতে চলিতে পুনর্ব্বার মনে মনে আশ্রয়স্থল খুঁজিতে যাইয়া মদনমোহন রাখহরি ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। এমন রাত্রে আর এত রাত্রে এক রাখহরি ছাড়া আর কেহ জাগিয়া নাই।

এখনও ছিপ্ ছিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে।

সম্মুখের সরকারী আলো উঁচুতে জ্বলিতেছে। কিন্তু কাচের উপর জল পড়িয়া ছানি-পড়া চোখের মতো তাহার স্ফূর্ত্তি নাই। এদিকে পথের ডান পাশে একটা ফণীমনসার ঝোপ আছে—কিন্তু ঠিক কোথায় তাহা মনে পড়িল না। মদনমোহন বাঁ দিক ঘেঁষিয়া সাবধানে চলিতে লাগিলেন।

সাবধানে চলিতে থাকিলেও অনেক জল তাঁর গা পর্য্যন্ত ছিটিয়া উঠিল। অনেকবার তিনি পতন সংবরণ করিলেন। অনেকবার দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সম্মুখটা দেখিয়া লইতে হইল।

রাস্তার আবদ্ধ জলে ছপ্ ছপ্ শব্দ উঠিতেই রাখহরি উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল ; কপাটের অন্তরাল হইতে কচ্ছপের মতো গলা বাড়াইয়া তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে চাহিয়া সে যেন পদশব্দের অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিল।

শব্দ অগ্রসর হইয়া তাহারই দোকানের সম্মুখে থামিল।

রাখহরির প্রাণ অকারণেই কণ্ঠে উঠিয়া আসিল—এবং রাস্তার উপর হইতে প্রশ্ন আসিল,—রাখু রয়েছিস্ ?

—রয়েছি। কে ?

—আমি মদন।

এত উদ্বেগে সময়ক্ষেপ করিবার পর রাত্রি বারটার সময় আসিল কিনা মদন ! রাখহরি মনে মনে যারপর নাই হতাশ হইয়া গেল—কিন্তু বিপন্ন বাল্যবন্ধুকে সম্বর্দ্ধনা করিতে ত্রুটি করিল না।

তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া উঠিয়া বাহির হইল ; বলিল,—এস এস। কোত্থেকে এই দুর্যোগে ?

—কলকাতা থেকে আসছি। এখনও বাড়ী যাস্ নি ? বলিতে বলিতে মদন ছাঁইচের নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

—এই যাই যাই করছি। বিয়ের অর্ডার নিয়ে মুস্কিলে পড়েছি! চল, বলিয়া রাখহরি খুব ব্যস্ততার ভঙ্গীতে জিনিষপত্র গুটাইয়া লইয়া তৈরী হইল—

বলিল,—খাবি ত' ?

মদন হাসিয়া বলিলেন,—দিতে পারিস ত' খাবো !

—পারব।

আহারাদি সুসম্পন্ন হইয়াছে—শুইতে যাইবার আগে মদন বলিলেন,—একটা কথা, ভাই !

রাখহরি বন্ধুর আগমনে বাধিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল ; জিজ্ঞাসা করিল;—কি কথা ?

মদন গলা খুব খাটো করিয়া বলিলেন,—আমি আজ মূল্যবান। এই বলিয়া একটু প্রীতির হাসি হাসিয়া বলিতে লাগিলেন,—বাবুদের কাজে গিয়েছিলাম কলকাতায়—কেন গিয়েছিলাম, সেখানে কি করলাম কি বৃত্তান্ত সব পরে শুনবি—সে ঢের কথা। আপাততঃ হাজার দশেক টাকা—নোটে গিনিতে—আমার সঙ্গে রয়েছে। বাবুদের সেখানকার কাছারীর আদায়ী টাকা।—আমাকে ত' শুতে দিলি এই ঘরে। দরজার খিল ভাঙা ; জানালা ত' জানালা নয়, সিঁধ—টাকাগুলো আমার কাছে রাখা ঠিক হবে না ; কি জানি যদি চোর ঢুকে কোমর হাতড়ায়। বসে ত' থাকতে পারব না সারারাত। তোর লোহার সিন্দুকে রেখে দে টাকাগুলো ; সকাল বেলা উঠেই আমি নিয়ে যাব।

ক্রুদ্ধ দৈত্যের মতো মেঘ গর্জন করিয়া উঠিল—রাখহরি সেইদিকে হঠাৎ কান পাতিয়া অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়িল ; বলিল,—না ভাই, ভয় করে।

রাখহরির কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু দু'টিতে সত্যই ভয় সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া মদনের মনে হইল।

রাখহরির ভয় দেখিয়া কদন কৌতুকী হইয়া হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন,—
—ভয় কি রে ? কেউ জানে না এ-র কথা—আর রাতই বা কতটুকু আছে! যা, শুতে দে !

রাখহরি কথা কহিল না।

মদন কোমর হইতে টাকার গাজিয়া খুলিয়া জোরপূর্ব্বক অনিচ্ছুক রাখহরির হাতে দিয়া তাহাকে অন্দরে শুইতে পাঠাইয়া দিলেন।

তারপর সিন্দুকের চাবি ফিরাইবাব, ডালা খুলিবার, এবং ডালা বন্ধ করিবার শব্দ তাঁর কানে আসিল।

তারপর যবনিকা উঠিল বেলা আটটায়—

কিন্তু পটদৃশ্যের তখন আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—শিঙ্গা ডম্বরুধ্বনিত করিয়া আর নেত্রাগ্নি বিচ্ছুরিত করিয়া ফণিভূষণের তাণ্ডব নৃত্য সাঙ্গ হইয়াছে, তাহার স্থানে চন্দনচর্চ্চিত‌তনু প্রসন্ন-আনন নারায়ণ আসিয়াছেন।

ধৌত পল্লবে আর পঙ্কিল পল্বলে বিহসিত রৌদ্রচ্ছটা পড়িয়াছে—এই নয়নারাম চমৎকারিত্ব রাত্রির দুঃখের দান।

রাখহরির গৃহের সম্মুখস্থ দেবদারু গাছের তলায় দাঁড়াইয়া সদা অস্থির কণ্ঠে হাঁকিয়া উঠিল,—বাবু ?

সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে রাখহরি সাড়া দিল,—কে ?

—আমি সদানন্দ, মদন বাবুর চাকর। বাবু রয়েছেন এখানে ?

—না, সে ত' এখানে আসে নি।

শুনিয়া সদানন্দের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু তাহার প্রাণের এই কম্পন তাহার একবার থামিল না—তাহা ব্যাপ্ত হইতে লাগিল—আজিও তাহার পরিব্যাপ্তির সমাধা হয় নাই—সদানন্দ যে শূন্যতা সহসা সম্মুখে প্রসারিত দেখিয়াছিল, সেই শূন্যতা আজিও সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চের কণ্টক-যন্ত্রণা বহন করিয়া দিনের পর দিন একটি অবসানের দিকে চাহিয়া আছে।

কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কিছু বলে না।

রাখহরি যথাসময়ে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছে। তাহার পুত্রদ্বয় এখন বিস্তৃত ব্যবসায়ের মালিক। সোনারূপার আমদানী রপ্তানী চলিতেছে। দোকানে লোক লস্কর, জমাদার, কারিগরগণ, পাচক, ভৃত্য, তাগিদদার—গৃহে পুত্র, কন্যা, জামাতা, পৌত্র, দৌহিত্র প্রভৃতি। সহরের রুদ্ধশ্বাস আকাশ আর জনতার নিষ্পেষণের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাহারা মনোরমা ফুল্লরার স্নিগ্ধ তীরে ও সুপ্রশস্ত প্রান্তরে ঐ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছে। জীবনের চঞ্চল উষ্ণ স্পন্দনে, বহুরূপী ব্যঞ্জনায়, হাসি, গানে, দানে, গর্ব্বে, গৌরবে তাহারা নিজেকে চতুর্দ্দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেছে। এদিকে দিবালোকে দাঁড়াইয়া তাহাদের প্রবল আত্মঘোষণার অন্ত নাই, ওদিকে লোকসমাজের মাঝে তেমনি তাহাদের শান্তি-সুখ-সমাদর কাহারো চাইতে এক তিল কম নয়।

কিন্তু একটি কক্ষে তাহারা প্রত্যহ একটি আলো জ্বালিয়া রাখে—নিরুদ্দেশ-যাত্রী ফুল্লরার অন্ধকার জলে তার আলো পড়ে কিনা কে জানে—

সেই আলোকিত গবাক্ষের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে রাম যেন মন্ত্রাবিষ্ট হইয়া গেল—অন্যদিকে চোখ ফিরাইতে পারিল না—

রাম পা মেলিয়া দিল—

একটা ব্যাঙ্ লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া তাহার পা ডিঙাইয়া চলিয়া গেল …নক্ষত্রকুঞ্জের ভিতর হইতেই যেন একটি নক্ষত্র খসিয়া পড়িল…একটি লোক শ্যামাসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে পথ দিয়া চলিয়া গেল…

রামের মনে হইল, মিথ্যার দ্বারা কেবল ভয়ত্রস্ত নির্ব্বোধকে বঞ্চিত করিবার জন্য পাপ পুণ্যের অগণিত কাহিনী বিরচিত হইয়াছে ; স্বর্গকে পুষ্পে অমৃতে অপ্সরায় সুখময় এবং নরককে শেলে শূলে কণ্টকে এবং আরো অনেক কিছুর দ্বারা ভয়াবহ করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে…শুধু তাহাই নহে…পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিয়া মানুষকে এমন দুস্ত্যজ্য অভ্যাসের বশবর্ত্তী করিয়া আনা হইয়াছে যে, একটি চোখ নিজের ভিতরের দিকে আর একটি চোখ ঊর্ধ্বে অহৈতুক আর অপরিচিত একটা স্থানের দিকে না রাখিয়া তার উপায় নাই।

কিন্তু জ্ঞানীরা জানেন যে, ধনে পাপের ছোঁয়াচ লাগে না—অগ্নি যেমন কোনও মলিনতা গ্রহণ করে না, ধনও তেমনি। অর্থকে অগ্নির মতো কলুষের দুঃস্পৃশ্য করা হইয়াছে বলিয়াই অগ্নির মতোই সে চিরকালের বস্তু এবং আরাধ্য বস্তু। যিনি ধনের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে সংসারে প্রচলিত করিয়াছিলেন তিনিই

তাহার পথ চারিদিকেই অবাধ অনাবিল করিয়া দিয়াছেন—মন্ত্রপূত হইয়া আর মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন হইয়া সে তাহার লীলাক্ষেত্রে ছাড়া পাইয়াছে।

পয়সায় পাপ নাই।

রাম আর নিশ্চেষ্ট হইয়া হাত-পা গুটাইয়া আলস্যের আশ্রয়ে বসিয়া থাকিতে পারিল না—গাত্রোত্থান করিল। ঘরে ঢুকিল, কুপী জ্বালিল, দা লইল, মাটী আঁচড়াইয়া তুলিবার জন্য একটি নারিকেলের মালা সংগ্রহ করিয়াছিল—সেটাকে লইয়া সে গহ্বরের পাশে আসিয়া বসিল।

টাকাটা তাহার চাই—তাহার আশা ত্যাগ করিবার কথা সে ভাবিতেই পারিল না।

গহ্বরের ধরে কুপী রাখিয়া রাম তাহার সংকল্পকে মনের দহনে দহনে উগ্র হইতে উগ্রতর করিয়া তুলিল।

তারপর গহ্বরের ভিতর উপুড় হইয়া পড়িয়া দা দিয়া মাটী খুঁচাইয়া সে মালায় করিয়া আলগা মাটী উপরে তুলিতে লাগিল।

কতক্ষণ এমন করিয়া মাটী তোলা চলিত তাহা কে জানে—হয়তো সারারাত্রিই; কিন্তু হঠাৎ একটা বাধা উঠিয়া পড়ায় রামের অনুসন্ধানের কাজে বিঘ্ন ঘটিল।

রাম নারিকেলের মালাটি পরিপূর্ণ করিয়া একবার মাটী তুলিয়া আর একবার হাত নামাইতে যাইয়াই চমকিয়া উঠিয়া হাত আর নামাইল না। ঝুরা মাটী গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে বোধ হয়, তাই এই সুখী আগন্তুকটি শরীরের হাতখানেক গর্ত্তের বাহিরে আনিয়া কে তাহার ঘুম ভাঙাইয়াছে তাহাই দেখিতে আসিয়াছে।

দেখিয়াই রামের শীতল রক্ত আর শীতল রহিল না—তাহার শিথিল শিরা উপশিরা উন্মত্ত রক্তের বেগে ধনুকের ছিলার মতো দৃঢ় হইয়া উঠিল। হাতে পায়ে বুকে পিঠে এমন অসামান্য সামর্থ্য আর কর্ম্মঠ তৎপরতা আসিয়া গেল যা আশ্চর্য্য।

রাম চট করিয়া পূজার পুরোহিতের মতো করিয়া আসনস্থ হইয়া বসিল। চক্ষু মুদ্রিত করিল। কুম্ভকারের অল্পায়ত চক্র যেমন ঘোরে এই উদ্যতফণ বিষধরকেও অক্ষদণ্ড করিয়া রামের ত্বরিতপ্রাপ্ত স্নায়ুর উজ্জীবন আর আত্মার চৈতন্য তেমনি বেগে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তাহার কৈশোর যৌবন লব গয়ামণি ভিক্ষাপাত্র ঘূর্ণিত ধূমপটলের মাঝে অত্যুজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গের মতো ঝিকমিক করিয়া দেখা দিয়াই মিলাইতে লাগিল।

পরক্ষণেই রাম চোখ খুলিয়া দেখিল, সাপটি রহিয়াছে। ফণা গুটায় নাই, কুপীর আলো তাহার গায়ের উপর পড়ে নাই, কিন্তু তার প্রতিফলিত আভায় সর্পের নিষ্পলক চক্ষু দু'টি পর্য্যন্ত লক্ষিত হইতেছে।

বড় দেখিয়া একটা মাটীর ডেলা তুলিয়া লইয়া রাম সজোরে নিক্ষেপ করিল। ডেলা সাপের ঠিক মাথায় পড়িল, ক্রুদ্ধ সর্প ফণা দুলাইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

রাম মুখে বলিল,—"হরি হে।" বলিয়াই ডান পা-খানা নামাইয়া দিয়া সে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

দংশন অনুভূত হইল। মস্তিষ্কে, তারপর শরীরের রক্ত আগুন হইয়া

অগ্নিস্রোতের মতো বহিতে লাগিল। শরীর পুড়িতে লাগিল, শিরাগুলি ফাটিতে লাগিল, কিন্তু সে মুখ বিকৃত করিল না।

রামের মনে পড়িল, লবকে দু'বার দংশন করিয়াছিল। ডান পা উপরে তুলিয়া রাম বাঁ পা-খানা নামাইয়া দিল। পুনরায় দংশন অনুভূত হইল।

রাম পা তুলিয়া আনিয়া আসনস্থ হইয়া বসিল, ফুৎকার দিয়া কুপী নিবাইয়া দিল, আলোর প্রয়োজন নাই।

পরস্বপ্রয়াসী যে দু'টি অভিজ্ঞ লোক কাল তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদের একজন আজ সকাল বেলা তামাসার পুনরভিনয় দেখিতে আসিল।

"রাম, খবর কি?" বলিয়া কৌতুকহাস্যে মুখ উজ্জ্বল করিয়া দরজার সম্মুখে আসিয়াই সে আঁৎকাইয়া পিছাইয়া গেল।

দেখিল, রামের পা-দুখানা আকাশের দিকে উঠিয়া আড়ষ্ট হইয়া আছে। পায়ের দশটি আঙুল গোড়ালির উল্টা দিকে দুমড়াইয়া আছে।

শরীরটা গহ্বরের ভিতর।

যথাক্রমে

প্রথম পরিচ্ছেদ

ছোট্ট নদীর ধারে হাট। গ্রামের নাম বেতডাঙ্গা, নদীর নাম চন্দনা, হাটের নাম চন্দনার হাট। নদীর বুক বৃদ্ধার স্তনের মতো শুকাইয়া আসিতেছে, তবু স্তন্যের মায়ামধু কৃতজ্ঞ স্তন্যপায়ী সন্তানেরা ভুলিতে পারে না, চন্দনাকে ভালবাসিয়া হাটের নাম দিয়াছে চন্দনার হাট।

এই হাটের উপর রামপ্রসাদের মুদিখানা; কলের তেল, মসলাপাতি প্রভৃতি আর বার্লি হইতে ডাল পর্য্যন্ত নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু খুচরা বিক্রয়ের দোকান সেটা। অমন আরো আছে; রামপ্রসাদেরটা তাহাদের মধ্যে বয়োকনিষ্ঠ না হইলেও ক্রমবৃদ্ধি নাই বলিয়া সে-ও চিরদিন লোকের কাছে অপাত্রই রহিয়া গেছে।

সবই ছোট।

নদী ছোট, গ্রাম ছোট, হাট ছোট, হাটে যারা আসে তারাও বৃহৎ নহে; কাজেই দোকানগুলি সর্ব্বব্যাপী ছোটর মাঝে ছায়াবাসী বৃক্ষশিশুর মতো খর্ব্ব হইয়াই আছে; ছোটকে আশ্রয় করিয়া যতটুকু অস্তিত্ব তার থাকিতে পারে ঠিক ততটুকুই আছে, ছোটর আলিঙ্গনকে ছাড়াইয়া বড় হইয়া উঠিতে পারে নাই। সিকদাররা বড় করিয়া ফাঁদিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা জন্মদিনে যতবড় হইয়া দেখা দিয়াছিল, এখন আর ততবড় নাই, ক্রমশঃ কুঞ্চিত হইতেছে। আশার বাহু বৃহৎ হইলেই ঊর্দ্ধে উঠা যায় না, ঊর্দ্ধস্থ স্থান আর তথাকার অবলম্বনও বৃহৎ হওয়া চাই।

সপ্তাহে দুদিন হাট বসে, বৈকালে, শনিবারে, আর মঙ্গলবারে, চারের হাট আর তিনের হাট নামে তারা স্বতন্ত্রভাবে পরিচিত। ঐ দু'টি দিনেই যা খরিদ্দারের ভীড়, আনাগোনা, ধুমধাম, সরগরম, এটা সেটা বিক্রী, তাছাড়া বাকি পাঁচ দিন উহাদের দিবারাত্র বসিয়াই কাটে—চোখের সামনে বিরাজ করে হাটের ধুলার উপর লোকের পদচিহ্ন, পরস্পরের মুখ, চন্দনার অপরিচ্ছন্ন শুষ্কপ্রায় দেহ, নিবিড় জঙ্গল, একটি বিরাট বনস্পতি আর অলক্ষ্মীর ছায়া, কর্ম্মহীন আলস্যের মাঝে বসিয়াই সময় কাটে। সামান্য দু'এক পয়সার জিনিষ ক্বচিৎ কখনো লোকে আসিয়া চায়, সাগু, মিছরী, হলুদ, শুকনো লঙ্কা, বার্লি—লোকে বলে বার্লিকু।

কিন্তু দোকান প্রত্যহই খুলিতে হয়, দোকান লক্ষ্মী, অবশ্য বিরাট আসন পাতিয়া তিনি বসিয়া যান নাই, তাঁর বিশ্বব্যাপী বৈভবের মূর্ত্তি ক্ষুদ্রতম আসনে স্থাপিত রহিয়াছে, মানুষ আশা করিয়া আর নিঃশ্বাস চাপিয়া তাঁহার মুখের দিকে চায়।

দোকানের সুমুখটা ঝাঁট দিতে হয়; জল ছিটাইয়া ধুলা মারিতে হয়; "জিনিষপত্র" ছিটাইয়া ছড়াইয়া একাকার হইয়া থাকে, সেগুলি গুছাইয়া সাজাইয়া পরিপাটি করিয়া রাখিতে হয়; পোস্তদানায় কি যেন জটা বাঁধিয়া ওঠে, জটা ছাড়াইয়া তাহা ঝাড়িয়া রাখিতে হয়, আটায় কীট জন্মে, তাহা বাছিয়া ফেলিতে

হয়; জিরে মৌরি পুরাতন বিবর্ণ হইয়া ওঠে, নতুনের সঙ্গে তাহাকে মিশাইয়া লইতে হয়।

এমনি শতেক কাজ, শতেক দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তবে দু'টি পয়সা আনিতে হয়।

বন্ধু-বান্ধব আসে।

ঠেক্না দিয়া তুলিয়া রাখা ঝাঁপের নীচে বাখারির বেঞ্চিতে তারা বসে, মধুর অম্লমধুর ও অমধুর বিবিধ আলোচনা হয়।

জিনিষপত্রের দর বাড়িতেছে, ধান জন্মিতেছে না, 'বাকি পয়সা' আদায় হয় না, রামপ্রসাদ এই সব অনুযোগ করে।

কিন্তু তার দুঃখের কথা কেহ ভাল করিয়া শোনে না, কেউ হয়তো আনমনে সায় দেয়;—তা ঠিকই বলেছ, রামপ্রসাদ, মাটির হাঁড়ি হে, মাটির হাঁড়ি মাটিও হয়েছে এখন পরম পদাত্ত, মাটির হাঁড়ি আগে ছিল পাঁচ পয়সা জোড়া, এখন একটারই দাম ছ'পয়সা, আকাশ-পাতাল ফারাক, আরে, পয়সা লোকে বিয়োচ্ছে? বলিয়া সে আকাশ-পাতাল ফারাকের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। তার একটা হাঁড়ি কিনিবার দরকার ছিল, সে তাই হাঁড়িকে ধরিয়াই নিজের কথা 'ষোল কাহন' বাজাইয়া লইল।

যে কাঁচালঙ্কা বেশী খায় সে বলে কাঁচালঙ্কারই কথা, আগে দেখেছি, আনাচে কানাচে লঙ্কাগাছ হ'ত আগাছার মতো, এক হাটে এক পয়সার কাঁচালঙ্কা নিলে আর তিন হাট সে দিকে চাইতে হত না, এখন দু'পয়সার কাঁচালঙ্কায় এক বেলা কুলোয় না হে! ঝোলে দিলে ডালে হয় না, ডালে দিলে ঝোলে পড়ে না। খাই কি? বলিয়া সে পূর্ব্বেকার অঢেল লঙ্কা-চাষের কথার সঙ্গে আহারের কষ্টের কথা ভাবিতে থাকে।

একজন যদি ঠাট্টা করিয়া বলে,—বা—বাঃ তুমি লঙ্কা খাও কত!—অমনি ঝগড়া বাধিয়া যায়।

কথায় কথায় সেই নিষিদ্ধ কথাটাই উঠিয়া পড়ে। শ্রীমন্ত মজুমদার সাবধান করিয়া দিয়াছেন, খবরদার আমার হাটের মাটিতে পা দিয়ে কথাটা তুলবে না কেউ। হাট তাঁর, অর্থাৎ তাঁর মাটিতেই বসে; আর, পরিণাম-শঙ্কায় বিশেষ ব্যাকুল হইয়াই তিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন, তবু ঠেকান যায় না, কথাটা ওঠে।

কানাই দত্ত হাসিয়া বলে,—মতে পাল জব্দ। তখনি বলেছিলাম, ওরে, ওটাকে ওখানে রাখিসনে; বনের জন্তু ত'। কখন কাকে কি করে বসবে। এখন হলি ত' ঠাণ্ডা!—বলিয়া অবুঝ কানাই দত্ত অনুপস্থিত মতিলাল পালের উদ্দেশে ঠাট্টার হাসি হাসে।

রামপ্রসাদ কাতর হইয়া বলে,—দত্ত মশাই, ও-কথাটা রাখুন।

কিন্তু নিষিদ্ধ কথা ঘাঁটাইয়া তোলা কানাইয়ের স্বভাব; অনুক্ত এবং অনুচ্চ প্রতিবাদের সম্মুখে সে হাত নাড়িয়া বলে, ভয় কেন এত? তবে, মতি আমার কথা শোনেনি বলে যে আমি তার বিপক্ষে গেছি, এমন কথা ভুলেও যেন কেউ না ভাবে। দেখেছিলে ত' সেদিন? আমি—

প্রবল কলরব করিয়া সবাই মিলিয়া তার কথাটাকে প্রাণপণে ঢাকা দেয়, বীরপণা শেষ করা হয় না।

যে ঘটনার আলোচনা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ঃ— উক্ত মতিলাল পাল একটা লাল-মুখ কটা-লোম আর পিটপিটে চোখ বানর আনিয়াছিল, কোথা হইতে কে জানে ; মতি কাহাকেও বলিয়াছিল, সিরাজগঞ্জ হইতে আনা, কাহাকেও বলিয়াছিল, গোয়ালন্দে পাওয়া, কাহাকেও বলিয়াছিল, উহা যশোহরের উপঢৌকন। সেখানকার আমদানিই হউক, জীবটি নিরীহ, তাহার নাম রাখা হইয়াছিল সুগ্রীব, রামায়ণের রাম-সহায়। মতির দোকানের বাহিরে একধারে যেখানে খড়ের গাদা আর কলার ঝাড় আর পাকাঠির মাচা, সেখানে একটা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে লম্বা শিকল দিয়া সুগ্রীব বাঁধা থাকিত আর ঝিমাইত। লোকের অনিষ্ট করে নাই, তবু লোকে তার পাঁচ হাত তফাৎ দিয়া যাতায়াত করিত।

এমনি করিয়া ব্যবধান রাখিয়া চলিতে চলিতে একদিন এক ব্যক্তি সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইয়া গেল, এবং একটি সুপক্ব কদলী সুগ্রীবকে তাহার হাতের উপর হইতে তুলিয়া লইতে দিয়া মানুষের ভয় ভাঙ্গিয়া দিল।

তারপর অনেকেই তার কাছে যায়, কলাটা মূলোটা বেগুনটা তাকে হাতে হাতে দেয়, দাঁড়াইয়া সুগ্রীবের গ্রীবাভঙ্গী, ভোজনকৌশল আর চর্ব্বণপটুতা দেখে, আর তারিফ করে।

কেউ কেউ বলে, মানুষে আর ওতে তফাৎ কমই। এই সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধির প্রতিবাদ কেউ করে না।

ইব্রাহিম নামক একটি কৃষক যুবক তেমনি হাসিতে হাসিতে একদিন একটা বেগুন লইয়া সুগ্রীবকে উপহার দিতে গিয়াছিল এবং অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা যে, মতি পালের ভাই নিত্য পাল ঠিক সেই সময়েই, ইব্রাহিম যখন সুগ্রীবের একেবারে হাতের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন পিছন হইতে সুগ্রীবের পিঠে মারিয়া দিল কঞ্চির এক খোঁচা, তাহাতেই সুগ্রীবের গ্রীবা বিশ্রী বেঁকিয়া গেল, ত্রেতাযুগের স্থিরবুদ্ধি কেন্দ্রভ্রষ্ট হইয়া গেল, ক্রোধান্ধ ইব্রাহিমের ডান পা-খানা চার হাত-পা দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া এক-কামড়েই তার হাঁটুর মাংস ছটাক তিনেক তুলিয়া লইল। তারপরও ইব্রাহিমের পা ছাড়িতে চাহে না, এমনি তার আক্রোশ।

লোকে ইব্রাহিমকে টানিয়া ছাড়াইয়া আনিল, ইব্রাহিমের রক্তপাত আর শুশ্রূষা হইল যত, সুগ্রীব প্রহার খাইল তত।

তারপর মতির সঙ্গে ইব্রাহিমের দাদা আকবরের কলহ বাধিল, এবং কেমন করিয়া কে জানে, কলহ বাড়িতে বাড়িতে হাটের সমুদয় লোক অকস্মাৎ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একদিকে দাঁড়াইল কেবল হিন্দু, অন্যদিকে কেবল মুসলমান ; —উভয় পক্ষই প্রহরণধারী।

কানাই দত্তও লাঠি লইয়া পিছনে ছিল বোধ হয়। যাহা হউক, রক্তারক্তি হইতে হইতে শ্রীমন্ত মজুমদারের প্রাণপণ মধ্যস্থতায় হইল না, মতি সঙ্গে সঙ্গে পঁচিশ টাকা জরিমানা দিয়া আকবর আর তার সম্প্রদায়কে তুষ্ট করিল।

নির্ভীক কানাই দত্ত ঐ কথাটাই আলোচনাধীনে আনিতে যাইতেছিল ; কিন্তু সুরুতেই বাধা পাইয়াছে।

সুগ্রীব অদৃশ্য হইয়াছে ; এদের সঙ্গে সঙ্গে ওদের আর বিরোধও নাই, তবু দোকানটির দিকে চাহিয়া রামপ্রসাদের মনে হয়, তাহারই দোকানে বসিয়া এ কথার হাসির দিকটা কি ভাবিবার দিকটা প্রকট না করাই ভাল, দেশের আবহাওয়া ভাল যাইতেছে না।

এই প্রকারের কথাবার্ত্তা দীনবন্ধু আর সাবিত্রী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শোনে, হাসির কথায় সকলের সঙ্গে হাসে, আর মানুষের আর রামপ্রসাদের ফাই-ফরমাস খাটে, তামাকের ডিবাটা আগাইয়া দেয়, আগুনের মালসাটা, তুষচাপা ঘুঁটের আগুন তোলার চিমটেটা হাতে দেয় ; যে তামাক সাজে, ঘটির জল তাহার হাতে ঢালিয়া দেয়। তামাক খাইয়া তারা একে একে গা তোলে, দিনব্যাপী কর্ম্মহীন প্রচুর অবকাশের দিকে চাহিয়া তারা আরো অনেক কথা কহিতে চায়। কিন্তু বাড়ীর ফরমাস লইয়া তাহারা আসিয়াছে, উঠিতে হয়।

মিছরী, বাতাসা, বার্লি, ধনে, মৌরি প্রভৃতির মোড়ক বাপের হাত হইতে লইয়া কখন দীনবন্ধু কখন সাবিত্রী, যে চায় তাহার হাতে দেয় ; হাত পাতে ; বলে,—পয়সা ?

কেউ দেয়। কেউ অকারণে ট্যাঁক হাতড়াইয়া বলে,—হাটবারে দেব, রাম।

রাম বলে,—আরো চারটে পাব যে !

—সেটাও সেই দিনই নিও। বলিয়া খরিদ্দার-বন্ধু চলতে সুরু করে।

রামপ্রসাদ বিষণ্ণ হইয়া মনে মনে ভাবে, এটাও আমার গেল।

হাটের মাটির সীমানা ঘিরিয়া খান পাঁচেক ঘর আছে, তারা আড়তের আকারে তৈরি, কিন্তু আড়তের গুরুত্ব তাহাদের আছে বলিয়া কেহ স্বীকার করে না। তা ছাড়া চারিদিক খোলা পাঁচখানা চালা আছে হাটের ঠিক বুকের উপর, তাতে মনিহারী দোকান, মুগার সূতা আর ধনেখালির বঁড়শীর দোকান বসে, পশ্চিমা রুটিওয়ালা একখানা ভাড়া লইয়াছে ; দু'খানা পানওয়ালাদের।

চন্দনা খুবই ছোট নদী, জল তাহাতে বারমাসই থাকে, কিন্তু স্রোত বারমাসই থাকে না, নাম জানা নাই এমন ঘাসে-শেওলায় নদীর আবদ্ধ জল আগে বিবর্ণ হইয়া পরে এ-পার হইতে ও-পার পর্য্যন্ত চাপা পড়িয়া যায় ; ঘাটে যেখানে জলে নামিতে হয়, শেওলার জঙ্গল সরাইয়া দিয়া সেই স্থানটি পরিষ্কার করা হয়, জল টলটল করে।—লোকে সেখানে স্নান করে, জল তুলিতে নামে।

আর দীনবন্ধু সেখানে মাছ ধরে। গুলির সূতা তিন-বেরতা করিয়া পাকাইয়া দীনবন্ধু কঞ্চির ছিপের ডগায় বাঁধে, ঘনেখালির বঁড়শী লাগায়, আয়োজন সবই হয়, ফাৎনাটোপ পর্য্যন্ত—কিন্তু প্রয়োজন যাহাকে দিয়া, তাহার দর্শন প্রায়ই মেলে না, তপস্যার সে বস্তু, বঁড়শীবিদ্ধ হইয়া ডাঙ্গায় ওঠে না।

ফাৎনাটা হাওয়ায় ঢেউয়ের উপর নাচে, হঠাৎ মনে হয়, ডুবিয়া গেল, মাছে টানিতেছে।

সাবিত্রী হাততালি দিতে থাকে।

কিন্তু টানিলে শুধু বঁড়শীই উঠিয়া আসে, মাছ থাকে না ; হাততালি বন্ধ করিয়া সাবিত্রী ম্লান হইয়া যায় ; বলে, পালিয়ে গেছে।

দীনু বলে,—মাছগুলো ভারি চালাক হয়ে গেছে, এক কাজ কর দিকি, বাবাকে লুকিয়ে একটু ময়দা নিয়ে আয় দিকি, কেঁচোর টোপ ভাল মাছে খায় না।

সাবিত্রী ছুটিয়া যাইয়া এক-খাবলা ময়দা লইয়া আসে।

কিন্তু ময়দার টোপেও ভাল মাছ ওঠে না, খারাপ মাছও ওঠে না। সাবিত্রী বলে, নদীতেই মাছ নেই।

দীনু বলে, বড় খারাপ নদী।

কিন্তু নদী বড় খারাপ হইলেও, একদিন একটা উঠিয়াছিল, সত্যিকার মাছই একটা বঁড়শীতে বিঁধিয়া উঠিয়াছিল। সেদিন, তার পরদিন এবং তারও পরদিন পর্যন্ত দীনবন্ধু আর সাবিত্রী সেই মাছের গল্প ছাড়া আর কোনও গল্প করে নাই।

সেটা পুঁটি। রুপোলী ঝকঝকে গা,—দেখিতেই আনন্দ; কয়েক মুহূর্ত্ত খাবি খাইয়া পুঁটি প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, আর তাহার ঠোঁটের ভিতর হইতে বঁড়শীটাকে খুলিয়া আনিতে লাগিয়াছিল দশ মিনিট।

সাবিত্রী সেই মাছের উপর আর তার দাদার পিঠের উপর উপুড় হইয়া বঁড়শী খোলা দেখিতে দেখিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, জলে থাকলে আরো বড় হ'ত, নয় দাদা?

—তা ত' হতই!

—এত বড় হত? বলিয়া সাবিত্রী খাড়া হইয়া হাত দু'টা মেলিয়া যত বড়টা দেখাইয়াছিল, রোহিত যদি তত বড় হয় তবে তার ওজন হয় তিরিশ সের।

দীনু হাসিয়া বলিয়াছিল,—দূর পাগল, পুঁটি মাছ অতবড় হয় কখনো! আর একটুখানি বড় হত।

শুনিয়া পুঁটির অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্রত্বে সাবিত্রী হতাশ হইয়া গিয়াছিল।

সেদিন রাত্রে সাবিত্রী চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিল। দেখিয়াছিল, জলের ভিতর হইতে পুঁটি ঠিক ততটুকুই উঠিয়াছে; কিন্তু দেখিতে দেখিতে সে বড় হইয়া উঠিল, বাড়িতে বাড়িতে তার পুচ্ছ গেল জলে, আর মাথা ঢুকিল ঘরে।

সাবিত্রী আগে দেখে নাই, হঠাৎ দেখিল, মাছের দু'খানা পা আছে; মাছ উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল, তারপর কথা বলিতেও সুরু করিল; যাবে আমাদের দেশে?

—'ওমা, আঁসটে গন্ধ যে!' বলিয়া সাবিত্রী পুঁটির কথায় হাসিয়া উঠিয়াছিল।

—না, গন্ধ-টন্ধ নেই; চলো যাই। বলিয়া পুঁটি সাবিত্রীর হাত ধরিয়া জলের ধারে আনিতেই তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

আরো মজা বর্ষাকালে।

দিন দিন একটু একটু করিয়া জল বাড়ে, জল ঘোলা হইতে থাকে, জলের ঘাস-শেওলা ডুবিতে ডুবিতে একেবারে ডুবিয়া যায়, একটুখানি স্রোত বয়।

স্রোতের পথে আগেই আসে কচুরী-পানা, ফণায় বাতাস লাগিয়া তারা স্রোতের আগে ভাসিয়া চলে, কোনোটা পার হইয়া যায়, কোনোটা কিনারায় আসিয়া লাগে, কোনোটা নদীর উপরকার পারাপারের বাঁশের সাঁকোর পায়ার সঙ্গে শিকড় জড়াইয়া আটকা পড়ে।

ডুবানো নৌকাগুলি লোকে টানিয়া টানিয়া তুলিতে থাকে, জল ছেঁচিয়া তাতে দাঁড় বসায়, হাল বসায়।

বাঁশের সাঁকো তুলিয়া দিয়া হাটের সামনে খেয়া চলে, সেই পুরাতন ভাঙাচোরা নৌকাখানা ধীরে ধীরে এ-পার ও-পার করে, ও-পারের লোক এ-পারের হাটে আসে। জল বাড়িয়া কালীর ঘরের ধার পর্যন্ত পেঁছায়, ঘাসের উপর ছল্ ছল্ করে।

শ্মশানের কয়লা স্তূপে স্তূপে ভাসিয়া যায়, আধ-পোড়া কাঠ, মৃতদেহও আসে।

বড় বড় নৌকা আসিয়া হাটের ঘাটে ভেড়ে, তাহাদের খোল যেন অশেষ; ভিতর হইতে কত যে জিনিষ নামে তাহার ঠিক নেই, ধান, গুড়, পাতা-তামাক, হুঁকা পর্যন্ত।

জেলেরা ডিঙ্গি লইয়া পদ্মায় ছোটে, ইলিশ মাছের আশায়, বিদেশী পান্সী পাল তুলিয়া উজান দিকে যায়, তাদের বড় নজর, ভারি দেমাক, চন্ননার হাটের পানে যেন ফিরিয়াও চায় না।

জলপথে বৌ-ঝিরা শ্বশুরবাড়ী, বাপের বাড়ী যায়, তাদের দৃষ্টি এদিকে পড়ে, কুতূহলী হইয়া মুখ বাড়াইয়া তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে।

আগাগোড়া নারিকেল বোঝাই পূবের নৌকা এই পথে দক্ষিণে যায়, চন্ননার অর্ধেক জুড়িয়া তারা চলে, তাদের গতি বড় ধীর।

হাটের পশ্চিমে কুমোরদের বাড়ী।

তারা নৌকা সাজায়; কাঁচা কঞ্চির বেড় তৈরী করিয়া তাহার উপর পুরাতন চাটাই ফেলিয়া বাঁধিয়া দেয়, নৌকার গায়ের ফাটল আর ছিদ্রগুলি পাটের আঁশ আর গাবের আঠা দিয়া বন্ধ করে, খোল পূর্ণ করিয়া হাঁড়ি, কলসী, সরা, মালসা সাজাইয়া সাজাইয়া তোলে, সকালবেলা দেখা যায়, নৌকা নাই; কখন তারা নৌকা লইয়া বাণিজ্য করিতে বাহির হইয়া গেছে।

সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করে, দাদা, ওরা কোথায় গেছে নৌকা নিয়ে?

দীনু বলে, গাঁয়ে গাঁয়ে ওরা বেড়ায়।

—নৌকা থেকে নেমে?

দীনু বলে, হ্যাঁ।

আমের আঁটির বাঁশী তৈরীর তখনই সময়, ছাই-গাদায় দু'টি মাত্র পাতা লইয়া ডাঁটাটা বাহির হয়, সাপের কচি বাচ্চার মতো লিকলিকে আর মসৃণ, পাতা দু'টির গায়ে যেন তেলমাখান, এমনি তার কাল রংটা ঝক্‌ঝক্ করে, টানিলেই উপড়াইয়া আসে।

"কালো কালো ভোমরা, কাল ঘাস খায়" ইত্যাদি মন্ত্র গান করিতে করিতে আঁঠির মাথা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ঘষিয়া বাঁশী তৈরী করিতে হয়, ঘাটে বসিয়া সেই বাঁশী বাজান ভারি মজা।

মেঘ না উঠিতেই ওপারের একটি গাছের মাথায় সোজা বিদ্যুৎ ঝিক্‌মিক্ করিয়া ওঠে, সাবিত্রী ভয় পায়; বলে, চলো দাদা, বাড়ী যাই।

একখানা চলন্ত ডিঙ্গীর দিকে চাহিয়া দীনু বলে, দাঁড়া।

অনেক দূরে শ্রীনিবাস অধিকারীর হাটের ডিঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায়; ও-পারেও জমির আলে, খেজুর গাছের আড়ালে আড়ালে, লোকের সারি দেখা দিতে থাকে, সাবিত্রীর তখনই যাওয়া হয় না।

শ্রীনিবাসের ডিঙ্গী সোজা দিকে মুখ করিয়া হু হু শব্দে আসিতে আসিতে সট্ করিয়া ঘুরিয়া হাটের দিকে মুখ করে, ডিঙ্গীর চারিদিকের জল কল্‌কল্ শব্দ করিয়া তোলপাড় হইয়া যায়।

সাবিত্রী আশ্চর্য্য হইয়া বলে, দাদা, নৌকা ঘুরল কেমন করে?

দীনু বলে, পিছনে যে বসে আছে হাল ধরে সে-ই ঘুরিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু সাবিত্রী অবাক হইয়াই থাকে, বুঝিতে পারে না। দেখিতে দেখিতে হাট জাঁকিয়া ওঠে।

বর্ষার সময়েই রামপ্রসাদের কাজ বাড়ে।

আর-বর্ষা পর্য্যন্ত অর্থাৎ একটি বৎসরে, যত 'সাজমশলা' বেনেতি জিনিষ কাটিবে বলিয়া হিসাব আর অভিজ্ঞতা আছে, তা এখনই তাহাকে কিনিয়া রাখিতে হয়; এখন কিছু সস্তা দরে পাওয়া যায়; এখন ঘাটে-আসা নৌকার মাল কিনিয়া না রাখিলে ভবিষ্যতে বড় অসুবিধায় পড়িতে হয়, যাইতে হয় জামালপুরের বাজারে; কিন্তু সেখানে দরও বেশী, সেখান হইতে আনাও কষ্ট, তাই চারিদিকে খোঁজ রাখিতে হয়, কোন নৌকায় কি আসিল।

রামপ্রসাদ দীনুকে দর জানিতে পাঠায়, তারপর নিজে যায়।

মাঝে মাঝে ঠকিতেও হয়; আরো সস্তায় পাওয়া যাইবে আশা করিয়া তখনই দর মিটাইয়া মাল কেনে না; সে-নৌকার মাল ফুরাইয়া যায়, সে বছর তা মজুত করিয়া রাখাই হয় না। জামালপুরে দৌড়াইতে হয়।

দীনবন্ধু দাঁড়ি ধরিতে শিখিয়াছে; কিন্তু খরিদ-বিক্রয়ের কাজ বোঝে মাঝারি রকম, বাটখারা চেনে, তবে সোজা হিসাবের বাহিরে গেলেই মুস্কিল হয়, অমুক জিনিষটা এই ক'পয়সায় ওজনে কতটা দিতে হইবে তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না। বাবাকে শুধায়।

রামপ্রসাদ বলে, ছটাকটা দে, আর তিনটে পয়সা দিয়ে ওজন করে দে।

পয়সা দিবার মর্ম্মটা দীনুর হৃদয়ঙ্গম হয় না।

যে জিনিস গুণতি হিসাবে দিতে হয় তা সাবিত্রীই দিতে পারে; সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি নাই বলিয়া তার মুখস্থ হইয়া গেছে: যথা, বড় বাতাসা তিনখানা পয়সায়, ফুলবাতাসা ছ'খানা, লেবেনচুসগুলি, দেশী সুপারী তিনটে, জাহাজী সুপারি পাঁচখানা ইত্যাদি।

এমনি করিয়াই এই তিনটি ক্ষুদ্র ব্যক্তির দিন যাইতেছিল।

হেমন্তের পর শীত ঋতুটাকে বাদ দিয়া বসন্ত আসিবে ইহা যেমন কেহ আশা করিতে পারে না তেমনি রামপ্রসাদের মনে হইত, আজিকার দুঃখের পর সুখ এবং কল্যকার সুখের পর দুঃখ দেখা দিবে, সংসারের এই নিয়মচক্রের আবর্ত্তনের হাত হইতে নিস্তার নাই; তবে তার দুঃখও যেমন মৃদু, সুখও তেমনি মৃদু; সুখ-দুঃখের এই মৃদুতাই চিরদিনের পরিচয়ে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু মৃত্যু সংসারে নিয়মের ভিতর হইলেও মৃদু নয়।

মৃদু স্রোতের মাঝে যমদণ্ড পড়িয়া স্রোত বাধা পাইয়া একদিন ফেনাইয়া উঠিল, স্ত্রীর মৃত্যু রামপ্রসাদের অন্তরে কঠিন ঘা দিল।

রামপ্রসাদের স্ত্রী কখনও রামপ্রসাদের সর্ব্বার্থসাধিকা হইয়া উঠে নাই, তার মুগ্ধ চক্ষুর সম্মুখে সে একটা হেঁয়ালির মতোও ছিল না। চিরদিনের অন্তঃপুর হইতে যাত্রা করিয়া সে চিরদিনের শ্মশানে চলিয়া যাইতেই রামপ্রসাদের গৃহ শূন্য হইয়া গেল, কেবল এই হিসাবে যে সন্তানের যে পালনকর্ত্রী ছিল, সে-ই রহিল না। তবু দীর্ঘ দিনের সংসর্গে অপার মমতা জন্মিয়াছিল, রামপ্রসাদ কাঁদিল খুব।

দীনবন্ধু আর সাবিত্রীর মাতৃশোকের সীমা রহিল না. রামপ্রসাদ তাহাদের ইহাই বলিয়া বুঝাইতে গেল যে, মা কি সকলেরই বাঁচিয়া থাকে? বলিয়া তার নিজেরই মনে হইল, তার মতো অসহায় বুঝি কেউ নাই।

সাবিত্রী বলে, কেন, সবারই মা ত' বেঁচে আছে। হারুর মা বেঁচে আছে, কুতুর মা বেঁচে আছে, অণির মা আছে।

রামপ্রসাদ চোখ মুছিয়া বলে, তাদের মা বেঁচে আছে বটে, কিন্তু খেঁদির মা বেঁচে নেই, ভোলার মা বেঁচে নেই, চাঁপার মা বেঁচে নেই।

সাবিত্রী পুনরায় বলে, তা না থাক, আমাদের মা মরে গেল কেন তিনদিনের জ্বরে?

সে পরশু ছিল আজ নাই, মনে পড়াতে রামপ্রসাদের চোখে আবার ঝরু করিয়া জল আসিয়া পড়ে।

মানুষ কেন এমন করিয়া অসময়ে অকস্মাৎ মারা যায় তার হেতুটি জানা না থাকায় রামপ্রসাদ আর কথা কহে না, কেবল দুই চোখের জলের ধারার ভিতর চারিদিক অস্পষ্ট দেখিয়া ভাবে, অদৃষ্ট।

হাটের ময়দান সম্মুখে করিয়া তিন জনে নিঃশব্দ হইয়া থাকে, নক্ষত্রের আলোকেই বালিবহুল সাদা ধুলা পরিষ্কার দেখায়, সেই স্পষ্টতার পাশেই নিবিড় জঙ্গলের অভ্যন্তরটা বড় অন্ধকার মনে হয়, দু' একটি জোনাকি সেই অন্ধকারে বিচরণ করে, নদীর ও-পারের প্রান্তরে একটি ক্ষুদ্র আলো ঘুরিয়া বেড়ায়, সামনের দোকানের মালিক প্রদীপের সামনে বসিয়া হিসাবের খাতা দেখে।

সাবিত্রী বলিয়া ওঠে, বাবা, ভয় করছে।

রামপ্রসাদ তাহাকে কোলের ভিতর টানিয়া লয়; বলে, চল, শুইগে।

মা-হারা ছেলেকে আর মেয়েকে রামপ্রসাদ মানুষ করিতে লাগিল, কিন্তু তার অবিরাম মনে হয়, কিছুই ঠিক হইতেছে না; ছেলে মানুষ করিতে সে জানে না, তাহার হাতে পড়িয়া উহারা বাঁচিবে না, এমন অযত্নে আর স্নানাহারের অনিয়মে কোনো ছেলেমেয়েই বাঁচিতে পারে না।

যাহাকে পায় তাহাকেই ডাকিয়া বসাইয়া রামপ্রসাদ কেবল ঐ দুঃখই করে।

কিন্তু সে সব স্নেহদ্রব রামপ্রসাদের মনের গোলমাল। দীনবন্ধু আর সাবিত্রীর বিশেষ যে অযত্ন হইতেছে তাহাও নয়, আর অষ্টপ্রহর খাওয়া-পরার যত্নেরও যে খুব দরকার ছিল তাহাও নয়, তারা তখন বড় হইয়া উঠিয়াছে, খুব বড় নয়, তবে মা-হারা হইয়া একেবারে অসহায় হইয়া পড়িবার দুগ্ধপোষ্য বয়স তখন তাহারা পার হইয়া আসিয়াছে, তখন দীনুর বয়স এগার, সাবিত্রীর বয়স সাত।

ক্রমে তাহারা খেলাধুলার মধ্যে মাকে ভুলিতে লাগিল।

রামপ্রসাদ নিজেই রাঁধে, সাবিত্রীকে আগুনের কাছে যাইতে দেয় না, রান্না শেখায়ও না; বলে, না। মেয়েছেলে, রাঁধতে গিয়ে যদি হাত-পা পুড়িয়ে ফেলে। তখন তার বিয়ে দেয়া কঠিন হবে।

সাবিত্রী আগুনের কাছে যায় না, কিন্তু হেঁসেলে যায়, জল মসলা জুগাইয়া দেয়, আরো অনেক কাজ সে করে, বাসন মাজে, কাপড় কাচে, শুকাইয়া তোলে, ঘর-দুয়ার ঝাঁট দেয়; এঁটো ঘুচায়।

লণ্ঠন জ্বালিবার দিশা সে পায় না। দীনু তা জ্বালিয়া দেয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দীনুর বাবা রামপ্রসাদ আর এখানকার অনাথ চক্রবর্ত্তীর ভাই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ছেলেবেলাকার পড়ার সাথী। রামপ্রসাদ গোবিন্দকে 'তুই-তুকারি' করিয়া পা দেখাইতে পরকালে দুর্দ্দশার কিংবা ইহকালেই পা খসিয়া যাইবার ভয় করে নাই; কিন্তু এখন রামপ্রসাদের কাছে চক্রবর্ত্তীর মর্য্যাদা বাড়িয়া উভয়ে জাতিগত পার্থক্য হিসাবে পরস্পর পূজনীয় ও আশীর্ব্বাদীয় পাত্রে দাঁড়াইয়া গেছে। তখন ভাই সম্পর্ক ছিল; এখন রামপ্রসাদ বলে 'আপনি' 'আজ্ঞা'; ডাকে খুড়োঠাকুর বলিয়া, আর পায়ের ধুলো নেয়। গোবিন্দ বলেন 'রামপ্রসাদ' 'তুমি' আর পায়ের ধুলো দেন।

আশীর্ব্বাদ রামপ্রসাদ পায় না; কারণ, আশীর্ব্বাদ উচ্চারণের সময় ঠাকুরের নাই।

গোবিন্দ ঠাকুর দেশে ছিলেন না প্রায় দশ বৎসর, থাকিলে বোধ হয় রামপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর পূর্ব্ব সম্পর্কে বিপর্য্যয় ঘটিত না।

দশ বৎসর অনুপস্থিতির পর হঠাৎ একদিন গেরুয়া বস্ত্র, নামাবলী, রুদ্রাক্ষের মালা, রক্তচন্দনের ফোঁটা, মসৃণ মুখমণ্ডল আর দীর্ঘ পিঙ্গল কেশদাম লইয়া তিনি আবির্ভূত হইতেই ক্ষুদ্র রামপ্রসাদ চমকিত আর ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া পূর্ব্বের সম্পর্ক বিস্মৃত হইয়া গেল, তাঁহাকে সম্বোধন করিল 'খুড়োঠাকুর' বলিয়া, আর সাষ্টাঙ্গে ভূপতিত হইয়া তাঁর পদধূলি নিল, তারপর ঠাকুরের সম্মুখে সে সন্ত্রস্ত হইয়া রহিল।

গোবিন্দ হাসিয়া উঠিলেন।

কিন্তু তিনি এখন হাসেন না; তবে রামপ্রসাদকে তিনি ভালবাসেন।

গোবিন্দ আসেন, বসেন, উঠিয়া যান; কোন দিন কিছু বলেন, কোনদিন বাক্য ব্যয় করেন না।

যে দিন তিনি বাক্যব্যয় করেন না, সেদিন রামপ্রসাদ চতুর্গুণ স্তম্ভিত হইয়া যায়; তার মনে হয় ঠাকুর 'মায়ে'র কথা দিবা-নিশিই ভাবিতেছেন, ওর মতো কালীভক্ত আর নাই।

কিন্তু দীনবন্ধু আর সাবিত্রী অত তলাইয়া বুঝিতে পারে না, তাহারা গোবিন্দের গা বাহিয়া ওঠে।

রামপ্রসাদের স্ত্রীর মৃত্যুর পর মাস ছয়েক পরে পায়ের ধূলা দিবার পর গোবিন্দ একদিন রামপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার শরীর ত' ভাল নেই, রাম, অসুখ করেছে ?

রামপ্রসাদ প্রসাদী কলিকাটা হাতে লইয়া বলিল, করেছে খুড়ো-ঠাকুর, আজ তিন দিন এমনি হ'য়েই আছে। বলিয়া কলিকা টানিল না, নামাইয়া রাখিল, তামাকের ধোঁয়ার গন্ধ ভাল লাগিতেছে না।

গোবিন্দ বলিলেন, গায়ে কাপড় জড়িয়েছ দেখেই আমি সেই ভয়ই করেছিলাম। —তোর দৌড়ে এসে আমার পায়ের ধুলো নেবার কি দরকার ছিল ? তামাক সাজতেই বা কে তোকে বললে ? বলিয়া অসন্তোষের জ্বালায় অস্থির হইয়া গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মাথার নামাবলীর পাগরী একটানে খুলিয়া ফেলিলেন।

রাম কথা কহিল না।

তিন ক্রোশ মাঠ ভাঙ্গিয়া গোবিন্দ সবেমাত্র উপস্থিত হইয়াছেন, পায়ে ধুলো যথেষ্টই ছিল, সসন্তান রামপ্রসাদ আঁচড়াইয়া যাহা তুলিয়া লইয়াছে তাহা সামান্য।

পায়ের ধুলার উপর আঙুলের চিহ্নের দিকে চাহিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, আশীর্ব্বাদ করছি তোর শরীর সেরে উঠুক। কাঁপছিস যে ?

এই তাঁর রামপ্রসাদকে প্রথম আশীর্ব্বাদ।

কিন্তু ব্যর্থ।

দোকানের আঙিনা পর্য্যন্ত হাঁটিয়া আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিবার এবং তামাকু প্রস্তুতের শ্রমেই বোধ হয় রামপ্রসাদ কাঁপিতেছিল।

গোবিন্দ উঠিয়া আসিয়া তার কপালে হাত দিলেন, দেখিলেন, অত্যন্ত গরম !

জিজ্ঞাসা করিলেন, শুবি ?

রামপ্রসাদ বলিল, হু !

গোবিন্দ তাহাকে ধরিয়া লইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন।

রামপ্রসাদ বলিল, পাশে বুকে ব্যথা আছে, খুড়ো-ঠাকুর।

গোবিন্দ কথা কহিলেন না।

কাঁথা দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিয়া কহিলেন, দীনু যাও ত' ভাই, সেই নতুন ডাক্তার বাবুর কাছে ; তাঁকে ডেকে আন।

রামপ্রসাদ বলিল, ডাক্তার ডাকবেন, খুড়ো-ঠাকুর ?

—ডাকব বই কি। টাকা আমি দেব।

দীনু প্রস্থান করিল।

গোবিন্দ বলিলেন, সাবিত্রী, তোমার বাবার পায় হাত বুলিয়ে দাও।

সাবিত্রী হাত বুলাইতে লাগিল।

বাখারির বেঞ্চির উপর বসিয়া গোবিন্দ ডাক্তারের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অগ্রজের মৃত্যুর পর নিত্যপদকে গ্রামে আসিয়া বসিতে হইল। দুই বৎসর পূর্ব্বে সে ডাক্তারী ডিগ্রী লইয়া মহকুমাসহর নৃপেন্দ্রনগরে প্র্যাকটিস করিতে সুরু করিয়াছিল, অল্পে অল্পে হাতযশ ছড়াইয়া পসার জমিয়া আসিতেছিল, এমন সময় একদিন তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু ঘটিল।

সত্যপদ বহুদিন হইতেই অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছিল, তাহার দরুণ রক্তাল্পতা জন্মিয়া যখন সে অনুজের সঙ্গে কলিকাতায় গেল তখন সে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী এবং ব্যাধি চিকিৎসার বাহিরে গেছে। সত্যপদ নিজের রোগ সম্বন্ধেও নিজের মতামত এবং চিকিৎসা আর পথ্য সম্বন্ধেও নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকেই অপরাজেয় করিয়া রাখিত, তাহার মৃত্যুর পরে লোকে বলিল, তাহার অকালমৃত্যুর কারণ সে নিজে।

ওরা ভূস্বামী, কিন্তু প্রকাণ্ড কিছু নয়, আবার তুচ্ছও নয়। শুনা যায়, দেখিয়া শুনিয়া চালাইতে পারিলে এবং চলিতে জানিলে, অর্থাৎ হিসাবী হইলে, খরচ বাদে বৎসরে মবলক আঠার শত টাকা অক্লেশে ঘরে ওঠে। সুতরাং ভূরিপ্রসবা ভূমিজননীকে আশ্রয় করাই বেশী নিরাপদ এবং লাভজনক হইবে মনে করিয়া এবং হিতৈষিগণের পরামর্শে নিত্যপদ নৃপেন্দ্রনগর ত্যাগ করিয়া দেশে আসিয়া বসিল।

অধিকাংশ পল্লীর যেমন, এই বেতভাঙা গ্রামেও তেমনি বাহিরে শস্যক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া গেছে; আর চারিদিকের বনানীর বেষ্টন যেন গ্রামের গায়ের উপর ঝুঁকিয়া আছে।

নদীর দুই তীরে আবাদী ক্ষেত্র; নদীর তীর হইতে গ্রামের ভিতরে প্রবেশ-পথ সহসা ভাল করিয়া চোখে পড়ে না, কিন্তু প্রবেশের পথ আছে, এবং প্রবেশ করিলে মানুষেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; তাহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া বসবাস করিতেছে তাহাও খুঁজিলেই চোখে পড়ে।

নিত্যপদ এখানকার অধুনালুপ্ত পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ করিলেও গুরু মহাশয় তাহার বিদ্যা শেষ করিয়া তাহাকে বিদ্যাদান করিবার সুযোগ পান নাই, তার পূর্ব্বেই সে নৃপেন্দ্রনগরের হাইস্কুলে যাইয়া ভর্ত্তি হইয়াছিল। তারপর প্রবেশিকার পর কলেজে প্রবেশ এবং তারপর মেডিক্যাল কলেজ।

সুতরাং দেশটা বিদেশই থাকিয়া গেছে। ছুটিতে যাওয়া আসা করিলেও তখন চারিদিকে চাহিয়া দেখিবার কথা তার যেন মনেই হয় নাই, কেবল গৃহের আনন্দটা পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করিয়া সে চলিয়া যাইত।

কিন্তু এখন চিরদিনের মতো বাস করিতে আসিয়াছে বলিয়া চিরবাসভূমির চতুর্দ্দিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইতেই যেন সে চোখ খুলিল এবং যাহা চোখে পড়িল তাহাতে তাহার আনন্দের সীমা রহিল না।

মানুষের পরস্পরে যেমন হৃদয়ে-হৃদয়ে প্রীতির বন্ধন, মুখে-মুখে আত্মীয়তার আহ্বান, তেমনি সোহাগভরেই মানুষ যেন আপন সম্পত্তি পরের দুয়ার পর্য্যন্ত

বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে, গৃহও তেমনি অবারিত, দুয়ারে অর্গল দিয়া দুয়ারের মাথায় কেহ 'প্রবেশ-নিষেধ' বিজ্ঞপ্তি লিখিয়া দেয় নাই, আমার গাছের ফল তোমার ভোগ্য, আমার গৃহে তোমার আসন পাতাই রহিয়াছে।

নিত্যপদ মোহিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, লক্ষ্মী যে বৈকুণ্ঠবাসিনী তাহার প্রমাণ আমাদের পল্লী প্রকৃতি আর পল্লীবাসীর প্রকৃতি।

সহরে এমন নয়—

সেখানে প্রত্যেকটি ভূখণ্ড চিহ্নিত করা, একজনের মাটির অংশ, গাছের ফল আর একজন গ্রহণ করিবে ইহারই বিরুদ্ধে সহরের কঠিন সতর্কতা, চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া পরস্বলোলুপতাকে সে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে—মনে হয়, পরের জিনিষের প্রতি লোলুপতা সহরের পক্ষে লজ্জার কথা নহে; এবং তস্করের লোভকে স্পষ্টস্বরে বাধা দেওয়ায় তার চক্ষুলজ্জা নাই, সহর সংকীর্ণহৃদয়, সন্দেহে উগ্র, পল্লী উদার, দানে মুক্তহস্ত।

কিন্তু অনুসন্ধান করিলেই নিত্যপদ জানিতে পারিত যে, ব্যাপার ঠিক তাহাই নহে; সম্পত্তির জ্ঞানে আর অধিকার রক্ষায় এ গ্রামের যে-কেহ সহরের যে-কেহ হইতে খাটো নহে, বুদ্ধিতে, কৌশলে, প্রতারণায়, জবরদস্তিতে, অর্থাৎ সময়োপযোগী আচরণে ইহারাও সিদ্ধহস্ত। কাহার সীমানা কোথায় শেষ হইয়াছে, কাহার কতটা প্রাপ্য, সহরের লোকের চাইতে এখানে তাহা কেউ কম জানে না। চৌহদ্দির সীমারেখা পুরুষ হইতে পুরুষান্তরের মনে দাগ কাটিয়া নামিয়া আসিয়াছে বলিয়া তাহা প্রাচীর অপেক্ষা দুর্লঙ্ঘ্য, প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থান যেখানে রহিয়াছে সেখানেই সে নিস্পৃহ কিন্তু জমির সীমানা বাড়াইয়া লইতে সে লাঠিও আনিতে জানে। এখানেও পরস্বলোলুপ তস্কর দুষ্প্রাপ্য নহে। কোনটি কাহার বাগান, কোন গাছের আম 'কাঁচা-মিঠে' অথবা বর্ণচোরা, কাহার গাছের কাঁটাল পাকেই না, ইঁচড়েই খাইয়া ফেলিতে হয়, ইত্যাদি বিষয় বালক-বালিকাও জানে, আরো জানে, কাহার গাছের ফল বলিয়া লইতে হয়, কাহার গাছের ফল 'না বলিয়া' না লইলে পাওয়া যায় না; তাদের বাপ-মা তাদের তা শিখাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, সময়ের অভাবে এদিকটা নিত্যপদর অজ্ঞাত রহিবে।

বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মীর এই কমনীয় অঞ্চলতল আশ্রয় করিয়া নিত্যপদ কায়েমী হইয়া বসিল।

নিত্যই নূতন ব্যাধির আবিষ্কার হইতেছে, দূরে সমুদ্রতীরে বসিয়া শ্বেতাঙ্গ ঋষি মানবের কল্যাণ কামনায় জীবনব্যাপী সুকঠোর তপস্যা সুরু করিয়া দিয়াছেন। পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়া ব্যাধিমুক্তির সুনিশ্চিত পন্থা আবিষ্কার করিতেছেন, তাঁহার অটুট ধৈর্য্য, অনন্ত একাগ্রতা, অপার জ্ঞান।

পুরাতন জানাশুনা রোগেরও কত না সুচিন্তিত ঔষধ, নব নব চিকিৎসা-পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইতেছে। জ্ঞানের যে স্রোত অবিরাম পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে বহিয়া চলিয়াছে, বিদ্যার্থী নিত্যপদর এমন অভ্যাস নয় যে কেবল তার তীরে সে চক্ষু মুদিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে।

সুতরাং সে পড়ে—

পূর্ব্বাহ্নে সে পড়িতেছিল, এমন সময় তাহাকে অভিনন্দিত করিতে এবং তাহার দাদার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিতে স্বার্থনিরপেক্ষ কয়েক ব্যক্তি তাহার বৈঠকখানার বারান্দায় আসিয়া উঠিলেন।

নিত্যপদর কানে পৌঁছিল, কে যেন বলিতেছেন, 'আহা, বড় ভালো লোক আর কাজের লোক ছিল এই ডাক্তারবাবুর দাদা।'

—তা আর বলতে। বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি খুক্ খুক্ করিয়া কাসিলেন।

নিত্যপদ পূর্ব্বেই চটির আওয়াজ পাইয়াছিল, এখন গলার আওয়াজ শুনিল, ইঁহারা যে সম্ভ্রান্ত গ্রামবাসী সে বিষয়ে নিত্যপদর সন্দেহ রহিল না।

বাড়ীতে লোক আসিলে আগন্তুকের পদধূলি গৃহে পতিত হইল বলিয়া পবিত্র আর অনুগৃহীত হওয়া একটি সুন্দর ভাব-ভূয়িষ্ঠ গার্হস্থ্য নীতি।

নিত্যপদ ইঁহাদের দরজার সম্মুখে দেখিয়া বই ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিল, যজ্ঞোপবীত দেখিয়া দলের দু'জনকে প্রণাম করিল, মুখে-চোখে কত আনন্দ প্রকাশ করিয়া আর কত কৃতার্থ হইয়া যে সে তাঁহাদের ফরাসে তুলিয়া বসাইল—তাহার ইয়ত্তা নাই।

বসিয়া যজ্ঞেশ্বর বলিলেন, পড়ছিলে? বেশ, বেশ। জ্ঞান হচ্ছে তরবারীর মতো, যত চর্চ্চা করবে তত উজ্জ্বল থাকবে। নয় কি? বলিয়া নিত্যপদর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার অনুমোদন প্রার্থনা করিলেন।

নিত্যপদ বলিল, আজ্ঞে, হ্যাঁ।

তারপরই বাক্যব্যয়ের পথ উন্মুক্ত হইয়া গেল, নিত্যপদ অবিলম্বেই দেখিল, জনমত ইহাই যে, তাহার দাদা সত্যপদর অভাবে গ্রামের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পরিণাম নিরূপিত হওয়া দুষ্কর, পূর্ণ হওয়া দূরের কথা। এবং এই মতই যখন জ্ঞান-গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, তখন নিত্যপদর একটি নিঃশ্বাস পড়িল। ভাইয়ে-ভাইয়ে ভাব ছিল। নিত্যপদ পত্রে দাদার সংবাদ পাইত বটে, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব কত বড় ছিল তাহা সে অনুভব কি অনুমান করিতে পারে নাই।

নিত্যপদের নিঃশ্বাসের সমান্তরালে একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাখনলাল বলিলেন, তুমিও দাদারই ভাই; কিন্তু তোমাকে ত' আমরা তার মতো অত বেশী করে পাব না।

মতিলাল চক্রবর্ত্তী বলিলেন, হ্যাঁ, ওঁর ব্যবসা রয়েছে।

নিত্যপদ বলিল, ডাক্তারী করব বলে ত' আমি আসি নাই।

—কিন্তু চর্চ্চা রাখতে হবে ত'। অতবড় একটা বিদ্যে কত কষ্টে শেখা। পড়লে শুধু হবে না; এ হাতে-কলমের কাজ, ব্যবহার না করলে পড়া-বিদ্যে মরুভূমির মতো মিথ্যে, যত বিস্তৃতই হোক, তাতে ফসল ফলান যায় না। যাতে ফল নাই তা মিথ্যে নয় ত' কি? বলিয়া মতিলাল হাত উল্টাইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে নিষ্ফল যা তা নিষ্ফলই।

ধ্বজাধারী মতিলালের পাশেই ছিলেন। বলিলেন, চর্চ্চার অভাবে শিক্ষা মাটি হবে, এ কি কেউ চায়? তোমাকে তা করতে আমরা দিলে ত'—বলিয়া তিনি নিত্যপদর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, যেন মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলেই মানুষকে কথায় বাধ্য করা যায়।

নিত্যপদ চাহনির বিনিময়ে একটু হাসিল।

চন্দ্রনাথ ছিলেন ধ্বজাধারীর বাঁ দিকে; তিনি বলিলেন, তুমি ছাড়তে চাইলেও লোকে তোমাকে ছাড়বে না। এখানকার লোকগুলো ত' কুচিকিৎসাতেই ম'ল। আর সেদিন নাই যে লোকে কেবল হামবড়া বক্তৃতায় ভুলবে। বলিয়া তিনি যেন কাহারো উদ্দেশে ভ্রূভঙ্গী করিলেন।

চন্দ্রনাথের কথার সারবত্তা সকলেই স্বীকার করিলেন।

বিরূপাক্ষ ভুরু তুলিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন, আলস্যের প্রশ্রয় দিও না, ভাই, কদাচ দিও না, মানুষের অমন শত্রু আর নাই। যা-ই বিছানায় পড়েছ তাকিয়া নিয়ে, অমনি কুচিন্তা এসে মাথায় ঢুকবে। বলিয়া তিনি বাঁ হাতের পাঁচটি আঙ্গুল জড়ো করিয়া ছাড়িয়া দিলেন, তারপর বলিলেন, এ আমি পড়েছি, নিজেও জানি।

নিত্যপদর বৈঠকখানার ফরাসের উপর, অর্থাৎ উঁহারা যেখানে বসিয়া আছেন, সেইখানেই, চারিটা তাকিয়া যথার্থ ছিল, ব্যবস্থাটা নূতন নয়, পুরণো আমলের।

সেইদিকে চাহিয়া নিত্যপদ পুনরায় একটু হাসিল, বলিল, অলস আমি নই। আর আলস্য করবার সময় কি পাবো?

মতিলাল প্রশ্ন করিলেন, কেন পাবে না?

—জমি-জায়গা—

—তোমার গোমস্তাটি অদ্বিতীয় পাকা লোক।

—তবে আমি এখানে এলাম কেন?

—তারি ওপর নজর রাখতে। স্বার্থ নষ্ট করবার লোক তোমার যেমন আছে, স্বার্থ রক্ষার লোকও তেমনি আছে, কিন্তু তুমি চোখের ওপর না থাকলে শেষের দল নির্ব্বিকার থাকবে।

নিত্যপদ কিয়ৎক্ষণ কি যেন ভাবিল। বলিল, ও। গ্রামে কি অসুখ বিসুখ খুব হয়?

চন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, হয় বললে কম বলা হয়। জিজ্ঞাসা করো, বারমাসই কি লাগাই থাকে? মাঝে মাঝে দমকা আসে, লাগাও থাকে। নূতন পুরাতনে মিশিয়ে ডাক্তারের খোরাক এক রকম বারমাসই থাকে। বলিয়া তিনি এমন তৃপ্তির ভাব ধারণ করিলেন যেন পাল্লা দিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া ডাক্তারের সম্মুখে পরম লোভনীয় সামগ্রীটি তিনিই সর্ব্বাগ্রে তুলিয়া ধরিতে পারিয়াছেন।

মাখনলাল মতিলালের দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সেখানে কেমন হত?

নিত্যপদ বলিল, হত মন্দ না।

—রেবু কত? শ'?

—প্রায়।

—কত ক'রে ভিজিট নিতে?

—রুগী বিশেষে, দুই চার আট।

—বটে! কি রে?

একটি বালক আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মাখনলাল তাহাকেই প্রশ্ন করিলেন,

সকলের সঙ্গে নিত্যপদও চাহিয়া দেখিল, বালকটির মুখের বিষণ্ণতা অতি গভীর, সে যে বিপন্ন, তাহার মুখ দেখিয়া তাহা না বুঝিবার উপায় নাই।

মতিলাল বলিলেন, কি খবর, দীনু? তারপর নিত্যপদর সঙ্গে দীনুর পরিচয় করাইয়া দিলেন; বলিলেন, আমাদের হাটের ওপর ও-র বাবা রামপ্রসাদের মুদিখানার দোকান আছে, অল্পজীবী লোক। ছেলেটার মা নেই। তারপর কি মনে করে, দীনু?

দীনু বলিল, বাবার বড় অসুখ করেছে। বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

নিত্যপদ স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, উঠে এস খোকা। উঠে এসে তোমার খবর কি বলো।

দীনু উঠিয়া আসিল, কিন্তু নূতন খবর কিছুই বলিতে পারিল না; বলিল, বাবার অসুখ করেছে; শুয়ে আছে, গোবিন্দ দা-ঠাকুর সেখানে আছেন। তিনিই আপনাকে ডাকতে বললেন।

নিত্যপদ ছেলেটিকে লক্ষ্য করিল, লাল পেড়ে একখানি ময়লা কাপড় পরণে রহিয়াছে, চেহারায় কোন বিশেষত্ব নাই. মনে হয় না যে ছেলেটা বুদ্ধিমান, কিন্তু বাপের জন্য তার এই কাতরতা নিত্যপদর সম্বিতে একটা আলোড়ন তুলিল।

ওদিকে চন্দ্রনাথ বন্ধুগণের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, তাঁহার চাহনির ও হাসির মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আর যাঁহারা ছিলেন তাঁহারাও সুখভরে অল্প অল্প হাসিতে লাগিলেন, তার মানে এই যে, উহাদের সকলেরই ভবিষ্যদ্বাণী এবং অন্তরের ইচ্ছা সঙ্গে সঙ্গে সত্যস্বরূপ পরমপুরুষের অন্তরে যাইয়া ঘা দিয়া তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছে, রোগীর বাড়ী হইতে ডাক আসিয়াছে।

—তা হ'লে আপনারা বসুন, আমি রোগীকে দেখে আসি। হানিফ, এঁদের তামাক দাও। বলিয়া নিত্যপদ উঠিয়া পড়িল।

তামাকের বিরাম অবশ্যই ছিল না।

পুনরায় নূতন ছিলিমের আশায় উঁহারা বসিয়া রহিলেন, এবং নিত্যপদর তৎপরতা, সদিচ্ছা আর পরোপকারে প্রবৃত্তি দেখিয়া উঁহাদের সন্তোষের অবধি রহিল না।

শ্মশানের দিকেই একটা সুস্পষ্ট আর শক্তিশালী ইঙ্গিত যাঁহাদের চোখের সম্মুখে অহরহই দুর্ব্বার হইয়া ফুটিয়া আছে, তাঁহাদের পক্ষে এই লোকটি বড় আশার কথা, যমালয় আর অদৃষ্টের বিরুদ্ধে এত বড় একটা উদ্যমী পুরুষকার দাঁড়াইলে 'কচি কাঁচা' লইয়াও দুশ্চিন্তা যে থাকেই না, সে আবার ইচ্ছুক। কিন্তু টাকার কথাটা ভুলিলে চলিবে না।

বিরূপাক্ষ বলিলেন, এস, ভাই; আমরাও তামাকটা খেয়েই উঠি। তোমাকে পেয়ে আমরা বড় সুখী হয়েছি।

বিরূপাক্ষ ব্রাহ্মণ; নিত্যপদ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল, এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন সবাই।

নিত্যপদ বাড়ীর ভিতর গেল, জামা পরিয়া আসিল। আলমারী খুলিয়া জ্বর আর বুক পরীক্ষার যন্ত্র বাহির করিয়া লইয়া বলিল, এস, খোকা।

বলিয়া লাফাইয়া নামিল।

দীনু তাহাকে পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিল।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থামিয়া শ্রুত এবং দৃষ্ট ব্যাপারের যন্ত্র-গন্ধ মনে মনে অনুধাবন করিবার পর মাখনলাল হিসাব করিয়া বলিলেন, নিত্যপদ ছেলেটি ভাল। দাদার স্বভাব কতক পেয়েছে।

মতিলাল বলিলেন, হুঁ। বলিয়া দু'বার হুঁকা টানিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, একশ টাকা মাসে পেত। সে ত' অনেক হে!

বিরূপাক্ষ বলিলেন, আমাদের কিছু বাদছাদ দিয়ে নিতে হবে; কারণ, আমরা জানি ত'! একদরে বিক্রয় বড় বিরল! বলিয়া অভিজ্ঞতার আনন্দে অন্যমনস্ক হইয়া তিনি হাত বাড়াইয়া হুঁকা লইতে গেলেন, কিন্তু পাইলেন না, মতিলালের তখনও শেষ হয় নাই।

চন্দ্রনাথ বলিলেন, রুগী বিশেষে দুই চার আট টাকা ভিজিট নিত বললে! বলিয়া সংশয় আর শঙ্কা মিশ্রিত একটা দৃষ্টিতে মতিলালের মুখনিঃসৃত ধোঁয়া আর চিন্তামুদিত চক্ষুর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

গ্রামের মধ্যে মতিলাল বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাত।

বিরূপাক্ষ বলিলেন, নইলে মোটের উপর একশো টাকায় দাঁড়ায় কেমন করে? সেটা ভাবো।

মতিলাল হঠাৎ বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু আমরা কিছু দেব না। বলিয়া তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি তুলিয়াই রাখিলেন।

দিবার ইচ্ছা চন্দ্রনাথেরও নাই, মাখনলাল, বিরূপাক্ষ প্রভৃতিরও না দিবারই ইচ্ছা; তাই না-দিবার কাজে মতিলালকে অগ্রণী দেখিয়া তাঁহাকে আরও যাচাই করিয়া লওয়া আবশ্যক বলিয়া উঁহাদের মনে হইল।

সকলেই মতিলালকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, অই! দেবে না কি রকম?

—দেব না।

মতিলালের কণ্ঠস্বরে ভয়ংকর দৃঢ়তা দেখিয়া উঁহারা আশ্বস্ত হইয়া ভাবিলেন, না দিবার অকাট্য কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বিরূপাক্ষ তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবে না কেমন করে শুনি?

বিরূপাক্ষের নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া মতিলাল হাস্য করিতে লাগিলেন, আদায় করিবার কায়দাই ভাবিয়া বাহির করিতে হয়, না দিবার আবার উপায় কি?

মতিলাল বলিলেন, দেব না। বলব, দেব না হে! ব্যস—বলিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে বিরূপাক্ষের হাতে হুঁকা দিয়া মতিলাল বলিলেন, কলকেয় কিছু নেই, ওঠো!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ডাক্তার রামপ্রসাদের দোকান ঘরের অর্থাৎ গৃহের সম্মুখে আসিয়া থামিল, দীনবন্ধু গোবিন্দকে বাহিরে না দেখিয়া ভিতরে খবর দিতে গেল, ডাক্তারবাবু আসিয়াছেন।

হাটের দিনে নিত্যপদ এদিকে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তখন রামপ্রসাদের দোকানখানাকে বা বিশেষ কিছুকেই বিশেষভাবে সে লক্ষ্য করে নাই। লোকজনের ঠেলাঠেলি, কলরব, দরদস্তুর, ক্রেতা-বিক্রেতায় এবং দোকনদারে-পাওনাদারে টানাটানির দৃশ্যগুলি সকৌতুক দৃষ্টিতে দেখিয়া আর তারল্যের সহিত উপভোগ করিয়াই সে বাড়ী ফিরিয়াছিল।

স্থানটা মোটামুটি কি রকম তাহাই দেখিতে নিত্যপদ অনুসন্ধিৎসু ; দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে নেত্রপাত করিল; লোকের উদ্দীপ্ত কোলাহল আর দু' একটি ব্যগ্রগতির স্মৃতিটাই মনে জাগ্রত ছিল, ইহার এখনকার নির্জনতা এবং নীরবতা অর্থাৎ নির্ব্বাপিত অবস্থাটা যেন ভাল লাগিল না। সবগুলি দোকানেরই মুখ বন্ধ, মেঘলা দিনের আকাশের যেমন চেহারা হয়, স্থানটা ব্যাপিয়া তেমনি একটা গাঢ়-তর বিমর্ষতা যেন বিরাজ করিতেছে, লৌহকারের দোকানের সম্মুখে পোড়া কয়লা রাশীকৃত করা আছে, সেই অঙ্গার-স্তূপের পাশে বসিয়া কয়েকটি লোক একটি সজ্জিত কলিকা লইয়া আড্ডা জমাইয়াছে মনে হইল।

যেন কিছু খবর লইতে চায় এমনিভাবে সে তাকাইয়া আছে দেখিয়া দলের দু'জন সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

দীনুর মুখে খবর পাইয়া গোবিন্দ ঠাকুর বাহির হইয়া আসিলেন ; বলিলেন, আসুন, রোগী এদিকে আছে। মন্দিরে মাথা হেঁট করে ঢুকতে হবে ডাক্তারবাবু। বলিয়া নিত্যপদর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

চলিতে চলিতেই নিত্যপদ দেখিল, দোকান খুব ছোট অর্থাৎ পণ্যসম্ভার স্বল্প, কিন্তু ঘরখানা ছোট নয়। যাতায়াতের পথ রাখিয়া লম্বালম্বি বেড়া দিয়া ঘরখানাকে তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে, প্রথম ভাগে দোকান, দ্বিতীয় ভাগে গুদাম, তৃতীয় ভাগ শয়নকক্ষ। রান্না যেখানে হয়, সে স্থানটা তাহার চোখে পড়িল না ; কিন্তু শয়নকক্ষও পার হইয়া উঠানে নামিলে তার চোখে পড়িত যে রান্নাঘর না আছে এমন নয়। গৃহ প্রস্তুতের উপকরণ হিসাবে কাষ্ঠ আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই, সর্ব্বত্রই বাঁশের ঝাঁপের বন্দোবস্ত। রান্নাঘরেও তাই, তবে সে ঘরখানা আরো একটু উন্নত এই হিসাবে যে, তাহার দু-পাশের এবং পিছনের বেড়া নামিয়া পড়িয়াছে, চালের এবং বেড়ার মাঝখানে আট আঙ্গুল ফাঁকের স্থলে দেড় হাত ফাঁক রহিয়াছে।

মাঝের কক্ষটা অর্থাৎ গুদাম পার হইবার সময় খৈনী তামাক এবং চিটা গুড়ের গন্ধ নিত্যপদর নাকে গেল।

প্রায়-অন্ধকার অনেকটা স্থান অতিক্রম করিয়া রোগীর কাছে পৌঁছিয়া নিত্যপদ

যেন নিজের অবস্থাটা বুঝিয়া লইতেই খানিক থমকিয়া রহিল। প্রবেশ করিয়াছিল মাথা হেঁট করিয়া, কিন্তু তার হেঁট মাথা এখানে আসিয়া আরও হেঁট করিতে হইল, চাল এদিকে ঢালু হইয়া নামিয়াছে।

দীর্ঘতনু ডাক্তারের মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার উপায়াভাব তত মারাত্মক নয়, গোবিন্দের আদেশে দীনু তাড়াতাড়ি মোড়া আনিয়া দিল, নিত্যপদ তাহাতে বসিয়া মাথা তুলিতে পারিল, কিন্তু রোগী যেখানে অবস্থান করিতেছে, সে স্থানটাকে মনে মনে সে সহ্য করিতে পারিল না, মাটি শুধু স্যাঁৎসেতে নয়, রীতিমত কাদা, আঙ্গুলের চাপে গর্ত্ত হইয়া যায়।

তক্তপোষের উপর রোগী শুইয়া আছে, কিন্তু মৃত্তিকা হইতে উঠিয়া শীতল বাষ্প যে রোগীর দেহে প্রবেশ করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কোথা হইতে একটা গুরুভার সোঁদা গন্ধ আসিয়া এই স্থানটাতে বিশ্রী হইয়া জমিয়া আছে, গুড়ের আর খৈনী তামাকের উগ্র গন্ধ তাহাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই।

এই তার এখানকার প্রথম রোগী, বিশেষ যত্ন করিয়াই সে পরীক্ষা করিল।

বাহিরে আসিয়া সে বাঁশের বেঞ্চির উপর বসিল, মেটে দোয়াত হইতে খাগের কলমে 'সিহাই' কালি তুলিয়া তুলিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া সে লাল কাগজে ব্যবস্থাপত্র লিখিল।

কিন্তু কাগজখানা গোবিন্দ ঠাকুরের হাতে দিবার পূর্ব্বে নিত্যপদ বলিল, দেখুন, রোগীর রোগ কঠিন, নিউমোনিয়া হয়েছে, বিশেষ যত্নের দরকার। রোগীকে স্থানান্তরে নিয়ে বিছানাটা বদলান যায় না?

গোবিন্দ বলিলেন, না, যা হবার ঐখানেই ঐ বিছানার ওপরেই হবে, আর নাই।

—শুশ্রূষা করবার কে আছে?

—এই ছেলেটি আর এই মেয়েটি। বলিয়া গোবিন্দ ঠাকুর যথাক্রমে দীনবন্ধু আর সাবিত্রীকে দেখাইয়া দিলেন।

দীনবন্ধুকে নিত্যপদ আগেই দেখিয়াছিল।

সাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া সে আরও ব্যথিত হইল। শরীরে, মনে, সজ্জায়, স্বাস্থ্যে ইহাদের কোথাও প্রফুল্লতা নাই, এই বয়সে যে চাঞ্চল্য চোখে-মুখে খেলা করে তাহা যেন অসময়ের অতি তীক্ষ্ণ শীতের বাতাসে জড়সড় হইয়া গেছে, মানুষের বৃদ্ধির স্বাভাবিক অনুপাতে ইহারা বাড়িয়া উঠিতেছে না।

নিত্যপদ যেন চোখের জলই চাপিয়া গেল, বলিল,—আপনি?

গোবিন্দ উত্তর করিলেন, আমি পর; তবে আমিও থাকব!

—থাকবেন। বলিয়া নিত্যপদ উঠিল। বলিল,—মালিশের ওষুধ আর খাবার ওষুধ আছে, গোলমাল হয়ে না যায়; মালিশের ওষুধটা ভয়ংকর বিষ। ডাক্তারখানা থেকেই একটা চিহ্ন করে আনা হয় যেন, দেখেই চেনা যায়।—বলিয়া সে ব্যবস্থাপত্র গোবিন্দের হাতে দিল।

—আপনার ফিস। বলিয়া গোবিন্দঠাকুর দু'টি টাকা ডাক্তারকে দিতে গেলেন। কিন্তু নিত্যপদ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

রোগীর যে অবস্থা সে এইমাত্র দেখিয়া আসিয়াছে, তাহা দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের;

যে সাগরের মন্থনের পর অতল হইতে ঐ দুটি রজতমুদ্রা তাহাদের হাতে আসিয়াছে অপরিমেয় আকারে তাহা তাহার সম্মুখে এখনও বিস্তৃত রহিয়াছে।

ছেলেটির আর মেয়েটির ভয়ার্ত্ত চক্ষুর দিকে চাহিয়া আর রোগীর পরিণাম সম্ভাবনা স্মরণ করিয়া সে হাত বাড়াইতে পারিল না।

কিন্তু এখানকার এই প্রথম রোগী অর্থাৎ ব্যবসায়ের যাত্রা, যাত্রার সময় শুভ অশুভ নিয়মটা পালন করা দরকার, বউনিতেই বাকি পড়া কি ভাল।

এই দ্বিধার মুহূর্ত্তে সাবিত্রী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, বাবা বাঁচবে ত' ?

নিত্যপদ সস্নেহে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিল, বাঁচবে। তোমরা যত্ন ক'রো কিন্তু খুব, তারপর গোবিন্দ ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, টাকা দু'-টি এখন রাখুন। বলিয়া সে চলিতে সুরু করিল।

গোবিন্দ তাহার সঙ্গে যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওষুধ আনতে পাঠিয়ে দি ?

—দিন ! আমার কাছে ওষুধ নেই। কিন্তু মালিশেরটা যেন ভুলে খাইয়ে দে'য়া না হয়। তা হলে বাঁচান যাবে না।

গোবিন্দ তাহাকে ভরসা দিলেন, আমি নিজে দেখে খাওয়াব।

নিত্যপদ বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, তাহার পৃষ্ঠপোষক হিতৈষিগণ হুঁকা রাখিয়া প্রস্থান করিয়াছেন এবং বিশ-বাইশ বছরের একটি গৌরবর্ণ ছেলে তাহাদের বৈঠক-খানার বারান্দায় বেঞ্চির একধারে বসিয়া আছে।

সত্যপদের কন্যা খুকী তার কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল, দুজনে বোধ হয় গল্প করিতেছিল।

নিত্যপদকে দেখিয়া খুকী বলিয়া উঠিল, ঐ যে কাকা এসেছে।

মুখ ফিরাইয়া তাহাকে দেখিয়াই ছেলেটি শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর একরকম দৌড়াইয়া নামিয়াই তাহার পায়ের ধুলা লইল, নিত্যপদর বাধা মানিল না।

নিত্যপদ তাহার পিঠের উপর হাত রাখিয়া বলিল, আসুন আসুন, আপনার যদি যাবার তাড়াতাড়ি না থাকে তবে বসিগে চলুন।

ছেলেটি কৃতার্থ হইয়া গেল ; বলিল, না, আমার যাবার তাড়াতাড়ি নেই।

—খুকী, দু'কাপ চা করতে বলে এস।

খুকীর তাহাতে আপত্তি ছিল, বলিল,—এখন চা খাবে, কাকা ? রান্না যে প্রায় হ'য়ে গেছে।

—তা হোক, তুমি বলো গিয়ে।

খুকী লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল।

উভয়ে বেঞ্চিতে বসিল, বসিয়া ছেলেটি নিজের পরিচয় দিল, বলিল, আমি আপনার অচেনা, কিন্তু আপনাদের সবাইকে আমি চিনি। আপনার দাদার আমি প্রিয়পাত্রই ছিলাম, তাঁর থিয়েটারের ভারি সখ ছিল, সে বিষয়ে আমার উপর তিনি খুব নির্ভর করতেন।

—তাই নাকি ! বলিয়া নিত্যপদ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল,

নিত্যপদর মনে হইল, বেতভাঙা গ্রামের সখের থিয়েটারে সুন্দরী নায়িকার ভূমিকায় ইহাকে বেমানান হয় না।

—সে ত' বাইরের কথা ; তা ছাড়া আমার বাবা ছিলেন আপনাদের পারিবারিক চিকিৎসক ; কিন্তু আমি চিরকাল মুর্খ হয়ে গেলাম। আমার নাম কান্তিভূষণ সরকার। বলিয়া কান্তিভূষণ বোধ করি নিজের চিরস্থায়ী মুর্খত্বের অনুশোচনায় একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

নিত্যপদ বুঝিল ঠিকই, ছেলেটি বুঝাইতে চায় যে, তাহার পিতা গ্রাম্য ডাক্তার ছিলেন বলিয়াই অশিক্ষিত ডাক্তার ছিলেন না, বলিল, আপনার মুখের চেহারা থেকে মনে হচ্ছে তাঁকে আমি দেখেছি।

—নিশ্চয়ই দেখেছেন। বলিয়া পিতৃগৌরবে উৎসাহিত হইয়া কান্তিভূষণ বলিতে লাগিল, বাবার কাছে আমি ডাক্তারী শিখি নাই বটে, সে শিক্ষার জন্যে যে ভাষা-জ্ঞানের দরকার তা-ই আমার নাই, কিন্তু প্রেসক্রপসন বুঝতে আর ওষুধ চিনতে আমি শিখেছি।

নিত্যপদ বলিল, সেটাও সামান্য গুণ নয়, শিক্ষা আপনার কাজে লাগবে।

কান্তিভূষণ একটু হাসিল, বলিল, সে আপনার অনুগ্রহ। তারপর বলিল, শিক্ষা কাজে লাগাতে আমি ইচ্ছুক ; কিন্তু সুযোগ যা পেয়েছি তা অকিঞ্চিতকর। আমি কম্পাউন্ডারীই করি, ফণী-ডাক্তারের।

ফণী-ডাক্তারের বিদ্যা-বুদ্ধি অভিজ্ঞতা গুণগ্রাম সম্বন্ধে নিত্যপদর কিছুই জ্ঞান নাই, তবু সে উৎসাহ দিল। বলিল, 'বেশ ; সুদক্ষ কম্পাউন্ডারের দাম আছে।'

—কিন্তু দাম পাবার জন্যে না হোক, শেখাবার ইচ্ছাতেই আমি লাইনটা ধরে আছি। যে ডাক্তারের কাছে আমি এখন কাজ শিখছি, তিনি ডাক্তার কেমন তা আমি বলতে পারিনে, কারণ তাঁর বিদ্যার কম-বেশী ধরবার সাধ্যই আমার নেই ; কিন্তু তিনি আমাকে দিয়ে যে কাজ করান শাস্ত্রচর্চা তাকে বলা চলে না। তা ভাল নয় ; আমার শেখবার পক্ষেও নয়, লোকের রোগের পক্ষেও নয়।

নিত্যপদ উদগ্রীব হইল ! জিজ্ঞাসা করিল, মানে ?

—ওষুধ তাঁর কিছুই নেই ; কাজেই তিনি রোগীর চিকিৎসা যা করেন, তা—

শেষ না করিয়াই কান্তিভূষণ থামিয়া গেল।

—কি হয় তার ?

কান্তির মনে হইতেছিল, সে বুঝি নিমকহারামী করিতেছে—একটু সময় লইয়া বলিল, কেবল জলের জোরে, অর্থাৎ স্বভাবের নিয়মে যদি সারে ত' সারে, তা নইলে সারে না।

নিত্যপদ শিহরিয়া উঠিয়া বড় বড় চোখে কান্তিভূষণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল, ওষুধের দাম তিনি নেন ?

—সঙ্গে সঙ্গেই নেন না যদি প্রেসক্রপ্সন না হয়। হালখাতা করে বৎসরান্তে কিছু কিছু আদায় করেন এবং তা-ই যথেষ্ট।

—নগদ দাম কি রকম নেন ?

—দাগ প্রতি দু আনা দশ পয়সা পর্যন্ত।

নিত্যপদ তার রোগীর কথা মনে করিয়া চিন্তাকুল হইয়া উঠিল।

কান্তিভূষণ বলিতে লাগিল, আপনি ওষুধ-পত্তর কিছু আনেননি, শুনেছি। যদি আনবার কল্পনা থাকে তবে আপনার কাছে আমি কাজ শিখব, এই প্রার্থনা এখনই জানিয়ে রাখতে এসেছি।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দ থাকিয়া নিত্যপদ বলিল, সাধারণতঃ কোন কোন ওষুধের দরকার এদিকে হয়, তা আপনার বোধ হয় জানা আছে। অবসর মতো একটা ফর্দ যদি করে আনেন তবে এক আলমারী ওষুধ আমি আনাতে পারি।

—'আনব।' বলিয়া আনন্দের আবেগে কান্তিভূষণ বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া দাঁড়াইল ; বলিতে লাগিল, অবসর আমার এত যে তাকে কোথায় রাখব, কি দিয়ে ভরব ভেবে পাইনে। বাবা যে-সব ওষুধ রাখতেন তার ফর্দও আমি খুঁজলেই পাব। তিনি তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতায় অনেক কিছুই জানতেন।

—ভালই হবে। আমার যা দরকার আমি তা ফর্দে যোগ করে দেব।

অদূরে অতি সাবধানে পা ফেলিয়া খুকী চা লইয়া আসিতেছে দেখা গেল।

কান্তিভূষণ গদগদ হইয়া উঠিল, বলিল, কিন্তু আপনি যেন মনে করবেন না আমি পারিশ্রমিকের লোভ রাখি, এই দয়াটুকু করবেন, সে লোভ আমার নেই, আমি কেবল শিখতে—

দীনবন্ধু একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

উভয়েই দেখিল, তাহার চোখের জল চোখের পাতায় তখনও রহিয়াছে, এবং বাঁ গালের ত্বকের উপর তিনটি আঙুলের দাগ লাল হইয়া ফুটিয়া আছে।

কান্তিভূষণ প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে দীনু ?

দীনু জবাবে যে বিবরণ প্রদান করিল তাহা এই যে, এই ডাক্তারবাবু যে টাকা দু'টি গ্রহণ না করিয়া গোবিন্দঠাকুরকে ফেরৎ দিয়াছিলেন, সে তাহারই একটি টাকা ভাঙাইয়া আট আনার পয়সা লইয়া ফণী-ডাক্তারের ঔষধালয়ে ঔষধ আনিতে গিয়াছিল। ফণী ঔষধ দিয়াছিল ; কিন্তু সে দাম চাহিয়া বসিল দেড় টাকা। গোবিন্দঠাকুর ঔষধ লইয়া শীঘ্রই ফিরিতে বলিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া এবং পিতার অসুখের দরুণ উৎকণ্ঠাবশতঃ "বাবা টাকা পরে দেবে" বলিয়া আট আনার পয়সা রাখিয়া দিয়া ঔষধ লইয়া সে ছুটিতে আরম্ভ করিলে, ফণী-ডাক্তার তাহার পশ্চাদ্ধাবনকরতঃ ঔষধের শিশি দুইটিই ছিনাইয়া লইয়াছে, গালি দিয়াছে এবং গালে চপেটাঘাত করিয়াছে।

ঘটনার কথা শেষ করিয়া দীনু নূতন করিয়া ফুঁপাইতে লাগিল।

বালকের সজলকণ্ঠের কাহিনী উভয়ে নির্ব্বাক হইয়া শুনিল।

কান্তিভূষণ নিত্যপদর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে।

নিত্যপদের অন্তঃকরণ স্নিগ্ধ চিরকাল।

তাহার মনে হইল, ইহার অধিক নির্ম্মমতা আর নির্য্যাতন মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়, কিন্তু সে জানে না যে, অলক্ষ্মীর সদ্যদৃষ্ট রূপখানা তার মনের সম্মুখে এখন দেদীপ্যমান রহিয়াছে বলিয়াই এই সাধারণ নিত্যশ্রুত গল্পটিকে তার এত বীভৎস মনে হইতেছে।

ত্যাগের দ্বারা আহরিত অনুকম্পার আনন্দ সে বহন করিতেছিল—তাই

নিত্যপদর মনে হইল, এই প্রহারে সে নিজে জর্জরিত হইয়া গেছে, বালকের গণ্ডের ঐ তিনটি রক্তরেখা তাহারই লাঞ্ছিত অন্তরাত্মার রক্তবমন।

কান্তিভূষণ জিজ্ঞাসা করিল, আগেকার কিছু পাবে না কি রে ?

দীনু বলিল, তাই বললে, এবারকার হালখাতায় বাবা গিয়ে আট আনা দিয়ে এসেছিল ত'।

—চলো, শুনে আসি তিনি কি বলেন। বলিয়া নিত্যপদ হঠাৎ উঠিয়া পড়িল।

খুকী ইত্যবসরে হাতের কাছে চা আনিয়া দিয়াছে ; সেদিকে দৃক্‌পাত করিবার অবসর তাহার হইল না।

কান্তিভূষণ অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, আমি ও'রই কম্পাউণ্ডার, তবু চলুন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দীনুকে এবং আরো কয়েকটি রোগীকে বিভিন্ন কৌশলে বিদায় করিয়া ফণী ডাক্তার অন্তঃপুরে গিয়াছিল, সেখান হইতে পানের খিলি এবং গানের কলি মুখে লইয়া সে রান্নাঘরের দুয়ার হইতে ডিস্‌পেন্সিং রুমের উদ্দেশে রওনা হইল।

পান দিলেন তার স্ত্রী বিজয়া।

গান অবশ্য তার নিজের, যদিও রচনা দ্বিতীয় ব্যক্তির এবং সুরসংযোগ তৃতীয় ব্যক্তির, তবু গান তার নিজেরই, তারই কণ্ঠসমুদ্‌গত বলিয়া।

গানের কলিটি এই ; "অতি ক্লান্ত নয়ন তব, সুন্দরি"।

বিরহে কাঁদিয়া হোক, কি মিলনোল্লাসেই হোক কবি-কথিতা সে সুন্দরীর বিভাবরী জাগরণে কাটিয়াছে এবং চক্ষু ক্লান্ত দেখাইতেছে—তাহার সম্বন্ধে কৌতূহল কি তাহার প্রতি স্পৃহা বা দরদ ফণীর নাই, তবে সুরটি ভাল।

যেন অপর্য্যাপ্ত অবসর তাহার সম্মুখে এমনি গা দুলাইয়া ধীরে-সুস্থে ফণী বাহিরে আসিল ; একগাল পানের পিক ডিস্‌পেন্সিং রুমের মাটি-লেপা বেড়ার গায়ে নিক্ষেপ করিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, একটি স্ত্রীলোক একটি ছেলেকে কোলের উপর আঁচল ঢাকা দিয়া রুমের বারান্দায় বসিয়া আছে। সম্মুখে একটি আট আউন্স শিশি।

স্ত্রীলোকটির চোখে জাগরণের ক্লান্তি ছিল, কিন্তু তাহা অতিশয় বাস্তব জিনিষ, এবং কল্পনা করা কঠিন নয়, সে-ক্লান্তি রোগীর শিয়র হইতে আহরিত।

রোগী দেখিয়া ফণী ডাক্তার হুংকার ছাড়িল, জগা, আর এক ঘটি জল আনু বাইরে।

এই হুংকারগুলি অত্যন্ত কাজের। ফণী ডাক্তারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, উহাতে তাহার স্ত্রী প্রভৃতি অন্তঃপুরিকাগণের কর্ত্তব্যের দিকে দৃষ্টি পড়ে,

এবং রোগীগণের প্লীহা প্রভৃতি যন্ত্রগুলি চমকিয়া গুটাইয়া যায়। অধীত বিদ্যার উপর এই অভিজ্ঞতার প্রয়োগে মৃত্যুকে পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত করা গেছে, অর্থাৎ যমের তাড়না রোগীকে ভিতরে ভিতরে যতই অস্থির করুক, ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার বাহিরে প্রকাশ থাকে না।

পরিষ্কার কূপোদকের ব্যয়ের পরিমাণ দেখিয়া যদি সন্দেহ করিবার প্রয়োজন না হয়, তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ফণী ডাক্তারের পসারের শেষ নাই। ডাক্তারের 'জগা' নামক কিশোর পুত্রটি ভিতর হইতে কেবলি "এ্যাকোয়া" সরবরাহ করিতেছে, এবং তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইতে বিলম্ব হইতেছে না, তবে পিতলের ঘটি হইতে কাচের শিশিতে প্রবেশ করিবার পথে উদকের বর্ণের স্বাদের গন্ধের ও গুণের পরিবর্ত্তন নিশ্চয়ই ঘটিতেছে, নতুবা এক সময়ে তাহার মূল্য দিতে হইবে জানিয়াও এবং চাখিতে পাইয়াও লোকে তাহা একবার নয়, দু'বার নয়, ঘন ঘনই লইবে কেন!

ফণী ডাক্তার চেয়ারে জাঁকাইয়া বসিল, এই ক্ষুদ্র ঘরে যেন তার গুরুত্ব ধরিতেছে না। তার ডান দিকে দু'টি কাচের আলমারী, কাচ আবৃত করিয়া সবুজ কাপড়ের পর্দ্দা ঝুলিতেছে, সবুজ রং চোখের ক্লান্তি অপহারক; তা ছাড়া ঐ পর্দ্দা, পর্দ্দার কাজও করিতেছে, ভিতরস্থ আলমারীর ভিতরস্থ ঔষধের শিশির সংখ্যা গণনা করিবার উপায় নাই; এবং শিশিতে ও বোতলে ঔষধ আছে কি-না, আর কাগজের ঠোলগুলির ভিতর আদৌ শিশি আছে কি-না তাহা প্রশ্ন করিবার সুযোগ নাই, বাঁ দিকে একখানা চারপায়া পাতা, তাহার উপর সতরঞ্চি বিছান নাই, জড়ো করা রহিয়াছে। পিছনে সেলফ্, বেড়ার গায়ে ঝুলিতেছে, তাহার উপর ভয়াবহ আকারের আরকের কয়েকটি শিশি এবং অস্ত্রের ব্যাগ দেখা যাইতেছে, কিন্তু অস্ত্র-গুলি এখন কোথায় তাহার উদ্দেশ নাই, তবে রান্না-ঘরের চালে যে কাঁচিখানা রহিয়াছে এবং যাহা দিয়া এখন লণ্ঠনের ফিতা কাটা হয় তাহা পূর্ব্বে এই ব্যাগেই ছিল বলিয়া ফণীর মনে পড়ে।

ঘরখানি নূতন তৈরী হইয়াছে, দরজা বসিয়াছে, কিন্তু জানালা এখনও বসান হয় নাই, মিস্ত্রীর বাড়ীতেই তাহা আছে বলিয়া প্রকাশ।

যাহা হউক, জগা ঘটিতে করিয়া সের আড়াই জল দিয়া গেল।

টেবিলের উপর কনুই চাপিয়া ফণী জিজ্ঞাসা করিল, কেমন ছিল তোমার ছেলে রাত্তিরটা?

স্ত্রীলোকটি বলিল, 'পেট গেল, পেট গেল" করেছে সারারাত, তারপর ভোরবেলা একবার দাস্ত হয়ে তবে একটু ঘুমোয় ছেলে, জ্বর আছেই। বলিয়া স্ত্রীলোকটি ছেলের শুষ্ক চুলগুলির ভিতর অঙ্গুলি চালনা বন্ধ করিয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া উত্তাপ অনুভব করিল।

ফণী বলিল, হুঁ। যেন তাহার অনুমান আর উহার বিবরণ মিলিয়া গেছে। তারপর ঘরের সম্মুখের উঠানের ওদিকে ভগ্ন প্রাচীরের যে ইষ্টক স্তূপ রহিয়াছে তাহারই দিকে সে দুই মুহূর্ত্ত ভ্রূভঙ্গী করিয়া চাহিয়া রহিল, অসংখ্য ঔষধের মধ্যে কোনটি প্রয়োগ করা যাইবে যেন তাহাই সে চিন্তা করিতেছে, কিন্তু ঔষধ ভাবিয়া লইতে ভাল ডাক্তারের দুই মুহূর্ত্তের বেশী সময় লাগে না।

বলিল, শিশি দাও। কান্তের আসতে দেরী হবে বলে গেছে, কত যে তার বাজে কাজ। 'তোর বাবা কেমন আছে রে?' বলিয়া ফণী স্ত্রীলোকটির হাত হইতে শিশি লইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল।

নূতন আগন্তুক ছেলেটা বলিল, ভাল আছে; জ্বর নাই। পায়ের তলায় ব্যথা আছে বললে।

—বনে বাদাড়ে বেড়ায়, কাঁটা ফুটে আছে, খুঁজে দেখিস্, শিশি দে।

শিশি দু'টি লইয়া ফণী পর্দ্দার আড়ালে গেল, রঙিন "এ্যাকোয়া" দিয়া দুই জনকে বিদায় করিতে তার দেড় মিনিটের বেশী সময় লাগিল না।

—নিতাই যে, এস। ভাল?

গামছাখানা পাতিয়া বসিয়া নিতাই বলিল, আজ্ঞে না, ভাল আর কই। আমেই বুঝি আমাকে নেয়! বলিতে বলিতেই নিতাইয়ের কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, সত্যপদবাবুর ভাই বড় ডাক্তার হ'য়ে এসেছেন শুনলাম, যদি অনুমতি করেন তবে তাঁকে একবার দেখাই। বলিয়া নিতাই অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত হইয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিল, এবং ফণী ভুরু তুলিয়া চাহিয়া রহিল নিতাইয়ের দিকে।

ফণীর মুখের কথা শেষ হইল না, একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল, শিশু যেমন কান্না গেলে, তেমনি অকাতরে আর অকস্মাৎ ফণী ডাক্তার এত ক্রোধ একটি ঢোকে গিলিয়া ফেলিল, তার চোখে পড়িয়াছে, স্ত্রীলোকটি কাঁধের উপর হইতে আঁচলের খুট টানিয়া লইয়াছে, এবং গিঁটের আয়তন দেখিয়া মনে হইতেছে, গিঁটের অভ্যন্তরে যে বস্তুটি রহিয়াছে তাহা পয়সা নিশ্চয়ই নয়, আধুলি।

ক্রোধাগ্নির উপর জলধারা বর্ষিত হইল।

ফণী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, কিছু মনে করো না, হরির মা; আমার হাতে রাখতে তোমার ভয় হতে পারে বলে আমি মনে করিনে। রোগ ত' গায়ের ময়লা কাপড় নয় যে ইচ্ছে হ'ল ত' ছেড়ে ফেললাম, তা নইলে গায়েই রইল। আয়, দেখি। বলিয়া ফণী ছেলেটিকে সস্নেহ আহ্বানে কাছে লইল, অদৃশ্য আর দুষ্টবুদ্ধি প্লীহাকে শাসন করিতে সে দুই চক্ষুর দৃষ্টি মর্ম্মভেদী করিয়া তুলিয়াছে, এমন সময় একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে নিত্যপদ ঘটনাস্থলে পেঁাছিয়া গেল, কান্তি ও দীনু তাহার সঙ্গে।

অবাধ্য প্লীহা তখনকার মতো ছাড়া পাইল।

ফণী রোগীর হাত ছাড়িয়া দিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, নিত্যপদ বিদ্যার উপরওয়ালা এবং ধনে মহত্তর ত' বটেই।

[illegible] বলিল, আসুন, আসুন।

আতিথেয়তা প্রত্যাখ্যান করা হইতেছে ইহা নিত্যপদর মনেই হইল না, সে আসিল বটে, কিন্তু বসিল না, জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এই ছেলেটাকে চড়িয়ে দিয়েছেন শুনলাম। শুনলাম কি আঙ্গুলের দাগই রয়েছে, কাজটা কি ভাল হয়েছে? বলিয়া সে ভৎর্সনার দৃষ্টিতে ফণী ডাক্তারের দিকে চাহিয়া রহিল।

ফণী ডাক্তার বুঝিল, বড় ডাক্তার বলিতে চান যে কাজটা উচিত হয় নাই;

কিন্তু কাজের ঔচিত্য অনৌচিত্যর কৈফিয়ৎ দিবার পূর্ব্বে সহসা টেবিলের উপর হইতে দীনুকে দেওয়া এবং তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া ঔষধের শিশি দুটি উঠাইয়া লইয়া ফণী বাহিরে চলিয়া গেল, এবং একটা কলুকলু আওয়াজে বুঝা গেল, ঔষধের শিশি উজাড় করিয়া সে বোধ হয় ধূলার উপরেই ঢালিতেছে।

খালি শিশি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া ফণী কৈফিয়ৎ দিল; বলিল, কি বলছিলেন? চড়িয়ে দিয়েছি? দিয়েছি ত' দিয়েছি।

কথায় যে তাচ্ছিল্য ফুটিল ভদ্রসমাজে তাহার স্থান নাই।

নিত্যপদ লাল হইয়া উঠিল।

কান্তিভূষণ পূর্ব্ব-পরিচয়ের সাহসে অগ্রসর হইয়া বলিল, উনি বলতে চান, ওষুধ না দিলেও ত' পারতেন, মেরে বসা ঠিক হয়নি।

ফণী উত্তরে বলিল, হয়নি না কি? তারপর ওই দু'জনকে ডিঙাইয়া সে সম্বোধন করিল দীনুকে; হাসিয়া বলিল, ওরে দীনু, ওপর আদালতে যা; এ-আদালতের "জুষ্টিকেশন্" নেই। বলিয়া সে সন্ত্রস্ত রোগীকে কাছে টানিয়া লইয়া অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে প্লীহা পরীক্ষায় মন দিল, যেন এই লোকগুলির সঙ্গে কারবার তার এ জন্মের মতো চুকিয়া গেছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে নিত্যপদর একটু মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেছে।

এই ঔষধালয় দেখিয়া তার হুঁস হইয়াছে যে, ঔষধ বলিতে এই বেতভাঙা গ্রামে যে বস্তু বুঝাক তাহা কেবল এই ঔষধালয়েই প্রাপ্তব্য—ডাক্তার এই ঔষধ দিয়া কর্ত্তব্য করে, রোগী এই ঔষধ সেবন করিয়াই সন্তুষ্ট।

দীনবন্ধুর দিকে সে একবার চাহিল।

তারপর কান্তিভূষণকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া দিয়া নিত্যপদ ফণীর চেয়ারে বসিল, "মণি-ব্যাগ" খুলিয়া দু'টি টাকা টেবিলের উপর রাখিল, এবং অত্যন্ত কুণ্ঠিতস্বরে বলিল, ফণীবাবু, আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। বলিয়া নিত্যপদ বালকটির প্লীহার উপর হইতে ফণিভূষণের হাত টানিয়া লইয়া ধরিয়া রাখিল, কিন্তু ফণী তাহার দিকে চোখ তুলিল না।

নিত্যপদ বলিল, আমায় ক্ষমা করেছেন বলুন, নতুবা আমি হাত ছাড়ব না। আমার মন বড় কু। যদি বলেন, এমন কাজ আর করব না বলে নাকে খৎ দাও, তাতেই আমি রাজি আছি।

ও-পক্ষ সত্যই নাকে খৎ দিতেছে কি না দেখিতে মুখ তুলিয়া ফণীর চোখে পড়িল টাকা দু'টি, আগে ছিল না, এখন রহিয়াছে, এবং তখন ফণীর মনে হইল, নিত্যপদ ছেলেমানুষ, আবোলতাবোল বকিতেছে, কিন্তু ফল হইল ভাল—ফণী উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, বলিল,—ক্ষেপেছেন না পাগল হয়েছেন। ছাড়ুন, ছাড়ুন, হাত ছাড়ুন, আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। ক্ষমার কি আছে?

নিত্যপদ হাত ছাড়িয়া দিল এবং ভাব হইয়া গেল।

দীনু ঔষধ লইয়া প্রস্থান করিল, কি দেওয়া হইল তাহা নিত্যপদ প্রশ্ন করিল না কি দেখিতে চাহিল না, এক নিমেষেই তার চৈতন্য হইয়াছে যে, অদৃষ্টকে সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত করিয়া তাহার মাথায় সংসারের যাবতীয় জঞ্জাল চাপাইয়া দিয়া

পথ চলিলে সে প্রতিবাদ করে না, অনিবার্য্য এবং অটল হয়তো অনেকে আছেন; কিন্তু নিঃশব্দে কেবল সে-ই।

ফণী প্রথমে টাকা লইতে চাহিল না, ঘোরতর প্রতিবাদ করিল—শেষে টাকা পকেটে রাখিয়া ফণী কান্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হ'ল কোথায়?

কান্তি বলিল, রাস্তায়। এখানেই আসছিলাম, মিতু চৌকিদার তাদের অসুখের কথা তুলে দাঁড় করাল এমন সময় দেখি, দীনুর সঙ্গে উনি আসছেন। ও'র সঙ্গেই চলে এলাম।

শুনিয়া নিত্যপদ অধিকতর অবাক হইয়া চলিয়া আসিল, ক্ষমা চাহিয়া আসিল, ক্ষমা করিয়া আসিল, যাওয়ার নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল এবং আসার নিমন্ত্রণ লইয়া আসিল। কিন্তু তার দুঃখ ঘুচিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এই ঝঞ্ঝাটেই যেন আগামী অশুভের ছায়া, নিত্যপদ এই ঘটনায় রুখিয়া উঠিয়া নিজেই প্রচুর অর্থ ব্যয় করিল; কিন্তু তাহার প্রাণপণ জিদ এবং বিপুল চেষ্টা সত্ত্বেও রামপ্রসাদ বাঁচিল না।

তার দোকানের দুয়ার কিছুদিনের জন্য বন্ধ হইল।

গোবিন্দ বলিলেন, আমি বেরুলাম টাকার যোগাড়ে। দেখ ত' তার বাবার বাক্স খুলে কিছু আছে কি না।

বাক্সের ভিতর হইতে পাঁচ টাকা সাড়ে সাত আনা বাহির হইল।

গোবিন্দ বলিলেন, ঐ দিয়ে ক'দিন পেট চালা। দোকান খুলিসনে। বলিয়া তিনি নামাবলী মাথায় জড়াইয়া তখনই উধাও হইলেন।

পিতৃশোকে ভাই-ভগিনীর কান্নাকাটির কথা না বলিলেও চলে, সেটা আসল কথা নয়; আর মৃত্যু মানুষের নিজের ইচ্ছাধীন বা অপরের আকাঙ্ক্ষা সাপেক্ষ নহে—যাহা স্বেচ্ছাধীন এবং আকাঙ্ক্ষা সাপেক্ষ রামপ্রসাদের মৃত্যুতে তাহাই চক্ষুলজ্জার আবরণ ত্যাগ করিয়া প্রবল হইয়া উঠিল। দীনুদের এই দুর্দিনে তাহাদের শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া সবাই সৎপরামর্শ দিল যত, তাহাদের আগুলাইবার কেহ নাই দেখিয়া ফাঁকি দিল তার ঢের বেশী। তাহাদের প্রাপ্য পয়সা আগবাড়াইয়া কেহ দিতে আসিল না। খাতায় হিসাব উঠিত না; অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, সজ্ঞান অপরাধের সাজা কঠিনতর জানিয়াও রামপ্রসাদের এই কাঁচা কাজের সুযোগ ত্যাগ করিলেন না।

পরামর্শ যেন অক্রেয়, এমনি গুরুত্বের সহিত বহু হিতৈষী দীনুকে বুঝাইয়া বলিল, "শ্রাদ্ধে বিশেষ খরচ করিসনে, দীনু।" দীনুর যেন সেই সঙ্গতি, আর বে-আড়া খরচ করিবার জন্য সে যেন উন্মুখ হইয়া আছে।

এদিকে কোনো চাষীর ঘরে আঁখের গুড় আছে কি-না সন্ধান করিতে আসিয়া শ্রীকান্ত ঠাকুর দীনবন্ধুকে ডাকিয়া বাহির করিলেন।

বলিলেন, একটু তামাক সাজ্ আর একটা কথা শোন।

তামাকের সঙ্গে যে গভীর বিষয়ের আলোচনার, জনক আর সন্তানের মতো পারম্পর্যের গৌণমুখ্য আপেক্ষিক সম্বন্ধ আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিশেষতঃ মাইলখানেক হাঁটিয়া আসিয়া যদি বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, তবে ঐ আপেক্ষিক সম্বন্ধটি আরও নিবিড় হইয়া উঠে।

দীনু তামাক সাজিয়া দিল এবং কথা শুনিতে দাঁড়াইল।

শ্রীকান্ত একবার হুঁকার উপর হইতে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কদিন হ'ল ?

দীনু বলিল, সাতদিন।

—ক'টা দিন দেখতে দেখতে বেরিয়ে যাবে। লোক খাওয়ানোর দরকার নাই, গরীবের সাদাসিদে শ্রাদ্ধ হবে। পুরুতকে নিয়ে তিনটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করালেই তোর হাজার ষোড়শের ফল হবে। বলিয়া খানিক হুঁকা টানিয়া শ্রীকান্ত পুনরায় বলিলেন, তিনটি ব্রাহ্মণ, ধর পুরোহিত এক।

বলিয়া শ্রীকান্ত ঠাকুর কথা বলা এবং হুঁকা টানা বন্ধ করিয়া একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন ; কিন্তু তাঁর নিশ্চেষ্টতা দেখা গেল বাহিরে, ভিতরে তিনি আর দুটি ব্রাহ্মণের নামের জন্য ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতেছিলেন, কিন্তু হুঁকার ছিদ্রটির দিকে চক্ষু দুটি প্রাণপণে নিবিষ্ট করিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ত্রিভুবনে আর দুটি ব্রাহ্মণ বুঝি নাই।

কিন্তু দীনু জানিত পুরোহিত ছাড়া আরো ব্রাহ্মণ এই গ্রামেই আছেন।

বলিল, আর আপনি আছেন।

শুনিয়া শ্রীকান্ত নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। একটিকে পাওয়া গেছে, এখন আর একটিকে আবিষ্কার করা দরকার।

হাসিয়া বলিলেন, আমি ত' আছিই রে। আর একটি।

কিন্তু এবার ত্রিভুবন ভ্রমণ করিলে চলিবে না, গুড়ের সন্ধানে যাইতে হইবে।

সুতরাং অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়াই আর একটি নাম পাওয়া গেল, শ্রীকান্ত বলিলেন, বসন্তকে বললেও চলবে।

বসন্ত শ্রীকান্তের ভাই।

শ্রাদ্ধের তেইশ দিন পূর্ব্বেই এই বন্দোবস্ত হইয়া রহিল, শ্রাদ্ধ সম্পর্কে যত প্রকারের দুশ্চিন্তা দীনুকে পীড়িত করিতেছিল তাহার মধ্যে ভোজন করাইবার জন্য ব্রাহ্মণ পাওয়াও একটি, শ্রীকান্তের তুমুল চেষ্টায় দীনুর এই দুশ্চিন্তাটা ঘুচিল।

কিন্তু সাবিত্রীকে লইয়া দীনবন্ধু সংকটে পড়িয়া গেছে, সে খাইতে চায় না আর অবিরাম কাঁদে।

দীনুর আদরে তার কান্না থামিল বটে, কিন্তু মুখে হাসি ফুটিল না।

সে নদীর ধারে ছুটিয়া যায়, স্বল্পপ্রসর নদীর ওপারের দিকে চাহিয়া থাকে, জলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়া একটি খেজুর গাছের তলদেশে ধোতাবশিষ্ট অঙ্গার আর

ভস্ম রহিয়াছে—আধ-পোড়া কাঁচা বাঁশ আর ভাঙ্গা কলসী একটি ছাইয়ের উপর পড়িয়া আছে।

সাবিত্রীর মন আর খেলা চায় না।

কেহ ডাকিয়া কিছু শুধাইলেই পরের আদরে, যেন ঠাণ্ডা হাওয়ায় মেঘ ভাঙিয়া, তার চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে।

যাহারা ঢের দেখিয়াছে তাহারা তাহাকে বুঝায়, "মানুষ চিরদিন কেহ বাঁচিয়া থাকে না।"

কিন্তু সাবিত্রী সংসারের অতটুকুও দেখে নাই; চোখে অনন্ত একটা ব্যাকুল জিজ্ঞাসা লইয়া সে মানুষের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, কেহ অশ্রু গোপন করিতে সরিয়া যায়, কেউ বা বুঝিতে পারে না।

সাবিত্রীর মনে পড়ে, তার বাবাও তার মায়ের কথায় ঐ কথাই বলিতেন।

সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করে; "আমি কেন বেঁচে আছি?"

প্রশ্নটা অদ্ভুত মনে হয়—সেই বহুদূরবর্ত্তীর সন্ধান করিতে এ ছুটিবে কেন! শিশু যে! "কেন বাঁচিয়া আছি" ইহা সমস্যা নহে; অন্তরের নিগূঢ় ধ্বনির মৌখিক প্রতিধ্বনি ইহা কাহারও নহে। বাঁচিয়া থাকা সহজ নহে কেন, নির্ব্বিঘ্ন নিশ্চিন্ত নহে কেন, ইহাই ভাবনা হইয়া আছে; যথেষ্ট নীরব নহে কেন, এই প্রশ্ন করিয়াও কেহ হয়তো দাঁড়াইয়াছেন; সুপ্রচুর আর যথেচ্ছ স্বপ্ন দিয়া এ-জীবন পূর্ণ নহে কেন, ইহাও কাহারো না কাহারো প্রশ্ন আর সমাধানের বিষয় হইয়া আছে।

মানুষ চিরদিন 'খণ্ড-কপালে'—মৃত্যুর মতো একটা সমগ্রতা আর সমাপ্তির চিন্তা আসিলে সে প্রমাদ গণে।

"কেন বাঁচিয়া আছি?"—এ প্রশ্ন যেমন নূতন তেমনি কপট।

লোকে হাসে; বলে, সময় না হ'লে কেউ যায় না রে।

সময়টা জানা থাকিলে হিত কি অহিত হইত তাহা লোকে ভাবেও নাই; তবু বলে, সময়টা জানি না তাই ত' দুঃখ।

সাবিত্রী আর প্রশ্ন করে না।

দীনবন্ধুদের অশৌচান্তের কাল প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে—গোবিন্দ ঠাকুরও ফিরিয়াছেন।

আকাশে যেমন নক্ষত্র, নামাবলীর গায়ে যেমন হরিনাম, পয়সা তেমনি পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গের উপর ছিটাইয়া আছে; বুদ্ধি খরচ করিয়া এবং সহিষ্ণুতা সহকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহা সংগ্রহ করিতে হয়, এই কৌশল যেদিন মস্তিষ্কে ফুটিয়াছে সেইদিন হইতে গোবিন্দ ঠাকুর ত্রিকালজ্ঞ সাজিয়াছেন, বাছা বাছা মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ তাঁর চোখের সম্মুখে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, কেবল দৃষ্টিশক্তি আর বর্ণন-নৈপুণ্যের উপর তার সিদ্ধি-অসিদ্ধি নির্ভর করে।

তাঁহার মাদুলী কবচ আর তাবিজের শক্তি অনুভব করিয়া অনেকেই রোমাঞ্চিত হইয়াছে, আরো অনেকে হইবে, অর্থাৎ অদৃষ্ট কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতের সংখ্যা আরো বাড়িবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন।

যাহা হউক, যে গাছ জন্মে নাই তাহারই ফল আহরণ করিয়া দিয়া ফলের

মূল্য লইয়া অর্থাৎ মানুষের ভবিষ্যৎ কহিয়া দক্ষিণা লইয়া গোবিন্দ ফিরিলেন. সাবিত্রী সঙ্গী পাইয়া গেল, গোবিন্দ ঠাকুরের কাছে সে ভাল থাকে।

গোবিন্দ তাহাকে কোলের ভিতর টানিয়া লন; বলেন, তোমার বাবা সুখে আছেন; আমরা কি করছি না করছি তিনি তা দেখতে পাচ্ছেন।

সাবিত্রী মাথা তুলিয়া বলে, দেখতে পাচ্ছেন?

—পাচ্ছেন বৈ কি।

—আমরা কেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি নে?

—আমাদের মতো এই রকম শরীর ত' তাঁর নেই। তিনি দেখতে পান, কিন্তু দেখা দিতে পারেন না, কথা শোনাতেও পারেন না।

—মা?

—তিনিও তাই।

শুনিয়া সাবিত্রী চুপ করিয়া থাকে।

বাবার আর মায়ের দেহ চোখের সামনে ছাই হইয়া গেছে তাহা তাহার মনে থাকে না, অদৃশ্য থাকিয়া তাঁহারা দেখিতে ও শুনিতে পাইতেছেন শুনিয়া সাবিত্রীর মন ভাল লাগে, কাছেই তাঁহারা রহিয়াছেন, কেবল তাঁহাদের চোখে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু—

আলো সরিয়া যায়—

সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করে, তাঁরা ত' আমাদের মানুষ করতে পারেন না।

বাপের চোখের উপর থাকিয়া মায়ের হাতে মানুষ হইবার এই বুভুক্ষা দেখিয়া গোবিন্দের চোখে যেন জল আসিতে চায়, তিনিও আপনা আপনি মানুষ হইয়াছিলেন।

বলেন, নদীর জল এইবার শুকোচ্ছে। বলিয়া তিনি জলে নামিয়া যে লোকটা হাঁটু পর্যন্ত কাদা মাখিয়া উঠিয়াছে, তাহারই দিকে চাহিয়া থাকেন।

সাবিত্রীও তাহার দিকে চাহিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলে।

পুরোহিত যে ফর্দ করিয়া দিয়াছিলেন তদনুসারে আয়োজন করিলে দীনুর পিতার শ্রাদ্ধে যে পরিমাণ অর্থব্যয় হইত তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মতো নয়; কাজেই গোবিন্দঠাকুর ফর্দখানাকেই হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া স্বকৃত ফর্দ অনুসারে আয়োজন করিয়া দিলেন।

এবং তাহা দেখিয়া পুরোহিতের হিতাকাঙ্ক্ষা লোপ পাইয়া গেল, যৎসামান্য প্রাপ্তি আর অতি তুচ্ছ যা-তা আয়োজন দেখিয়া কাহারো প্রতি আর তাঁর বিন্দুমাত্র সহিষ্ণুতা রহিল না।

শ্রাদ্ধকারী যজমানকে 'ছোটলোক' এবং 'শূদ্র' বলিয়া গালি দিয়া রাগতভাবে তিনি এত অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতে লাগিলেন যে, হাটের মালিক স্বয়ং শ্রীমন্ত মজুমদার মহাশয় কি করিবেন তাহার দিশা না পাইয়া বাড়ী হইতে নিজের অম্বুরী তামাক খানিকটা আনিয়া ব্রাহ্মণের সেবার্থে প্রদান করিলেন।

কলাপাতায় দিব্য একটি নল পাকাইয়া হুঁকার মুখে বসাইয়া তাঁহাকে দেওয়া হইল।

কিন্তু অত অল্পে ঠাকুর মহাশয় বঞ্চনার বেদনা বিস্মৃত হইলেন না, গন্ধ পাইয়াই কলিকা সমেত হুঁকা ফেরৎ দিলেন ; বলিলেন, রাজবাড়ীর এ-তামাক আর এখানে খাব না। বলিয়া মুখ বক্র করিয়া হুঁকার বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

দিন ছিল বটে আগে। একটি শ্রাদ্ধের পৌরোহিত্য করিতে পারিলেই এক গাড়ী জিনিস সঙ্গে করিয়া আনা যাইত, ভূমি বা তন্মূল্য হইতে পালঙ্ক পর্যন্ত, পালঙ্ক বা তন্মূল্য হইতে পাদুকা পর্যন্ত, তদুপরি বসনে তৈজসে দানে দক্ষিণায় ব্রাহ্মণভক্তি ঝক্ ঝক্ করিত—এবং তাহারই ছটায় পিতৃলোক পুলকিত হইয়া পিণ্ড গ্রহণ করিতে অবতরণ করিতেন, তখন লোকে পুরোহিতকে তুষ্ট করিতে দুগ্ধবতী গাভী আর স্ত্রীর অলঙ্কার বেচিয়া দিত।

শ্রাদ্ধ সার্থক হইত তখন, এখন শ্রাদ্ধ না কচু হয়। তখনকার শ্রাদ্ধের দানে পুরোহিতের অভাব একদিনের জন্য নয়, দু'দিনের জন্য নয়, কয়েক মাসের জন্য ঘুচিত।

তাহার পরিবর্তে কি না এক ছিলিম উৎকৃষ্ট তামাক। পুরোহিতের সর্বাঙ্গ রি রি করিতে লাগিল।

ফর্দ করিবার সময় ব্রাহ্মণী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ; ফরমাস করিয়াছিলেন, "কিছু রসগোল্লা এনো।"

কন্যা গোলাপী বলিয়াছিল, "বাবা, আমি রসগোল্লা খাব।"

স্ত্রী-কন্যাকে রসগোল্লার প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি শ্রাদ্ধোপচারের মধ্যে স-আধার, অর্থাৎ চারিটি কাংস্য পাত্র সহ সের-চারেক রসগোল্লা দানও চাহিয়াছিলেন।

কিন্তু কই তা।

মাত্র দু'টি রসগোল্লা শ্রাদ্ধোপকরণের মধ্যে স্থান পাইয়াছে—তাহাও আবার মাটির খুরিতে।

নিকুঞ্জ চক্রবর্তীর মনে হইতে লাগিল, হনুমান যেমন করিয়া মেঘনাদের নিকুম্ভিলা যজ্ঞ পণ্ড করিয়াছিল, এই শ্রাদ্ধ তিনি তেমনি করিয়া পণ্ড করিয়া দেন।

উঠান লেপিয়া উপরে চাদরের আচ্ছাদন খাটাইয়া এবং মাটিতে সতরঞ্চ বিছাইয়া একধারে দর্শকগণের বসিবার স্থান এবং অন্যদিকে শ্রাদ্ধস্থান সজ্জিত হইয়াছে।

পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে বসিলেন।

দর্শকেরা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল ; "বাবা, ঠাকুরের কি রাগ। দুর্বাসার জাত কি না।" বলিয়া গর্ব অনুভব করিতে লাগিল—যেন, এই কোপ ধারণ করে বলিয়াই বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু দীনবন্ধু মর্মাহত হইল।

মন্ত্রপঠনের অশ্রদ্ধ অসহিষ্ণু ভঙ্গী আর তাহার নিজের অশুদ্ধ উচ্চারণের দরুণ শ্রাদ্ধক্রিয়াই যে ব্যর্থ হইতেছে তাহাতে তাহার সন্দেহ রহিল না। সে শুনিয়াছিল, শ্রাদ্ধ বড় সহজ কাজ নয়, স্বর্গের আত্মা তাহাতে সুখী হয়, শীতল

হয়, একাগ্রতা কি নিষ্ঠার ফাঁকি তাহাতে চলে না। উপকরণ যতই অকিঞ্চিৎকর হোক, স্বর্গতপিতার উদ্দেশে তাহা আনীত হইয়াছে বলিয়াই তাহার মূল্য আর শুচিতা অলৌকিক হইয়া উঠিয়াছে, মুখ ব্যাজার করিয়া তাহা "গ্রহণ করো, গ্রহণ করো" বলিয়া আত্মাকে আহ্বান করা হইতেছে, ইহাও যদি অপরাধের আর ক্লেশের কারণ না হয় তবে আর কি হইতে পারে।

দীনবন্ধুর চোখে জল আসিল, এবং মানুষের উপর তাহার আর শ্রদ্ধা রহিল না।

যাহা হউক, শ্রাদ্ধের পর পূর্ব্বকথিত শ্রীকান্ত এবং তাঁহার উদ্যোগে তাঁহার পূর্ব্বকথিত ভ্রাতা বসন্ত এবং আরও দু'চার-জন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি দধি আর চিপিটক ভোজন করিলেন। পুরোহিত ঠাকুর নামমাত্র জলযোগে বসিলেন।

পুরোহিতের সঙ্গে পাছে হাতাহাতি হইয়া যায় এই ভয়ে গোবিন্দ আয়োজন করিয়া দিয়া গা-ঢাকা দিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পর নিত্যপদকে ডাকিয়া আনিয়া তিনিও কিছু ভোজন করিলেন।

শ্রাদ্ধপর্ব্ব গদাপর্ব্বের গা ঘেঁষিয়া শেষ হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভবানী ভট্টাচার্য্যের বাড়ী এই গ্রামেই।

তাঁহার গৃহে বাদলা উপলক্ষে রান্নার বিশেষ আয়োজন হইয়াছে। ভট্টাচার্য্যের বিধবা ভগিনী দাক্ষায়ণী তাঁহার স্বতন্ত্র নিরামিষ পাকে এবং ভট্টাচার্য্যের সধবা ভ্রাতৃবধূ আমিষ পাকে খিচুড়ি রাঁধিয়াছেন।

বড় ভট্টাচার্য্য বিপত্নীক; তিনি বাড়ীতে থাকেন না। তাঁর ছোট ভাইটিও নায়েবী কর্ম্মোপলক্ষে প্রবাসী। তাঁহাদের ভগিনী দাক্ষায়ণী তাঁহাদের গৃহের ও সন্তানগণের রক্ষণাবেক্ষণের কর্ত্রী, তিনিই বাটিস্থ ব্যাপার যথারুচি চালিত করেন এবং যথাসাধ্য সংযত রাখেন।

কিন্তু বুঝিবার ভুলে একটুখানি টলিয়া যাইয়া বুদ্ধিমতী দাক্ষায়ণী গুরুতর এক সংকটের সৃষ্টি করিয়া বসিলেন।

বড় ভট্টাচার্য্যের অর্থাৎ ভবানীকিংকরের মধ্যমপুত্র সনাতন আজ দেড় বৎসর যাবৎ কালাজ্বরে ভুগিতেছে, শয্যাশায়ী হইয়া নাই, উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়ায়, টুকটাক পা ফেলিয়া সে বহির্ব্বাটি পর্য্যন্ত যাইতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত অসুস্থ সে। বার বৎসরের ছেলে রোগ ভোগের দেড় বৎসরে মাথায় একতিল বাড়ে নাই, কিন্তু তাহার উদরের স্ফীতি ভয়ংকর হইয়া উঠিয়াছে, যেন কেউ চারিদিক হইতে প্রাণপণে আকর্ষণ করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, পেটের চামড়া এমনি টানু টানু আর পাতলা দেখায়। তার বিস্ফারিত অকুণ্ঠিত উদরের উপর নীলবর্ণ শিরাজাল বিস্তৃত হইয়া আছে, যেন রক্তের পরিবর্ত্তে তাহারা নীলবর্ণ একটি জলীয় পদার্থে

পরিপূর্ণ, চুল কটাসে, বিরল, গায়ের চামড়া খস্‌খসে, খণ্ড খণ্ড সাপের খোলসের মতো হালকা চামড়া শুকাইয়া উঠিয়া উঠিয়া যাইতেছে, পায়ের পাতা ফুলা, আঙুলের টিপ দিলে জলে-ফুলা মাংসে গর্ত্ত হইয়া যায়, শীঘ্র ভরিয়া উঠে না।

দাক্ষায়ণী তাহার পায়ের উপর হাত রাখেন, শীতল স্পর্শে বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া ওঠে, একটা অবশ করা শীতলতা তাঁহারও হাতের ত্বক মাংস অস্থি বহিয়া উপরের দিকে উঠিয়া যায়।

দাক্ষায়ণীর মনে হয়, ভয়ংকর মন্থর একটি শক্তি তার দেহের নিম্নতম প্রান্ত আশ্রয় করিয়া অনিবার্য্য গতিতে হৃদ্‌পিণ্ডের দিকে অগ্রসর হইতেছে, যেমন করিয়া সূর্য্যাস্তের পর আকাশের পূর্ব্বসীমান্ত হইতে অন্ধকার ওঠে কেন্দ্রের দিকে।

ভেক যেমন সাপের দাঁতে আটকা পড়িয়াছে।

শিহরিয়া দাক্ষায়ণী সনাতনের চোখের দিকে চাহেন—তাড়াতাড়ি সনাতনের পায়ের উপর হইতে হাত তুলিয়া লন, ত্রাসের অস্থিরতা সম্বরণ করিয়া লইতে তাঁর সময় লাগে।

সনাতনের চোখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনে হয়, চোখের উপর যে আলো পড়িয়াছে তাহা ভিতরে প্রবেশ করিয়া একটি সীমাবদ্ধ স্থানে আবদ্ধ হইয়া হাঁপাইয়া মরিতেছে, তার বেগ নাই, সেই মৃত আলো পাণ্ডুর আভা ফেলিয়াছে।

চোখে নৃত্যের আভা নাই, অন্য ভাষা নাই, আড়ষ্ট দৃষ্টি কেবলি যেন বলিতেছে; "আমি যাব না।"

দাক্ষায়ণীর শরীর কাঁপিতে থাকে।

ফণী ডাক্তারের হাতেই সনাতন বরাবর ছিল, সে গা ফুঁড়িয়া ঔষধ দিতেছিল, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল না হওয়ায় এবং দক্ষিণা দিবার অর্থের অভাবে সে-চিকিৎসা বন্ধ করিয়া রোগীকে এখন গৃহ-চিকিৎসার অধীনে অর্থাৎ ডাক্তারী ঔষধের পরিবর্ত্তে কবিরাজী ঔষধের অনুপানের উপর রাখা হইয়াছে; কিন্তু রোগীর সম্বন্ধে সতর্কতার শৈথিল্য নাই।

তবে এই বাদলার দিনে একটু ত্রুটি হইয়া গেল।

কেবলি নিষেধ করিয়া, কেবলি বঞ্চিত করিয়া, তার অতি তুচ্ছ লালসাকেও বাধা দিয়া, তাহাকে যেন মৃত্যুরই মতো সংসারের বাহিরের একটি অতি কৃপণ বান্ধবহীন অনুদার আর গভীর স্থানে নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই সংকীর্ণ অন্ধকার বন্দীশালার ভিতর হইতে পলায়ন করিয়া জীবনের আলোকিত চলচঞ্চল স্রোতের মাঝে আসিবার চেষ্টায় ছেলেটির মন দিবারাত্র ছটফট করিয়া মরিতেছে, তার বিলাপের অন্ত নাই, কিছুই না পাইবার ব্যথাই যেন তাহাকে ক্ষয় করিতেছে বেশী।

এই কথাগুলি যতই চিন্তা করেন, প্রাণ ফাট্‌ফাট্‌ করিয়া দাক্ষায়ণীর ততই মনে হয়, ঐ অন্ধকার-কূপ-কারাগার হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিতেই হইবে।

কিন্তু যন্ত্রণা এই যে, মুক্তিদানের সহজে কি দ্রুত উপায় নাই। রোগ মৃদু, এখন আর দুঃসহ নাই, কিন্তু দুর্জ্জয়।

বাড়ীর অপরাপর ছেলেরা উঠানে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করে।

সনাতন বারান্দায় তক্তপোষে বসিয়া খুঁটির সঙ্গে বাঁধা বাঁশের আড়ের উপর দুই হাত তুলিয়া দিয়া তাহা দেখে, তাহাদের সঙ্গে সে মনে মনে যোগদান করে, খেলার পরিচিত পদ্ধতি মানিয়া লইয়া সে একসঙ্গে সমগ্র খেলাটি চোখের উপর ধরিয়া রাখে, ইহার পর ঐ অবস্থাটা আসিতেছে তাহারই প্রত্যাশায় তার দেহে-মনে উত্তেজনা দেখা দেয়।

আপনি মধ্যস্থ হইয়া সে চীৎকার করিয়া ওঠে; "না, না, হ'ল না।" চীৎকার করিয়া সে হাঁপায়।

তার চীৎকার শুনিয়া দাক্ষায়ণী ছুটিয়া আসেন; দেখেন, সনাতনের মুখ লাল হইয়া সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিয়াছে।

তার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দেন, তার অতি প্রকট মেরুদণ্ড আর পঞ্জরাস্থিগুলির দিকে তাঁর দৃষ্টি কয়েক মুহূর্ত্ত নিষ্পলক হইয়া থাকে, তার গায়ের ঘাম আঁচল দিয়া মুছিয়া দিয়া দাক্ষায়ণী তাহাকে মনে-মনে ছুটাছুটি করিতেও নিষেধ করেন: "ওরা খেলছে খেলুক; তুমি চুপটি করে বসে দেখ।"

অন্যান্য ভাইয়েরা ঘুড়ি ওড়ায়, ডাণ্ডাগুলি খেলে, গাছে ওঠে, পেয়ারা পাড়ে, ডাব পাড়ে, তাদের দুর্দ্দান্ত অঙ্গচালনা আর হস্ত-পদের ক্রীড়া-শ্রমের বিরাম নাই, তফাতে দাঁড়াইয়া অক্ষম সনাতন তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকে।

সে শোনে কেবল পিসিমার মুখে রূপকথার গুঞ্জরণ, যাহা কেবল আলস্যের নিবিড় সহচর; চক্ষু দুটিকে সে শুধু ঘুমে ভরিয়া দেয়, কোনো আনন্দ কোনো স্বপ্ন সে ফুটাইতে পারে না।

আর শোনে, কি খাইতে তার বারণ সেই নির্ম্মম কথা। পুরাতন সরু চালের ভাত আর চুনা মাছের পানসে ঝোল প্রত্যহ; আর ক্বচিৎ কখনো সুজির ফুলকো রুটি দু'একখানা; তা ছাড়া আর সবই নিষিদ্ধ। ইলিশ, তেলাল কই, বড় বড় মাগুর, চিতল মাছের পেটি, বাড়ীতে আসে; কিন্তু সনাতনের তা খাইতে বারণ। পরমান্ন, পিষ্টক প্রস্তুত হয়, দুধে ক্ষীরে ময়দায় নারিকেলে; সনাতন তার কেবল ঘ্রাণ পায়, চোখে দেখিতে পায় না, আর আর ছেলেরা কাঁচা আম চিবাইয়া খায়, ভাল ভাল কাঁঠাল দুধে মাখাইয়া খায়, অমনি চুষিয়া খায়, নাড়ু বড়া খাজা বাতাসা ইত্যাদি সে কত।—খাদ্যবস্তু যেমন অশেষ, উহাদের খাইবার ইচ্ছা, হজমশক্তি আর খাইবার সময়ও যেন তেমনি।

এটা সেটা খাইবার জন্য সনাতন কাঁদে, বলে, পিসিমা, আর কতদিন না খাইয়ে রাখবে?

তার কঙ্কালসার শুষ্ক দেহখানির দিকে চাহিয়া দাক্ষায়ণীর মনে হয় এ রুগ্ন কিন্তু ততোধিক ক্ষুধাতুর এ, একটি নিঃশ্বাস দমন করিয়া দাক্ষায়ণী বলেন,— অসুখ সারলেই খাবে বাবা, ছেলে ঝগড়া করে; বলে,—সে ত' শোনাচ্ছ আজ কতদিন তার ঠিক নাই, তোমরাই সব খেয়ে ফুরুলে, আমার জন্যে ত' কিছুই রাখলে না, সব রাক্ষস।

—কিছুই ফুরোয়নি বাবা, সব আছে। তুমি যখন খাবে তখনই তৈরী করে দেব আরো ভাল করে।

—হ্যাঁ, দেবে!—আজ খিঁচুড়ি রেঁধেছ, কতদিন খাইনে, দাও। বলিতে বলিতে সনাতন কাঁদিয়া ফেলিল।

পুনরায় বলিল,—তুমি ত' আমাকে না দিয়ে গিলবে।

দাক্ষায়ণী কাঁদিতে উঠিয়া গেলেন।

রোগীর পক্ষে কুপথ্য যা, তাহা তিনি কাঠের বাক্সে রাখিয়া বাক্সে চাবি দিয়া চাবি নিজের কাছে রাখেন, কিন্তু আজ তাঁর মতিভ্রম ঘটিল, দিনের পর দিন এই বঞ্চিত করার কাঠিন্য সহসা সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গেল, ভাঙ্গা বুকে আর তাহা বহন করিতে পারিলেন না, মনে হইল, যে-অন্ন আজ তিনি নিজের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা বিষ, শুকাইয়া মরিলেও ইহার সম্মুখে তিনি সে-অন্ন মুখে তুলিতে পারিবেন না।

দাক্ষায়ণী আসিয়া সনাতনের মুখখানা চিবুকে আঙুল দিয়া তুলিয়া ধরিলেন; তার চোখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এক গ্রাস, বাবা, তার বেশী নয়।

—তাই দেবে চলো। বলিয়া সনাতন কাঁদিতে কাঁদিতেই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বেলা তখন দুটো।

দাক্ষায়ণী সনাতনকে রান্নাঘরে লইয়া গেলেন, খিঁচুড়ি খাইতে দিলেন, এক গ্রাসের স্থলে সে পুনঃ পুনঃ চাহিয়া লইয়া গ্রাসের পর গ্রাস মুখে তুলিতে লাগিল, ভয়ের তাড়নায় কণ্টকিত হইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া নিবারণ করিতে চাহিলেও, তাহার মুখে আহারের উল্লাস দেখিয়া দাক্ষায়ণীর হৃদয় তাহা পারিল না।

দিতে দিতে হঠাৎ চমকাইয়া উঠিয়া দাক্ষায়ণী একবার দুর্ব্বলকণ্ঠে বলিলেন,—থাক, আর না।

অপূর্ণ ক্ষুধার আর আশাভঙ্গের কাতরতা সনাতনের ছলছল চক্ষু দুটিতে যেন জগদ্ব্যাপী হইয়া উঠিল।

পিসিমার মুখের দিকে চাহিয়া সে অনন্ত আকুলতার সহিত বলিল, আর দু'টি খাই, পিসিমা।

রাত্রি তখন কত কে জানে।

আর্ত্তনাদের শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া কণ্ঠাগত প্রাণে দাক্ষায়ণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন।

ঘরে রোগী বলিয়া সারারাত্রি আলো জ্বালা থাকে, দাক্ষায়ণী দেখিলেন, সনাতন ছটফট্ করিতেছে।

সনাতনের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দাক্ষায়ণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি, বাবা?

সনাতন ক্ষীণস্বরে বলিল,—পেট ব্যথা করছে বড়।

দাক্ষায়ণী দেখিলেন, সনাতনের পেট ফাঁপিয়াছে; তার পেটের কাছে কান লইয়া তিনি একটা ফুট্‌ফাট্ শব্দ শুনিতে পাইলেন, এতদিন পরে দাক্ষায়ণীর একেবারে কর্ণমূলে নিঃশব্দবাহিনী বৈতরণী হঠাৎ যেন কলকল্ শব্দ করিয়া উঠিল।

পলকের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তিনি ভগবানকে স্মরণ করিলেন।

ছোট বধূকে ঠেলিয়া তুলিলেন, ছেলেরাও উঠিয়া পড়িল।

পাকাশয়ের বায়ুর শান্তির জন্য সরিষার তেল আর জল মিশ্রিত করিয়া ফিটাইয়া তিনি সনাতনের পেটে মালিশ করিতে লাগিলেন, সনাতন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া রহিল।

নিস্তেজ আলোকে আর নিঃশব্দ থমথম গভীর রাত্রে রোগীর দিকে চাহিয়া শঙ্কা যেন শ্বাসে শ্বাসে আপনি ঘনাইয়া উঠে। নিজেদেরই ছায়ার চঞ্চল বিচরণের মাঝে অদৃষ্টের একটা ভয়াবহ দুতমূর্ত্তি যেন পলে পলে কঠিনতর হইতে থাকে, মনে হয়, শীর্ণতম স্বল্পাবশেষ দেহের অভ্যন্তরে যে প্রাণতন্তুটি এখনো টিকিয়া রহিয়াছে, চোখের ঐ একটি পলকপাতের টানেই সে বুঝি ছিঁড়িল।

দাক্ষায়ণী চক্ষু মুদিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন, তাঁহার স্নায়ুর স্পন্দন আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।

দাক্ষায়ণী নত হইয়া সনাতনের মুখের কাছে মুখ লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এখন ভাল ঠেকছে, বাবা?

সনাতন কথা কহিল না, চোখ খুলিল না; কথা তার কানে গেছে কি না তাহা বুঝা গেল না।

কোথাকার একটা দুর্লঙ্ঘ্য নিষেধ সত্ত্বেও আপনার সম্বিতের কাছেও লুকাইয়া, দাক্ষায়ণী সনাতনের নাকের কাছে হাত ধরিলেন, নিঃশ্বাস অনুভূত হইল।

রাত্রি তখন বেশী ছিল না, কিছু পরেই ভোর হইল, আলোকের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সনাতন আবার যন্ত্রনায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, কিন্তু এবার কেবল একটিমাত্র শব্দ, উঃ।

ছটফটানি নাই, এ-পাশ ও-পাশ করা নাই, কোনো অস্থিরতা, চাঞ্চল্য নাই; চক্ষু অর্ধনিমীলিত, হাত দুখানা আর পা দুখানা অনড় হইয়া শয্যায় পড়িয়া আছে, তাহাতে রক্ত ছিল না, এখন যেন প্রাণ নাই; আর কণ্ঠ দিয়া ঐ একটি-মাত্র সুদীর্ঘ শব্দ দ্রুত নিঃশ্বাসের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে নির্গত হইতেছে।

ডাক্তার আনিতে লোক ছুটিল।

নিত্যপদ বাড়ীর কাছেই, তাহাকেই সে ডাকিয়া আনিল।

সনাতনের মুখের শব্দটি তখন ক্রমশঃ হ্রস্ব হইয়া নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই রোগীর বুকের সঙ্গে কল লাগাইয়া নিত্যপদ আধ মিনিটও রাখিল না, সরিয়া দাঁড়াইয়া সে রোগীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দাক্ষায়ণী আকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—কেমন দেখলে, বাবা?

অন্যদিকে চোখ ফিরাইয়া নিত্যপদ বলিল,—আমি কিছু দেখলাম না।

বলিতে বলিতেই রোগী গাঁজলা ভাঙিতে লাগিল, দাক্ষায়ণী আঁচল দিয়া তাহা মুছিয়া মুছিয়া লইতে লাগিলেন, আর্ত্তনাদ নিস্তেজ অস্ফুট হইতে হইতে কণ্ঠ সহসা একেবারে নিঃশব্দ হইয়া গেল; চিবুক সমেত নীচের ঠোঁট দুবার নড়িয়া উঠিল, মাথাটা বারকতক বালিশের উপর এ-পাশ ও-পাশ করিয়া কাৎ হইয়া রহিল, আর নড়িল না।

নিত্যপদ সজলচক্ষে বাহির হইয়া গেল।

দাক্ষায়ণী প্রভৃতি নিঃশব্দে অশ্রুমোচন করিতেছিলেন। তাঁহারা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

—তোকে মেরেছি, আমিও মরব। বলিয়া দাক্ষায়ণী কাঁদিতে কাঁদিতে হঠাৎ ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ট্রাঙ্কের উপর হামালদিস্তা ছিল, তাহার নোড়াটা তুলিয়া লইয়া মৃতদেহের শিয়রে দাঁড়াইয়াই নিজের মাথায় আঘাত করিয়া টলিয়া পড়িলেন ট্রাঙ্কের উপর, অজ্ঞান হইয়া পরক্ষণেই সেখান হইতে গড়াইয়া পড়িলেন মাটিতে।

এই সনাতন নিত্যপদ ডাক্তারের দ্বিতীয় রোগী, চিকিৎসা অবশ্য করে নাই, তাহার মুমূর্ষু অবস্থায় দৌড়াইয়া আসিয়া কেবল তাহার বুকে বল বসাইয়াছিল।

কিন্তু ফণী ডাক্তার এই সূত্রেই লাফাইতে লাগিল, শোকে নয়, বিজয়োল্লাসে। মধুমক্ষিকা মধুসঞ্চয় করে যে ফুল হইতে তাহার সবগুলিই প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট হইবে এমন কথা নাই, ছন্দের তালে পা ফেলিয়া মানুষ যে নৃত্য করে তাহা কখনও লঘু, কখনও তাণ্ডব।

ফণী ডাক্তার সনাতনের এই শোচনীয় অকালমৃত্যুর ভিতর হইতে মধুসংগ্রহ করিয়া রসনা পরিতৃপ্তকরতঃ অতি উদ্দাম ভঙ্গীতে নৃত্য করিতে লাগিল।

অর্থাৎ তাহার রোগীরা তাহারই মুখে শুনিয়া গেল: "নিত্যপদ ডাক্তার ত' ভারি জাঁদরেল পাশ করা ডাক্তার, তোদের ত' তার নামে নোলা ভিজে ওঠে, কিন্তু দেখলি ত'? আসতে আসতেই দু' দুটো জলজ্যান্ত মানুষকে দিলে যমালয়ে পাঠিয়ে," বলিয়া ফণী চুপ করে, বোধ হয় তার নাচিতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু নাচে না, বলে, রামপ্রসাদ গেল, সনাতন গেল, বদ্যি হতে এখনো আটানব্বইটা বলি চাই, তোরা কে কে যেতে চাস কাছে? প্রশ্ন করিয়া ফণী সমাগত রোগীগণের দিকে চাহিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসে।

প্রশ্ন শুনিয়া রুগ্নের দল আতঙ্কে কাঁপিয়া ওঠে, ফণীর হুঙ্কারের চাইতে তার এই মৃদু জিজ্ঞাসা ভয়ঙ্কর শোনায়, যেন হাড়ে বাজে।

ফণী পুনরায় বলে, —ডাক্তার ত' নয় রক্ষাকালীর বরপুত্তুর, কাঁচাখেকো দেবতা। —কেবল তাই নয়, সনাতন মারা গেল কিসে জানিস? বিষে। উত্তেজক ওষুধ এত খাইয়ে দিয়েছিল যে শরীরে বিষের ক্রিয়া হ'ল, রুগী তৎক্ষণাৎ মারা গেল।— পুলিস-কেস অক্লেশেই হতে পারে, নরহত্যার অপরাধে পাঁচ বৎসর শ্রীঘর। বলিতে বলিতে চার পাঁচটি শিশি হাতে করিয়া ঔষধ দিতে ফণী উঠিয়া দাঁড়ায়।

যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া বলে, তোরা ত' জানিস, আমার হাতে সনাতন ছেলেটা দেড় বৎসর দিব্যি টিকে ছিল। আহা, খেদের স্বর টানিতে টানিতে ফণী পর্দ্দার ওদিকে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

কিন্তু রুগীদের হৃদকম্প আর থামিতে চাহে না, ডাক্তারের হাত দিয়া বিষ প্রয়োগ নরহত্যা হইয়া গেল, ইহাই যথেষ্ট ভয়াবহ, তাহার উপর পাঁচ বৎসরের জন্য শ্রীঘরবাস।— রোগীগণের নাড়ী বড় ক্ষীণভাবে বহে।

রক্তামাশয়ের রোগী অনাথ প্রাণপণে শক্তিসঞ্চয় করিয়া লইয়া চেঁচাইয়া বলিল,

মারতে মারুন রাখতে রাখুন, আপনিই আমাদের বল-ভরসা। আর কারো কাছে আমরা যাব না, ডাক্তারবাবু। আমি ত'—

ডাক্তারবাবুর কানে কথাগুলি পৌঁছিয়াছিল, হাঁকিয়া বলিলেন, শুনেছি গিয়ে দাঁড়া। কিন্তু অনাথ তখন বাক্যোচ্চারণের শ্রমে হাঁপাইতেছে, কথা শেষ করিতে পারে নাই।

ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী একটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, রামপ্রসাদের অসুখের সময় কান্তিভূষণ নিজেই পরমোৎসাহে কলিকাতায় যাইয়া এক আলমারী ঔষধ কিনিয়া আনিয়াছে এবং ফণী ডাক্তারের অবৈতনিক শিক্ষাগার সে ত্যাগ করিয়াছে।

সেদিনকার প্রণয়প্রতিষ্ঠার পরও ফণীর মর্ম্মান্তিক ক্রোধের কারণ ইহাই।

যাঁহারা নোকর-নগদীর দ্বারা কিম্বা বেগার ধরিয়া হাট করান তাঁহারা নিজেরাও কখনো কখনো সখ করিয়া হাটে বেড়াইতে আসেন, তাঁহাদের হাটে আসাটাকে লোকে শ্রদ্ধাভরে বলে পদার্পণ করা।

হাটের উপর বসিবার স্থান আছে।

হাট বৈকালে বসে বলিয়া সময়টাও ভাল, ঠাণ্ডা, প্রজাসাধারণ নমস্কার করে, নিজের তামাক খরচ হয় না অথচ মজলিশ করা চলে।

এই সব সুবিধা আছে বলিয়াই যাঁহাদের হাটে না আসিলেও চলে তাঁহারাও আসেন অর্থাৎ পদার্পণ করেন।

ফণীর বাক্যজাল বিস্তৃত হইয়া রোগীকে বিষ খাওয়ানোর রোমাঞ্চকর সংবাদ দু'দিন দু'রাত্তিরে রাষ্ট্র হইয়া জানিতে কাহারো বাকি নাই, এবং হাটে আগত উপরিউক্ত অবসর-বিলাসী ব্যক্তিগণের ভিতর সেই কথাটা পরের হাটেই উঠিয়া পড়িল।

বহুক্ষণ যাবৎ আলোচনাধীনে রাখিয়া একটা কথার রস নিংড়াইয়া বাহির করা এবং তাহার দ্বারা আপন এবং পরের চিত্তকে রঞ্জিত করার মৌলিক পটুত্ব ইঁহাদের আয়ত্তাধীন।

দীনবন্ধুর দোকানের সম্মুখে বাখারির বেঞ্চিতে বসিয়া পীতাম্বর সান্যাল কাজের এবং কথা বলিবার লোকের অভাবে কুষ্মাণ্ড-ক্রেতার বিস্ময় এবং কুষ্মাণ্ড-বিক্রেতার প্রতিবাদ উপভোগ করিতেছিলেন।

সম্মুখ দিয়াই অমর অধিকারী পূব হইতে দক্ষিণ দিকে চলিয়াছেন দেখিয়া পীতাম্বর তাহার কাপড় চাপিয়া ধরিলেন; বলিলেন, ভারি যে কাজের লোক। বলিয়া তাঁহাকে টানিয়া পাশে বসাইলেন।

অমর বলিলেন, কাজ কিছু নেই।

—তবে বসো। শুনেছ নতুন ডাক্তারের ব্যাপারটা?

—শুনেছি। এই যে, এস।

উত্তর দিক হইতে নফর ঘোষ আর পশ্চিম দিক হইতে প্রতাপ বক্সী আর হেম বাড়ুয্যে উভয়কে সম্মিলিত এবং বেঞ্চিতে স্থান আছে দেখিয়া এইদিকেই আসিতেছিলেন।

অমর অধিকারীর অভ্যর্থনা উপরিভাবে লাভ করিয়া তাঁহারা বসিতে বিলম্ব

করিলেন না, এবং জানিতে চাহিলেন, অমর কি শন্নিয়াছেন ?

তাঁহাদিগকে তাহা জানান হইল।

এবং তারপর একটা বাকযন্দ্ধ প্রশ্নে উত্তরে, স্বীকারে অস্বীকারে, শব্দে অলংকারে, বিশ্বাসে অবিশ্বাসে এমন ঘোরাল হইয়া উঠিল যে ভীষ্মপর্ব্ব তত ঘোরাল নয় ; বিজয়লক্ষ্মী ইহাদের মধ্যে কাহার অংক আশ্রয় করিবেন তাহা অনন্মান করিবার যো রহিল না, ভারত-যন্দ্ধের ফলাফল কোনোদিনই এত অনিশ্চিত হইয়া উঠে নাই।

মোটের উপর বন্ঝা গেল, অর্থাৎ নিত্যপদ অদন্রে দাঁড়াইয়া "ইঁহাদের তর্ক-বিতর্ক শ্রবণে" বন্ঝিতে পারিল যে, বিষপ্রয়োগের কথাটা কেহ কেহ বিশ্বাস করিয়াছেন, কারণ ঐ অবস্থায় রোগীকে উত্তেজক ঔষধ দেওয়া অসম্ভব নহে এবং রোগীর পক্ষে তাহা সহনাতীত হওয়াও অসম্ভব নহে।

কেহ কেহ আবার বিশ্বাস করেন নাই ; বিশ্বাস না করিবার কারণ এই যে, অত বড় ডাক্তারের মাত্রাজ্ঞানের আর সহজবন্দ্ধির এতখানি অভাব থাকিতেই পারে না ; ঔষধ অতিমাত্রায় প্রয়োগ করিলে তাহা বিষতুল্য হইয়া উঠিতে পারে তাহা সেই ডাক্তার নিশ্চয়ই শিখিয়া আসিয়াছে। তবে ইহাও সত্য যে, সংসারে দৈবই বলবৎ।

দীনন্ তখন খরিদ্দার বিদায় করিতেছিল।

উহাদের মন্খে বিষ কথাটি বারম্বার শন্নিয়া দীনবন্ধন্র বোধ হয় মনে হইয়াছিল, বিষের কথা সে-ও কিছু অবগত আছে।

দোকান হইতে নামিয়া সে-ও ঐ রথীবর্গের সম্মুখে আসিয়া সাক্ষ্য দিতে দাঁড়াইল ; বলিল, বিষের কথা মিছে নয়, বাবার অসুখের সময়েও ঐ ডাক্তারবাবন্ বিষ দিয়েছিল, বলেছিল, ভয়ংকর বিষ, পেটে গেলে আর বাঁচান যাবে না। কিন্তু, বলিতে বলিতে খরিদ্দার কেহ আসিয়া দোকানে দাঁড়াইয়া আছে কিনা দেখিতে যাইয়া দীনন্র চোখে পড়িল, সেই ডাক্তারবাবন্ই অখিল বৈরাগীর ঘটি-বাটি-গাড়ন্-বদন্না মেরামতের দোকানের কাছে দাঁড়াইয়া কথাগন্লি শন্নিতেছেন।

দীনবন্ধন্ ঝপ করিয়া থামিয়া দাঁতে জিব কাটিয়া ত্রস্তভাবে দোকানে উঠিয়া গেল।

এবং তাহার পর হঠাৎ পলায়নের কারণ অনন্সন্ধান করিতে যাইয়া দীনন্ যাহাকে দেখিয়াছিল তাহাকে উঁহারাও দেখিতে পাইলেন।

কথা আর চলিল না।

ফুল-শয্যার নববধন্ আড়িপাতা সন্দেহ করিয়া এত নিঃশেষে চুপ করে না।

খানিক পরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া হেম বাড়ন্য্যে বলিলেন, যাই, বেলা গেল।

দেখা গেল সকলেরই সেই ধারণা, অর্থাৎ বেলা গেছে।

বাড়ীর দিকে চলিতে চলিতে নিত্যপদের মনে হইল, সে এত ক্লান্ত যে, কথা বলিতেও অক্ষম।

গ্রামের সরল দৃশ্যগন্লি সে যতবারই দেখে ততবারই তার ভাল লাগে, হাটের সীমানার পরেই বাঁ দিকে কুম্ভকারের বাড়ী, মৃৎপাত্র পন্ড়াইবার বৃহৎ ভস্মমাখা চুল্লিটা ; তার পাশেই বাঁশের মোথা-স্তন্পীকৃত করা, এবং তার ওদিকে খড়ের

পালা ; তারপর সঙ্কীর্ণ পা-পথের দু'ধারে ঘন জঙ্গল, পার হইয়া 'বেহারার খাল', বর্ষার সময় এই খাল দিয়া নদীর জল কোথায় যায় তাহা সে শুনিয়াছে কিন্তু মনে নাই, ক্ষেতের ধানের গোড়ায় যাইয়া সে জল ধানকে বাঁচাইয়া রাখে, পাকাইয়া তোলে। তারপর একটি আতা গাছ, বেগুন আর লঙ্কার ক্ষেত, একপাশে নারিকেলের চারা অনেকগুলি, তারপর কিছুদূর অগ্রসর হইলেই খাঁ দের বাড়ী, সম্মুখে পূর্ব্বাহ্নের সূর্য্যকে আড়াল করিয়া সুপারীর বাগান, বাড়ী আর বাগানের মাঝখানে একটা স্থান খেলার ময়দানের মতো, কিন্তু স্যাৎসেঁতে, গার্সি'র দিন এখানে লাঠিখেলার প্রতিযোগিতা হইত। বহুদিন পূর্ব্বে কোন্ কুঠিয়াল সাহেব টম্‌টম্ হাঁকাইবার জন্য এই রাস্তাটিই নাকি পাকা করিয়াছিল, কিন্তু পাকা রাস্তা মাটি চাপা পড়িয়াছে, তার চিহ্ন রহিয়াছে ইঁটের তৈরী একটি কালভার্ট, প্রাচীন কীর্ত্তির অভিজ্ঞান স্বরূপে এই ইঁট ক'খানার একটা মূল্য আছে মনে করিয়া নিত্যপদ যাতায়াতের সময় এখানে একটু দাঁড়াইত।

কিন্তু পল্লীদৃশ্য অর্থাৎ গাছপালাগুলি আজ তার চোখে পড়িল না, প্রাচীন কীর্ত্তির স্মৃতি জাগান মূল্যবান ভগ্নাবশেষ সে যেন ঘুমের মধ্যে পার হইয়া গেল।

ক্লান্ত হইলেও নিত্যপদ এক সময় বাড়ী ফিরিল।

ফিরিয়া তার ইজি-চেয়ারে বসিল, তার পর হাত দু'খানা মাথার নীচে দিয়া মাথাটা তাহার উপর ঢালিয়া দিল, এবং তারপর পা দু'খানা বেঞ্চির উপর তুলিয়া দিয়া সম্পূর্ণ এলাইয়া পড়িল!

কিসের একটা ঘোরে মস্তিষ্ক বহুক্ষণ অপরিষ্কার থাকিবার পর ঘোর কাটিয়া অল্পে অল্পে তার মস্তিষ্ক আর চক্ষু উন্মীলিত হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং তখন তার অনুভূত হইল যে, তাহার সকল উদ্যম, সদিচ্ছা, অনুকম্পা এবং আয়োজনকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া একটি ঝটিকা বহিয়া গেছে, সে এখন রীতিমত অনাথ এবং অপদার্থ, আর, কাহাকেও তার ভাল লাগিতেছে না।

বিষের কথাটা অর্থাৎ বিষপ্রয়োগে নরহত্যার অপরাধে সে যে আসামী তাহা ইতিপূর্ব্বেই তাহার কানে এমন বিপুল কলেবর আর ঝঙ্কৃত হইয়া যায় নাই।

কিন্তু সমুদয় ঝঙ্কারকে পরাস্ত করিয়া নিত্যপদর কানে বাজিতে লাগিল দীনবন্ধুর কথাগুলি, অজ্ঞান বালকের উক্তি বলিয়া তাহাকে উপেক্ষা করা সম্ভব হইতেছে না, তাহার ব্যবহার ক্ষমার যোগ্য নহে। দীনবন্ধু তুচ্ছ ব্যক্তি, তবু তুচ্ছ ব্যক্তির যত অপরাধই ক্ষমার্হ হউক, কৃতঘ্নতা নহে।

উঁহারা তাহার এবং সে উঁহাদের অপরিচিত, কিন্তু দীনু তাহাকে চেনে, রামপ্রসাদকে বাঁচাইবার জন্য তার সে-চেষ্টার আন্তরিকতা দীনবন্ধু তখন কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল।

কিন্তু আজ তাহা ভুলিয়া গেছে, তার যে দুর্ণামের অন্ত নাই তাহাকেই আরো পুষ্ট, নিঃসন্দেহ, আর সঞ্জীবিত করিয়া দিতে ব্যগ্র হইয়া বালক দৌড়াইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

রাত্রিটা উত্তপ্ত মস্তিষ্কে কাটাইয়া সকালবেলা নিত্যপদর কাণ্ডজ্ঞান ফিরিল। তাহার মনে হইল, ইহাদের বুদ্ধিই অল্প ; তাহার প্রতি বিদ্বেষ ইহাদের কাহারো

নাই, বিষ-প্রয়োগের গুজবটা ঈর্ষ্যাপরায়ণ ব্যক্তির মিথ্যা কলঙ্করটনা হইতে পারে কি না সেইটা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার উৎসাহটা বাদে ইহাদের অপর সকল দিকেই প্রেরণা আছে; ইহাদের কথায় রাগ করিলে নিজেকে ছাঁটিয়া ইহাদেরই সমান করিয়া খাট করা হয়।

কিন্তু সে ত' হাতের কাছেই ছিল, তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই ত' হইত, মহাশয়, ব্যাপারখানা কি ? সে সাহস নাই।

একটি সুগম্ভীর বৃষ চলিয়াছে, তাহার পশ্চাতে চলিয়াছে বালকের দল তাহাকে উত্যক্ত করিতে করিতে, বৃষ মুখ ফিরাইলেই বালকেরা ছুটিয়া পলাইতেছে।

অবস্থার সাদৃশ্যবশতঃ বহু পূর্বে দৃষ্ট এই ঘটনাটি মনে পড়িয়া নিত্যপদ আপনমনেই একটু হাসিল, এবং অবশিষ্ট চা-টুকু তার ভাল লাগিল।

কিন্তু এই পথেরই আর এক পথিক অর্থাৎ নিত্যপদর কম্পাউণ্ডার কান্তিভূষণ দেখা দিল মুখ নামাইয়া। সে নিজেরই গরজে এবং পরোপকারের নামে একটু আধটু ক্যানভ্যাসিং সুরু করিয়াছিল, তাহাকে কটূক্তি শুনিতে হইয়াছে।

—আসুন। বলিয়া নিত্যপদ তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। বলিল, আমাদের এ-পাট তুলতে হ'ল, কান্তিবাবু। লোকে কি বলছে তা আমি শুনেছি।

কিন্তু বিপন্ন হইয়া আসিলেও এবং বিষণ্ণ হইয়া থাকিলেও কান্তিভূষণ পৃষ্ঠ-প্রদর্শনের কথা ভাবে নাই, নতমুখ তুলিয়া বলিল, পাট তুলছিনে শীগ্‌গির ! এখানকার ধরণই এই; আপনি ঘাবড়াবেন না। একটা হৈ চৈ-এর নেশা করতে না পারলে এরা কি করে থাকে বলুন ! কিন্তু ভুলে যাবে।

নিত্যপদ ভাবিতে পারিল না, বিষ প্রয়োগে হত্যাকারীর কথা লোকে ভুলিতে পারে।

বলিল, তাই নাকি। মানুষ খুব হাল্‌কা হাওয়ায় বাস করে দেখছি।

—অশিক্ষিত। ঠিক অন্তরের কথা তাদের কিছুই নেই। হাল্কা প্রাণে যা লাগে তাতেই প্রাণ নড়ে চড়ে ওঠে; কিন্তু বেশীক্ষণ নয়।

—সব অশিক্ষিত।

—আমি ত' তা-ই বলি, অশিক্ষিত বলে অপটু নয় কিন্তু। ভেবে দেখবার রুচি নাই, সহিষ্ণুতা নাই, ভেতরে প্রবেশ করবার সামর্থ্য নাই, যা জানে না তা মানতে চায় না, যেন, নতুন তথ্য আর নতুন কার্যকারণ কিছু উপস্থিত হতে পারে না, শাস্ত্রে আছে বলে যাকে জানে তাকে ছাড়তে চায় না, এক কথায়, প্রগতি নাই। অশিক্ষিত আর কাকে বলে। আমিই এক অশিক্ষিত, আমার উপরেও এরা। অথচ নিজের মতের জাত বজায় রাখতে এদের গোঁ যদি দেখেন তবে অবাক হয়ে যাবেন।

নিত্যপদ বলিল, দেখেছি কাল। কিন্তু আমার এই বিষপান করানোর কথা ভুলে যাবে বলে মনে হয় না।

কান্তিভূষণ বলিল, যাবে, ডাক্তারবাবু। কুশিক্ষার একটা সুবিধেও আছে, কথার উল্টো দিকটা দেখিয়ে দিলেই' তাই নিয়ে মত্ত হ'য়ে উঠবে, আগে যা বলেছিল তা অম্লান বদনে অস্বীকার করবে, অর্থাৎ যদি স্বার্থে না বাধে। সেই জন্যেই ত' তাদের প্রত্যক্ষ স্বার্থের সঙ্গে আমাদের স্বার্থ এক করে তুলতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি ! একটু থামিয়া কান্তিভূষণ বলিতে লাগিল, আমি ভেবে দেখেছি, যেখান

থেকে সুষ্ঠু চর্চাপটুত্ব আসে সেইটাই এদের শিথিল, শিক্ষাই ত' চিন্তায় প্রবাহ আর সৌষ্ঠব দেয়। স্বার্থ আর শরীরের সুচিন্তা ছাড়া আর কিছু ধরে রাখবার শক্তি থাকলে ত' শিক্ষিতই বলতাম। গা ঘামিয়ে চাঙ্গা হয়ে ওঠে ; কিন্তু নেতিয়ে পড়তেও দেরী হয় না।

কান্তিভূষণের বিশ্লেষণ বিশ্বাস না করুক, আর তার পারিপাট্য দেখিয়া বিস্মিত না হউক, নিত্যপদ ভাবিতে লাগিল, এ হিসাবে শিক্ষিত লোক দেশে দু'চারিজন আছে।

বলিল, কিন্তু ধরে ত' আছে অনেক কিছুই।

— সব ছায়া।

নিত্যপদ চুপ করিয়া রহিল।

কান্তিভূষণ বলিতে লাগিল, নিজের যাতে লাভ, শত্রুর যাতে অনিষ্ট, মামলা করা যে উচিত, পচা গোবরের পোকাটাও যে পবিত্র, স্বতন্ত্র থেকে জাত বাঁচান যে কর্ত্তব্য, চক্ষুলজ্জা যে বালাই, যখন যার সমালোচনা করতে মুখরোচক লাগে তাই যে সত্য, ইত্যাদি নীতিগুলিকে অমর করে রেখেছে। শিক্ষার দান ধারণ-শক্তি আর তার সঙ্গেই স্থিতিস্থাপকতা এদের মনে দেখতে পাবেন না! এস, মা এস, বলিয়া খুকীর হাত হইতে চায়ের পাত্র গ্রহণ করিয়া কান্তিভূষণ গ্রামের লোকের কথা ভুলিয়া গেল।

কিন্তু গ্রামের লোকের কথা ভুলিয়া যাইয়া শান্তির সহিত চা-পান শেষ করা অদৃষ্টে ছিল না, পল্লীপথে একটা কলরব অগ্রসর হইতেছে শোনা গেল।

কান্তিভূষণ অনাগত দিনে সাফল্যের যে-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে তাহা যে নিতান্তই ছায়া-ছবি নহে সেইটা সপ্রমাণ করিতেই যেন গ্রামের ঈশ্বরীপ্রসাদ দাস, ইংরেজি-জানা ঈশ্বরী, তাহার দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক পুত্র শ্রীমান রাজেন্দ্রকে কাঁধে লইয়া রওনা হইয়াছে, পিতার স্কন্ধারোহী রাজেন্দ্রকে অনুসরণ করিয়াছে একখানি হাত-পাখা লইয়া তাহার অনুজা প্রফুল্লনলিনী, ভ্রাতা মহেন্দ্র, বাড়ীর ঝি মধুমতী, এবং আরো অনেকে, পথে আসিতে আসিতে এই ক্ষুদ্র অশুভযাত্রার সঙ্গে এত লোক যোগদান করিয়া তাহাকে বিপুলায়তন করিয়া তুলিয়াছে যে, প্রত্যেকের নাম করা সহজ নহে।

পিতার কাঁধের উপর হইতে রাজেন্দ্র কেবলি চীৎকার করিতেছে ; বাবারে ম'লাম, মাগো গেলাম। আর, কেবল সঙ্গে আসিতেছে এই অপরাধে সে ভগিনীকে বলিতেছে, হারামজাদি! এবং ঈশ্বরীপ্রসাদ রাজেন্দ্রকে বলিতেছে, রাস্কেল! আর জনতা হট্টরোলে কি বলিতেছে, তাহা বুঝা যাইতেছে না।

মিছিলের গন্তব্য স্থান ছিল নিত্যপদর বাড়ী, দ্রুতগতি সেখানে পৌঁছিয়া ভারাক্রান্ত ঈশ্বরীপ্রসাদ নিত্যপদর সমীপবর্ত্তী হইল, এবং কাঁধের ভার তাহার সম্মুখে নামাইয়া দিল।

হাঁফ ছাড়িয়া মেয়েকে বলিল, হাওয়া কর। ডাক্তারকে বলিল, দেখুন, সার।

রাজেন্দ্র ডাক্তারের সম্মুখে স্থাপিত হইয়া আর্ত্তনাদ ত্যাগ করতঃ কাৎরাইতে লাগিল।

নিত্যপদ দেখিল, ছেলেটির গোড়ালীতে সুবৃহৎ একটি কাঁটা ফুটিয়াছে।

ইংরেজী-জানা ঈশ্বরী বলিল, বেলের কাঁটা, সার।

কাঁটা তাহার স্থান ছাড়িয়া পদতলে প্রবেশ করিল কেমন করিয়া তাহা ডাক্তার জানিতে চাহে নাই; কিন্তু ঈশ্বরীর ক্রোধ তখন প্রবল; আর, চিকিৎসকদের কাছে রোগ-বিবরণ গোপন করিতে নাই বলিয়া ঈশ্বরী ইংরেজি ও বাংলায় মিশ্রিত করিয়া যাহা বলিল তাহা এই; ছেলেটা নিতান্ত বদমায়েস, ষ্টুপিড্ ছেলে; লেখাপড়ায় আদৌ মন নাই, কেবল খেলায় মন; ছেলের এখন যে বয়েস সেই বয়েসে সে (ঈশ্বরী) দ্বিতীয় ভাগের সবগ্নলি দ্নর্হ বানান কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু ছেলে ষাঁড় বানান করিতে কোন 'শ' লাগিবে তাহা বলিতে পারে না, গ্নর্মহাশয়ও একটি গর্দভ। সে যাহাই হোক, কোনো আবশ্যক না থাকিলেও ছেলে একটি আম্রবৃক্ষে আরোহন করিয়াছিল, তাহার শাখা ধরিয়া দোল খাইতে খাইতে হাত ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া মাটিতে পড়িতেই বাছাধনের—

রাজেন্দ্র আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, ওরে আমার পা গেল।

প্রফুল্লনলিনী আরো জোরে দ্ন'হাতে পাখা চালাইল, ঈশ্বরী বলিল, চুপ রহো, রাস্কেল, তখন মনে ছিল না, বলব কি, সার্, আমাদের জীবন ও অতিষ্ঠ করে তুলেছে, কিছুতেই বাগ মানাতে পারছিনে, বেশী কি আর বলব সার, ভূতের চাইতেও গেছো, এখন দেখ মজা। বলিয়া ঈশ্বরী ক্রোধে আক্রোশে দাঁত খিঁচাইয়া রহিল।

রোগ-বিবরণ শ্ননিয়া ডাক্তার কিছু বলিল না।

ছেলে কি-মজা দেখিতেছিল তাহা সে-ই জানে, কিন্তু গ্রামের লোক নিত্যপদর উঠান পরিপ্নর্ণ করিয়া জানিয়া গেল, ছেলে কি মজা করে তাহাই দেখিতে।

ইতিমধ্যে বাড়ীর ভিতর হ্নকুম গিয়াছিল, এক গামলা গরম জল আসিল, ঔষধ আর ব্যাণ্ডেজের সরঞ্জাম বাহির হইল।

ইহাতে রাজেন্দ্র আপত্তি করে নাই।

কিন্তু অস্ত্রগ্নলির র্প এক নজর দেখিয়া লইয়াই সে চোখ ব্নজিয়া আছাড়ি-পিছাড়ি করিতে লাগিল, কোনোটা চিরিবার, কোনোটা ঘাঁটিবার, কোনোটা উপড়াইবার—রাজেন্দ্র হাপ্নস নয়নে কাঁদিয়া বলিল, আপনার পায়ে পড়ি, ডাক্তারবাব্ন।

ডাক্তারবাব্ন কিছু বলিবার প্নর্বেই ঈশ্বরী বজ্রনিনাদে কহিল, চুপ রহো, রাস্কেল।

এবং গ্রামের স্ত্রী-প্নর্ষ সম্নদয় লোক ভয়ার্ত্ত রোগীকে সাহস দিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে মজার দিকে ঝুঁকিয়া আসিতে লাগিল।

কুতূহলী জনতাকে কান্তিভূষণ ভর্ৎসনা করিয়া পিছে হঠাইয়া দিয়া রাজেন্দ্রের ঠ্যাং দ্ন'হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল।

বিয়োগান্তক কর্নণস্বরে রাজেন্দ্র ডাকিল, বাবা রে।

প্রফুল্লনলিনীর অবসন্ন হাত হইতে পাখা কাড়িয়া লইয়া গ্রামের ভৈরবী মাসী রোগীর মাথায় প্রবল বেগে বাতাস করিতে লাগিল, পাঁচ সাতজন লোক উৎসাহের সহিত উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল, ভয় নাই, ভয় নাই।

ও-পাড়ার নিস্তারিণীর নিষ্ঠুরতা আর রক্ত দর্শন সহ্য হয় না, সে পিছন ফিরিয়া বসিয়া পড়িল।

নিত্যপদ সুনিপুণ হস্তে মাংস কাটিয়া কাঁটা বাহির করিয়া দিল, ঔষধ লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিল।

ঈশ্বরী সময় পাইয়া বলিল, ওঠগে গাছে।

কিন্তু রাজেন্দ্র আদেশ পাইয়া মাত্র উঠিয়া বসিল, তাহাও ভৈরবী মাসীর হাতের ঠেলায় কতকটা, নিজের চেষ্টায় কতকটা।

ওদিকে, সেই কাঁটাটা একটিবার চোখে দেখিবার লালসায় লোকের একটা হুড়াহুড়ি লাগিয়া গেল, যেন বেলের কাঁটা পায়ের ভিতর হইতে বাহির হইলে অপরূপ কিছুতে দাঁড়ায়।

কিন্তু তখনই নিত্যপদর একটি কথায় যেখানে যে চাঞ্চল্য ছিল তাহা এক পলকে নিষ্পন্দ হইয়া গেল।

কান্তিভূষণ তাহার ডাক্তারের কৃতিত্বের নিদর্শন এবং বিজ্ঞাপন প্রচারের উপায় হিসাবে কাঁটাটা উৎসুক জনতাকে প্রদর্শন করিবার একটা সাড়ম্বর উদ্যোগ মনে মনে করিতেছিল, সে থমকিয়া নিত্যপদর দিকে মুখ তুলিল।

ভৈরবী মাসী পাখা চালাইতেছিল, সে হাত থামাইল, ছেলের পায়ের কাঁটার সঙ্গে ঈশ্বরীর বুকের কাঁটা খসিয়া যাইয়া সদ্যমুক্ত নিঃশ্বাস স্বাভাবিক গতিতে বহিতেছিল, তাহা আটকাইয়া রহিল।

কথাটা এই।

নিত্যপদ চেয়ারের উপর হইতে ঈশ্বরীপ্রসাদকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিল, অস্ত্র করবার ফি আট টাকা—কখন দেবার সুবিধে হবে তোমার ?

সবারই কানে কথাগুলি যায় নাই।

কিন্তু যাহার কানে যায় নাই সে-ও যাহার কানে গেছে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অজ্ঞাত আতঙ্কে বিমূঢ় হইয়া রহিল, যেই ঐ দলপতির ফাঁসির হুকুম হইয়া গেছে, এবং তাহার এই অনুচরবর্গের প্রতি প্রায় তাদৃশ কঠোরই একটা দণ্ডাদেশ উচ্চারিত হয় বুঝি।

ঈশ্বরীপ্রসাদের পিতৃহস্ত দ্বারা উত্তোলিত হইয়া পুত্র রাজেন্দ্রের পুনরায় স্কন্ধারোহণের কথা, কিন্তু ছেলেকে কাঁধে তুলিয়া লইতে হাত না নামাইয়া ঈশ্বরী ছেলের নাক লক্ষ্য করিয়া বরাবর তুলিল পা।

বলিল, লাথিয়ে তোর নাক দেব গুড়ো করে—দে টাকা, ওঠ, না উঠবি ত' এই দিলাম তোর নাক—

ভৈরবী মাসী হাঁ-হুঁ করিয়া উঠিয়া হাত দিয়া ঠেলিয়া তার পা নামাইয়া দিল।

ঈশ্বরী ছেলের নাক ভাঙ্গিতে না পাইয়া বিলাপের সুরে বলিল, হা ভগবান, আট টাকা কাঁটা তুলতে।— তা'হলে লক্ষ্মণের শক্তিশেল তোলাতে শ্রীরামের অযোধ্যা দিয়ে দেয়া উচিত ছিল যে ! সে চুক্তি ত' হয় নাই, সার।

নিত্যপদ লাল হইয়া উঠিল ; নতকণ্ঠে বলিল, কোনো চুক্তিই হয় নাই ; আর চুক্তিই বা কিসের ! অস্ত্র করতে আমি আট টাকাই নিই, ঐ আমার বাঁধা ফি।

শক্তিশেল না তুললে লক্ষ্মণের যে দশা হত এই বেলের কাঁটা না তুলতে পারলে তোমার ছেলেরও সেই দশা হত। যাক আমার ফি আট টাকা।

ইংরেজির প্রভাব সত্ত্বেও ঈশ্বরীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

নিত্যপদ চাহিয়া দেখিল, কান্তিভূষণ মৃদুমৃদু হাসিতেছে, বলিল, হিসেবে তুলবেন, আজকের তারিখে অমুকের পুত্র অমুকের পায়ে অস্ত্রোপচারের ফি আট টাকা বাকি। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, হিসেব ঠিক রাখছেন ত'? কতবার যে ঐ খাতা আদালতে দাখিল করতে হবে তার ঠিক নেই। - এখন ছেলেটাকে একটু উত্তেজক ওষুধ খাইয়ে দিন।

এই কথাতেই এই দৃশ্যের যবনিকা নামিতে লাগিল। নিত্যপদ জানিত না যে, ইতিমধ্যে ঐ 'উত্তেজক' শব্দটা গ্রামস্থ জনসাধারণের মধ্যে যমতুল্য ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে, সনাতনের জীবনান্তের সংস্রবে ঐ ভয়ঙ্কর বাংলা কথাটা ঈশ্বরীও শুনিয়াছিল।

ছেলেকে তাহাই খাওয়ান হইবে শুনিয়া তাহার প্রাণে যেটুকু স্বস্তি ছিল তাহাও লুপ্ত হইয়া গেল, ছেলের উপর রাগ রহিল না, দিগ্বিদিক-জ্ঞানহারার মতো এক লম্ফে ছেলেকে ডিঙ্গাইয়া সে নিত্যপদর পায়ের কাছে যাইয়া বসিয়া পড়িল, ছেলের প্রাণভিক্ষা চাহিয়া সকাতরে বলিল, ও ওষুধটা খাওয়াবেন না সার, আমি বরং আট টাকাই দিতে রাজি হলাম; বলিয়া হাত বাড়াইয়া নিত্যপদর পা ধরিতেই যায় আর কি।

ঈশ্বরীর এই ব্যাকুলতার মর্ম্মার্থ নিত্যপদর প্রাণে পৌঁছিল, বলিল, দিতে তুমি বাধ্য।

ঈশ্বরী উঠিল; পুত্রকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া সে প্রস্থান করিল, যাইবার সময় নিত্যপদর দিকে ম্লান চক্ষে চাহিয়া সে বলিয়া গেল, এই ছেলের পা দুখানা ধরে ধোপার পাটের উপর এর মাথাটা আছড়াতে পারলে তবে আমার গায়ের দুঃখু মেটে, সারু।

রাজেন বাপের কাঁধের উপর কাঁদিয়া উঠিল, হুঁ, হুঁ, হুঁ।

ঈশ্বরীপ্রসাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মজাদার জনতা অদৃশ্য হইয়া গেল, রহিল কেবল নিত্যপদ আর কান্তিভূষণ, উভয়েই নিঃশব্দ।

মনটা কোনো কারণে অস্থির হইলে নিত্যপদর পা কাঁপে, এখন তার পাখানা থরু থরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পাট শুকাইবার আড়ের উপর একটা কাক আসিয়া বসিয়া আছে, মাথা নামাইয়া নামাইয়া সে নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে, এক জোড়া শালিখ উঠানে নামিয়াছে, তাদের কলকণ্ঠের শ্রান্তি নাই, মাঝে মাঝে মাথা বুকের দিকে নোয়াইয়া কাহাকে যেন ডাকিতেছে, আয়!—অদৃশ্য স্থানে ঘুঘু ডাকিতেছে, তার আবেগ প্রাণ স্পর্শ করে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটাইয়া নিত্যপদ বলিল, এই-ই ওষুধ।

কান্তিভূষণ জিজ্ঞাসা করিল, কিসের?

—তা ঠিক জানিনে। হঠাৎ মনে হ'ল, মানুষের তামাসা করবার প্রবৃত্তিটা থাকে না, যদি তার নগদ মূল্য দিতে হয়। টাকা ও দিতে পারবে?

—না।

—তবে ঠিক হয়েছে। ও বাঁধা রইল, গ্রামের মধ্যে আমার মিত্র থাকবে কেবল ঐ লোকটি।—প্রাপ্য ছাড়লে প্রণয় বাড়ে এ বিশ্বাস ভুল, কান্তিবাবু।—হাটের ওপর যে-দীনবন্ধুর দোকান আছে তাকে ত' আপনি চেনেন নিশ্চয়ই।

—চিনি।

—আমি তারই কাছে এ শিক্ষার জন্যে ঋণী।

দীনবন্ধুর অভাবনীয় কৃতঘ্নতা তাহাকে পুনঃ পুনঃ দংশন করিয়া বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

হাটের ঘটনাটি বলিয়া নিত্যপদ বলিল, সে ছেলেমানুষ বটে, কিন্তু উপকার গ্রহণ করবার জ্ঞান তার হয়েছে দেখেছি তখনকার কৃতজ্ঞতায়। সেই জ্ঞান আর একটু বাড়িয়ে নিলেই সে মানুষ হত, কিন্তু তা হয় নাই, হবেও না, তার সংসর্গ খারাপ, শিক্ষার দুয়ার বন্ধ।—যে কঠিন কি দুর্লভ, তাকে পাওয়ার জন্যে মানুষের একটা ব্যাকুল আরাধনা আছে, মানুষ মনে প্রাণে দাস।—তারপর হাসিয়া বলিল, আপনার চা খাওয়াটা তখন ভাল করে শেষ করা হয় নাই, কান্তিবাবু। খুকি যাও ত' মা, তোমার কাকাবাবুর জন্যে চা করে আনো।

খুকী কহিল, যাই, তোমার?

—আমারও।

কান্তি বলিল, ঐ সম্পর্কের কথাটা যখন আপনার মুখে এসে গেছে তখন আপনি বড় ভাইয়ের মতোই আমাকে সম্বোধন করবেন।

নিত্যপদ হাসিয়া বলিল, আচ্ছা।—যা বলছিলাম, যে নিজের গণ্ডীকে দুরতিক্রম্য করে রাখে তাকে প্রভু বলে স্বীকার করে নিতে আমাদের দ্বিধা কি কপটতা থাকে না, তার উপর যদি শিক্ষাকে নিষেধাত্মক করা হয় তবে ত' সোনায় সোহাগা, ইংরেজ আর ব্রাহ্মণ, বলিয়া নিত্যপদ থামিয়া রহিল।

কান্তি বলিল, বাবাকেও দেখেছি তিনি খুব স্নেহপরায়ণ হলেও একটা স্থানে নিজেকে খুব দৃঢ় করে রাখতেন, চতুরতার সাথী কখনও তিনি হন নাই, করতে এলে অসন্তুষ্ট হতেন। তার ফলে তিনি শ্রদ্ধা পেতেন।—ফণী ডাক্তারের কাছে লোক ভিড় করে যায় বটে কিন্তু তাকে ফাঁকি দিতে কারো বাধে না। চীৎকার করাই যার স্বভাব তার চীৎকার কখন গগনভেদী হবে, কখন তার নীচে দিয়ে যাবে তা নিয়ে কেউ বড় মাথা ঘামায় না, বরং ঠাট্টা করে।—মানুষের রাগের ভয়ে কি শাস্তির ভয়ে নত হয়ে থাকা অস্থায়ী; ভক্তিভরে নত হয়ে থাকাই চিরদিনের।—ফণী ডাক্তারের পতন অনিবার্য, আপনার উত্থানও অনিবার্য। বলিয়া কান্তিভূষণ নিজের মনের কথা মুখে প্রকাশ করিয়াই আশান্বিত হইয়া উঠিল।

তারপর বলিল, হাটের উপরকার ঐ আলোচনাটা আপনি স্বকর্ণে শুনেছেন, আর তাঁরা তা দেখেছেন, এ ভালই হয়েছে। আপনি হয়তো খুব মনঃপীড়া পেয়েছেন কিন্তু তাঁরাও ভয় পেয়ে গেছেন।

—কিন্তু তাতে আমার লাভ?

—আপনি যে ওঁদের কত বড় সহায় হয়ে এসেছেন তা ওঁরা জানেন। যার ভরসা করি তাকে পুজো করি।—তারপর কান্তিভূষণ একটু হাসিয়া বলিল, দেবতার

কথাই ধরুন না, মহাদেবের হাতে ইন্টানিন্ডের অপার ক্ষমতা দিয়েও তাঁর আচরণ কি চরিত্র সম্বন্ধে গ্লানিকর গল্পের সৃষ্টি করতে আমরা ভয় পাইনে, মানে সেটা পরোক্ষে, তাঁকে মানুষের দলে এনে পরস্পরের মধ্যে আমোদ করতে।—আপনার সম্বন্ধে ঐ আলোচনাটা ধরুন পরোক্ষ ব্যাপার, কিন্তু পুজোর প্রত ক্ষ ফল আপনি পাবেনই। আপনি শিক্ষিত আর ক্ষমতাশালী এ কথাটা হাজার অন্যায় আলোচনার মধ্যেও ওরা ভুলতে পারবে না, আর একটা কথাও বড় মনে হচ্ছে আমার।

—কি ?

—এই ছেলেটার পায়ের কাঁটা নির্বিঘ্নে আর সহজে তুলে দিয়ে আপনার নিজের না হোক আমার পথের অনেক কাঁটাই আপনি তুলে দিয়েছেন। বিষ খাওয়ানোর কথাটি এবার চাপা পড়লো। বলিয়া কান্তিভূষণ অশেষ তৃষ্ণার সহিত চায়ে চুমুক দিল।

নিত্যপদ জিজ্ঞাসা কবিল, আট টাকা ফি চার্জ করা কি অন্যায় হয়েছে ?

—না। দুটি টাকা সে দেবে ; কিন্তু লোকে বলবে, আট টাকার ডাক্তার এখানে দু' টাকায় দেখছে। আপনি সজ্ঞানে অবশ্যই করেন নাই, কিন্তু লোক টানবার এমন কৌশল আর হয় না। বলিয়া কান্তিভূষণ সজ্ঞান আনন্দে বিভোর হইয়া চা-পান শেষ করিল।

কাপ নামাইয়া রাখিয়া বলিল, আপনি বড়, আমি ছোট, বয়সেও, কাজেও। কিন্তু একটা অনুরোধ আপনাকে করছি, এই সব লোকের সঙ্গে কথা বলার অনুমতিটা আমাকে দিয়ে রাখুন। অবশ্য আপনার অসমক্ষে আমাকে যা বলতে হবে তারই কথা বলছি।

—কেন ?

—আপনি শিথিল হন এ আমি চাইনে। আর, এ কথার ভিতরের উদ্দেশ্যটা আমি না বললেও ক্রমশঃ আপনি জানতে পারবেন।

—আচ্ছা। এখানকার ভদ্রলোকের প্রধান পেশা কি ?

—কি যে তা আমি ঠিক বলতে পারিনে, তবে সুদের পাওনা একটা প্রধান। চাষীর অবস্থা খুব খারাপ।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কান্তিভূষণ বলিতে লাগিল, আমাদের এই নদীটা মাইল পাঁচেক দূরে যেখানে বড় নদীতে পড়েছে সে জায়গার নাম কামারখালি, বড় একটা ব্যবসার স্থান। ষ্টিমারে, নৌকোয়, বহুৎ মাল যাওয়া-আসা করে, কিন্তু সেখানে দেখবেন, পরিশ্রমের যে কাজটা তা করে বিদেশীরা।

—কারা তারা ?

—উড়ে। প্রায় তিরিশ চল্লিশ জন বছর বছর আসে তারা, চল্লিশ পঞ্চাশ হাত খাড়া পাড় ভেঙ্গে ষ্টিমারের আর নৌকোর মাল আড়তে তোলে, আড়তের মাল ষ্টিমারে আর নৌকোয় তোলে। দু'মণ আড়াই মণ এক একটা বস্তা মাথায় করে তারা অক্লেশে ওঠা-নামা করে, প্রত্যেক দিন আড়াই টাকা তিন টাকা তারা রোজগার করে, আর শরীর কি তাদের! আমাদের চারটের সমান তাদের একটার ওজন। বর্ষার সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাস চার-পাঁচ এই আমদানী-রপ্তানী খুব চলে, ঐ ক'মাসেই সম্বৎসরের খোরাক নিয়ে তারা চলে যায়। কিন্তু আমাদের এখানকার

লোকগুলো মাথায় করে মোট বইতে হয় বলে সে কাজে যায় না, সে কাজ নীচ কাজ ! যারা চার-পাচ ভাই তারাও কয়েক বিঘে মাটি কামড়েই পড়ে থাকে ; সারা বৎসর অভাব ঘোচে না, টাকা পয়সা যে পাবে তাকে দিতে পারে না, মহাজনে খাতকে, ভাইয়ে ভাইয়ে, ক্রেতা বিক্রেতায়, প্রজায় গোমস্তায় দিনরাত খচখচি, তাতে কিন্তু মান যায় না। সবারই অনটন, কারণ টাকা এদেশে ফুঁড়ে ওপরে ওঠে, থিতিয়ে নীচে নামা তার দস্তুর নয়।

—বাবু, একটা পয়সা দাও আল্লার নামে। ভিক্ষা চাহিয়া নয়, প্রাপ্য দাবি করিয়া একটি তের চৌদ্দ বৎসরের বালক আসিয়া দাঁড়াইল। গায়ে আলখেল্লা, মাথায় তারের টুপী।

কান্তিভূষণ চুপি চুপি বলিল, এই এক টাইপ্। ওকে জেরা করি শুনুন মজা। বলিয়া কান্তিভূষণ স্বরু করিল, তোর নাম কিরে ?

বালক সদর্পে উত্তর করিল, সেখ কেরাসিন্।

কান্তিভূষণ নিত্যপদর বিস্ময়-বিহ্বলতা দেখিয়া বুঝাইয়া বলিল যে, উহার নাম ইয়াসিন্। সমবয়সীরা উচ্চারণের সাদৃশ্যবশতঃ বিদ্রূপের সুবিধা পাইয়া নামের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া লইয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিল, তোর কে আছে ?

—খোদা আছেন।

অর্থাৎ খোদাকেই সে সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে।

—বাপ-মা কি ভাই নেই ?

—আছে। বাপ্জান আছে, ভাইজান আছে।

—তারা কি করে ?

—আল্লার নামে ফকিরী করে। ভাইজান সত্যিপীরের গান করে।

—তুই কি করিস ?

—আমিও ফকিরী করি, দেখতে পাচ্ছ না ? বলিয়া কেরাসিন সেখ ছাঁচিকুমড়ার খোলা দিয়া প্রস্তুত ভিক্ষাপাত্র সগৌরবে প্রদর্শন করিল।

—কাজ করিসনে যে ?

ফকির উত্তর করিল, গরীব ভালমানুষের ছেলের কাজ করতে আলার মানা আছে। আল্লাতাল্লার নামে যে দান করে আল্লা তারে দোয়া করে। ভিক্ষে দাও

—তোর ঐ ঝুলির ভেতর কি আছে ?

—চাল আছে, আবার কি থাক্‌বে ?

—দেখা দেখি।

কেরাসিন চমৎকার সপ্রতিভভাবে সিঁড়ির উপর উঠিয়া আসিয়া ঝুলির মুখ ফাঁক করিয়া ধরিল, কান্তিভূষণ উঠিয়া আসিয়া উপর হইতে তাহার ভিতর চাহিয়া দেখিল, বলিল, সের পাঁচেক চাল আছে ; বেগুন আর কাঁচালঙ্কাও আছে।

তারপর সেখ কেরাসিনের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, তোমাকে ভিক্ষে দে'য়া হবে না, তোমাকে খেটে খেতে হবে।

কেরাসিন প্রতিবাদ করিল, তোমার কথায় ? আমি গরীব ভালমানুষের ছেলে।

—অর্থাৎ মানী লোক? যাঃ, বলিয়া কান্তিভূষণ ধমক দিতেই কেরাসিন চটিয়া গেল, চিবুক নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল, চোখ রাঙাবার কে তুমি, বাবু? ভাল লোকের মতো ভালভাবে বললেই হয়। কাজ করি না করি সে আমার ইচ্ছে, হা খোদা, তোমারই মর্জি'। বলিয়া পাপীর জন্য পরিতপ্ত হইয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সেখ কেরাসিন প্রস্থান করিল।

ভগবানের নামে দীনবেশ ধারণ করিয়াই যেন এই বালক ফকির সাজিয়াছে। ভাবে ভঙ্গীতে মনে হয়, উদরান্নের কথাটা ইহার পক্ষে গৌণ। এই বয়সেই এই ভাণটাকে সে এত সহজে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে যে, ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। সর্ব্বত্যাগী আপনাকে ভগবানের নামে উৎসর্গিত করিয়া দিবার মনোগতিকে এতই শ্রদ্ধার চক্ষে লোকে দেখিয়া আসিয়াছে যে, সে প্রবৃত্তি না থাকিলেও এই বালক অতীতের ত্যাগী সাধুর দোহাই মানাইয়া অপরকে প্রবঞ্চিত করিবার কাজে সহজেই পরিপক্ব হইয়া উঠিয়াছে, মানুষের সেই শ্রদ্ধাই তার সহায়, শিক্ষক এবং পরিপোষক। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ভুল হইয়া গেছে এইখানে যে, মুখের কথাগুলি অকালপক্ব ছেলের মুখের কথার মতো উপহাস্য হইয়া উঠিতে পারে তাহা সে ভাবিয়া দেখে নাই!

উপহাস্য দিকটাই প্রবল হইয়া একটু আমোদ দিল।

নিত্যপদ বলিল, আপনি চটিয়ে দিলেন, নয়তো ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাও কিছু শোনা যেত।

কান্তিভূষণ বলিল ওর বাবা এলে একদিন আপনাকে তা শোনাব, ছেলে এখনও তত দুরন্ত হয়ে উঠতে পারে নি।

নিত্যপদ হাসিতে লাগিল।

কান্তিভূষণ বলিল, বেলা হ'য়ে গেছে, এখন উঠি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দীনবন্ধু দোকান করিতেছে।

কিন্তু বাজারের হদিস যেমন তার মিলিল না, লোকে ধমক দিয়া কত যে আদায় করিতে চায় তাহারও কিনারা তেমনি তার মিলিল না। এমন কি, ভক্তিভাজন রামদাস চক্রবর্ত্তী একেবারে জ্ঞাতসারে যে আশ্চর্য্য আচরণ করিলেন তাহাতে দীনবন্ধু অবাক হইয়া গেল।

রামপ্রসাদের জ্বর আসিয়াছিল সন্ধ্যাবেলা।

সেইদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে, যখন ঝিকিমিকি বেলা আছে তখন, রামদাস আসিয়া বহু ভণিতার পর ধারেই দুপয়সার শুকনো লঙ্কা লইয়া গিয়াছিলেন, দীনবন্ধুই হাতে করিয়া লইয়া লঙ্কার ঠোঙা তাঁহার হাতে দিয়াছিল।

তিনি বলিলেন, তখুনি আবার এসে পয়সা আমি দিয়ে গিয়েছিলাম রে

পাগলা। আমি কি বাকি রাখি! কদাচ নয়। বলিয়া রামদাস উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন, যেন, উচ্চহাস্য যে করে সে মানুষ সরল আর নির্দোষ হয়, আর সে কাহারো ধার রাখে না।

হাসি দিয়া শতেক কিছু ঢাকা যায়, এমন কি খুনী খুন ঢাকিতে পারে, কিন্তু এই ব্যাপারটি ঢাকা পড়িল না।

দীনু জানে ঠাকুর দেন নাই, মিথ্যা কথা বলিতেছেন ; তখনি ফিরিয়া আসিয়া পয়সা দিলে দেওয়াটা সে দেখিতে পাইত, কারণ তারপর বাপের কাছছাড়া সে হয় নাই। অথচ এই ব্রাহ্মণের পদধূলি লইতে তার বাবা দোকান ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিত।

দীনবন্ধু সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি দিয়েছেন, ঠাকুর্দা ?

রামদাস রাগিয়া গেলেন।

বলিলেন, দুবার করে বলতে হবে না কি ? যদি মিছে কথা বলছি বলে তোর মনে হয়, তবে নিয়ে আয় তামা তুলসী গঙ্গাজল, ছুঁয়ে আমি দিব্যি করছি। বলিয়া তিনি বারম্বার সম্মুখে দুহাত বাড়াইয়া হাত দুখানা কোলের দিকে টানিতে লাগিলেন, যেন তিনি সাঁতরাইয়া তামা তুলসী প্রভৃতির কাছে উপনীত হইতে চান।

তিনিই পেঁীছিতেন, কি ঐ টানে তাহারাই আসিত বলা যায় না, কিন্তু হস্তচালনার টানে রামদাসের কোমরের কাপড় খুলিয়া গেল।

বাঁ হাতে কাপড় চাপিয়া ধরিয়া রামদাস সেই নিঃশ্বাসেই বলিতে লাগিলেন, দেখলে দেখলে ছোঁড়ার আচরণ ! আমি বামুনের ছেলে, দুটি পয়সার জন্যে মিছে কথা বলছি, আমার মুখের উপর বললে ও ! কালে কালে হল কি হে ! বামুনের বাক্যে অবিশ্বাস। দেখলে ত' তোমরা !

দুটি লোক সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদিগকে দীনবন্ধুর এই নিকৃষ্ট আচরণের সাক্ষী মান্য করিয়া রামদাস হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন, বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁর নিতম্বের আন্দোলন দেখা গেল।

ব্রাহ্মণের সাক্ষী দুটি মুখ মুচড়াইয়া হাসিল।

দীনবন্ধু মুখ নামাইয়া বসিয়া রহিল।

এমনি করিয়া বিপরীত পক্ষ হইতে তর্জন আসিল বিস্তর, এমন কি অভিসম্পাৎ এবং চোর অপবাদ পর্য্যন্ত।

মানুষের সঙ্গে দীনবন্ধুর যথার্থ পরিচয় সুরু হইল।

জল নদীর আকারে নামিয়া আসে ; কিন্তু সোজা পথে সে নামিতে পারে না, শত স্থানে তাহাকে মোড় ফিরিতে হয়, এই অসরল গতিই না কি নদীর মৃত্যুর একটি কারণ। মানুষের পক্ষে এ কথা খাটে কি না কে জানে !

সাবিত্রী একধারে বসিয়া থাকে, দীনবন্ধু খরিদ্দার বিদায় করে।

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া হরিধন আচার্য্য বলিলেন, দীনু, তোর বাবার কাছে দুটো পয়সা পেতাম, বাবা, চিনি, দু'পয়সার নিয়ে তাকে একটি আনি দিয়েছিলাম, ফেরৎ পয়সা দুটো তাড়াতাড়িতে তখন নেইনি। ভাবলাম, রামপ্রসাদ

ত' আপনার লোক, থাক পয়সা পড়ে। তারপর ত' আমি এই দেড়টি মাস বাতে বিছানায় পড়ে, বিছানায় পড়েই শুনলাম, রামপ্রসাদ চলে গেছে, ভাবলাম যা তুই, আমিও চলেছি তোর পিছু পিছু। তোর জ্যাঠাইকে বললাম, রামপ্রসাদ ত' চলে গেল। শুনে সে আঁৎকে উঠল; বললে, আহা বেচারী মারা গেল অল্পবয়সে।

দীনবন্ধুর চোখে জল আসিল।

বাতের দৌর্ব্বল্যবশতঃ একটু বিশ্রাম লইয়া হরিধন বলিতে লাগিলেন, তা তুইও বাপকা বেটা। হুঁসিয়ার আছিস, বুঝে চলতে পারবি ঠিক। পয়সা দুটো দিবি এখন? না, পয়সা আর চাইনে নগদ, বরং মতিহারী তামাক দে বাবা দু'পয়সার।

দু'পয়সার একটি পাতার স্থলে দুটি পাতা পাইয়াই হরিধন বুঝিয়া লইলেন, দীনু দর জানে না, পাতা দুটি হাতে করিয়া পাতা দুটির দিকে চাহিয়া হরিধন কাতরভাবে একটু হাসিলেন, যেন এই পিতৃহারা অনাথ বালকের নিকট হইতে পয়সার বিনিময়ে ন্যায্য পাওনাটা লইতে বেদনার কারণ আছে।

যে-কথাটা বলিতে চান তাহা বলিবার পূর্ব্বে হরিধন এদিকে ওদিকে তাকাইয়া লইলেন।

তারপর স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, দীনু, তুই দর জানিসনে, বাবা, দু'পয়সায় দুটি পাতা নয়, তিনটি, আর একটা দে, যাই, খোঁড়া পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিনে আর।

দীনুর সরল মন লজ্জিত হইল। আর একটি পাতা সে দিল।

হরিধন দীনুকে অলীক ঋণের জন্য দায়ী করিয়া দুটি পয়সা অর্থাৎ শূন্য অংক মূলধনের কারবারে শতকরা ছয় শত লাভ লইয়া গেলেন।

কিন্তু সেই প্রথম আর শেষ নহে।

বাপ অবর্ত্তমানে নাবালক পুত্রের দুর্ব্বলতা এবং অজ্ঞানতার সুযোগ লইবার বুদ্ধি নিরক্ষরেরও আছে, বাপের দুচার পয়সার ঋণ দীনুকে শোধ করিতে হইল ঢের, তার মনে হইতে লাগিল, বাবাই দেশের যাবতীয় লোকের নিকট হইতে অগ্রিম পয়সা লইয়া রাখিয়াছিলেন, ধারে তাঁহার নিকট হইতে কেহ কিছু লয় নাই।

এ যে সত্য নহে তাহা বুঝিতে দীনুর বিলম্ব হইলেও ভুল হইল না; কিন্তু উপায় নাই, জোর করিয়া কিছু বলিতে গেলে লোকে চোখ লাল করে, বাপের উদ্দেশে কুকথা বলে।

সেদিন স্বয়ং মতিলাল বলিয়া গেলেন, বাপের দেনা শোধ করবিনে? অহিন্দু ম্লেচ্ছ কোথাকার! তোর বাপটা ছিল ন্যাকা, তুই তার অষ্টগুণ ন্যাকা। নরকস্থ হবি।

মতিলালের কথা এই যে, রামপ্রসাদ দীর্ঘকাল পূর্ব্বে তাঁহার হাতে-পায়ে ধরিয়া নাকি একটি টাকা কর্জ লইয়াছিল, কথা ছিল, গরীব একবারে টাকাটা দিতে পারিবে না, জিনিস দিয়া অল্পে অল্পে ঋণ পরিশোধ করিবে; কিন্তু তিনি দয়াপরবশ হইয়াই এতদিন জোর-জবরদস্তি কিছু করেন নাই, ক্ষমা করিয়াই আসিয়াছেন, এখন যদি সেই ব্যক্তির পুত্র হইয়া দীনু তাহা অস্বীকার করে তবে

মৃত ব্যক্তি যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে যাইয়া নরকে পড়িবে, মানুষের কথায় নহে, শাস্ত্রের নির্দ্দেশে।

দীনু ভয় পাইয়া শপথ করিল, পিতৃঋণ সে শোধ করিবেই, তবে রহিয়া সহিয়া লইতে হইবে, এ অপরাধ যেন তিনি মার্জনা করেন।

মতিলাল বলিলেন,—হিসেব রাখিস।

দীনুর বুক ঝলসিয়া গেল, কিন্তু পিতৃঋণের দোহাইকে সে অমান্য করিতে পারিল না।

পরম আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দরিদ্র রাইরমণ দাস আপনা হইতে আসিয়া দশটি পয়সা দিল; বলিল, আধসের বাতাসার দাম পেত তোর বাবা। আর কেউ কিছু দিলে ?

না, দাদা। সবাই আমাদের কাছেই পাবে বলে জিনিস অমনি নিয়ে যাচ্ছে।

শুনিয়া রাইরমণের মুখ বিমর্ষ হইল।

দীনুর মনে পড়ে, তার বাবা যখন গ্রামের ক্ষুদ্র-বৃহৎ কাহাকেও নাম ধরিয়া না ডাকিয়া গুরুজনের আর স্নেহভাজনের মর্য্যাদা দিয়া সম্বোধন করিতেন, তখন সে ভাবিত, এতগুলি লোকের কেউ তাহাদের অনাত্মীয় নয়। কিন্তু এই অত্যল্প কালের মধ্যেই তাহার সেই আত্মীয়তার আনন্দ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত কাষ্ঠখণ্ডের মতো লুপ্ত হইয়া গেছে।

দিন দিন অবস্থা এমন হইয়া উঠিল যে, দোকান না খুলিলেও চলে, মজুত মাল ফুরাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু সেই অনুপাতে পয়সা সে পায় নাই, বাপের মিথ্যা ঋণ পরিশোধ করিতেই সে প্রায় ফতুর হইয়াছে।

দীনু বোনের কাছেই দুঃখ প্রকাশ করে, বলে, দোকান আর চলল না, সাবি।

—কেন দাদা ?

কোন জিনিসটা বছরের কোন সময়ে কিনিয়া রাখা উচিত সে-দিশা তার নাই, কোন জিনিসটা কোন বাজারে কোন মহাজনের ঘরে সস্তা তাহা তাহার জানা নাই; একা যাইয়া সে-সব জিনিস কিনিয়া আনাও তাহার পক্ষে অসম্ভব, এমন কি, দর যাচাই করাও তাহার দ্বারা হইবে না।

দোকান চালাইবার পক্ষে এই সব বিঘ্ন আর অভিজ্ঞতার অভাব অনুভব করিয়া দীনু হতাশভাবে বলে,—আমি পেরে উঠছিনে।

—কেন, মধো ত' বেশ চালাচ্ছে!

—সে পারে, সে যে তার বাপের সঙ্গে ঘুরত, আড়তদারেরা তাকে চেনে, সে যখন বাপের সঙ্গে থেকে কারবার করা শিখেছে আমি তখন খেলে বেড়িয়েছি। বলিয়া দীনু চোখের জল মোছে।

দীনুর অবস্থা যখন এইরূপ সংকটাপন্ন তখন একদিন সকালবেলা নামাবলী মাথায় জড়াইয়া গোবিন্দ আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনি কোথায় গিয়াছিলেন কেউ জানে না।

কেন আসিয়াছেন, তাহাও অজ্ঞাত।

কিন্তু তাঁহার কণ্ঠধ্বনি সুমধুর, আর তাহা ভয়হারক।

জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেমন আছিস তোরা ?

গোবিন্দের গলা শুনিয়া সাবিত্রী অন্দর হইতে দৌড়াইয়া আসিল।

দীনু পায়ের ধুলো লইয়া বলিল,—ভাল আছি, ঠাকুদ্দা। কিন্তু দোকান আর চলল না !

—কেন ?

—আমি যে শিখি নাই, দিশে পাচ্ছিনে। আর দোকান ত' একরকম খালি হয়ে গেছে। কিন্তু মাল কেনবার পয়সা নাই।

—মানে ?

মানে কি তাহা দীনু আদ্যন্ত জানাইল, পিতাকে সে ঋণমুক্ত করিতেছে।

গোবিন্দ বলিলেন,—দোকান চলবে, চালাতেই হবে। তামাক সাজ দেখি এক কলকে,—আমি বসে ভাবি, কি উপায় করলে দোকান চলে, কাল হাট ত' ?

—হ্যাঁ। বলিয়া দীনু ঐ ভাবিবার কথাতেই আশান্বিত হইয়া তামাক সাজিতে বসিল।

দোকান চলিবে শুনিয়া সাবিত্রী গোবিন্দের গা ঘেঁষিয়া লাফাইতে লাগিল।

গোবিন্দ বাখারির বেঞ্চিতে বসিলেন, এবং নামাবলী খুলিয়া রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

কিন্তু ঠিক এই দোকানটি সম্বন্ধেই ভাবিবার বিশেষ কিছু ছিল না, নগদ টাকা কিছু চাই, পাঁচটি কি ছটি হইলেই চলিবে, ঐ টাকা ক'টি লইয়া জামালপুরে যাইয়া কিছু মালপত্র খরিদ করা আবশ্যক, এই মাত্র।

গোবিন্দ ভাবিতে লাগিলেন অন্য কথা।

মানুষকে ঠকাইয়া কিছু লাভবান হইবার ইচ্ছা মানুষমাত্রেরই আছে, ছোট, বড়, ইতর, ভদ্র, বিদ্বান, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, সকলেরই আছে. সুতরাং যে ঠকায়, ঠকান কাজটাই গর্হিত বলিয়া গোবিন্দ তাহাকে নিন্দা করেন না ; কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পাত্রভেদে ঐ কাজটা কখনো ন্যায়, কখনো হাস্যোদ্দীপক, কখনো মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠে।—একটি ঘুঘু মারিলে দোষ আছে ; কিন্তু শত শত ইঁদুর মারিলে নাই ; বিড়াল মারিলে দোষ আছে, কিন্তু বাঘ মারিলে দোষ নাই। দুইটাই হত্যা, কিন্তু হতজীবের প্রয়োজনীয়তা বা কমনীয়তা, সক্ষমতা বা অক্ষমতার উপরেই হত্যা-ক্রিয়ার শোভনতা বা শোচনীয়ত্ব নির্ভর করে।—"শেয়ানে-শেয়ানে কোলাকুলি" হইয়া প্রবঞ্চনার ব্যাপার চলিলে তাহাকে নৃশংস ব্যাপার বলা চলে না ; একটি বৃহৎ পরিবারের যাবতীয় লোককে ঠকাইয়া পয়সা আদায় করায় কিছুমাত্র গ্লানি নাই, কারণ তাহাতে চাতুর্য্য আছে, কাপুরুষতা নাই।

গোবিন্দের নিজের পেশা তাই।

কিন্তু দুর্ব্বল আর অসহায় এই বালককে উপর্য্যুপরি শোষণ করায় মানুষের ইতরতায় আর নিম্মমতায় ক্ষুব্ধ হইয়া গোবিন্দ ঠাকুর প্রতিহিংসা লইবার কথাটাই ভাবিতে লাগিলেন।

কিন্তু, নিজে ছোঁয়া না দিয়া অথচ দীনুর অবস্থার সঙ্গে কার্য্যকারণের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রতিহিংসা গ্রহণের উপায় তিনি অনেক ভাবিয়াও আবিষ্কার করিতে পারিলেন না।

গোবিন্দ ঠাকুর তখনকার মতো নিঃশব্দে ধূমপান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

বৈকালে দীনুকে লইয়া জামালপুরে গেলেন, প্রয়োজনীয় 'জিনিস-পত্তর' নগদ মূল্যে কিনিয়া দিলেন, তাহাতে কিছু সস্তায় পাওয়া গেল।

তারপর দিন গোবিন্দ ঠাকুরের কীর্ত্তি দেখিয়া হাটের লোক অবাক হইয়া গেল ; দেখা গেল, উগ্রকলেবর গোবিন্দ যেন প্রাণপণ করিয়া দীনুর দোকানে বসিয়া গেছেন, যজ্ঞোপবীত কোমরে নামাইয়া তাহার উপর গামছাখানি কষিয়া বাঁধিয়াছেন, প্রয়োজন অনুসারে কস্তাকস্তি করিয়াও আগে দাম আদায় করিয়া লইতেছেন, এমন কি, ছোট এলাচ নিক্তিতে ওজন করিয়া দিতেছেন, গুণ্তি হিসাবে নহে। তাঁর নামাবলীর দেখা নাই।

দীনু কেরাসিন তেলের বোতল লোকের হাত হইতে লইয়া সাবিত্রীর হাতে দিতেছে, সাবিত্রী তাহাতে তেল ভরিয়া রাখিতেছে।

কিন্তু এদিকে নগদ পয়সা লইবার খুব কড়াকড়ি দেখিয়া অনেক তথাকথিত খরিদ্দার সরিয়া গেল, কেউ একটু হাসিয়া গেল ; কেউ যাব কি যাব না ইতস্ততঃ করিয়া গেল ; কেউ বলিয়া গেল, দীনুকে ফাঁকি দিয়া কিছু 'মারিবার'' মৎলব ঠাকুরের।

আদিত্য পাল ঝগড়া করিয়া গেল,—তুমি কে? তোমাকে কে চেনে হে? পয়সার লেন দেন ছিল আমার রামপ্রসাদের সঙ্গে, এখন আছে দীনুর সঙ্গে। ওরে দীনু, একে কেন বসিয়েছিস?

দীনু গোবিন্দের মুখের দিকে চাহিল।

গোবিন্দ কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

আদিত্য অবশ্য অন্য দোকানে গেল ; এবং অনেককে অন্য দোকানে যাইতে দেখিয়া দীনু বলিল, অনেক খদ্দের চলে যাচ্ছে যে, ঠাকুদ্দা!

গোবিন্দ বলিলেন, যাক, শুধু হাতেই যাচ্ছে, দাম দেবার নাম করে জিনিস অমনি নিয়ে যাচ্ছে না।

দীনু বলিল, ঠাকুদ্দা, তোমার মতো ভাল লোক আমি দেখি নাই।

শুনিয়া গোবিন্দ একটু হাসিলেন।

সন্ধ্যার কিছু পরেই হাট প্রায় নির্জন হইয়া গেল, যাহারা দোকান পাতিয়াছিল তাহারা কুপী জ্বালিয়া ঝাঁকায় বস্তায় তাহাদের পণ্য তুলিয়া লইল, দু'তিনটি গরীবের ছেলে-মেয়ে আসিয়া মানুষের হারান পয়সা অন্ধকারেই হেঁট হইয়া হাটময় খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল, যেখানে মাছের হাট বসিয়াছিল, সেখানে মাছের গন্ধ লইয়াই শৃগালে-কুকুরে কলহ বাধিল, একটি মার্জারকেও তফাতে ঘুরিতে ফিরিতে দেখা গেল।

কোমরের গামছা আর পৈতা যথাস্থানে তুলিয়া দিয়া গোবিন্দ ঠাকুর বাহিরে হাওয়ায় আসিয়া বসিলেন।

দীনবন্ধু তাঁর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

গোবিন্দ বলিলেন, দেখলি ত'? ইতর ভদ্দর কাউকে ধারে দিবিনে, তাতে খদ্দের থাক আর যাক! তোর ছোট দোকান, পুঁজি কম, বাকি পড়লে চলে না।

দীনু বলিল, তা-ই করবো এখন থেকে। আমি ত' ভেবেছিলাম, ঠাকুদ্দা, তুমি দাঁড়ি ধরতেই পারবে না।

গোবিন্দের দাঁড়ি ধরিবার নিপুণতা এবং অনায়াস চাতুরীই দীনুকে বিস্মিত করিয়াছে বেশী।

গোবিন্দ হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, আমার নিজেরই দোকান ছিল যে রে। নিজের হাতে বেচতাম। এ ত' কি হাট, এক সঙ্গে শ'-খানেক লোক হয় কি না হয়। আমার দোকান ছিল নবাবদির বাজারে; পঞ্চাশ খদ্দের একসঙ্গে এসে দাঁড়াত।

—সে দোকান কি হ'ল?

—বিক্রী হয়ে গেল।

—কেন?

—দু'ভায়ে দোকান করেছিলাম; দাদা গোপনে দোকানের নামে ধার করেছিল, সেই দায়ে চলতি দোকান বিক্রী হয়ে গেল।

—ধার করেছিলেন কেন?

—দাদা লোক ভাল নয়। কি জব্বার?

—নুন পাঁচ ছটাক। বলিয়া জব্বার হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

—হাসছিস যে?

—তুমি দোকান করছ!

—হ্যাঁ। পয়সা দে। এত রেতে তোর হুঁস হ'ল?

—না গো, সুরথ সরকার দুধের ছ'টা পয়সা দেয়ই না, ঘ্যাঙাতে ঘ্যাঙাতে তার পিছু পিছু তার বাড়ী পর্যন্ত যেয়ে ধন্না দিয়ে পয়সা ক'টা নিয়ে এলাম। দাও, রাত হ'ল।

পাঁচ ছটাক নুনের পুঁটুলি বাঁধাই ছিল, পয়সা লইয়া গোবিন্দ ঠাকুর তাহারই একটা জব্বারকে দিলেন।

গোবিন্দ হাতে-কলমে কাজ শিক্ষা এবং মুখে রীতি শিক্ষা দিয়া দীনবন্ধুকে একরকম পাকা দোকানদার করিয়া তুলিলেন। দীনবন্ধু এখন খরিদ্দারের সঙ্গে ওজন আর দাম লইয়া বাদ-প্রতিবাদ তুমুল কলরব করিতে পারে।

মানুষ তাহার চক্ষুলজ্জাটা হরণ করিয়াছে, সে এখন তাই নগদ পয়সা না দিলে থাবা চালাইয়া খরিদ্দারের হাতের জিনিস কাড়িয়া লইতে পারে।

গোবিন্দ তাহাতে খুসী হন, উৎসাহ দেন, আর নজর রাখেন, দীনবন্ধু কাজ চালায়।

দোকানে লাভ হইতে লাগিল।

দীনবন্ধু সময় সময় একলা বসিয়া ভাবে।

এই জ্ঞানটা তার এই বয়সেই জন্মিয়াছে যে, মানুষ বড় অসরল, ফাঁকি দিয়া পরের দ্রব্য আপন করিয়া লইবার দিকে মানুষের এত ঝোঁক যে, একটু অসতর্ক হইবার যো নাই, আনমনা হইলেই দেখিতে হইবে, কিছু খোয়া গেছে। তার দোকানের লাভ হইতেছে তার যত্নে, অর্থাৎ তার ঐ জ্ঞানটা ফুটিয়াছে বলিয়া, দীনু তা বেশ বুঝিতে পারে।

কিন্তু সবার উপরে স্থান দিয়া সে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে হরিধন আচার্য্যকে।

গোবিন্দ ঠাকুরকে মতিহারী তামাকের পাতা দু'পয়সায় একটি বিক্রয় করিতে দেখিয়া সে প্রথমে চমকিয়া উঠিয়াছিল, তারপর দুঃখিত হইয়াছিল, এখন ক্রুদ্ধ হইয়া আছে।

দীনবন্ধুর আর একটি মহা ভাবনা আসিল।

সাবিত্রী বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার বিবাহ দেওয়া দরকার; কেউ মনে করাইয়া না দিতেই এই সংকটের কথাটা দীনুর মনে পড়িয়া গেল।

ভাবিয়া ভাবিয়া একদিন নিরিবিলি সময়ে সে গোবিন্দ ঠাকুরকে বলিল, ঠাকুন্দা, সাবির যে বিয়ে দিতে হয়?

গোবিন্দ সব কথাই সহজভাবে লন, আর সব কথারই তৈরী জবাব দেন; সাবিত্রীর বিবাহের কথায় তিনি সহজভাবে তৈরী জবাব দিলেন, দে।

—দেয়া কি সোজা, ঠাকুন্দা?

—কঠিনটা কি?

—টাকা কোথায় পাব?

—টাকা দিতে না হয় এমনি কৌশল করে একটি ছেলে দেখতে হবে। কই সে?

—বাড়ীতে আছে।

গোবিন্দ বলিলেন, বিয়েতে আগে দেখতে হবে কুল, বাপ-ঠাকুন্দা কেমন লোক ছিল, তারপর আর সব। খেটে খাক, লেখাপড়া সামান্য জানুক ক্ষতি নাই; কিন্তু ছেলের স্বভাবটি উত্তম হওয়া চাই।

—সকলের আগে যে টাকা, ঠাকুন্দা। আর অত খোঁজ আমি কেমন করে পাবো!

—আচ্ছা দেখি। টাকা না লাগে অথচ স্বভাবটি উত্তম হয়, এমনি একটি বর চাই ত' সাবির জন্যে? আমি তার ভার নিলাম। বলিয়া গোবিন্দ উঠিতে যাইতেছেন এমন সময় সাবিত্রী আসিয়া দাঁড়াইল; জিজ্ঞাসা করিল, কি ঠাকুন্দা, কিসের ভার নিলে?

গোবিন্দ হাসিয়া বলিলেন, ফাজিল মেয়ে, অমনি আবার শুনতে দৌড়ে এসেছে। বলিয়া সাবিত্রীর চিবুকে হাত দিয়া তার মুখখানা ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। পাত্রের সন্ধানে যাইয়া পাত্রীর রূপের কথা নিশ্চয়ই বলিতে হইবে, সাবিত্রীকে দেখিয়া তাহা তাঁর মনে পড়িয়া গেছে। তারপর বলিলেন, তোর বরের খোঁজে চললাম। বলিয়া তিনি নামাবলী কাঁধে ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দীনু বলিল, তামাক সাজি?

—না। এখনই বেরুবো, খুব সাবধান, ধারে বিক্রী কাউকে নয়। বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

সাবিত্রীর চেহারা ভাল, মায়ের মুখাকৃতি আর দেহের গঠন সে পাইয়াছে; রং ফর্সা কিন্তু অনুজ্জ্বল; মাজিয়া ঘষিয়া সাজাইয়া পরাইয়া বর্ণে উজ্জ্বলতা এবং মুখশ্রীতে লাবণ্য ফুটান যাইতে পারে এবং সেই অবস্থায় পরীক্ষার্থ আনিলে মার্জিতরুচি ব্যক্তির পক্ষেও তাহাকে 'পাশ' না করা কঠিন হইয়া পড়ে। সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার তার চুলগুলি; গর্ব্ব করিতে সে শেখে নাই, কিন্তু তার গর্ব্বের বস্তু হইতে পারে, অযত্নেই তা ঢেউ খেলিয়া কোমরের নীচে পর্য্যন্ত পড়ে, যত্নপূর্ব্বক লালন করিলে আরো সুন্দর হয় ইহা ভুল নহে।

কিন্তু বিবাহের কথায় সাবিত্রীর মুখ ভার হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

নিত্যপদকে শীঘ্রই পুনরায় অস্ত্রধারণ করিতে হইল।

এবারকার রোগ বিবরণ এই ঃ—

রোগীর নাম গোবর্দ্ধন সেখ। সে, অর্থাৎ গোবর্দ্ধন সেখ, বেলা ন'টার সময় এক মুষ্টি মুড়ি আর গুড় খাইয়া কাস্তেখানা হাতে করিয়া গরুগুলির জন্য কিছু ঘাস কাটিতে মাঠে গিয়াছিল। এক বোঝা ঘাস কাটিবার পর এক ছিলিম তামাক খাইয়া আর এক বোঝা কাটিতে সুরু করিয়াছে আর তৃষ্ণায় তার ছাতি ফাটিতেছে, এমন সময় তার মধ্যম পুত্র জয়নাল ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া সংবাদ দিল যে, তাহার অর্থাৎ গোবর্দ্ধনের দুই স্ত্রী, জয়নালের বড় মা আর ছোট মা, অত্যন্ত দাঙ্গা বাধাইয়াছে ; এখন যাইয়া তাহাদের উভয়ের মধ্যে না পড়িলে চুলোচুলির যে-টুকু এখনো বাকি আছে তাহাও থাকিবে না। তাহার নাম গোবর্দ্ধন হইলেও দু'টি সংসারকে দুই স্কন্ধে ধারণ করিয়া তাহার নাজেহালের একশেষ হইতেছে। সে যাহাই হউক, সংবাদ পাইয়া কাস্তে আর ঘাস জয়নালের জিম্মায় রাখিয়া সে যখন দৌড়াইয়া বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল তখন তাহার দুই সংসার একত্র হইয়া উঠানের মাটীতে ভীম আর কীচকের মতো জড়াজড়ি করিতেছে।

কপালে করাঘাতকরতঃ তাড়াতাড়ি যাইয়া সে একটি স্ত্রীর—

এখানে স্মরণ করা আবশ্যক যে, গোবর্দ্ধনের দু'টি স্ত্রী-ই সুপ্রসবিনী ; তবে বড় সংসারটি রত্নগর্ভা, অর্থাৎ দেনমোহরের সম্ভাবনাসহ উপর্যুপরি চারিটি কন্যা প্রদান করিয়াছে ; কিন্তু ছোটটি তা নয়, তাহার গর্ভে কেবল পুত্রই জন্মিতেছে।

সে যাহাই হউক, সে তাড়াতাড়ি যাইয়া বড় সংসারের হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিতে গেলেই, ছোট সংসার বড় সংসারকে ছাড়িয়া দিয়া উভয় সংসারের যে ভর্ত্তা তাহারই, অর্থাৎ গোবর্দ্ধনের বাম হস্তের মধ্যম অঙ্গুলিটি টানিয়া লইয়া মুখে পুরিয়া, কেবল কামড়াইয়া নয়, চিবাইয়া দিয়াছে। তবে ইহাও প্রকাশ থাকে যে, ঠিক তখনই কন্যাপ্রসবিনী বড় সংসারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তার আসে নাই, কিম্বা পক্ষপাতিত্ববশতঃই তাহাকে রক্ষা করিতে গোবর্দ্ধন বদ্ধপরিকর হয় নাই, হাত ধরিয়া যাহাকে সে টানিয়া তুলিতে গিয়াছিল সে বড় বৌ না হইয়া অক্লেশেই ছোট বৌ হইতে পারিত—বড় বৌ যে হইয়া গিয়াছে তাহা দৈবাৎ। প্রতিবেশী মোহর মোল্লা আসিয়া তাহার আঙ্গুল ছোট সংসারের মুখের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছিল। নতুবা—

বিবরণে অবস্থা প্রকাশ করিয়া গোবর্দ্ধন বলিল, এই দেখুন, ম'শয়, সেই আঙ্গুল। বলিয়া গোবর্দ্ধন নিজেই আঙ্গুলের ভিজা ন্যাকড়ার পটি খুলিয়া আঙ্গুল দেখাইল, বলিল, আঙ্গুলের মাথা খেয়ে দিয়েছে, ম'শয় !

নিত্যপদ আঙ্গুলের আহত মাথা দেখিল।

অ্যাম্পুটেশনের পূর্ব্বে ও পরে অনেক হাত-পা সে দেখিয়াছে, কিন্তু তা এমন নয়।

নিত্যপদ দেখিল, দুই অর্থেই গোবর্দ্ধনের কথাটা সত্য, সর্ব্বনাশ করার নাম

মাথা খাওয়া, আর, চিবাইবার পর আঙ্গুলের মাথার যে চেহারা হইয়াছে তাহাতে তাহাকে অর্ধভুক্ত বলা যাইতে পারে।

ঘটনাটা কল্যকার।

গোবর্দ্ধন সকাতরে বলিল, আঙ্গুলের দপদপানিতে ম'শয়, চোপর রাত ঘুম নাই, কেবল চেঁচিয়েছি।

নিত্যপদ বলিল, কাল তখনই এলে না কেন?

গোবর্দ্ধন বলিল,মোহর মোল্লা বললেও তাই, কিন্তু অমনি ত' আসতে পারিনে, ম'শয়! তার একটা খরচ আছে! গুচ্ছের মেয়ে বিইয়ে বড় মাগী মনে করে আমি কি হয়েছি, ঢেঁকির পাঁচ পা দেখেছি! যা রোজগার করি, ম'শয়, বেচে কিনে সব কেড়ে কুড়ে নিয়ে গ্রাস করবে সে-ই। বললাম, একটা টাকা দে, তা দিল না; বলল, ছোট বৌয়ের ঠেঙ্গে নে, যে কামড়েছে। শুনলেন মাগীর কথা! কিন্তু যন্ত্রণায় আর থাকতে পারলাম না, চলে এলাম খালি হাতেই। তবে আপনার যে হক তা আমি দেব, না-দেয়া হবে না। আঙ্গুলটা ফুলেছে কত দেখুন, ম'শয়। বলিয়া গোবর্দ্ধন আঙ্গুলের স্ফীতি নিরীক্ষণ ত্যাগ করিয়া নিত্যপদর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটু হাসিল, হাসিটা সুখের নয়, পরীক্ষার; শূন্য হাতে আসিয়া হতাশ হইয়া ফিরিতে হইবে কি না, ডাক্তারের মুখের ভাবে সেই সংশয়-প্রশ্নেরই জবাব সে খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু নিত্যপদর মুখ একেবারে অবিচলিত।

নিত্যপদ গোবর্দ্ধনকে বলিল, বস।

কান্তিভূষণকে ডাকিয়া আনিতে সে লোক পাঠাইয়া দিল, এবং বাড়ীর ভিতরে গরম জলের জন্য বলিয়া পাঠাইল।

তারপর অস্ত্রের ব্যাগ বাহির করিয়া আনিয়া সে চুপ করিয়া বসিল।

কিন্তু গোবর্দ্ধনের ভয় করিতে লাগিল।

ঈশ্বরীপ্রসাদের পুত্র রাজেন্দ্র ডাক্তারের অস্ত্র দেখিয়া ভয়ে আধখানা হইয়া শোকাবহ কাতরোক্তি করিয়াছিল; গোবর্দ্ধন সশব্দে কাতরোক্তি না করিলেও ভয় পাইয়া গোবর্দ্ধনের গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল ঠিক তাহারই মতো। ডাক্তার স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে।

গোবর্দ্ধন ফণী ডাক্তারের কাছে বহুবার যাওয়া-আসা করিয়াছে, সে কত কথা কয়। এরূপ অবস্থায় ফণী ডাক্তার তাহার অপরাধিনী স্ত্রীকে গালিগালাজ করিত; তাহাকেও যাচ্ছেতাই ভৎ‍‍র্সনা করিত; সেই সূত্রে গ্রামের লোকগুলির উদ্দেশেও কটু কথা বলিত; পৃথিবীর যত লোক দুইটি স্ত্রী লইয়া ঘর করে তাহাদের অভিশাপ দিত, "ধর্ম্ম দেখিত", ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, হাসি-তামাসা, আপশোষ-তিরস্কার, দরদ সে কত। চিকিৎসা তাহার কাছে ঘরোয়া ব্যাপার, চিকিৎসাকে সে ভয়ঙ্কর করিয়া তোলে না।

কিন্তু এই ডাক্তারবাবু অস্ত্রগুলিকে সম্মুখে রাখিয়া যেন কোন সর্ব্বনাশীর ধ্যান করিতেছেন, মুখে তাঁর কথা নাই।

গোবর্দ্ধন আঙ্গুলটাকেই যেন সর্ব্বাগ্রে তুলিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, আমি আসছি, ম'শয়; আপনার ত' বিলম্ব আছে?

নিত্যপদ বলিল,—হ্যাঁ, একটু দেরীই আছে। কান্তি, আর গরম জল এলেই।

—তবে ততক্ষণে আমি একটু আসি।

—আচ্ছা এস।

গোবর্দ্ধন নামিয়া গেল।

কান্তিভূষণ আর গরম জলের গামলা আসিল।

কান্তিভূষণ জিজ্ঞাসা করিল, আজ আবার অসুখ নাকি ?

—হ্যাঁ।

—কে ?

—নাম বললে, গোবর্দ্ধন সেখ। তার স্ত্রী তার আঙ্গুল চিবিয়ে দিয়েছে, কালকের ঘটনা ; মানে, কিছু বাদছাদ দিয়ে তার আঙ্গুলটাকে বাঁচাতে হবে।

—কই সে ?

—আসছি বলে' কোথায় গেল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরও গোবর্দ্ধনের দেখা পাওয়া গেল না। কান্তিভূষণ প্রথমে যেখানে বসিয়া ছিল সেইখান হইতেই তারপর উঠানে নামিয়া এবং তারপর রাস্তায় যাইয়া গোবর্দ্ধনের নাম করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

তাহার ডাক শুনিয়া জনৈক গোবর্দ্ধন চাকি দৌড়িয়া আসিল, কিন্তু গোবর্দ্ধন সেখ আসিল না, কি সাড়া দিল না।

কান্তিভূষণ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ফণী ডাক্তারের কাছে গেছে। আপনি কি বলেছিলেন তাকে ?

—কিছুই বলি নি। তোমাকে ডাকতে পাঠিয়ে বসে আছি, লোকটা চুপ করে বসে থাকতে থাকতে উঠে গেল, বললে, আপনাদের ত' দেরী আছে, আমি আসছি এখুনি।

নিঃশব্দে আরো অর্দ্ধঘণ্টা গোবর্দ্ধনের জন্য অপেক্ষা করিবার পর গরম জল ঠাণ্ডা হইয়া গেল, এবং উভয়ে গোবর্দ্ধনের আসার আশা ত্যাগ করিল।

কান্তিভূষণ ভাবিয়া ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, টাকার কথা কিছু বলেছিলেন তাকে ?

—সে-ই বলেছিল, টাকা আনতে পারিনি ; তাতে আমি আপত্তি করিনি।—যাক সে কথা, চা খাওয়া হয়েছে তোমার ?

—হ্যাঁ, না, তবে।

নিত্যপদ হাসিয়া খুকীকে দিয়া ভিতরে চায়ের ফরমাস পাঠাইল।

কান্তিভূষণ বলিল,—গোবর্দ্ধন ফণী ডাক্তারের কাছে গেছে নিশ্চয়।

—তাই-সম্ভব ; এখানে দেরী হচ্ছিল।

—তা নয়। আপনি ত' এখনো পরিচিত হন নাই ; খারাপ করবেন কি ভাল করবেন কে জানে, এই ভয়েই সে পালিয়েছে। ফণী তাদের অনেকদিনের বন্ধু ; তার হাতে অসুখ ভালও না হয়েছে এমন নয়, মৃত্যু-ব্যাধি নয় বলেই হোক, কি যে কারণেই হোক, হয়েছে, তাই সেখানেই গেছে।

—তা-ই যদি সত্য হয় তবে তোমার যত আয়োজন সবই ত' নিরর্থক হল। খাতা পর্য্যন্ত বাঁধিয়ে এনেছ। বলিয়া নিত্যপদ হাসিতে লাগিল।

কান্তিভূষণ ছ'দিস্তা শ্রীরামপুরী কাগজের এক লম্বা-চৌড়া খাতা বাঁধাইয়া আনিয়াছে, তাহাতে কসি টানিয়া ঘর-পূরণের ব্যবস্থা করিয়াছে, যথা :—রোগীর নাম, পিতার বা স্বামীর নাম, নিবাস, বয়স, সংক্ষিপ্ত রোগী বিবরণ, যে-কয় দাগ ঔষধ দেওয়া হইল, দাগ প্রতি মূল্য, মোট মূল্য, জমা, বাকি—

কান্তিভূষণ বলিল,—আমি চিরকাল আশাবাদী, স্রোত কখন মোড় ফিরবে আগে থেকে কিছুই তা অনুমান করবার যো নেই। একদিন হয়তো দেখব, ফণী ডাক্তার কবরেজকে ছেড়ে আপনার রোগী হয়ে এসেছে।

—তা আর বিচিত্র কি। নিজের চিকিৎসা—

—কেউ নিজে করে না বটে, কিন্তু ফণী নিজেদের চিকিৎসার ভার ডাক্তারকে দেয় না, তখন ডাকে কবরেজকে।

—তা-ই না কি ? কেন ?

—ডাক্তারী ওষুধের উপর মনে মনে ওর কিছুমাত্র আস্থা নেই, বলে, ডাক্তারী ওষুধে রোগ সারে কি না তা নিয়ে এখনো পরীক্ষাই চলছে, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ পরীক্ষোত্তীর্ণ।

—কিন্তু তিনি নিজে ত' নির্ব্বিচারে চালিয়ে যাচ্ছেন !

—ন্যায়-অন্যায় বিষয়ে তার মতামত খুব আধুনিক। সে বলে, ভগবান ক্ষিদে দিয়েছেন এই জেনে যে, যেন তেন প্রকারেণ লোকে তা মেটাবে ; কিন্তু 'স্বচ্ছন্দ বনজাতেন শাকেন' পরিপূর্ণ করলে উদর বিদ্রোহ করে এ-ও তাঁরই নিয়ম। আবার ওদিকে একটা স্বর্গের লোভ আর নরক-ভীতি দিয়ে রেখেছেন, এই সব দেখে শুনে আমি অতিরিক্ত পাপ-পুণ্যের দিক দিয়ে যাইনে, একেবারে যা তা পাপ আর শুকিয়ে শুকিয়ে পুণ্যি দুই-ই আমি করিনে ; কারণ, গিয়ে যদি দেখি নরক আছে, তবে সাজাটা অল্পের উপর দিয়েই যাবে, আর যদি দেখি, নাই, তবে ইহকালের লোকসানটা তেমন বাজবে না।

শুনিয়া নিত্যপদ চমৎকৃত হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে চর্ব্বিতাঙ্গুলি গোবর্দ্ধনের সঙ্গে নিত্যপদর পারিবারিক হিতৈষী মতিলালের পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হইয়া গেছে। মতিলাল কন্যার সপ্তম মাসে সাধভক্ষণ উপলক্ষে দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া দড়ির সাহায্যে দুগ্ধের ভাণ্ড হাতে ঝুলাইয়া ফিরিতেছিলেন, গোবর্দ্ধন আঙ্গুল লইয়া ফণী ডাক্তারের কাছে যাইতেছিল।

মধ্যপথে মজুমদারদের জামতলায় উভয়ের সাক্ষাৎ হইল।

গোবর্দ্ধন প্রচুর দুগ্ধ সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া মতিলালকে প্রশ্ন করিল না ; মতিলালই তাহাকে দাঁড় করাইয়া জানিতে চাহিলেন, সে কোথায় চলিয়াছে ?

গোবর্দ্ধন বলিল,—"ইস্"—

তারপর সে জানাইল, এই আঙ্গুল লইয়া সে 'ফণীবাবু ডাক্তার ম'শয়ের' কাছে চলিয়াছে।

মতিলাল অঙ্গুলির বৃত্তান্ত শুধাইলেন না ; কিন্তু অঙ্গুলি চিকিৎসার দরকার হইয়াছে বুঝিয়া তিনি পুনরায় জানিতে চাহিলেন, নিকটবর্ত্তী বৃহত্তর ডাক্তারকে ত্যাগ করিয়া সে দূরবর্ত্তী ক্ষুদ্রতর ডাক্তারের কাছে কেন যাইতেছে ?

গোবর্দ্ধন তদুত্তরে জানাইল, নিকটবর্ত্তী ডাক্তারের শরণাপন্ন সে হইয়াছিল ;

এমন কি সেখান হইতেই সে এখন আসিতেছে, কিন্তু যাইলে কি হইবে? ডাক্তার-বাবু তাহার সঙ্গে কথাই কহেন নাই!

—"কথাই কহেন নাই।"—নিদারুণ প্রতিধ্বনি উচ্চারণ করিয়া মতিলাল হতবাক হইয়া গোবর্ধনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, গোবর্ধনের মুখখানা সত্যই সম্মুখে রহিয়াছে, কিন্তু সেই মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে কি একটা সুবৃহৎ আর সুসজ্জিত আশার সত্যবস্তু যেন মতিলালের সম্মুখ ছাড়িয়া দিগন্তে বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু তাহাকে বিলীন হইতে দিলে চলিবে না।

বলিলেন,— আয়, আমার সঙ্গে আয়।'

গোবর্ধন বলিল,—না, ঐ ছোট ডাক্তারের কাছেই যাই। বলিয়া সে আঙুল লইয়া আর অপেক্ষা করিতে পারিল না।

দুধের ভাঁড় হাতে করিয়া আর সেখানে দাঁড়াইয়াই মতিলাল আত্মপক্ষে এবং বিরূপাক্ষ প্রভৃতি বন্ধুবর্গের পক্ষেও অত্যন্ত নির্ভরসা হইয়া গেলেন ; এবং সেই ক্রোধেই তিনি গোবর্ধনের মুখে যাহা শুনেন নাই এমন অনেক অশ্রুতপূর্ব্ব বাক্যের কল্পনা করিয়া বাষ্পবেগে ফুঁসিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে হইল, এই ডাক্তারটিকে পথে আনিতে হইলে কঠিন হওয়া দরকার। ডাক্তারের দাদা সত্যপদর বন্ধু হিসাবেও তাঁর কর্ত্তব্য বজ্রাদপি কঠিন অর্থাৎ অগ্রজের স্থলাভিষিক্ত হইয়া উপদেশ দিবার অধিকার তাঁর আছে। তারপর তাঁর মনে হইল আর কিছু নয়, টাকা দিতে অক্ষমতা জানাইয়াছে বলিয়াই নিত্যপদ রোগীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আট টাকা ফি বেলের কাঁটা তুলিতে! নাপিত যা দু'পয়সায় করে, নরুণের বদলে বিলাতি ছুরি হাতে করিয়াছিল বলিয়া তারই দরুণ আট টাকা!—উগ্রলোভ ধৃষ্টকে কিছু শোনান দরকার।

এবং শুনাইতেই তিনি আসিলেন।

নিত্যপদ তাঁর মনের কথা জানিত না ; সে সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া বলিল, —আসুন।

দুধের ভাঁড়ের দিকে চাহিয়া কান্তিভূষণ বলিল,—আসুন, কাকা।

অত্যন্ত সাবধানতার সহিত দুধের ভাঁড় নির্ব্বিঘ্ন স্থানে রাখিয়া দিয়া মতিলাল সযত্নে আসন গ্রহণ করিলেন।

সোজা নিত্যপদর দিকে চাহিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন,—ব্যাপারটা কি?

অক্ষরগুলি আর ধ্বনির গর্ভে কত অর্থ আর কত দুঃখের কত অনুভূতি নিহিত ছিল তাহা উঁহাদের কেহ অনুমান করিতেও পারিল না, কেবল অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উহারা মতিলালের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মতিলাল নিজেকে উদ্ঘাটিত করিতে লাগিলেন ; 'গোবর্ধনের সঙ্গে পথে দেখা হল, সে এসেছিল তোমার কাছে, তুমি তার সঙ্গে কথা কও নাই যে?' জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি কুঞ্চিত ভ্রূমধ্য আরও কুঞ্চিত করিয়া দৃষ্টিও উত্তপ্ত করিয়া তুলিলেন।

প্রশ্নের সুরে আর মুখের ভঙ্গীতে বিস্ময় নয়, অনুযোগ নয়, অত্যন্ত ব্যক্ত রূঢ় ভর্ৎসনা ছিল—তাহা নিত্যপদ অনুভব করিল, কিন্তু তাহা যে তাহার অগ্রজের বন্ধু হিসাবে এবং বিপথগামী তাহাকে 'পথে আনিবার' অভিপ্রায়ে দেখা দিয়াছে তাহা নিত্যপদ ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিল না।

ধীরে ধীরে বলিল,—করেছি ত'! বলিয়া জলপূর্ণ গামলাটির দিকে চাহিয়া সে অবজ্ঞাভরে অন্যদিকে দৃষ্টি না ফিরাইয়া মতিলালেরই মুখের দিকে চাহিয়া রহিল এমন শিষ্টভাবে যে, ঐ প্রবীণ ব্যক্তির যে-কোনো অনুজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইতে সে প্রস্তুত।

কিন্তু মুখে আর কিছু বলিল না, বলিল না যে, কি করিয়া গোবর্দ্ধনের আঙ্গুলে ক্ষত হইয়াছে তাহা সে শুনিয়াছে, জল গরম করিয়া আনা হইয়াছিল ইত্যাদি।

কিন্তু ঐ একটি কথায় বিসম্বাদিত সকল ব্যাপার চুকাইয়া দিবার চেষ্টাকে দম্ভ মনে করিয়া মতিলালের অসন্তোষ ধূম পরিমাণে বাড়িয়া গেল, সহসা কি সহজে শেষ হওয়াটা তার সয় না। মতিলালের অশিক্ষিত মনে চিন্তাপ্রসূত বক্তব্য কখনো সুস্পষ্ট শরীরী হইয়া উঠিতে পারে না, ঝড়ে-ওড়া শুষ্ক পাতার মতো পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবিন্যস্ত শব্দরাশি প্রবলবেগে মুক্ত করিয়া দিতেই তিনি অভ্যস্ত, পরের কাছেও তাহাই তিনি চান; নতুবা তাঁর মনে হয়, প্রতিপক্ষ তামাসা করিতেছে, তাঁর মনের ঘটা নষ্ট করিয়া দিয়াছে, যেন আশ্রয়চ্যুতি ঘটিয়া তাঁর সব ঘোলা-ঘোলা আলগা আলগা অস্বস্তিকর লাগে।

মতিলাল বলিতে লাগিলেন,—কথা কয়েছ? কৃতার্থ করেছ তাকে। কত টাকা চেয়েছিলে? তার পরিবারটিকে চাও নাই ত'?

নিত্যপদর মুখমণ্ডল বেদনায় ভরিয়া উঠিল, উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই, অর্থাৎ ডাক্তার ফিয়ের বাবদ রোগীর স্ত্রীটিকে চাহিয়াছিল কি না তাহা স্বীকার বা অস্বীকার করিবার পূর্ব্বেই, মতিলাল সমান তেজে বলিতে লাগিলেন, এটা উপোসী লোকের দেশ। তুমি ঈশ্বরীপ্রসাদের ছেলের পায়ের কাঁটা তুলতে আট টাকা চেয়েছিলে শুনেছি—শুনে হেসে আর বাঁচিনে। এর কাছে ষোল টাকা, কি টাকার বদলে তার হাল লাঙ্গল গাই বলদ চেয়ে বসেছ বোধ হয়।

টাকা চাওয়াটা যে কত বীভৎস হইতে পারে তাহাই একেবারে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া মতিলাল ঐ টাকার কথাটাই ফেনাইতে লাগিলেন, কারণ অন্ততঃ নিজের সম্বন্ধে একটা চক্ষুলজ্জার সৃষ্টি করিয়া ইহার অর্থগৃধ্নুতা ঘুচাইতে হইবে।

বলিতে লাগিলেন,—রাতারাতি লুঠতরাজ করে ঘরে ফেরবার মতলব তোমার আছে তা আমরা জানতাম না,—ভদ্রলোকের সম্বন্ধে কে-ই বা তা আগে থেকে জেনে বসে থাকে। গরীবের প্রতি দয়া তোমার নেই, সেইটাই আমরা প্রধানতঃ আশা করেছিলাম, সেই কারণেই আমরা ক্ষুণ্ণ হয়েছি বেশী। তোমার দাদার দয়ার কথা শুনলে তুমি বোধ হয় দম ফেটেই মারা যাবে, টাকাকে সে চেনে নাই কোনোদিন, টাকাই তাকে চিনে তার কাছে আসত। গরীবের সঙ্গে কথা না কওয়া বড় লোকেরা বাবুয়ানির মধ্যেই গণ্য করে জানি; দেশের ঐ গরীবটার সঙ্গে দু'টো কথা কইলে তোমার বাবুগিরির কি ক্ষতি হ'ত তা তুমিই জান! আমাদের সঙ্গে কবে যে তুমি কি করে বসবে।

আতঙ্কবশতঃ থামিয়া এইখানে মতিলাল নিঃশ্বাস লইলেন, নিজেদের ভবিষ্যতের ভয়াবহ চিত্রটাকে নগ্ন করিয়া দেখাইতে তিনি পারিলেন না।

নিত্যপদ মৃদুকণ্ঠে বলিল, এ সব আপনি অন্যায় বলছেন।

নিত্যপদর এই কথার পর আরো এক মুহূর্ত্ত থমকিয়া থাকিয়া মতিলাল বলিয়া উঠিলেন,—অন্যায় সবাই বলছে; চিকিৎসা যা করছ তা-ও সবাই বলছে, অন্যায়ই বলছে নিশ্চয়, কিন্তু এ-কথা আমাকে বলতেই হবে যে, ও-সব ধাষ্টোমো এখানে চলবে না। আমরা ভেবেছিলাম, বেশী শিখে এসেছ, বিদ্যা দদাতি বিনয়ম, বিনয়ী হবে, দরদী হবে, তোমাকে আমরা ভাইয়ের মতো পাব।

—বিনামূল্যে। বলিয়া কান্তিভূষণ যেন আভ্যন্তরিক একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিল।

মতিলাল তাহার দিকে চোখ গরম করিয়া তাকাইলেন; বলিলেন, তুমি থামো, বার হাত কাকুড়ের তের হাত বিচি! ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেও না।

কিন্তু কান্তিভূষণের আর ঘোড়া ডিঙ্গাইবার ইচ্ছা ছিল না, সে থামিয়া রহিল।

মতিলাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দাঁড়াইয়াই বলিতে লাগিলেন, টাকা দিতে না পারলে আমাদেরও তুমি কাণ ধরে তাড়াবে, এ আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। সবাই তোমরা গুণধর। বলিয়া ডাক্তার এবং তার কম্পাউণ্ডারকে: অর্থাৎ দুইটি জীবকে এক ঢিলে হত্যা করিয়া দিব্যচক্ষু মতিলাল এক তরফা জয়ে একটা অপরিপুষ্ট আনন্দ আর দুঃখের ভাণ্ড লইয়া এমন বেগে প্রস্থান করিলেন যে, চেষ্টা করিলেও তাঁহার নাগাল পাওয়া যাইত না।

কিন্তু এ-সংশয়টি তিনি লইয়াই গেলেন যে, তাঁহার নিজের সম্বন্ধে একটা দুরতিক্রম্য চক্ষুলজ্জার সৃষ্টি করিয়া লোকটাকে পথে আনিতে পারা গেছে কি না।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কান্তিভূষণ হঠাৎ হাসিয়া উঠিল; বলিল, ভাল একটা 'সিন্' হয়ে গেল। তারপর বলিল, সব মাটি হ'ল দেখছি।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, মতিলালের উদ্‌ভ্রান্ত শব্দ-ঝঞ্ঝা নিত্যপদকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সে শুনিয়াছে, এই মতিলাল পুত্রবতী পল্লীজননীর সেই পুত্রটি, 'গুণীগণ-গণনারম্ভে" যাহার নামই উল্লেখ করিতে হয়, তিনি প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ: সুতরাং তাঁহাকেই গ্রাম্যচরিত্র এবং প্রবৃত্তির প্রতিনিধি গণ্য করা যাইতে পারে। অত্যল্প দিনেই নিত্যপদর শিক্ষা হইয়াছে যে, ধীরতা আর অভিমান এখানে পোষাকী বিলাসের সামগ্রী, তাহা লইয়া শিক্ষিত মনের সূক্ষ্ম বিচরণের পথ এখানে নাই, এখানে যুক্তি চলিবে না, ন্যায়ের তর্ক চলিবে না, অর্থাৎ স্থিরমস্তিষ্কে আর নিরুপদ্রবে কোনো প্রশ্নের মীমাংসায় পৌঁছান যাইবে না। প্রচুর শব্দোৎপাদন-পূর্ব্বক দিগ্‌বিদিকে ছুটাছুটি করিতে না পারিলে এখানে অস্তিত্বই স্বীকৃত হইবে না। নিত্য শোকের আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া মানুষের মনে যে অসাড়তা আসে, তেমনি একটা স্থূল অসাড়তার আবরণ দিয়া নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে হইবে, নতুবা দুঃখের সীমা থাকিবে না।

বলিল, কি মাটি হয়েছে?

—গিয়ে উনি দল পাকাবেন; মিছে কথা বলবেন যে, ওকে আপনি অপমান করেছেন, কথার জবাব দেন নাই, দিলে বলতেন, সেদিনকার বালক, ওর বাচালতা দেখ।

বলিয়া কান্তিভূষণ নিজেরই পূর্ব্বোক্ত কথার উল্টা কথা বলিয়া বসিল ; "কিন্তু তাতে মাটি কিছুই হবে না, আপনাকে পাবার আশা কারু তাতে ঘুচবে না।"

ঘুচবে কি না তাহা নিতান্তই অনিশ্চিত।

কিন্তু আলস্যের যে একটা মন্থরতা সেখানে বিরাজ করিতেছিল তাহা নেপথ্যের একটি শব্দেই ঘুচিয়া গেল।

—ডাক্তারবাবু আছেন ?

জিজ্ঞাসাটা হুংকারের কাছাকাছি গেছে।

কান্তিভূষণ কণ্ঠস্বর চিনিত ; বলিল, ফণী ডাক্তার ! কিন্তু তৎপূর্ব্বেই নিত্যপদ চকিত হইয়া উঠিয়াছে, তার পেটে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্লীহা থাকিলে অবিলম্বে চুপসিয়া যাইত। কিন্তু ফণী ডাক্তারের এ হুংকার আপ্যায়নমূলক ; চেঁচাইয়া কথা না কহিলে মানুষ মানুষের কর্ম্মক্ষমতা এবং আত্মীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না বলিয়া যাহাদের বিশ্বাস আছে, ফণী তাহাদের শীর্ষস্থানীয়।

তখনই খালি-গা আর চটি-পায়ে ফণী ডাক্তার দৃষ্টিপথে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহারই পশ্চাতে দেখা গেল চর্ব্বিতাঙ্গুলি গোবর্দ্ধন সেখকে, চর্ব্বিত অঙ্গুলিতে ফুৎকার দিয়া সে যন্ত্রণা নিবারণের ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে।

—আসুন। বলিয়া নিত্যপদ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ফণী ডাক্তার বলিল, আপনার রুগীকে আপনার কাছে ফিরিয়ে এনেছি, এ আপনারই রুগী, আমার রুগী কেমন করে হবে ? প্রশ্ন করিয়া ফণী উঠিয়া আসিল ; চমৎকার সপ্রতিভতার সহিত উপবেশন করিল ; পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার আনন্দে লোকে যেমন করিয়া কথা বলে তেমনি স্বচ্ছন্দ কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল, "বেটা নির্ব্বোধ, গিয়ে আমাকে বললে, আপনি ওর সঙ্গে কথা কন নাই, কি কথা কইবে রে তোর সঙ্গে ?" বলিয়া গোবর্দ্ধনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, পুরাণের গল্প শুনবি ত' আমার কাছে যা'স, বেদ-বেদান্তের লেকচার দেব, ঠেসে শুনিস। কিন্তু এ কি আমার কর্ম্ম। দেখছেন ব্যাপারটা ! স্ত্রী দিয়েছে আঙ্গুল চিবিয়ে ! ভগ্নীপতিরা তোর হুঁকো-পানি বন্ধ করবে না রে ?

গোবর্দ্ধন উঠিয়া আসিয়া একান্তে বসিয়াছিল, বলিল, না, মশ'য়।

ফণীভূষণ হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিল, আহাম্মকের দুম। জানেন, অত্যন্ত কলরব করে আর কথার বাজে খরচ করে এদেশ বশ করতে হয় ! আপনিও যেমন, কথা বলতে চান না। দেখা রে আঙ্গুল। আঙ্গুলের আধখানা মুখের ভেতর কেটে রাখতে পারত তবে বলতাম, হাঁ, দাঁতাল মেয়ে মানুষ বটে ! দেখা, দেখা।

নিত্যপদ বলিল, তখনই দেখেছি ; নিয়ে এসেছেন, ভালই হয়েছে, দু'জনে থেকে অস্ত্র করাই ভাল হবে, বরং আপনিই ছুরি নিন, আমি—

—আমি বুঝি সিনিয়ার ! বলিয়া ফণীভূষণ হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল, বলিল, ছুরি দেখলে আমার ভয় করে। আপনাকে আমি সাহায্য করবো কি ! ঐ ওখানে গিয়ে আমি চোখ বুজে বসে' থাকব। বলিয়া এমন দূরবর্ত্তী আর বৃহদাকার একটি তিন্তিড়ী বৃক্ষ সে দেখাইয়া দিল যাহার আড়ালে যাইয়া চোখ বুজিয়া বসিলে ছুরি সম্বন্ধে নির্ভয় হওয়া সম্ভব।

নিত্যপদ জিজ্ঞাসা করিল, আমার ফি-টা কে দেবে ?

ফণীভূষণ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, আমি দেব, আদায় করে দেব, দিবি ত' ?

গোবর্ধন অকাতরে বলিল, দেব, মশ'য়, না দিয়ে কি উপায় আছে। একদিনের কাজ ত' নয়! আবার আসতে হবে ত'! না দেই ত' আমার ঘর-বাড়ী রইল, আমি রইলাম, আপনারাও রইলেন, বাড়ী ছেড়ে ত' যেতে পারব না। যেন ঘর-বাড়ীর খরিদ্দার এখানে ঢের ; ডাক দিয়া আসিলেই উপযুক্ত মূল্য দিয়া ঘর-বাড়ী খরিদ করিবে ; আর ডাক্তারের পক্ষে টাকা আদায় করিবার সেটাই সর্বাপেক্ষা সহজ উপায়।

ফণী পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, ছোট সংসারকে এক হাত নিবি ত' পরে ?

—নিতে পারব না, মশ'য় ; নিতে গেলে এবার কান যাবে।

—দূর, বেটা ভেড়ুয়া, তোর মুখ দেখলে অযাত্রা। বলিয়া ফণী কত যে ফুর্তি পাইল তাহার ইয়ত্তা নাই।

গরম জল আসিয়া পড়িল।

অস্ত্রোপচার "কৃতকার্যতার সহিত" সম্পন্ন হইল। ফণীভূষণ ছুরির ভয়ে বৃক্ষতলে যাইয়া চোখ বুজিয়া বসে নাই, সেই বাড়াবাড়ি কথাটা তার বিনয়মূলক অস্বীকারকে হৃদয়গ্রাহী করিবার কায়দা। পটি-বাঁধা আঙ্গুল কোথায় রাখিলে একটু আরাম পাওয়া যায় তাহার দিশা না পাইয়া গোবর্ধন হাতখানা একবার হাঁটুর উপর একবার কাঁধের উপর একবার অপর হাতের উপর তুলিয়া দিতে লাগিল।

এতক্ষণে উহাদের কথা কহিবার অবকাশ ঘটিল।

ফণী বলিল, আপনার দিব্যি হাত, খ্যাঁচ্ খ্যাঁচ্ করে ছেঁটে ছুটে চিরে ফেঁড়ে দিলেন—আঙ্গুল একটু কাঁপল না। বলিয়া ফণী এমন গদগদ হইয়া উঠিল যেন নিত্যপদর যে-আঙ্গুল কাঁপে নাই সে-আঙ্গুল তার চির-জীবনের নিত্য-আরাধ্য সামগ্রী হইয়া রহিল।

কান্তিভূষণ বলিল, বুক কাঁপলেই আঙ্গুল কাঁপে। উনি ত'—

বলিয়া আর কিছু বলিল না।

উনি কি এবং ও'তে তাতে কি প্রভেদ তাহা পরিষ্কার বুঝিয়া লইয়া এবং স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিয়া ফণী কান্তিভূষণকে শুনাইয়া নিত্যপদকে বলিল, আমরা হাতুড়ে, বুঝলেন। ক্ষমা-ঘেন্না করে একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে নেবেন, পরস্পরের সম্প্রীতি না থাকলে কেউই আমরা বাঁচব না।

কান্তিভূষণ মাথা দুলাইয়া ইঙ্গিতে জানাইল, তাহা সত্য।

নিত্যপদ একটু হাসিল, অনুমোদনের কি অবিশ্বাসের হাসি সেটা, তাহা বুঝা গেল না।

গোবর্ধন সজলচক্ষে বলিল, তা ঠিক, মশ'য়।

দশম পরিচ্ছেদ

ওদিকে মতিলাল দুধের ভাঁড় তাড়াতাড়ি ঘরের দুয়ারে নামাইয়া দিয়া সেই পায়েই ছুটিয়া ধাইয়া ইংরেজী জানা ঈশ্বরীপ্রসাদকে তার বাড়ীর ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছেন।

নিত্যপদকে যথেচ্ছা শ্রুতিকটু সম্ভাষণ করিয়াও তাঁর "মনের আশা মেটে নাই," সাক্ষী লইয়া নিত্যপদর চোখের উপর ধরিয়া প্রমাণ করিতে হইবে যে, সে কতবড় অর্থপিশাচ। বাক্‌প্রাচুর্য্য এবং স্বরপ্রাবল্যের দ্বারা যদি সত্যই মানুষকে সর্ব্বদাই পরাস্ত করা যাইত, তবে মতিলাল চিরকাল অপরাজেয়ই থাকিয়া যাইতেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কথা না কহিয়াও শক্তি-প্রতিরোধের একটা ব্যবস্থা সংসারে আছে।

নিত্যপদর গম্ভীর মুখের সংক্ষিপ্ত উত্তরে কি ছিল কে জানে, কিন্তু মতিলালের মনে হইয়াছে, তাঁহার প্রতিষ্ঠা উহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এমনি ধারা জিদের দ্বারাই তিনি একটি ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন সন্দেহ নাই; তথাপি তাঁহার বাক্যের যে প্রতিবাদ করে সে-ও উচ্চকণ্ঠেই করে, প্রতিবাদে তিনি প্রচুর বাক্যাড়ম্বরের সম্মুখীন হইতেই অভ্যস্ত, হোক তাহা অর্থহীন, তিনি যে ভুল বলিতেছেন, তাঁহার প্রদত্ত সংবাদ যে ভিত্তিহীন, তাঁহার অভিযোগ যে অমূলক, তাঁহার ধারণা যে অনুচিত, অর্থাৎ তিনি যে মিথ্যাবাদী বা চপল বা ক্রুর ইহা তিনি শুনিয়া থাকেন, কিন্তু হাল্কা মনে হয়, সর্ব্বাঙ্গ রি-রি করিয়া প্রতিহিংসা লইবার ইচ্ছা এমন করিয়া জাগ্রত হয় না, আজ যেমন হইয়াছে।

নিত্যপদর দাম্ভিকতা এবং অসামাজিকতা যে কত, তাহারই অকাট্য প্রমাণস্বরূপ মতিলাল ঈশ্বরীপ্রসাদ নামক ইংরেজী-জানা সম্ভ্রান্ত সাক্ষীকে জোরে টানিয়া আনিয়া, যেখানে বসিয়া নিত্যপদ, ফণী এবং কান্তিভূষণ কথা কহিতেছিল, সেইখানে হাজির করিয়া দিলেন, ঈশ্বরীপ্রসাদ সংকুচিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাঁহার মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া, তাঁহার মুখে কি কথা ফোটে তাহাই শুনিবার জন্য তিনজনেই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল।

কিন্তু মতিলাল হঠাৎ খানিকটা দমিয়া গেলেন। মোকদ্দমা সম্পর্কে যে-কথা বলা অনুচিত, বিভ্রান্ত সাক্ষী শপথপূর্ব্বক তাহাই বলিয়া গেলে সেই হতভাগ্য পক্ষের মুখের চেহারা যেমন হয়, গোবর্দ্ধনকে সেখানে উপবিষ্ট দেখিয়া মতিলালের মুখ দেখিতে কতকটা তেমনি হইল, জয়ের আশা বুঝি নাই।

কিন্তু সে অতি অল্প সময়ের জন্য, মতিলাল অত সহজে পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র হইলে লোকের ঠেলায় এতদিন তাঁহাকে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিতে হইত—

আগাইয়া আসিয়া মতিলাল বলিলেন, বড় যে বলা হচ্ছিল, 'আমি নির্লোভ।' আট টাকা ফিস এই লোকটার কাছে তুমি চাও নাই ?

'নিত্যপদ বলিল, চেয়েছি, কিন্তু ও দেয় নাই। আর আমি নির্লোভ তা ত' আমি বলিনি।

মতিলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি না বললে আমি পেলাম কোথায় ?

যেন মনগড়া কথা বলিয়া সংসারে কিছু নাই।

নিত্যপদ জবাব দিল না—অপরে যে কথা বলে নাই, সে কথা কোথায় পাওয়া যায় তাহা বোধ হয় নিত্যপদ জানিত না।

মতিলাল তেমনি রুখিয়া রুখিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি তোমার দাদার বন্ধু—আমাকে তুমি বসতে পর্য্যন্ত বললে না ; তবু তোমার হিত আমরা চাই ; কিন্তু তোমার যেমন এক-রোখা আচরণ দেখছি, তাতে তোমার কাছে নিজের মান রাখাই দায়।

ফণী মধ্যস্থ হইয়া বলিল, কিন্তু রোগীকে উনি যখন দেখেছেন তখন আর অত কথা কেন, খুড়োমশাই ?

—তা দেখেছেন, আমি তা অস্বীকার করিনে, টাকার জন্যও উনি ক্রোকী পরওয়ানা আনাননি, তা-ও মানি। তবু এসব কি ? আমাদের গ্রাহ্য না করার মানেটা কি ?

মানে জানিতে চাহিয়াই তিনি নিরস্ত হইলেন না, নিজস্ব আর অর্থাতীত আরো কিছু কথা তাঁর বলিবার ছিল।

ভয় দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে হইলে আরো একটু "শাসিত করার" প্রয়োজন আছে বিবেচনা করিয়া মতিলাল বলিতে লাগিলেন, গ্রামের আপামর দশজনকে নিয়েই তোমাকে থাকতে হবে, রুগী হ'য়ে সবাই আসবে না ; তুমি রাজা-উজির ব্যক্তি নও যে, গন্দানের ভয়ে তোমাকে খাতির করতে হবে। তোমাকেও মানুষের খাতির-মর্য্যাদা রাখতে হবে, তা না রাখার ফল ভাল হবে না। বলিয়া মতিলাল থামিলেন, কুফল কত সাংঘাতিক হইতে পারে তাহাই অনুমান করিবার অবসর বোধ হয় দিলেন।

নিত্যপদ তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছে কি না তাহার কথায় তাহা বুঝা গেল না ; সে বলিল, আপনি অকারণে রূঢ় হচ্ছেন। বলিয়া সে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল, যেন সভা ভঙ্গ করিতে চায়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এই ইঙ্গিতটুকু বুঝিতে মতিলালের তিলার্দ্ধ বিলম্ব হইল না, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, তাড়ালে আমাকে ? আচ্ছা। বলিয়া তিনি নিত্যপদর টুঁটির দিকে নয়, মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত নিষ্পলক চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া ঈশ্বরীপ্রসাদের হাত ধরিয়া কোন দিকে চলিতে লাগিলেন তাহার দিশা রহিল না, কিন্তু যাইবার সময় তাঁহার মনে হইল, "উচিত শিক্ষাই" দেওয়া হইয়াছে। বেগার লইয়া, কাড়িয়া খাইয়া, প্রাপ্য না দিয়া, কেবল দুদ্ধর্ষ স্পর্দ্ধাকেই সম্বল করিয়া মতিলাল জীবনযুদ্ধে জয়ী হইয়া আসিয়াছেন, কেহ তাঁহার জয়যাত্রার প্রতিরোধ করিতে পারে নাই, এবারেও জয় হইয়াছে বলিয়াই তাঁহার মনে হইল।

চিরজয়ী মতিলালের এবারকার জয়যাত্রার দর্শক ছিল পাঁচজন।

ঈশ্বরীপ্রসাদকে তিনি সারথি করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাকে রথধ্বজে তুলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

বাকি তিনজনের ফণী ডাক্তার ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাস্য লইয়া উঠিয়া পড়িল ; বলিল, আমি চললাম নিত্যপদবাবু। গোবর্দ্ধন, তুমি ঘা ধুইয়ে নিতে রোজ আমার কাছে যাবে, আর কি কি করতে হবে, এস, তোমাকে পথেই বলিগে।

বলিয়া গোবর্ধনকে লইয়া. এবং নিত্যপদকে নমস্কার জানাইয়া সে প্রস্থান করিল।

কান্তিভূষণ নিঃশব্দে বসিয়া প্রাঙ্গণপ্রান্তের দূর্বা দেখিতেছিল, হঠাৎ একটা অকারণ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল, মরেছে।

ঐ কথাটা উচ্চারণ করা তার মুদ্রাদোষ সন্দেহ করিয়াও নিত্যপদ বলিল, কে ?

—আমাদের ঐ মতিকাকা। ও'র বড় মেয়েটি কয়েক মাস আগে প্রসব হ'তে মারা গেছে, ছোটটি সাতমাস পোয়াতী। আপনাকে নিয়ে দেখাবে বলছিল, সে পথে কাঁটা দিয়ে গেল।

নিত্যপদ বলিল, না, না, যাব ; ডাকলেই যাব।

—যাবেন ?

—যাব বৈ কি! ও'দের ত্যাগ করলে আমি থাকব কাকে নিয়ে! বলিয়া নিত্যপদ সকৌতুকে হাসিতে লাগিল।

খুকী আসিয়া জানিতে চাহিল, কাকা স্নান করিবেন কখন ?

শুনিয়া কান্তিভূষণ উঠিয়া পড়িল, বলিল, বিকেলে আসব। এখন যাই।

যথারীতি হাট বসিয়াছে, কোলাহল আর ঠেলাঠেলি তেমনি চলিতেছে, কিন্তু আজ হঠাৎ নিত্যপদর চোখে পড়িল, হাট বলিতে যে চঞ্চল আর বিশৃঙ্খল একটা সমষ্টি বুঝায়, এ হাটে তা নাই, এত লোকসমাগমেও স্থানটা যেন উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই, সবই মন্থর গতিতে চলিয়াছে বিক্রেতার সঙ্গে দু'দশ মিনিট অবাস্তব আলাপ করিবার ইচ্ছা অনেকের পক্ষেই স্বাভাবিক দেখা গেল, সেটা গ্রাম্য প্রীতি সন্দেহ নাই ; কিন্তু যে খরিদ্দার ধামাটি লইয়া হাটে আসিতেছে তাহার গতি অতি ধীর, যেন পাই-না-পাই ক্ষতি নাই, যে বেচিতে আসিতেছে সেও মন্দগতি, বিশেষ লাভ করিতে পারা যাইবে এ বিশ্বাস তার নাই বলিয়াই মনে হয়!

নিত্যপদ মানুষের হাত-পা ছাড়িয়া চক্ষু লক্ষ্য করিল, উৎসাহের দীপ্তি, সন্তোষের আনন্দ কি শ্রমসামর্থ্য তাহাতে নাই, ক্রীড়াময়তা নাই, কৌতূহলও নাই ; চিরদিনের বৈচিত্র্যহীন একটি কোষের ভিতরে বাহিরে উহারা যাতায়াত করিতেছে, গমনাগমনে স্পৃহা নাই, অন্য দিকে দৃষ্টি নাই, ঐখানেই তার গতির সুরু ঐখানেই শেষ।

নিত্যপদ চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল, খানিকটা চীৎকার করিয়া কাজ করিয়া অত্যন্ত আলস্যভরে লোকগুলি প্রস্থান করিতেছে, আর সেই চীৎকারের পনর আনাই অনর্থক।

ওদিকে কয়লার ছাইয়ের স্তূপের পাশে "দুধের বাজার", খরিদ্দার বিক্রেতার হাত হইতে 'দোনা' লইয়া তাহার ভিতরে নাক প্রবেশ করাইয়া নিঃশ্বাসের সাহায্যে কি পরীক্ষা করিতেছে তাহা নিত্যপদ অনুমানে বুঝিয়া লইল। সে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই দুধের বাজার চড়িয়া গেল, দাম ন' পয়সা হইতে এগার পয়সায় উঠিল, এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ জানা গেল এই যে, জনৈক গোয়ালা টিন লইয়া হাটে আসিতেছে, তাহার প্রচুর দুধের প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে কেহ কেহ জানিতে চাহিল, বাবন্ হাটে আসিয়াছেন ?

নিত্যপদ প্রত্যুত্তরে জানাইল, হ্যাঁ সে হাটেই আসিয়াছে।

কেহ কেহ জানিতে চাহিল, বাবন্ কেমন আছেন ?

নিত্যপদ প্রত্যুত্তরে জানাইল যে, ভালই আছে।

সে যাহাই হউক, দন্ধের বাজারের পাশেই চালের বাজার অর্থাৎ দশবারজন লোক ধামায় করিয়া ঢেঁকি-ছাঁটা মোটা চাল লইয়া বসিয়া আছে, কেহ বা মালসায় করিয়া সেড় দেড়েক চালও বিক্রয়ার্থ আনিয়াছে, টাকায় কাঁচি তের হইতে চৌদ্দ সের দর। বিস্তর লোক চালের গন্ণাগন্ণ পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে।

এই সব দেখিতে দেখিতে হঠাৎ এক হন্ংকার শন্নিয়া নিত্যপদ ফিরিয়া দেখিল, ফণী ডাক্তার এক-আঁটি 'সয়লা' বেগন্ন দন্হাতে করিয়া আকাশে তুলিয়া ধরিয়াছে, যেন সে জিনিস সে মৃত্তিকাবাসী অপর কাহাকেও স্পর্শ করিতে দিতে চায় না।

নিত্যপদ যাইয়া ফণীর পাশেই দাঁড়াইল।

শন্নিল, যার বেগন্ন সে তিনটি পয়সা ফেরৎ দিতে হাত বাড়াইয়া বলিতেছে, না, ডাক্তারবাবন্, ও-দামে আমি দেব না, দেব না।

ফণী বলিল, দিবি দিবি : আমি দিই নে ? আমার ওষন্ধ গিলে গিলে তোর সাত গন্ষ্টির পেটে চড়া পড়ে গেছে, সব দাম দিয়েছিস তার ? বলিতে বলিতে ফণী নিত্যপদর মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু তাহাকে চিনিতে পারিল না।

নিত্যপদ জিজ্ঞাসা করিল, চায় কত ?

কিন্তু ফণী ডাক্তার তাহাতেও কর্ণপাত করিল না, বেগন্নওয়ালাকে বলিল, এই নে আর একটা পয়সা। বলিয়া সে আকাশ হইতে হাত নামাইয়া আর বেগন্ন-গন্লি মাটিতে নামাইয়া জামার পকেট হইতে আর একটি পয়সা বাহির করিয়া দোকানীর কোলের উপর ছুড়িয়া দিল, এবং বেগন্ন লইয়া নিত্যপদর গায়ের পাশ দিয়া সে সর্ব্বাতীত একেশ্বর ব্যক্তির মতো শির উচ্চে তুলিয়া প্রস্থান করিল।

নিত্যপদর শারীরসত্তা তার নজরেই পড়িল না!

নিত্যপদ ধীরে ধীরে কালীর ঘরের পাশ দিয়া যাইয়া নদীর ধারে দাঁড়াইল।

নদীর পঙ্কগর্ভ হইতে উদ্ভিদ উঠিয়া এখনো জল আবৃত করিয়া ফেলে নাই, কিন্তু স্বচ্ছ জলের অল্প নিম্নেই তাহাদের আন্দোলন দেখা যাইতেছে। বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া আড়ের উপর এক-হাতের স্পর্শ রাখিয়া লোক আসিতেছে যাইতেছে, বিপরীত দিক হইতে আসিয়া দন্ইজনে সামনাসামনি হইলেই একজন থামিয়া হেলিয়া দাঁড়াইয়া পথ দিতেছে, তাহাতে তাহাদের বিরক্তি নাই, সেই অবসরে দন্ই একটি বাক্যবিনিময়ও না হইতেছে এমন নহে। বর্ষার জল কমিবার সময় পন্রন্ পলি মাটির উপর খেজন্র গাছ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়া পৈঠা তৈরী হইয়াছিল, মাটি শন্কাইয়া গেছে কিন্তু পৈঠা আছেই।

আট নয় বৎসরের দন্টি বালক নিত্যপদর কাছেই আসিয়া দাঁড়াইল।

একজন বলিল, ক'টা দিয়েছে রে ?

—তিনটে।

—তুই একটা ধরা, আমি একটা ধরাই। বলিয়া এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখিতে যাইয়া নিত্যপদর সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই দন্'জনেই সরিয়া গেল।

দু'জনে দু'টি বিড়ি ধরাইল, চোরের মতো সতর্ক হইয়া টানিতে লাগিল।

নিত্যপদ একটু হাসিয়া ওপারের দিকে চাহিল।

সূর্য অস্তে গেছেন, কিন্তু পূবের আকাশে তাঁহার দেওয়া রং এখনও লাগিয়া আছে, বর্ণ বর্ণান্তরে পরিবর্তিত হইতেছে, ম্লানিমার আভাস ফুটিতেছে।

এক সারি লোক ওপারের আল-পথ ধরিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়াছে, কাহাদের একখানা কুটির দেখা যাইতেছে, বনাভ্যন্তর হইতে বাহিয়া সে যেন স্বতন্ত্র হইয়া আছে, বহুবিস্তৃত ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে লম্বা চারিটি খুঁটির উপর উঁচুতে একটি মাচা বাঁধিয়া তাহার উপর খড়ের ছাউনি করা আছে, সূর্যের মুমূর্ষু আলো দেখিতে দেখিতে তাহার উপর মিলাইয়া গেল, ফসলের সময় পাহারাওয়ালার ঘাঁটি সেটা।

এদিকে হাটের কলরব নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে।

ছেলে দু'টি ধূমপান শেষ করিয়া হাটের ভিতর চলিয়া গেল, এবং তখনই সেই হাটের ভিতর হইতেই কান্তিভূষণ যে ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া হঠাৎ উপস্থিত হইল, সে চর্বিতাঙ্গুলি গোবর্দ্ধন সেখ, আঙ্গুলের মাথায় পটি বাঁধাই আছে।

কান্তিভূষণ বলিল, আপনাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি, এ কি বলছে শুনুন।

নিত্যপদ জিজ্ঞাসা করিল, কি বলছ তুমি ?

গোবর্দ্ধন বলিল, আপনার টাকা, মশ'য়, আমি ঐ ডাক্তারকে দিয়েছি, পরশু তারিখে সে লোক পাঠিয়ে নিয়ে গেছে, আপনার নাম করে সে বললে, টাকা দাও শীগ্‌গির, সে ডাক্তারবাবু ছাড়ছে না, কাঁছাগামছা ধরে টানাটানি লাগিয়েছে, বলে, সে ছোটবৌয়ের কাছ থেকে দু'টো টাকা নিয়ে গেল। আমার কি দোষ, মশ'য়? আপনি পান নাই ?

নিত্যপদ অনুভব করিল, তার কোথায় যেন সুড়সুড়ি লাগিতেছে, না হাসিয়া থাকা যাইবে না , কিন্তু সে হাসিল না, বলিল, না, পাইনি।

গোবর্দ্ধন দুঃখিতও হইল, সতর্কও হইল, দেখুন দেখি দৈব ? কিন্তু আমি ত' দুকর করে দেব না, মশ'য়, বলিয়া সে নীরব হইল, কিন্তু যেন আরো প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়া—

নিত্যপদ মৃদু হাসিয়া বলিল, তোমাকে দু'বার দিতে হবে না, আমি চাইনে। আঙ্গুল সেরেছে তোমার ?

—শুকোচ্ছে, মশ'য়। ডাক্তারবাবু ধুয়ে ধুয়ে দিচ্ছে আর ছ'-আনা করে পয়সা নিচ্ছে রোজ।

—আচ্ছা, তুমি যাও। তোমার কোনো দোষ নেই।

গোবর্দ্ধন সেলাম করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু বিস্মিত হইয়া গেল, তর্কাতর্কি কিছুই হইল না, সত্য-মিথ্যা নির্দ্ধারণের কোনো প্রচেষ্টাই দেখা গেল না, এমন কি একবারের স্থলে দু'বার প্রশ্নই কেহ করিল না।

.কান্তিভূষণ বলিল, ফিরবেন এখন ?

—চলো ফিরি।

—ফণীর সঙ্গে একবার দেখা করে গেলে হয় না ?

—কি দরকার। আমার সঙ্গে হাটের ভেতর তার দেখা হল, কিন্তু আমাকে সে চিনতে পারল না, আমি কারণ খুঁজছিলাম ; যা হোক কারণটা পাওয়া গেল। এস।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দ ঠাকুরের নামাবলী নামক বস্ত্রখানা অজর, যেমন কাজের তেমনি তা-ই মাথায় বাঁধিয়া তিনি দূর দূরান্তে গ্রামে গ্রামে পর্য্যটন করেন, পূজা, ব্রত, মন্ত্র দেওয়া, ভবিষ্যৎ উদ্‌ঘাটন আর ধর্ম্মকর্ম্মে প্ররোচিত করিয়া দীক্ষাদান তাঁর ব্রত অর্থাৎ পেশা। তিনি মানুষ খুঁজিয়া বেড়ান।

বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ একদিন একটি পাত্রকে তিনি সাবিত্রীর জন্য পছন্দ করিয়া ফেলিলেন। ছেলেটি দেখিতে শুনিতে ভাল ; তার বয়স অল্প ; বাপ নাই, মা আছেন ; অবস্থা খুবই ভাল ; এখনই কৃষিকার্য্যে, মৎস্য-শিকারে এবং প্রাপ্য গণ্ডা বুঝিয়া লইতে সে দক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, এক কথায় ছেলেটি বুদ্ধিমান আর করিৎকর্ম্মা। তিন ভাইয়ের সেই বড়। গোপনে খোঁজ লইয়া গোবিন্দ ঠাকুর আরো জানিলেন যে, ছেলেটির চরিত্র নির্ম্মল, বংশও ভাল ; মা-ভাইকে সে ভালবাসে, তবে রাগ নাকি বেশী।

গোবিন্দ চিন্তা করিয়া দেখিলেন, পুরুষের রাগ থাকাই ভাল, "পুরুষের রাগই লক্ষ্মী।"

ছেলের মা এলোকেশী বলিল, মেয়েটি সুশ্রী যদি হয় তবে টাকা আমরা চাইনে।

আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া গোবিন্দ বলিলেন, তোমরা ধন্য। টাকা আমাদের নাইও। বড় ভাল মেয়ে সে, এত ভাল যে অমনটি আর দেখি নাই, কম মেয়ে ত' দেখি নাই আমি ; কিন্তু অমনটি আর দেখলাম না কোথাও। আমি ত' দেখিই নাই, আর কেউ দেখেছে কিনা সন্দেহ, বামুন হ'য়ে এ-কথা আমি বলছি তোমায়।

বলিতে বলিতে গোবিন্দ ঠাকুর জলচৌকির উপর চমকিয়া উঠিলেন, ঠিক এলোকেশীর গলার স্বরে কে যেন ঘরের ভিতর চেঁচাইয়া উঠিল : 'ওরে কালা মুখপোড়া।' তারপরই খিল্‌খিল্‌ করিয়া সেই কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল।

এলোকেশী ঠাকুরের চমকানি দেখিয়াছিল, হাসিয়া বলিল, ময়না পুষেছি, ঠাকুর। আমার কথা শিখেছে হতচ্ছাড়া পাখীটা।

—কালা কে?

কালা আমার মেজ ছেলে। বলিয়া তারপর এলোকেশী বলিল, বিয়ের কথাবার্ত্তা হোক তাহলে।

গোবিন্দ বলিলেন, হোক।

সুতরাং অনেক কথাই হইল।

এলোকেশী চৌকাঠে বসিয়া যত সমাচার শুধাইল গোবিন্দ জলচৌকির উপর বসিয়া একে একে তার সবগুলিরই জবাব দিলেন, ছেলের মেয়ের বাপের কথা, মেয়ের মায়ের কথা, মেয়ের রূপের কথা, গুণের কথা, রান্নার কথা, বুদ্ধির কথা, গৃহস্থালীর কথা, সেবার কথা, মেজাজের কথা।

গোবিন্দ ঠাকুরের বাক্যের অকপটতায় আর ভঙ্গীর ব্যঞ্জনাসারল্যে অর্থাৎ ঘটকালি-পটুতায় ছেলের মা এলোকেশীর সাবিত্রীকে তখনই পনর আনা পছন্দ

হইয়া গেল, বেটার বৌ আনিবার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া এলোকেশী বলিল, দেখে আসি একবার, আবার এ-ও ভাবছি যে কি দরকার। বামুনের মুখ থেকে যখন বেরিয়েছে, তখন কথা মিথ্যে হবে না।

গোবিন্দ বলিলেন, একবার দেখবে বইকি। বলিয়া তিনি হুঁকো রাখিয়া উঠিলেন, বলিলেন, যেও একদিন নিজেই, যবে ইচ্ছে। ছেলেরা কোথায় ?

—খামার বাড়ীতে আছে।

—বেশ। আসি। বলিয়া গোবিন্দ যখন এলোকেশীকে পদধূলি দিয়া প্রস্থান করিলেন, সুশিক্ষিত ময়না তখন ভৎ'সনা ত্যাগ করিয়া ভক্তিপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে, চেঁচাইতেছে : 'রা-ধা গোবিন্দ বলো।'

গোবিন্দ ঠাকুরের সব সোজা, সাপ্টা খাড়াখাড়ি কাজ, আসিয়া খবর দিলেন, "ছেলে প্রস্তুত" যেন কুম্ভকারের গৃহে প্রতিমা প্রস্তুতের 'অর্ডার' দেওয়া হইয়াছিল, প্রতিমা নির্ম্মিত হইয়াছে।

শুনিয়া দীনু নাচিয়া উঠিল, এবং তাহার শতেক প্রশ্নের উত্তরে গোবিন্দ এমন একটি কথা উচ্চারণ করিলেন না, যাহাতে দীনুর আনন্দ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, তারপর দীনু ভাবিয়া ভাবিয়া দ্বিগুণ সুখী হইয়া উঠিল এই সূত্রে যে, ছেলেটি অভাবী নয়, সাবিত্রী দুঃখের ঘরে মানুষ হইয়াছে, কিন্তু এইবার সে খাইয়া-পরিয়া সুখে থাকিবে।

কিন্তু সাবিত্রী কাঁদিতে লাগিল।

সবচেয়ে তার বড় কথা হইল এই যে, দাদা হাত পুড়াইয়া রাঁধিয়া খাইবে কেমন করিয়া। অসুখে বিসুখে তার মুখে কে জল দিবে! দাদা দোকান সামলাইবে না ঘর সামলাইবে! দু' দিক দেখিতে যাইয়া হয়তো তার দু'দিকই যাইবে।

কিন্তু তার কান্না কেউ কানে তুলিল না, সুলভে সুপাত্র লাভের আনন্দে গোবিন্দ হাসিতে লাগিলেন, দীনুও হাসিতে লাগিল। আর, একটা কথা সকলেরই জানা আছে যে, মেয়ের বিবাহের সময় আসিয়া গেলে কোন অজুহাতেই বিদায় দিবার কাজটাকে বন্ধ রাখা যায় না, যত অসুবিধা আর যত কষ্টই তাতে হউক।

গোবিন্দ সাবিত্রীকে কাছে ডাকিয়া তাহার মাথায়, পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেন, আর বুঝাইয়া বলিলেন, দীনুর খুবই কষ্ট হবে এ-কথা মিথ্যে নয়; তবু তাকে রেখে তোমাকে যেতেই হবে, যাওয়া বারণ করতে কেউ পারবে না, আগে ধর্ম্ম সমাজ এই সব, তারপর মানুষের সুখ-দুঃখ। বলিয়া তিনি ব্যাপক জ্ঞানের আওতায় কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তারপর হাসিয়া বলিলেন, বিয়ের এখনও দেরী আছে; কান্না রেখে, একটু তামাক খাওয়া দিকি, তামাক খেতে খেতে বসে ভাবি বিয়েটা বন্ধ করবার কোনো উপায় আছে কি না।

শুনিয়া সাবিত্রী তামাক সাজিতে বসিল, কিন্তু বিবাহ বন্ধ করিবার কথাটা যে মিথ্যা, তাহা বুঝিয়া তাহার কান্না গেল না।

তাহাই হইল, অর্থাৎ সাবিত্রী নির্ভরসা হইয়া গেল এবং দাদার সুখ-দুঃখ বুঝিয়া ব্যাকুল হইবার কি অনুভূতি ব্যক্ত করিবার অনুচিত সুযোগ সাবিত্রীকে দেওয়া হইল না।

এলোকেশী চার বেহারার ডুলিতে চড়িয়া আসিয়া সাবিত্রীকে দেখিল, কিন্তু

দেখিবার কি আছে। অসাধারণ ত' কিছুই নয়, তবু এলোকেশী সাবিত্রীর রূপ-লাবণ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল, সাবিত্রীর প্রতি তার মনে একটা স্নেহধারা প্রবাহিত হইল, গোবিন্দকে গোপনে বলিল, মেয়ে ভাল, এ বিয়ে হবে ঠাকুর।

গোবিন্দ আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, তুমি সুখী হবে।

পিতৃশ্রাদ্ধ যেমন চারিদিক হইতেই অসহায় দুঃখে মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছিল, সুখের বিষয় বিবাহে সে কণ্টকচর্চ্চা প্রকট হইল না।

শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠই হইয়াছিল এক ঘোরতর ক্লেশের কারণ, কিন্তু বিবাহের মন্ত্রে শুদ্ধি-অশুদ্ধি দীনুকে বিচলিত করিল না, সে সেদিকে ভাল করিয়া কানই দিল না, শ্রাদ্ধে পুরোহিতের দুর্ব্বাসাসুলভ ক্রোধ-দৌরাত্ম্যে সে বিদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু বিবাহের পৌরোহিত্য করিতে যে ব্রাহ্মণকে আনা হইয়াছিল তিনি সদাশয় ব্যক্তি, ঠ্যাটামি করিলেন না, রাগও করিলেন না।

বিবাহ একপ্রকার নির্ব্বিঘ্নেই সম্পন্ন হইল। বিবাহ ব্যাপার অল্পে সারিয়াও দীনবন্ধুর পঁচিশ টাকা ঋণ হইল, প্রাণপণে সঙ্কুচিত করিয়াও ব্যয়কে জমার গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ রাখা গেল না, সে বাহিরে পা দিল।

বরযাত্রীরা সাত আট জন তিন সন্ধ্যা খাইল, দীনুদের যাহারা ভালবাসে বলিয়া একটা বাচনিক বিশ্বাস আছে, তাহাদেরও একবেলা খাওয়াইতে হইল।

অত বেশী সুদে টাকা কর্জ্জ করিতে গোবিন্দ ঠাকুর দীনুকে নিষেধ করিলেন; টাকায় এক আনা সুদ মাসে, সুদের সুদ চলিবে; কিন্তু দীনু এখন সংসারের সঙ্গে স্বয়ংসিদ্ধভাবে পরিচিত হইয়াছে, সে দুঃখের সঙ্গে বলিল,—সাবির বিয়েতে আমি সবাইকে ডাকতে পারলাম না, এই আমার দুঃখ রইল, ঠাকুদ্দা। তোমার চরণের আশীর্ব্বাদে টাকা আমি দেখতে দেখতে দিয়ে ফেলব।

যাহা হউক, গোবিন্দ ঠাকুরের অক্লান্ত চেষ্টায় সুপাত্রের হস্তেই সাবিত্রী সমর্পিত হইল, এবং এই সমর্পণের কাজে খুঁত রহিল না।

বরের আর কনের পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের ব্যগ্রতায় মাইলটাক দৌড়াইয়া দীনু ফিরিয়া আসিল, কিন্তু আসিয়া সে একটানে ঘরে ঢুকিতে পারিল না, ঘরের দিকে মুখ করিয়া নির্জ্জন-বাহিরে দাঁড়াইয়া সে চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

বোনটির সঙ্গ তার সেই কবেকার অভ্যাস, শিকড়ে শিকড়ে জড়াজড়ি হইয়া তাহারা যেন রসের আদান প্রদান করিয়া বাঁচিয়া ছিল, এই গৃহের কলেবরের সমগ্রতা ছিল তাহারই প্রাণে, এই গৃহের মর্ম্ম তাহারই চক্ষুপুটে।

দীনুর মনে হইতে লাগিল, মৃত্তিকার শ্রী অন্তর্হিত হইয়াছে, হাট অন্ধকার, পৃথিবীতে মানুষ নাই।

খাওয়ার কষ্টের কথা তার মনে পড়িল না, অসুখের সময় কে তাহাকে দেখিবে ইহা ভাবিয়াও তাহার ভয় হইল না, কিন্তু তাহার এই দুর্গতির শঙ্কায় সাবিত্রী শুকাইয়া উঠিয়াছিল, সেই মমতাটুকু স্মরণ করিয়া দীনুর বুক ফাটিতে লাগিল, যে মানুষটি মমতা দিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল, পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, সে চলিয়া গেছে, মুখের দিকে চাহিয়া কেহ নিঃশব্দে অনুসন্ধান করিবে না, সে কেমন আছে।

বোনের সেবার অভাব আর বিচ্ছেদ-দুঃখ দীনুর সহিয়া আসিল। এখন দীনুর মনে হয়, সাবিত্রী সুখে আছে, এই খবরটি মাঝে মাঝে পাইলে তার আর দুঃখ থাকিবে না।

দোকানটা বেশ চলিতেছে, অবশ্য গোবিন্দের ইঙ্গিতে; তিনিই অভিভাবকরূপে দোকানের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছেন, ধারে বিক্রয় একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সাবিত্রীর খবর-বার্ত্তা লোকের মুখে পাওয়া যায়, সে ভাল আছে।

ভাল থাকার খবর আসিতে আসিতে অকস্মাৎ একদিন যে খবর আসিয়া পড়িল তাহা বজ্রতুল্য কঠোর, তাহার আঘাত সহ্য করা দীনুর পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

দীনবন্ধু শুনিল, সাবিত্রীকে শিবু মারিয়াছে।

শিবু দীনুর ভগিনীপতির নাম।

খবরটা যে আনিয়াছিল, খবর শুনিয়া দীনু দিশেহারার মতো তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া রহিল, যেন উহা বিশ্বাস করিবার বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তি আছে, কিন্তু খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

তারপর বলিল,—ঠিক জান, ভবেশ, শিবু সাবির গায়ে হাত তুলেছে?

দীনু অবিশ্বাস করিতে চায় দেখিয়া ভবেশ অসন্তুষ্ট হইল, বলিল,—হ্যাঁ হে, হ্যাঁ, প্রত্যয় না হয় দেখে আয় গিয়ে। খালি হাত তোলা নয়, পিঠ ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে।

ভবেশ আরো যাহা বলিল, তাহার সারাংশ এই যে, সে কার্য্যোপলক্ষে পারুল-ডাঙ্গায় গিয়াছিল, মাত্র সকালবেলায় এখানে পৌঁছিয়াছে; স্বচক্ষে সে সাবিত্রীকে দেখিয়া আসিয়াছে, বেত্রাঘাতে তার পিঠ ফাটিয়া রক্ত গড়াইতেছে নিশ্চয়, পারুল-ডাঙ্গার সবাই ঐ কথা লইয়া তুমুল আলোচনা করিতেছে; এবং এ-কথাও বলিতেছে যে, পণস্বরূপ কিছু টাকা বিবাহের সময় দিলে সম্ভবতঃ এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিত না। সুলভ মূল্যে যে জিনিস পাওয়া যায়, তাহা প্রথমতঃ আনন্দদায়ক হইলেও টেকসই হয় না, সংসারাভিজ্ঞ পারুলডাঙ্গা গ্রামের ইহাই মত। এই খবর দিতেই সে এখন হাটের উপর আসিয়াছিল, অন্য দরকার ছিল না।

বলিয়া ভবেশ চলিয়া গেল।

দীনু মাটিতে আছড়াইয়া পড়িল।

হাঁড়ির ভাতের মতো অদৃষ্টের দুঃখ তাহারা ভাই-বোনে সমান ভোগ করিয়াছে, দাদা দুঃখ পাইবে এই ভয়ে সাবিত্রীর সেই ব্যাকুলতা, তার প্রশ্নগুলি, তার নিষেধ, তার উপদেশ, সর্ব্বোপরি তার বিমর্ষ মুখখানি তখনো চোখের উপর ভাসিতেছে; কিন্তু সাবিত্রীর এই পরম দুঃখের দিনে তার দুঃখ মোচনের উপায় ত' কোনদিকেই চোখে পড়িতেছে না।—দীনুর বুকের শ্বাস চলাচল যেন বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

এই যন্ত্রণাবোধ বালকোচিত কিছুতেই নয়।

কিন্তু ব্যাপার বালকোচিত হইল তখন, যখন দীনু "আচ্ছা দাঁড়াও"—বলিয়া দূরবর্ত্তী শত্রুকে শাসাইয়া গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তার দৌড়ের সীমা গোবিন্দ ঠাকুরের গৃহ পর্য্যন্ত; সুখে দুঃখে সঙ্কটে কেবল গোবিন্দই

তাহাদের আগলাইয়া আছেন, পথ দেখাইয়া দিতেছেন, দীনবন্ধু দাঁতে দাঁতে চাপিয়া ছুটিতে ছুটিতে গেল তাঁহারই কাছে।

গোবিন্দ শীঘ্রই সফরে বাহির হইবেন ; যাত্রার উদ্যোগের মধ্যে সব্জী-ক্ষেতের কঞ্চির বেড়া মজবুত করাই প্রধান, নতুবা ছাগলে খাইয়া যাইবে। গোবিন্দ নামাবলীখানা বেড়ার উপর রাখিয়া দা আর দড়ি লইয়া সেই কাজেই ব্যস্ত ছিলেন।

দীনবন্ধু প্রাণভীত পলাতকের মতো দৌড়াইয়া আসিয়া পৌঁছিতেই তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—কি দাদা দীনু, বড় কাতর দেখছি যে ?

দীনু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—ঠাকুদ্দা, তোমার পায়ে পড়ি, উপায় করো। বলিয়া সে আরো কাঁদিতে লাগিল।

গোবিন্দ বলিলেন, কি হয়েছে বল আগে ! আমি ত' জানিনে কিছু ! কাঁদিসনে, ঠাণ্ডা হয়ে বল দেখি কি হয়েছে ? বলিতে বলিতে আগাইয়া তিনি দীনবন্ধুর গায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দীনু তাহার ক্রন্দনের হেতু বলিল : "শিবু সাবিত্রীকে মেরেছে, এমন মেরেছে যে"—বলিতে বলিতে সে ফুঁপাইয়া চুপ করিয়া রহিল, বলিতে পারিল না যে, "পিঠ ফাটিয়া রক্ত গড়াইতেছে"—কিন্তু ঐ কথাগুলি যেন রক্তের সাথে তার বুকের ভিতর বাজিতে লাগিল।

কিন্তু দীনুর এই ব্যক্ত আর অব্যক্ত অভিযোগ আর ব্যথার উত্তরে গোবিন্দের মুখে একটু হাসি দেখা দিল। গোবিন্দ বহুদর্শী লোক, তাঁর মনে হইল, এই দুঃখে এত কান্না ! স্ত্রীকে কে না মারে ! নূতন শুনিয়া আর নিজের সহোদরা বলিয়া দীনুর বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে।

গোবিন্দের মুখের হাসিটা দীনু দেখিল।

গোবিন্দ মুখে বলিলেন, তা মেরেছ মেরেছে তাতে হয়েছে কি ! অমন মেরে থাকে, তাতে তুই কাঁদছিস কেন ? যাকে মেরেছে, গিয়ে দেখগে সে মার ভুলে গেছে। বলিয়া তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, তিনি যে বাক্যগুলি উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা প্রবোধ-বাক্যই।

গোবিন্দের হাসিটা দীনুর ব্যথিত স্থানে তীরফলকের মতো বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহার কথা শুনিয়া সে হতাশ হইয়া গেল, হাসিটা নিম্মর্ম, নির্ব্বিকার বলিয়া কথাও নিম্মর্ম, গোবিন্দের অযোগ্য। তাহার এত কঠিন বেদনার প্রতি গোবিন্দের এই অবিচল অনাগ্রহ বড় মর্ম্মান্তিক হইয়া বাজিল, কিন্তু তখন সাবিত্রীর ক্লেশ ছাড়া নিজের ক্লেশের পরিমাণের দিকে চাহিয়া আলোড়িত হইবার সময় আর ইচ্ছা তার ছিল না।

বলিল,—সাবিত্রীর পিঠ ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে, ভবেশ বলল। তুমি এর বিচার করো। বলিয়া সে গোবিন্দের পায়ের উপর যাইয়া পড়িল, পা দু'খানা দু'হাতে জড়াইয়া ধরিয়া সে কাঁদিতে লাগিল ; "আমায় সঙ্গে করে তার কাছে নিয়ে চলো ঠাকুদ্দা। আমি তাকে এখানে নিয়ে আসব।"

হাতের কাটারিখানা মাটিতে ফেলিয়া আর দীনুকে সেই পায়ের উপর হইতে টানিয়া তুলিয়া গোবিন্দ ধীরে ধীরে বলিলেন, আয় বসিগে। বলিয়া দীনুকে

লইয়া দাওয়ায় বসাইয়া এবং নিজে মোড়ায় বসিয়া গোবিন্দ পুনরায় বলিলেন—তোকে পারুলডাঙ্গায় নিয়ে যেয়ে সাবিত্রীর সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে আনতে পারি, কিন্তু তাকে নিয়ে আসা হয় না।

দীনু প্রশ্ন করিল: "কেন হয় না?"

শ্বশুরালয়ে নির্যাতিতা হইয়া বোন ভাইয়ের আশ্রয়ে আসিয়া জুড়াইবে ইহাতে বিঘ্ন কোথায়?

গোবিন্দ দীনুর প্রশ্নের জবাব দিলেন; বলিলেন, স্বামীর কাছ থেকে কেড়ে আনবি কি করে? সে যদি ছেড়ে না দেয়?

দীনবন্ধু তর্ক করিল: "সাবি যদি আসতে চায়?"

গোবিন্দ বলিলেন, তবু তাকে আনা হয় না। তার স্বামী আছে, শাশুড়ী আছে, তারা তাকে ছাড়বে না। তোদের মা বাপ নেই, তুই ছেলে মানুষ; তোর কাছে যদি তারা তাকে না পাঠায় তবে কি জোর আছে তোর? সাবিত্রী এখন আমাদের নয়, তাদের।

স্বত্বনির্ধারণ বহু পূর্বেই হইয়া গেছে, দীনুর জ্ঞাতসারেই হইয়াছে, কিন্তু দীনু অবুঝ; জিজ্ঞাসা করিল,—সে বসে বসে মার খাবে?

শুনিয়া গোবিন্দ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, হাসিয়া বলিলেন, বসে বসেই মার কেন খাবে। তারাও ত' মানুষ। ভগ্নিপোত বোনকে দু' এক ঘা মারলেই যদি বোনকে কেড়ে আনতে হয় তবে অনেক বউয়েরই শ্বশুর-ঘর করা হয় না। বলিয়া গোবিন্দ সুস্থচিত্তে মাথা নাড়িতে লাগিলেন, দীনুর চোখ ফুটাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে একটিমাত্র দৃষ্টান্তেরও উল্লেখ করিলেন না।

পারমার্থিক জগতে ঠাকুরের দৃষ্টি অতি ঊর্ধ্বেই বিচরণ করে, তজ্জন্য তিনি ভক্তির পাত্র; কিন্তু তাঁর সাংসারিক দৃষ্টির এই অবনত আর অসরল অবস্থা দেখিয়া দীনু তাজ্জব হইয়া গেল।

স্বামী স্ত্রীকে মারিবে কেন? আর তার প্রতিকার কোথাও নাই কেন? দীনবন্ধু অবাক হইয়া তাহাই ভাবিতেছিল।

গোবিন্দ বলিলেন, সাবিত্রী যদি দোষ করে থাকে?

দীনবন্ধুর দোষ নাই, গোবিন্দকে অবিচারক মনে করিয়া তাঁহার উপর রাগ করা দীনুর পক্ষে এখন স্বাভাবিকই; ঠাকুর যেন বিপক্ষের দিকেই টানিয়া কথা কহিতেছেন, নির্যাতনের সমর্থন করিতেছেন, সাবিত্রীর দোষানুসন্ধান করিতেছেন।

দীনবন্ধু বলিয়া উঠিল, সাবিত্রী দোষ করতেই পারে না, যতই খুঁজুন, পাবেন না আমি বলতে পারি। শিবুই ছোটলোক, স্ত্রীর গায়ে হাত ছোটলোকেই তোলে। আমাদের বাবা বেঁচে থাকলে সে সাহস পেত ভেবেছেন? কখ্খনো না। আমাদের কেউ নাই দেখেই সে অপমান করে। বলিয়া দীনু গোবিন্দের মুখের দিকে নয়, খড়মের দিকে আরক্ত নেত্রে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তার তখনও মনে হইল না যে,ঐ খড়ম যতই পবিত্র হোক, আশ্রয় হিসাবে এখন তা অকিঞ্চিৎকর।

গোবিন্দ অগত্যা বলিলেন, তা বটে, কিন্তু তখন ত' অত বুঝি নাই।

দীনবন্ধু অকৃতজ্ঞ নয়; ঠাকুরের মুখ দিয়া ক্ষোভের সুর বাহির হইয়াছে দেখিয়া

সে তৎক্ষণাৎ নরম হইল; সকাতরে বলিল, তোমার দোষ নাই ঠাকুন্দা; তুমি আমাদের যে ভাল করেছ তেমন বাপেও করে না, সাবির আর আমার অদেষ্টের দোষ। বলিতেই দীনুর চোখে জল আসিল।

গোবিন্দ উঠিতে উঠিতে বলিলেন, তোকে সেখানে যেতে হবে না, আমিই যাব একদিন সাবির শাশুড়ীর কাছে, ধমুকে রেখে আসব মা-বেটাকে।

—কবে যাবে?

—এই শীগ্‌গিরই। বলিয়া গোবিন্দ দীনবন্ধুর গায়ে একবার হাত বুলাইয়া দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন।

কিন্তু, মানুষটি যিনিই হউন, কেবল গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেই আর-একজনের সকল যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয় না, ঠাকুরের স্পর্শলাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াও দীনবন্ধুর মনে তিলমাত্র সুখ রহিল না।

এত উপকারী ঠাকুন্দাও যেন হস্তক্ষেপ করিতে নারাজ, নিরপেক্ষ থাকিতে চান। "এখনই চলিলাম" বলিয়া তিনি ত' ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন না, "শীগগিরই যাব" বলিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়াছেন মাত্র, নিষ্প্রাণ দায়-শোধের মতো। তবে আর কাহার কাছে যাইয়া সে প্রতিকার-প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইবে?

সাবিত্রীর গায়ে কেহ কখনও হাত তোলে নাই, তার বাবা তোলেন নাই, সেও তোলে নাই, এখানে ত' সে দু'দিন ছিল, দুঃখেই তার দিন কাটিয়াছে, কিন্তু তার সুখের তরুণ সূর্য্য আকাশে উদিত হইয়াছে বলিয়া যে আনন্দ জন্মিয়াছিল তাহা মিথ্যা, এত আশার স্থল চিরদিনের মতো অলীক হইয়া গেছে।

হাটের দিন সেটা।

দীনু দোকানে বসিয়াছে; কিন্তু খরিন্দারের ডাকে তার হুঁস নাই, কি দিতে কি দিতেছে, কত চায় আর কত দিতেছে, ফেরৎ পয়সা বেশী দিতেছে কি না, সেদিকে তার লক্ষ্য নাই, হাটের কলরব দীনুকে আনন্দ দিত; তাহা দীনুর কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না।

কিন্তু দীনুর চাইতেও দুর্ভাগ্য হরিধন আচার্য্যের, তাঁর কেরোসিন আজই ফুরাইয়াছে।

হরিধন তাঁর কেরোসিনের কোয়ার্ট বোতলটা তেলের টিনের পাশে ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, দীনু, তেলের বোতলটা রইল রে, বলিয়া দীনুর মনোযোগ সে দিকে আকর্ষণ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে অন্যত্র গেলেন।—

কিন্তু তিনিই দীনুর দোকান হইতে সেই বোতলটি লইয়া পুনরায় ঐ প্রকার ধীরে ধীরে বাহির হইবার সময় যে কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল তাহা অপ্রত্যাশিত আর শোচনীয়, আর সে-ই কাজটি করিয়া বসিয়াছে বলিয়া দীনুকে অনেকেই দোষী করিল।

"বেচা-কেনা"র মাঝে একবার অবসর পাইয়া দীনু মজুত বোতলগুলিতে তেল ভরিয়া রাখিয়াছিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, দীনু লণ্ঠন ঝুলাইয়া দিল, একটি খরিন্দার আসিয়া খয়ের চাহিল এক পয়সার; কিন্তু খদির আবগারী বিভাগের দ্রব্য না হইলেও

সূর্য্যাস্তের পর তাহার বিক্রয় নিষিদ্ধ, কিন্তু খরিন্দার নাছোড়বান্দা ; সে নিজের গরজেই সাব্যস্ত করিতে চাহে যে, সন্ধ্যা এখনও পুরোপুরি লাগে নাই, অতএব খয়ের বিক্রয় করা যাইতে পারে।

—না। বলিয়াই দীনবন্ধু হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া দেখিল, হরিধন আচার্য্য তেলের বোতলটি হইয়া ধীরে ধীরে সরিতেছেন, তাঁর মুখ অন্য দিকে ফিরান ; আর, ঘরের অন্ধকার অংশের দিকেই তাঁহার দেহের ঝোঁক।

চক্ষের পলকে বিপরীত কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

দীনবন্ধুর মাথায় বিদ্যুদ্বেগে আর বিদ্যুতের জ্বালা দিয়া খেলিয়া গেল, এই সেই হরিধন, যিনি তার পিতৃবিয়োগের দুর্দ্দিনে অকাতর চিত্তে তাহাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছিলেন। আর, মানুষের বেত্রাঘাতে সাবিত্রীর পিঠ ফাটিয়া রক্ত গড়াইতেছে।

দীনবন্ধু দোকানের তক্তপোষের উপর হইতে লাফাইয়া মাটিতে নামিল, হরিধন আচার্য্য থমকিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই দীনবন্ধু তাঁর গলার চাদর দু'হাতে চাপিয়া ধরিয়া মাটির দিকে টানিতে লাগিল, আর চীৎকার করিতে লাগিল ; "চোর, চোর"।

গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিরা তখন কেহ হাটে ছিলেন না ; অন্যান্য যাহারা ছিল, তাহারা চোর দেখিতে ছুটিয়া আসিল এবং দেখিয়া দাঁতে জিব কাটিয়া পিছাইয়া আসিল।

হরিধন ততক্ষণে শরীর রক্ষার্থে তাড়াতাড়ি বোতল মাটিতে নামাইতে যাইয়া ফেলিয়া দিয়াছেন, তেল গড়াইয়া দোকানের মেঝের বাহিরে চলিয়া আসিয়াছে, এবং আত্মস্থ হইয়া জোরপূর্ব্বক দীনবন্ধুর হাতের টান ছাড়াইয়া মাথা তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ইহার পর তিনি প্রাণপণ উচ্চকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, মারলি আমাকে তুই ? গায়ে হাত দিলি ? কার জিনিস চুরি করেছি রে আমি ? কার কি চুরি করেছি ? আমার বোতল আমি নেব না ?

দীনবন্ধু দর্শকগণের অনুরোধে তাঁর গলার চাদর ছাড়িয়া দিলেও কিন্তু 'আপনি-আজ্ঞার' ধার দিয়াও সে গেল না ; বলিল, তোমার বোতল তুমিই নিচ্ছিলে, কিন্তু তাতে তেল ছিল যে আমার, আমি না দেখলে বোতল চুরির দায় ফেলতে তুমি আমার ঘাড়ে, আর তেলের দাম কই ? আমি বুঝিনে কিছু ?

দর্শকেরাও বুঝিয়া একে একে সরিয়া গেল ; কিন্তু বলিয়া গেল যে, ব্রাহ্মণের অঙ্গস্পর্শ করিয়া দীনবন্ধু কাজ ভাল করে নাই।

শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া হরিধন বলিলেন, রইল বোতল ; তোমরা সব সাক্ষী রইলে হে, আমি চললাম প্রেসিডেণ্টের কাছে, দিনে ডাকাতির কি ব্যবস্থা আমি করতে পারি দেখব।

কিন্তু দীনবন্ধু যে তাঁকে তেলের দাম দিবার অবসর দেয় নাই এ আপত্তি তিনি করিলেন না।

—দেখ। বলিয়া দীনবন্ধু দোকানের তক্তাপোষে উঠিয়া গেল।

হরিধন তৈলশূন্য বোতলটি ভূতল হইতে তুলিয়া লইয়া দোকানের বাহিরে আসিলেন। এটা যেন শ্রীরামচন্দ্রের যুগ, তৃণ হইতে সূর্য্যদেব পর্য্যন্ত সবারই কান

আছে, এমনি ভাবে সবাইকে শুনাইয়া আর পার্থিব অপার্থিব যাবতীয় সত্তার উদ্দেশে হরিধন চীৎকার আর বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, দীনবন্ধু তাঁর হাতে সাড়ে পাঁচ আনার পয়সা ছিল তাহাও সেই সঙ্গে ছিনাইয়া লইয়াছে ; তিনি বৃদ্ধ এবং বহুদিন হইতে বাতে অক্ষম বলিয়া আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে আদৌ সক্ষম হন নাই, আরো অত্যাচার করিয়াছে, তাহা এই যে তেলের বোতলে যে তেল ছিল তাহা মাটিতে ফেলিয়া দিয়াছে। তোমরা এই সব গুণ্ডামি প্রত্যক্ষ করিয়াছ, ধর্ম্মও তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। তোমাদের সাক্ষ্য দিতে হইবে,অপমানের এই শেল উৎপাটিত করিতে তোমরা যদি সহায় না হও, তবে তোমরাও মহাপাতকের ভাগী হইবে।

হরিধন 'আচার্য্য-বামুন' বলিয়া মানে ছোট আর প্রতাপে অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ, তাহাই অনুভব করিয়াই বোধ হয় এত কথার মধ্যে ব্রহ্মণ্য তেজের উল্লেখ তিনি করিলেন না।

হরিধনের সাক্ষ্য মানামানি কেহ শুনিল, কেহ শুনিল না কিন্তু যে-ব্যক্তি খয়েরের দরুণ বৃথাই দাঁড়াইয়া ছিল, সে একটু আগাইয়া আসিয়া বলিল, বোতলটা তুমি চুরিই করছিলে ঠাকুর, তোমার কান্না আর যে-ই শুনুক, আমি শুনব না। বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

কথাটা আরো কয়েকজনের কানে গেল দেখিয়া হরিধন হতোদ্যম হইয়া খানিক স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন।

তারপর হাটের আঙ্গিনা ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেন ; এবং তখন তাঁর চীৎকার পুনরায় শুনা যাইতে লাগিল, কিন্তু সে-সব কথার বক্তা ও শ্রোতা না হওয়াই ভাল।

হরিধন আচার্য্যের গৃহে তৈলাভাবে কিম্বা অপমানদুঃখে সে-রাত্রিতে লণ্ঠন জ্বলিল কিনা, কিম্বা তিনি প্রেসিডেণ্টের সমীপে দুঃখ নিবেদন করিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন কি না তাহা জানি না; কিন্তু দীনবন্ধু পরক্ষণেই এতবড় ঘটনাটা নিঃশেষে ভুলিয়া গেল।

তখনই দোকান বন্ধ করিয়া কিছু না খাইয়াই সে শুইয়া পড়িল।

অন্ধকারে তার উন্মীলিত চক্ষুর সম্মুখে সাবিত্রীর ব্যথাতুর মুখখানা যেন আরো গভীর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শরীরে আহত হইয়া সাবিত্রীকে কখনো সে কাঁদিতে দেখে নাই। আজ সে কাঁদিতেছে। বোধ হয় দাদাকে ডাকিয়া ডাকিয়া সে কাঁদিতেছে। শিবু তাকে মারে, বোধ হয় রোজই মারে, দোষ থাক আর না থাক তবু বোধ হয় রোজই মারে, সাবিত্রী সর্ব্বাঙ্গ পাতিয়া দিয়া হিংস্র শত্রুর রক্তবর্ণ অস্ত্রলেখা নিঃশব্দে গ্রহণ করে।

দূরত্বের আবরণ ছিন্ন করিয়া সাবিত্রীর অস্ত্রলেখাকীর্ণ দেহ দীনবন্ধুর ভীত নেত্রের সম্মুখে যেন সত্য সত্যই বিচরণ করিতে লাগিল।

অস্থির হইয়া দীনবন্ধু শয্যার উপর উঠিয়া বসিল, ঝাঁপ ঠেলিয়া ঘরের বাহিরে আসিল, দীনবন্ধু জানে না যে, বহু সময় সে বিভীষিকা দেখিয়া কাটাইয়াছে।

হাট তখন নির্জন, ও-দিককার দোকানগুলির লোকেরা খাইতে বাড়ী গেছে, আরো রাত্রি হইলে দোকানে আসিবে। নদী আর ওপারের প্রান্তর অন্ধকারে একাকার হইয়া গেছে। হাটের বালিবহুল শুভ্র মৃত্তিকা নক্ষত্রালোকে স্বচ্ছ হইয়া বালুকণাগুলি চিক্ চিক্ করিতেছে।

দীনবন্ধুর মনে হইল, এখনই ছুটিয়া যায় সেই পারুলডাঙ্গায়, যেখানে সাবিত্রী প্রহার-যন্ত্রণায় কাঁদিতেছে। কিন্তু গোবিন্দ নিষেধ করিয়াছেন, আর সম্মুখে গভীর অন্ধকার, আর পারুলডাঙ্গা অনেক দূরে। দীনবন্ধু শয্যায় ফিরিয়া আসিল।

আরো একটা দিন নিশ্চেষ্ট থাকিয়াই দীনবন্ধু বীভৎস সব কল্পনা করিল, আর ছটফট্ করিল, কিন্তু তার পরের দিন চুপ করিয়া থাকাটা তাহার সহ্য হইল না, দোকানের ঝাপে তালা লাগাইয়া আর পথ শুধাইয়া দ্বিপ্রহরের পর সে পারুলডাঙ্গায় আসিল।

উঠানে পা দিতেই শুনিল, ঘরের ভিতর হইতে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির কণ্ঠস্বর আসিতেছে; "রা-ধা গোবিন্দ বল।"

সেইদিকে খানিক চাহিয়া থাকিয়া বাধ বাধ পায়ে ভয়ে-ভয়ে একটু-একটু করিয়া অগ্রসর হইয়া দীনবন্ধু দেখিল, বাঁদিকে ঢেঁকিশাল, সাবিত্রী আর তার শাশুড়ী সেখানে রহিয়াছে, শাশুড়ীর নির্দ্দেশমতো সাবিত্রী বেতের 'সেরে' করিয়া মাপিয়া মাপিয়া ধামার চাল প্রকাণ্ড একটা হাঁড়িতে তুলিতেছে। এলোকেশী গণিতেছে, বারো, তেরো, চৌদ্দ। কুলা একখানা সেখানে পড়িয়া আছে; তুষে আর চালের কুঁড়ায় ঢেঁকিশালের মেঝে ঢাকা পড়িয়া গেছে। শাশুড়ী ঘামিয়া উঠিয়াছে।

খানিক নিঃশব্দে তাকাইয়া থাকিয়া দীনবন্ধু যেন অনেক বিপদ কাটাইয়া কণ্ঠস্বর ফুটাইল।

এলোকেশী যখন বলিল: "পনর।"

তখনই দীনবন্ধু ডাকিল: "সাবি?"

চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দীনবন্ধুকে দেখিয়া সাবিত্রীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, দীনু তাহা স্পষ্ট অনুভব করিল, কিন্তু সে উঠিতে যাইয়াও উঠিল না, কাজে মন দিল।

এলোকেশী বলিল, কে গা তুমি?

এলোকেশী দীনবন্ধুকে চিনিতে পারে নাই এমন নহে, কিন্তু সে বউয়ের ভাই বলিয়া তৎক্ষণাৎ চিনিতে না পারাই যেন উচিত জব্দ করা হয়।

দীনবন্ধু বলিল, আমি সাবিত্রীর দাদা।

পরিচয় অবগত হইয়া এলোকেশী যেন কুটুম্বসমাগম-উৎফুল্ল আর তার সম্বর্দ্ধনার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া শয়নঘরের দাওয়ায় আসন পাতিয়া দিল।

দীনু বসিবার আগে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া পূজনীয়ার পদধূলি লইল।

এই ভদ্র আচরণে কতক প্রসন্ন হইয়া এলোকেশী শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি মনে করে? বোনকে দেখতে এসেছ বুঝি?

—হ্যাঁ। কিন্তু সাবি আমাকে দেখে যেন চিনতেই পারল না।

অভিমানে দীনুর স্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

দীনুর আগমনে এলোকেশী যে-কারণে কুটুম্বসমাগম-সুখ অনুভব করিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিবার পথ দীনবন্ধুই খুলিয়া দিল।

দীনবন্ধু জানে না যে, এলোকেশী আপাততঃ সুমিষ্ট সম্ভাষণ করিলেও তাহার সুর উহা নহে। দাদাকে দেখিয়া প্রথম মুহূর্ত্তেই ছুটিয়া তাহার কাছে আসিবার জন্য সাবিত্রীর প্রাণ আকুল হইয়া উঠিলেও, শাশুড়ীর ভয়েই সে ওঠে নাই; তখনই

শাশুড়ী হয়তো কিছু বলিতেন না, কিন্তু সাবিত্রী জানে, কাজ ফেলিয়া উঠিয়া আসার অপরাধ শাশুড়ী ক্ষমা করেন না, ঐ অপরাধে পরে তাহাকে গুরুতর বাক্যদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কি, সহোদরের প্রতি আকর্ষণকেই রাক্ষসীর ক্ষুধার মতো প্রচণ্ড আর অস্বাভাবিক একটা কিছুর সঙ্গে তুলনা করিয়া দাদাকে জড়াইয়া বড় বড় বিদ্রূপ আর ভর্ৎসনার কথা বলিবেন।

দীনুর ক্ষোভ দেখিয়া এলোকেশী সুবিধা পাইল, অর্থাৎ যে কথা নিজে তুলিয়া ক্রোধমিশ্রিত নিন্দার ছলে বলিতে হইত, সেই কথাই নিরাশ্বাস অভিযোগের সুরে শুনাইতে পারা যাইবে।

সাবিত্রী ঢেঁকিশাল ছাড়িয়া বিনা আহ্বানে এক-পা নড়ে নাই।

মুখ বক্র করিয়া সেইদিকে একবার চাহিয়া লইয়া এলোকেশী আস্তে আস্তে বলিল, ও-র রকমই ঐ। তোমার বোন বলেই তোমার কাছে বলছি, বাবা, আর তুমি আমার পেটের ছেলের মতন, কিন্তু বলবো কি, তোমার বোনের রকম ভাল নয়। বলিয়া এলোকেশী এমন ভঙ্গীতে মাথা নাড়িতে লাগিল, যেন সে বৌয়ের সঙ্গে যুঝিয়া যুঝিয়া সম্প্রতি হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছে।

দীনবন্ধু ছেলেমানুষ। ভার-ভারিক্কি আর মাতৃসমা এলোকেশীর কথা শুনিয়া তাহার মনে হইল, কথা সত্যই। নিতান্ত বাধ্য হইয়াই আপনার জনের কাছে আপনার জনের সম্বন্ধে অপ্রীতিকর আলোচনায় যে কুণ্ঠা আর বেদনা থাকা সঙ্গত, এলোকেশীর কথায় আর কথার আওয়াজে তাহা লক্ষ্য করিয়া দীনবন্ধু আরো প্রতারিত হইল। বোনের নিন্দায় সে লজ্জা পাইল, হতাশ হইল; বলিল, সে ত' এমন ছিল না!

এলোকেশী দীনবন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ছিল, তোমরা বুঝতে পার নাই। ছেলেমানুষ তুমি; মেয়েদের মনের বজ্জাতি তুমি কি টের পাবে। বলিয়া এলোকেশী কি কারণে অল্প অল্প হাসিতে লাগিল দীনবন্ধু তাহা অনুমান করিতে পারিল না।

সাবিত্রীর বজ্জাতি দীনবন্ধু টের পায় নাই, ইহা এলোকেশীর পক্ষে হাস্যজনক কৌতুকের কথা নহে; এলোকেশী তার বজ্জাতি টের পাইয়াছে, সেটা জ্বালার কথা হইতে পারে, কিন্তু হাসির কথা হইতে পারে না।

হাসির কারণ উহা নহে।

দীনবন্ধু যে তাহার কথা বিশ্বাস করিয়া কেমন হতোৎসাহ অপ্রতিভের মতো মুখ করিয়াছে. এলোকেশীর তৃপ্তির আর তজ্জনিত হাসির কারণ তাহাই, এটুকু তারই কেরামতি; বউয়ের ভাই জব্দ হইয়াছে।

দীনবন্ধু অসুখী, মুখ নামাইয়া আছে।

এলোকেশী অপেক্ষা করিতেছে।

এমন সময় গোবিন্দ ঠাকুর কোথা হইতে সহসা উহাদেরই দরজায় দেখা দিলেন, মাথায় নামাবলীর পবিত্র উষ্ণীষ, পায়ে ততোধিক পবিত্র ধুলো।

"রা-ধা গোবিন্দ বলো।" বলিয়া যে নারীকণ্ঠ ঘরের ভিতর কলির জীবকুলের উদ্ধারকল্পে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাইতেছিল, সে ঠিক সেই সময়েই কথা ও সুর দুইই পাল্টাইয়া বলিয়া উঠিল: "অ বৌমা, মরেছে হারামজাদী।"

ঠাকুরের আসার গোলমালে, অর্থাৎ এলোকেশীর অভ্যর্থনার কলরবে, আর তাঁহাকে দেখিয়া আসান পাওয়ায়, নিজের আনন্দ-চাঞ্চল্যে দীনবন্ধুর কানে ঐ গালটা গেল না, কিন্তু গোবিন্দ শুনিলেন।

গোবিন্দ উঠান পার হইয়া নিকটে আসিলেন; বলিলেন, দীনু যে। আমার আগেই এসে হাজির।

গোবিন্দ তাহাকে আসিতে বারণ করিয়াছিলেন, মনে পড়িয়া দীনু লজ্জিত হইল, এলোকেশীও হৃদয়ঙ্গম করিল, দীনু হঠাৎ আসে নাই, আসিবার পরামর্শ হইয়াছিল, তথাপি সে সস্নেহে বলিল, এসেছে, ভালই করেছে, ছেলেমানুষের মন! মায়ের পেটের বোনের জন্যে মনটা চঞ্চল হয়েছিল।

বলিয়া সে দ্রুতপদে নামিয়া ঠাকুরের পদধূলি লইল, যথোচিত ভক্তি আর আড়ম্বর করিয়া তাঁহাকে উচ্চাসনে বসাইল, তাঁহার পাদপ্রক্ষালনের জল আনিয়া দিল, তামাক সাজিয়া দিল।

গোবিন্দ হাত-পা ধুইয়া তামাকু সেবন করিতে লাগিলেন, এবং বিশ্রাম করিতে করিতে ভর্ৎসনার স্বরে বলিলেন, আমিই আসব বলেছিলাম ত'। তুমি কেন কাজ কামাই করে এলে, দীনু?

গোবিন্দ ভাবিয়াছিলেন, দীনু আসিয়া কলহ করিবে, এবং তাহাতে সাবিত্রীর কষ্ট বাড়িবে বই কমিবে না।

দীনু অধোমুখে বলিল, মন বড় খারাপ হয়েছিল, ঠাকুন্দা।

—তা বেশ করেছিস। বলিয়া গোবিন্দ মাথা তুলিয়া হাঁকিলেন, সাবিত্রী কই রে?

ঢেঁকিশালার দিকে মুখ করিয়া এলোকেশীও ডাকিল, বৌমা, এদিকে এস, ঠাকুর মশাই ডাকছেন।

যেদিকে হইতে সাবিত্রী আসিবে দীনু সেইদিকে নিষ্পলক চক্ষে চাহিয়া রহিল।

সাবিত্রী আসিয়া দাঁড়াইল।

দীনবন্ধুও দেখিল, গোবিন্দও তৎক্ষণাৎ অনুভব করিলেন, ডাকিলে যে-ভঙ্গীতে আসিয়া সাবিত্রী দাঁড়াইত, আজ ডাক শুনিয়া সে সে-ভঙ্গীতে আসিয়া দাঁড়াইল না, গতিতে সে অনাহত দেহহিল্লোল নাই, দাঁড়াইবার ভঙ্গীতে তার পূর্ব্বের নিজস্বতা নাই, অপরাভূত স্বাচ্ছন্দ্য নাই।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গোবিন্দের বড় অনুকম্পা জন্মিল, মুখে চোখে হতাশার চিহ্ন যেন স্পষ্টাক্ষরে লেখা পড়িয়াছে।

গোবিন্দ তবু কলরব করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, আমাকে পেন্নাম করতেই ভুলে গেলি যে, সাবি। কেমনধারা ভুল তোর? বলিতে বলিতে একবার তাঁর মনে হইল, এলোকেশীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখেন, কিন্তু ইচ্ছাটা দমন করিলেন, বলিলেন, আছিস কেমন বল?

সাবিত্রী সলজ্জভাবে একটু হাসিল, বলিল, ভালই আছি, ঠাকুন্দা। বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াছিল, থামিয়া বলিল, ওকি, দাদা?

মুখ ফিরাইয়া গোবিন্দও সবিস্ময়ে দেখিলেন, দীনবন্ধু দুটি করতল দিয়া মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

—'কাঁদছিস কেন রে ক্ষ্যাপা ?' হাল্কা সুরে এই কথা বলিয়া গোবিন্দ তার পিঠে সান্ত্বনার হস্তস্পর্শ দিতেই দীনবন্ধু রুখিয়া উঠিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, সাবিকে ওরা মেরে ফেলবে, ঠাকুন্দা, কত রোগা হয়ে গেছে দেখ, তোমার 'দুখানি পায়ে পড়ি' সাবিকে তুমি বাঁচাও, চলে আয়, সাবি ; তুমি এখানে আর থাকিসনে।

সবাই অবাক হইয়া রহিল।

সাবিত্রীর চোখ ছলছল করিতে লাগিল।

দীনবন্ধু বলিয়া চলিল, শিবু গেল কোথায় ? দেখা পেলে শিক্ষে দিয়ে যেতাম, তার এত বড় বুকের পাটা, সাবির গায়ে হাত তোলে, বলিয়া দীনু কাঁপিয়া কাঁপিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

এলোকেশী অটল হইয়া এতক্ষণ দীনুকে নিরীক্ষণ করিতেছিল।

দীনু থামিতেই সে সুরু করিল, ওমা, এ আবার দেখি আর একজন। বাড়ী বয়ে ঝগড়া করতে এসেছে। মন্দানি দেখ। শিবুকে খুঁজছিস ? সে থাকলে এতক্ষণ তোর তেল নিংড়ে ছেড়ে দিত ! কোথাকার হাবাতে ছোঁড়া রে তুই ?

দীনু প্রত্যুত্তর করিল, আমি হাবাতে নই, হাবাতে তোমরা। স্ত্রীকে ধরে মারে তোমার ছেলে, তাকে শাসন করতে পার না, শাসন করতে এসেছ আমাকে। তোমার বাড়ীতে আমার বোনকে আর রাখব না। বলিয়া দীনু সাবিত্রীর দিকে ছুটিয়া যাইতেই গোবিন্দ আশ্চর্য্য তৎপরতার সহিত তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু এলোকেশীর মুখ কেহ চাপিয়া ধরে নাই, তাহার মুখ চলিতে লাগিল : "নিয়ে যা না তোর বোনকে, দূর হয়ে যা, বালাই, দূর হয়ে যা।"

কুটুম্বিতা যখন এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে তখন, "গোলমাল কিসের এত ?" জিজ্ঞাসা করিয়া, এবং এক হাতে ছিপ আর অন্য হাতে চারের ভাঁড় লইয়া শিবুরা তিন ভাই ঢুকিল।

এই চরম মুহূর্ত্তে গোবিন্দ দীনুর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বিদ্যুদ্বেগে পলায়ন করিলেন, সাবিত্রী তার ললাটলিপি লইয়া সেখানেই রহিল, এলোকেশীও তার রসনা লইয়া রহিয়া গেল।

এই পলায়নের মতো বুদ্ধির কাজ গোবিন্দ জীবনে খুব কমই করিয়াছেন, তাঁহার মাথায় ঐ বুদ্ধি না আসিলে কুটুম্বদ্বয়ের ঐ আপ্যায়নলীলা কতদূর গড়াইত তাহা অনুমান করা অসম্ভব নয়।

উল্লিখিত ঘটনা সাবিত্রীর বধূজীবনের পূর্ব্বাহ্নের কথা, প্রভাত যে শীতল রূপটি লইয়া উদিত হইয়াছিল তাহা ক্ষণস্থায়ী, মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই আকাশ হইতে অগ্নি ঝরিতে লাগিল।

কোনো-কোনো গৃহিণী নিজের তের বছরের কন্যাটিকে মনে করেন ছেলেমানুষ, এবং ছেলেমানুষ বলিয়া তার ভ্রম অজ্ঞতা অনিচ্ছা কি আলস্যের অপরাধ তাঁহার পক্ষে মর্ম্মান্তিক হইয়া ওঠে না। কিন্তু অপর গৃহের এগার বছরের কন্যাটিকে বধূরূপে সংসারে আনিয়া বধূটিকে মনে করেন মস্ত ; আর তার ভুল-চুক অপটুতা ক্ষমা করিতে চাহেন না।

সাবিত্রীর শাশুড়ী এলোকেশী এই ধরনের মানুষ, এক হাতে দক্ষযজ্ঞ সমাধা

করিবে অথচ মুখে কথাটি থাকিবে না, এই ছিল তার বউয়ের আদর্শ আর বউয়ের সম্বন্ধে আশা। বউয়ের মুখে কথাটি নাই ইহা ঠিকই, কিন্তু নিত্যকার দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার তাহাকে দিয়া একহাতে সমাধা করাইবার ধনুর্ভঙ্গ পণ আর প্রাণান্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল ; তাহার একমাত্র কারণ সাবিত্রী ছেলেমানুষ, কিন্তু উহাতেও এলোকেশীর প্রাণে ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ ভোগ চলিতে লাগিল।

অপটুত্ব চোখে দেখা সয় না বলিয়া এলোকেশীর একটা গর্ব্ব আছে ; তার মনে হয় ঐ না-সওয়াটা তার নিজের অপরিমিত কর্ম্মিষ্ঠতার প্রমাণ। সাবিত্রী কেন সব কাজ শিখিয়া আসে নাই, ইহাই লইয়া সাবিত্রীকে অহরহ ভৎসনা আর প্রতিবেশিগণের কাছে এলোকেশীর অবিরাম নালিশ চলিতে লাগিল।

কে একজন বলিয়াছিল, "ছেলেমানুষ ত' বউ।"

তাহাতে এলোকেশী বলিয়াছিল, "হ্যাঁ; দেখে এস পাতখানা, খায় কত!" তারপর এলোকেশী তার শাশুড়ীর কাছে শেখা শ্লোকটা আবৃত্তি করিয়াছিল।

থাল ভরে বেড় ভাত আমি যুবতী,
কাজে কর্ম্মে বল নাক আমি পোয়াতী।

সাবিত্রীর সঙ্গে ঐ যুবতী-পোয়াতীর আকার বা অবস্থা-সাদৃশ্য পাওয়া যায় নাই, তবু কেবল এলোকেশীর চোখ-মুখের চেহারা দেখিয়া আর উচ্চারণের বেগ অনুভব করিয়া বিপক্ষ দল হার মানিয়াছিল।

যাহাই হউক, এলোকেশীর কাজ অনেক, আর সব কাজই ভারি-ভারি ; থালা, বাসন, ঘটি বাটি, হাঁড়ি কলসী বড় বড় ; রান্না বেশী বেশী ; জল তোলাও তাই ; তার উপর ঢেঁকি আর ধান, কলাই আর যাঁতা, দুধের গাই, আর হালের বলদ, অর্থাৎ লক্ষ্মীমন্ত সংসারে যে সমস্ত জিনিস না থাকিলে চলে না, ধনে জনে পুত্রে এলোকেশীর সংসারে তা সবই আছে।

কিন্তু রামপ্রসাদের কি দীনবন্ধুর ছোট্ট গৃহস্থালীতে এ সব স্বপ্নেও কখন ছিল না। কাজেই প্রথম প্রথম সাবিত্রীর আঁদিশা লাগিতে লাগিল, কায়িক কষ্টের কথা না ধরিলেও চলে।

পাঁচ সাত দিন দেখিয়া এলোকেশী বলিল, কেবল গিলতে শিখেছ, কাজ করতে শেখ নাই।

গিলিবার কথাটা স্বীকার করিয়াও উত্তরে সাবিত্রী বলিতে পারিত—"এত বড় বড় কাজ ত' কখনো করি নাই, মা।"

এলোকেশী বলিতে লাগিল গোবর অমন করে ভাঙে না ; ঘটি মেজেছ ত' মাটি ধোও নাই, খানিকটা ঘটির কানায় লেগেই আছে। দুয়োর নিকিয়েছ ত' গোবর কোথাও ধেবড়ে আছে, কোথাও খালি জল বুলিয়েছ, গরুর কাছে এগুতে তোমার ভয় করে, এ-সব ত' ভাল লক্ষণ নয় বাপু।

ঐ দুর্লক্ষণ ঘুচাইতে হইলে কি করিতে হইবে তাহা সাবিত্রী বুঝিতে পারিল, সাবধান হইবে সংকল্পও করিল ; কিন্তু এই দুর্যোগ দিন দিন কত ভয়ংকর হইয়া উঠিতে পারে, হঠাৎ এই অন্ধকারের সম্মুখে পড়িয়াও তাহা সে কল্পনা করিতে পারিল না। তার কেবল বুক কাঁপিতে লাগিল।

চোখ থাকিতেও যে চোখে দেখে না, হাত থাকিতেও যাহার ক্ষমতা নাই, তাহাকে এবং নিজের অদৃষ্টকে বহুভঙ্গিম ভাষায় ধিক্কার দিতে দিতে এলোকেশী সাবিত্রীর অসম্পন্ন কাজগুলি সম্পন্ন করিল।

বিবাহের পরই ক্ষুদ্র গৃহের মেয়ে সাবিত্রী শ্বশুরবাড়ীর বড় বড় ঘর, গোলা, খামার, খড়ের মস্ত মস্ত পালুই দেখিয়া বিস্মিত আর খুশি হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমাগত কথার বিষ ঢালিয়া পড়ায় তাহার সে আনন্দ কুঁকড়াইয়া নির্জীব হইয়া গেল। বিবাহ করিয়া লইয়া যাইতেছে, বৌ হইয়া যাইতেছে, যাইয়া সেখানে থাকিতে হইবে, মুখ ম্লান করিলে চলিবে না, এইটুকু পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম করিলেও অন্য জ্ঞান তার জন্মে নাই, অর্থাৎ যাহাদের কাছে যাইতেছি তাহারা না জানি লোক কেমন, কুটিল এ ভয় তার হয় নাই। কিন্তু কঠিন কথা শুনিয়া সে থতমত খাইয়া গেল, এবং তারপর দ্রুতগতিতে জ্ঞান বাড়িয়া, বড় বড় ঘর আর ধানের গোলা প্রভৃতি সৌভাগ্যের সমুজ্জ্বল নিদর্শনগুলি তাহার কাছে তুচ্ছ হইয়া উঠিতে লাগিল।

প্রথম প্রথম বোধহয় দিন সাতেক, এলোকেশী তাহাকে মিষ্ট কথা বলিয়াছিল; দেবর দু'টি কাছে কাছে থাকিত, ঠাট্টা-আব্দার করিত।

কিন্তু একদিন এ-সব উল্টাইয়া গেল। যে স্ত্রীলোকটি অন্যান্য কাজের মধ্যে ধান বাহির করিয়া রৌদ্রে দিত সে একদিন আসিল না।

এলোকেশী বলিল, বৌমা, ঘরে জালায় ধান আছে; জালা থেকে ধান ধামায় তুলে উঠোনে চাটাই পেতে রোদে দাও।

সাবিত্রী কান পাতিয়া আদেশটা শুনিল; কিন্তু এলোকেশীর আদেশ যত সহজ শুনাইল, এবং এলোকেশীর পক্ষে কাজটা যত সহজ, সাবিত্রীর পক্ষে তাহা তত সহজ নহে। গোবর-গোলা মাখাইয়া ছিদ্রহীন করা চাটাই উঠানে পাতিয়া ধামা লইয়া যাইয়া সাবিত্রী দেখিল, জালার গর্ভে ধান যেখানে রহিয়াছে সেখানে তার হাত অতি কষ্টে পেঁছায়; আঙুলের অগ্রভাগ দিয়া ধামা স্পর্শ করা যায়, কিন্তু মুঠা করিয়া তোলা যায় না।

দেবরদ্বয়ের কাহাকেও সাহায্যার্থে ডাকিতে সাবিত্রী লজ্জাবোধ করিল, সে জলচৌকি আনিয়া জালার ধারে পাতিল, এবং তাহার উপর চড়িয়া জালার উপর বুক দিয়া উপুর হইয়া পড়িয়া আর জালার মুখের ভিতর মাথা ঢুকাইয়া সে ধান তুলিয়া ধামায় রাখিতে লাগিল।

ধামার ধান উঠিতে লাগিল বটে কিন্তু সময় ও শ্রমব্যয়ের অনুপাতে কাজ আগাইল না।

এলোকেশী দু'বার আসিয়া তাগিদ দিয়া গেল—কণ্ঠনিনাদে তার সন্তোষ অসন্তোষ বুঝা গেল না; কিন্তু তৃতীয়বার তাগিদ দিতে আসিয়া সে ধমকাইয়া উঠল, 'হ'লো ?'

সাবিত্রী তখন হাঁপাইতেছে, এবং ধামা মাত্র অর্ধেক ভরিয়াছে, সাবিত্রী ধামার দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িল, অর্থাৎ হয় নাই।

এলোকেশী আগাইয়া আসিয়া ধামার ধান দেখিল, তারপর এ-কাজের যে পুরস্কার তাহাই সে দিল; বলিল, কপাল আমার! বলিয়া কপালে করাঘাত

করিয়া বলিতে লাগিল, এই গুণের বউ তুমি আমার ! আমার গেরস্তালী করা তাহলেই হয়েছে। সরো, সরে দাঁড়াও। বলিয়া সাবিত্রীকে হাত দিয়া সরাইয়া নিজেই ঝপাঝপ ধান তুলিয়া ধামা ভরিয়া লইয়া রৌদ্রে দিতে গেল।

বলিয়া গেল, ধান তুলবে জালা থেকে তাতে জলচৌকি রে, মই রে—

এলোকেশীর আদৌ মনে পড়িল না যে, ক্ষুদ্রদেহা সাবিত্রীর পক্ষে এই কাজটি কত দুরূহ ; কিন্তু সাবিত্রীর মনে হইল, শাশুড়ীর তাহা মনে পড়া উচিত ছিল।

সাবিত্রী মুখ নামাইয়া রহিল। এলোকেশী গজগজ করিতেই লাগিল।

এবং শিবরতন বাড়ী আসিতেই লাগাইয়া দিল ; "ওরে শিবু, বৌ নিয়ে ত' আমার দিন চলবে না। বললাম"—

বলিয়া ঘটনাটা সে শিবুকে জানাইল।

কিন্তু শিবু আবার অন্য মতের লোক ; নিজের অসুবিধা না ঘটিলে পরের অসুবিধার কথায় সে উষ্ণ হয় না। সে চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু শ্রোতা চুপ করিয়া থাকিলেই রাগ পড়িয়া যাইবে এলোকেশীর রাগ তেমন নিরালম্ব বস্তু নহে। সে-দিন সমস্তটা দিন সাবিত্রীর লাঞ্ছনার সীমা রহিল না।

অদৃষ্টের ফের এমনি যে এলোকেশীর একটা রাগ পড়িতে না পড়িতে পুনঃ পুনঃ রাগের কারণ দেখা দিতে লাগিল। সাবিত্রীর রান্নায় নুন ঝালের পরিমাণ কম-বেশী হয়, তার অসময়ে ঘুম পায়, বৈকালে সিঁদুরের টিপু লইতে তার ভুল হইয়া যায়, ঝাঁট দিয়া ঘরের সমস্ত ধুলো সে বাহির করিতে পারে না।

চোখ মেলিয়া চাহিলেই কতদিকে কত যে তার অক্ষমতা আর অপরিচ্ছন্নতা আর অকল্যাণকর ত্রুটি এলোকেশীর চোখে দিবারাত্র ধরা পড়ে তাহার ইয়ত্তা নাই। এলোকেশী বকিতে-বকিতে একটু থামিয়াই আবার বকিতে শুরু করে। কিন্তু পদে-পদে ভয়ে দিশেহারা হইয়া না গেলে সাবিত্রীর এত ভুল হইত না।

সন্ধ্যার পরই খাওয়া দাওয়া সারিয়া একটু গল্প গুজব করিবার পর ঘুমাইয়া পড়া তার অভ্যাস ছিল ; এখানে আহারাদি শেষ হইতে রাত্রি এগারটা বাজিয়া যায়, রাত্রি এগারোটার আগেই যদি সাবিত্রীর ঘুম পায় তবে অসময়ে ঘুম পাইয়াছে বলা যায় না।

এলোকেশী বলে, ছেলেরা ত' জেগেই রয়েছে। তোমার পোড়া চোখেই এত ঘুম বিধাতা দিয়েছেন। তারপর ছেলেদের শিশুত্ব এবং বউয়ের ধাড়িত্ব লইয়া সে অসংখ্য কথা বলে।

আবার ইহাও মানুষকে স্মরণ করাইয়া দিতে এলোকেশীর ভুল হয় না যে, অকালনিদ্রা চিরনিদ্রার পূর্ব্বলক্ষণ।

একদিন সাবিত্রীর এমনি তন্দ্রাচ্ছন্নতার সময় তার কনিষ্ঠ দেবর একটা আরশুলা আনিয়া তার পিঠের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিল, সাবিত্রী ভয় পাইয়া হাউমাউ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়াছিল।

দেবরেরা এখনো মাঝে মাঝে দৃশ্যটি অভিনয় করিয়া দেখায়।

পোষা ময়নাটাকে ইতিপূর্ব্বে সবাই মিলিয়া "রাধা-গোবিন্দ" বুলি শিখাইয়াছিল ; বউকে গাল দেওয়াটা তার আপনা-আপনি শিক্ষা অভ্যাস হইয়া গেল।

কত সময় শিবুর সাক্ষাতেই এই নির্য্যাতন ঘটে, কিন্তু কাহারো পক্ষ লইয়া সে কথা বলে না, সে জননীকে উৎসাহ দেয় না, স্ত্রীর হইয়া প্রতিবাদ করে না, স্ত্রীকে সান্ত্বনাও দেয় না।

এলোকেশী ভাবে, ছেলে কেন তাহার হইয়া দু'টা কথা বলে না! উহাতে আক্রোশ বাড়িয়া সাবিত্রীর উদ্দেশ্যে মনে মনে বলে, তোর মতো পুঁচকে মেয়েকে যদি জব্দ করতে না পারি তবে আমি বৃথাই বাপের বেটি।

এলোকেশীর পিতা রামতনুর নাকি মানুষকে জব্দ করিবার কৌশল উদ্ভাবনে হাতযশ ছিল।

এলোকেশী সেই পিতার পিতৃযশগর্ব্বিতা কন্যা। তা হউক। কিন্তু মাঝখানে পরকাল মাটি হইল ময়নাটার; এত কটুভাষা তার কণ্ঠস্থ হইয়া গেল যে, এলোকেশীর মুখের সঙ্গে তার মুখের আর তফাৎ রহিল না, পবিত্র রাধানাম-সংযুক্ত পাপহর গোবিন্দনাম সে ভুলিতে বসিয়াছে।

শিবুর দুইটি ছোট ভাইয়ের নাম বয়ঃক্রম হিসাবে যথাক্রমে কালা আর মোনা। সাবিত্রীর সঙ্গে তাহাদের ব্যবহার ছিল কৌতুকের পরিচ্ছদে সভ্য না হোক সুশ্রী, কিন্তু মায়ের দৃষ্টান্তের আর দাদার অগ্রাহ্যের ভাব দেখিয়া তাহারাও গণ্ডীর বাহিরে আসিল; মায়ের কথায় সায় দিতে দিতে এবং বৌদিদির বিরুদ্ধে তৈরী সাক্ষ্য দিতে দিতে এক দিন তারা সেই রাজ্যে স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিয়া দুর্ব্ব্যবহারে মাকেও ডিঙাইয়া যাইবার উপক্রম করিল।

মেজ কালা বলে, বৌদি, তোমার দাদাকে আমি দেখেছি।

সাবিত্রী চমকিয়া তাহার দিকে চায়, উজ্জ্বল হইয়া উঠে, বুঝি খবর পাওয়া যাইবে, আশান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে: "কখন দেখলে ?"

কালা আগে হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে, তারপর বলিতে থাকে, সেই দাদার বিয়েতে গিয়েছিলাম, তখন দেখেছিলাম। তোমার দাদার একটা পা খাটো নাকি ? মুখ দিয়ে বুঝি 'র' বেরোয় না তার ?

সাবিত্রী আশ্চর্য্য হইয়া বলে, কই না।

—তবে কাকে দেখতে কাকে দেখেছিলাম তখন। নেঙ্গুটি পরা, একটা ছোঁড়া খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে দাদার দিকে চেয়ে বলছিল, 'বল দেখি। বাঃ বেশ বল। বলো দেখি, আঠাল দুগুণে কত হয় ?' সে তোমার দাদা নয় ? তোমার দাদা তবে কেমন ?

সাবিত্রী ব্যথিতমুখে ফেরে।

কালা বলে, শোনো, বৌদি, এখনো সব বলা হয় নাই।

কালার খল খল হাসির শব্দ কানে লইয়া সাবিত্রী আড়ালে যাইয়া দাঁড়ায়।

ছোট মনা আরও এক-কাঠি উপরে।

সে বলে, বৌদি, খাবার জল।

ঢক্ ঢক্ করিয়া ঘন ঘন জল খাওয়া মোনার একটা রোগে দাঁড়াইয়া গেছে; আর, পানীয় জল সম্বন্ধে সে খুব সতর্ক, ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া তবে সে জল গলাধঃকরণ করে; কারণ, বিজ্ঞান-রীডারে লেখা আছে জলে কলেরার জীবাণু থাকে।

জলের প্লাস হাতে লইয়া মোনা জলের ভিতরটা আদ্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কোনোদিন আপত্তিজনক কিছু দেখিতে পায়, কোনোদিন পায় না, যদি পায় তবে তার মনে হয়, এই জল পেটে গেলেই অনিবার্য্য কলেরা হইত।

সেদিন জলে কি ছিল কে জানে—

মোনা জলের প্লাস উপুড় করিতে যাইয়া কি ভাবিয়া থামিয়া গেল, সাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া চোখ গরম করিয়া বলিল, তোমার যে চোখ থেকেও নেই তার গোড়ায় জল দিলাম।

বলিতে বলিতে প্লাসের জল ছুঁড়িয়া দিল সাবিত্রীর গা-বরাবর, গা ভিজিয়া গেল।

তারপর মোনা বলিল, এতে যদি তোমার চোখ ফোটে তবে আর দেব না।

চৌদ্দ বছরের বালকের মুখের ঐ কথাগুলি অমৃতের মতো শুনাইল না। এলোকেশী তফাতে দাঁড়াইয়া ঘটনাটা আগাগোড়া দেখিল, কিন্তু কথা বলিল না।

সাবিত্রীর সমবয়স্কা মেয়েরা বেড়াইতে আসে; সাবিত্রী তাদের কাছে আসিয়া বসিলেই এলোকেশী কাজের ছুতায় তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যায়; কোনোদিন বা এলোকেশী তাদের ভিতরে আসিয়া বসে, তার সঙ্গে মেজ কালা আসে, ছোট মোনা আসে।

এলোকেশী বলে, বৌয়ের সঙ্গে নিত্যি নিত্যি কি গল্প করিস তোরা?

মেয়েরা কেউ কিছু বলিবার আগেই মোনা তাদের ভিতর হইতে বলিয়া ওঠে, বৌদি তার দাদার গল্প শোনায়, দোকানের গল্প শোনায়, এদের সব তাক লাগিয়ে দেয়। বলিয়া মেয়েদের দিকে চাহিয়া মোনা বড়াইয়ের হাসি হাসে।

একটি মেয়ে বলে, তা কেন। আমরা অন্য গল্প করি। আর তোমার বৌকে ত' তুমি বসতেই দাও না!

এলোকেশী বলে, কি গল্প করিস?

মেয়েরা বিরক্ত হয়, একজন বলে, তা তোমার শুনে কাজ কি? সে আমাদের কথা।

—আমার নিন্দে করিস বুঝি?

এদিকে মোনা লাফাইয়া উঠিল; তাহা দেখিয়া ওদিকে সাবিত্রীর বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল।

মোনা বলিল, তোমার নিন্দে করতে শুনেছি, মা, আমি একদিন লুকিয়ে শুনেছি।

এলোকেশী সাবিত্রীর দিকে চাহিল—

সাবিত্রীর কণ্ঠ তখন শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেছে, তবু এই মিথ্যাটার প্রতিবাদ সে করিল, না, মা, নিন্দে করি নাই।

মোনা চীৎকার করিয়া বলিল, আলবাৎ করেছ, তুমি দলের ভিতর ছিলে।

সত্যই এক দিন নিন্দা করা হইয়াছিল এলোকেশীর মেজাজের; কিন্তু সাবিত্রী তাহাতে যোগ দেয় নাই। নিন্দা করিয়াছিল অনসূয়া নাম্নী মেয়েটি।

সে এলোকেশীর মুখের দিকে চাহিয়া আসরের ভিতর উঠিয়া দাঁড়াইল।

মোনা হাসিয়া বলিল, পালাচ্ছে।

—হ্যাঁ পালাচ্ছে, তোর ভয়ে। বলিয়া অনসূয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল।

এলোকেশী বলিল, ভিজে বেড়ালটি; তুমি বাপু এ-বংশের মান খোয়াতে এসেছ, চুপচাপ থাকো, সাত চড়ে কথা কও না, কিন্তু ঘোঁট পাকাতে ত' আছ!

মোনা বলিল, বৌদিদিদের গাঁয়ে ভদ্দর-লোক নাই, মা।

—কোত্থেকে থাকবে! হ্যাংলার দেশ যে। গোবিন্দ ঠাকুরের।

কিন্তু গোবিন্দ ঠাকুরের উদ্দেশে উচ্চারিত এলোকেশীর পরবর্ত্তী কথাগুলি উহ্য রাখাই ভাল; ব্রাহ্মণের প্রতি অভক্তির উক্তি শুনিলে মন খারাপ হইয়া যায়।

তারপর এলোকেশী গোবিন্দ ঠাকুরকে নিষ্কৃতি দিয়া ছেলেদের শুনাইয়া বলিল, "তোমাদের ঠাকুমা ছিল বড় ঘরের মেয়ে, দুয়োরে হাতী বাঁধা থাকত। আমার বাবা আর মামারা ত' ডাকসাইটে মানুষ। আমার বড় মামা রাতারাতি একজনের ঘর ভেঙ্গে ভিটে কেটে সমান করে বেগুনের চারা লাগিয়ে দিয়েছিল। এ কোথা থেকে এক দোকানদারের মেয়ে এনে ঠাকুর গছিয়ে দিলে!"

ও'রা সব বৃহৎ ছিলেন, আর, পূর্ব্ব কথার অনুরূপ কথা বলাই উচিত, সুতরাং মেজ কালা একটা বৃহৎ জিনিসেরই সংবাদ দিল; বলিল বৌদি ভাতের গ্রাস তোলে দেখেছ!

এলোকেশী আর মোনা যুগপৎ বলিল, দেখেছি।

কালা বলিল, এত বড় বড় ড্যালা - বলিয়া দুই হাতের দশটি আঙুল মাথায় ঠেকাইয়া মধ্যে খোল রাখিয়া ড্যালার যে আকার সে দেখাইল তাহা বড় সাইজের একটা বেলের মতো।

যে মেয়েরা গল্প শুনিতে আসিয়াছিল তাহারা অবাক হইয়া এই গল্প শুনিল, এবং অবিলম্বেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

তাহাদের অপরাধ স্কন্ধে লইয়া সাবিত্রী অতি ঘনিষ্ঠ তিনটি ব্যক্তির বাক্যবাণের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

শিবরতনের শরীর একদিন খারাপ হইল, সর্দ্দি লাগিয়া তার নাক দিয়া অবিরাম জল ঝরিতে লাগিল, রাত্রে কিছু খাইবে না, মাত্র এক ঝিনুক আদার রস গরম-গরম খাইবে, তারপর আধঘণ্টা বাদে দুগ্ধসহ চারিটি খই খাইয়া শুইয়া পড়িবে।

কিন্তু এ ত' গেল পথ্য আর বিশ্রামের ব্যাপার, পথ্য আর বিশ্রামের সঙ্গে তার শুশ্রূষারও প্রয়োজন: সুতরাং ব্যবস্থা হইল এই যে, পথ্য গ্রহণের পর শিবু শয়ন করিলে খানিকটা সরিষার তেল গরম করিয়া তাহার পায়ের তলায় মালিশ করিয়া বসাইয়া দেওয়া হইবে।

পথ্য মা দিলেন।

শিবু শুইতে গেল। এবং স্বভাবতঃই সাবিত্রীর উপর ভার পড়িল তেল গরম করিয়া স্বামীর পায়ে মালিশ করিবার, কিন্তু শুশ্রূষার এই সামান্য কাজটুকু করিতে সাবিত্রী অসামান্য অর্ব্বাচীনতা প্রদর্শন করিল। প্রথমতঃ এ্যালুমিনামের

ছোট্ট বাটিতে তেল লইয়া প্রদীপের শিখায় গরম করিতে গেলে আগে তার হাত কাঁপিল, তারপর তেলের আগে গরম হইল বাটি, আঙুলে ছ্যাঁকা খাইয়া বাটিটা নামাইতে যাইয়া সে খানিক তেল মাটিতে ফেলিয়া দিল।

এলোকেশী নিকটেই ছিল।

বধূর কাজের তদারক করিতেছিল ; আর নিজের বধূ-জীবনের সূচনাতেই অকম্পিত কর্ম্মকুশলতায় সেই নামজাদা শাশুড়ীকে পর্য্যন্ত কিরূপ অবাক করিয়া দিয়াছিল তাহাই স্মরণ করিতেছিল।

এমন সময় তেল বাটি হইতে মাটিতে পড়িল ; অতীত কালের অবাক শাশুড়ীর চিত্র তৎক্ষণাৎ মুছিয়া গেল।

এলোকেশী সম্মুখবর্ত্তিনীকে বলিল, বাটির ভারটা হাতে সইল না বড়লোকের মেয়ের ! তোমার বড়লোক বাবার যেন টিন টিন তেল থকেতো, আমাদের ত' তা নাই। তোলো তেল।

কিন্তু মেঝের ধূলা ততক্ষণে তেল শুষিয়া লইয়াছে।

মেজ কালা বলিল, বৌদি খেতে আর চুল আঁচড়ে বিবি সাজতেই জানে, কাজ বল্লেই হাঁ। বলিয়া কালা নিজেই খানিক হাঁ করিল।

এলোকেশী বলিল, যা বলেছিস।

ছোট মোনা বলিল, বাপের আদরে মাথা খাওয়া গেছে।

এলোকেশী বলিল, বাপের গল্পে আর কাজ নাই।

যাহা হউক, তেল পুনরায় গরম করা হইল।

শিবু দাওয়ায় শুইয়াছিল, শাশুড়ী আর বড় বড় দেবর দু'টির সম্মুখে স্বামীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইতে সাবিত্রীর লজ্জা করিতে লাগিল, হাতের পাতার উপর পুরু করিয়া আঁচল পাতিয়া তাহার উপর তেলের বাটী বসাইয়া সে থমকিয়া রহিল।

এলোকেশী বলিল, আলুকাছ ! কি ভাবছ দাঁড়িয়ে ? তেল ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে !

সাবিত্রী ছোট মোনার দিকে চাহিয়া একটু লজ্জার হাসি হাসিল, মোনা হাসির অর্থ বুঝিল না, অপরাধ লইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, মা, বৌদি হাসছে।

—হাসছে ? হাসির কথা কি হল ওর ? দে ত' ওর চোয়াল চেপে।

ওদিক হইতে রোগী স্বয়ং হাঁকিতে লাগিল, একটু তেল গরম করে আনতে তোদের কি হ'ল ?

মোনা বলিল, তেল গরম করা হয়ে গেছে, বৌদি যাচ্ছে না।

শিবু বুদ্ধিমান, উঠিয়া ঘরে গেল।

সাবিত্রী ততক্ষণে চলিতে সুরু করিয়াছে।

সাবিত্রী একান্ত জড়সড় হইয়া শিবরতনের পায়ের তলায় তেল মাখাইতে বসিল।

কিন্তু লক্ষ্মণেরও একদিন নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। সারাদিন সংসারের কাজের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া পরিশ্রান্তদেহে বসিয়া থাকিতে থাকিতে তার কর্ত্তব্যকে আচ্ছন্ন করিয়া কখন একটু তন্দ্রা আসিয়াছে তাহা সে জানে না।

হঠাৎ চমকিয়া ঘুমের ঝুল ভাঙিয়া সাবিত্রী দেখিল, সে আর স্বামীর পদতলে বসিয়া নাই, খাটের আর বেড়ার মধ্যবর্ত্তী অবসর পথ দিয়া সে পড়িতেছে।

অবিলম্বেই সে মাটিতে পৌঁছিল।

এবং কষ্টে সৃষ্টে সেই সংকীর্ণ স্থানের ভিতরেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন দেখা গেল, সে আহত হইয়াছে অর্থাৎ বেড়ার খুঁটির কর্কশ গিঁটের সঙ্গে ঘর্ষণে তার বাঁ হাতের উপর ডানার চামড়া খানিকটা উঠিয়া গেছে; আর নারিকেলের দড়ির ধারে ছাল উঠিয়া কপালের একটা স্থান জ্বালা করিতেছে। এবং শিবু উপুড় হইয়া আর নিষ্পন্দ হইয়া শুইয়া আছে।

কিন্তু ঘটনাটা জানাজানি হইয়া গেল।

হুড়মুড় করিয়া পড়ার একটা শব্দ হইয়াছিল; ইষ্টনাম-জপমগ্না এলোকেশীর কানে সে শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল।

জিজ্ঞাসা করিল, শিবু, শব্দ হ'ল কিসের রে? বলিতে বলিতে সে জপের মালা হাতে করিয়াই ঘরে ঢুকিল।

শিবু বলিল, ঢুলছিল, পায়ে করে ঠেলে দিয়েছি আর পড়ে গেছে।

মেজ কালা আর ছোট মোনা দরজার পাশেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, হি হি করিয়া তাহারা হাসিয়া উঠিল।

এলোকেশী খুসী হইল। শিবুকে নিরপেক্ষ থাকিতে দেখিয়া এলোকেশীর সর্ব্বান্তঃকরণে একটা জ্বালার সঙ্গে মনে হইত, ছেলের বুঝি মনে মনে বৌয়ের দিকেই টান; কিন্তু এখন লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোকে বৌয়ের কপালে কালশিরা আর বাঁ হাতের একটা স্থানে রক্তের রেখা দেখিয়া তার সেই মর্ম্মান্তিক ভ্রম দূর হইল।

বলিল, বৌ আমায় পাগল না করে ছাড়বে না, ছাড়বে না। পায়ে একটু তেল মালিশের কাজ তোমার দ্বারা হল না। হায় হায়। বলিয়া সে জপের মালা বেড়ার গায়ে ঝুলাইয়া দিল, তেলের বাটি লণ্ঠনের মাথার উপর রাখিয়া দিয়া গুছাইয়া বসিল, সে নিজেই মালিশ করিবে।

সাবিত্রী নড়ে নাই।

তাহার দিকে চাহিয়া এলোকেশী পুনরায় বলিল, দাঁড়িয়ে আছে যেন সং, বেরোও খাঁচা থেকে দয়া করে, এত বকি এত ঝকি তবু নেকির হুঁস্ হ'ল না! যাও, কালা আর মোনাকে ভাত দাও গে।

সাবিত্রী ফাঁদের ভিতর হইতে নিজেকে টানিয়া টানিয়া বাহির করিয়া কালা আর মোনাকে ভাত দিতে গেল।

মোনা বলিল, এবার ঘুমুলে আরশোলা এনে গায়ে ছেড়ে দেব।

কালা বলিল, উঁহু, উনুনের ভিতর ঠেলে দেব।

খাইতে বসিয়া মাছের ঝোলের বাটির ভিতর অকারণেই একবার নজর দিয়া মেজ কালা বলিল, এইটুকু মাছ?

সাবিত্রী মুখ তুলিয়া বলিল, যে মাছ ছিল তা তোমাদের দু'জনকেই দিয়েছি, ঠাকুরপো।

—হ্যাঁ, তাই আবার দিয়েছ। তোমার জন্য রাখ নাই?

—না।

—দেখি কড়াই ?

সাবিত্রী কড়াই আনিয়া দেখাইল।

—দেখি হাঁড়ি ?

সাবিত্রী হাঁড়ি আনিয়া শূন্যে উপুড় করিয়া দেখাইল।

এমনি করিয়া সরা, মালসা, গামলা, সব এক এক করিয়া দেখাইতে হইল ; কিন্তু বাটিতে যে অজ্ঞাত পরিমাণ মাছ আছে, তদতিরিক্ত মাছ অন্যত্র আবিষ্কৃত হইল না।

ছোট মোনা ছোট বলিয়া ধীশক্তিতে ছোট নয় ; সে বলিল, আগেই খেয়ে ফেলেছ তুমি।

দেবরদের এই আচরণকে সাবিত্রী নিছক তামাসা বলিয়াই মনে করিতেছিল, মাছ আগেই খাইয়া ফেলিবার কথায় সে হাসিয়া উঠিল ; বলিল, হ্যাঁ খেয়েছি বৈ কি !

—তবে বেড়ালের পেটে গেছে !

—না গো না ; আমার গোণা মাছ, তোমাকে দিয়েছি তিনখানা, মেজ ঠাকুরপোকে দিয়েছি তিনখানা, দেখ সত্যি কি না ;—বেড়াল খাবে কি, যেমন ঢাকা তেমনি ছিল, তোমাদের সামনেই ত' কড়াইয়ের ঢাকনি খুললাম। বলিয়া সাবিত্রী সকৌতুকে হাসিতে লাগিল।

এলোকেশী ও-ঘরে বসিয়া বহুক্ষণ হইতেই কথাবার্ত্তার আওয়াজ পাইতেছিল, কিছুক্ষণ কাণ পাতিয়া থাকিয়াও কথা স্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, কি বলাবলি করছিস তোরা ?

জবাব দিল মেজ কালা। বলিল,—বৌদি মাছ দিচ্ছে না ; মোটে তিনখানা করে দিয়েছে।

এলোকেশী বলিল,—দাও না, বৌমা। আর পারিনে আমি দিনরাত এমনি করে বকতে, আমি খাক হয়ে গেলাম।

কিন্তু সাবিত্রী ত' আর চীৎকার করিয়া জবাব দিতে পারে না, তাহাদের কৌতুক-কলস্বরের ভিতর শাশুড়ীর কণ্ঠস্বর প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া ভয়ে নির্ব্বাক হইয়া সে স্নেহভাজনদ্বয়ের দিকে কাতরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

উহাতে মোনার মজা লাগিল ভারি। সে আরো উচ্চকণ্ঠে বলিল, মা, বৌদি মাছ আমাদের দিল না, জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল।

সাবিত্রী যেন ক্ষমা চাহিয়া বলিল, কেন মিছে করে বলছ, মা এখুনি রাগ করবেন।

কিন্তু মা রাগ করিয়াছেন, তাঁর তেল মালিশ করা শেষ হইয়াছে, তিনি তাড়িয়া আসিতেছেন, তিনি সশরীরে পোঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁর আওয়াজ পোঁছিতে লাগিল : "মাছ ফেলে দিল! তোরাও দিলিনে কেন ওর চুলের ঝুঁটি ধরে ঘুরিয়ে ? পয়সার মাছ ফেলে দেবার ফল দিচ্ছি আমি হাতে হাতে।"

সাবিত্রীর মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল।

এলোকেশী হাতে-হাতে ফল দিতে ছেলেদের আহারের স্থানে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, তাহারা আহার করিতেছে এবং হাসিতেছে।

ছোট মোনা বলিল,—না, মা, মিছে কথা।

ঐ কথায় সাবিত্রীর যেন পুনর্জন্ম লাভ হইল।

এলোকেশী ফিরিয়া গেল ; কিন্তু ছেলেদের একটা ধমক দিয়া গেল না।

সাবিত্রীর দিন এমনি করিয়াই যায়, আহত স্থানে যে রক্তবিন্দু ফুটিয়া ওঠে তাহার দিকে সে চাহিয়া দেখে না, দেবরদের কথায় হাসে, ক্ষতযন্ত্রণা তাহার মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারে না।

আগে যে কাজ করিতে সে মোটেই জানিত না, এখন সে-সব কাজ ভালই শিখিয়াছে। গরুর ছানি কাটা, চিঁড়ে কোটা, মুড়ি ভাজা, ধান ভানা প্রভৃতি কাজ এখন সে পারে, এতবড় উঠানটা সে একা লেপে, এখন সে কিছু বড়ও হইয়াছে, কিন্তু তার মন গুটাইয়া গেছে, বাপের বাড়ীতে মনকে টানিয়া রাখিবার দরকার হইত না, শরীরের মতো মনও সুস্থ-চাঞ্চল্যে অবাধে খেলিয়া বেড়াইত।

কিন্তু স্বামীগৃহে আসিয়া তার খেলার স্থানটাই কেবল দৃশ্যান্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এমন নহে, তার খেলাই বন্ধ হইয়া গেল, শরীরের এবং প্রাণের। হাসিতে তার ভয় করে, কিন্তু কোন দিকেই তার রেহাই নাই।

হাসিলে এলোকেশী বলে, ফাজিল ; না হাসিলে সেই এলোকেশীই বলে, বিষমুখী। চট্ করিয়া কথা কানে গেলে বলে, কানখারা ; না গেলে বলে, কালা।

সাবিত্রীর মন চঞ্চল নয়, এখানে তার মন বসিতেছিল, সাহচর্য্য আর সাহায্য পাইলে বসিয়া যাইত, মাঝে মাঝে মন দুলিয়া উঠিলেও সুরুতে শ্বশুরালয় তার খারাপ লাগে নাই। কিন্তু যাহাদের কাছে সে থাকিতে আসিয়াছে, আর যাহাদের উপর সে মন বসাইবে তাহারাই তাহার মনকে তুলিয়া দিল। এখন বাড়ীর কথা মনে পড়িতেই সেখানকার নির্ব্বিঘ্ন সুশান্ত জীবনযাত্রার কথা মনে পড়ে, দৈন্যের মাঝেও ফুটিবার সুখ ছিল, সে স্মৃতি সুখের।

অনিবার্য্য আত্মদানের মাঝে এখন তার মনে হয়, একটা নিদারুণ পাপ-কার্য্যের ফল এটা, এখানে যতদিন থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত তার ভাগ্যের কাল কাটিবে না। একবার সেখানে ফিরিয়া যাইতে পারিলে আর এখানে সে আসিবে না। দাদা অনাহারে দিন কাটাইতেছে কি না কে জানে, দাদা যদি অসুখ হইয়া ঘরের ভিতর মরিয়া পড়িয়া থাকে, তবু তাহাকে দেখিবার কেহ নাই।

সাবিত্রী আরো ভাবে, এরা কেন এমন করে। যদি মরি তবে ভাল হয়।

সাবিত্রী নির্জ্জনে চোখের জল ফেলে।

দীনবন্ধু যে ঘটনা ভবেশের মুখে শুনিয়া প্রথমে অবাক হইয়া গিয়াছিল, তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া গোবিন্দ ঠাকুরের খড়মের উপর আছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তারপর বিদ্রোহ করিয়াছিল এবং আরো অনেক-কিছুর পর গোবিন্দ ঠাকুর তাহাকে টানিতে টানিতে এলোকেশীর বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির করিয়া লইয়া পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, সে-ঘটনার সূত্রপাত অতি সামান্য।

ময়নার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

ময়না 'রাধাগোবিন্দ' নাম শুনায় ; এবং এলোকেশীর হাসির ও ভাষার ভঙ্গীর আজব-কায়দার অনুকরণ করিলেও সে শিবুরই সম্পত্তি ; পিনাইপুরের কালী-পূজার মেলায় শিবু তাহাকে পাঁচ টাকা মূল্যে খরিদ করিয়াছিল, "পাহাড়িয়া আসলি" ময়না, কান-ওঠা।

শিবু ময়নাগত-প্রাণ, ময়নার নাম রাখিয়াছে সুরবালা ; সুরবালাকে নাওয়ায় খাওয়ায় শিবু নিজে, খাঁচার আঁকড়া ধরিয়া তাহাকে বাহিরের হাওয়া খাওয়াইয়া আনে।

নূতন নূতন কিছুদিন ত' সে সুরবালাকে চোখের আড়াল করে নাই, ডিম্বাবস্থায় সুরবালা তার জননী-বক্ষের যে উত্তাপ পাইয়াছিল, শিবুর বুকের উত্তাপ তার চাইতেও বেশী, সহোদর কালা আর মোনাকে সে খাঁচার ত্রিসীমানায় যাইতে দিত না।

একদিন মাছ ধরার তাগিদ বড় সকাল সকাল আসিল ; বেলা ন'টা না বাজিতেই শিবুরা তিন ভাই খাওয়া সারিয়া ছিপ আর চারের ভাঁড় লইয়া বাহির হইয়া গেল।

যাইবার সময় শিবু বলিয়া গেল;—মা, সুরবালাকে যেন খাবার দেয়া হয়।

শিবুর মা এলোকেশী দেওয়ার ভার দিল শিবুর স্ত্রী সাবিত্রীর উপর, দিয়া উঁচুতে ঝুলানো খাঁচা নামাইয়া দিয়া গেল।

সুরবালা সাবিত্রীকে যাচ্ছে-তাই গালি দেয়, পরের ভাষা আবৃত্তি করিয়া ; কিন্তু ধূর্ত্ত বোধ হয় তাহাকে মনে মনে চিনিয়া রাখিয়াছিল, সাবিত্রী ছাতুর বাটি খাঁচার ধারে নামাইয়া খাঁচার দরজা খুলিতেই সে অক্লেশে বাহির হইয়া গেল।

সাবিত্রী প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়াছিল, পরক্ষণেই সে চেঁচাইয়া উঠিল,—মা,—ময়না উড়ে গেল। ময়না যে-দিকে উড়িয়া গেছে সেদিকে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

—উড়ে গেল? কোনদিক গেল? বলিয়া এলোকেশী আকাশ-প্রমাণ চীৎকার করিয়া যেন আকাশ-পাতাল গ্রাস মেলিয়া দৌড়াইয়া আসিল, অর্ধমৃতা সাবিত্রী বলিল, ঐদিকে গেছে। বলিয়া জঙ্গলের দিকটাই দেখাইয়া দিল, এবং তারপরই সেখানে যে হুলুস্থূল বাধিয়া গেল রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডেও তার তুলনা নাই।

এলোকেশী ক্ষিপ্তের মতো ছুটিয়া বাড়ীর বাহিরে গেল। খানিকটা বৃক্ষশূন্য ক্ষেত্র, তারপরই বহুবিস্তৃত আর ঘনসন্নিবেশিত পল্লবারণ্য আকাশ ঢাকিয়া বহিতে সুরু করিয়াছে ; শূন্যের সুবিস্তৃত সে আচ্ছাদন ভেদ করিয়া সূর্য্যকিরণ মাটিতে পড়ে না, অন্ধকার সেই রাজ্যের দিকে এক পলক চাহিয়াই এলোকেশী ময়না আশা ত্যাগ করিল, ছুটিয়া সে বাড়ীর ভিতর আসিল, সাবিত্রীকে সম্ভাষণ করিবার পূর্ব্বে একবার মড়াকান্না কাঁদিয়া উঠিল, উঠানে লোক জড় হইতে লাগিল, শিবুকে সংবাদ দিতে লোক ছুটিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে ঐ ব্যবস্থা করিয়া এলোকেশীর অবকাশ হইল ; তখন সে সাবিত্রীর উদ্দেশে এমন সব কথা বলিতে লাগিল যার গাঁথুনিই চমৎকার, এক-বাড়ী লোক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সেই অপূর্ব্ব ভাষা শুনিতে লাগিল, সাবিত্রীর চোখের সম্মুখের আলো নিবিয়া গেল।

ছিপ-বঁড়শী চারের ভাঁড় প্রভৃতি সখের আয়োজন পুকুরঘাটেই পড়িয়া রহিল, শিবুরা তিন ভাই ছুটিতে ছুটিতে অকুস্থানে পৌছিয়া গেল।

খোঁজাখুঁজি সুরু হইল, গ্রামস্থ সমুদয় সক্ষম ব্যক্তি দলে দলে দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, এবং ঘণ্টা তিনেক ধরিয়া সেই তিমিরবরণ পল্লবারণ্য তোলপাড় করিবার পর পলাতক বেইমান ধরা পড়িল।

ময়না লইয়া শিবু যখন শোকাচ্ছন্ন নীরব গৃহে ফিরিয়া আসিল তখন দেশের সক্ষম অক্ষম যাবতীয় লোক তার সঙ্গে, আর দেশের লোকের ক্লান্তি নাই, কাহারো কাহারো কাঁটায় গা ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতেছে, কাঠ পিঁপড়ার দংশনে কাহারো কাহারো দুর্গতির একশেষ হইয়াছে, অনেকের মাথায় মাকড়সার জাল জড়াইয়া আছে।

স্বরবালাকে পুনরায় সুরলোকে আবদ্ধ করিয়া শিবু সাবিত্রীকে উঠানে নামাইয়া আনিয়া ময়না উড়াইয়া দিবার শাস্তি দিল, কঁাচা কঞ্চি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া ছিটকাইয়া পড়িতে লাগিল, দুখানা তিনখানা, সাবিত্রী মাটিতে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গেল।

তার পিঠ ফাটিয়া রক্ত গড়াইতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নিত্যপদ বসিয়া বসিয়া পা নাচায় আর এখানকার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বহু বিচিত্র চিন্তা করে। তার মনে হয়, এখানকার প্রকৃতি শোভন হইলেও নিস্তেজ এবং অপটু। রাত্রে ঘাসের উপর যে শিশিরপাত হয়, তাহা বেলা ন'টা পর্য্যন্ত শুকায় না ; বর্ষা কবে আসিয়া কবে চলিয়া গেছে কিন্তু মাটি এখনও ভিজা রহিয়াছে ; জল যেখানে যাহা জমা হইয়াছিল তাহা আছেই, পচিয়া উঠিয়াছে, দুর্ব্বলকে আক্রমণ করিয়া আর ভক্ষণ করিয়া যাহারা বৃদ্ধি পায় প্রকৃতির অঙ্গে তাহাদেরই প্রাধান্য সে অবিরাম কীট আর জীবাণু প্রসব করিতেছে। গাছের ফল ছোট হইয়া গেছে, তার ভিতরেও কীটের বাসা।

মানুষের হাতে প্রকৃতিরও দুর্গতির অন্ত নাই, মানুষ তাহাকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার নিকট হইতে যাহা আদায় করিয়া লওয়াই মানুষের গৌরব তাহাতেও অক্ষমতারই চূড়ান্ত পরিচয় দিতেছে। অক্ষম ভীরুর হাতে দোহনভার দিলে গরু দুধ চুরি করে, প্রকৃতি অক্ষমের দিকে চাহিয়া অবজ্ঞাভরেই আপনাকে কৃপণা করিয়া রাখিয়াছে।

সূর্য্য নিস্তেজ হইয়া আছেন।

নিত্যপদর মনে হয়, এখানকার যাবতীয় গাছপালা সমূলে তুলিয়া ফেলিয়া দিবার পর, পল্লী-আকাশ পুনঃ পুনঃ অতিক্রম করিয়া সূর্য্য যদি উদয়মুহূর্ত্ত হইতে অস্তকাল পর্য্যন্ত অগ্নির জ্বালা এই মাটিতে ঢালিয়া দেন, তাঁহার জ্বলন্ত স্পর্শের

অতীত হইয়া যদি ইহার সূচ্যগ্র স্থান না থাকে, আর অবাধ উষ্ণ বায়ু যদি ইহার গৃহে গৃহে মুহুর্মুহুঃ অসহনীয় তপ্ত বালু দিয়া যায় তবেই লোকগুলি মানুষের মতো হইতে পারে, নতুবা আর রক্ষা নাই।

এই ছায়া-শীতল আর সিক্ত-মৃত্তিকা পল্লী-ভবনে বাস করিয়া শীতলতায় ইহাদের মস্তিষ্ক অসাড় আর হৃদয় কুণ্ঠিত হইয়া গেছে!—আর্দ্র মৃত্তিকা দূষিত বাষ্পের যে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে তাহা পল্লীর সংকীর্ণ সীমার পল্লবমণ্ডপের মধ্যেই সঞ্চিত থাকিয়া সঞ্চালিত হইতে থাকে, সেই বিষবাষ্পই মানুষের পেটে প্লীহার আকারে বাড়ে আর কণ্ঠ দিয়া নিয়ত উদ্গারিত হয়।

নিত্যপদ উদভ্রান্ত হইয়া মাঝে মাঝে আরো ভাবে, ইহাদের যদি একবার জাহাজে চাপাইয়া পৃথিবী ঘুরাইয়া আনা যায়, তবে বোধ হয় দৃশ্য এবং বায়ুর পরিবর্ত্তনের ফলে ইহাদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত হয়।

এদিকে কান্তিভূষণের রেজেষ্ট্রি-বহি রেখায়-রেখায় ভরিয়া উঠিতেছে, ক্রমিক নম্বর পা-পা অগ্রসর হইয়া এতদূর গেছে যে, দেখিয়া সন্তোষ জন্মে অর্থাৎ নিত্যপদর কাছে রোগী আসিতেছে এবং রোগীর কাছে নিত্যপদ যাইতেছে।

কিন্তু কান্তিভূষণ যাহাকে বলে "বস্তু", তাহার আমদানী তেমন নাই, 'ডাক' দিয়া কেহ একটি টাকা নগদ দেয়, কেহ মাথা চুলকাইয়া বাকি রাখে, যা বাকি পড়ে নিত্যপদ তার আশা তখনই ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু কান্তিভূষণ তার রেজেষ্ট্রি বহিতে তারিখ-সম্বলিত 'নোট' রাখে।

নিত্যপদ আপত্তি করিয়াছিল, অনর্থক কাজ বাড়ানো হইতেছে; কিন্তু কান্তিভূষণ বলিয়াছিল, "যদি নালিশ করবার সুবিধে কখনো হয় তবে এই খাতা দাখিল করে দেব, হাকিম খাতা দৃষ্টে ডিক্রী দেবেন। এ পাকা কাজ হচ্ছে; যদি বলেন সুবিধে কখন হবে?—পাটের দরটা একবার চড়ে কিছুদিনের জন্যেও বার-চৌদ্দ টাকা হলেই নালিশ করা চলবে।"

কান্তিভূষণের দূরের দিকে দৃষ্টি দেখিয়া নিত্যপদ হাসে।

কান্তি পুনরায় বলে, দেখুন আমার কথা সত্যি হল কি না। ফাঁকি দিয়ে চিরদিন সবাইকে ভুলিয়ে রাখা যায় না। ফণী ডাক্তার—

নিত্যপদ বলে, "তার যশ অক্ষয় হোক, তার সঙ্গে আমার প্রতিযোগিতা নেই।"

কান্তিভূষণ হাসিয়া বলে, না না; সে সে-পাত্রই নয়, প্রতিযোগিতার অযোগ্য। কিন্তু সে যে কেবল ফাঁকি তা বুঝেও লোকে তার কাছে যেত একেবারে নাচার হয়ে। আর কিছু না হোক আমাদের ওষুধের সুনামটা খুব বেরিয়েছে। কিন্তু ওষুধের খরচ যদি ওষুধ থেকে না ওঠে তবে ত' ডাঁহা লোকসান।

শেষ কথাটা বলিয়াই কান্তিভূষণ মনে মনে চকিত হইয়া উঠে, এই ক্ষতির প্রতিকারের উপায় কান্তিভূষণের মাথায় আসে না; কিন্তু তাহাকে চকিত করিয়া তোলে পরিণাম সম্ভাবনাটা, ওষুধের সুনাম বাহির হইয়াছে বলিয়া এখন উৎফুল্ল হইলেও লোকসান দিয়া দিয়া একদিন হয়তো তাহাদেরও নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই ফণী ডাক্তারের মতো কেবল 'এ্যাকোয়ার' উপরেই নির্ভর করিতে হইবে। মানুষের মন যত ঘাতসহ, লৌহসিন্দুক তত নহে।

কান্তিভূষণের মনে হয় তার আশঙ্কা যত বেশীই হউক, নিত্যপদ যদি আপনি জাগিয়া এই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া না থাকে তবে তাহাকে এই দুঃস্বপ্নের মাঝে ঠেলিয়া তুলিয়া লাভ নাই।

বলে,—দেখুন দেশের লোকের রকম। মামলার সময় বড় উকীলকে নিয়ে এরা কাড়াকাড়ি করে,যত লাগে ততই দিতে এদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই ; কিন্তু প্রাণ নিয়ে যেখানে টানাটানি সেখানে ওষুধের সামান্য দামটা দিতে এরা যেন আর থই পায় না।

—কোথায় পাবে ?

—উকীলের ফি কোথায় পায় ?—কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলেও যারা দিতে পারে তারাও ওষুধের দাম দেয়া লোকসান মনে করে কেন ?—'দেব' বলে দেয় না কেন ?—স্পষ্টভাবে দয়া চাওয়াটা লজ্জার কথা, ফাঁকি দেওয়ার লজ্জা নাই মনে করে কেন ?—ফণীর মতো ডাক্তারগুলোই 'ফিল্ড্' খারাপ করে দেয়। বলিয়া কান্তিভূষণ যেন বহু পুরাতন রহস্যাচ্ছন্ন ব্যাপারের একটা উদ্‌ঘাটনসূত্র পাইয়া চুপ করিয়া ভাবিতে থাকে।

কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর উহাই নহে।

ঘটি বাটি বেচিয়া ওরা কেন উকীলকে টাকা দেয় তাহার কারণ আছে ; উদরান্নের যে সমস্যায় লোকে অহরহ ছট্‌ফট্ করিতেছে, উকীলের ঘরে যাইয়া টাকা ঢালিয়া দিয়া আসা সেই সমস্যার সমাধানের প্রয়াস না হোক তাহাকে আরো গুরুতর হইয়া উঠিতে না দিবারই শেষ চেষ্টা। যে শিশু রোগে ধুঁকিতেছে সে নিত্য-নৈমিত্তিক অন্নসমস্যার সহিত কেবল ব্যয়ের দিক দিয়াই সংশ্লিষ্ট, প্রাণের টান তার প্রতি যথেষ্টই আছে ; সে মরিলে অদৃষ্ট-দেবতার অকরুণা স্মরণ করিয়া শোক সহ্য করা ছাড়া গত্যন্তর নাই ; কিন্তু জমা টাকা প্রতি তিন আনা হিসাবে বৃদ্ধি একবার ধার্য্য হইয়া গেলে আর নিস্তার নাই। ঔষধের দাগ কম হইলে তাহার ফল যাহা দাঁড়ায়, একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহা ভুলিতে পারা যায়, কিন্তু মামলার তদ্বির বে-তাগ্ হইলে তাহার ফল প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে এবং পুরুষানুক্রমে বহন করিতে হইবে, অদৃষ্ট সেখানে দোহাইয়ের পাত্র নহে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে সে দুঃখ হাল্কা হয় না।

একাধিক ব্যক্তি যাহারা একান্নবর্ত্তী তাহাদের পরস্পরের প্রতি মমতা নাই এমন নহে ; কিন্তু একের জন্য অপরে সর্ব্বস্ব পণ করিতে পারে না ; প্রাণপণ করিতে হয় তো পারে। মনের ধর্ম্মে যাহার জন্য স্বার্থত্যাগী হইতে তাগিদ আসে সে কেবল বুদ্ধিহীন সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ স্বল্প পুঁজির অংশীদার, ক্ষতির এক কণা পূর্ণ করিবার সাধ্য তাহার নাই। সুতরাং আত্মরক্ষার স্বাভাবিক নিয়মের খাতিরেই আত্মীয়গণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ; ইচ্ছার অভাবে নয়, উপায়ের অভাবেই যে আত্মরক্ষার সহায়ক হইয়া উঠিতে পারে নাই সে দূরে আছে, কর্ম্মবিরল আর উপায়হীন দরিদ্রের গৃহে ইহা নিষ্ঠুর হইলেও সত্য।

কান্তিভূষণ বলিল,—ওরা এসে বসে আছে, 'রিপিট্' করবো, না নূতন ব্যবস্থা কিছু করবেন ?

নিত্যপদ অবস্থা শুনিয়া কাহারো সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা করিল, কাহারো সম্বন্ধে পূর্ব্ব ব্যবস্থাই বহাল রাখিল।

কান্তিভূষণ ঔষধ প্রস্তুত করিতে গেল।

চিলে-কোঠার ছাদে এক ঝাঁক পায়রা বসিয়া ছিল, একটা শালিক উড়িয়া ঝাঁকের ভিতর ঝপ্‌ করিয়া বসিতেই পায়রাগুলি ভয় পাইয়া খানিক উড়িয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া দূরে বসিল।

নিত্যপদ তাকাইয়া তাকাইয়া ভীরুর আচরণ দেখিল; বাজ নয়, চিল নয়, শকুন নয়, এমনকি কাকও নয়, শালিখ, অন্ততঃ তিনটি শালিখকে একসঙ্গে পরাজিত করা একটি পায়রার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নয়, ভয় না পাইয়া তাহাই করা উচিত; কিন্তু।

অতি মধুর সুকোমল কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, ভায়াজীবন রয়েছ হে? বলিতে বলিতে মধুরতার সজীব মূর্ত্তির মতো মতিলাল অতি ধীরে পা ফেলিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন।

নিত্যপদ সমাদর করিয়া তাঁহাকে বসাইল।

বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আপনার বাড়ীর সব খবর ভাল?

মতিলাল বলিলেন,—ভাল। তারপর গদগদ-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, ভায়া আমার কুশলের কথাটি তুমি যেমন করে জিজ্ঞাসা করো তেমন আর কেউ করে না, ভারি মিষ্টি লাগে; মনে হয়, তুমি যথার্থই জানতে চাও, আমরা কেমন আছি, কেবল মুখের ভদ্রতা করো না। বড় ভাল লাগে বলিয়া ভাল যে যথার্থই লাগে তাহারই প্রমাণস্বরূপ মতিলাল উপর পাটির দাঁত দিয়া নিজের ঠোঁট চাপিয়া ঠোটটাকে পেষণ করিতে করিতে দাঁতের পাটি টানিয়া লইলেন।

কিন্তু কথাটা মতিলাল বানাইয়া বলেন নাই, সম্ভাষণের মাধুর্য্য আজ তিনি সত্যই অনুভব করিয়াছেন।

আগে কোনোদিন মতিলাল এমন কথা কহিলে নিত্যপদ নিঃশব্দে একটু হাসিয়া বিনয় প্রকাশ করিত, কিন্তু আজ সে বলিল, সে আপনাদের আশীর্ব্বাদ।

মতিলাল আজ মধুবৃষ্টি করিতেই আসিয়াছেন; বলিলেন, আশীর্ব্বাদ নয়, ভায়া! আশীর্ব্বাদ ত' অনেককেই করি; কিন্তু এমন সত্যিকার জিজ্ঞাসা আর কারো কাছে পাইনে, বাড়ীতে এসে, কি পথ-চলতি অনেকেই ত' জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন আছেন?' কিন্তু সত্যি কথা বলি, ভায়া, আমি তাতে রস পাইনে, কথাগুলো যেন প্রাণে বাজে না!—কেন বল ত'? বলিয়া সমস্যাপীড়িত হইলেও তিনি এমন প্রফুল্ল নয়নে নিত্যপদর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন যেন ঐ প্রশ্নটির দ্বারা তিনি সুহৃদকে বাহুবন্ধনে টানিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছেন।

নিত্যপদ বলিল,—যদি অপরাধ না নেন, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

মতিলাল তৎক্ষণাৎ অভয় দিয়া বলিলেন, বলো ভায়া, তোমার কথা শুনতে আমার ভাল লাগে।

নিত্যপদ জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি ত' লোকের খবরা-খবর জিজ্ঞাসা করেন, যেমন তারা আপনার করে?

—করি, নিশ্চয়ই করি, তা না করলে চলে।

—আপনি কি তখন আন্তরিক জিজ্ঞাসা করেন, না জিজ্ঞাসা করতে হয় বলে জিজ্ঞাসা করেন?

মতিলাল হাসিয়া উঠিলেন!

বলিলেন,—এঃ, বড় জেরায় ফেললে, ভায়া, যখন জিজ্ঞাসা করলে তখন সত্যি কথা বলাই ভাল, জিজ্ঞাসা করতে হয় বলেই করি, অনেক সময় সে কি জবাব দিল তা কাণে আসে না।

—তবে আর দোষী করছেন কাকে আপনি? আপনি যদি আবেগ অনুভব না করেন তবে আর দশজনের কি দায় পড়েছে যে আপনি কেমন আছেন তা-ই জানতে ছটফট করবে!

মতিলাল অত্যন্ত বিপন্ন ব্যক্তির মতো সকাতরে বলিলেন, কেন এমন হ'ল। যেন এই কুৎসিত 'এমন হওয়াটা' তাঁহাদের সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া হইয়া পড়িয়াছে, ভবিষ্যতে সতর্ক থাকিতে হইবে।

নিত্যপদ একটু হাসিল, বলিল, কিন্তু আমি আপনাদের যথার্থই ভালবাসি, তারি সুরটুকু আপনার কাছে মধুর লেগেছে। আন্তরিকতার একটা সুষ্ঠু ছন্মমূর্ত্তিও শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত আছে, কিন্তু এখানে তা-ও নাই, অগ্রাহ্যের একটা রূঢ় আত্মপ্রকাশ দেখতেই আপনারা অভ্যস্ত, অর্থাৎ এখানকার ব্যবহারের আদান-প্রদানে শিষ্টতার শাসন মানা হয় না, আপনারা নিয়মের ব্যতিক্রমই দেখে আসছেন। নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখলে আপনাদের বিস্ময় লাগে।

মতিলাল আরো বিস্মিত হইলেন, নিত্যপদর কথাগুলি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বলিলেন, যদিও ভাল বুঝলাম না, তবু লাগল ভাল। তবে, তুমি যে আমাদের ভালবাস একথা খুবই সত্য। সেদিন তোমাকে অনেকগুলো কর্কশ কথা বলেছিলাম, তা মনে করে তুমি রাগ করো নাই ত'? আমাদের দাদা-ভাই সম্পর্কটা তুমি ভোলো নাই নিশ্চয়ই!

নিত্যপদ বলিল,—না ভুলি নাই, রাগ করে আমি নাই! রাগ করলে নিজেকে কতটা খাটো করা হয় তা কি আমি জানিনে? নিজের দুর্ব্বলতা আমি কাউকে দেখতে দিতে চাইনে। বলিয়া সে মতিলালের মুখাবয়ব লক্ষ্য করিতে লাগিল।

কিন্তু মতিলাল নিত্যপদকে বাড়াইয়া দিয়াই আজ আনন্দ পাইতেছেন; নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা স্বীকার করিতে তাঁর আজ বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নাই, বলিলেন, —আবার ভাল বুঝলাম না, ভায়া।

নিত্যপদ হাসিয়া বলিল,—মোট কথা আমি রেগে নাই। যদি কোন দরকারে এসে থাকেন, তবে আমি রাগ করে আছি মনে করে আপনি ইতস্ততঃ করবেন না।

মতিলাল এ-কথায় লজ্জিত হইলেন না, তাঁর বর্ত্তমান মিষ্টত্বের কৃত্রিমতা যে ধরা পড়িয়া গেছে তাহাই ধরিতে পারিলেন না; বলিলেন,—সঙ্কোচ আমার একটু ছিল, কিন্তু তোমার কথায় তা গেল। আমার মেয়েটিকে তোমায় একবার দেখতে হবে, ভায়া, আমার বড় কন্যাটি এই বিপাকে সেদিন মারা গেছে।

—কি অসুখ তাঁর?

—অসুখ নাই, সে সসত্ত্বা। ছেলেটা ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় পেটের ভিতর আছে কি না একবার দেখতে হবে তোমাকে।

নিত্যপদ বলিল, দেখব। এ-সব দেখা অত্যন্ত দায়িত্বের, জ্বর-জ্বালা নয় যে তেমন গ্রাহ্য করব না, কাজেই এ-সব ক্ষেত্রে আমি চার টাকা ফি নিয়ে থাকি; আপনি দাদার বন্ধু আপনি অর্দ্ধেক ফি দেবেন।

অভিনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে করিতে যেন আত্মদানের অসাড়তার মাঝেই মতিলালের ওষ্ঠদ্বয় পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া ছুঁচাল হইতেছিল ; নিত্যপদ কথা শেষ করিতেই তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং সম্প্রসারিত হইয়া গেল, তারপর তারা একটু কাঁপিল।

একটু সামলাইয়া লইয়া মতিলাল বলিলেন,—এ ত' ভায়া রাগের কথাই হল! বলিয়া মাথা দুলাইতে লাগিলেন, যেন তাঁহার এই ধারণা হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

কিন্তু মিষ্টত্ব তিনি ত্যাগ করিলেন না।

নিত্যপদ বলিল,—না না, তা আপনি ভুলেও ভাববেন না। আমার যে প্রাপ্য। আমি কুড়ি-পঁচিশ চাইনি যে আপনি বলবেন বিপদের সময় তুমি রাগ করে যাচ্ছে-তাই দর হাঁকছ, তা ত' নয়। আপনি হলপ করে বলতে পারেন, আপনি আপনার প্রাপ্য কখনো ছেড়েছেন ? টাকার কথা ছেড়ে দিই, পয়সাটা ?

শুনিয়া মতিলাল স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, অতগুলি অমিষ্ট কথা একসঙ্গে শুনিয়া নয়, অন্য কারণে। তিনি আগাগোড়া মনে করিয়া আসিয়াছেন, নিত্যপদ গোবেচারী, এমন গোবেচারী যে, ঝগড়া করিতে জানে না ; সেই নিত্যপদ যে তাঁহার ব্যক্তিত্বকে তাঁহার সম্মুখেই বক্র করিয়া তুলিতে পারে, সহস্র অসম্ভব দিকে তাঁহার বুদ্ধি নির্ব্বিচারে ছুটিলেও, তাহা তিনি অনুমান করিতে রাজিই হন নাই।

ছাড়াছাড়ির কথা ছাড়িয়া দিয়া মতিলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, কান্তি বুঝি তোমাকে শেখাচ্ছে এই সব ?

কান্তিভূষণ ঘরের ভিতর হইতে বলিল, আজ্ঞে না।

নিত্যপদ বলিল, পয়সা নেয়া কি পরামর্শ দিয়ে শিখাতে হয় কাউকে। এখানে দেখছি শুধু ন্যায্য পাওনা পয়সা নয়, তার উপরেও যত পারা যায় অতিরিক্ত আদায় করাই দস্তুর। সেদিনকার একটা ঘটনার কথা শুনুন। আপনার তাড়াতাড়ি নেই ত' কোথাও যাবার ?

মতিলাল তখনো আশা একেবারে ত্যাগ করেন নাই।

আকাশ যেমন নীল, তেমনি সহজ উদার প্রসন্নতার সহিত তিনি বলিলেন, বলো শুনি। তাড়াতাড়ি নাই ; কেবল তোমার কাছেই এসেছিলাম।

নিত্যপদ বলিল, কাছেই কোন দোকান থেকে সেদিন বৌদি চিনি আনালেন এক পোয়া, সন্দেহ হওয়ায় তিনি ওজন করে দেখলেন, ওজন তিন ছটাক হল। চিনি ফেরৎ নিয়ে গেল, আমিও গেলাম সঙ্গে। দোকানী বললে ঠিক দিয়েছি, এই দেখুন পোয়া। ওরে, এইটে মেপে চিনি দিইনি তোকে ?—আমাদের হানিফ বললে, হ্যাঁ ত'। কিন্তু আমি বাটখারা চেয়ে নিয়ে দেখলাম, ব্যবহারে তার ছটাক খানেক লোহা ক্ষয় হয়ে গেছে, বললাম, এইটেই তোমার বদলান দরকার।

দোকানীর বোধ হয় রাগ হল ; বললে, ওতেই চলছে, মশাই, চিরকাল, দেশের লোক ত' নিচ্ছে, আপনার পছন্দ না হয় নেবেন না, আর জব্দ করতে চান ত' পুলিসে খবর দিনগে।

আর একটা লোক সেখানে বসে ছিল, সে বললে, ওরে বাবুর সঙ্গে অমন করে কথা কইতে হয় ?—দোকানী বললে, যে বাবু সে-ই আমি।

সাম্যবাদের ঢেউ পৌঁছেছে দেখে আমি চলে এলাম। বলিয়া নিত্যপদ হাসিতে লাগিল।

মতিলাল বলিলেন,—তা-ই নাকি!—ওই গোপলা, বুঝলে কান্তি?

কান্তি বলিল,—হুঁ।—দাদা, ফণী ডাক্তার আর গোবর্ধনের ঘটনাটা।

নিত্যপদ আলস্যভাবে বলিল,—থাক।

মতিলাল সহজে ছাড়িবার পাত্র নন, তিনি অন্যায়ের মূলোৎপাটন করিতে চান; বলিলেন, গোপলার প্রাণে ফ্যাসন ঢুকেছে, বুঝলে কান্তি?—নাপিত ডেকে বেটার মাথাটা মুড়িয়ে দিলে তবে বেটা জব্দ হয়, ঐ ইয়াকি'র ঢঙে যে চুল কাটায় তার উচ্ছন্নে যেতে কিছু বাকি নাই, বেটাকে জব্দ করতে হবে।

মতিলাল গোপালকে জব্দ করিবার সংকল্প করিলেও ইত্যবসরে তিলার্ধকাল বিস্মৃত হন নাই যে নিজেই তিনি জব্দ হইয়া আছেন, বলিলেন,—আর আলিস্যি করবার সময় নাই, ভায়া, উঠি এখন, তবে সে-ই কথাই রইল?

নিত্যপদ সাবধান হইয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিল,—কি কথা?

—তুমি দেখে আসবে, অর্ধেক ফিস্ দেব।

—বেশ।

ইঙ্গিতে সদুত্তর শুনিয়া মতিলাল উঠিতেছিলেন, এমন সময় কান্তিভূষণ বিবিধ আকারের বিবিধ বর্ণের এবং বিবিধ প্রকারের সত্যকার ঔষধে পূর্ণ এক বোঝা শিশি লইয়া বাহিরে আসিল।

মতিলাল সেইদিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, রুগী পত্তর আসছে বেশ সন্তোষের কথা।—তারপর তিনি মানবসাধারণের উদ্দেশে একটি সত্য প্রচার করিলেন, বলিলেন, বাপু হে, ঝুটা সাচ্চা জন্তুতেও বোঝে।—যাই, সেই কথাই রইল।

বলিয়া তিনি যাইবেন, কিন্তু একটা কথা হঠাৎ উঠিয়া পড়িল, কথাটা শেষ পর্যন্ত শুনিয়া যাইবার অভিপ্রায়ে মতিলাল দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কান্তিভূষণ ঔষধের শিশি বিতরণ করিতেছিল; রোগীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, তোরা আসছিস আর ওষুধ নিয়ে যাচ্ছিস্, কিন্তু দাম দেবার ত' নাম করিস্ নে।

রোগীদের একজন বলিল,—ওষুধের দাম আর নেবেন না বাবু।

—কেন?

—কোনোদিন ত' দিইনে।

—কাকে দাওনি?

—ফণী ডাক্তারকে দিই নাই, কবরেজ মশায়কে দিই নাই। হালখাতার সময় ফণীবাবুকে চার আট-আনা দিই, তিনি তাতেই সন্তুষ্ট; কবরেজ মশায় তা-ও চান্ না।

নিত্যপদর কিছু বলিবার ছিল, কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল, অসাড়তা বোধ করা কখনো কখনো রক্ষাকবচের কাজ করে।

কিন্তু কান্তিভূষণ অসাড়তা অনুভব করে নাই; সে বলিল,—সে-ওষুধে এ-ওষুধে তফাৎ আছে।

যার সঙ্গে কথোপকথন সুরু হইয়াছিল সে এই ঔষধে-ঔষধে পার্থক্যের প্রতিবাদ করিল না, করিল আর একজন ; বলিল,—এ-ও জল, ও ও জল, আমরা না বুঝি এমন নয়, তবে খাই যে নেহাৎ নাচার হ'য়ে। শুনুন না ও'রই কাছে। বলিয়া সে সম্ভ্রান্ত এবং স্মিত আনন মতিলালকে দেখাইয়া দিল, আঙ্গুল দিয়া নয়, তাঁহার দিকে চোখ ফিরাইয়া।

কান্তিভূষণ মতিলালের কাছে শুনিতে চাহিল না, তাহাকেই শুধাইল,—উনি তার কি জানেন ?

মতিলালের মুখের দিকে চাহিয়া লোকটি যেন একটি মুহূর্ত্তে বিভ্রান্ত হইয়া রহিল, স্পষ্টই ধরাইয়া দিবে কি-না, পরক্ষণেই বলিয়া ফেলিল ও'দের কাছে শুনেছি, ওষুধের নামে আপনারাও জলই দিচ্ছেন, কিন্তু তাতে আমাদের দুঃক্ষু নাই।

মতিলাল বলিলেন,—যাঃ।

যে বালক অবিশ্রান্ত অর্থহীন কথা কহিতেছে, তাহাকে যেন সস্নেহে ঊর্দ্ধ কণ্ঠে একটা ধমক দিয়া মতিলাল অম্লানচিত্তে ধীরে ধীবে প্রস্থান করিলেন। —এইমাত্র যাহার কাছে কৃপা প্রার্থনা করিয়া কেবলই বাক্যসুধা উদ্‌গীরণ করিতেছিলেন, তাহার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়া তিনি কিছুমাত্র অপ্রতিভ হইয়াছেন বলিয়া মনে হইল না, কন্যার জীবনসংকট-সময়ে যাহার অনুগ্রহদান এখনো বাকি আছে, তাহাকে চটাইয়া দিয়া তিনি শঙ্কিত হন নাই।

কিন্তু কথাটা সত্য।

মতিলাল এবং আরো কয়েকজন ব্যক্তি একদিন নিজেদের মধ্যে ঐ আলোচনা করিয়াছিলেন, ডাক্তার ঔষধের মূল্যস্বরূপ এক কপর্দ্দকও নগদ পাইতেছে না সে যে ঔষধের লেবেল দিয়া ঔষধই দিতেছে, ইহা তাঁহারা কেহ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, কাজেই সাব্যস্ত হইয়াছিল যে, নিত্যপদ শিশিতে ভরিয়া রঙ্গীন জল দিতেছে অর্থাৎ ফণীভূষণেরই সে পুনরাবৃত্তি। খুব একটা হাসাহাসি হইয়াছিল কেবল ঐ কথাটা লইয়াই এবং রোগীসঙ্ঘের ভিতর কথাটা রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হয় নাই।

যাহা হউক, ঔষধের নগদ দাম দিতে অস্বীকার করিয়া রোগীরা প্রস্থান করিল।

খানিক স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কান্তিভূষণ বলিল,—কিন্তু মজা এই, ওষুধ আপনি ওদের আর দেবেন না যদি ভেবে থাকেন, তবে ভুল করেছেন।

নিত্যপদ তাহার মুখের দিকে চাহিল।

কান্তিভূষণ পুনরায় বলিল,—কাল আবার এসে পড়বে, আপনার পা জড়িয়ে ধরবে, খুঁটির গায়ে মাথাও ঠুকবে কেউ কেউ, কেউ কেউ এমন কাঁদবে যে আপনি টিকতে পারবেন না।

নিত্যপদ বলিল, যেমন চলছে চলুক।

একটি নূতন রোগী গায়ে চেকদার ব্যাপার জড়াইয়া আর আড়-ঘোমটার ভঙ্গীতে মাথায় কাপড় দিয়া স্বতন্ত্র হইয়া এক পাশে বসিয়া ছিল, কান্তিভূষণ তাহাকে স্ত্রীলোক মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি কি চাও, বাছা ?

—আমি হরিদাস। বলিয়া হরিদাস মুখের মাথার কাপড় সরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া গা মেলিয়া পট্‌পট্‌ শব্দে আড়মোড়া ভাঙিল, দেখা গেল, তার ছোট ছোট গোঁফ আছে, ছোট ছোট দাড়ি আছে, কদমফুলী চুল, আর চোখ ক্ষুদ্র কিন্তু চতুর, মুখমণ্ডল পাণ্ডুর।

কান্তিভূষণ কিন্তু তাহাকে রোগের বিবরণ শুধাইল না, হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল,—ফিরলে কবে?

দিন তিনেক হ'ল ফিরেছি, এসেই জ্বর, আর সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা!—বড় কাবু করে দিয়েছে। বলিয়া হরিদাস মুখের ভিতরকার তিক্ততার ছবি বাহিরে ফুটাইয়া তুলিল।

কান্তিভূষণ বলিল, হরিদাস প্রবাসে ছিল।—তোমার প্রবাসের গল্পটা ডাক্তারবাবুকে বলো, হরিদাস।

নিত্যপদ গল্প শুনিতে ভালবাসে, জিজ্ঞাসা করিল,—কি গল্প?

—আছে একটা, শুনুন।

হরিদাস লজ্জিত হইয়া বলিল,—সে গল্প কি আর শোনাব ওঁকে। সে বড় লজ্জার কথা, ডাক্তারবাবু!

—তবে থাক।

কান্তিভূষণ লাফাইয়া উঠিল: "না, না, লজ্জার কথা মোটেই নয়, বলো তুমি।"

হরিদাস একটুখানি সময় মুখ নামাইয়া রহিল, তারপর চোখ নামাইয়া সে বলিতে লাগিল,—আমি জেল-ফেরতা, ডাক্তারবাবু। বলব কি, নেহাৎ কর্ম্মদোষে।—বলিয়া থামিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

নিত্যপদর মনে হইল, কর্ম্মদোষ ছাড়া অন্য কারণে মানুষ জেলে যায় না।

কান্তিভূষণ তাড়া দিল: "তারপর"—

হরিদাস বলিতে লাগিল,—বিয়ে করলাম, তা শাশুড়ী আছে ত' শ্বশুর নাই, আর শাশুড়ীর অগাধ টাকা আর একটি নাবালক ছেলে।—ভাবলাম, যাক ভালই হল, অভাবী দুঃখীর দিন একটু আয়াসে চলবে। কিন্তু মূল বড় কঠিন, শাশুড়ী ঠাকরুণকে বাজিয়ে দেখলাম, তাঁর যত টাকা তত হুঁস, আর তত কথার ধার, আমাকে পষ্টই জবাব দিল, করে খাওগে বাপু, "বসের দিশের" ছেলে তুমি।—দাঁত বসল না, মুখ ছোট করে চলে এলাম।—হাটে পান বেচি, সুবিধে মতো এক চালান গোল আলু কি ফুলকপিও আনাই, চীনে-সিঁদুর, খোঁপার কাঁটা, লণ্ঠনের ফিতে এই সব গাঁয়ে গাঁয়ে ফেরি করি, এমনি করে নেহাৎ কষ্টেই আমার দিন চলে।—এদিকে আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ ভারি ভারি গয়না গড়িয়ে তাঁর কন্যাকে পরতে পাঠান, তাঁর কন্যা তাঁর দেয়া গয়না পরে আমার দেয়া কচু'সন্দ খান, আমি গয়না দেখি আর মনে মনে ভাবি, ঘরে একদিন সিঁদ না হয়ে যায় না।

কান্তিভূষণ প্রবলবেগে হাসিয়া উঠিল।

তার হাসি থামিলে হরিদাস বলিতে লাগিল,—হলও তাই; একদিন সকাল বেলা উঠে আমার স্ত্রী দেখলে, তার অঙ্গে অলংকার একখানাও নাই, আর ঘরের কোণে প্রলয় প্রমাণ এক সিঁদ।—দেখে সে হাউমাউ করে উঠতেই সেই গোলমালে

আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, আমিও মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। যা-ই হোক, দারোগা এলেন, তাঁকে বসতে দিলাম, তিনি সিঁদ দেখলেন, আমার স্ত্রীর জবানবন্দী নিলেন, তারপর খপ করে আমার হাতখানা চেপে ধরে বললেন, তুই-ই চোর। দারোগার অত্যাচারে আমার স্ত্রী আবার কেঁদে উঠলো, একে তার গয়না চুরি গেছে তার উপর দারোগা তার স্বামীকেই বলে কিনা চোর! কিন্তু বলব কি ডাক্তারবাবু, দারোগা জবরদস্তি আমার কাপড় চোপড় খুলিয়ে ফেললেন, গয়না বেরিয়ে পড়ল।

নিত্যপদ চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—বল কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বেরিয়ে পড়ল জাজ্জ্বল্যমান, তখন আমার স্ত্রীর মুখ যদি দেখতেন তবে আপনার চোখে জল আসত।

নিত্যপদ অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি চুরি করেছিলে?

—তাছাড়া আর কি মনে হয় বলুন!—চোর এসে চুরি করে যাবতীয় গয়না আমার কাপড়ের ভিতর রেখে গিয়েছিল, এ ত' কেউ বিশ্বাস করবে না, আর আমার স্ত্রীই যে সিঁদ কেটে রেখে এসে সমস্ত রাত জেগে বসে তাইয়ে তাইয়ে তার গয়না গুলো ছেনি দিয়ে কেটে আমার কাপড়ের ভাঁজের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছিল, একথাও ত' কেউ মানবে না।

—দারোগা তোমাকেই সন্দেহ করল কেমন করে?

এই প্রশ্নে হরিদাসের চক্ষু বিমর্ষ হইয়া গেল, বলিল,—সেই কথাই আমিও ভেবেছিলাম অনেকক্ষণ অবধি; আমার স্ত্রীও ভেবে অবাক হয়েছিল, কিন্তু দারোগা তা বুঝিয়ে দিল। আমার পায়ের কড়ে আঙ্গুলটা ছাড়া আর একটা আঙ্গুল যে অত্যন্ত ছোট তা আমার মনেই ছিল না, সিঁদের মাটির উপর আমার পায়ের যে দাগ পড়েছিল তাই দেখে আর আমার পায়ের ছোট আঙ্গুলটা দেখেই দারোগা বুঝতে পেরেছিল চোর আর কেউ নয়। তারপর দারোগা বলল, সিঁদ আছে বটে, কিন্তু সিঁদ দিয়ে চোর ঘরে ঢোকে নাই।—সিঁদের গায়ে মানুষ ঢোকার দাগ নাই।—ঘরের দরজায় খিল আঁটা, অথচ চুরি গেছে, তা হলে চোর ঐ ঘরের ভিতরেই ছিল। শুনে আমি অবাক হলাম, আর নিজের উপর রাগ হ'ল—অথচ দারোগার ঐ কথাতেই তিনটি মাস খেটে এলাম।

শুনিয়া কান্তিভূষণ ত' বটেই, নিত্যপদও এত হাসিতে লাগিল যে একটানা এত হাসি সে জীবনে হাসে নাই।

হরিদাস ম্লান হইয়া রহিল।

হাসি থামিলে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া নিত্যপদ জিজ্ঞাসা করিল,—এ দুর্ম্মতি তোমার কেন হয়েছিল?

দুর্ম্মতি নয়, ডাক্তারবাবু, সুমতি। আমার স্ত্রীর আবার গয়না হত—শাশুড়ীর অগাধ টাকার কিছু না হয় খসত; কিন্তু আমি একটা সুবিধে করে ত' নিতে পারতাম।

নিত্যপদ তৎক্ষণাৎ হরিদাসের পক্ষপাতী হইয়া গেল, তার চরিত্রের নির্ম্মলতায় মুগ্ধ হইয়া নহে, অন্য কারণে।

বলল—এস, তোমার হাত দেখি।

নাড়ী দেখিয়া, উত্তাপ দেখিয়া এবং তাহার ক্লেশের কারণগ্নলি মনোযোগ প্নর্ব্বক শ্রবণ করিয়া নিত্যপদ তাহাকে চিকিৎসাধীনে গ্রহণ করিল; বলিল,—তোমাকে কিছ্নদিন টনিক খেতে হবে; অনিয়মে তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে। তোমাকে ফি দিতে হবে না, ওষ্নধ্ তন্মি অমনি পাবে।

শ্ননিয়া কৃতজ্ঞ এবং বিড়ম্বিত হরিদাস ডাক্তারের পদধ্নলি লইতে গেল।

নিত্যপদ পদধ্নলি না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার স্ত্রী এখন কোথায় ?

—এখানেই আছে। সে আবার এই গ্নণধরকে ছেড়ে থাকতে পারে না। তবে শাশ্নড়ী কিছ্ন টাকা এবার খসিয়েছে—ভয় পেয়ে গেছে খ্নব।

—কি করবে এখন মনে করেছ ?

—মনে কিছ্ন করি নাই আগে। এখন আপনাদের ম্নখে গোপলার কথা শ্ননে ভাবছি, একটা দোকানই দি' পাড়ার ভেতর।

কান্তি ঘরের ভিতর হইতে বলিল,—দাও তাই।

—ঔষধের শিশি লইয়া হরিদাস বলিল,—একটা টাকা এনেছিলাম—রেখে যাই ?

নিত্যপদ নিষেধ করিল।

হরিদাস প্ননশ্চ বলিল,—মতিলালের কাছে আপনি গোপালের সম্বন্ধে যে কথাটা বলেছেন, মতিলাল গোপালকে তা শতগ্নণ বাড়িয়ে শোনাচ্ছে।

নিত্যপদ বলিল,—গোপালের সঙ্গে ও'র খ্নব বন্ধ্নত্ব নাকি ?

আজ্ঞে হাঁ, সন্ধ্যের পর ঐ দোকানেই ও'র আড্ডা—কলকে চলে।

—গাঁজা ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।—ঐ রোগটা এখানকার অনেকেরই আছে।—আসি এখন।

চেকদার র‍্যাপার গায়ে জড়াইয়া হরিদাস চলিয়া গেল।

নিত্যপদর সকালবেলাকার কর্ত্তব্য সমাধা হইল। "যার শেষ ভাল তার সব ভাল"—এই প্রবাদটি যদি অর্থহীন না হয়, তবে মনে করিতে হইবে যে, নিত্যপদ, মতিলাল এবং রোগীগণের পক্ষেও নেহাৎ অযাত্রায় দিন স্নর্ন হয় নাই—বিরোধ-বিসম্বাদ টানাটানি-উদ্ঘাটন সত্ত্বেও সবাই একরকম সন্তন্ষ্ট হইয়াছে।

মতিলাল একটি কন্যাকে হারাইয়া আর একটি কন্যার জীবনভিক্ষা চাহিতে আসিয়া টাকার ভয়ে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিলেন—তিনি যাইবার সময় সন্তুষ্ট হইয়া গেছেন—যে রোগীটি ঔষধের পরিবর্ত্তে জলদানের কথা মতিলালই রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল, সে-ই তাঁহার এই উপকারটি করিয়াছে, যাহার কাছে তিনি বাধ্য হইয়া ক্ষ্নদ্র হইয়া দাঁড়াইয়া অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাকে লোকসমক্ষে ক্ষ্নদ্র করা হইয়াছে।

মতিলাল সন্তুষ্ট হইয়া গেছেন।

রোগীরা ঔষধের ম্নল্য বাবদ কিছু দিবে না ইহা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া গেছে।

এবং নিত্যপদ সমস্ত জ্বালা বিস্মৃত হইয়া সন্তন্ষ্ট হইয়া গেছে হরিদাসের গল্প শ্ননিয়া।

কান্তিভূষণ যাইবার পর নিত্যপদ ভিতরে আসিয়া স্নানাহার সারিয়া বই পড়িতে বাহিরে আসিল। সেকালের কর্ত্তারা সকালে উঠিয়া বহির্ব্বাটিতে আসিতেন,—দ্বিপ্রহরে স্নানাহারের সময় একবার অন্তঃপুরে যাইতেন,—তারপর দ্বিপ্রহর ও বৈকালটা বহির্ব্বাটিতেই বিশ্রাম এবং দরবার করিতেন—সন্ধ্যার পর পাশা খেলিতেন, এত সময় বাহিরে কাটাইয়া রাত্রিতে আহারের সময় তাঁহারা পুনরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেন।

সেকালের এই ব্যাপারটা স্বাস্থ্যবর্দ্ধক না হোক স্বাস্থ্যরক্ষক মনে করিয়া নিত্যপদ তাহারই অনুসরণ করিত, অর্থাৎ স্ত্রী মঞ্জরীর সঙ্গে তার ভাল করিয়া দেখা হইত রাত্রে আহারের পর।

সেইদিন—নিত্যপদ যখন বহির্ব্বাটীতে পাঠনিমগ্ন, তখন দুইটি স্ত্রীলোক তাহার অজ্ঞাতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল—

সত্যপদর স্ত্রী বিন্দুবাসিনী মেয়েকে পদ্যপাঠ দ্বিতীয় ভাগ পড়াইতেছিল—নিত্যপদর স্ত্রী মঞ্জরী ভেলভেটের উপর পুঁতি গাঁথিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল রচনা করিতেছিল—

পাঠাভ্যাস করিতে করিতে অনবরত সরিয়া সরিয়া পিছাইয়া যাওয়া খুকীর অভ্যাস—

"এখানে বোস" বলিয়া বিন্দুবাসিনী তাহাকে তৃতীয়বার টানিয়া আনিয়া পুস্তকের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছে—এবং মঞ্জরী মুখ তুলিয়া ব্যাপার দেখিয়া হাসিতেছে—এমন সময় স্ত্রীলোক দুটি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া রোয়াক পার হইয়া দরদালান অতিক্রম করিয়া কক্ষের ভিতর একেবারে তাহাদের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইল—বিন্দুবাসিনীর সুকঠোর অধ্যাপনার আওয়াজ অনুসরণ করিয়া তাহারা নিঃশব্দে আসিয়াছে—নতুবা সাড়া লইতে হইত।

ভদ্রমহিলা দেখিয়া উহারা অধ্যাপনা এবং চরণরচনা ত্যাগ করিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল—

বিন্দুবাসিনী বলিল,—আসুন।

মঞ্জরীও বলিল,—আসুন।

তারপর মঞ্জরী বসিতে আসন দিল—

খুকী পানের ডিবা দিল—

এবং তারপর বিন্দুবাসিনী প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিল।

আগন্তুক মহিলা দুটির একজন প্রধান, অপর অপ্রধান—তাহা দেখিয়া বুঝা যায়; অর্থাৎ বয়স হিসাবে তাঁহারা মাতা ও কন্যা হইতে পারেন। যিনি প্রৌঢ়া তিনি কেবল শাড়ী পরিয়া আসিয়াছেন; যুবতীর গায়ে এণ্ডির চাদর রহিয়াছে; যিনি প্রৌঢ়া তিনি সুস্থকায়া, যুবতী বিবর্ণ। যাহা হউক, উভয়ের মুখ বিষণ্ণ, এবং অভ্যর্থনায় কৃতার্থ হইয়া উভয়ে উপবেশন করিলেন—

পান খাইতে অনুরোধ করা হইল—

পান গ্রহণ করিয়া যিনি প্রধানা, তিনি বলিলেন,—এটি আমার ছোট মেয়ে।

এই মেয়ের সঙ্গে গ্রথিত হইয়া আর একটি কন্যা তাঁর অগ্রুময় স্মৃতিসায়রে

বিরাজ করিতেছে। একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রধানা বলিলেন,—বড়টিকে সেদিন হারিয়েছি। বলিয়াই তিনি অশ্রুমোচন করিলেন।

এবং শোকাতুরা অপরিচিতার চোখে অশ্রুবিন্দু দেখিয়া সমবেদনায় ওদের দু'জায়েরও চোখ ছলছল করিতে লাগিল।

চোখের জল আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—একই গাঁয়ের লোক আমরা—তোমরা আমরা, আপনা-আপনির মধ্যেই মা—কিন্তু মাঝখানে বসতি থেকে দেখা-শোনা নাই—এটি বুঝি ডাক্তারবাবুর স্ত্রী?

মঞ্জরী চক্ষু ঈষৎ নত করিল; তারপর যুবতীর দিকে চাহিয়া রহিল।

বিন্দুবাসিনী বলিল,—হ্যাঁ।

—ছেলেপিলে হয় নাই এখনও? বলিয়া প্রৌঢ়া মঞ্জরীকে লক্ষ্য করিলেন।

—না। বেশীদিন ত' বিয়ে হয় নাই।

—বিয়ে কোথায় দিয়েছিলে? আমরা ত' খবরবার্ত্তা কিছু পাই নাই যে ডাক্তারবাবুর বিয়ে!

—বিয়ে হয়েছিল কলকাতায়! খুবই তাড়াতাড়ি।

ও—নামটি কি?

—মঞ্জরী।

—তোমার পরিচয় আর শুধোতে হবে না—তোমার বেশ দেখেই আমি চিনেছি।

বিন্দুবাসিনীর চোখে মুখে কাতরতা ফুটিল—তারপর কতক্ষণ নিঃশব্দে গেল—আবার একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া প্রবীণা প্রসঙ্গের পরিবর্ত্তন করিলেন, আমার বড় মেয়েটির কথা বলছি—সে সাত মাস পোয়াতী যখন, তখন এল আমার কাছে—কি কুক্ষণেই সে যাত্রা করে বেরিয়েছিল, সে-ঘরে আর ফিরল না সে—তার মরণ লেখা ছিল এখানে, তা-ই সে এসেছিল।—সুস্থ মানুষ—এই ছিল, এই নাই।—কত সাধের প্রথম সন্তান পেটে নিয়ে সে এসেছিল, মা, কিন্তু আমার মুখেও ছাই দিয়ে গেল, নিজেও ছাই হয়ে গেল।—বিয়ে দিয়েছিলাম কত খরচ কত যত্ন করে তার ঠিক নাই—জামাইটিও হয়েছিল মনের মতন—রাজপুত্তুরের মতো চেহারা, দিব্যি করিৎকর্ম্মা বিষয়ী লোক; কিন্তু অত সাধের কুটুম্বিতে আমার এক মুহূর্ত্তেই মিথ্যে হয়ে গেল। মেয়ের শাশুড়ী মাগী রোজ রোজ পত্তর লেখে, বেটা না বিটি হল, বেয়ান? সবই হল, যা অদৃষ্টে ছিল তাই হল—সর্ব্বনাশী চলে গেল, দুকূলের সর্ব্বনাশও করে গেল। বলিয়া তিনি শোকাবেগে বাক্যোচ্চারণ করিতে অক্ষম হইয়া অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

মেয়েটিও কয়েকবার চোখ মুছিল।

এবং ঐ ভগ্নবুকের নিঃশ্বাসপ্রবাহের অভ্যন্তরে বসিয়া ওরা দুই জা এই অকালমৃত্যুর নিদারুণ কাহিনী শুনিল, আর কত যে যন্ত্রণা অনুভব করিল, আর কত যে কাঁদিল তাহার ইয়ত্তা রহিল না।

কাঁদিল না কেবল খুকী—সে হাঁ করিয়া ঐ মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—আশা যা করা যায় দৈবাৎ তার বিপরীত ঘটিয়া গেলে যে শোচনীয় অবস্থা মানুষের হয়, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও সে কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না।

কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থির হইয়া প্রবীণা বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু এই কি সব ! —আবার এই মেয়েটি পোয়াতী হয়ে মায়ের কাছে এসেছে।—কি যে হবে, মা, তা নারায়ণই জানেন, যত দিন এগুচ্ছে ভয়ে ততই আমার বুক শুকিয়ে আসছে, কেবল ডাকছি হরিকে, মুখে জল রোচে না, গলা দিয়ে ভাত নামে না।

বিন্দুবাসিনী বলিল,—কিন্তু মা, বার বারই কি ভগবান এমনি করবেন ! তা হলে তাঁর রাজ্যে মানুষ বাস করবে কেমন করে !

—সবই বুঝি, মা ; কিন্তু স্থির থাকতে পারি কই--পাগল হ'য়ে বেড়াচ্ছি যে। —শোনো অবস্থাটা।

বলিয়া তিনি বড় কন্যার মৃত্যুর কারণটির এবং তাহার জীবনরক্ষার জন্য যে-যে প্রচলিত উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা দিলেন।

ভ্রূণের বহিরাগমনের যে নিয়ম স্বাভাবিক তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল—যে "হতভাগীর" হাতে প্রসূতিকে সমর্পণ করা হইয়াছিল তাহার শিক্ষার বা নৈপুণ্যের অভাবও যে সেই মর্ম্মান্তিক মৃত্যুর জন্য অংশতঃ দায়ী তাহা তিনি স্বীকার করিলেন।

বলিতে লাগিলেন,—সেই ভয়ই এবারও করছি মা।—আমি আর আমাতে নাই —কি করলে যে ভাল হয় তা আমার সব গুলিয়ে গেছে।- ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়, আমার দশাও তাই।—হচ্ছেও ত' সবারই—ওদের হাতেই দিব্যি হচ্ছে, কিন্তু আমার বেলাতেই অদেষ্ট কেন পুড়ল তা আমি জানিনে, মা। এই মেয়েটিকে সামনে করে আমি না পারি কাঁদতে, না পারি বুক বাঁধতে।

বলিয়া তিনি নতনেত্রে নীরব হইয়া রহিলেন - তাঁর চোখের জল গলা বাহিয়া কয়েক ফোঁটা কোলের কাপড়ে পড়িল।

মঞ্জরী করুণ নেত্রে মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল, যেন এ মেয়েটি তাহাদের কাছে চিরবিদায় লইতে আসিয়াছে—আহা !

আগমনের হেতু জানিবার জন্য বহুপূর্ব্বে যে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, প্রবীণা অতঃপর তাহার জবাব দিলেন ; বলিলেন,—লোকে বলে ডাক্তারবাবু দেশে এসে বসেছেন তাঁর দয়ার শরীর, তাঁকে একবার দেখাও। আমি বলি, সে ভাগ্যি কি আমাদের !—তবু ভয়ে ভয়ে এলাম কি করব, মা, প্রাণ বড় না লজ্জা বড় !— তিনি কি দেখবেন ? বলিয়া তিনি বিন্দুবাসিনীর মুখের দিকে যেন অভয় প্রার্থনা করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

জনশ্রুতিতেই কোনো পরিচিতা তরুণীর সন্তানসম্ভাবনা হওয়ার সংবাদে মেয়েদের আহ্লাদের সীমা থাকে না।

এ ত' গ্রামের মেয়ে আর একেবারে সম্মুখে উপবিষ্টা—তার উপর মৃত্যুকাহিনী এমন শোকাবহ, আর মেয়েটির এমন পান্ডুর শান্ত মুখচ্ছবি যে বিন্দুবাসিনী আর মঞ্জরীর চিত্ত বিগলিত হইয়া সেখানে একটি মর্ম্মান্তিক অবসান-সম্ভাবনা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—শঙ্কায় বেদনায় আর অনুকম্পার তাড়নায় তাহাদের যেন কেন্দ্রচ্যুতি ঘটিয়া গেল।

মনে হইল ইহাতেও যদি না দেখে ত' দেখিবে কিসে ? ডাক্তারী বিদ্যা তাহা হইলে পুড়াইয়া ফেলুক।

মেয়েটির মা ডাক্তারের উদ্দেশে যে সংশয় আর কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যেন ডাক্তারের অমানুষিক হৃদয়হীনতার দিকেই, ভয়-ব্যাকুল মাতৃহৃদয়ের ইঙ্গিতে এবং তাহাতেই মঞ্জরী অসহিষ্ণু হইয়া ভ্রূভঙ্গিপূর্বক আদেশ করিল, খুকী, ডাক ত' তোর কাকাকে।

খুকী ছুটিয়া গেল।

এবং অবিলম্বেই নিত্যপদকে ধরিয়া আনিল। তাহাকে দেখিয়া গ্রামের বধূ হিসাবে প্রৌঢ়া ঘোমটা টানিয়া দিলেন, গ্রামের কন্যা হিসাবে মেয়েটি দিল না।

মঞ্জরী এবং বিন্দুবাসিনী একসঙ্গেই বলিয়া উঠিল,—এই মেয়েটিকে দেখ ত।'

ভূমিকায় কালব্যয় তাহাদের সহিল না।

নিত্যপদ বিস্মিত হইয়া বলিল,—কি হয়েছে ? কি দেখব ?

বিন্দুবাসিনী—দেখ ওর পেটের ছেলে যেমন থাকতে হয় তেমনি আছে কি এদিক-ওদিক হয়ে তেড়েবেঁকে আছে !

—ইনি বুঝি মতিলালবাবুর কন্যা ?

ঘোমটাসমেত মাথা নাড়িয়া প্রৌঢ়া জানাইলেন—ডাক্তারের অনুমান যথার্থ।

এবার মঞ্জরীদের বিস্মিত হইবার পালা।

মঞ্জরী বিস্মিত হইয়া বলিল,—জান নাকি ?

—শুনেছি। বলিয়া নিত্যপদ নির্লিপ্তভাবে চলিয়া যায় দেখিয়া বিন্দুবাসিনী আর মঞ্জরী তার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

নিত্যপদ হাসিয়া বলিল,—যেতে দাও—যন্ত্র আনতে হবে যে !

—'এস কিন্তু' বলিয়া উভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল।

ইত্যবসরে কাজ এবং কথার অভাবে খুকীকে কাছে ডাকিয়া ও'রা আদর করিলেন—খুকীর মা খুকীর পড়ায় তাচ্ছিল্য ইত্যাদি দোষাবহ আচরণের নিন্দা করিল।

তাহাতে প্রৌঢ়া কিছুমাত্র নিরাশ হইলেন না ; উপরন্তু উহাদের নির্ভয় থাকিতে অনুরোধ করিলেন, কারণ ছেলেমানুষ এবং ছেলেমানুষের ত্রুটি-অমনোযোগ প্রভৃতি অত্যন্ত মিষ্ট জিনিস।

নিত্যপদ স্পন্দনমান যন্ত্র লইয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিল, যন্ত্র লাগাইয়া ভ্রূণের বক্ষস্পন্দন অনুভব করিয়া বলিল,—ঠিক আছে।—বৌদি, আমার ফি !

—পালাও।—বলিয়া বিন্দু হাসিতে লাগিল।

নিত্যপদ বলিল—এখন এ দেখায় কিছু লাভ হল না ! সন্তান সুস্থ আছে এই পর্যন্ত জানা গেল, কিন্তু দুর্দৈব যা ঘটে, তা সেই আসন্ন-সময়ে। বলিয়া মুহূর্ত-পূর্বে এঁদের সকলের প্রাণে যে শান্তি আর আরাম সে দিয়াছিল, তাহা ধ্বংস করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

প্রৌঢ়া চমকিয়া উঠিলেন, ওমা, তা হ'লে কি হবে।

মঞ্জরী এবং বিন্দুবাসিনী উভয়েই একবাক্যে তাঁহাকে প্রবোধ দিল ইহাই বলিয়া যে, ছেলে যখন সুস্থ অবস্থায় গর্ভে অবস্থান করিতেছে, তখন দুশ্চিন্তার বিশেষ হেতু নাই, আর আসন্নসময়ে ডাক্তার যাহাতে সেখানে উপস্থিত থাকে, সে ব্যবস্থা তাহারাই করিবে, ইহা তাহারা শপথ করিয়াই বলিতেছে।

শপথের দৃঢ়তা দেখিয়া মেয়ের মা শঙ্কা ত্যাগ করিলেন ; বলিলেন, বাঁচালে মা। তারপর তিনি মঞ্জরীকে প্রাণপণে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কিন্তু বিন্দুবাসিনীর দিকে চাহিয়া তাঁহার আশীর্ব্বচন ফুরাইয়া গেল, ম্লান চক্ষে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে-করিতে বলিলেন, তোমাকে কি আর আশীর্ব্বাদ করবো মা ; তোমার পানে চাইতে আমার বুক ফাটছে।

বিন্দুবাসিনীর কেমন অসহ্য বোধ হইল, নিজের বেদনা আবৃত করিতেই যেন সে দুটি পান তুলিয়া প্রৌঢ়ার হাতে দিল, তিনি তাহা গালে ফেলিয়া তখনই উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মঞ্জরী হাত ধরিয়া মেয়েটিকে তুলিল, মেয়েটি মঞ্জরীর মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া ঋণ স্বীকার করিল।

দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া উভয়ে প্রবীণা ও নবীনাকে আবার দেখা দিতে অনুরোধ করিল ; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তখন ও-পক্ষ শুষ্কচক্ষু, মঞ্জরীরা কাঁপিতেছে।

নিত্যপদ বহির্ব্বাটীতে তার পুস্তকের কাছে ফিরিয়া আসিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিতে পারিল না, এই ঘটনা তাহাকে কিছু চঞ্চল করিয়াছে।

বাহিরের উঠানের অর্দ্ধেকে ছায়া পড়িয়াছিল।

নিত্যপদ চেয়ার নামাইয়া উঠানে পাতিল ; কান্তিভূষণের জন্য আর একখানা চেয়ার নামাইয়া রাখিয়া নিত্যপদ বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু সে না পারিল প্রাণ খুলিয়া হাসিতে, না পারিল পুরাপুরি রাগ করিতে, চোখের বালির মতো কষ্টদায়ক হইয়া মতিলাল তাহার মনের ভিতর খরখর করিতে লাগিলেন।

কান্তিভূষণ বৈকালিক হাজিরা দিতে আসিতেই নিত্যপদ তাহাকে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার মতিকাকার অবস্থা কি খুবই খারাপ ?

প্রশ্নটির বিষয় এমন কিছু গুরুতর নহে ; উত্তরের উপর কাহারো মামলার ডিক্রী-ডিসমিস জীবন-মরণও নির্ভর করিতেছে না যে জবাবে প্রতিবাদ কি সমর্থন প্রাণপণে করিতে হইবে।

কিন্তু কান্তিভূষণ করিল তাই, ঘোরতর শব্দ করিয়া লাফাইয়া উঠিল ; "খারাপ ? কে বললে ? খারাপ কিছুতেই না, বরং আমার-আপনার চাইতে ঢের ভাল। খারাপ ছিল বটে আগে ; কিন্তু ওঁর মাসীর মৃত্যুর পর উনি অবস্থা ফিরিয়ে নিয়েছেন।"

—মাসী উইল করে—?

—উঁহু। শোনা যায়, মাসীর মৃত্যুর সময় উনি উপস্থিত ছিলেন ; কিন্তু শরীর খারাপ বলে মাসীকে নিয়ে শ্মশানে যান নাই, বাড়ীতে একলা ছিলেন, তার পরদিনই এখানে চলে আসেন ; কিন্তু মাসীর নাবালক ছেলেরা সিন্দুক খুলে একটা কাণাকড়িও পায় নাই, লোকে বলে—

বলিয়া একটু থামিয়া কান্তিভূষণ বলিতে লাগিল, তারপর থেকেই শনির দৃষ্টি ছেড়ে যেয়ে লক্ষ্মীর নজর ওঁর উপর পড়ে, যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই জয়ের উনি একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত। সে টাকা ঢের বাড়িয়েছেন।

নিত্যপদ খানিক কি ভাবিল, শনি-লক্ষ্মীর বিরোধের কথাই বোধ হয় ; তারপর বলিল, কিন্তু থাকেন ত' নেহাৎ গরীবের মতো।

—সেটা এখানকার অধিকাংশ লোকেরই স্বভাব, রুচিটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে, সাদাসিদে মানুষ কি বৈরাগী বলে এদের ভাববেন না, জানে না কি করে ভালভাবে মানুষের মতো থাকতে হয়। টাকার পাখা আছে মনে করে টাকা এরা পুঁতে রাখে, কারো কারো বংশপরম্পরা চলে আসছে ; পথে-ঘাটে কুড়িয়ে যা পায় তাই খায়, টাকা পোঁতা থাকে, যা ওঠে তা সুদে খাটে। কত টাকা যে কালো হ'য়ে গেল তার ঠিক নাই।

—কিন্তু আশ্চর্য্য দেখ, দুটি টাকা বাঁচাতে উনি কি মাথাটাই খাটাচ্ছেন। প্রথমে আমাকে ভয় দেখালেন, তারপর হাত ধরলেন, তারপর, বলিয়া আজকার ঘটনাটা নিত্যপদ বিবৃত করিল।

বলিল, কিন্তু তিনিই জয়লাভ করলেন। তাঁর স্ত্রী-কন্যাকে আমি কিছু বলিনে, তাঁরা মতিলালের হাতে খেলেছেন মাত্র। সামান্য দু'টি টাকা আমি পেলাম না বলে ত' আমি দুঃখিত নই, কিন্তু ওর প্রাণপাত পরিশ্রমটা দেখ। লোকটার অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।

কান্তিভূষণ বলিল, ঐ ফন্দির জোরেই ত' করে খায়, দুটি টাকা অন্য কারো কাছে ধাপ্পাবাজি করে পেলে, অর্থাৎ মজুত টাকায় হাত দিতে না হ'লে, আপনাকে দিত। আমি আসি একটু। বলিয়া কান্তিভূষণ উঠিয়া ঘরের ভিতর গেল।

খানিকক্ষণ সেখানে কাটাইয়া কান্তিভূষণ বাহিরে আসিয়া বসিল।

নিত্যপদ জিজ্ঞাসা করিল, কি করে এলে ?

—রেজেষ্ট্রীতে মতিকাকার নাম তুলে রেখে এলাম, দুটি টাকা ডাক্তার-ফি বাকির হিসাব তাঁর নামে লেখা রইল, আপনাকে ত' ফাঁকি দেবেই, ওর মাসীর ছেলেরা এখন খেতে পায় না, একটি ছেলে এখানে থাকতে এসেছিল ; তাকে একদিনের বেশী স্থান দেয় নাই, যতক্ষণ সে-বেচারা বাড়ীতে ছিল ততক্ষণ তাকে নজরের উপর রেখেছিল, পাছে কিছু নিয়ে পালায়।

একটা সুতীক্ষ্ম যন্ত্রণাবোধ নিত্যপদকে যেন উত্তেজিত করিয়া টলাইয়া দিল, চৌর্য্যপরায়ণ দুর্ব্বৃত্তের পাশে সদ্যমাতৃহারা সন্তানগণের সেদিনকার সেই হতাশা, বেদনা আর একটা অন্ধকারের থরথর অনুকম্পন সম্পূর্ণ অবয়ব লইয়া তাহার সর্ব্বান্তঃকরণ ব্যাপিয়া নিমেষে সঞ্চালিত হইতে লাগিল।

বলিল, তাঁকে একবার ডাকতে পার ?

—কেন ?

—তিনি কেন আমার নামে অপবাদ রাষ্ট্র করছেন জিজ্ঞাসা করব।

—তিনি আসবেন না, ফণী ডাক্তার—

—কই ? বলিয়াই নিত্যপদ দেখিতে পাইল, ফণী ডাক্তার সর্ব্বাতীত একেশ্বর ব্যক্তির মতো শির উচ্চে তুলিয়া সম্মুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছে, কোট গায়ে দিয়াছে, আর জুতা পায়ে দিয়াছে।

কান্তিভূষণ ডাকিল, আসুন, ডাক্তারবাবু।

কিন্তু ডাক্তারবাবু আহ্বানকর্ত্তার দিকে নেত্রপাত করিয়া আহ্বানের প্রাপ্তি সংবাদ দিলেন না, মুখ না ফিরাইয়া আর চলিতে চলিতেই, আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন, সময় নাই বলিয়া অদৃশ্য হইলেন।

কিন্তু বিড়ম্বনাভোগ অদৃষ্টের কোথায় লেখা থাকে তার উদ্দেশ আজ পর্য্যন্ত কেউ পায় নাই। ফণী ডাক্তারের অনতিপশ্চাতে যে ব্যক্তিকে সেই পথেই চলিতে দেখা গেল তাঁর মাথা হইতে কোমর পর্য্যন্ত ছাতা মেলিয়া আড়াল করা, অঙ্গসমূহের মধ্যে কেবল লোমশ আর কৃষ্ণবর্ণ পা দুখানা ইহাদের চোখে পড়িল, পথিক মাথার ছাতা এদিকে কাৎ করিয়া ধরিয়াছেন কি অভিপ্রায়ে তাহা বুঝা গেল না, কারণ তিনি ছায়ায়-ছায়ায় চলিয়াছেন, রৌদ্র নাই, বৃষ্টির ছাঁট ত' নাই-ই।

নিত্যপদ পথিককে এ-অবস্থায় চিনিতে পারিত না নিশ্চয়ই; কিন্তু কান্তিভূষণ তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছে, বলিল, মতিকাকা। ও'রা দুজনেই একসঙ্গে কোথাও চলেছেন?

বলিতে না বলিতেই নিত্যপদ উঠিয়া দ্রুতপদে সেই দিকে গেল।

হঠাৎ একটা ধাক্কা পাইয়া এদিকের ছাতা উল্টাইয়া যাইয়া ওদিকে পড়ায় মতিলাল সম্পূর্ণ অনাবৃত হইয়া পড়িলেন, ছাতা হাতের সঙ্গে আটকাইয়া পা-বরাবর ঝুলিতে লাগিল।

এবং মতিলাল অপ্রসন্ন হইয়া বলিলেন, আচ্ছা মানুষ ত' হে তুমি। মানুষের গায়ে হাত?

নিত্যপদ বলিল, গায়ে হাত দেওয়াই বুঝি একমাত্র অপরাধ? মানুষ আর কোনো অপরাধ করে না?

—করে, করে, তুমি—

—আমি যা-ই হই, আপনি জোচ্চোর, যান।

মতিলাল এতাদৃশ লাঞ্ছিত হইয়াও গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিলেন না, হাত পা নাড়িয়া আস্ফালন করিলেন না, ভূদেব হইতে ত্রিদিব পর্য্যন্ত কাহারও দোহাই মানিলেন না, এমন কি অভিশাপও দিলেন না।

অনাবশ্যক এবং স্থানচ্যুত ছাতাটা পুনরায় মাথায় দিয়া বিরোধভীরু দুর্ব্বলের মতো নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন।

নিত্যপদ আসিয়া বসিল, কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল, একটি মাত্র গালির শব্দ উচ্চারণ করিয়াই তাহার দেহে-মনে অপার একটা জর্জরতা আসিয়াছে, আর এত ক্লেশবোধ হইতেছে যে তাহা অবর্ণনীয়। তার বাঁ হাঁটুটা কাঁপিতে লাগিল।

এই অপরাহ্নে আকাশ ব্যাপিয়া একটা স্নিগ্ধ স্বর্ণাভ দীপ্তিপ্রবাহ চলিয়াছে; রৌদ্রের এই রূপান্তরিত ছটা যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহাকেই যেন সোনা করিয়া তুলিয়াছে, গাছগুলি সারাদিন রৌদ্রে পুড়িয়া এখন উত্তপ্তদেহে যেন সুশীতল চন্দন লেপন করিয়াছে, তৃণদল পর্য্যন্ত এই অপরূপ আলোর অঙ্গরাগসেবায় পুলকিত হইয়া ঝলকিত কান্তিলাবণ্যে আকাশের সঙ্গে একাকার হইয়া গেছে। পল্লী-অরণ্যে এমন বৃক্ষটি নাই যেখান হইতে গৃহাগত পাখীর আনন্দ কলরব আসিতেছে না।

কিন্তু উহাদের দু'জনার কাহারো মুখে কথা নাই।

খুকীর কাজ খুকী করিল, চা আনিয়া দিল। এবং তখনই রাস্তার ও-দিকে একটা চীৎকার শোনা গেল, কে যেন দূরবর্ত্তী কাহাকে ক্রুদ্ধস্বরে বলিতেছে, আমিও মুসলমানের বাচ্চা। বাবুর চাকর হয়ে আছি, তা না হলে—

উভয়ে চকিত হইয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু অল্প পরেই দেখা গেল, যে ব্যক্তি চীৎকার করিতেছিল সে আর কেউ নয়, নিত্যপদর ভৃত্য হানিফ। সে ক্রুদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই।

হানিফ বেঁটে মানুষ কিন্তু বুক চওড়া ; দেহে শক্তি আছে, এই কারণে লোকে তাহার নাম দিয়াছে 'বাঁটুল'।

যাহাই হউক, তার চোখ-মুখ দেখিয়া মনে হইল সে ক্রুদ্ধ হইয়াছে এবং বাবুর চাকর হইয়া না থাকিলে সে কি করিত তাহার ইঙ্গিত তাহার চোখে-মুখেই স্পষ্ট হইয়া আছে।

হাতে একটি কাগজের ঠোঙ্গা লইয়া সে প্রবেশ করিয়াছে।

কান্তিভূষণ জিজ্ঞাসা করিল, হানিফ রেগেছ বড়, কি হয়েছে ?

হানিফ দাঁড়াইল, বলিল, হাটের ঐ দীনু দোকানদার, এত সাহস তার, বাবুর জিনিস আমার হাত থেকে সে কেড়ে নেয় !

—কেন ?

—বড় মা বললেন, হানিফ, আধসের ময়দা আনতে হবে যে বাবা ! পারবি ? আমি বললাম,—সে কি মা, পারব কি না তাই আবার জিজ্ঞাসা করছেন আমাকে ! আমি নিমক্ খাইনে ? দেন পয়সা, কিন্তু গোপ্‌লার দোকানে আর যাচ্ছিনে। মা বললেন, তোর যে দোকানে খুশী যা—মা একটা টাকা দিলেন—হাটে গেলাম দীনুর দোকানে, আধ্ সের ময়দা নিয়ে টাকাটা ফেলে দিলাম তার সামনে। দীনু বলল, ভাঙ্গানি নাই। আমি বললাম, টাকা দাও, ভাঙ্গিয়ে আনছি। দীনু বলল, জিনিস রেখে টাকা ভাঙ্গিয়ে আন। আমি বললাম, জিনিস আমি নিয়ে গেলে ক্ষেতিটা কি ? দীনু বলল, আর তুমি ফিরবে না। আমি বললাম, আমি নিত্যপদ ডাক্তারবাবুর চাকর। দীনু বলল, যে বাবুরই হও সব বাবুকে চিনি—এই নাও টাকা ভাঙ্গিয়ে আন। বলে ময়দার ঠোঙ্গাটা আমার হাত থেকে সাঁ করে টেনে নিলে। —আপনার চাকর বলেই আমি তাকে কিছু বললাম না।

নিত্যপদ বলিল, যাক, ও চুকে গেছে।

কিন্তু চুকিয়া যায় নাই—অর্থাৎ হানিফ তার মুখের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া চলিয়া গেল—বলিতে বলিতে গেল, গোপ্‌লার কথায় বাবু সেদিন হেসে চলে এলেন—আজ আবার এই—বাবুর দ্বারা কাজ হবে না—বাবুর নিমকের মান বাবুই রাখতে দিলেন না।

নিত্যপদ জিজ্ঞাসা করিল,—আমাদের ওষুধের ষ্টক কেমন ?

—কোনো কোনোটা প্রায় ফুরিয়ে এল -

—তোমার খুব ক্ষতি হল, কান্তি, তুমি শিখতে এসেছিলে, কিন্তু তা হ'ল না।

— কেন দাদা ?

—আর ওষুধ বিতরণ করে কাজ নাই ; জল দিতে থাকো। ফণীবাবু দেশের লোকের নাড়ী ধরে আছেন—তাঁর ব্যবহারই ঠিক। আমরা ভুল পথে চলেছিলাম, ভাই।

কান্তিভূষণ একটু হাসিল—

সেই হাসিটুকুতে যে বিস্ময় আর যে বিষণ্ণতা ফুটিয়া উঠিল তাহা অভাবিত।

দীনবন্ধুর ক্লেশ দেখিয়া গোবিন্দ মনে মনে হাসিয়া বাঁচেন না, হৃদয়হীনতার দরুণ নহে, ক্লেশের কারণের অভিনবত্বে। তিনি যাহাদের সংসার পাতিয়া বসবাস এবং দিনাতিপাত করিতে আজন্ম দেখিয়া আসিতেছেন, সুখ-দুঃখের হট্টরোলের মাঝে তাহারা সংসারই করে—কল্পলোকের কল্পবৃক্ষে নীড় রচনা করে না—কোথায় কোন্ অজ্ঞাত দেশে রূপবিভূতিশালিনী রাজপুত্রী মুকুটভূষণ যৌবনপ্রমত্ত রাজপুত্রের হস্তধারণ এবং স্বর্ণ-কমলের উপর চরণ স্থাপিত করিয়া বসিয়া আছে তাহা তিনি স্বপ্নেও কখনও দেখেন নাই। যে রমণীরত্ন ঘর সাজাইয়া আর নিজে সাজিয়া গৃহলক্ষ্মীরূপে কেবল জ্যোতি বিকীরিত করিতে থাকে এবং নিজেকে নানাদিক দিয়া সম্ভোগ্য করিয়া তুলিতে থাকে, তাহাকে কল্পনা করিতে গোবিন্দ ঠাকুর অক্ষম—যেমন, তিনি হিমালয়ের শৃঙ্গে উঠিতে অক্ষম।—স্বরের সমতা কখনো কোলাহলে পরিণত হইবে না—ললাটের চর্ম্মরেখা রুক্ষ কুঞ্চিত হইবে না—সর্ব্বদাই সুশীতল প্রভাতী সমীরণ প্রবাহিত হইবে—বৈশাখী ঝড়ের আঘাতে সংসার দুলিয়া উঠিবে না—ইহা কি হয়!

হয় কি না তাহা দেখিবার সুযোগ গোবিন্দের ঘটে নাই—দীনবন্ধুরও ঘটে নাই।

পারিবারিক চিত্র কখনো সুরম্য হইয়া উহাদের চোখে পড়ে নাই—পড়িলে হয়তো গোবিন্দ ঠাকুরের ভ্রম ঘুচিত—অন্তরের ও বাহিরের দীনতার গভীর লজ্জা দৃষ্টির সম্মুখে প্রকটিত হইয়া আত্মাকে প্রবুদ্ধ না করুক বিস্মিত ও অবনমিত করিতে পারিত—বিস্ময়ও একটি শিক্ষার উৎস ; কিন্তু এ শিক্ষালাভ উহাদের জীবনে হয় নাই।

তবু দীনবন্ধু আহত হইয়া কাঁদে—নিজের ভগিনীর পিঠ ফাটিয়া রক্ত গড়াইতেছে বলিয়া—রক্তপাত সে দুঃস্বপ্নেও আশা করে নাই—রক্ত ভয়াবহ।

কিন্তু গোবিন্দ পাকিয়া গেছেন ; তিনি মনে মনে হাসেন।

গোবিন্দ মনের সুখে তামাক খান আর টেরচা চোখে লক্ষ্য করেন, দীনবন্ধু সেকেলে বুড়োর মতো হাঁটু তুলিয়া আর ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া থাকে—হঠাৎ এক সময় হুহু করিয়া চোখের জল ছাড়িয়া দেয়—ডাকিলে সাড়া দিতে চায় না—কেমন যেন বেহুঁস—খাইতে বসিয়া অল্প দুটি খাইয়াই উঠিয়া পড়ে—স্নানের পূর্ব্বে মাথায় তেল দিতে তার ভুল হইয়া যায়।

দেখিয়া দেখিয়া গোবিন্দ একদিন ধমকাইয়া উঠিলেন ; বলিলেন,—অলক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়েছে হে তোমার উপর—আর কিছু নয়। শরীর খাটিয়ে মরা দোকানটাকে তাজা করে তুললাম, তুমি তাকে চোখের জলে ধুয়ে দিতে বসেছ!—বলিয়া তিনি

মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিলেন—অন্য কারণে নহে, কেবল দীনুর প্রতি মমতার বশে।

—আর চোখের জল ফেলব না, ঠাকুন্দা। বলিয়া দীনবন্ধু সজলচক্ষে গোবিন্দের দিকে চাহিয়া রহিল।

গোবিন্দ তখন ক্রোধ ত্যাগ করিয়া দাহ-জুড়ান মিষ্টকণ্ঠে বলিলেন,—ভাই, অদৃষ্ট। মানুষ সুখে থাকে অদৃষ্টের গুণে, দুঃখ পায় অদৃষ্টের দোষে।—দুঃখ পেলে কারো ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাওয়া মহাপাপ—কারুর উপর রাগ করা আরো পাপ।

দীনু এসব তত্ত্ব-কথা জানিত না—তত্ত্বনির্ণয়ের বয়স তার হয় নাই—দুঃখ যখন বিদ্ধ করে তখন দুঃখবাদের অনুপকারিতা লইয়া তত্ত্বালোচনা করিতে সে শিক্ষা করে নাই—সোজা দুঃখের সোজা অনুভূতি সে জানাইতে পারে।

মানুষের স্বকৃত ব্যাপার সংসারে কিছু ঘটে না—অদ্ভুত খেয়ালী অদৃষ্টের খেলায় বিশ্বাস থাকিলে অন্যায় কি অহৈতুকী বলিয়া বিস্ময় ও বেদনারও কিছু থাকে না।

গোবিন্দের মুখের কথায় কার্য্যকারণের অপূর্ব্ব সংস্থান আর সংযোগ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া দীনু ভাবিল, বুঝি সত্যই তাই—দুরপনেয় দুঃখের লেখা কপালে লইয়াই দুঃখী জন্মগ্রহণ করে; দুঃখ কেউ কাহাকে দিতে পারে না। ঝড়ে যেমন চাল ওড়ে, আগুনে যেমন ঘর পোড়ে, দুঃখও তেমনি কর্ম্ম-নিরপেক্ষ আর চেষ্টা, বুদ্ধি এবং চিন্তার অনধীন অনিবারণীয় অদৃষ্টের কথা—চাও না-চাও সে আসিবেই—

বলিল,—বুঝেছি, ঠাকুন্দা।

গোবিন্দ খুসী হইয়া বলিলেন,—বুঝেছিস ত'।—নে, সোজা হয়ে বোস কোমর তুলে।—আমি আবার একদিন যাব বেটির কাছে—ঢিট্ করে রেখে আসব।

দীনবন্ধুর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে বেটি মানে সাবিত্রীর শাশুড়ী এলোকেশী। গোবিন্দ ঢিট্ করিবেন বটে, কিন্তু তাঁর কথার অনাগ্রহ শিথিলতা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় কি না বুঝা গেল না।

কিন্তু গোবিন্দ ঠাকুর বিস্মিত হইয়া গেলেও বিস্ময়ের কথা ইহা মোটেই নয় যে, অপরকে ঢিট্ করিতে যাইয়া তিনি নিজেই ঢিট্ হইয়া আসিবেন—কিন্তু আসিলেন তাই।

ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং শুভবুদ্ধির প্রেরণায় ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি একদিন ইসাকপুর হইতে ব্রহ্মতলা গ্রামে যাইবার পথে পারুলডাঙ্গায় শিবুদের বাড়ীতে যাইয়া উঠিলেন।

ঢিট্ করিবার পূর্ব্বে তিনি উঠানে দাঁড়াইয়া স্ফূর্ত্তি করিয়া ডাকিলেন,—কই গো, এ-বাড়ীর সব মানুষ কই?

বাড়ীর মানুষ সব বাড়ীতেই ছিল—শিবু মৎস্যশিকারে যায় নাই, খামার-বাড়ীতেও যায় নাই।

গোবিন্দের অন্বেষণের শব্দে সে তার শুইবার ঘর হইতে এবং এলোকেশী তার

ঢেঁকিশালের ওদিককার একটা প্রচ্ছন্ন স্থান হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে দেখা দিল, কিন্তু কৃতার্থ হইয়া গেল না।

পূর্ব্বে অর্থাৎ পলায়নের পূর্ব্বে ঠাকুর এ-বাড়ীতে পদধূলি দিলে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা ত্বরিতেই লাভ করিতেন; স্পষ্টই বুঝা যাইত, উহারা তাঁহার দর্শন পাইয়া ধন্য এবং পুলকিত হইয়াছে।

আজ তাহারা বাক্যোচ্চারণ করিবার পূর্ব্বেই গোবিন্দ অনিবার্য্য অনুভব করিলেন, তাঁর আজিকার প্রভাত সুপ্রভাত নহে—পাদ-প্রক্ষালনের জল আসিতে কেহ দৌড়াইল না, কেহ উপবেশনের জন্য চৌকি আগাইয়া দিল না।

এখানে কালবিলম্ব করিবার নিষেধ তিনি পাইয়াছেন, তথাপি তিনি কি ভাবিয়া যে তাঁর বিঘ্নবিনাশন নামাবলীর পাগড়ী খুলিতে উদ্যত হইলেন তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু নামাবলীতে হাত দিতে না দিতেই শিবরতন যেন ঊর্দ্ধলোক হইতে প্রশ্ন করিল,—কি চাই আপনার?

শিবুর কণ্ঠ শুনিয়া গোবিন্দ মাথার পাগড়ী মাথাতেই রাখিয়া জবাব দিলেন,—কিছুই না—দেখা করতে এসেছি।

ঘরের ভিতর হইতে পরম বৈষ্ণবী সুরবালা বলিল,—মরো তুমি।

শিবু বলিল,—কার সঙ্গে?

—এই তোমাদেরই সঙ্গে—তোমরা ত' আমার—

গোবিন্দ হয়তো বলিতে যাইতে ছিলেন, "আমার অনাত্মীয় নও।"

কিন্তু এলোকেশী তাঁর কথার মাঝখানেই ঝাঁপাইয়া উঠিল,—ঠাকুর আমায় যে ঠকান ঠকিয়েছ তার উপর আর দেখা করতে এসে তোমার কাজ নাই।

শিবু বলিল,—বুঝেছি তোমার দেখা দে'য়ার কারণ, কিন্তু তুমি আর আমাদের কথার মধ্যে এস না।

গোবিন্দ ঠাকুরের মনে হইল আসিলে কি ফল হইবে তাহার ইঙ্গিতও ঐ নিষেধের ভিতরেই একটা বিশেষ ভঙ্গী লইয়া ফুটিয়া আছে। তাঁর আরো মনে হইল, শিবুর চোখ যেন ক্রমশঃ ধারালো আর লাল হইয়া উঠিতেছে—

গোবিন্দের মুখ দিয়া দ্বিতীয় শব্দ নির্গত হইল না, টিটু করা ত' হইলই না—অপমানের জ্বালায় কয়েক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিলেন।

সাবিত্রীকে চোখে দেখাও ঘটিল না।

দীনু এই খবর শুনিয়া গোপনে কাঁদিল।

গোবিন্দ বলিলেন,—ভাই, অদৃষ্ট!—কারো উপর রাগ করিসনে।

কিছুদিন গেছে—

পাতা একবার ঝরিয়া শাখায় শাখায় নব-কিশলয়ের হরিতে পাদপ আবার সজীব আর স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে—কুহুরবের আর বিরাম নাই—

সাবিত্রী একদিন রাত্র তৃতীয় প্রহরে ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিল, বেদনায় মাথা ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতেছে, গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া আছে, আর যেন সে নিমপাতা চিবাইয়াছে মুখের ভিতরটা এমনি তিত'—

কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্ করিয়া আবার সে ঘুমাইয়া পড়িল—এবং পুনরায় ঘুম ভাঙ্গিয়া যখন সে উঠিয়া বাহিরে আসিল, তখন রৌদ্র উঠিয়াছে—

শিবু স্বচক্ষে দেখুক বউয়ের গুণ তার কত, ইহাই মনে করিয়া এলোকেশী এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে ঘুমাইবার অবসর দিয়াছে, ডাকিয়া তোলে নাই, বৌয়ের "অলক্ষ্মী আচরণ" নিঃশব্দে সহিয়াছে।

সাবিত্রী বাহিরে আসিতেই এলোকেশীর দৃষ্টি পড়িল এবং সে প্রশ্ন করিল, ঘুম ভাঙল মহারাণীর ?

আরো কিছু বলিবে বলিয়া এলোকেশীর মনে ছিল, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই সাবিত্রী উত্তর দিল, হ্যাঁ, কেন ?

সাবিত্রীর মুখের কথা এলোকেশী অল্পই শুনিয়াছে, একাক্ষর দুটি একটি নিস্তেজ শব্দ ছাড়া সে প্রাণ খুলিয়া কথা এলোকেশীর সঙ্গে বলে নাই, কখনও যদি বলিতে চাহিয়াছে এলোকেশী অসহিষ্ণু হইয়া তাহা শুনে নাই, তাহার মুখের রা এলোকেশীর কাছে আশ্চর্য্য বস্তু হইয়া ওঠা বিচিত্র নয়, ক্রোধের কারণ ত' বটেই।

অভগ্ন এবং অকম্পিত দুটি কথা সাবিত্রী উচ্চারণ করিল অর্থাৎ স্বীকার করিল যে শাশুড়ীর চক্ষু ভুল দেখে নাই, মহারাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে।

কিন্তু এই নিদ্রাভঙ্গের পরিণাম কি তাহা সাবিত্রীও জানে না, এলোকেশীও ঘুণাক্ষরেও অনুমান করিতে পারিল না, কথার ব্যঙ্গাত্মক বক্রস্বরে তাহার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল।

সেই জ্বালায় সে লাফাইয়া উঠিতেই সাবিত্রী বলিল, আজ একটু থেমে থাক মা, আমার বড় অসুখ করেছে। বলিয়া সে বসিল।

এলোকেশীর কথার স্রোত হঠাৎ তার চিরদিনের চলার পথে থমকিয়া রহিল, ভিতরের তুফান উত্তাল হইয়া ছুটিতে থাকিলেও বাহিরে তাহার একটি তরঙ্গ দেখা দিল না, অবশ্য বৌয়ের শরীরে রোগযন্ত্রণার প্রকাশ দেখিয়া নয়, তার পরিস্ফুট আবাধকণ্ঠ নিষেধে।

যাহাকে চেতনাহীন পুত্তলিকা মনে করিয়া এতদিন খাঁচায় বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল সে শব্দ করিতেই ভীরুর মনে হইল, পুত্তলিকা দৈত্য হইয়া উঠিয়াছে।

এলোকেশী বাধ্য হইয়া থামিয়া থাকিল।

এলোকেশী হাত পা মুখ নাড়িয়া কেবল গলার জোরে আকাশ-পাতাল অধিকার করিয়া থাকিলেও সে কেবল মুখেই দুর্দ্দান্ত, প্রতাপ দেখাইয়া সে যাহাকে তাহাকে দিয়া যা তা করাইয়া লয়, কষ্ট দেয়, কিন্তু মন তার দুর্ব্বল, অতটুকু মেয়ে সাবিত্রীর আকস্মিক বিদ্রোহের সম্মুখে পড়িয়াই তাহার যেন খেই হারাইয়া গেল।

এলোকেশীর এই দুর্গতির আরো একটা কারণ এই যে, তার মনে পড়িয়া গেছে, শিবু কোন পক্ষেই নয়, নিজের তুষ্টি বাধা না পাওয়া পর্য্যন্ত সে কাহারো বৈরীও নয়, সুহৃদও নয়, বৌয়ের প্রতি কটূক্তির প্রতিবাদ সে করে নাই ; এখন মায়ের প্রতি বৌ যদি কটূক্তি করে, তবে তাহারও প্রতিবাদ সে করিবে না।

এলোকেশী শেষ চেষ্টা করিল।

বলিল, আর ঢং করতে হবে না দুপুর বেলা উঠে। অমন রোগের ঠাট্ আমি ঢের দেখেছি। এস।

অর্থাৎ কাজে লাগো।

কিন্তু এতদিন সুস্থদেহে আর সবল থাকিতে সাবিত্রীর যে দুঃসাহস হয় নাই, এলোকেশী দেখিল, অসুস্থ হইয়া আজ তার মনে সেই সাহস দুর্জয় হইয়া দেখা দিয়াছে। শাশুড়ীর আদেশের প্রতি অপার অবহেলা দেখাইয়া সে ঘরের ভিতর হইতে একটা বালিশ আনিয়া দাওয়ার মাটিতেই শুইয়া পড়িল।

এলোকেশী খানিক গুমোট ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া পাড়ায় গেল, ঘরে ঘরে যাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে বলিয়া আসিল, বৌ তাহাকে নিদারুণ অপমান করিয়াছে, কথা গ্রাহ্য করে নাই, অসুখের ভাণ করিয়াছে, আদেশ অমান্য করা আর পা দেখান একই কথা, অতএব তোমরা সকলে তাহাকে, অর্থাৎ অমন দুষ্ট-বুদ্ধি বধুর শাশুড়ীকে সত্বর যমালয়ে পাঠাইয়া দাও, কারণ যাইবার নির্বিরোধ অন্য স্থান নাই।

তাহাকে সুশীতল যমালয়ে প্রেরণে প্রতিবেশীগণের অবসরের অভাব দেখিয়া সে ফিরিয়া আসিল, এবং যে-ঘরের বারান্দায় সাবিত্রী শুইয়া ছিল, সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণাবশতঃ সেই ঘরের দিকেই সে তাকাইল না।

সত্য কথা এই যে, সাবিত্রী ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং ফলাফল সম্বন্ধে মরিয়া হইয়া শাশুড়ীর আদেশ অবহেলা করে নাই, রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ভয় করিতে সে ভুলিয়া গেছে, কিন্তু চোখ বুজিয়া শুইয়া জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে তার অদৃষ্টের একটা দিক স্বচ্ছ হইয়া গেল। এতদিন ধরিয়া প্রতিটি মুহূর্ত্ত কঠিন বাক্য আর অপমান সহ্য করিয়া তাহার অনুক্ষণ ভয়কাতর শশব্যস্ত প্রাণে সহজে যে জ্ঞান ফুটিতে পারে নাই, রোগের ক্লেশের মাঝে অবসর পাইয়া সহসা তাহা পূর্ণরূপে দেখা দিল।

শাশুড়ীর দুর্ব্বলতা তাহার চোখে পড়িল।

তাহার মনে হইল, এখানে কথার উত্তরে কথা কহিতে হইবে, শক্ত কথার জবাবে আরো শক্ত জবাব দিতে হইবে, সে-ও মানুষ, সে আর নিঃশব্দে সহিবে না।

সাবিত্রী উঠিয়া বসিল।

এলোকেশী অসহযোগ করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া যাতায়াত করিতেছে, সাবিত্রী বলিল, খাবার জল দাও ত' মা।

এলোকেশী প্রথমবার দাঁড়াইল না, ভ্রূক্ষেপও করিল না। দ্বিতীয়বার বলিল, গড়িয়ে খাও, আমার সময় নাই।

—সময় করে নাও। তোমার কি মানুষের রোগের দুঃখও বুঝবে না?

কিন্তু এলোকেশী তা বুঝিল না।

শিবুরা তিন ভাই যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল, ''নৃসিংহসংহার'' পালা যেমন অভিনব তেমনি বৃহৎ, রাত্রি সাড়ে দশটায় ''গান সুরু'' হইয়া ভাঙিতে বেলা উঠিয়া গেছে।

শিবনেত্র হইয়া তাহারা ফিরিল।

শিবরতন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, অমন করে বসে আছে যে, মা ?

মা গোয়াল ঘরের দরজা হইতে বলিল, আমি জানিনে।

সাবিত্রী বলিল, মা জানে, আমি বলেছি। আমার জ্বর হয়েছে।

—বটে ! দেখ্ ত' ওর গা। শিবু হুকুম করিল মোনাকে। মোনা সাবিত্রীর কপাল ছুঁইয়া বলিল, খুব গরম, দাদা।

—তবে আর বসে কেন ? শুলেই ত' হয় !

সাবিত্রী বলিল, জল খাব, মা তা দিচ্ছে না।

—মা, জল চাইছে, দাও। বলিয়া শিবরতন মুখ ধুইতে গেল।

এলোকেশীর এদিকে মাথা কাটা গেল পরাজয়ে ; ওদিকে রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল লাঞ্ছনায় ; এদিকে মরিতে ইচ্ছা হইল পুত্রের ব্যবহারে অর্থাৎ মনের ঘৃণায় ; ওদিকে বুক শুকাইয়া গেল সেই পুত্রের ব্যবহারেই অর্থাৎ বৌয়ের উপর টানে।

কিন্তু জল বহিয়া আনিয়া সে সাবিত্রীর সম্মুখে দিল, আর মৃত্যুকামনা সে কাহার করিল তাহা সে-ই জানে।

তারপর সাবিত্রী বেপরোয়া কেবল মুখের হুকুম চালাইয়া আর প্রয়োজন হইলে ধমকাইয়া পথ্য-পানীয় শুশ্রূষা আদায় করিয়া লইতে লাগিল।

সেদিন হাটবার নয়।

দীনবন্ধু দোকানটিতে চুপ্‌চাপ্ বসিয়া আছে, বাঁশের বেঞ্চির উপর গোবিন্দ ঠাকুর তাঁর ত্রিলোকতারণ নামাবলী মাথায় বাঁধিয়া বসিয়া আছেন, কোথাও যাইবার ইচ্ছা !

দু' একটি লোক যাওয়া-আসা করিতেছে।

সিকদারদের দোকানের সম্মুখে ছুতার-মিস্ত্রী উহাদের বস্ত্র-রাখার জন্য কেরোসিন কাঠের আলমারী প্রস্তুত করিতেছে, সেইদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে গোবিন্দ ঠাকুর বলিলেন, ঠিক আজকের তারিখে সাবিত্রীর বিয়ে হয়েছিল, মনে আছে, দীনু ?

দীনুর মনে ছিল না ; বলিল, তা-ই নাকি ? তারিখটা আমার মনে নাই, ঠাকুন্দা ! তার খবর অনেকদিন পাইনে।

সেই 'টিট্' করিয়া আসার পর গোবিন্দ সেদিকে আর যান নাই ; বলিলেন, তারপর আমিও আর সেদিক যাই নাই।

দীনু বলিল, সে বেঁচে আছে ত' ?

—ক্ষ্যাপা না পাগল ! বেঁচে থাকবে না ত' কি হবে তার !

—বলা যায় না, ঠাকুন্দা। খুন করে জালিয়ে দে'য়া পাড়াগাঁয়ে হামেসা হয়।

গোবিন্দ ঠাকুর দীনুর এই শঙ্কাটাকে অনুচিত মনে করিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন, বলিলেন, আরে না, না।

দীনু বলিল, ভবেশের সেদিকে যাওয়া-আসা আছে, তারও দেখা পাইনে অনেক দিন।

বলিতে বলিতে ভবেশকেই দূরে ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর সামনে দেখা গেল।

ভবেশ সেইখানেই দাঁড়াইয়া ঐ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর কাহার সঙ্গে কি কথা যেন বলিল।

দীনুর অকারণেই মনে হইতেছিল, খবর লইয়া ভবেশ এখানেই আসিতেছে, পথে সে ঐটুকু বিলম্ব করায় দীনুর কষ্ট বোধ হইল।

বলিল, ভবেশ আসছে। এবার সে কি খবর আনছে কে জানে!

দীনুর বুক দুরু-দুরু করিতে লাগিল।

গোবিন্দও দেখিলেন, ভবেশ দূর হইতেই তাঁহাদের দিকে চাহিয়া যেন হাসিতে হাসিতে আসিতেছে।

বলিলেন, খবর ভালই।

—আচ্ছা জব্দ। বলিয়া ভবেশ উদগ্রীব মানুষ দুটির সম্মুখে পৌঁছিয়া গেল।

—কে জব্দ? বলিয়া দীনু তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথাকার খবর রে?

—সাবিত্রীর শ্বশুরবাড়ীর।—বলিয়া ভবেশ মোড়ায় বসিয়া হাসিতে লাগিল।

দীনবন্ধু বলিল, সাবিত্রী ভাল আছে ত'?

—তা আছে বৈ কি! তা না থাকলে হাসি? সে ভালই আছে।

—জব্দ হল কে?

—তার শাশুড়ী, দেওর। সে গাঁয়ে সাবিত্রীর নাম রটেছে 'কুঁদুলি' বলে।

দীনবন্ধু সহ গোবিন্দ অবাক হইয়া ভবেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ভবেশ পুলকিত কণ্ঠে সংবাদ দিতে লাগিল, এখন সাবি আর সেই বাপের ঘরের পিট্‌পিটে মেয়েটি নাই। এখন শাশুড়ী যদি বলে এক কথা সাবিত্রী শোনায় তাকে দশ কথা, শাশুড়ী যদি তোলে কঞ্চি, সাবিত্রী তোলে বাঁশ, পারুল-ডাঙ্গার সবাই বলছে, বেটি জব্দ।

—শিবু?

—সে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখে। আমার মাসী বলে, 'কালী-মা এবার রণে চেপেছেন।'

শুনিয়া গোবিন্দ হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন; ভবেশ তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিল।

কিন্তু এটা হাসির কথা কি কান্নার কথা দীনুর তাহা ঠাহর হইল না।

গল্পগুচ্ছ

পামর

নাম শ্রীতমালকৃষ্ণ।

শুনিলেই সংস্কারবশতঃ চোখের সামনে ভাসে একটা প্রগাঢ় শ্যামশ্রী। যাহা ওপারের নবোদিত মেঘ এবং এপারের নবদুর্বাদল হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া যমুনার জলের সঙ্গে একাকার হইয়া গেছে। এতটা যদি না-ও চলে, তবু স্বীকার করিতেই হইবে যে, নাম শুনিলেই মনে হয়, মানুষটি সুশ্রী এবং বিনয়ে অবনত, অর্থাৎ স্নিগ্ধ বটে। কিন্তু কার্যতঃ তা নয়। তমালের চেহারা সুশ্রীই বলিতে হইবে। কারণ, গায়ের রং অত্যন্ত ফর্সা, শরীর এত মোটা নয় যে বেঢপু দেখায়, এমন শীর্ণ নহে যে নড়ু বড়ু করে—এত দীর্ঘ নহে যে মনে হইবে বোকা, এত খর্ব্ব নহে যে মনে হইবে ধূর্ত্ত।

চেহারাই যদি মানুষের সর্ব্বস্ব এবং একমাত্র পরিচয় হইত তবে অনেক অনর্থ ঘটিতই না; অনেক বাক্যের আবশ্যকই হইত না; অনেক দুরভিসন্ধি ধরাই পড়িত না; অনেক পাপাচার চিরকাল গোপনই থাকিয়া যাইত ইত্যাদি।

মন বলিয়া একটি সচল বস্তু আছে। সেই নাকি মানুষের আকৃতিকে আবৃত করিয়া প্রকৃতিরূপে প্রকট হয়; আর বিচার্য্য-বিষয় মানুষের চেহারা নয়, মন।

তমালের মনটাও ভাল; কিন্তু একটু খুঁত ছিল; তাহাতেই একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

হিসাব করিয়া রাজীবলোচনের পেনসনের পরিমাণ দাঁড়াইল একত্রিশ টাকা সাড়ে সাত আনা মাত্র। পেনসনের টাকা অল্প হইলে কি হয়। তিনি পেনসন লইয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মাধবপুর আদালতের বারান্দায় যে সমারোহ হইয়া গেল তাহা বিস্তর।

মাধবপুরেরই "জনকল্যাণ" নামক সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকায় নীলাম ইস্তাহারের পুরোভাগে এবং সংবাদ-চয়নের শেষে তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইল:

"অবসরগ্রহণ। গত ৪ঠা চৈত্র তারিখে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় অত্রস্থ সিভিল কোর্টের প্রাচীন কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন বসু মহাশয়ের বিদায়াভিনন্দন সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। দ্বিতীয় আদালতের মহামান্য মুনসেফ বাহাদুর অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে হাকিম বাহাদুরের সহৃদয়তার এবং বসু মহাশয়ের গুণবত্তার পরিচয় একই সঙ্গে পাওয়া যাইতেছে। শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় একদিকে যেমন নিরলস কর্ম্মী, অন্যদিকে তেমনি নিরহংকার কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে পক্ষগণ, উকিলবর্গ এবং মুহুরী-সমূহের কোনোদিন ক্ষুণ্ণ বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কারণ ঘটে নাই। বসু মহাশয়ের কর্ম্মদক্ষতায় শ্রীল শ্রীযুক্ত হাকিম বাহাদুরগণ বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেন। তাঁহার অবসর গ্রহণে স্থানীয় দেওয়ানী আদালতের বিশেষ অঙ্গহানি হইল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বক্তাগণ তাঁহার গুণগান করিবার সময় অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই। জলযোগান্তে অধিক রাত্রে সভা ভঙ্গ হয়। বসু মহাশয়ের অভাব আমরাও তীব্রভাবে অনুভব করিব। শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের ক্লান্ত দেহ বিশ্রাম লাভ করুক; তাঁহার অবশিষ্ট জীবন শান্তিময় হউক, সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই প্রার্থনা করি।"

সুপ্রসিদ্ধ "জনকল্যাণ" সম্পাদকের এবং অপরাপর বহু বিচক্ষণ ব্যক্তির শুভেচ্ছা শিরোধার্য্য করিয়া রাজীবলোচন যখন ঘরের কোণে ঢুকিলেন তখনকার অবস্থা তাঁর এইরূপ; সম্বল দাঁড়াইল মুদ্রিত অভিভাষণ বা শুভেচ্ছা নয়, একত্রিশ টাকা সাড়ে সাত আনা; তিনি আফিং ধরিয়াছেন এবং কাশি তাঁহাকে ধরিয়াছে, আর যৌবন-বয়সী পুত্র তমালকৃষ্ণ বেকার বসিয়া আছে। প্রতিপাল্য একটি গাভীকে লইয়া সাতটি প্রাণী।

তমাল উপার্জ্জন করে না, কিন্তু সময় সময় তার মনে হয়, সে একটি কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষ। পল্লীবধূকে স্মরণ করিয়া সে মৃদুস্বরে গান করে; 'তমাল কালো, কৃষ্ণ কালো, তাইতে তমাল ভালবাসি; মরিলে তুলিয়া রেখ তমালেরই ডালে।" তাহার শাখা প্রশাখা বাহির হইয়াছে, এবং তাহার উপর চম্পকবরণী তরুণীর মৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছে কল্পনা করিয়া তমাল মনে মনে খুব হাসে।

কিন্তু এসব কথা রাজীব জানিতেন না; জানিলে আরও ব্যথিত হইতেন। সে-সব তমালের মনের কথা; অশেষ দুঃখপ্রদ বাহিরের কথা এই যে, জীবনের কোনো সুযোগই তমাল গ্রহণ করিতে পারে নাই। তমালকে তিনি ইস্কুলে দিয়াছিলেন; কিন্তু ইস্কুলের সঙ্গে, পুস্তকের সঙ্গে, শিক্ষকের সঙ্গে তমালের প্রীতির সম্পর্ক আদৌ স্থাপিত হইল না। দেখা গেল, মানসিক আলস্যে সে পরিপূর্ণ।

নিত্যকার পাঠ তার অভ্যস্ত হয় না—কৈফিয়ৎ চাহিলে অম্লানবদনে বলে,—পরে শুধরে নিলেই হবে। বলিয়াই অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িতে বসে। কিন্তু তখনই ধরা পড়ে, তার পাঠাভ্যাসের জন্য প্রাণপাত করিবার এই আয়োজন ক্ষণিকের।

তার আলস্য আর অমনোযোগ যেমন মিথ্যা নয়, পরবর্ত্তীকালে ত্রুটি বা বর্জ্জন পূরণ করিয়া লইবার সঙ্কল্পও তেমনি সত্য। কিন্তু সময় নিরবধি এ ক্ষেত্রে নয়। জীবনকে খণ্ডিত করিয়া ভূষিত এবং সংক্ষিপ্ত মনে করিয়া বিদ্যা ও অর্থ আহরণ করিতে হইবে।

এখনকার ত্রুটি পরে সংশোধন করিয়া লইবার প্রস্তাব শুনিয়া তখন কেহ হাসিত, কেহ ধমক দিত; কিন্তু অভ্যাসটি তার গেল না।

শিক্ষাপ্রাপ্তি তমালের বেশী দূর অগ্রসর হইল না। রাজীব তাহাকে আদালতেরই এক মক্কেলের অধীনে বেতনপ্রাপ্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

সেখানে তমাল কাজ ফেলিয়া রাখিয়া মনিবকে ভরসা দিল: "পরে শুধরে নিলেই চলবে।"

মনিব রাজীবের খাতিরেও মার্জ্জনা করিলেন না; বলিলেন, "আচ্ছা তবে এস।"

তমাল বাড়ীতে আসিয়া বলিল,—"বারো টাকার কাজ আমি করিনে। একমাস

হা প্রত্যাশায় বসে থেকে মাইনে যখন পাব তখন না ভরবে মুষ্টি, না ভরবে পকেট, না ভরবে প্রাণ। বারো টাকার কাজ আবার কাজ! খোট্টা নাপিতরা রাস্তার ধারে ব'সে তার ঢের বেশী কামায়।" বলিয়া বারো টাকার প্রতি ঘৃণাবশতঃ তমাল বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। দুদিন প্রবেশ করিল না।

কিন্তু শুনিতে মিষ্ট ও স্বাভাবিক, তমালের বিবাহ আটকায় নাই। বধূ-মাতা আসিয়াছেন। মাধবী সুন্দরীও নয়, কুৎসিতও নয়; তবে তমালের পাশে তার রং কালোই দেখায়।

তমাল তাহার উল্লসিত দেহের দিকে চাহিয়া বলিত,—তুমি আমার যমুনা, তোমার বুকে আমার ছায়া পড়েছে। ঐ দেখ মেঘ উঠছে—কদম্বকাননে ঝড় উঠবে। এস দুটো গল্প করি।

মাধবী বলিত, নিজের বউকে ও-কথা ভদ্দর লোকে বলে নাকি!

তমাল বলিত,—এঃ, বেরসিক বড়।

এমনি করিয়া কোমল-কর্কশ ভাবে দিন যাইতে যাইতে তমালের স্ত্রী মাধবী দুইটি সন্তান প্রসব করিল, এবং তমালের বাবা রাজীব পেনসন লইলেন।

কিন্তু একটি ঘটনা কিছুতেই ঘটিল না। তমাল নিষ্ফল বৃক্ষের মতো নিষ্ফল হইয়া রহিল, অর্থাৎ অর্থোপার্জনে মন দিল না।

মাত্র একত্রিশ টাকা সাড়ে সাত আনায় পাঁচ সাতটি লোকের ভরণ-পোষণের ব্যয়নির্ব্বাহ হয় কি না ভাবিতে গেলে আজকালকার দিনে শঙ্কিত হইবারই কথা; কিন্তু তমাল শঙ্কিত হইল না, শঙ্কিত হইলেন তার বাবা আর মা, আর হইল তার স্ত্রী। যথেষ্ট গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় সংসারে অহোরাত্র যে ঘূর্ণি চলিতেছে তমাল তাহার বাহিরে উৎকৃষ্টতর আবহাওয়ায় গায়ে ফুঁ দিয়া বিচরণ করিত, কিন্তু সকলে মিলিয়া টানিয়া আনিয়া তাহাকে সেই ঘূর্ণির মধ্যেই ফেলিল।

তমালের মা বলিলেন,—বাবা, কিছু রোজগারের পথ দেখ। ওর পেনসনের ও ক'টি টাকায় কি এ বাজারে চলে!

কিন্তু জননীর শান্তভাবে এই কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল।

তমাল বলিল,—আমাকে বুঝি খুব বলিষ্ঠ দেখেছ! মাটী কেটে পয়সা আনব?

জিজ্ঞাসা করিয়া তমাল জননীকে একেবারে নির্ব্বাক করিয়া দিল।

তমাল যখন নেহাৎ ছোট তখন একবার তাহাকে রক্তাতিসারে ধরিয়াছিল। বাঁচিয়াছিল অনেক কষ্টে, অনেক টানাটানি, অনেকদিন যমালয়ের দ্বারে ঝুলিয়া থাকিবার পর। সেই হইতে তমালের একটা আলাদা ধরনের আলস্য ধরিয়া যায়; বড় হইয়াও তার মনে হইত, যমের দুয়ারের চৌকাঠ ছুঁইয়া আসিয়া সেই ভয়াবহ পরিশ্রমের দরুণ এখনও সে অশক্ত হইয়া আছে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, তাহার মা ঐ অভ্যাসটি তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত তাহাকে বই স্পর্শ করিতে দেন নাই, হাঁটিতে সাহায্য করিবার জন্য দৌড়াইয়া গেছেন। সেই অসামান্য অসুখের কথা স্মরণ করিয়া এত ক্লেশ প্রকাশ আর বিলাপ করিয়াছেন যে,

শুনিয়া শুনিয়া তমালের সত্যই মনে হইত, ভালই হইয়াছিল যে অসুখ করিয়াছিল। নতুবা মা এত আহ্লাদ দিতেন না।

সেই দুর্ব্বলতা এখনও তমালের স্মরণ হইল; এবং মৃত্তিকা খনন করিয়া সে পয়সা আনিবে কিনা তাহার এই দুরূহ প্রশ্নে মা শঙ্কান্বিতা হইয়া প্রস্থান করিলেন। তবু যাইতে যাইতে বলিয়া গেলেন,—না বাবা, তা বলি নাই, কিন্তু সবদিকই ত' ভাবতে হবে।

—সে আমি ভাবছিনে এমন নয়। বলিয়া তমাল দুঃখিত হইয়া রহিল।

কিন্তু স্ত্রী মাধবী তাহাকে অত সহজে অব্যাহতি দেয় না; সে যখন কথা তোলে তখন স্বামীর উত্তর শুনিয়া তাহার প্রস্থানের স্থান থাকে না, অর্থাৎ রাত্রে শয্যায়।

মাধবীর লজ্জা করে—

অনন্ত পরিশ্রমের পর অবসর লইয়া বৃদ্ধাবস্থায় শ্বশুর গৃহে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিবেন, ইহাই সংসারের স্বাভাবিক ধারা হওয়া উচিত। এখনও তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা যেমন দৃষ্টিকটু তেমনি যৌবনের শক্তির পক্ষে লজ্জার কথাই। এত লজ্জার কথা যে সহ্য কঠিন। কিন্তু স্বামী তাহা বুঝেন না। শ্বশুর অবশ্য শরীরের বিশ্রাম পাইতেছেন; কিন্তু চিরকাল অবিরাম এই সংসারকে স্কন্ধে বহন করিয়া শেষ ক'টা দিনও যদি পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া নিরুদ্বিগ্ন না থাকিতে পারেন তবে সেই কায়িক বিশ্রামের মূল্য কি! পুত্রের উপার্জন ভোগ করিবার আনন্দ একটা স্বতন্ত্র জিনিস, প্রত্যেক পিতার তাহা কাম্য। পুত্রের আনা টাকা দিয়া যাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই তাহারও কাম্য। সেটা কেবল স্নেহের নীরব আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু এখানে কেবল স্নেহের শুভ স্নিগ্ধ নিঃস্বার্থ আকাঙ্ক্ষা নয়, অনিবার্য্য আর জ্বালাময় প্রয়োজনও দাঁড়াইয়াছে।

তার উপর তারা একা নয়। দুটি সন্তান জন্মিয়া নিজস্ব জনসংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। তাহাদের ছেলে—শ্বশুরের পৌত্র সন্দেহ নাই, এবং আসলের চাইতে সুদের প্রতি মমতা বেশী তাহাও সত্য; কিন্তু ঐ ছেলে দু'টি আসিয়াছে বলিয়াই কি তাহাদের দায়িত্ব বাড়িয়া যায় নাই? কিন্তু কে শোনে কার কথা।

মাধবী স্বামীকে মনে করাইয়া দেয় যে, অর্থ উপার্জন করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। সকলেরই মুখ শুষ্ক তাহা কি তিনি দেখিতে পাইতেছেন না? দিন দিন বাজারে ঋণের পরিমাণ বিপুলায়তন হইতেছে তাহাও কি তিনি লক্ষ্য করিতে অক্ষম?

স্বামীকে ভৎর্সনা করা মাধবীর আসে না; সে ঠাণ্ডা মানুষ; করুণসুরে সে কথাগুলি বলে।

উত্তরে তমাল বলে,—দেখছি, দেখছি।

—কই দেখছ?

—কাল সকালে উঠেই আবার দেখব। নানা লোকের সঙ্গে কাজ সম্বন্ধে আমার কথাবার্ত্তা না হচ্ছে এমন নয়। কাল সকাল বেলা একজনের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে। সে সুবিধে ক'রে দেবে বলেছে। হ'ল? এখন চুপচাপ ঘুমোও।

পুনঃ পুনঃ ঐ রকমের প্রতিশ্রুতিসূচক কথা শুনিয়া মাধবীর মনে অবিশ্বাস আসিয়া গেছে ; তার মনে হয় বলে—"সব তোমার মিছে কথা।" কিন্তু বেশী বলা হইবে মনে করিয়া সে বলে না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মাধবী আবার বলে, বাবার ত' শরীর ভাল নয়।

তমাল বলে,—তবে উঠি এখনি, কিছু রোজগার ক'রে আনি।—বলিয়া অন্ধকার রাত্রির প্রায় পৌণে এগার ঘটিকার সময় কিছু উপার্জনের উদ্দেশ্যে বিছানার উপর হইতে সে পিঠটাকে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ উস্কাইয়া উস্কাইয়া তোলে। তারপর আবার গা ছাড়িয়া দেয়। এইভাবে মাধবীকে ঠাট্টা করিয়া তমাল তারপর বলে, বাবা ত' উপার্জন করেছেন ঢের ; খাওয়া দাওয়ায় অত দুধ ঘিয়ের আড়ম্বর না করে কিছু খেনো জমি কিনলেও ত' পারতেন। একখানা যেমন তেমন বাড়ী করলেও কিছু কিছু ভাড়া পাওয়া যেত।

অত্যন্ত দুঃখ পাইয়া মাধবীর মনে হয়, খাইয়াছি ত' আমরাই। তার আরো মনে হয়, বাপের সম্বন্ধে ঐ কথাগুলি অমন বক্র করিয়া বলা কেন।

কিন্তু মুখে তা বলে না।

আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটে—

সাহস সঞ্চয় করিয়া মাধবী বলে,—আমাদের হাত-খরচ আর ছেলেদের জামা-কাপড়ের খরচটাও যদি আমরা দিতে পারি তবে অনেকটা সাশ্রয় হয়।

তমাল এবার বিরক্ত হয়; বলে,—এঃ, বড়ই নাছোড়বান্দা দেখছি। মেয়ে-মানুষের পক্ষে পয়সা রোজগার যত সহজ, পুরুষের পক্ষে তা নয়। তার শুধু রূপ থাকলেই হয় না।

এই কুৎসিত কথা শুনিয়া মাধবী বালিশের ভিতর মুখ গুঁজিয়া দেয়। মনের জ্বালায় দুবার পা ছুঁড়িয়া নিস্তব্ধ হইয়া থাকে।

রাজীব প্রথমে একদিন বলিয়াছিলেন,—একত্রিশটি টাকা সম্বল ক'রে ত' ঘরে এসে বসলাম। তুমি এতদিন ব'সে কাটালে। নিজের চেষ্টায় কিছুই ক'রে উঠতে পারনি। এইবার উঠে পড়ে লাগ ; আলস্য ত্যাগ কর—এখনকার কাজ পরে হবে বলে ফেলে রাখবার আর সময় নেই। তারপর বলিয়াছিলেন, আমি বোধ হয় আর বেশী দিন নাই। শুনিয়া তমালের মনে হইয়াছিল, বাবা যেন কাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া গা ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু উহাতে তমাল ভীত হয় নাই ; বাবা মরিয়া গেলে পেনসনের একত্রিশটি টাকা, অর্থাৎ একমাত্র আয়ের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে এই সম্ভাবনার ইঙ্গিতে তমাল মনে মনে বলিয়াছিল : "সে তখন দেখা যাবে।" প্রকাশ্যে বলিয়াছিল : "আমি ত' বসে নেই বাবা। নানাস্থানে দরখাস্ত করেছি, দেখা-সাক্ষাৎও করেছি। কিন্তু"—বলিয়া ব্যর্থ চেষ্টার কত হতাশা যে সে মুখের উপর টানিয়া আনিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

—কোথায় কোথায় ?

দৃষ্টান্তস্বরূপ তমাল বলিয়াছিল,—এই ত' এখানকার মথুরবাবুর বাঁধা-মক্কেল ভূধরবাবু জমিদাররা। মথুরবাবু এসেছিলেন বাড়ীতে ; তিনি বলে গেছেন, বাবুদের কাছে আমার কথা বলবেন।

শুনিয়া রাজীবের দুর্ভাবনা ঘুচে নাই; কিন্তু প্রস্তুত জবাবে প্রতারিত হইয়া তখনকার মতো যেন দৈবাৎ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

কিন্তু চাকরী একটা তমালের কিছুতেই মেলে না, কারণ, চেষ্টা সম্বন্ধে বাড়ীতে সে যে খবর দেয় তাহা সবই কাল্পনিক। মানুষের সঙ্গে দেখা করিবার নাম করিয়া সে রসময়ের ষ্টেশনারি দোকানে আড্ডা দিয়া আসে; বলে, 'দেখা হ'ল না।' কিম্বা বলে, 'আর একদিন যেতে বলেছেন.' কিম্বা 'লোক তাঁরা নিযুক্ত করেছেন।'

তমাল উপার্জন করে না, কিন্তু তার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রুচি আর পারিপাট্য বিচার দেখিলে অবাক হইতে হয়; মাসে তিনবার সে চুল ছাঁটায়; মোটা সুতার কাপড় দেখিলে তার গা ঘিন্ ঘিন্ করে; জামার সঙ্গে কাপড়ের ঔজ্জ্বল্যের মিল হইল কি না তাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দশবার দেখিয়া তবে পরে; স্নানে যাইবার সময় গামছাখানাকে শুষ্ক না পাইলে তাহার বিরক্তির শেষ থাকে না। মাথার একটু গন্ধ তেল প্রত্যহ চাই-ই ইত্যাদি অনেক রকম।

কিন্তু এদিকে বাজারের ঋণ মাথা ছাড়াইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে।

সে কথার উত্থাপন করিলে তমাল আজকাল বলে, সে ভাবনা সে দায় আমার। দস্যু রত্নাকরের কথা জান ত'। যেমন ক'রে পারি তোমাদের আমি খাওয়াবই।

শুনিয়া মা হাসিয়া বলেন, ডাকাতি আর মানুষ খুন করবি নাকি?

—তা কি মানুষে করে না? জিজ্ঞাসা করিয়া তমাল সরিয়া যায়।

কিন্তু সে কথা কেহ বিশ্বাস করে না।

নিদারুণ অর্থসংকট চলিতেছে। সকল সংকটের শীর্ষস্থানীয় সে-ই; ভয় দেখাইয়া রক্ত শোষণ করিয়া মানুষকে পলে পলে পাণ্ডুরতর করিয়া তুলিতে তাহার সমকক্ষ কেহ নাই; কিন্তু রাজীব এবং তাঁর গৃহিণী যে সর্ব্বদাই সেই কারণে সন্ধিতে সন্ধিতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া স্তূপীকৃত হইয়া থাকেন, আর চোখের সম্মুখে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারই দিবানিশি দেখেন তাহা নহে, হাসিও চলে।

রাজীবের কন্যা শোভা কলস্বরা কুমারী, সে হাসিতে পারে খুব; তমালের ছেলেটি পুরুষ হইলেও, গায়ে সংসারের আঁচ লাগে না বলিয়াই সর্ব্বদাই খেলিয়া বেড়ায়, অসঙ্কোচে আনন্দ করে, প্রভূত আনন্দ দেয়, সুতরাং সংসারে আনন্দেরও হাওয়া আছে।

সেদিনও বড় জামাতা দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। জামাতৃসম্মান তাঁহাকে যথোচিত দান করা হইয়াছে; কিন্তু দক্ষিণ হস্ত পূর্ণ করিয়া দান করিতে বাম হস্ত দিয়া যাহা গ্রহণ করিতে হইয়াছে তাহা ঋণ; তবু আনন্দ তাহাতে ম্লান হয় নাই।

সেই আনন্দের ঝঙ্কার এখনও চলিতেছিল, এমন সময় তাহার উপর নূতন একটি ঘা লাগিল।

সেদিন বৃহস্পতিবার। তমাল অনেক বেলায় শয্যা ত্যাগ করে। সেদিনও অনেকবেলায় শয্যাত্যাগ করিয়া সে মুখ ধুইতে বসিয়াছে এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল; "তমাল বাবু।"

তমাল শব্দের দিকে একটু কান খাড়া করিল, কিন্তু সাড়া দিল না।

মা বলিল, তমাল, কে ডাকছে।

তমাল নিঃশব্দে চোখ গরম করিয়া মায়ের দিকে তাকাইল।

কিন্তু লোকটির ডাক আর থামে না, সে যেন ডাকেরই জাল বুনিয়া মানুষকে বন্দী করিয়া টানিয়া লইতে চায়।

তমাল ভ্রূভঙ্গী করিয়া উঠিয়া গেল, অসহিষ্ণুভাবে দরজা খুলিয়া আহ্বানকারীর সঙ্গে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল ; বলিল, বাবা, ডাকাত যেন ! কি চাও হে তুমি ?

লোকটা সিঙ্গিদের দোকানের লোক ; ধনীর পক্ষ হইতে প্রতিনিধিস্বরূপে আসিলেও সে তমালের চোখ মুখে বিকৃতি দেখিয়া থমকিয়া গেল ; নম্রভাবে বলিল, বাবু পাঠিয়ে দিলেন।

—তা বুঝেছি ; কিন্তু সময় অসময় নেই তোমাদের ! বাবার কাছে বসে ছিলাম ; তাঁর বড় অসুখ, তাইতেই ত' সাড়া দিতে দেরী হ'ল। কিন্তু তোমাদের ত' সে আক্কেল নেই। মানুষ কি অবস্থায় আছে তা জেনে তবে হাঁকাহাঁকি করতে হয়। যাও, এখন কিছু হবে না।

—তাঁর বড় অসুখ ! আহা-হা, কিন্তু তা কি ক'রে জানব বলুন ! এখন কেমন আছেন তিনি।

তমাল শব্দ উচ্চারণ করিল না, বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িল, আর ঠোঁটের একটা ভঙ্গী করিল। যাহার একমাত্র অর্থ এই যে, বাবার অবস্থা নৈরাশ্যজনক।

সিঙ্গিদের লোক বলিল, আচ্ছা আসি এখন। খবর নেব। বলিয়া সে খবর লইয়া চলিয়া গেল।

বলা বাহুল্য, বাজারে যে ধার হইয়াছে তাহা আর তুচ্ছ বলিয়া মনে করা যাইতেছে না ; দোকানী শঙ্কিত হইয়া তাগিদ সুরু করিয়া দিয়াছে।

তমাল ফিরিয়া আসিল।

এবং প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইল, মা তাহার দিকে অত্যন্ত বিষণ্ণ চক্ষে চাহিয়া আছেন, মাধবী তাঁর কাছেই ছিল, আড়ালে গেল।

কিন্তু তমাল জানে না যে, সিঙ্গিদের লোকের কাছে তাহার বিবৃতি তাঁহারা শুনিতে পাইয়াছেন, তখন হইতে এখন পর্য্যন্ত শাশুড়ী এবং বধূ পরস্পরের মুখের দিকে নিষ্বাক ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন, এবং এখন কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নাই, সেই মুখে যে শব্দের এখন আর চিহ্নও নাই সেই শব্দের দিকেও চাহিয়া আছেন।

তমাল নিষ্কৃতির আনন্দে একগাল হাসিয়া বলিল, "বিদেয় করেছি।"

মা বলিলেন, "কেমন ক'রে ও'র অমন অসুখের কথা মুখে আনলি ?"

—"সে পরে শুধরে নিলেই চলবে। আর, দায়ে পড়ে বলেছি বলেই ত' কামনা করিনে। তোমাদের দুঃখিত হবার কারণ নেই।"

"যদি ও'র কানে যেত ?"

গেলে কি বেদনার সৃষ্টি করিত তাহা তমাল ভাবিয়া দেখিল না ; বলিল, "নতুন কিছুই নয়, মা ; তোমরা কিছুই জানো না এ সবের।" বলিয়া তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপে অসন্তুষ্ট হইয়া তমাল পুনরায় বলিল, "আমার কাজ আমি দেখছি। তোমাদের তার ভেতর কথা বলবার দরকার কি ? আর, নিতান্তই

যদি অপরাধ হয়ে থাকে তবে ক্ষমা চাইছি।” বলিয়া হেঁট হইয়া তমাল মায়ের পদধূলি লইয়া মাথায় দিল।

মা বলিলেন, “আর অমন কথা মুখে আনিসনে।”

কিন্তু আর একদিন সে মুখে আনিল এবং তার বাপের কানে সে কথা গেল।

রাজীব স্বকর্ণে শুনিলেন, তমাল জানালায় দাঁড়াইয়া বলিতেছে; “বাবার কঠিন অসুখ নিয়ে আমি মহা বিব্রত, তাঁকে পথ্য আর ওষুধ দিতেই আমি ফতুর হ'য়ে যাচ্ছি, আর এই হ'ল তোমাদের দু'পাঁচ টাকার তাগিদের সময়! আশ্চর্য্য!” এই বলিয়া অবিবেচক ব্যক্তিকে ধিক্কার দিয়া তমাল বলিতে লাগিল, “বাবার শরীর একটু সুস্থ হ'লেই আমি দিয়ে আসব, তোমাদের আর আসতে হবে না দরজা পর্য্যন্ত।” বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেই তমালের চোখে পড়িল, তাহার বাবাই তাহার পশ্চাদ্দিক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন।

কিন্তু সকলেই জানে অবস্থা বিশেষে ব্যবস্থা করিবার নামই বুদ্ধিমত্তা, আর জয় বুদ্ধিমানেরই, সুতরাং তমাল লজ্জিত হইবার কারণ দেখিল না, মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

একটু পরেই তমালের বড় ছেলে আসিয়া খবর দিল; “ঠাকুর্দ্দা তোমায় ডাকছে বাবা।”

“ডাকছেন? যাই। কি করছেন?”

“বসে আছে।”

তমাল পিতৃসমীপে যাইয়া দেখিল, তিনি বসিয়া আছেন সত্যই, কিন্তু সবল সুস্থ লোকের মতো নহে, শত্রু কর্তৃক নিঃশেষে পরাজিত নিতান্ত হতাশ আর দুর্ব্বল ব্যক্তির মতো বালিশে কনুই চাপিয়া বসিয়া আছেন।

তমাল যাইয়া দাঁড়াইতেই রাজীব বলিলেন, “বস, কথা আছে।”

তমাল অত্যন্ত অপ্রতিভভাবে বিছানার পায়ের দিকে বসিল; বসিয়া পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজীব বলিলেন, “কথাগুলো তুমি ভাল বল নাই। তোমার মিথ্যাচার ধরা পড়লে আমাকে লজ্জা পেতে হবে।” পিতাকে পুত্রের আচরণে লজ্জা পাইতে হইবে, ইহাই মৃদুকণ্ঠে আর সদুঃখে জানান, শব্দ মৃদু হইলেও ভৎর্সনা যে কত তীব্র সে জ্ঞান তমালের নাই, পিতার ভৎর্সনা তমাল অনুভবই করিল না।

বলিল, “ধরিয়ে দেবেন না।” তারপর বলিল, “অবস্থা যখন স্বচ্ছল ছিল তখন ধর্ম্মপথে থাকতে কোনো বিঘ্ন ছিল না; কিন্তু অভাবে স্বভাব নষ্ট একটু হবেই। পরে শুধরে নিলেই চলবে।” বলিয়া তমাল অন্যদিকে চাহিয়া রহিল, যেন সেই পরবর্ত্তী কাল কতদূরে তাহাই তাহাকে দেখিয়া লইতে হইবে।

রাজীবের বুক টন্ টন্ করিতে লাগিল।

তাঁর মনে হইল, ইহার তুল্য ধৃষ্ট কুৎসিত কথা মানুষের মুখে উচ্চারিত হইতে ইতিপূর্ব্বে তিনি শুনেন নাই। মিথ্যাচার পৃথিবীতে দুর্লভ নয়, এমন কি সুলভই; কিন্তু নিজের পিতাকেই মধ্যবর্ত্তী করিয়া প্রবঞ্চনার উপায়স্বরূপে ইহা ব্যবহার করা অভদ্রতার চূড়ান্ত, পিতাকে মানুষ যত প্রকারে অপমান করিতে পারে, এই আচরণেই তার সীমা।

মর্ম্মাহত রাজীব বলিলেন, "তুমি চিরকাল আজকের কাজ কালকে শুধরে নেবে ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, কিন্তু কোনটাই তা হয়নি। লেখাপড়ার বেলায় দেখেছি, চাকুরীর বেলায় দেখেছি, তোমার কাজ অসমাপ্তই রয়ে গেছে। তা সইবার মতো না হ'লেও আমি সয়েছি। কিন্তু আর তা পারব না। তুমি আমাকে ব্যথা দিয়েছ।"

তমাল বলিল, "কাজের চেষ্টায় আমি কালকেই বেরুব, দেখে নেবেন! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।" বলিয়া তমাল হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পিতার পদধূলি লইল। বলিল, "তামাক দেব, বাবা?"

রাজীব কথা কহিলেন না।

কিন্তু তমাল তামাক সাজিয়া পিতার হাতে হুকা দিয়া প্রফুল্লচিত্তে প্রস্থান করিল।

"কাজের চেষ্টায় আমি কালই বেরুব" বলিয়া সুদৃঢ় সুতরাং মনোরম প্রতিশ্রুতি দিলেও তমাল বাহির হয় নাই; কিন্তু দেখা গেল, দু'তিন দিন পরে সে ঘণ্টা দেড়েক অনুপস্থিতির পর পাঁচটা টাকা আনিয়া মায়ের হাতে দিতেছে, আর বলিতেছে, "পয়সা ছড়ান রয়েছে, মা; একটু বুদ্ধি খরচ করলেই পয়সা এসে যায়।"

শুনিয়া মা উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন।

পিতা সন্দিগ্ধ হইলেন।

এবং তমাল অদৃশ্য হইতেই মা ঔজ্জ্বল্য ত্যাগ করিয়া কাতরকণ্ঠে বধূকে শুনাইলেন, "বৌমা, তোমার গায়ের কিছু চেয়ে নেয়নি ত' তমাল?"

মাধবী অত্যন্ত ম্লান হইয়া গেল; বলিল, "না!"

'না'। বলিয়া সে শাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। স্বামীর প্রতি শাশুড়ীর এই সন্দেহের লজ্জা যেন তাহারও।

দোকানের তাগিদদার আর বাড়ী পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়া তাগিদ দিতে আসে না...তমালের মুখেই শুনা গেল, স্বোপার্জিত অর্থে দোকানের ঋণ কিছু কিছু পরিশোধ করিয়া অকারণে ভীত এবং নির্ব্বোধ লোকগুলিকে সে নিরস্ত করিয়াছে।

কিন্তু রাজীবের প্রাণে যাহা ঘটিতে লাগিল তাহার অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছু নাই। কঠিনতম লজ্জা আর অপমানকর একটা কিছু প্রতি মুহূর্ত্তেই ঘটিতে পারে এই আশঙ্কায় রাজীব এমন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন যে তাঁর চোখ বসিয়া গেল—আহারে রুচি রহিল না...মাঝে মাঝে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ শীতল করিয়া দিয়া যেন একটা প্রেতাতঙ্কের কম্পন বহিতে লাগিল।

কিন্তু তিনি ভুলিলেন না যে, তমালকে প্রশ্ন করাও বৃথা।

মাধবী রাত্রে স্বামীকে কহিল,—"টাকা আনছ দেখছি..."

তার কথা শেষ না হইতেই তমাল হাসিয়া উঠিল, বলিল,—"আনছিই ত'। সবাই বলছ, টাকা আনো, টাকা আনো—তাই আনছি। মানুষের বাবা বেঁচে থাকতে টাকার অভাব কি!"

—"তার মানে কি বুঝলাম না।"

—"মানে, বাবা ত' কারুর চিরকাল বেঁচে থাকে না, সক্ষমও থাকে না;

কিন্তু ছেলেদের ভাত কাপড়ের দায়ী তিনিই। আমি বাবার পরবার কাপড় এনে দিয়েছি বটে, কিন্তু ”

তমাল আর কিছু বলিল না।

হেঁয়ালি বুঝিতে না পারিয়া মাধবী অবাক হইয়া রহিল।

রাজীবের পরিচিত ওপাড়ার ত্রৈলোক্য রায়ের সেদিন বসিয়া থাকিতে থাকিতে মনে হইল, রাজীবের কাছে একবার যাওয়া প্রয়োজন। হাতবাক্সে চাবি লাগাইয়া তিনি উঠিলেন—রাস্তায় বাহির হইতে হইবে বলিয়া বিঘ্নহর দেবতাকে স্মরণ করিলেন…বৈঠকখানার দরজা ভেজাইয়া দিয়া তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—‘ প্রিয়, দরজায় খিল দে ; আমি একটু বাইরে বেরুলাম।”

ত্রৈলোক্য রাজীবের দুয়ারে আসিলেন।

বন্ধ দরজার দিকে তাকাইয়া খানিক থমকাইয়া থাকিয়া ডাকিলেন—

“তমাল ?” মিনিট খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার ডাকিলেন,—“তমাল ?”

তমাল আসিল না, আসিল তার ছেলে লালগোপাল, দরজা খুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—“বাবা বাড়ীতে নেই।”

—“তোমার ঠাকুদ্দা কেমন আছেন ?”

—“ভাল আছেন।”

—“তাঁকে বল গিয়ে, ত্রৈলোক্য রায় দেখা করতে এসেছেন।”

—“যাই।” বলিয়া লালগোপাল দৌড়াইয়া গেল।

অন্তঃপুরে আহ্বানের অপেক্ষায় ত্রৈলোক্য রায় রাস্তায় পায়চারি করিতে লাগিলেন, কিন্তু একটু বিস্মিত হওয়া তাঁর অদৃষ্টে ছিল—

দেখা করিবার জন্য তাঁহার উদ্দেশ্যে আহ্বান আসিল না, যাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন তিনিই দেখা দিলেন…কিন্তু দেখা দিবার পূর্ব্বে রাজীব বলিলেন—“কি খবর ? এস, এস !”

তাঁরই কণ্ঠস্বর শুনিয়া মানুষকে চমকিয়া উঠিতে রাজীব আগে কখনো দেখেন নাই, কিন্তু এখন স্পষ্ট তাঁর চোখে পড়িল, ত্রৈলোক্য রায় চমকিয়া তাঁহার দিকে ফিরিলেন…

ঐ চমকটুকু দেখিয়া একটা অজানিত আশঙ্কায় রাজীবের মুখ পাংশু হইয়া গেল…দেখা করিতে আসিয়া বন্ধুর ডাক শুনিয়া মানুষ অকারণে চমকিয়া উঠে না।

রাজীব সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন,—“এস, এস।”

—“চলো।”

উভয়ে আসিয়া বসিলেন।

পরস্পর কুশল-প্রশ্নাদির পর, যে প্রশ্নটি করিবেন বলিয়া রাজীবের এক মুহূর্ত্ত চিন্তার বিরাম ছিল না, সেই প্রশ্নটিই তিনি করিলেন : “একটা কথা জানতে চাই, ঠিক উত্তর দেবে ?”

হাঁ না উত্তর না দিয়া ত্রৈলোক্য রায় একটু হাসিলেন মাত্র।

রাজীব বলিলেন,—“তুমি আমায় দেখে তখন চমকে উঠলে কেন ?”

ত্রৈলোক্য রায় বলিলেন,—"তোমাকে আমি বাইরে দেখব আশা করে আসিনি।"

—"কেন ?"

ত্রৈলোক্য রায় চুপ করিয়া রহিলেন…কিন্তু তাঁর মুখের অনুচ্চারিত উত্তরটি অগ্নিজিহ্ব অতি উগ্র একটি ভীতির মতো যেন লেহন করিয়া রাজীবের কণ্ঠ শুষ্ক করিয়া তুলিতে লাগিল…

বলিলেন,—"বলো"—

রাজীবের নির্নিমেষ দৃষ্টির দিকে চাহিয়া ত্রৈলোক্য বলিলেন,—"তমালের মুখে শুনেছিলাম, তুমি খুব অসুস্থ।"

—"কিছু নিয়েছে ?"

—"হাঁ।"

—"কত ?"

"দু'বারে সাত।" বলিয়া বন্ধুর লজ্জায় লজ্জিত হইয়া ত্রৈলোক্য রায় মুখ হেঁট করিলেন,…পুনরায় বলিলেন—"আরো কয়েকজনের কাছ থেকেও নিয়েছে শুনেছি। কিন্তু তুমি ভাল আছ, এই ভাল। তমালের আচরণের আমি নিন্দা করি, ভাই ; কিন্তু বিশ্বাস করো, আক্রোশ আমার এক বিন্দু নেই।" তারপর কয়েক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দ থাকিয়া—"এখন চলি"—বলিয়া ত্রৈলোক্য রায় একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

আক্রোশ যে ত্রৈলোক্য রায়ের নাই তাহা রাজীব বিশ্বাস করিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার বন্ধুর মুখের দিকে চোখ তুলিবার উপায় ছিল না। তাঁহার মনে হইতেছিল, ধনুর্ভঙ্গের মতো একটা দুর্জ্জয় বল প্রয়োগ তাঁদের প্রাণের উপর হইতেছে—সেই ভারে তিনি আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া গেছেন।

বলিলেন,—"এস। আবার দেখা দিও। আমি বড় অসুখী।"

"—দেব।" বলিয়া ত্রৈলোক্য রায় রাস্তায় নামিতেই যাহার সঙ্গে তাঁর একেবারে মুখোমুখী সাক্ষাৎ হইয়া গেল সে আমাদের তমাল।

ত্রৈলোক্য রায় থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

তমাল অম্লানমুখে হাসিয়া বলিল."বাবার সঙ্গে দেখা হ'ল ?" তারপর প্রশ্নের জবাব না পাইয়াও সেই টানেই সে বলিতে লাগিল,—"বাবাকে বলেছেন সব বুঝি ? কিছু মনে করবেন না দয়া করে। পরে আমি শুধরে নেব। টাকা আপনি পাবেন।"

ত্রৈলোক্য রায় কথা কহিলেন না—এরূপ অবস্থায় বলিবার কি থাকে !

কিন্তু তমাল থামিল না।

বলিল,—"বয়োজ্যেষ্ঠ আপনি, পিতৃবন্ধু। আমাকে ক্ষমা করুন।" বলিয়া সে ত্রৈলোক্য রায়ের পদধূলি লইয়া মাথায় মাখিল।

ত্রৈলোক্য রায়ের সঙ্গে একরকম মিটমাট করিয়া তমাল ঘরে ঢুকিল…ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা, তামাক দেব ?" বলিয়া অযাচিতই তামাক সাজিতে বসিয়া গেল।

রাজীবের চোখ ছলছল করিতে লাগিল…অগ্নিকুণ্ডে জলের ছিটার মতো পুত্রের এই সেবা-প্রয়াস তাঁর অন্তর স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই বাষ্প হইয়া মিলাইয়া গেল।

খানিক পুত্রের অবয়বের দিকে চাহিয়া থাকিয়া রাজীব বলিলেন—"আমি আজ প্রাণে বড় ঘা খেয়েছি।" বলিয়া চুপ করিয়া পুত্রের অবয়ব নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

তমাল তামাক সাজিয়া হুকা তাঁর হাতে দিল।

রাজীব বলিতে লাগিলেন,—লোক পুত্র কামনা করে সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা হিসাবে। পুত্র না জন্মালে মানুষের ধন-জন সব মিথ্যা। কিন্তু সে তোমার মতো পুত্র নয়। কুপুত্রের মতো শত্রু নাই। শত্রুর জন্ম কেউ কামনা করে না। তোমার আচরণে আমি মর্ম্মাহত হয়েছি—আমি নিজের মৃত্যু কামনা করছি। সম্ভ্রম যার নষ্ট হয়েছে, মৃত্যু ছাড়া তার নিষ্কৃতির উপায় নাই।" বলিয়া তিনি স্তব্ধ হইলেন।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে তমাল কি করবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। তাগিদ-দারের তাগিদের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হইয়া আত্মরক্ষার্থে সে কৌশল অবলম্বন করিয়াছে মাত্র—পথেঘাটেই তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিত। পরে শুধরাইয়া লইবার পথও ত' একেবারে বন্ধ হইয়া যায় নাই। এক জনের ঋণ পরিশোধ করিতে অন্য স্থান হইতে ঋণগ্রহণের প্রথা চিরকালের আর সর্ব্বজনানুমোদিত; তাহা দূষণীয় নহে। ঋণ গ্রহণ করিতেছি, মনে মনে ইহাই স্থির করিয়া সে ত্রৈলোক্য রায় প্রভৃতি হিতৈষী লোকের নিকট হইতে টাকা লইয়াছে, কারণ আজকালকার লোকগুলি অতিশয় সংকীর্ণ প্রকৃতির বলিয়াই সহজে টাকা বাহির করিতে চাহে না।

কিন্তু পিতার কাতরোক্তি শুনিয়া তাহার মনে হইল, অত কথা বলিবার সময় আর অবস্থা ইহা নহে; বলিতে গেলেও যাঁহাকে বলা উদ্দেশ্য তিনি শুনিতে চাহিবেন কি না সন্দেহ।

এই সব ভাবিয়া তমাল বলিল,—"বাবা, মনে অনর্থক ক্লেশ পাবেন না। আমি শুধরে নেবই।"

রাজীব বলিলেন,—"তুমি যাও এখান থেকে।"

তমাল সেখান হইতে এদিকে আসিয়া মায়ের মুখেও অনেক কথাই শুনিল। মা তাহাকে বলিলেন যে, তাহার আচরণ ঘৃণ্য, অমন পিতার পুত্রের অনুপযুক্ত। স্পষ্ট কুলাঙ্গার বলিয়া তিনি তমালকে সম্বোধন করিলেন না, কিন্তু বলিলেন যে, এ বংশের কাহারও জুয়াচোর নাম ছিল না—কুলে সে কলংক দিয়াছে।

তমাল দেখিল, মাধবী অশ্রুবিসর্জন করিতেছে।

শুধরাইয়া লইবার ইচ্ছাটাকে কেহই তেমন আমল দিতেছে না দেখিয়া তমাল হঠাৎ যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল।

সেইদিনটা এবং আরো অনেকগুলি দিন উহাদের বড় নিরানন্দে কাটিল—যেমন নিরানন্দে কাটিয়াছিল অযোধ্যার, রাম বনবাসে গেলে।

* * * *

তমাল আজ প্রায় দু' সপ্তাহ বাড়ীতে অনুপস্থিত, সে কোথায় গিয়াছে বাড়ীর কেহ তাহা জানে না।

বিপদের উপর বিপদ ঘটিল, শোভার একদিন হঠাৎ ভেদ বমি দেখা দিল—কিন্তু ভাগ্যের জোর এই যে অসুখ মারাত্মক হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই ডাক্তারের যত্নে সুফল ফলিল—শোভা ভাল হইয়া উঠিল; কিন্তু অন্য দিকে যে ক্ষতি হইল তাহা পূরণ হইবে এ আশা কাহারো মনেই স্থান পাইল না।

হাতের শেষ কন্দর্পকটি পর্য্যন্ত খরচ হইয়া গেল—ডাক্তার অনেক টাকা লইলেন।

তমালের আচরণে মনঃকষ্টের উপরও তীব্রতর হইয়া দেখা দিল এই সংকটটি যে তাহারই আচরণের দ্বারা পরিচিতের কাছে ঋণ চাহিতে দাঁড়াইবার মুখ আর নাই।—অনূঢ়া কন্যার বিবাহার্থে যে টাকা যেন যক্ষের জিম্মায় রাখা আছে, অনেক ভাবিয়া, অনেকবার আগাইয়া পিছাইয়া রাজীব তাহাতে হাত দিলেন— সে ভাঙিল। টাকা ভাঙা পড়িলে আর পূরণ হয় না—বিশেষতঃ তমালের মতো পুত্র যার, ভাঙা টাকা পূরণ করিবার উপায় তার ত্রিভুবনে নাই।

তবু তমালের কথা ভাবিয়া পিতামাতা অস্থির বোধ করিতেছেন এমন সময় যেন আঁধার আকাশে চাঁদ ফুটিল, মণিঅর্ডারে দশটি টাকা আসিয়া পড়িল।

পাঠাইয়াছে তমালকৃষ্ণ একেবারে জেলা-সহর হইতে। লিখিয়াছে, "চাকুরী পাইয়াছি। আপনাদের কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া অগ্রিম বেতন কিঞ্চিৎ চাহিয়া লইয়া এই টাকা পাঠাইলাম।" তারপর সে ভক্তিভরে মাতৃচরণে ও পিতৃচরণে "শত সহস্র" প্রণাম নিবেদন করিয়াছে।

প্রথম মুহূর্ত্তে নিরানন্দ গৃহে আনন্দের আলোক-তরঙ্গ খেলিতে লাগিল দেবতা পূজো পাইলেন।

কিন্তু রাজীব সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। সে কেমন প্রভু যে অপরিচিত লোককে অগ্রিম বেতন দিয়াছে। সমগ্র বেতনটিই অবশ্য দেয় নাই; বেতন তার কতই হইয়াছে যে, তার নিরাপদ ভগ্নাংশই দশ টাকা।

রাজীব ভাবিয়া কূলপাইলেন না; এবংসুদূরতম ও অসম্ভবতম অনেকদুর্ঘটনা কল্পনা করিয়াও তাঁহারই মাথায় বজ্রাঘাত যে আসন্ন হইয়াছে তাহা তিনি সন্দেহ করিতে পারিলেন না।

"জনকল্যাণ" নামক সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—রাজীবলোচনের অসংখ্য লোকের শুভেচ্ছা সহ এবং সসমারোহে বিদায় গ্রহণের সংবাদ একদিন তাহাতে বাহির হইয়াছিল। আরও একটি সংবাদ তাহারই স্তম্ভ অলংকৃত করিয়া আর একদিন বাহির হইল।

জনকল্যাণের সম্পাদক রাজীবের বন্ধু। রাজকর্ম্মচারী হিসাবে রাজীব তাঁহার উপকার করিতেন। কৃতজ্ঞ সম্পাদক এক কপি জনকল্যাণ রাজীবকে রীতিমত উপহার পাঠান। রাজীব তাহাতে প্রকাশিত সংবাদ কয়েকটি পড়েন; মুর্গীর চাষ, বেকার সমস্যা, সেকালের দেশ, পল্লীর দশা প্রভৃতি ছাপার ভুলে অবোধ্য প্রবন্ধগুলির উপর চোখ বুলাইয়া যান; প্রিয় কর্ম্মস্থলের বার্ত্তাবহ আর পুরাতন সঙ্গী হিসাবে "জনকল্যাণ" তাঁর নিঃসঙ্গ চিত্তকে একটু প্রফুল্ল করে।

করিতে করিতে একদিন সেই জনকল্যাণই একেবারে স্বপ্নাতীত যে সংবাদ বহন করিয়া আনিয়া অকস্মাৎ তাঁহার চোখের উপর তুলিয়া দিল সেই সংবাদটির

উপর হইতে রাজীব আর চোখ তুলিতে পারিলেন না। অসাড় দৃষ্টি নির্নিমেষ হইয়া রহিল। তারপর দৃষ্টির সম্মুখটা অন্ধকার হইয়া গেল, তারপর চক্ষু নিমীলিত হইয়া রহিল। তারপর চোখের কোণ বহিয়া জলের ধারা গড়াইতে লাগিল।

কিন্তু তখনও তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিতেছে সেই সংবাদটি।

"শোক-সংবাদ। আমরা অতীব দুঃখের সহিত এই শোক-সংবাদ প্রচার করিতেছি। অত্রস্থ মুনসেফী আদালতের অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুত রাজীবলোচন বসু মহাশয় আর ইহজগতে নাই। গত ১৬ই বৈশাখ তারিখে তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বসু মহাশয় ব্যক্তিগতভাবে আমাদের হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তাঁহার অভাব আমাদিগকে মর্ম্মাহত করিয়াছে। অবসর গ্রহণ করিবার পর হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। পরে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে। আরও শোচনীয় বিষয় এই যে, তিনি এক কপর্দ্দকও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিছু ঋণ আছে। কনিষ্ঠা কন্যাটি এখনও অনূঢ়া। তাঁহার শ্রাদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া তাঁহার পুত্র শ্রীমান তমালকৃষ্ণ এখানে আসিয়াছেন। আমরা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম যে, প্রসেস্-সার্ভারগণ, আমলাবর্গ, উকীল, মহুরী প্রভৃতি সচেষ্ট হইয়া পরলোকগত বসু মহাশয়ের শ্রাদ্ধের ব্যয়ের জন্য শতাধিক টাকা চাঁদা তুলিয়া শ্রীমান তমালকৃষ্ণের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই হৃদয়বত্তা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। আমরা বসু মহাশয়ের আত্মার পারলৌকিক শান্তি কামনা করি।"

তালিকায় নাম কাটা পড়ে নাই তখনও; কাগজ যথারীতি আসিয়াছে।

রাজীব অবশ হস্তে কাগজখানা বিছানার উপর নামাইয়া রাখিলেন। খাট ধরিয়া উঠিলেন, তখন তাঁর হাত দুখানা কাঁপিতেছে, নামিয়া দাঁড়াইলেন। তখন তার পা দুখানাও কাঁপিতে লাগিল। দেওয়াল ধরিয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন, তখন তাঁর হাত পা দেহ সবই কাঁপিতেছে···কাঁপিতে কাঁপিতে আবার ভিতরে গেলেন, শুইয়া পড়িলেন। যেন বিষের যন্ত্রণায় বিছানায় ছটফট করিতে লাগিলেন। অসুখ করিয়াছে বলিয়া জলস্পর্শ করিলেন না।

এবং বৈকালে তাঁর খবর লইতে যাইয়া তমালের মা দেখিলেন, তিনি ঘরে নাই —বিছানার উপর তাঁর লেখা একখানা চিঠি পড়িয়া আছে; তাহাতে লেখা রহিয়াছে—"ভগবান তোমাদের রক্ষা করুন। আমি চলিলাম। আমার খোঁজ করিও না।"

কর্ণধর পালের গমন ও আগমন

সাত-পুরুষের ভিটার মাটি এবং তার উপরকার বাস্তু-গৃহ মানুষের যে কত প্রিয় তার ঠিক নাই, বোধ হয় প্রাণের চাইতেও প্রিয় ; কাজেই উহাকে ত্যাগ করিয়া চিরদিনের মতো অন্যত্র চলিয়া যাওয়া হৃদয়বিদারক ব্যাপার সন্দেহ নাই। কষ্টটা এমনি সত্য যে, সত্য কিনা সন্দেহ করাই নির্ম্মমতা। কিন্তু পরম্পর শুনা গেল, এবং শুনিতে শুনিতে এবং পরে উদ্যোগ আয়োজন দেখিয়া ক্রমশঃ সন্দেহই রহিল না যে, কর্ণধর পাল তাহাই করিতেছে। কর্ণধর পাল বর্ত্তমানে মৃত্যুশয্যায় শায়িত রহিয়াছে, অর্থাৎ অন্তরের মায়া দিয়া, আর যেন দেহের নাড়ী দিয়াও পাকে পাকে বাঁধা, এবং সহস্র স্মৃতিমণ্ডিত গৃহকে সে মৃত্যুর ডাকে ছাড়িয়া যাইতেছে তাহা নহে। ব্যাপার অন্যরূপ, স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে সে মাটি সহ বাড়ী বিক্রয় করিয়াছে। কাহার কাছে সে বিক্রয় করিয়াছে তাহা অবশ্য জানা গেল না, কিন্তু সে বিক্রয় করিয়াছে ; এবং আরও জানা গেল যে বাড়ীখানাকে সে বেচিয়া ত' দিয়াছেই, আরো বেচিয়া দিয়াছে তার অস্থাবর সম্পত্তি যাহা-কিছু ছিল সবই, এমন কি মজুত মাল পর্য্যন্ত, অর্থাৎ হাঁড়ি, কলসী, সরা, মালসা, ঘট, গামলা, কুঁজো, কলুকে, হোলা, ঠিলে ইত্যাদি, আর চক্রখানা, যাহা কাঠিতে করিয়া ঘুরাইয়া সে ঐ সব বস্তু প্রস্তুত করিত।

লোকে আরো শুনিল এবং কেহ কেহ চোখেও দেখিল যে, কর্ণধর পাল বাঁধন ছিঁড়িবার কষ্টে চোখের জলে পুনঃ পুনঃ স্নান করিয়া উঠিতেছে।

কর্ণধর পাল অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তি।

তবু ইহা না বলিয়া দিলেও চলে যে, কর্ণধর পাল ধিক্কারে আর লজ্জায় অভিভূত হইয়া এবং অশ্রুধারায় পরিপূর্ণ হইয়া ঐ অসহ্য কাণ্ড করিয়াছে, সহজে করে নাই। এ দেশে আর সে থাকিবে না, মুখ দেখাইবে না ; অন্য দেশে চলিয়া যাইবে বলিয়া সে সংকল্প করিয়াছে। সংকল্প তার অটল বলিয়াই মনে হইল।

সন্তানাদি যার হয় নাই তার স্ত্রী-বিয়োগ যদি ঘটে তবে একা একা আর ভাল লাগে না বলিয়া বাড়ীতে কুলুপ লাগাইয়া আন্তরিক বৈরাগ্যসহ কিছুদিন তীর্থ পর্য্যটনে নিরুদ্দেশ হওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক, বিশেষতঃ মহাভারত যদি তার নিত্যপাঠ্য হয় ; কিন্তু সে ধরনের বিয়োগ-বেদনা কর্ণধর পালের সংসার-স্পৃহা বিলুপ্তির হেতু নহে।

কিম্বা ঋণের দায়, কিম্বা জমিদারের অত্যাচার তাহার কারণ নহে।

কারণটি বড়ই জটিল এবং আরো কঠিন।

কর্ণধর পালের বিধবা এবং অবশ্য যুবতী কন্যা, সুন্দরী রমণী, বৎসর দেড়েক হইল বিদেশী একটি যুবকের সঙ্গে পলায়ন করিয়াছে। তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, পুণ্যক্ষেত্র নবদ্বীপে পাওয়া যায় নাই, তীর্থ-শ্রেষ্ঠ কাশীধামে পাওয়া যায় নাই, রাজধানী কলিকাতায় পাওয়া যায় নাই। মেয়েটির জন্য কর্ণধর ধনে-প্রাণে গেল।

কর্ণধরের এখন ঐ একটি মাত্রই সন্তান, কন্যা। আগে ও পরে আরও দু' তিনটি সন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাহারা মনে দাগ কাটিয়া বসিবার পূর্ব্বেই, অর্থাৎ নাড়াচাড়ার সুখে এবং দেখি া দেখিয়া মমতা জন্মিয়া মনে চিরস্থায়ী হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই পরলোকগমন করায় নগণ্য হইয়া গেছে, টিকিয়া গেছে ঐ কন্যা, সর্ব্বনাশী কন্যা। কন্যা সর্ব্বনাশ ঘটাইবার পূর্ব্বে সে-ই ছিল একমাত্র বন্ধন।

কিন্তু বন্ধন যে ও-তরফ হইতে এমন শিথিল হইয়া আসিতেছে তাহা কে জানিত। সামান্য কয়েকটি মাস, আট-দশ মাসের বেশী নয় স্বামীগৃহে বাস করিবার পর কন্যাটি বিধবা হইয়া ফিরিয়া আসিল, সিন্দূর পরিয়া বাহির হইয়াছিল, সিন্দূর মুছিয়া ঢুকিল। সেই নিদারুণ প্রত্যাবর্ত্তনে কর্ণধর তার গভীরতম সম্বিতেও দুঃখিত হইয়াছিল কি না তাহা ঠিক করিয়া বলিতে সে নিজেই বোধহয় পারে না। কারণ ঐ কন্যাই যে তার একমাত্র বন্ধন। বিধবা কন্যাকে একেবারে যৌবনে মাছ-মাংসে আর শাঁখা সিন্দূরে বঞ্চিত হইয়া তপস্বিনীর বেশে অহরহ সম্মুখে দেখিয়া কর্ণধরের বুক ফাটিত, কি একমাত্র সন্তান অর্থাৎ সংসারের একমাত্র অবলম্বনকে ফিরিয়া পাইয়া সে স্বস্তি পাইয়াছিল তাহা লইয়া বাহিরে তর্ক করিবার উপায় নাই, তাহা কর্ণধরের পরমাত্মা জানে।

তারপর দিন যায়।

তারপর দিন একাদিক্রমে আরো গত হইতে হইতে মেয়ের শ্বশুরবাড়ীর দেশেরই একটি ছেলে আসিয়া স্বর্গগত জামাতার আত্মীয় পরিচয়ে দিন দুই আদরে-আপ্যায়নে থাকিবার পর, এবং বিস্তর সদাশয়তার পর, মেয়েটিকে লইয়া পলায়ন করিল ; দরিদ্র, নিরীহ ধর্ম্মভীরু, দেবদ্বিজে ও বৈষ্ণবে ভক্তিমান কর্ণধরের মুখে চুনকালি পড়িল ; গ্রামে হৈ হৈ উঠিল – ধর্ম্ম গেল।

এবং আরো যাহা ঘটিল তাহার বর্ণনা দেওয়া বোধ হয় অপরাধ হয় কিনা তাহা পরের বিবেচ্য।

কর্ণধর পাল লোকটি খুবই ভাল, নিরতিশয় গ্রাম্য , দেখিতে বেশ ছিমছাম, সামান্য গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া আর কোমরে কাপড় বাঁধিয়া সে কাঁচা এবং পোড়ান মৃৎপাত্রের স্তূপের ভিতরে এবং চাকার সম্মুখে বসিয়া থাকে , কিন্তু মনে হয়, কর্ণধর ধুইয়া মুছিয়া নিজেকে বেশ পরিপাটি করিয়া রাখিয়াছে, যেন কোনো ভদ্রস্থানে যাইবে।—চাকা তার হাতে ঘোরে খুব, আর তার হাতের গুণে মাটি যে আকার ধরে তা নিখুঁৎ।

ইহা ছাড়াও তার মন্দিরায় বেশ মিঠে হাত এবং এ ছাড়াও তার আর একটা গুণ, হাতেরই গুণ ; অসামান্য এক লোভনীয় গুণ এই যে বড় মিষ্টি করিয়া সে তামাক সাজে।

ব্রাহ্মণের হুঁকা সে তিন-চারিটি রাখে ; তিন চারিজন ব্রাহ্মণের একসঙ্গে পদার্পণ হইলেও তিন-চারিজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গেই সে নিযুক্ত রাখিতে পারে।

ইহা ব্যতীত. কর্ণধরের মনটি সাদা, প্যাঁচ সে জানে না। অতএব গ্রামের সে প্রিয়পাত্র। তাহার, অর্থাৎ মৃদুস্বভাব সেবাপরায়ণ ভালোমানুষটির কন্যার অকাল বৈধব্যে তাহার, অর্থাৎ বিধবা কন্যার পিতার বুকের বেদনার অনুকম্পন সেদিন গ্রামের বুকে বিদ্যুৎগতিতে ছড়াইয়া গিয়াছিল। যে মানুষটি বাঁচিয়া

থাকিলে বিবাহিতা নারীর ভঙ্গুর দেহ হইতে অমর আত্মা পর্যন্ত চমৎকার রসসামগ্রীর অক্ষয় জোগান পাইতে থাকে তাহার, এক কথায় স্বামীর মৃত্যুতে কন্যার ছটফটানি দেখিয়া শোকাহত কর্ণধরও মাটিতে, তার চাকার ধারে, উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল।

কর্ণধরের হিতৈষিগণ, দরদীবর্গ এবং অনুরাগী সবাই, যুবা বৃদ্ধ দুই রকমই কর্ণধরকে মাটির উপর হইতে টানিয়া তুলিতে দৌড়িয়া আসিয়াছিল। এবং সেই অবসরে অনেকেরই, যুবা বৃদ্ধ দুই রকমেরই, চোখে পড়িয়াছিল যে, কর্ণধরের কন্যা দেবীদাসী অপরূপ রূপ-প্রাচুর্য এবং যৌবনোন্দামতা সঞ্চয় করিয়াছে।

তারপর সূর্যের উদয়াস্তের নিয়মে ঘটনায় ঘটনায় সময়ের ব্যবধানের বৃদ্ধি এবং শোকের ক্ষয় হইতে হইতে দেবীদাসী কান্নাটা ভুলিয়া কেবল দু'চারি গ্রাস সুখহীন নিরামিষ ভাত লোকের কথায় মুখে দিতে সুরু করিয়াছে, এবং কর্ণধর তামাক সাজিয়া পূর্ব্ববৎ আন্তরিকতার সহিত ব্রাহ্মণ-সৎকার করিতে লাগিয়াছে এমন সময় একদিন সকালবেলা উঠিয়া দেবীদাসীকে ঘরে কিম্বা ঘরের বাহিরে গ্রামে কোথাও পাওয়া গেল না।

কর্ণধর লোকটি অত্যন্ত সরল প্রকৃতির এবং অতিরিক্ত স্নেহপরায়ণ বলিয়া ছুটাছুটি করিল প্রয়োজনের বেশী এবং মানুষকে জিজ্ঞাসা করিল নির্বিচারে, সেই কারণে কথাটা দু'চার মিনিটেই গ্রামময় জানাজানি হইয়া গেল।

লোকে ভীড় করিয়া আসিল।

ভীড়ের ভিতর চন্দ্রশেখর দত্ত (৫৫) বলিলেন, আমাদের দিনে এ-সব ছিল না ; জীবনে কখনো দেখি নাই। বলিয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তী ভূপতিভূষণ রায়কে লুকাইয়া একটি নিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

সকলেই সেই কথাই বলিল,—অননুমোদনের কথা।

যুবা, বৃদ্ধ, দুইরকমের লোকই, সমস্বরে বলিল, ভারি কলঙ্কের কথা ইহা, যারপর নাই ঘৃণ্য কথা, একেবারে ন্যক্কারজনক ব্যাপার।

শুনিয়া কর্ণধর পাল মাটির ভিতর হইতে আরো মুখ তুলিতে পারিল না।

তখন তাহ'কে সকলে মিলিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন ; অগ্রণী যুধিষ্ঠির গোস্বামী বলিলেন, তোর অপরাধ ত' কিছু নাই কর্ণ ; তোকে আমরা দোষছি নে ; তোকে আমরা এখনো শ্রদ্ধা করি, ধার্ম্মিক আর বুদ্ধিমান বলে ; কিন্তু এ-কথাও সত্যি যে, তোর একটা দায়িত্ব ছিল ; সাবধান হওয়া তোর উচিত ছিল।

ত্রিপুরেশ্বর চক্রবর্ত্তী (৫৭) বলিলেন—অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাস দেয়ঃ ন কস্যচিৎ।

শুনিয়া কথাগুলিকে ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত মনে করিয়া কর্ণধর মাটির ভিতর হইতে মুখ তুলিল ; এবং ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া দর্শকগণের পায়ের উপর সর্ব্বাঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া লুটাইতে লাগিল, তখন তাহার অর্থাৎ কুলত্যাগিনী কন্যার পিতার, মর্ম্মবেদনার অনুকম্পন তাঁহাদের বুকেও প্রবাহিত হইতে লাগিল।

যুধিষ্ঠির গোস্বামী কৃপাবশতঃ, এবং শুশ্রূষার ভঙ্গীতে, তাহাকে তুলিয়া বসাইলেন।

কিন্তু বিশেষ কিছু করিবার নাই, বিশেষ কিছু বলিবারও নাই ; ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চতর জাত্যন্তর্গত ব্যক্তিগণ কুম্ভকারকে সামাজিকভাবে সুতরাং অক্লুরন্ত করিয়া, কি বলিবেন !

সকলে চলিয়া আসিলেন।

বৃদ্ধেরা আসিয়া বসিলেন উপেন সান্যালের বৈঠকখানায়, যুবকেরা গিয়া উঠিল শ্রীশ অধিকারীর দোকানে।

মেয়েরাও অবশ্য ব্যাপারটা শুনিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহারা কাহারও বৈঠকখানায় সমবেত হইলেন না, নিজের নিজের ঘরেই চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন।

কিন্তু পুরুষের স্নায়ু শক্ত বেশী, শীঘ্র চমকায় না, আর গাল দে'য়া ছাড়া তাঁরা আরো অনেক জানেন ; সুতরাং তাঁহারা শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষি হইতে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত এবং তথা হইতে আধুনিকতম কথাসাহিত্যের গতিতে অবতরণ করিলেন।

বিস্তর বকিয়া তারপর এক সময় তাঁরা নিঃশব্দ হইয়া গেলেন।

কি একটা অশান্ত অভাববোধ আর তৃষ্ণার দাহ সবারই প্রাণে মূর্চ্ছিত অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল তাহা তাঁহারা বোধহয় জানিতেন না ; কিন্তু এই সূত্রে তাহারই পীবর অথচ খিন্ন একটা চেতনা যেন অনুভব করিতে লাগিলেন। যাহার দরুণ ক্রমে সকলেরই মনে হইল উহাদের ভালবাসার কথাটা, সকলেরই মনে হইল, উহাদের ভালবাসা নিশ্চয়ই খুব গভীর ; অপরাধ করিয়াছে বটে ; অপরাধ অমার্জনীয় বটে, কিন্তু কত ভাসবাসে !

বৃদ্ধের দলের পীতাম্বর কবিরাজ (৫১) চুপ করিয়া থাকিতে থাকিতে বলিয়া উঠিলেন,—পরিণামে কষ্ট পাবে।

এদিকে যুবাদের দলের সূর্য কুশারী বলিল, এ আকর্ষণ নিরোধ করা অসম্ভব।

কথাটা যুবকেরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল, স্বীকার না করিয়া তাদের উপায়ই নাই ; কারণ "পঙ্কের পথে"র কবি সূর্য কুশারী চুল অকারণে বড় রাখিয়া কেবল কবি সাজিয়া বসিয়া নাই—"বাজারে" যথার্থই তার কবিখ্যাতি আছে ; সে নিজে অবশ্য উদ্বাহু হইয়া জানায় নাই, তবু ধরা পড়িয়া গেছে যে, মানুষের গভীরতম এবং আকুলতম আকাঙ্ক্ষার সন্ধান সে রাখে। কুশারী আবার বিদ্রোহী —সে বিদ্রোহ দূষণীয় কিছু নয়, সৃষ্টিশীল মনের আকুতি ; সকলেই জানে, সে বিদ্রোহ চঞ্চল নয়, উদ্দীপ্ত নয়, অসহিষ্ণু নয়, পরন্তু পরিণত, সংহত, স্বল্পভাষ এবং গভীর। কুশারীর ভক্তেরা আরো স্বীকার করে যে, পরিপূর্ণতম বস্তুর প্রতি তার লোভ অসীম—নিজস্বকরণের লোভ নহে, বৈষ্ণব কবির মতো সেই উদ্দেশে ধ্যানী হইয়া কাব্য রচনার লোভ।

সে যাহাই হউক, কুশারীর ধারণা ঐ, তাহা সে অবাধে অকপটে প্রকাশ করিল ; এবং দেখা গেল, অথবা সঙ্গোপনে অন্তর্যামী জানিলেন, তাহার সঙ্গে মতভেদ কাহারও নাই।

ভালবাসা বাস্তবিকই দুর্লভ, অত্যন্ত দুর্লভ, আর সহজে প্রকট নয় ; এবং এত লোভের জিনিস যে, লোভ দমন করিতে না পারিয়া লোকে নাকাল হইয়া যাইতেছে।

ভালবাসা পাইলে প্রত্যাখ্যান করিবার কথা ভদ্রলোকেরা যতই ভাবুন, জীবন-দেবতা তাহাকে ঠেলিতে পারেন না। ধ্বনির প্রতিধ্বনি জাগিবে না, অথবা বাতাস উঠিলে জলে ঢেউ উঠিবে না, ব্যবস্থা-প্রণয়ন দ্বারা যেমন তাহা ঘটান যায় না তেমনি তা অনিবার্য্য।

মোটের উপর লক্ষণ দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, দেবীদাসীর শ্বশুরবাড়ীর দেশের সেই লোকটা আসিয়া না পড়িলে. এবং তৎপূর্ব্বে ইহা জানিতে পারিলে যে, দেবীদাসী ভালবাসিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে তবে গ্রামেই কিছু ঘটিত।

বৃদ্ধেরা জিহ্বা এবং হস্তপদাদির সাহায্যে বিস্তর আস্ফালন করিলেন; ছেলে-গুলির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে বলিয়া সংকল্প করিলেন, কারণ, "দেশের হাওয়া বিপরীত"!

উদ্দেশ্য সাধু, কথাও মূল্যবান।

কিন্তু মাঝখানে হঠাৎ একটা উল্টো কথা বলিয়া বসিলেন পুরুষোত্তম বাগ্‌চি (৬৩); তিনি বলিলেন, আমাদের কিন্তু এস বলে কেউ কোনোদিন ডাকে নাই। কেন কে জানে! থোর বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোর বলিয়া তিনি উঠিলেন।

পুরুষোত্তমের ঐ অসংযত ও অসঙ্গত উক্তি শুনিয়া উপস্থিত সকলে প্রথমে যেন মানে না বুঝিয়াই উচ্চহাস্য করিলেন; তারপর হুঁস্ হইল যে, কথাটা খারাপ; তখন সকলে তাঁহাকে ধিক্কার দিলেন।

কন্যাই গেল, সুতরাং বাড়ী দিয়া কি হইবে? গাভীর দুগ্ধ কে খাইবে? বাবা বলিয়া কে ডাকিবে? বলিবে, বাবা, চান করো, বেলা ঢের হয়েছে? কেহ তাহা বলিবে না। তবে সংসারে আর রহিল কি? সে-ই বা রহিবে কাহার জন্য?

অতএব কর্ণধর পাল তল্পী বাঁধিল। কোথায় যাইতেছে বলিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানের কথা সে কাহাকেও বলিল না।

তীর্থস্থান, অতএব তাপিতের আশ্রয়, নবদ্বীপ কি কাশী কিম্বা প্রসিদ্ধ স্থান কলিকাতা, ইহার মধ্যে কোন স্থানে সে যাইতেছে তাহা জানা গেল না।

জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, এ পোড়া মুখ যেখানে হোক গুঁজে থাকব, গাছে হাঁড়ি টাঙাতে চললাম বলিয়া কাঁদিয়া ভাসাইল।

বিদায়কালে সে ব্রাহ্মণগণের পদধূলি লইল যত, চোখের জল ফেলিল তত; এবং চোখের জলে আর পায়ের ধূলায় মাখামাখি করিয়া এমন একটা করুণ-কঠিন হিতে বিপরীত কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল যে, সূর্য্য কুশারী সেই আবহাওয়ার প্রভাবে পড়িয়া দুর্জ্জয় প্রেম-সংক্রান্ত একটি অশ্রু-করুণ কবিতা তখনই লিখিয়া আনিল, নিজেই আবিষ্ট হইয়া নিরতিশয় মন্ত্রমুগ্ধের মতো লেখা বলিয়া ছেলেরা অনেকে তাহা মৃদুগুঞ্জনে আবৃত্তি না করিয়া ছাড়িল না।

ত্রিপুরেশ্বর চক্রবর্ত্তী তল্পী-ঘাড়ে কর্ণধরকে সান্ত্বনা দিতে দিতে গ্রামের বাহিরে রাস্তায় তুলিয়া দিয়া আসিলেন।

কর্ণধরের বাড়ী এখন পড়ো বাড়ী, চাল বেড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কর্ণধর সুদূরে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া এই গৃহের কথা স্মরণ করিয়া বোধহয় নিঃশ্বাস

ফেলিতেছে, আর নিঃশ্বাসের সঙ্গে নীরব অশ্রুপাতও করিতেছে, কিন্তু গ্রামের লোক তাহাকে এই অল্প দিনেই ভুলিয়া গেছে।

মরমী সূর্য্য কুশারী কথাটা, কর্ণধরের কথা নয়, তার মেয়ের কথা তুলিয়া মাঝে মাঝে মুক্তি-ধারার বন্দনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তাঁর নিজস্ব গতির ঝর্ণা, স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা আর দোলন ছন্দে, ভাবময় পারিপার্শ্বিককে তার শব্দ-তরঙ্গ বাজিতে থাকে, মুক্তার মতো সমুজ্জল শব্দমালা বাহির হইতে থাকে, মর্ম্মরিত ঘন নিঃশ্বাসে যবনিকা দুলিতে থাকে।

নিজের এই ব্যাখ্যা সূর্য্য কুশারী আজকাল করে।

তা ছাড়া সাধারণ লোকের কর্ণধরের কথা মনে নাই, এমন সময় দেখা গেল, কর্ণধরের সেই পড়ো বাড়ীর সম্মুখে ইট পড়িতেছে; একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক মজুরের উপর কর্তৃত্ব আর কাজের বিলি-ব্যবস্থা করিতেছেন।

চিন্তামণি ভিষকরত্নের প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোকটি পরিচয় দিলেন যে, তিনি মহাদেবগঞ্জের জমিদার শ্রীযুত সমরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী মহাশয়ের কর্ম্মচারী; এই বাড়ী তিনি, সমরেন্দ্রনারায়ণ, প্রস্তুত করাইতেছেন; ইট তাঁরই।

মহাদেবগঞ্জ কোন জিলার অন্তর্গত?

সমরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরীর কর্ম্মচারী জানাইলেন যে, মহাদেবগঞ্জ রাজসাহী জিলার পুরন্দরপুর পুলিশ ষ্টেশনের অধীন একটি বিশেষ স্থান। যে প্রাচীন জমিদারবংশ রাজসাহী জিলাকেই অলঙ্কৃত করিতেছে তাহা ঐ মহাদেব-গঞ্জেরই জমিদারবাবু সিংহ চৌধুরী উপাধিক। মহাদেবগঞ্জেই তাঁহাদের সদর কাছারি। যে মহাদেবগঞ্জ কাঁচাগোল্লার জন্য বিখ্যাত সে ঐ মহাদেবগঞ্জই। সমরেন্দ্রবাবু এই বাড়ী ক্রয় করিয়াছেন; এক্ষণে ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করাইবেন।

ঐ কথায় গ্রামে একটা আন্দোলন সুরু হওয়া বিচিত্র নয়। কোথায় জিলা রাজসাহী, আর তার ভিতর কোথায় সেই পুরন্দরপুর পুলিশ ষ্টেশনের অধীন মহাদেবগঞ্জ। ওরা আছে বলিয়া স্বপ্নেও কেউ জানে না।

তারিণীশঙ্কর গুপ্ত (১৯) যতদূর সম্ভব অনুমান করিয়াও কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, তারিণীশঙ্কর হাল ছাড়িয়া দিতেই সবাই শিথিল হইয়া গেলেন, কর্ণধর পাল কর্তৃক বাড়ী বিক্রয় ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল সমস্যায় দাঁড়াইয়া গেল।

তারিণীশঙ্কর তারপরও আরো খানিক ভাবিয়া শেষ পর্য্যন্ত ইহাই সন্দেহ করিলেন যে, কয়েক হাত ঘুরিয়া যদি মহাদেবগঞ্জের জমিদারের হাতে পড়িয়া থাকে।

তাহাই সম্ভব।

কিন্তু কর্ণধর কিছুই প্রকাশ করে নাই কেন? যেন, গোপনে সে কাজটা করিয়াছে, কেন? এখানে সে খরিদ্দার খোঁজে নাই, পীড়াপীড়ি করিয়া জানিতে চাহিলেও সে এড়াইয়া যাইত, কখনো কখনো হঠাৎ এমন কাশিতে সুরু করিত যে মনে হইত, তার দমবন্ধ হইয়া আসিতেছে।

ব্যাপার আশ্চর্য্য।

অভাবনীয় কল্পনাশক্তি এবং অপরিমেয় অন্তর্দৃষ্টিসহ সজল সুন্দর অভিমানের

মালিক হইয়াও সূর্য্য কুশারীও অভ্রান্ত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না।

জমিদারের কর্ম্মচারী আশুবাবু, লোকটি অত্যন্ত অমায়িক; লোকের অকারণ ঔৎসুক্যে বিরক্ত না হইয়া জানাইলেন যে, এই বাড়ী প্রস্তুত করাইবার ভার তাঁহার উপর পড়িয়াছে; ইহা ছাড়া উদ্বেগনিবারক আর কিছু তিনি অবগত নন; ক্রয়-বিক্রয় তাঁর অসাক্ষাতে কোথায় ঘটিয়াছিল জানেন না। পথের লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াই তিনি এই দূরবর্ত্তী গ্রামের এবং পতিত বাড়ীর সন্ধান পাইয়াছেন।

ইহাতেও হতাশ না হইয়া তারিণীশঙ্কর প্রমুখ কয়েকজন কয়েকদিন ধরিয়াই আরো চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং সেই অবসরে আরও ইট আসিল, মাটি খুঁড়িয়া ভিত্তি প্রস্তুত হইল।

ইষ্টকালয় উঠিতে লাগিল।

তাহার সহিত আরো যাহা উপরের দিকে উঠিতে লাগিল তাহা হইতেছে গ্রামের লোকের চোখ; এবং সেই ঊর্ধ্বায়িত চোখের সম্মুখে দিন দিন বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া উঠিতে লাগিলেন খ্যাতনামা মহাদেবগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার সমরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী।

বাসব বোস হঠাৎ একদিন বলিল, শুনেছি, লোকটা কোটিপতি।

ক্ষুদিরাম পাঠক বলিলেন, হ্যাঁঃ! কোটিপতি!

কিন্তু বাসব বোসু পিছাইল না, সে কলকাতায় চাকরী করে; বলিল, ইণ্টার প্রভিনশ্যাল ব্যাঙ্কের ছোট ম্যানেজার বললে তাই। ছ'টা যে রেসের ঘোড়া তার আছে তারই দাম দেড় লাখ ক'রে আঠার লাখ।

—দেড় লাখ একটার দাম হ'লে ছ'টার দাম হয় বুঝি আঠার লাখ! পণ্ডিত! তিনি কোটিপতি ঐ হিসেবে নাকি?

আর যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল সবাই হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু সে হাসিতে পথ আটকাইল না, কথাটা চলিতে চলিতে "লোকটা" প্রায় কোটিপতিতেই দাঁড়াইয়া গেল!

শুনিয়া সূর্য্য কুশরী পুলকিত হইল; লোকটা সুশিক্ষিত নিশ্চয়ই; কবিতাও নিশ্চয়ই বোঝে; গ্রামে বাস করিয়া সুখ পাওয়া যাইবে।

কাশীশ্বর বাঁড়ুয্যে কোথা হইতে শুনিয়া আসিলেন লোকটা নাকি খুবই দানশীল। তার দানের হাত বন্ধ করিতে একজন জবরদস্ত সাহেব ম্যানেজার রাখিতে হইয়াছে।

রাইরমণ গুহ জানিতে চাহিলেন, কে রেখেছে?

—সেই বাবুর মা। আবার কে?

—সায়েব ত' এখানেও আসবে।

হরিপদ সান্ন্যাল বলিলেন, না-ও আসতে পারে, আবার আসতেও পারে।

যে সাহেবকে বাবুর দানের হাত বন্ধ করিতে নিযুক্ত করা হইয়াছে সেই সাহেব বাবুর দানের হাত বন্ধ রাখিতে এখানেও আসিতে পারে শুনিয়া কাশীশ্বর বাঁড়ুয্যে দোটানার মধ্যে পড়িয়া বিমনা হইয়া গেলেন।

মহিম মিশ্র বলিলেন, খুব পর্দ্দানশীন পরিবার নিয়েই আসবে। পাঁচিল ত' আকাশে পৌঁছল গিয়ে।

সূর্য্য কুশারী সেখানে ছিল ; বলিল, হ্যাঁ, খুবই উঁচু হচ্ছে। বলিয়া মাঝখান হইতে সে খানিক নিরাশ হইয়া গেল।

বাড়ী প্রস্তুত নিরাপদে সমাপ্ত হইয়াছে। পর্দ্দাহীন অর্থাৎ বেপরোয়া বাড়ী এবং হিন্দুপরিবারের উপযোগী পর্দ্দানশীন অর্থাৎ চোখ-লুকান বাড়ী, এই দুই রকমের বাড়ীর মাঝামাঝি কায়দায় বাড়ী অতি চমৎকারই হইল, লোকে বুঝিল, বাবু স্বয়ং বিলাতি ধরনের, উদারচরিত ; কিন্তু অন্তঃপুরে যাঁরা বাস করেন তাঁরা দেশী ধাতের ; আড়াল চাহেন। নীচের তলাটা দরাজ উন্মুক্ত, উপরটা আব্রুতে অন্ধকার না হইলেও এমন কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে যে ; বাহির হইতে কিছুই লক্ষ্য করিবার উপায় নাই। সূর্য্য কুশারী সেই দিকে তাকাইয়া চুপ হইয়া গেল।

যাহা হউক, বাড়ী শেষ হইল।

দরজায়, জানালায়, কড়ি-বর্গায়, রঙে, বার্ণিশে, ঘুলঘুলিতে, সার্শিতে, চৌবাচ্চায়, ইঁদারায়, হেঁসেলে, গোসলখানায় তাহা দেখিতে হইল যেমন মনোরম, তাহাতে বাসের সুবিধা হইলও তেমনি।

তারিণীশঙ্কর গুপ্ত ভিতরটা দেখিয়া আসিয়া বলিলেন,—বৈজ্ঞানিক বাড়ী হয়েছে। যেমন প্রচুর স্থান তেমনি সজ্জা।

কাশীশ্বর বাঁড়ুয্যে বলিলেন, টাকায় সব হয়। বুদ্ধি খোলে আগে।

তারপর আসিল খাট, পালঙ্ক, গদি, বালিশ, আয়না, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি, সবই নূতন, সবই সুদৃশ্য, সবই মার্জ্জিত।

তারপর দেখা গেল সুবৃহৎ একটা টেবিল হারমোনিয়ামও আসিল এবং দ্বিতলে উঠিয়া গেল।

তারিণীশঙ্কর গুপ্ত বলিলেন, ধনী পরিবারের মধ্যে নাচ-গানের খুব প্রচলন হয়েছে। এঁরাও গানটান গাইবেন।

শিবকুমার আচার্য্য বলিলেন, নাচের কথা বললে, নাচেরও।

—ত' হয়েছে বৈ কি।

—তোমার সব আজগুবি কথা ; যত মিথ্যে খবর পাওয়া যাবে তোমার কাছে। ঘুঙুর পায়ে দেয় ?

—তা জানি নে।

—ওদিকে মানুষ আকাশে উড়ছে, এদিকে নাচছে গাইছে ভদ্রলোকের মেয়েরা, আমাদের তা হ'লে বায়ু মৃত্তিকা দুই পথই বন্ধ ?

হ্যাঁ ; অত না হোক, চোখ-কান বন্ধ ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে থাকতে হবে।

ওঁরা কুদৃশ্য দেখিবার ও অশ্রাব্য শুনিবার সম্ভাবনায় চোখ-কান আগে-ভাগে বন্ধ করেন নাই ; সুতরাং একদিন প্রাতঃকালেই দেখিতে পাইলেন, সেই নূতন বাড়ীটার দরজার তালা খুলিয়া কাহারা যেন তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।

আরও টের পাইলেন, সেখানে শব্দজাত সজীবতার অন্ত নাই।

যাহারা আসিয়াছে এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে সেই মানুষগুলিকে তখনই চোখে দেখা গেল না, কিন্তু মানুষগুলির নমুনাস্বরূপ যাহাকে বাহিরে, ভিতরে

প্রবেশের ফটকের ধারে, দেখা গেল, এৎমামপুর অবাক হইয়া গেল সর্ব্বপ্রথম তাহাকে দেখিয়াই।

কাশীশ্বর বাঁড়ুয্যের কোটিপতি বাবুটির সঙ্গে দেখা করিবার আন্তরিক ইচ্ছা, প্রয়োজনই ছিল, কিন্তু এই খোট্টা দ্বারবানকে দ্বারে দেখিয়াই কাশীশ্বরের মনে হইল, বাবু দুর্গম দুর্গে বাস করিতে আসিয়াছেন। এই প্রহরীকে ঠেলিয়া বাবুর কাছাকাছি যাওয়া ত' দূরের কথা, ইহার কাছে ঘেঁষা দুষ্কর, এই পর্ব্বতকে মুখের কথায় বা গায়ের জোরে টলান এৎমামপুরের কম্ম' নয়।

বাস্তবিকই, অতবড় মানুষ অনেকেই দেখে নাই, অতখানি লম্বা, আর অতখানি চওড়া, অতখানি ছাতি, আর অতখানি গর্দ্দান! হাঁটু দু'টাই হাতীর দুটা মাথার মতো আকারে আওয়াজে সে এক তাণ্ডবতুফান ব্যাপার?

কাশীশ্বর চমকিয়া উঠিলেন; তারপর রটাইয়া দিলেন যে, মহাদেবগঞ্জের কাঁচাগোল্লা বিখ্যাত হউক আর না হউক, জমিদার যে প্রবল প্রতাপান্বিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, যার আছে সে নির্ব্বোধ; সে গিয়া দেখিয়া আসুক ঐ লোকটাকে, ঐরাবতের মতো প্রকাণ্ড, আর বিক্রমে সিংহ ঐ লোকটাকে।

জমিদারবাবু প্রবেশদ্বারে গিরি গোবর্দ্ধন রাখিয়া দিয়াছেন, নড়ায় কার সাধ্য।

শুনিয়া তামাসা দেখিতে লোক ছুটিল; সেদিকে স্পষ্ট কেহ তাকাইল না, গোবেচারীর মতো আড়চোখে তাহাকে দেখিল, ভিতরের ব্যস্ততার একটু আভাস পাইল, এবং দোতালার ঘরে মানুষের কণ্ঠস্বর অল্পস্বল্প শুনিতে পাইল, অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত সেই স্থানটা অতিক্রম করিতে হইল বলিয়া দোতালার ঘরের কণ্ঠস্বরে স্ত্রীকণ্ঠ মিশ্রিত ছিল কিনা তাহা নিঃসংশয়ে ধরা গেল না।

সূর্য্য কুশারী কবিতা ফাঁদিতেছিল; সে সূক্ষ্ম-দ্রষ্টা এবং ততোধিক সূক্ষ্ম-স্রষ্টা, উর্ব্বশীর পরিপূর্ণ সমগ্র তনুর চাইতে অদৃশ্য চরণের নূপুর নিক্কণ শুনা যাইতেছে এই কল্পনা তার ভাল লাগে।

অন্তঃপুরের একেবারে সম্মুখে ঐ সুবৃহৎ রূঢ়তা দেখিয়া তার কবিতার শেষার্দ্ধ মাটি এবং কলালক্ষ্মীর অনবদ্য প্রাতঃচেতনাই বৃথা হইয়া গেল, কর্কশ স্থূল আবরণ উপরে থাকে বলিয়া কুশারী-কবি নারিকেল খাওয়া ত্যাগ করিয়াছে, ফুলের পাঁপড়িতে কবিতার বই ছাপান যায় কিনা তাহাই সে চিন্তা করে, সুতরাং অন্তঃপুরের সম্মুখে দ্বারোয়ান রাখায় বিদ্রোহ ত' সে করিবেই, এ কি গদ্যের অরাজক যুগ না কি? না, এটা পুরাণো, পচা, ভাপ্‌সো, নেহাৎ অন্যায়, হাবসী-হারেমের যুগ? ভাবে রূপে এই দ্বন্দ্ব এখনো কি সহ্য করে লোকে? জমিদারবাবু মনে করিয়াছেন কি!

সূর্য্য কুশারী মনে মনে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

এবং গুণাকর দে দ্বারোয়ানের নাম রাখিল গিরিরাজ।

গোধূলির প্রফুল্ল লগ্নে সমরেন্দ্রনারায়ণ বহিঃভ্রমণে নির্গত হইলেন, সমগ্র এৎমামপুর সেই কোটিপতির দর্শন পাইল।

কিন্তু শিবের সঙ্গে ভূতের মতো বাবুর সঙ্গে সেই দুরতিক্রম্য 'গিরিরাজ', হাতে তার পাঁচ হাত লম্বা বাঁশের লাঠি, তেল মুছিয়া কাঁধে ফেলিয়াছে, আর লগ্নের সঙ্গে

ও প্রভুর সঙ্গে একেবারেই, কবিতার গদ্যাত্মক পদের মতো আর ফাল্গুনের মেঘের মতো, একেবারেই বেখাপ্পা হইয়া সে পশ্চাতে চলিয়াছে।

সবাই দেখিল, বাবুর শরীর ভদ্রলোকের মতো দোহারা, বর্ণ উজ্জ্বল; পোষাকে অলৌকিক সমারোহ কিছু নাই; বয়স আটত্রিশ হইবে, তারিণীশংকর ঐরূপ অনুমান করিলেন, বাবু নিজে বিন্দুমাত্র ভয়ংকর নন, কিন্তু তাঁর পশ্চাতের ঐ দানবটা যেন প্রচণ্ড একটা ধমক।

সমরেন্দ্রনারায়ণ যখন বাড়ীর বাহিরে রাস্তায় নামিয়াছেন তখন পল্লীবাসিগণের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়াই বাঞ্ছনীয় না হোক অনিবার্য্য বটে। সমরেন্দ্রনারায়ণ নিঃশব্দে আর গম্ভীরভাবে পথ চলিতেছেন, আপামর লোকে চিনিল, ইনিই তিনি যিনি ঐ অট্টালিকার মালিক, মানুষের দুষমন ঐ দ্বারবানের প্রভু, আর মহাদেবগঞ্জ তথা রাজসাহী জিলার অলংকার, যাঁর মাতাঠাকুরাণী ছেলের সাহেব অভিভাবক রাখিয়াছেন, এবং যাঁর মনটি টাকা দান করিয়া করিয়া ফকির হইবার দিকেই প্রাণপণে ঝুঁকিয়া আছে, কিন্তু সাহেব হাত ধরিয়া আছে বলিয়া ফকির হওয়া ঘটিতেছে না।

"বাড়ীতে খবর দে গে", বলিয়া পুরুষেরা ছেলেমেয়ের দ্বারা ভিতরে খবর পাঠাইলেন, মেয়েরা জানালা বা দরজা একটু খানি ফাঁক করিয়া তাঁহাকে দেখিলেন।

কাশীশ্বর বাঁড়ুয্যের অভিসারিকা প্রাণ তৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিল।

শত হস্ত দূর হইতে সূর্য্য কুশারী দুই হস্তের আঙুলগুলি মাত্র ভারতীয় পদ্ধতিতে যুক্ত করিয়া অতি সুকুমার এবং অতি পরিচ্ছন্ন একটি নমস্কার নিবেদন করিল; কিন্তু কোনো দিকেই দৃষ্টি নাই বলিয়া সমরেন্দ্রের তাহা চোখে পড়িল না।

তারিণীশংকর গুপ্ত অনুমান করিলেন যে, বাবুর বুদ্ধি চপল নয়।

নদীর ধারে ফাঁকা হাওয়ায় খানিক ভ্রমণ করিয়া সমরেন্দ্র গৃহে ফিরিলেন, পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দে এবং গম্ভীরভাবে এবং শালপাংশু বর্ব্বরটাকে সঙ্গে লইয়া।

কেহ তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে অগ্রসর হইলেন না; কিন্তু কাশীশ্বর প্রভৃতি সুজনবর্গ লক্ষ্য করিয়া রাখিলেন, ঐ নদীর ধারেই উঁহাকে ধরিতে হইবে।

সূর্য্য কুশারী কি অভিনব কল্পনা করিল কে জানে! তাহার দ্বিতীয় কবিতা গ্রন্থখানা, "ধরণীর ধূলা", যাহা আর্টিষ্টিক শক্তিতে, প্রকাশের লীলায় এবং ব্যঞ্জনার বিশালতায় আরো সুন্দর হইয়াছে, তাহাকে প্রকাশকগণ ফেরৎ দেওয়া অবধি সে ব্যথিত হইয়াছিল, হঠাৎ সে নিখুঁৎ করিয়া চুল বাগাইল, দাড়ি আঁচড়াইল। বৈদিক ঋষিগণের অনুকরণে সে চুল দাড়ি গোঁফ বাড়াইয়া তুলিয়াছে, এদিকে ঐ; ওদিকে সে লরেন্সের অত্যন্ত সমর্থ অনুরাগী; অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে য়ুরোপীয় আধুনিকতম চিন্তাধারার মিলন সে আকাঙ্ক্ষা করে, সমরেন্দ্রকে তাহা স্বীয়রূপে এবং বাক্যের ভাবে বুঝিতে দিতে হইবে।

সেটা পরের কথা; আপাততঃ সেই দিনই সন্ধ্যার পর সূর্য্য কুশারীর একদিককার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, সমরেন্দ্রের গৃহে অর্গ্যান-টিউন সুরযন্ত্রের সুরের সংগে নারীকণ্ঠ মিশ্রিত হইয়া চির-সুন্দরের দিকে ধাবিত হইল।

সূর্য্য কুশারীর স্বতঃই মনে হইল, ঐ সুর যেন চঞ্চলপক্ষ চকোর, তৃষিত সে, আর সে অন্য কোনোখানের দিকে ছুটিয়াছে।

তার আরো মনে হইল, ঐ সুর একটা অশরীরী সৃষ্টি, একটা অতীন্দ্রিয় শক্তি, একটা অব্যক্ত অব্যাখ্যাত ইচ্ছা, একটা ক্লান্ত নিভৃত আত্মা, ঐ সুর কানে কানে শুনিবার জন্য সমস্ত আকাশ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করিয়া আছে ; এবং ঐ সুর শুনিতে শুনিতে নক্ষত্র সভার অশ্রান্ত হৃদয় কম্পন থামিতে চাহে না।

আরো আনন্দের কথা এই যে, সমরেন্দ্রের সঙ্গে কাশীশ্বর প্রভৃতির বাচনিক আলাপ না হইয়া গেল না, গিরিরাজকে ডিঙাইয়া হইল।

নদীতীরে ও'রা পূর্ব্ব হইতেই ওৎ পাতিয়াছিলেন, সমরেন্দ্র দেখা দিতেই অনেকখানি দূরত্ব রাখিয়া তাঁহারা জানাইলেন, বাবুর দর্শন পাইয়া তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন।

মুখের কথা ঐ সামান্য দু'চারিটি ; কিন্তু উঁনি যেন কিছুতেই অন্যায় মনে না করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে কথার সঙ্গে ভঙ্গীতে যে শ্রদ্ধা মিশাইলেন তাহা যেমন প্রচুর তেমনি মধুর।

সমরেন্দ্র উত্তরে জানাইলেন, এখানকার জলবায়ু ভালই বোধ হইতেছে।

শুনিয়া সকলেই বেশ সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন।

চিন্তামণির গায়ে তখনও জ্বর ছিল, তিনি বলিলেন, স্থানের স্বাস্থ্য ভাল।

তারিণী গুপ্ত কিছু অনুমান করিলেন না ; যা অনুভব করিতেছেন বলিয়া তাঁর বিশ্বাস তাহাই প্রকাশ করিলেন ; বলিলেন, নদীর জল অতি সুপেয় এবং অম্লনাশক।

শুনিয়া বাবু সন্তোষ প্রকাশ করিলেন ; বলিলেন, তা হ'লে ত' ভালই।

শিবকুমার আচার্য্য আকাশে ব্যোমযান এবং মৃত্তিকায় নাচগান এই দু'য়ের ভয়ে কোথায় দাঁড়াইবেন ভাবিয়া পান নাই, ঘুঙুর বাজাইয়া নাচ নয়, গলায় শুধু গান হইতেছে, লোকের মুখে এই খবর পাইয়া তিনি নির্জ্জনে ভ্রুভঙ্গী করিয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন, আহার্য্যও সুলভ।

সমরেন্দ্র বলিলেন, তবে ত' আরো ভাল।

পরস্পরের প্রতি সম্ভাষণ এবং প্রীতি জ্ঞাপন, সংবাদ দান আর সংবাদ গ্রহণ, সংক্ষেপেই শেষ হইল, তবু তাহা মূল্যবান। সবাই সুখী হইলেন।

বাবু গেলেন বাড়ীতে।

পরে এরা হইলেন বাড়ীমুখো।

আর যে যা-ই করুক, যা-ই ভাবুক, কাশীশ্বর উহাদের পশ্চাতে ফেলিয়া আপন বেগে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন।

বলিলেন, বাবুর সঙ্গে কথা কয়ে এলাম।

ব্রাহ্মণী বলিলেন, গলায় গেঁথে আনতে পারলে না বাবুকে, তাবিজ ক'রে? পেটে ভাত নেই, বাবু বাবু বাবু।

কিন্তু ঐ কথাগুলির কথা আরও বেশী করিয়া না বলিলেও চলে। সমরেন্দ্র ধনবান ব্যক্তি সন্দেহ নাই ; আচারে আচরণে তিনি শ্রদ্ধাস্পদ, তাহাতেও সন্দেহ নাই ; তাঁহাকেই পুরোভাগে রাখিয়া, অর্থাৎ তাঁহারই নামে অট্টালিকা নির্ম্মিত

এবং সজ্জিত করা হইয়াছে ইহাও সত্য ; কিন্তু তিনি যতই বৃহৎ হউন, বৃহত্তর সত্তা থাকা কিছুই অসম্ভব নয়।

দু'দিন পরেই ঠিক দুপুর বেলা, গ্রামের লোক যখন খাইয়া-দাইয়া শুইয়াছে ঠিক তখন, নিতাইয়ের পিসী (৬৭) বাছুর খুঁজিতে বাহির হইয়া একটা বৃহত্তর সত্তারই সংবাদ লইয়া অকস্মাৎ বায়ুবেগে ছুটিতে সুরু করিয়া দিল।

সামনেই নবীন বটব্যালের বাড়ী।

নিতাইয়ের পিসী শশী বায়ুবেগে ছুটিতে ছুটিতে সেই বাড়ীতেই ঢুকিয়া পড়িল।

বটব্যাল-পত্নী উজ্জয়িনী দেবী তখন মেঝেয় পাটী বিছাইয়াছেন, আঁচল খুলিয়া পাটীর উপর ফেলিয়াছেন, শুইবেন ; শুইবার আগে মেয়েকে বলিতেছেন, দেখে আয় ত' কুকু, ওবেলাকার ডাল তরকারী ঢাকা আছে কিনা? মুখ-পোড়াদের বেড়ালটা এসে এখুনি মুখ দেবে। যা দেখে আয়।

বলিতে বলিতেই, কথা শেষ না হইতেই, নিতাইয়ের পিসী শশী হুড়মুড় করিয়া ঢুকিয়া পড়িল, আর হাঁপাইয়া আসিয়া পড়িল।

নিঃশ্বাস ফুরাইয়া আসিতেছিল, তবু সে বলিল, হেই মাগো, এ কী দেখিলাম পথে আসতে! সে কথা, মা, বলতে নারি।

তরকারী ঢাকিতে কুকু উঠিতেছিল।

উজ্জয়িনী কাৎ হইতেছিলেন।

দু'জনাই থামিয়া গেলেন। সেই অবর্ণনীয় ব্যাপার দেখিয়া শশী যে বিহ্বলতা লইয়া আসিয়াছে তাহাও অবর্ণনীয় ; উজ্জয়িনী চমকিয়া উঠিলেন, তরকারী যে ঢাকা হইল না এবং তিনি যে শুইতে চান তাহাও ভুলিয়া গেলেন।

বলিলেন—মাগো, শুনে যে চমকে উঠলাম! কি দেখলি শশী?

শশী বসিয়া পড়িল ; বলিল—সে কথা মা বলতে নারি।

অনুচ্চারণীয় ভয়ের কথা ব্যক্ত করিতে গিয়া আরো ভয়ে তার চোখ আরো বিহ্বল হইয়া রহিল, বলিল, মাগো ঐ বাড়ীতে, ঐ যে বাড়ী করেছে কোথাকার রাজারা, সেই বাড়ীতে—

—সে বাড়ীতে কি?

—সে কথা, মা, বলতে নারি।

—তবে এলি কেন ছুটতে ছুটতে?

—বলি, বলি। ঐ বাড়ীতে রয়েছে আমাদের পিলে। বলিয়া শশী খালাস হইয়াও হালকা হইল না।

—পিলে? পিলে কি?

—ভুলে গেলে এর মধ্যেই? ঐ কর্ণপালের মেয়ে গো, যার নাম দেবীদাসী।

উজ্জয়িনী কথাটা উড়াইয়া দিলেন ; বলিলেন—ধ্যুৎ।

—হ্যাঁ, মা, হ্যাঁ পিলে। মিছে কথা যদি বলে থাকি তবে যেন দু'টি চক্ষুর মাথা খাই। বলিয়া শশী চোখের দিকে আঙুল না তুলিয়া আঙুল তুলিয়া নিজের নাক দেখাইল।

উজ্জয়িনী বলিলেন—তোরা ত' চোখের মাথা খাস কথায় কথায়। কোথায় দেখলি ?

—জানলায় দাঁড়িয়ে ছিল, মা, পষ্ট দেখলাম। আমাকে দেখতে পেয়েই ঝম ক'রে জানলা বন্ধ করে দিলে।

সাত-আট বছরের সময় দেবীদাসীর অসম্ভব প্লীহা বৃদ্ধি ঘটায় কে একজন বলিয়াছিল, "কর্ণধর, ওটা তোর মেয়ে নয়, ওটা তোর পিলে"। সেই অবধি পিলে বলিয়াই লোক তাহাকে ডাকিত।

কিন্তু নিতাইয়ের পিসী ভুল দেখে নাই—সত্যই তা-ই। সমরেন্দ্র এই গ্রামেরই নিরুদ্দিষ্টা মেয়ে পিলেকে অর্থাৎ কর্ণধর পালের কন্যা দেবীদাসীকে ঐ বাড়ীতেই আনিয়াছেন, অথবা দেবীদাসীই আসিয়াছে ; অধিক কি, ঐ বাড়ীটাই দেবীদাসীর।

পথঘাট সম্পূর্ণ নির্জন হইয়াছে মনে করিয়া দেবীদাসী ভরা দুপুরে জানালাটা একটু খুলিয়া নিজের গ্রামের চেহারাখানা একটু দেখিয়া লইতেছিল।

কে জানিত যে, নিতাইয়ের পিসীর বাছুর হারাইবে। দুপুরবেলাতেই, বাছুর খুঁজিতে সে এই পথেই আসিবে, আর তাহাকে দেখিয়া ফেলিবে, এবং চিনিয়া ফেলিয়া "ওমা" বলিয়া থমকিয়া দাঁড়াইবে।

ইহারও আগের কথা যা তা সবাই জানে ; অর্থাৎ দেবীদাসী যে ব্যক্তির সঙ্গে পলায়ন করিয়াছিল সে দেবীদাসীকে দুধে ভাতে অর্থাৎ পরম সুখে রাখিতে রাখিতে পরিত্যাগ করিয়াছিল, পিস্তল দেখায় নাই বা লাথি মারে নাই, অমনি আর দেখা দেয় নাই, তারপর একটি নিষিদ্ধ গৃহ হইতে সমরেন্দ্র কর্তৃক তার উদ্ধারসাধন এবং স্ত্রীকরণ ঘটে।

তারপর দেবীদাসীরই ইচ্ছায় তাহার পিতা কর্ণধর পালকে গ্রাম হইতে স্থানান্তরিত করিয়া অপর একটি জনবহুল স্থানে নগদ কিছু টাকা দিয়া কায়েমী করিয়া বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেখানে সে চাকা ঘুরাইতেছে।

এবং এই বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, সমরেন্দ্র দেবীদাসীর গার্হস্থ্য সরল চরিত্রে, মধুর ব্যবহারে, এবং অপার্থিব রূপে এবং অন্যান্য প্রশংসনীয় গুণে বিশেষ মুগ্ধ হইয়া গেছেন, আর অবিরত অনুগত হইয়া থাকেন।

এদিকে ডাল তরকারী ঢাকা হইয়াছে কিনা সে খবর উজ্জয়িনীর লওয়া হইল না, কুকু কথা না শুনিলে অবাধ্যতার দরুণ তাহাকে তিনি মারেন ; সেদিকে তাঁর ভারি লক্ষ্য ; কিন্তু আজ উজ্জয়িনী তা লক্ষ্য করিলেন না, অঞ্চল গুটাইয়া লইয়া তিনি দিবানিদ্রার পীড়ন সম্পূর্ণ দমন করিলেন।

শশীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিলেন।

বলিলেন—কি সাহস! গাঁয়ের বুকের ওপর এসে বসেছে! বলিয়াই ক্রোধে তাঁর নাকে নিঃশ্বাসে যেন ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। মুখপোড়াদের বিড়াল তরকারীতে মুখ দিয়া মুখ চাটিতে চাটিতে সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। উজ্জয়িনী তাহা দেখিতে পাইলেন না।

শশী তাঁর প্রচণ্ড মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, টাকার মানুষ যে মা। টাকায় সব হয় মা, সব ঢাকা পড়ে।

কিন্তু উজ্জয়িনীর কাছে টাকা অতি তুচ্ছ।

বলিলেন—তা হোক। অমন টাকার মুখে আগুন। এই কেলেংকারী করবে ওরা এই বামুন-ভদ্দরের গাঁয়ে, আর তা-ই লোকে দাঁড়িয়ে দেখবে!

কেলেংকারী দেখিতে এখনও কেহ দাঁড়াইয়া যায় নাই; কিন্তু উজ্জয়িনী মনে করিয়াছেন, কোনো প্রতিবিধান না করিয়া লোকে দাঁড়াইয়া এখনই না দেখুক, দেখিতে দাঁড়াইয়া যাইবেই। অবশ্য স্বতঃসিদ্ধভাবে কেন তিনি উহা মনে করিলেন তাহা তিনি জানেন না।

উজ্জয়িনী পুনরায় বলিলেন—ছি, ছি, ছি! যখন পালাল তখন ভেবেছিলাম, গাঁয়ের কারু ঘাড়ে চাপে নি, এই ভাগ্যি। সমস্ত গাঁ এবার উচ্ছন্নে যাবে –শশী, তুই তা দেখে নিস। বলিয়া শশীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াও তিনি শান্ত হইতে পারিলেন না; বলিলেন. রাগে আমার গা রি রি করছে।

শশী বলিল—মাগো, আমি ডরে মরছি।

উজ্জয়িনী আরো উত্তেজিতা হইয়া বলিলেন,—এখনই কি? আরো মরতে হবে।

ইত্যাদি আশংকায়, আস্ফালনে, বিস্ময়ে, শিহরণে কথা আটকাইয়া রাগে কাঁপিয়া ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে জ্বালাতন বোধ করিয়া, ঘৃণায় কণ্টকিত এবং সংসারের আচরণে বীতস্পৃহ আর হতাশ হইয়া, গাঁয়ের পুরুষগুলিকে ইচ্ছানুরূপ গালি পাড়িয়া অর্থাৎ নানা রঙের ইন্দ্রধনু এবং নানা পীড়ার যন্ত্রণা একই সঙ্গে সম্মুখে আগত দেখিয়া যেন ঘূর্ণি জলে পাক খাইয়া খাইয়া সেই অশুভ দ্বিপ্রহরের কয়েক ঘণ্টা ওদের কাটিল।

সংক্ষেপে, উজ্জয়িনী নিজেও ক্ষেপিয়া গেলেন, বেচারা শশীকেও ক্ষ্যাপাইয়া তুলিলেন। শশীর বাছুর খোঁয়াড়ে গেল।

তারপর সংবাদটা বায়ুপথে ছুটিতে এবং ছড়াইতে লাগিল। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই জানিতে কাহারো বাকি রহিল না যে, ঐ বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতেছে ঐ বাড়ীর কর্ত্রী ঐ বাড়ীর মালিক, আর কেউ নয়, এখানকারই পিলে—যৎসামান্য কর্ণধর পালের যৎসামান্যা কন্যা পিলে, যার নাম দেবীদাসী।

বটে?

এৎমামপুর তড়পাইয়া উঠিল।

মেয়েরা বলিতে লাগিলেন, কি ঘেন্নার কথা—!

পুরুষেরা বলিতে লাগিলেন, কি স্পর্দ্ধার কথা—!

এবং উভয়পক্ষই—অন্তঃপুর ও বহির্ব্বাটী—চোখ লাল করিয়া রহিলেন, বহুক্ষণ চোখের লাল কাটিল না, এবং মনে হইল, রাগের এ লাল কাটিবার নয়।

একাধিক লোকের সম্মুখেই তারিণী গুপ্ত হঠাৎ অনুমান করিলেন; মহাভারতে এ-র চাইতেও অশুদ্ধ কথার উল্লেখ আছে—

মহর্ষি মিশ্র উষ্ণ হইয়া বলিলেন, খবদ্দার।

পুরুষোত্তম বাগচি বলিলেন, আমিও ত' মহাভারত পড়েছি—পাইনি ত'!

—আছে; বলিয়া তারিণীশংকর চুপ করিয়া রহিলেন।

কিন্তু মহাভারতের নিন্দাবাদ সকলের চাইতে বিদ্ধ করিল ত্রিপুরেশ্বর

চক্রবর্ত্তীকে ; তিনি উগ্র হইয়া বলিলেন, অব্রাহ্মণের এ অকারণ পাণ্ডিত্য বড়ই অসহ্য হে।

তারিণী গুপ্ত বলিলেন, আছে। আদিপর্ব্বে, অশ্বমেধ-পর্ব্বে, সভাপর্ব্বে, উদ্যোগপর্ব্বে, কর্ণপর্ব্বে, দ্রোণপর্ব্বে, অনুশাসনপর্ব্বে পাবে।

—তুমি নিজে দুষ্ট, অসৎ প্রকৃতির, তাই তুমি দুষ্টের প্রশ্রয়দাতা, আর দুশ্চরিত্রতার সমর্থক ; আর মহাভারতের অপমানকারী। তোমার সংসর্গ আমরা ত্যাগ করলাম। বলিয়া প্রথমে ত্রিপুরেশ্বর চক্রবর্ত্তী এবং তার পশ্চাৎ পুরুষোত্তম বাগচি তারিণীশঙ্করকে ত্যাগ করিয়া গেলেন।

ক্রুদ্ধ জনমত কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তারিণীশঙ্কর একা বসিয়া কৌতুকটা উপভোগ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এমন সাহস কাহারও নাই যে, একক কিম্বা দলবদ্ধ হইয়া ঐ অট্টালিকার সম্মুখে গিয়া, দ্বারবানের সম্মুখীন হইয়া পিলেঘটিত ব্যাপারের প্রতিবাদ বা সমালোচনা বা কোন প্রকার প্রতিকার চেষ্টা বা তার অবৈধতা সম্বন্ধে অমত প্রকাশ করেন। মনে সে কথা তাঁরা ভাবিতেও পারিলেন না, বলিতেও পারিলেন না।

কেবল কাশীশ্বর বাঁড়ুয্যে ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইয়া এক সময় জানিতে চাহিলেন, —এ দ্বারোয়ানজি, বাবু হিঁয়াই হ্যায়, না চল গিয়া হ্যায়।

হিন্দীর দরকার ছিল না, গিরিরাজ পরিষ্কার বাংলায় বলিল, ক'লকাতা গেছেন।

—আবার আয়েগা ত' ?

—হাঁ, হাঁ, ফিন আবেঙ্গে। কা কাম হ্যায় ?

হিন্দীতে প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করার প্রশ্ন বড়ো কঠোর মনে হইয়া কাশীশ্বর আরো ভয় পাইয়া খুব তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলেন।

সবাইকে ক্ষুব্ধ দেখা গেল, বিমর্ষ হইয়া গেল সূর্য্য কুশারী একা। ঐ বাড়ীটার নীরব সুরের যে অতীন্দ্রিয়ত্ব সে মনে মনে সম্ভোগ করিত, আর ছন্দে তাহাকে আকার দিয়া অমর করিয়া তুলিত, সেই অতীন্দ্রিয়ত্ব ঘুচিয়া গেল, অর্থাৎ কবির সুদূরের পিয়াসার এবং অপরিচিতার মারফৎ আদিতম সৃজনপ্রয়াসের সার্থকতা হউক এই প্রার্থনার কোন অর্থই থাকিল না।

দ্বিপ্রহর তখনও উত্তীর্ণ হয় নাই।

আপাদমস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিতা দুটি রমণী গিয়া সেই বিখ্যাত এবং অধুনা আরো বিখ্যাত, অট্টালিকার ফটকে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দ্বারবান ত্বরিতপদে আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল।

রমণীদ্বয়ের একজন অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে বলিলেন,—আমরা ভেতরে কি যেতে পারি, বাবা ? এ বাড়ীর গিন্নী—।

বলিতে যাইতেছিলেন, "আমাদের আপনারই লোক।" কিন্তু বলার দরকার হইল না ; দ্বারবান সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, যান মাইজীর হুকুম আছে।

রমণীদ্বয় মন্থরপদে প্রবেশ করিলেন কিন্তু বুক যেন অকারণেই দুরু দুরু করিতে লাগিল, বাড়ীর চাকচিক্য তাঁদের চোখের উপর ঝকঝক্ করিতে

লাগিল ; আরামের আয়োজন, আর সম‍ুদয়ের উচিত ম‍ূল্য তাঁরা অন‍ুভব করিতে লাগিলেন, না জানি কত টাকাই না খরচ করিয়াছে ভাবিয়া দিশা না পাইয়া অবাক হইতে হইতে তাঁহারা সিঁড়ি ভাঙিয়া দোতালার বারান্দায় উঠিয়া গেলেন, এমন একটা ছম্‌ছম্‌ অস্বস্তির ভাব লইয়া, যেন চুরি করিতে আসিয়াছেন, এবং ধরা পড়িবার সম্ভাবনা বিস্তর।

সকলগ‍ুলি ঘরেরই শিকল তোলা।

একটি ঘরের দরজা খোলা ছিল ; উভয়ে গিয়া সেই দরজার সম্ম‍ুখে দাঁড়াইতেই কি যে একটা অভাবনীয় জ‍্বলন্ত ব্যাপার চক্ষের পলকে ঘটিয়া গেল তাহা বলা যায় না, চোখ যেন ঝলসিয়া ব‍ুজিয়া আসিল।

র‍ূপের দিকে যে সর্ব্বদাই অসঙ্কোচে আর অকাতরে নেত্রপাত করা যায় ইহা সত্য নহে। উঁহারা দেখিলেন, সম্মুখে যাহাকে দেখা যাইতেছে সে তাঁহাদের সেই প‍ুরাতন পিলেই বটে, কিন্তু তাহার দেহে র‍ূপান্তর যাহা ঘটিয়াছে তাহা মান‍ুষে এমন অকস্মাৎ চোখে দেখিবে বলিয়া প্রত্যাশা করিতে পারে না, ইহার র‍ূপ যেন জাগতিক সকল নিয়ম আর সকল সম্ভাবনাকে পরাস্ত আর অতিক্রম করিয়া গেছে।

ঐ র‍ূপ দেখিয়াই উঁহাদের মুখে শব্দ ফ‍ুটিল না।

তার উপর ঐ সোনা, অঙ্গে অঙ্গে অশেষ—কর্ণে, কণ্ঠে, বাহ‍ুতে, মণিবন্ধে, অলঙ্কার যে কত প্রচুর, আর কত যে তার ম‍ূল্য তাহার ইয়ত্তা তাঁরা করিতে প্যারিলেন না, কেবল অন‍ুভব করিতে লাগিলেন, দৃষ্টিতে যেন দ‍ুঃসহ হইয়া একটা নিরবচ্ছিন্ন আলোক তরঙ্গ চোখের উপর নাচিতেছে।

পালিশ করা সোনা ঝিকমিক করিবেই ; যাহার গায়ে সেগ‍ুলি রহিয়াছে সে-ও চির‍কালের পরিচিত মান‍ুষ, একেবারে জানা, কিন্তু একেবারে জানা মান‍ুষটির দিকে চাহিয়া এখন উহাদের মনে হইল কেবল সেই প‍ূর্ব্ব-পরিচয়ের স‍ূত্রে এখন উহাকে ঘনিষ্ঠ সম্ভাষণ করিবার বির‍ুদ্ধে যেন দ‍ুর্লঙ্ঘ্য একটা নিষেধ ঐ অপরিমেয় স্বর্ণের অতি উজ্জ‍্বল দীপ্তির মধ্যেই আছে।

ভুবনমোহিনী যে প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া প‍ূজা করা হইতেছে সে প্রতিমা পরিচিতই, ম‍ূর্ত্তি কথা কহিয়া উঠিলেই অচেতন র‍ূপ যথার্থ সজীব হইয়া উঠে ইহাও ঠিক‍্; কিন্তু ইহাও সত্য যে হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর শ‍ুনিয়া পলায়ন করিবে না, এমন লোক বিরল।

ও‍ঁদের সেই পিলে যেন তেমনি আতঙ্কজনক আর অত্যন্ত পরিস্ফ‍ুট একটা সজীবতা লাভ করিয়াছে, ম‍ৃন্ময়ী যেন চিন্ময়ী হইয়া উঠিয়াছে, তার অন্তরেই অকলঙ্কিত আভিজাত্য যেন ঐ অলঙ্কারের ঘটায় ছটায় একটা রোমহর্ষক অলৌকিক ভাষায় ধ্বনিত হইতেছে।

সুতরাং ও‍ঁরা থমকিয়া রহিলেন, যত পরামর্শ বহ‍ু যত্নে করিয়াছিলেন ; ভর্ৎসনা করিবেন, রাগ করিবেন বলিয়া যে অনিবারণীয় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন : ফল-সাধক যত কথা বলিবেন বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছিলেন সে সমস্তই যেন বিদ‍্যুতের তীক্ষ্ণ আঘাতে অন্ধ এবং অসাড় হইয়া গেল।

দেবীদাসী উঁহাদের পদশব্দ পাইয়াছিল; তার ব‍ুঝিতে কষ্ট হয় নাই যে গ্রামের স্ত্রীলোক কেহ আসিতেছে, গ্রামের লোককে প‍ুনরায় দেখিবার দ‍ুর্দ্দমনীয়

ইচ্ছা তার থাকিলেও একটা লজ্জাও তার ছিল ; তার ভয় না হইয়াছিল এমন নয়।

কিন্তু সাক্ষাতের প্রথম মুহূর্ত্তেই তাহাই ঘটিয়া গেল যাহা ঘটিবে বলিয়া ও'রাও মনে করেন। ও'রাই তাহাকে নিষ্কৃতি দিলেন, উহাদের মনের সমীহ আর সঙ্কোচ, অর্থাৎ দুর্ব্বলতা, একেবারে স্পষ্ট হইয়া চোখে পড়িতেই দেবীদাসীর নিজের দুর্ব্বলতা, এক নিমেষেই ঘুচিয়া গেল, তা ত' গেলই, অধিকন্তু তাহার তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না যে, উহারা অবিসম্বাদিতভাবে স্বীকার করিয়াছেন, এই তিনের মিলনক্ষেত্রে তাহারই স্থান উচ্চ।

দেবীদাসী ও'দের চোখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া অগ্রসর হইয়া গেল ; বলিল,—জ্যেঠিমা, আসুন ; পিসীমা, আসুন বলিয়া উপুর হইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

ও'দের একজন পূর্ব্বকথিতা উজ্জয়িনীর অত্যন্ত আপনার লোক, স্বামীর সাক্ষাৎ ভগিনী, দেবমায়া তাঁর নাম। আর একজন কাশীশ্বরের আবাল্যের সহধর্ম্মিণী ইচ্ছাময়ী।

উভয়ে সটান মেঝেয় বসিলেন।

দেবীদাসী ব্যস্ত হইয়া আসন দিতে চাহিলে তাহাকে নিবারণ করিলেন ; বলিলেন, "এই খানেই বসি ; দিব্য পরিষ্কার।" বসিয়া ও'রা চারিদিকে চোখ ফিরাইয়া বড় বড় ছবি, বড় বড় আয়না, ভাল ভাল চেয়ার, মোটা পালঙ্ক আর গদি প্রভৃতি তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন, অবাক দৃষ্টি মুগ্ধ হইয়া গেল।

সেই অবসরে দেবীদাসী গিয়া ক্যাস-বাক্স খুলিয়া দশটি টাকা বাহির করিল ; এবং ফিরিয়া পাঁচটি করিয়া টাকা উহাদের পায়ের কাছে নামাইয়া রাখিয়া গলায় আঁচল দিয়া পুনরায় এবং অধিকতর ভক্তিভরে প্রমাণ করিল।

শয্যার দিকে চাহিয়া একটা অপবিত্রতার চিত্র মনে পড়িয়া এবং একটা অপবিত্রতার ছোঁয়াচ লাগিতেছে মনে করিয়া উ'হাদের মন গুটাইয়া আসিতেছিল, টাকা পাঁচটি প্রণামী পাইয়া সঙ্কুচিত মন তৎক্ষণাৎ বিস্তৃতি লাভ করিল, তা ছাড়া লক্ষ্মীর দৃষ্টি লাগিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্যভাবে একটা প্রফুল্লতাও লাভ করিল।

ইচ্ছাময়ী টাকা পাঁচটি ডান হাত দিয়া তুলিয়া বাঁ হাতে করিলেন ; তারপর দেবীদাসীর চিবুকে আঙুল ছোঁয়াইয়া সস্নেহে চুম্বন করিলেন, এবং ভাবিয়া রাখিলেন দেবীদাসীর সঙ্গে যে এই ছোঁয়াছু'য়ি হইয়া গেল সে-কথাটা কাহাকেও বলা হইবে না। দেবমায়া টাকা পাঁচটি আঁচলে বাঁধিলেন, ইত্যাদি।

কিন্তু দু'জনার কেউ কথা খু'জিয়া পাইলেন না, "আজ কি রেঁধেছিলে ?" জিজ্ঞাসা করা এখানে চলিবে না।

দেবীদাসীই সুরু করিল ; বলিল, তোমাদের কাছেই আবার ফিরে এলাম, মা। পায়ে রেখ'।

ইচ্ছাময়ী বলিলেন, সে কি বলছিস পিলে ?

বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, কে কাহাকে আশ্রয় দিতে সমর্থ তাহার দিশা তিনি সত্যই পান নাই।

দেবমায়া বলিলেন, সেই অবধি আমরা ভেবে বাঁচিনে, না জানি পিলে কি দশায় পড়েছে!

কথাগুলি মিথ্যা, তাঁহারা কেহ অমন কথা ভাবেন নাই।

পিলে বলিল, দশা খুব খারাপই হ'ত, পিসীমা, যদি ইনি স্থান না দিতেন।

কর্ণধর পালের কন্যা পিলে এমন উজ্জ্বল, এমন সহজ আর সপ্রতিভ আর মহিমান্বিত, আর ভঙ্গীর উল্লাসে এমন দুর্নিবার আর সুষমাময়ী হইয়া উঠিতে পারে ইহা কেহ জানিত না, ডালিম ফুলের যে রং সেই রঙের শাড়ী একখানি পরিয়া এবং সোনায় গা ঢাকিয়া সম্মুখেই সে বসিয়া আছে; কিন্তু মনে হইতেছে, সে যেন দুর্নিদ্দেশ্য একটি পরীর মতো আপন অংগচ্ছটার চমক হানিয়া উপর দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে, কোনো-খানেই তার সীমা নাই।

ও'রা হা করিয়া শুনিতে লাগিলেন।

পিলে তাঁর ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের কাহিনী বলিতে লাগিল, সে লোকটা ত' আমাকে একটা খারাপ বাড়ীতে রেখে দু'দিন বাদেই পালিয়ে গেল। সেই বাড়ীতে ইনি মাঝে মাঝে আসতেন। তারপর আমাকে দেখতে পান।

পিলের ভাগ্য সম্বন্ধে এতক্ষণের উৎকণ্ঠা দূর হইয়া উভয়েই সমস্বরে বলিলেন, ভালই হ'ল।

—ভালই হ'ল বৈ কি। খুবই ভালবাসেন, কত যে দিতে চান তার ঠিক নাই। আমিই তাঁকে থামিয়ে থামিয়ে রাখি যে, অত দিয়ে কি হবে! বলিয়া পিলে একটু সুখের হাসি হাসিল।

এমন করিয়া হাসিতে কি সে পারিত! না, শিখিত! ইচ্ছাময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বাড়ী ত' তোমারই?

পিলেকে 'তুমি' সম্বোধন অজ্ঞাতে বাহির হইয়াছে।

পিলে বলিল, আমার নামেই করেছেন।

—সায়েব ম্যানেজার না কি আছে?

—না। ম্যানেজার বাঙ্গালীই, আগে তিনি ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

—আয় কত হবে?

—পোণে দু'লাখ। বলিয়া পিলে ইচ্ছাপূর্ব্বকই থামিল না, ও'দের চমক খাওয়াটা চোখে পড়িয়াছে বুঝিতে পারিলে ও'রা অপ্রতিভ হইতে পারেন মনে করিয়া পিলে বলিতে লাগিল, কিন্তু যাকে ভালবাসেন তার পিছনে বাজে খরচ কি এত! বলিয়া সৌভাগ্যের গৌরবে না হোক, প্রণয়গর্ব্বে পিলে আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

চারিদিকে চাহিয়া উ'হাদেরও তাহাতে সন্দেহ রহিল না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবই, যেন খেলা খেলা; এত বাহুল্য দ্রব্য তাঁহাদের আয়ত্তাধীনে স্বপ্নেও নাই; তাঁরা জীবনে দেখেন নাই।

দেবমায়া বলিলেন, তোমারও খরচের হাত কম নয়। বলিয়া হাসিলেন, সেটা স্তুতির প্রফুল্লতা, কৃতজ্ঞতার প্রয়োজনীয় হাসি।

পিলে বলিল, না হ'য়ে উপায় নেই। উনি বলেছেন, গ্রামের সবাই তোমাদের

ভালবাসতেন। যদি কেউ কখনো দয়া ক'রে অভাবের কথা জানান তবে তোমার যা ইচ্ছে যত ইচ্ছে দেবে, আমার অনুমতি দেয়া রইল।

"দয়া ক'রে অভাবের কথা জানান", এই কথাগুলির জন্য উঁহারা বাবুকে অধিকতর শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন; কারণ দান করিয়া ধন্য হওয়ার প্রবৃত্তি খুব উচ্চাঙ্গের বৈষ্ণবী মানসিক উন্নতির লক্ষণ, এবং সকলের তা হয় না।

ইচ্ছাময়ী গদগদস্বরে বলিলেন, একেবারে দেবতা মানুষ।

দেবমায়া বলিলেন, যা বলেছ, ইচ্ছে! দেবতাই।

পিলের জীবনেতিহাসের এই অংশটুকু শ্রবণ করিয়া উঁহাদের কি মনে হইল তাহা পিলে না জানিলেও আমরা জানি। অভাব-অনটনের ঊর্ধ্বে উঠিয়া এই অপরিসীম স্বাধীনতা-সম্ভোগ জীবনের প্রধানতম কাম্য বলিয়াই উঁহাদের মনে হইল, চিরদিন স্বর্গীয় ঐ স্বপ্নই উঁহারা দেখিয়াছেন। ধুলো নয়, বালি নয়, নগদ টাকা লইয়া যথেচ্ছা ব্যবহার করার, প্রায় ছিনিমিনি খেলার মতো যাহার অবস্থা এবং উন্মুক্ত স্বাধীনতা, তাহার অদৃষ্ট যে কত সুপ্রসন্ন আর ভাগ্য-বিধাতার আশীর্ব্বাদ যে তাহার প্রতি কত প্রচুর, তাহা সন্তোষজনকভাবে ধারণা করিতেই পারা যায় না। দৈন্য আরো বাড়িবার বিরুদ্ধে অষ্টপ্রহরই যাদের তীক্ষ্ণ সতর্কতা, তাহাই লইয়া কলহ, তাহারই দরুণ বিচ্ছেদ, সেই দৈন্যের ফলে হয়তো অকালমৃত্যুই ঘটিতেছে; ভিক্ষাবাবদ একমুষ্টি চাল খরচ করিতে যাঁদের সম্বলে শিরায় টান পড়ে, এমনি নিষ্পেষিত যাঁহাদের অবস্থা, তাঁহারা টাকার অত অবাধ আর নিঃস্পৃহ ব্যবহার দেখিয়া নিশ্চয়ই বিস্মিত হইয়া যাইবেন, সেই জীবনকে উদার বৈকুণ্ঠবাস, মর্ত্ত্যে স্বর্গের অবতরণ, মনে করিবেন বৈ কি!

বৈকুণ্ঠবাসিনীর সম্বন্ধে উপস্থিত অব্যক্ত একটা বিস্ময়ের ঘোর লইয়া উঁহারা উঠিলেন, পিলে আবার প্রণাম করিল, পুনরায় আসিতে বলিল, আরো অনুরোধ করিল, যাঁহারা দয়া করিয়া পদধূলি দিয়া কৃতার্থ করিতে সম্মত তাঁহারাও যেন আসেন।

ইচ্ছাময়ী বলিলেন, আসবে বৈ কি।

"তুমি আমাদের বল ভরসা আশ্রয়", এই কথাগুলি তাঁর মুখ দিয়া বাহির না হইলেও মনের সহস্র উৎসমুখে মুহুর্মুহুঃ বাজিতে লাগিল।

সর্ব্বশেষে শুধাইলেন কর্ণধরের কথা।

দেবমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাবা এখন কোথায়?

পিলে বলিল—কৃষ্ণনগরে আছেন।

—ভাল আছে?

—খবর পেয়েছি, ভালই আছেন।

উভয়ে বলিলেন—বেশ।

একদিন অশুভ প্রাতে দেবীদাসীর পলায়ন করিবার ঘৃণ্য কথাটা কর্ণধরের স্নেহধর্ম্ম আর অবিবেচনার দরুণ যত বেগে রাষ্ট্র হইয়াছিল, তার চতুর্গুণ বেগে তাহার পুনরাগমনের সংবাদ ত' বটেই, রাজ্ঞীর পদে প্রতিষ্ঠার সংবাদ, আর উপকার করিবার অকপট অভিপ্রায়ের সংবাদও প্রচারিত হইয়া গেল।

লোকের সেদিন সুপ্রভাত!

ইচ্ছাময়ী বলিয়াছিলেন, "আসবে বৈ কি।"

যাঁহাদের তরফ হইতে তিনি পিলেকে ঐ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাঁহারা হীনচেতা নন, ইচ্ছাময়ীর তরফের সত্যটা তাঁরা নির্ব্বিবাদে রক্ষা করিলেন, অর্থাৎ আসিলেন।

প্রণামী পাঁচ টাকা নগদ পাওয়া গেছে, এই সংবাদটা পরবর্ত্তী সংবাদ হইয়া ধীরে সুস্থে রটিলেও, বিদ্যুৎ-চমকের পর মেঘের ডাকটাই যেমন ঘোরতর বেশী আর সাড়া জাগায়ও বেশী, তেমনি আলোড়ন তুলিল সে-ই বেশী।

যাঁহারা পদধূলি দিতে সম্মত তাঁহারা আসিলেন।

অকাতরে পদধূলি দিলেন।

এবং দু'তিন দিনেই দেবীদাসীর দেড় শত টাকা, উড়িয়া গেল বলা যায় না, জলে পড়িল বলা যায় না, পূজার ফুলের মতো সার্থক হইয়া গেল।

সূর্য্য কুশারীর স্বপ্নও সার্থক হইল।

তার দিদি, চন্দ্রিকা (৩৩) গিয়া দেবীদাসীর প্রণাম ও প্রতিশ্রুতি লইয়া আসিলেন যে, "ধরণীর ধূলা" ফুলের পাঁপড়িতে নয়, কাগজেই পুস্তকাকারে ছাপিবার সমুদয় খরচ সে দিবে ; কারণ, গুণীর গুণ সে বোঝে ; "উনিও" বোঝেন।

কিন্তু এই কি সব। দেবীদাসীর বদান্যতা আরো প্রচুর, তাহার হৃদয় আরো প্রশস্ত, আকর্ষণ আরো মিলনাত্মক।

একদিন সকালবেলাই সিধে দেওয়া আরম্ভ হইল, পিতলের একটি বালতি, তাহা পূর্ণ করিয়া সের দশেক আতপ চাল, এবং কাঁসার বাটিতে করিয়া পোয়া তিনেক গাওয়া ঘি।

সে আধার অর্থাৎ পিতলের বালতি সমেত ব্রাহ্মণেরা পাইলেন, তার সঙ্গে পাইলেন দক্ষিণা দু'টাকা।

দেখিয়া তারিণী গুপ্ত বাড়ীর ভিতরে এবং বাড়ীর বাহিরেও রাগে গোঁ গোঁ করিতে লাগিলেন, বাড়ীর ভিতরে সায় এবং অনুকম্পা পাইলেন বটে, কিন্তু বাহিরে কেহ আমল দিল না।

অচ্যুত চক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানায় তারিণী গুপ্তও ছিলেন।

অচ্যুত বলিলেন, ওর পাপ ধুয়ে মুছে গেল।

নটবর বিদ্যাবাগীশ বলিলেন, শুধু ধুয়ে মুছে? অমন পুণ্যাত্মা আর নেই।

কাশীশ্বর বাঁড়ুয্যে বলিলেন, মনে যার ময়লা নেই সে-ই ত' ধন্য। অমন দানশীলা রমণী দেশের গৌরব।

মহাভারতের কুৎসাকারী অপবাদে ত্রিপুরেশ্বর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এবং অব্রাহ্মণ বলিয়া দেবীদাসী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তারিণী গুপ্তের মনে বিষ সঞ্চিত হইয়াছিল ; বলিলেন, হ্যাঁ, দিলে থুলেই গৌরব। কানা পুতের নানা রোগ। তোমরা বড় উঞ্ছপরায়ণ।

মহিম মিশ্র মহাভারতের নিন্দায় উষ্ণ হইয়াছিলেন ; এখন হাসিয়া বলিলেন, বামুনরা চিরকালই তা-ই। রাগ করলে উপায় নেই, ভায়া।

কিন্তু ঠিক এই সময়েই আর একটা আবিষ্কার যাহা রাস্তার ধারে ঘটিতেছিল তাহাও অসামান্য, তাহাও আনন্দপ্রদ।

ত্রিপুরেশ্বর চক্রবর্ত্তী ঐ বাড়ীটার সম্মুখ দিয়া আসিতেছিলেন ; কোন বাড়ীটা তাহা না বলিলেও চলে, ঐ বাড়ীটার সৌন্দর্য্য এবং দৃশ্যাতীত একটা অসাধারণ গুরুত্ব দাঁড়াইয়া গেছে বলিয়া বাড়ীটার দিকে তাকানই নির্ম্মল আনন্দ লাভের অন্যতম উপায় এবং একটা কাজের কাজ দাঁড়াইয়া গেছে। ত্রিপুরেশ্বর আনন্দ-পূর্ব্বক ঐ দিকেই তাকাইয়া পথ চলিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁর চোখে পড়িল, একটি মনুষ্যমূর্ত্তি চট্‌ করিয়া ফটকের থামটার আড়ালে সরিয়া গেল।

সন্দেহ হওয়ায় ত্রিপুরেশ্বর থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিলেন, কে, কর্ণধর নাকি ?

বলিতেই আর কেউ নয়, কর্ণধরই আড়াল ছাড়িয়া প্রকাশ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

ত্রিপুরেশ্বর পুনরাগত মিত্রকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন; মিলনোল্লাসে পুলকিত-কণ্ঠে কলরব করিতে লাগিলেন—এস, এস, কর্ণ। এসেছ ভালই হয়েছে, তোমায় আমরা বড় ভালবাসতাম। দেখে আনন্দ হ'ল। ভাল আছ ?

—আজ্ঞে। বলিয়া কর্ণধর রাস্তায় উঠিয়া আসিল।

ত্রিপুরেশ্বর কর্ণধরের কাঁধের উপর হাত তুলিয়া দিলেন, কর্ণধরকে গায়ের দিকে টানিয়া লইলেন, তারপর যেন তাঁর নিজস্ব সম্পদ পুনরাবিষ্কৃত হারা-নিধিকে পুনরাবিষ্কারের গৌরবসহ গ্রামের লোককে দেখাইতে চলিলেন।

ত্রিলোকপতির তীর্থ-ভ্রমণ

পায়ের চটির একটা হুটোপুটি শব্দ করিতে করিতে ত্রিলোকপতি গুরুদাসের বৈঠকখানার দরজায় পৌঁছিয়াই থমকিয়া গেল। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর যে উদ্দেশ্যে আসে সে, আজও সে সেই উদ্দেশ্যেই আসিয়াছে, একটু ব্যগ্র হইয়াই আসিয়াছে। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হইবার আশা বৈঠকখানার দুয়ারেই অন্তর্হিত হইয়া গেল। গুরুদাস আর সে দাবা খেলে। গুরুদাস বৈঠকখানায় উপস্থিত আছে বটে, কিন্তু দেখা গেল, একটি অপরিচিত ভদ্রলোকও সেখানে বসিয়া আছেন, শুধু ভদ্রলোক তিনি নন, তিনি যে অবস্থাপন্ন বিশিষ্ট ভদ্রলোক তাহা এক নজরেই স্পষ্ট বুঝা গেল। বসিয়া তিনি আছেন, কিন্তু যেমন তেমন করিয়া বসিয়া নাই, এমন ভঙ্গীতে বসিয়া আছেন, যাহা সহজ অথচ গম্ভীর এবং শিষ্ট, পরিচ্ছদে একটা শুভ্র সমারোহ আছে, পরিচ্ছদ মূল্যবান নয়, কিন্তু শোভন। নিজেকে কি পোষাক মানায়, বিকৃত রুচির দরুণ অনেকেই তাহা বুঝিতে পারে না, কিন্তু ইনি বেশ পারিয়াছেন বলিয়া ত্রিলোকপতির মনে হইল।

ভদ্রলোকের আগমনের কারণ, অর্থাৎ অতিথি সমাগমের ব্যাপারটা সাধারণ নয়, তাহাও ত্রিলোকপতি বুঝিল। গুরুদাসের সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট লণ্ঠনটি বৈঠকখানায় আনা হইয়াছে, যাহা আনাইতে ত্রিলোকপতি এবং অন্যান্য বন্ধুরা রাগে চীৎকার

করিয়াও পারে নাই। ফরাসের ধূলিপূর্ণ সেই অনাদি সতরঞ্চির উপর পরিষ্কার চাদর বিছান হইয়াছে, গড়গড়াটা মাজা হইয়াছে, সটকাটাও নূতন; কলিকাটি সুবৃহৎ; গন্ধে বুঝা গেল যে তামাক আজ পুড়িতেছে তাহা নিত্যসেব্য ছ'আনা সের তামাক নহে, ইহারই তুষ্টির জন্য এবং সম্মানার্থে মূল্যবান তামাক গুরুদাস আনিয়াছে। তাহার উপর ত্রিলোকপতি আরও লক্ষ্য করিল যে, গুরুদাস নিজে খালি গায়ে নাই, জামা পরিয়া নিজেরই বৈঠকখানায় আসিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, সে বিশেষ উৎসাহিত কৃতার্থ এবং বিনীতভাবাপন্ন হইয়া খালি বসিয়া নাই, যেন অনুগ্রহ পাইতে দরবারে হাজির আছে।

এ-সব দেখিতে এবং হৃদয়ঙ্গম করিতে ত্রিলোকপতির বেশীক্ষণ লাগিল না।

গুরুদাস যখন অত্যন্ত সম্ভ্রান্তভাবে বলিল, "এস, ত্রিলোক, বস"। তার পূর্ব্বেই সে গুরুদাসের নিজের এবং তার বৈঠকখানার এই ভালর দিকে পরিবর্ত্তন দেখিয়া লইয়াছে।

ফরাসে স্থান সংকীর্ণ বলিয়া এবং বিশিষ্ট ভদ্রলোকটিকে যথেষ্ট ব্যবধানে রাখিতে হইবে বলিয়া ত্রিলোকপতি লোহার চেয়ারে বসিল এবং বসিয়া গুরুদাসের তেঁতুলে মাজা গড়গড়ার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

গুরুদাস খুব আভিজাত্যের সহিত বলিল, ইতি রঘুনাথগঞ্জ থেকে এসেছেন, শিউলিকে দেখতে।

রঘুনাথগঞ্জের নাম ত্রিলোকপতি শুনিয়াছে, কিন্তু শিউলি ব্যক্তিটা কে তাহা ত্রিলোকপতি স্বপ্নেও জানেন না, কিন্তু বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সম্মুখে অজ্ঞতা প্রকাশ করা চলিবে না, বিজ্ঞভাবে বলিল, ও!

কিন্তু ঘটনা এই, শিউলি আর কেহই নয়, গুরুদাসেরই সহোদরা।

ত্রিলোকপতি এ-দেশে কর্ম্মোপলক্ষে মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে আসিয়াছে, এখানকার মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব জন্মিলেও, কাহার জ্ঞাতি আত্মীয় কুটুম্ব স্বজন কোথায় কে বাস করে সে খবর সে পায় নাই।

তবে রঘুনাথগঞ্জ হইতে ইনি শিউলিকে দেখিতে আসিয়াছেন শুনিয়া হাত তুলিয়া সে ভদ্রলোকটিকে নমস্কার করিল, তিনিও প্রতিনমস্কার করিলেন, কিন্তু কথা হইল না। ত্রিলোকপতি একটু লাজুকস্বভাবের লোক, এদিকে চিন্তাশীল, ভক্তিপরায়ণ এবং ওদিকে দাবার চালে প্রত্যুৎপন্নমতি-সম্পন্ন হইলেও অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে অবান্তর কথা তুলিয়া আলাপ জমাইতে সে ভাল পারে না, কথাবার্ত্তায় ক্ষুদ্রবৃহৎ বিচারের প্রয়োজন আছে তাহা সে মনে করে; আবার ইহাও তার মনে হয়, কষ্টের সঙ্গেই মনে হয় যে, বিশিষ্ট ভদ্রলোকের কথোপকথন প্রস্তুত এবং প্রবাহিত করিবার উপযুক্ত ভাল ভাল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার কিছুই জানা নাই।

রঘুনাথগঞ্জের ইলিস মাছ সস্তা কি না, কবিরাজ প্রচুর কি না, গঙ্গা তার কোন দিকে, এখানকার মতো সেখানেও পথে ধূলা যথেষ্ট কি-না, ডাক দুবেলা কি একবেলা বিলি হয়, পাকা বাড়ীর সংখ্যা বেশী কি কাঁচা বাড়ীর সংখ্যা বেশী, বালাপোষের কারখানা রঘুনাথগঞ্জে আছে কি না, গুটিপোকার আবাদ ওদিকে কোথায় কোথায় হয়, এস্থান হইতে যাতায়াতেরই রেলভাড়া কত ইত্যাদি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করা যাইত; কিন্তু বিশিষ্ট ভদ্রলোকটি বাজে কাজে এখানে আসেন নাই,

গুরুদাসের বাড়ীর, বোধ হয় গুরুদাসের পরমাত্মীয়াই, শিউলিকে দেখিতে আসিয়াছেন, এবং দায়িত্বপূর্ণ আর ভাবনার একটা ব্যাপার উভয় পক্ষেরই ঘটিতে যাইতেছে; দ্বিতীয়তঃ ভদ্রলোকটির চোখের দিকে তাকাইয়া মনে হয়, ইহার প্রভুশক্তি অত্যন্ত প্রবল, সুতরাং ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইবে, ইহাই মনে করিয়া ত্রিলোকপতি একটা নমস্কারেই কর্ত্তব্য শেষ করিয়া চুপ করিয়া রহিল, দেনা-পাওনা পছন্দ-অপছন্দের দ্বন্দ্বও ভিতরে ভিতরে পীড়া না দিক, ভিতরে আছে, চুপ করিয়া বসিয়া ত্রিলোকপতি তাহাই অনুভব করিতে লাগিল।

আগেই অনেক কথা নিশ্চয়ই হইয়া গেছে, গুরুদাস এখন খুব উদাত্তকণ্ঠে বলিল, আগেও আপনাকে বলেছি, আবারও বলছি, আমি দরিদ্র, কিন্তু উচ্চাভিলাষী। আপনার ছেলের সঙ্গে আমি আমার সহোদরার বিবাহ দিতে চাই, এতেই আমার উচ্চাভিলাষ কত তা বুঝবেন।

গুরুদাসের উচ্চাভিলাষের কথাটা, বলিবার ভঙ্গীর দরুণ, কতক দম্ভের মতো শুনাইল, এবং ত্রিলোকপতি বুঝিল, গুরুদাস ইহার কাছেও নির্ব্বিবাদে খাটো হইতে চায় না।

ভদ্রলোকটি মৃদু একটু হাস্য করিলেন, ত্রিলোকপতির মনে হইল, ইনি চট্ করিয়াই হাসেন না, হাসির ভাণ্ডার হইতে হাসি যেন চুয়াইয়া বাহির হয়, এমনি ধীরে ধীরে হাসেন।

বলিলেন,—বেশ। ছেলেটাকে এখনও ত' দেখেন নি।

শুনিয়া গুরুদাস খুব মুরুব্বিভাবে একটু হাসিল; বলিল, সে আমার দেখাই। পিসীমা যা লিখেছেন, তার একটি বর্ণও মিথ্যা নয় তা আমি জানি। আর একটি কথা, ছেলে যে আপনার। বলিয়া গুরুদাস আনন্দে গদগদ হইয়া গা দুলাইল।

ত্রিলোকপতির মনে হইল, যে-টুকু বাকি ছিল ঐ কথার দ্বারাই গুরুদাস যেন তাহা শেষ করিয়া আনিয়াছে, অর্থাৎ বিবাহ হইবেই, কিছু বাদসাদ দিতে চাহিলেও ইনি আস্কারা দিবেনই।

—তামাক খান। বলিয়া রঘুনাথগঞ্জের ভদ্রলোকটি অচঞ্চলভাবে গড়গড়ার নল নামাইয়া রাখিতেই গুরুদাস যত লজ্জিত তত বিহ্বল হইয়া গেল, গড়গড়ার উপর হইতে সন্তর্পণে কলিকাটি তুলিয়া লইয়া এবং তাড়াতাড়ি নিজের হুঁকাটি তুলিয়া লইয়া ঘরের বাহিরে আসিল, সহোদরার শ্বশুর যিনি হইবেন তিনি এখন হইতেই গুরুজন বৈ কি!

বারকতক হুঁকা টানিয়া গুরুদাস ডাকিল, ত্রিলোক, শোনো।

ত্রিলোক শুনিতে গেল, কিন্তু তার মনে হইতেছিল, বিবাহব্যাপারে, সুকোমল শুভদ আর সুখদ বিবাহব্যাপারে, দেনাপাওনার কথাগুলি বড় কর্কশ লাগে, নানাপ্রকারের দেনাপাওনার উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাহা আদায় করা, আর তার প্রতিবাদ, মানুষের ভাল লাগার কথা নয়, স্বেচ্ছায় নয়, সানন্দে বাধ্য হইয়া, টানাটানিতে অবসন্ন হইয়া, দুঃসাধ্য বিবাহব্যাপার চুকাইতেই হইবে, ইহাতে মনটা বড় ধিক্ ধিক্ করে। যাহার নাম বিবাহ, অর্থাৎ চিরজীবী একটা মিলন, তাহারই সূত্রপাতে এই বাজার-দর দেখান, আর তাই কাটান, কেমন যেন কটু লাগে, মনে হয়, বিবাহের সম্ভ্রমহানি ঘটিতেছে, আর মাধুর্য্যের চমৎকারিত্ব-

নষ্ট হইল। যদি এমন হয় যে, একটি ছেলে আর একটি মেয়ের ভাব হইল, বিবাহে তাহারা সম্মত হইল তখন তাহারা হাত ধরাধরি করিয়া গেল মন্দিরে, পুরোহিত তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া দেবতার আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিলেন, একাত্মকারী মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তাহাদের মস্তকে নির্ম্মাল্য স্পর্শ করাইলেন, শ্বেতচন্দনে তাহাদের ললাট চর্চ্চিত করিয়া দিলেন, দেবতাকে জাগ্রত জানিয়া তাঁহারই গোচরে তাহারা বিবাহিত হইল।

যদি এমন হয় তবে মন্দ হয় না, অনেক দাহ জন্মেই না।

গুরুদাস চুপি চুপি বলিল, পঁচিশ ভরি সোনা চায়; দু'ভরি কমিয়ে তেইশ ভরিতে রাজি করেছি, অনেক কেঁটে-কেটে; হাজার-এক নগদ, তার উপর খাট-বিছানা, ঘড়ি-বাসন ইত্যাদি। প্রায় আড়াই হাজার কেবল দিতে হবে।

শুনিয়া ত্রিলোক আর্ত্তনাদ করিল; বলিল, –বাবা! তারপর বলিল,— তোমার সহোদরা আছে তা জানতাম না, তা আবার বিয়ের উপযুক্ত। বয়স হ'ল কত তাঁর?

—পনর চলছে নির্ব্বিবাদে। তুমি ভেবেছ বুঝি যে তাড়াতাড়ি গৌরীদান করছি, তা নয়। তবে ছেলেটি ভাল, এম, এ পড়ে, দেখতে শুনতে চমৎকার, লম্বা চৌড়া সুপুরুষ পয়সাওলা। এটাকে কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাইনে। বলিয়া গুরুদাস হুঁকা লইয়া উঠিল।

ত্রিলোক বলিল,—আমি যাই।

—আচ্ছা, এস! কাল এস। আজ আর খেলাটা হ'ল না। ফলাফল কাল শুনো।

ত্রিলোকপতি রাস্তার জ্যোৎস্নায় নামিয়া তার বাসার দিকে চলিতে লাগিল, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেছে। ফুলের কোরকের অভ্যন্তরে যেমন পরাগ থাকে, তেমনি একটি সূক্ষ্ম সুকোমল বস্তুকে চারিদিকে হইতে বেষ্টন করিয়া তাহার হৃদয় যেন মুদিত হইয়া গেছে।

পথে চলিতে চলিতে ত্রিলোকপতির সেই কোরকদৃশ্য পেলব অন্তরের অভ্যন্তর হইতে বিচিত্র রসস্রোত নির্গত হইতে লাগিল, অর্থাৎ সে ভাবিতে লাগিল, সর্ব্বস্ব নগদ দিয়া কে নিঃস্ব হইতে যাইতেছে সে কথা নয়, গুরুদাসের সহোদরা শিউলির বিবাহের কথা।

ত্রিলোকপতির মনে হইল বিবাহ অনুষ্ঠানটা বিধাতার অভিপ্রায় অনুসারে ঘটে কিনা কেউ জানে না; কিন্তু ঐ অনুষ্ঠানটি যে মানুষের অত্যন্ত গভীর চিন্তার পরিণাম তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ ঐ উপায়ে দুর্দ্দান্ত অতি প্রখর বাস্তব একটা জন্তুর নগ্নতা ঘুচাইয়া তাহাকে সংযতশীল পথে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। সেই মুক্তিদানের কোনো প্রকারান্তর নাই। কিন্তু পুরুষ যদি নারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ এবং তাহাকে অর্ধাঙ্গে ব্যাপ্ত করিয়া লইয়া ভূমিষ্ঠ হইত তবে কত যে খরচ বাঁচিত তার ইয়ত্তাই নাই, জীবনের কত সমস্যার উদ্ভবই হইত না, দুর্ভাবনায় মানুষ শুকাইয়া মরিত না।

ত্রিলোকপতি নিজের রসিকতায় একটু হাসিল।

কিন্তু তা হয় না। পশুপক্ষীদের কি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় কে জানে!

তাহাদের পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না নিশ্চয়, কেহ মন্ত্রপাঠ করায় না ; কেবল মানুষই নিজেকে এই বিষয়ে নিতান্ত পরাধীন করিয়া রাখিয়াছে, তার মানে আছে। মানুষকে আবদ্ধ করা হইয়াছে সত্য, অনেক দিক নিষিদ্ধ করাও হইয়াছে, কিন্তু তাহাকে সাধুজনের পরম ঈপ্সিত একটা ক্ষেত্রে অশেষ অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রটি সনাতন, নিষ্কলুষ, অধ্যাত্ম জাগরণ দ্বারা গ্লানি-নির্ম্মুক্ত সেই ক্ষেত্রে দেহের মিলন হয়, এবং মিলন সার্থক হয়। ইহাই সেই পরাধীনতার মর্ম্মার্থ, পশুর সঙ্গে তার পার্থক্য ঐখানে, কেবল সন্তান সৃষ্টিই তার উদ্দেশ্য নয়, হইতে পারে না।

মেয়েটিকে পুরুষ আসিয়া বিবাহ করিয়া লইয়া যাইবে। নির্ব্বোধ ব্যক্তির হঠাৎ মনে হইতে পারে, মেয়েটির বিবাহের বয়স হইয়াছে, অতএব মন্ত্রশক্তির দ্বারা জীবনে জীবনে একটা অকাট্য গ্রন্থি দিবার অভিনয় করিয়া পুরুষটি মেয়েটিকে লইয়া যাইবে সন্তানার্থে, এবং সুলভে এমন সব হাস্যোদ্দীপক স্থূল কাজ করাইয়া লইবে যার নাম হইবে স্বামীসেবা এবং গৃহস্থালী। অনেকের ধারণা এই নিয়মেই, অর্থাৎ ধাপ্পাবাজির উপরেই জগৎ চলিতেছে।

ত্রিলোকপতি চাঁদের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। কি আশ্চর্য্য, আজও কেহ কেহ মনে করেন, এই কুসংস্কার তাঁদের আছে যে, বিবাহ আর কিছুই নয়, উভয় পক্ষেরই অর্থাৎ স্ত্রী এবং পুরুষের জীবনযাপন সম্বন্ধীয় একটি সুবিধাজনক চুক্তিমাত্র, বিবাহের অন্য অর্থ টানিয়া আনিয়া যদি কেহ ভাবোন্মত্ত হন তবে তিনি হইতে পারেন, কিন্তু ব্যাপার ঐ। পুরুষের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়া স্ত্রী থাকিবেন পোষা, এবং উপযুক্ত ব্যবহার আর অন্নবস্ত্র না পাইলে স্ত্রী করিবেন গোঁসা। আবার কি চাই ?

গোঁসা করিবার অনুমতি স্ত্রীকে দেওয়া আছে।

ত্রিলোকপতি আবার একটু হাসিল।

ঐ ধৃষ্ট লোকগুলির প্রজ্ঞার ঐখানেই শেষ, তার বেশী অগ্রসর হইতে তারা শেখে নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখা যায়, অনেকেই আছে ভাল, পরস্পরে মিলও আছে, স্বামীর প্রতি স্ত্রী এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামী অনুকম্পাসম্পন্ন।

তারপর ত্রিলোকপতির মনে হইল, বিবাহের এটা নিতান্তই ঘরোয়া, অপরিণত আর রূঢ় দিক, স্থূল উদ্দেশ্যকে সার্থক করা মাত্র ; কিন্তু বিবাহের গভীর তাৎপর্য্যও রহিয়াছে, তাহার দিকে দৃষ্টি অধিকাংশেরই নাই, তবু তা আছে। স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলা হয়, মিথ্যা বলা হয় না ; স্বামী পতি ইহাও মিথ্যা নয় ; ব্যবহার করার মনোবৃত্তিই বেশীর ভাগ লোকের, ইহাও সত্য, কিন্তু তা একেবারেই ভুল, মানুষ ভারি ভুল করে, শোচনীয়ভাবে ঐখানটায় ভুল করিয়া সে বসিয়া আছে। বিবাহ ঐহিকও নয়, দৈহিকও নয়, বিবাহ পারত্রিক এবং আত্মিক। ইহা যে মানিতে না চায় সে উৎসন্ন গিয়াছে।

বিবাহের পরই নবদম্পতির চেহারার জৌলুস খুলিয়া যায় ইহা সবাই জানে। লোকে বলে, বিয়ের জলের গুণ। কিন্তু তা নয়। সত্তার গভীরতম সুখানুভূতির সঙ্গে তাহারা যে জগতে চক্ষুরুন্মীলন করে যেখানে আত্মাই কর্ত্তা, দেহ নয়, প্রকৃতি সুপ্তির শেষে সবগুলি দল উন্মোচিত করিয়া পূর্ণতম আনন্দে বিকশিত

হইয়া উঠে, ঐ শ্রী তাহারই, বিয়ের জলের নয়। উভয়ের গভীর অন্তরগত মিলন যেমন কামনাকে অভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় করিয়া তোলে, তেমনি দেহকে করে সুন্দর, মনকে করে পবিত্র, আত্মাকে করে অন্তর্মুখী। কাজেই দুজ'নারই চেহারা হয় এমন নবীন, যেন এক রাজ্য ছাড়িয়া অন্য রাজ্যে তাহারা নূতন করিয়া জন্ম নিল।...কেবল একটা লৌকিক স্থূল অনুষ্ঠানের পুনরাবর্ত্তন ঘটে, অন্তর্গত কোন নবতর পরিবর্ত্তন ঘটে না বলিয়াই দ্বিতীয়বার বিবাহের সম্মান নাই, শাস্ত্রেই তার মর্য্যাদা খুবই কম।

সংসারের যাবতীয় বিবাহিত ব্যক্তিকে এবং অন্যান্য অবুঝ লোকগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া ত্রিলোকপতি অতঃপর গুরুদাসের সহোদরার কথা, তার ভবিষ্যতের কথা, চিন্তা করিতে লাগিল।

এ-বিবাহ নিশ্চয়ই হইবে, এবং ইহাদের বনিবনাও নিশ্চয়ই হইবে; সবারই হাতে কুমারীর হৃদয়-অমরাবতীর চাবি নাই, তবু মেয়েটি সুখী হইবে, সবারই নিঃশ্বাসে মুকুল চোখ মেলে না, তবু মেয়েটি সুখী নিশ্চয়ই হইবে।...বন্ধু গুরুদাসের সহোদরা বলিয়া ত্রিলোকপতি শিউলির সুখাকাঙ্ক্ষা করিতেছে এমন নয়, সুখ তাহার পক্ষে স্বাভাবিক এবং অনিবার্য্য বলিয়াই ত্রিলোকপতির মনে হইতেছে।

শুনা যায় পুরুষ নারীর প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন, নারীকে যে অবজ্ঞা করে, বর্ব্বর যুগে পুরুষ নারীকে ভয় করিত, তার মৃদুতা, কোমলতা এবং দুর্ব্বলতাকে ভয়ের চক্ষে দেখিত—সেই ভয় এখন অবজ্ঞায় রূপান্তরিত হইয়াছে। তখন ভয় করিত কিনা জানা যায় নাই, এখন যে অবজ্ঞা করে তাহাও অবিসম্বাদিত সত্য নহে। পৃথিবী অন্যায় উক্তি এবং গর্হিত আচরণের দ্বারাই মৌলিক এবং উন্নত হইয়া উঠিতেছে। আশ্চর্য্য।

আশ্চর্য্য হইয়াই ত্রিলোকপতি মেসের বাসায় পেঁাছিয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, ভাত হয়েছে?

একটু দেরী আছে, বাবু।

—থাক, একটু জিরুই। বলিয়া ত্রিলোকপতি ঠাকুরেরই খাটিয়ার উপর উঠানে বসিল, তখন তার মনে হইল, মেয়েটি বাড়ীর ভতরেই মানুষ হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত বাড়ীর বাহিরে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে নাই—জ্ঞান অল্প হওয়া সম্ভব; কিন্তু ঠিক ঐ কারণেই অন্য দিকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে বোধ হয়। আজকাল বিবাহের পবিত্র বন্ধনের মর্য্যাদা মেয়েদের তরফ হইতেই সর্ব্বত্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত হইতেছে না, বন্ধন শিথিল করিয়া অনেকেই আনিতেছে, কেহ কেহ কাটিবার জন্য ছুরিও শানাইতেছে দেখা যায়। কোনো মেয়ে হয়তো শিক্ষায়তনের উচ্চ চূড়া হইতে অবতরণ করিয়া পাঁচ সাত বৎসর কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছেন, নিজের অভীষ্ট সাধনের উপায় নিজেই আবিষ্কার করিয়াছেন, জীবনের সুখোপকরণ নিজের জন্য নিজেই সংগ্রহ করিয়াছেন, নিজের রুচি অনুযায়ী অবসর যাপন করিয়াছেন, ইত্যাদি হয়তো পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে নির্দ্দোষভাবে কিন্তু অবাধে মেলা-মেশা করিয়াছেন।

তাঁহাকে ধরুন, বিবাহবন্ধন স্বীকার করিতে হইল, তারপর হঠাৎ একদিন ধরা পড়িল যে, তিনি ভুল করিয়াছেন, যাহা আশা কিংবা অনুমান করিয়াছিলেন ইহা

তাহা নহে, কর্ম্মময় জীবনের বহির্মুখী অভিসারই ভাল ছিল ; এখন যেন সবই উল্টাপাল্টা অস্বস্তিকর লাগিতেছে, মনের স্বাধীন স্ফূর্ত্তি ব্যাহত হইতেছে।

অথচ স্বামীকে তিনি ভালবাসেন। এবং ইহাও জানেন যে, চক্ষুলজ্জা বলিয়া একটি ভয়ঙ্কর জিনিস আছে, লোকে মনে করিতে পারে, তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া একথা উঠিতে পারে যে পারিবারিক শৃঙ্খলা এবং শান্তি নষ্ট যে করে তার শিক্ষা নিষ্ফল, বুদ্ধি অল্প, মন দুর্ব্বল, নৈতিক জ্ঞান নাই।

কাজেই বিক্ষোভ একটা চলিতেই থাকে, কিন্তু ভিতরে ; বাহিরে তার প্রকাশ হয় না। স্বামীকে ভালবাসেন বলিয়াই নিজের মনের অবস্থা তাঁহাকে জানাইয়া তাঁহাকে আঘাত দিতে মহিলাটি চান না, অপ্রত্যাশিত দিকে তৎপরতা দেখাইয়া বিরোধের সৃষ্টি করিতে চান না, নিঃশব্দে তিনি একটা অসন্তোষের যন্ত্রণা বহন করেন। এরূপ অবস্থা অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়।

কিন্তু ইহাদের তেমন কিছু ঘটিবে না। মাকড়সা যেমন দেহাভ্যন্তরের তন্তু বাহির করিয়া জাল প্রস্তুত করে, ইহারা শিউলি এবং তার স্বামী নিজেদের অন্তরের সূক্ষ্ম সমুজ্জল পরিবেশে শ্রী-অলঙ্কার সমন্বিত করিয়া সসাগরা পৃথিবী-ব্যাপী একটি কাল্পনিক আবাস নিৰ্ম্মাণ করিবে, যাহাকে কখনও মনে হইবে কুটির, কখনও মনে হইবে প্রাসাদ, কখনও উপবন, কখনও সৈকত, কখনও উদ্যান, কখনও স্বর্গ, কখনও অন্ধকার, কখনও আলোকিত, কিন্তু সর্ব্বদাই চমকপ্রদ এবং সুখদ।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিল, ভাত দেব, বাবু ?

ত্রিলোকপতি বলিল, দাও।

আহারান্তে ত্রিলোকপতি একটি সিগারেট ধরাইল, বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া আর বালিস লইয়া শুইল, চাঁদের আলো সমগ্র বারান্দায় পড়িয়াছে, ত্রয়োদশীর চাঁদ অত্যন্ত উজ্জ্বল।

শুইয়া শুইয়া ত্রিলোকপতির মনে হইতে লাগিল, রঘুনাথগঞ্জের ঐ বিশিষ্ট ভদ্রলোকটির পুত্রের সহিত শিউলির বিবাহ হইবেই, গুরুদাসের যেরূপ আগ্রহ দেখা গেল তাহাতে সে ক্ষতিকে ক্ষতি মনে না করিয়া এ বিবাহ দিবেই ; এবং আরো সস্তায় পাত্র কোথাও পাওয়া যায় কিনা তাহা সে অনুসন্ধান করিবে না।

কিন্তু ত্রিলোকপতি শিউলিকে দেখে নাই, সে আছে বলিয়াই ত্রিলোকপতি জানিত না। বরটি ত' একেবারেই অজ্ঞাত, তার নামই জানা নাই। কিন্তু তাহাতে ত্রিলোকপতির কিছুই অনিষ্ট ঘটিল না, অবলীলাক্রমে এখানকার শিউলির এবং রঘুনাথগঞ্জ নিবাসী সেই যুবকটির অনুপম মূর্ত্তি কল্পনা করিল, পাশাপাশি স্থাপিত করিয়া নয়, পৃথকভাবে। তার মনে হইল, গুরুদাসের সহোদরা শিউলি দেখিতে ভালই, ভাল না হইয়া সে পারে না, তার চক্ষু দুটি গভীর এবং বিমর্ষ, মনে হয় বিমর্ষ, কিন্তু বিমর্ষ তা নয়, কারণ অন্তর বিমর্ষ নয়, আনন্দ সেখানে ছলছল করিতেছে, তার চোখের ধরণই অমনি, যেমন স্বচ্ছনীর সরসীকে বিমর্ষ মনে হইতে পারে, যদি যে দেখে তার দৃষ্টি গভীর মনে হয়। বর্ণ খুব গৌর নয়, কিন্তু অত্যন্ত উজ্জ্বল, এত উজ্জ্বল যে মনে হয়, তার ত্বকের চেতনা

আছে, স্বতন্ত্র এমন একটা চেতনা যা অপর চেতনাকে অভিভূত করে, তার কাছে গিয়া যে দাঁড়ায় তার মুখেচোখে সেই ঔজ্জল্যের সুপ্রশ্ন আভা পড়ে। একটুখানি লম্বাটে গড়ন, পরিপূর্ণতায় আর পরিমাণ পরিপাট্যে তার দেহের অনিন্দ্য আনন্দ সুষমা যেন উৎসের মতো ঝরিতেছে, গতিতে একটি মৃদু লীলা আছে, কিন্তু কথায় তাহাকে পারা ভার, ভারি কৌতুকপ্রিয় ; ভাইপোগুলিকে অত্যন্ত জ্বালাতন করে, বৌদিকে ঠকাইবার দিকেও তার চেষ্টা আছে।

কিন্তু সকলের চাইতে সুন্দর সে তখন যখন সে স্নান করিয়া ভিজা চুল পিঠের উপর ছাড়িয়া দেয়, তখনই সে অপূর্ব্বকুমারী আর স্বভাবকুমারী, সুকুমার আর ধৌতকুমারী দেহে জলকণা আর রোদের আভা ঝলমল করিতে থাকে, চোখের পাতা ভিজিয়া বড় করুণ দেখায়। এমন একটি শিষ্টতা আর শালীনতা তার প্রত্যেক আচরণে আছে, যার জন্য তার বাড়ীর লোকের গর্ব্বিত হওয়া উচিত।

গুরুদাস নিশ্চয়ই গর্ব্বিত, নতুবা অত টাকা খরচ করিয়া অসাধারণ উৎকৃষ্ট পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দিতে বদ্ধপরিকর হইবে কেন।

কিন্তু সেই ছেলেটি ইহাকে কি প্রেমের চোখে দেখিবে! খুব প্রেমের চক্ষে দেখিবে সন্দেহ নাই। ইহার লজ্জায়, ইহার সঙ্কোচে, ইহার রূপে, ইহার বাক্যে, ইহার হাসিতে, ইহার অভিমানে, ইহার গুণে, এক কথায়, ইহাকে পাইয়া সে জীবনের স্বাদ পাইতে সুরু করিবে, এবং নিজেকে ধন্য মনে করিবে। ইহার অতি সরল অন্তঃকরণের আত্মদান হইবে অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী, আর, সেই ব্যক্তি, রঘুনাথ-গঞ্জের সেই যুবকটি সব এবং সর্ব্বস্ব পাইয়াও অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিবে ঐ অন্তরের দিকে, সেই অন্তরের অপরিমেয় রহস্য হইবে তার চিন্তার বিষয় আর তৃষ্ণার আকর্ষণ, সে সন্দেহ করিবে, ঐ হৃদয় দূরবর্ত্তী নয়, একেবারে ঢালিয়া দিয়া সমর্পণ করিয়াছে, তবু ঐ হৃদয়েরই অন্তর্ব্বর্ত্তী কি একটা বস্তু সে যেন উদ্ঘাটিত করে নাই— সেই বস্তু পাইতেই হইবে।

এই আকাঙ্ক্ষায় সে শিউলিকে আরো ভালবাসিবে, আরো কাছে পাইতে চাহিবে, কিন্তু যথার্থ ভদ্র বলিয়া অসহিষ্ণু হইয়া চাহিবে না। কেবল গভীর চাহনির মাদকতা নয়, দেহের সুষমা, যৌবনের উন্দামতা নয়, তাহাকে বন্দী করিবে শিউলির মনের লাবণ্য।

মনের লাবণ্য বলিয়া একটা জিনিসকে কল্পনা করিয়াই ত্রিলোকপতির সন্দেহ হইল, মনের লাবণ্য বলিয়া কিছু আছে কি। আছে, যেমন আকাশের লাবণ্য, চাঁদের লাবণ্য, হরিৎক্ষেত্রের লাবণ্য, তটিনীর লাবণ্য আছে, তেমনি শিউলির মনেরও লাবণ্য আছে, তার তা অসীম, আর তা এক মুহূর্ত্ত লুকান থাকিবে না, মানুষটি প্রতি-মুহূর্ত্ত তা দেখিতে পাইবে। সুতরাং শিউলির সঙ্গ হইবে তার আত্মার অবগাহন, কল্পনার পরিমার্জনা, আনন্দের অনুশীলন, বৈকুণ্ঠের সোপান।

চেতনাময় গভীরতার মাঝে তাহারা পরস্পরকে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে।

কিন্তু বরটি দেখিতে কেমন হইবে? কার্ত্তিকের মতো। মনে হইতেই ত্রিলোকপতির হাসি পাইল। মানুষের কি রুচি দেখ। পরিকল্পনার কি বাহাদুরী। মানুষের রূপ কার্ত্তিকের মতো। কার্ত্তিকের কথা মনে পড়িলেই যে চেহারাটা আমরা দেখিতে পাই তাহা জড়মূর্ত্তির, তাহাতে মানুষের মনের সে দীপ্তি কই!

চোখে-মুখে উদ্‌গ্রীবতা কই। জীবনের সদাচঞ্চল স্পন্দন কই! অথচ মানুষ কিনা কার্ত্তিকের মতো। মানুষের মুখ যে মোহ আর তন্ময়তা সৃষ্টি করিতে পারে কার্ত্তিক তা পারেন না। কার্ত্তিক যেন কর্ম্ম সমাপন করিয়া চিরদিনের জন্য বিশ্রামে বসিয়াছেন, অতএব তিনি বিগত, তাঁর অধর জিহ্বা চক্ষুধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া কাহারো প্রাণে নিঃশব্দে প্রতিধ্বনি তোলে না, যেমন মানুষের বেলায় ঘটে, বিশেষ করিয়া এই ছেলেটির যেমন করে, যার সঙ্গে শিউলির বিবাহ হইবে তার যেমন করে। সুপুরুষ যাহাকে বলে সে তাই, আর সে অত্যন্ত প্রাণময়, আর সে শিউলিকে অত্যন্ত ভালবাসিবে।

এইখানে ত্রিলোকপতির অলস এবং অবিরাম চিন্তায় একটু ব্যাঘাত ঘটিল।

মেসের বাবুরা আসিয়া পড়িলেন।

ত্রিলোকপতিকে বারান্দায় নিশ্চেষ্ট অবস্থায় শায়িত দেখিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রিলোকপতি খেয়েছ?

তাঁহারা ত্রিলোককে স্ত্রীলোক বলিয়া ডাকেন।

ত্রিলোকপতি বলিল, খেয়েছি।

—আমরাও খাইগে। ঠাকুর ভাত দাও। আজ কে হারলে?

ত্রিলোক বলিল, বাজি চটে গেছে।

—তাই বুঝি চাল ভাবছ শুয়ে শুয়ে?

—হুঁ।

বাবুরা হাত মুখ ধুইতে গেলেন।

ত্রিলোকপতি তখন ভাবিতে লাগিল, ইহারা পরস্পরকে ভালবাসিবে—অনায়াসে অবাধে ভালবাসিবে, সে ভালবাসার তুলনা নাই, শুভদৃষ্টির সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহারা পরস্পরকে ভালবাসিবে, সহজাত এবং সদ্যজাগ্রত একটা ঐশী আকর্ষণ দুর্নিবার হইয়া তাহাদের সংযুক্ত করিয়া দিবে, এই আকর্ষণে স্বার্থের হাত আদৌ নাই, একই অবস্থায় নিপতিত দুইটি অসহায় ব্যক্তির মুখাপেক্ষিতা ইহা নহে, শাসিতের প্রতি শাসকের অনুকম্পা বা অনুগ্রহ নহে, মোহ নহে, বুদ্ধি খরচ করিয়া নহে, কেবল হৃদয়ের প্রেরণায় হৃদয় দিয়া তাহারা ভালবাসিবে, সত্য অমলিন সর্ব্বান্তঃকরণব্যাপী সেই ভালবাসা, যৌবনের উৎকণ্ঠিত কম্পমান চঞ্চল উষ্ণ রূপজ প্রেম নহে, ইহা সেই অভিজাত অনাদি প্রেমের স্রোত যাহা নিদ্রিত আদিম পিতা ঘুম ভাঙিয়া দেখিয়াছিলেন আদিম নারীর নিষ্পলক বিহ্বল আর অকপট চক্ষু দু'টিতে। মানুষের এই ভালবাসাই সংসারকে অলৌকিক করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া ত্রিলোকপতির মনে হইল, মানুষের জীবনে আর আছে কি! এই প্রেমই তার জীবন, জীবন বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহারই সমষ্টি এই প্রেম, জীবনে যাহা কিছু উজ্জ্বল অপরূপ মনে হয় তাহা এই প্রেমেরই প্রতিবিম্ব, যাহা কিছু উপভোগ্য মনে হয় তাহা এই প্রেমের মিশ্রণেই হইয়া থাকে অর্থাৎ সংসারে বস্তু বলিয়া কিছু নাই, প্রেম যাহাকে তার মর্ম্ম আর মধু দিয়া সৃষ্টি করে তাই কেবল আছে, আর সব মরীচিকা আর মায়া। লোকে বলে, প্রণয়ী প্রণয়িনীর একজন ভালবাসে, আর একজন ভালবাসিতে দেয়। হয়তো এই সত্যই সাধারণ, কিন্তু তখনই পৃথিবীর

পুনরাবর্ত্তন অভিনব, উৎসবময় আর রসাভিষিক্ত হইয়া চোখে পড়ে যখন দু'জনাই ভালবাসিতে দেয়। ইহারা তা-ই দিবে, শিউলি আর তার বর।

এইখানে ত্রিলোকপতি খচ করিয়া একটা যন্ত্রণা অনুভব করিল—যদি তা না হয়।

কিন্তু না, তাহা হইবে না, হইতে পারে না, কারণ, দেবতা নিৰ্ম্মম নহেন।

সুখের ইতিহাস নাই, প্রেমেরও ইতিহাস নাই, কারণ তার উত্থানপতন, ভাগ্যবিপর্য্যয়, আদি মধ্য অন্ত নাই। ইহাদের ভালবাসার ইতিহাস কেবল এইটুকু যে তাহারা ভালবাসে।

ত্রিলোকপতি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত অনুভব করিল যে ইহাদের প্রেমে কলুষ থাকিবে না, কারণ কলুষ অপ্রসন্ন, আর জ্বালাময় ধ্বংস তার ভাগ্যে ঘটে, দ্বিতীয়তঃ কলুষের তীব্র একটা উদ্দীপনা আছে, সেই উদ্দীপনা বেদনা বহন করে আর অবসাদ আনে। এ দুর্ভাগ্য ইহাদের ঘটিবে না ; ইহারা ভালবাসিবে আর মনে করিবে, আত্মার মণিকোঠায় বসিয়া দেবতা স্বয়ং তাহা গ্রহণ করিতেছেন, ইহারা একথাটাও ভুলিবে না যে, প্রেম অর্জন করা মানেই প্রেমের অনশ্বরত্ব উপলব্ধি করা।

তারপর, ইহাদের কি বিরহ ঘটিবে না ? নিশ্চয়ই ঘটিবে, সংসারীর পক্ষে তা অনিবার্য্য, না ঘটান চলে না। বিরহের গভীর আর্ত্ততা তাহাদের চোখে ফুটিবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যে সুখ অনুভব করিবে তার সীমা-পরিসীমা নাই, তখন একটা অনাহত মধ্যাহ্নের উদয় হইবে, তাহার আলোকে তাহারা দেখিবে, অন্তরের দিগন্ত পর্য্যন্ত অত্যন্ত উজ্জ্বল, সেই উজ্জ্বলতাকে মহিমায় মণ্ডিত আর সৌন্দর্য্যে পুলকিত করিয়া বিরাজ করিতেছে একটি মাত্র মূর্ত্তি ; সেই মূর্ত্তি শিউলির বেলায় হইবে সেই ছেলেটির এবং সেই ছেলেটির বেলায় হইবে শিউলির। তাহারা তখন অধিকতর তদ্গতচিত্ত এবং অভিভূত হইয়া যাইবে। তারপর তাহারা পুনর্ম্মিলনের জন্য উন্মত্ত নয়, উন্মত্ততা অশোভন তাহা তাহারা জানে, তাহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, এবং পুনর্ম্মিলন অমনি ঘটিবে না, হর্ষে প্লাবিত হইয়া তাহারা বন্যার বেগে ছুটিয়া আসিয়া একত্রিত হইবে।

কিন্তু বড়ই মুস্কিল ঘটে, মানুষ যখন পরের মন বিশ্লেষণ করিতে বসে, নিঃশেষ হইয়াও অনুসন্ধান করিতে চায়, বিচার করিতে অগ্রসর হয় যে, যাহা সে দিয়াছে তাহার প্রতিদানে সে ষোল আনাই পাইয়াছে কি না। কিন্তু ইহাদের সে মতি হইবে না, কারণ, ইহারা সরল আর স্বাভাবিক, স্বাভাবিক আর শিক্ষিত। ইহারা জুয়াচুরি করে না, ইহাদের আত্মগোপনে রুচি নাই, পরের অন্তরের প্রতিবিম্ব নিজের ভিতর দিয়া দেখিয়া ইহারা মনে করে না, সেটি নিজেরই চোখের ভুল, আত্ম বলিয়া কিছুই সে দান করে নাই। এমনি যদি কেহ মনে করে তখন সে নিজেকে মনে করে বন্দী, বন্দিত্বের ভিতর হইতে তখন সে পলায়ন করিতে চায়, কিন্তু তাহা সত্য কেবল কৃত্রিম বিনিময়ের পক্ষে, ইহাদের প্রেমে কৃত্রিমতা নাই, যাচাই করিয়া নিজেকে ক্ষুদ্র করিতে ইহারা জানে না। সুতরাং ইহারা অমর।

মানুষের প্রেমের ট্র্যাজিডি মৃত্যুতে নয়, বিরহে নয়, অবসাদে আর ক্ষুদ্রতার পরিচয়ে, আর উদাসীনতায়।

ত্রিলোকপতি মনে মনে একটু বক্র হাসি হাসিল, নিজেরই উদ্দেশে।

খারাপ হালকা আয়নার ভিতর ছায়া যেমন বিকৃত অদ্ভুত দেখায় এও তেমনি, অর্থাৎ তাহার নিজের মন অতিশয় ক্রূর বলিয়া প্রেমের এই অসম্ভব বিকৃতির কথা সে ভাবিতেছে।

সে যাহা হউক, যে স্থানে ইহারা পরস্পরকে ভালবাসিবে সে স্থান হইবে তীর্থতুল্য, সে স্থানটি কি এবং কেমন তাহা ত্রিলোকপতি আগেই ভাবিয়া রাখিয়াছে, সে স্থানটি তাহাদের হৃদয়ের রাসমন্দির, এই স্থানের অনন্ত রূপান্তর কেবল তাহাদেরই কেন্দ্র করিয়া আসিবে, যাইবে এবং আবর্ত্তিত হইবে। ঐ স্থানটা মানুষের চোখে পড়িবে না কিন্তু মনে জাগিবে, নির্নিমেষ অপলক হইয়া জাগিবে, মানুষের শ্রদ্ধার প্রণিপাতের স্পর্শে তাহাদের প্রেমের ঐতিহ্যের সৃষ্টি হইয়া সে স্থান হইবে অক্ষয়, আর চিরবরণীয়, ধ্যানে মাত্র উপলব্ধি করার মতো একটা অশরীরী মন্দির সেখানে গড়িয়া উঠিবে, জগদতীত মূল্য তার মানুষে বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না, কেবল স্মরণ করিয়া অপার্থিব রসসিঞ্চনে ধন্য হইয়া যাইবে।

উচ্চারণ করিবে এখানে ভালবাসা জন্মিয়াছিল, স্থিতিলাভ করিয়াছিল, কিন্তু বিলুপ্ত হয় নাই—সুন্দরের মর্ম্মে আর প্রকৃতির বক্ষ-কুহরে তাহা সঞ্চিত হইয়া আছে।

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ইহাই।

এই তীর্থ আবিষ্কারের পর ত্রিলোকপতি অতিশয় মুগ্ধ হইয়া শয়ন করিতে গেল, সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিল, চির-আকাঙ্ক্ষিত আরাধ্য বস্তুকে লাভ করিয়া মনটা যেন গ্লানিহীন পরম তৃপ্তির মাঝে ডুবিয়া আছে।

বৈকালে গুরুদাস বলিল,—বুড়ো ভারি ঠ্যাটা হে, কিছুতেই বাগ মানতে চায় না, কিছুতেই কমালে না। কি করি, তাতেই রাজি হয়েছি। ৭ই বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে।

ত্রিলোকপতি বলিল,—বাঁচলাম।

ত্রিলোকপতির ভয় হইয়াছিল পাছে এই সম্বন্ধ ভাঙিয়া যায়। কিন্তু গুরুদাসের মনে হইল, ত্রিলোকপতি ঠাট্টা করিল, তাহার কি দায় যে শিউলির বিবাহের দিন স্থির হওয়ায় সে বাঁচিয়া গেল!

কিন্তু ইহা সে জানে না যে, ত্রিলোকপতি এই বিবাহ হইবেই মনে করিয়া কত মাথা ঘামাইয়াছে, আর হওয়াটা দেখিবার জন্য সে কত উদগ্রীব হইয়াছে। এই বিবাহটি নিষ্পন্ন হইলেই ত্রিলোকপতির তীর্থ-যাত্রা সার্থক হইবে, যদিও তীর্থটি অবস্থান করিতেছে নিতান্তই তার মস্তিষ্কে।

৭ই তারিখ শীঘ্রই আসিয়া পড়িল।

ত্রিলোকপতি বাজার টানিল, সামিয়ানা খাটাইল, সামিয়ানার বাঁশ ভাঙিয়া আছাড় খাইল এবং আরও কত কাণ্ড করিল তাহার হিসাব নাই।—বরযাত্রীগণ আসিবার পূর্ব্বে যে গোলমাল আর খাটুনি আর ব্যতিব্যস্ততা ছিল, তাহারা আসিবার পর তাহা চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল, সবাই পরিশ্রম করিতেছে, কিন্তু দেখা গেল ত্রিলোকপতি করিতেছে সকলের চতুর্গুণ।

মসলা-পেষা, শিল-নোড়া ধোয়া হইতে জনৈক বরযাত্রীর জন্য সেতার সংগ্রহ সে-ই করিল, বরযাত্রীদের জল-পান-তামাক-চা দিল, বরকে বাতাস করিল।

বরের বাবা সেই বিশিষ্ট ভদ্রলোকটিকে করযোড়ে নমস্কার করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, ভাল ছিলেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার খবর ভাল ?

কিন্তু জবাব দিবার সময় ত্রিলোকপতি পাইল না।

কে একজন চায়ে আরো খানিক চিনি চাহিলেন, ত্রিলোকপতি চিনি আনিতে দৌড়াইল।

ত্রিলোকপতি উঠান ঝাঁট দিল, পাতা করিল, জল দিল ইত্যাদি সে না করিল কি! সে মানুষকে খাওয়াইল, সমাদর করিল, যত্ন করিল, উৎসাহিত করিল, আপ্যায়িত করিল, একটা ভৃত্য গুরুদাসের ধমক খাইয়া রাগ করিয়াছিল, ত্রিলোকপতি হাতে ধরিয়া তার রাগ ভাঙাইল।

প্রীতি-উপহার বিতরণও সে-ই করিল, এবং সম্প্রদানের পর বর-কন্যা বাসরঘরে গেলে ত্রিলোকপতি খালি একটি রসগোল্লা মুখে দিয়া এক গ্লাস দধি পান করিল।

কৃতজ্ঞ গুরুদাস উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিল,—আর কিছু খাবে না ?

—না। খিদে নেই।

—অত ঘাঁটাঘাঁটির পর খেতে রুচি নেই, কেমন ?

—তাই।

—বর কেমন দেখলে ?

—চমৎকার, চমৎকার, চমৎকার! বলিয়া ত্রিলোকপতি তার তীর্থের দিকে চাহিল, মনে হইল, কিছুই ভুল করি নাই।

গুরুদাস বলিল, শিউলির সঙ্গে মানিয়েছে বেশ।

—আমি তা জানতাম।

—হিতৈষী তুমি, খুশি ত' হবেই।

ত্রিলোকপতি বলিল,—আসি এখন।

—এস। ভারি খেটেছ। আচ্ছা, এর পুরস্কার তুমি পাবে। বলিয়া গুরুদাস পুলকিত কণ্ঠে হাসিতে লাগিল।

ত্রিলোকপতি তার মেসের বাসার দিকে চলিতে লাগিল, কিন্তু এত ক্লান্তির পরও যেন পথ দিয়া নয়, আকাশ দিয়া, চরিতার্থ হইয়া তার মনে হইতে লাগিল আমিই পথ করিয়া দিলাম।

নিত্যধন চাটুয্যের অপরাধ

কি একটা উপলক্ষে সহদেব যেন ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজন করিতেছে।

"খাওয়ায় সহদেব সেন"—এই খ্যাতিটি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়, সহদেব সেন সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া আয়োজন করিতেছে, ইহাও শুনা গেল; আরো শুনা গেল যে, দিনটাও ঠিক হইয়া আছে।

আয়োজন যথাযোগ্য, রীতিমত, কেহ কেহ বলিল, "অভূতপূর্ব্ব"।

শুনিয়া ভূদেবগণের রসনা চঞ্চল হইয়া উঠিল। চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে ভট্টাচার্য্যের পথে সাক্ষাৎ হইয়া যাইতেই উভয়েই দাঁড়াইয়া গেলেন।

সহদেবই তখন সম্মুখে উজ্জ্বলতম।

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, শুনেছ হে, সহদেব খাওয়াবে।

শোনা কথাই; তবু পুনরায় শুনিয়া ভট্টাচার্য্যের মুখ উৎফুল্ল হইয়া রহিল, বলিলেন, শুনেছি। তুমি শুনলে কার কাছে?

—কাগের মুখে। তোমার সন্দেহ আছে না কি?

—বিন্দুমাত্র না।

—বাবা বাঁচলাম। কতদিন যে পেট ভ'রে ভোজ খাইনে তা মনেও পড়ে না।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, পেট ভ'রে খাওয়াতে আর কে জানে! রয়েছে ত' অনেকেই!

—ঘোষালে আর আমাতে সেই কথাই বলছিলাম তখন; খাওয়ানোটা উঠে যাচ্ছে দিন দিন। ভেতরের খবর কিছু রাখ নাকি আয়োজনের? শুনছি বিরাট ব্যাপার!

—ক্রমশঃ প্রকাশ্য। এখনও ত' দিন সাতেক দেরী আছে। বলিয়া ভট্টাচার্য্য পা বাড়াইলেন।

এবং পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া যে-হাসি হাসিয়া তাঁরা যে-যার পথে গেলেন সে হাসি কেবল সরস রসনার গুণেই চিত্তহারী।

সময় যত যায় গুজব তত জোরাল আর ঘোরাল আর রসাল হইয়া উঠে।

শুনিতে শুনিতে আর ভাবিতে ভাবিতে চারু ঘোষালের হঠাৎ এক সময় একটা বেগ আসিয়া গেল, তিনি আসিয়া বিশ্বসুখ সান্ন্যালকে ডাকিয়া ডাকিয়া অন্তঃপুরের বাহিরে আনিলেন, হাসিমুখে বলিলেন, শুনেছ হে, সহদেবের কারখানাটা? না, বাড়ীর ভেতরেই চুপচাপ বসে আছ? অতুলনীয় যে ব্যাপার প্রায় অভাবনীয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে তাহার কথা মুখে বলা যায় কত? সুতরাং প্রশ্ন করিয়া চারু ঘোষাল বিশ্বসুখের মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

কিন্তু বিশ্বসুখ বাড়ীর ভিতর গামছা পরিয়া শাক-ক্ষেতের মাটি প্রস্তুত করিতেছিলেন, আনন্দের বার্ত্তাসহ ঘোষালকে তাঁর উৎপাত মনে হইল, মাটিমাখা হাতের দিকে চাহিয়া তিনি বিরক্তমুখে বলিলেন, কে অত খবর রাখে।

ঘোষালের উদ্যম নিবিয়া গেল।

—এঃ, বিরক্ত দেখছি যে বড়। তবে থাক। বলিয়া ঘোষাল আন্তরিক ক্লেশ পাইয়া সেখান হইতে ফিরিলেন।—কিন্তু মানুষ মাটিতে পড়িয়া মাটি ধরিয়াই ওঠে। ঘোষাল দৌড়াইয়া আসিয়া যাদব চক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানায় উঠিলেন।

বলিলেন, শুনেছ, চক্কোত্তি, তোমাদের বিশ্বসুখ সান্যাল আমাদের আর মানুষ মনে করে না?

যাদবের হাতে কাজ ছিল না, কেবল মধুপান করিতেছিলেন; বলিলেন, বলো, কি হয়েছে বলো।

মর্ম্মাহত ঘোষাল তখনই বসিলেন না, বলিলেন, মোকদ্দমায় জিতে এখন মানুষকে যেন শিঙে তুলে আছড়াতে চায়।

ঘোষালের রাগ দেখিয়া চক্রবর্ত্তী ঠাণ্ডা সুরে বলিলেন, বস; তামাক খাও। শুনছি।

ঘোষাল বসিলেন; বলিলেন, তামাকের কথায় মনে প'ড়ে গেল সহদেব নাকি দু'টিন তামাক খাস গয়া থেকে আনাবে।

—সে ত' সেই দিনটা কেবল। তা বলে আজকে এ তামাকে অরুচি করো না।

—না তা করিনি। আমাদের এ তামাকই বা নিন্দের কিসের?

—সান্ন্যালের কথা কি বলছিলে? নাও।

হুঁকা লইয়া ঘোষাল বলিন, একটু তোয়াজ করে তাকে বলতে গেলাম, 'শুনেছ হে সহদেবের কারখানাটা?'—এসব কথা নিয়ে মানুষ একটু আনন্দ করতেই চায়: কিন্তু সে শুনে তেড়ে উঠল, যেন আমি তার কিই না করেছি। বলিয়া নির্যাতিত ঘোষাল একটু ক্লেশের হাসি হাসিয়া আরও বিষণ্ণ হইয়া গেলেন।

—যাক গে সে-কথা। কি এমন খবর নিয়ে গিয়েছিলে শুনি?

—ঐ খবরেরই খবর, আজকাল যা চলতি। শুনলাম দই আসছে জিয়াগঞ্জ থেকে; ছুরিতে করে কেটে কেটে চাপ চাপ পাতে দেবে।

বলিয়া ঘোষাল লক্ষ্য করিলেন যে, খবর শুনিয়া চক্রবর্ত্তী বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই, মৃদু হাসিয়া চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কিছু খবর রাখো?

—কই, আর কিছু ত' শুনিনি আপাততঃ। বলিয়া ঘোষাল মনে মনে হতাশ হইয়া গেলেন, চক্রবর্ত্তীর ভাব দেখিয়া তাঁর মনে হইল, যেন তাঁর আগেই আরো জবর সংগ্রহ করিয়া মজবুত হইয়া বসিয়া আছে।

ঘোষালের অনুমান ঠিক।

যাদব চক্রবর্ত্তী দু'টি আঙুল তুলিলেন, তর্জনী আর মধ্যমাটি; বলিলেন, মাত্র দু'আনা খবর তুমি জানো, আনা বারো আমার কাছে শোনো।

—আর দু' আনা?

—ব্যাকুল হ'য়ো না, আর দু' আনা কাল এসে শুনে যেও।

—বারো আনাই বলো শুনি।

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, শোনো। জেলা যশোহরের অধীন তপাগাছির বিল থেকে আসছে কৈ মাছ, যশোরের প্রসিদ্ধ কৈ, তার প্রত্যেকের পেটটাই এক বিঘৎ।

বলিয়া এক বিঘৎ বলিতে কতটা স্থান বুঝায়, তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা পরস্পর হইতে দূরে লইয়া চক্রবর্ত্তী তাহা দেখাইলেন ; তারপর বলিলেন, ছটা ক'রে এই মাছ ফি ব্রাহ্মণে পাবে ; দু'টো ভাজা, দু'টো সর্ষে-পাতুড়ী।

বলিয়া থামিতেই ঘোষাল জিজ্ঞাসা করিলেন, আর দু'টো ?

—বোধ হয় ঝোলে। সেই কৈ মাছের পেটের তেলে বড়া হবে।

মুখ তিক্ত করিয়া ঘোষাল বলিলেন, তেলের বড়া প্রায়ই তিতো হয়।

—খেও না। কেবল মাছই খেও।

—আচ্ছা, ওদিকটা নিশ্চিন্দি, তারপর ?

—তারপর ত' বিস্তর ; কিন্তু খেতে হবে যেমন একটির পর একটি, সবুর স'য়ে স'য়ে, শুনতেও হবে তাই। তারপর গলদা চিংড়ী দেড় মণ ; রুই।

—দেড় মণ হ'লে ক'টি করে পড়ে ?

—ফি ব্রাহ্মণের ? সে হিসেব ক'রে ওরাই তখন দেবে।

—প্রচুর আসছে। গাদার মাছ ব্রাহ্মণের পাতে পড়বে না, যত পারো পেটিই কেবল।

—বল কি। বলিয়া খানিক দম লইয়া ঘোষাল জিজ্ঞাসা করিলেন, ওদিককার খবর ত' একরকম শোনা হ'ল, এদিকে ভাত না লুচি ?

ঘোষালের এই অর্ব্বাচীন প্রশ্নে চক্রবর্ত্তী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন ; বলিলেন, সহদেব কখনো সাদা ভাত ব্রাহ্মণকে খাইয়েছে। আর, লুচি হ'লে কি মাছের অত যোগাড় করে। বড় দমিয়ে দিলে তুমি। কিসের সঙ্গে কি খাটে তাই জানো না ভাল ক'রে, তুমি গিয়েছিলে বিশ্বস্থখ সান্ন্যালকে খবর দিতে। এ বিষয়ে কাউকে খবর দিতে যাবার আগে আমার কাছে একটু বসে যেও, ঠকতে হবে না।

চক্রবর্ত্তীর ঐ কথাগুলি ধমক্ নয়, বিদ্রূপ নয়, প্রীতি।

চক্রবর্ত্তীর বন্ধুপ্রীতিতে হৃষ্ট হইয়া ঘোষাল হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, ভাতও নয়, লুচিও নয় ; তবে কি পোলাও ?

— হ্যাঁ, ঘি যাচাই করা লেগে গেছে। মুর্শিদাবাদ থেকে দর।

—নমুনো এসেছে।

চক্রবর্ত্তী নিঃশব্দ হইলেন।

এই ধারণাতীত অনুষ্ঠানের সম্মুখে ঘোষালেরও রা সরিল না, খানিক নিঃশব্দ থাকিয়া তিনি উঠিলেন।

কিন্তু কথার শেষ তখনও আসে নাই।

ঘোষাল উঠিয়া যাইতেই চক্রবর্ত্তীর ব্রাহ্মণী হরিভাবিনী অন্তরাল ত্যাগ করিয়া স্বামীর সম্মুখে আসিলেন ; এদিক ওদিক তাকাইয়া বলিলেন, কেউ এসে পড়বে না ত'?

—না। কি আরজ তোমার ?

হরিভাবিনী বলিলেন, তোমাদের ঘোষালের গলা শুনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তোমাদের ত' কবে থেকেই জিব দিয়ে জল ঝরছে ; খবর রেখে বেড়াচ্ছ ; আলোচনা আর আনাগোনার অন্ত নেই। মেয়েদেরও বলবে কি না সে খবর রাখ না ?

চক্রবর্ত্তীর পাঁচ বছরের মেয়ে উমাতারা বলিল, বাবা, আমিও যাব ভোজ খেতে তোমার সঙ্গে।

চক্রবর্ত্তী কন্যার চিব্নকে আঙ্গ্নল ছ্বঁইয়া আদর করিলেন ; বলিলেন, যাবে বৈ কি।

উমা বলিল, খেয়ে পেট এমনি ডাগর হবে, নয় বাবা ? বলিয়া পেট ফাঁপাইয়া আর পেটের খানিক ঊর্ধ্বে শ্নন্যে হাত তুলিয়া ডাগর পেটের যে আয়তন উমা দেখাইল তাহা অসম্ভব।

হ্নঁ। বলিয়া চক্রবর্ত্তী বিপ্নল উদ্যমে হাসিতে লাগিলেন।

হরিভাবিনী বলিলেন, আমার কথার কি হ'ল ?

—খবর নিচ্ছি দাঁড়াও।

—দাঁড়িয়ে ত' আছিই, কিন্তু খবর নিতে তোমার বয়ে গেছে।

না নেব ; তদ্বির করব যাতে আর কারো না হোক আমার সস্ত্রীক নেমন্তন্ন হয়।

—তা আবার করতে যাবে তুমি। স্তোকবাক্য বলছ এখন, আমি চলে গেলেই তোমার কিছ্ন মনে থাকবে না।

চক্রবর্ত্তী প্রতিশ্রুতি দিলেন, না, থাকবে।

হরিভাবিনী প্রথমে স্তোকবাক্য বলিয়া স্বামীর কথায় উপেক্ষার ভাণ করিলেও দ্বিতীয়বার প্রতিশ্রুতি পাইয়া যথার্থই আশান্বিত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

উমা মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছিল, হাঁটু বাজাইয়া আগ্নডুম বাগ্নডুম স্বরে সে গাহিতে লাগিল, মা যাবে, বাবা যাবে, আমি যাব।

সেইদিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে চক্রবর্ত্তী হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিলেন,—আঃ হা, বলতে ভুলে গেলাম, যা ত' উমা তোর মাকে বল গিয়ে, আমার একখানা কাপড় যেন সাবানে কেচে রাখে।

পরদিন একটা আনকোরা স্নসমাচার লইয়া চার্ন ঘোষাল স্ফীতচিত্তে যাদব চক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানায় পেঁাছিয়া দেখিলেন, সেখানে আরো অনেকে সমবেত হইয়াছেন, কিন্তু ঘোষালকে দেখিয়াই তাঁহারা যেন চলতি একটা কথা হঠাৎ চাপা দিয়া একটু জড়সড় হইয়া গেলেন, আর তা স্পষ্ট হইয়া ঘোষালের চোখের উপরেই ঘটিল।

বাড়ী চক্রবর্ত্তীর, তিনি অভ্যর্থনা করিলেন,—এস, ঘোষাল, বস। নতুন খবর কি ওদিক্কার ?

ঘোষাল একবার সকলের ম্নখের দিকে চাহিলেন ; তারপর বলিলেন—খবর ত' ছিল, কিন্তু তোমাদের ভাব দেখে খবর দিতে আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে না।

শ্ননিয়া কেহ কাহারো দিকে না চাহিয়া প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে একটু হাসিলেন, ষড়যন্ত্র সফল হইয়াছে।

ঘোষাল প্ননরায় বলিলেন,—আমি কিন্তু এঁচেছি কতক।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, ছাই এঁছে। খবর কি বলো দেখি, আমাদের কাছেও এত খবর মজ্নত রয়েছে। বলিয়া তিনি দক্ষিণ হস্ত তরঙ্গের গতিতে চালিত করিয়া উলটান ধামার মতো স্নবৃহৎ একটি আধার কল্পনা করিলেন।

অবনত ম্নখ তুলিয়া মন-মরা ঘোষাল বলিলেন, শ্ননলাম কলকাতা থেকে কাঁকড়া আর ভেটকী মাছও আসছে।

—তুমি চিরদিন পিছিয়ে রয়ে গেলে। বহুৎ পুরাণো খবর, আমরা এ খবর শুনেছি প্রায় আঠার ঘণ্টা হ'ল। বলিয়া চক্রবর্ত্তী অট্টহাস্যকরতঃ নিমচাঁদ গোস্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—আঠার ঘণ্টাই, কি বল ?

গোস্বামী বলিলেন, আর কিছু বেশী বই কম হবে না।

পুরাতন সংবাদ আনয়ন করিবার লজ্জায় ঘোষাল মরমে মরিয়া গেলেন।

যেমন করিয়া ছেলেরা ধাঁধার উত্তর জিজ্ঞাসা করে তেমনি করিয়া বিনায়ক মুখুজ্জে প্রশ্ন করিলেন, বল দেখি ঘোষাল, কাঁকড়া আর ভেটকী যদি জুৎমত না মেলে তবে কি করবে সহদেব ?

ঘোষাল উত্তরটা জানিতেন না, অজ্ঞতার দরুণ নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া বলিলেন, তা ত' জানিনে।

—তবে কিসের বাহাদুরী তোমার। সকল খবরের চেয়ে টাটকা খবর যেটা সেইটাই তোমার জানা নেই। যদি কলকাতায় বাজারে দৈবাৎ কাঁকড়া আর ভেটকী না মেলে তবে গোয়ালন্দ থেকে—

নির্ব্বাপিত ঘোষাল চোখ-মুখ উজ্জ্বল করিয়া মুখুজ্জের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া লাফাইয়া উঠিলেন, ইলিশ!- ঈশ্বর করুন, কলকাতার ভেটকী আর কাঁকড়া মাছের বাজার যেন পুড়ে যায়। ভেটকী আর কাঁকড়া কি আর মাছ! জলের পোকা। বলিয়া ঘোষাল কাঁকড়া আর ভেটকীর প্রতি ঘৃণাবশতঃ নিম্নোষ্ঠকে নাসিকার দিকে ঊর্ধ্বোষ্ঠকে নাসিকার দিকে ঠেলিয়া তুলিলেন।

গোঁসাই শুধাইলেন, বল দেখি ঘোষাল, ঘি মুনাসিফ হয়েছে কোথাকার ?

—মুর্শিদাবাদের।

এবার ঘোষালের উত্তর নির্ভুল হইয়াছে।

—আনারস আর আম আসছে কি না ?

—আসছে।

—নিমন্ত্রিতের ফর্দ্দ প্রস্তুত হয়েছে কিনা? প্রশ্ন করিয়া গোঁসাই সঙ্গীদের দিকে চাহিয়া সঙ্গীহারার মতো যেন খানিক গুটাইয়া গেলেন।

ঘোষাল থতমত খাইয়া বলিলেন, হয়েছে শুনেছি।

ঘোষালের উত্তর এবারও নির্ভুল।

কিন্তু তারপরই সবাই নীরব হইয়া রহিলেন, যেন একটা বেদন পরিপাক করিতে হইতেছে।

ফর্দ্দ প্রস্তুতের প্রশ্নের পরেই হঠাৎ এই নীরবতার একটা নিদারুণ অর্থ অব্যর্থ বিপুল বেগে ঘোষালের বুকে বাজিয়া উঠিল, একদৃষ্টে মাটির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে যেন কান্না চাপিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, ফর্দ্দে বুঝি আমার নাম নেই ?

কেহ জবাব দিলেন না।

মুখুজ্জে চক্রবর্ত্তীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—ভীম নাগ, শুনলাম, অর্ডার নেয় নি, তস্য ভ্রাতা শ্রীনাথ নাগ নিয়েছে। দু'ভাই সমান, এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।

যে যাহাকেই দেখুক, আপাততঃ ঘোষালের তাহাতে কিছু যায় আসে না, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

গোঁসাই ভুরু তুলিয়া জানিতে চাহিলেন, লড়তে যাচ্ছ না কি।

—যাচ্ছি বই কি! কে তাকে পরামর্শ দিয়েছে শুনে আসি। আমার চেয়ে ব্রাহ্মণের খাঁটি রক্ত কার বেশী আছে বলে সে জানে তাও শুধিয়ে আসি। বলিয়া ক্রুদ্ধ ঘোষাল ত্বরিতপদে উঠানে নামিলেন।

উমার বাবা যাদব চক্রবর্ত্তী তাঁর পশ্চাতে হাঁকিয়া বলিলেন, মেয়েদের নেমন্তন্ন হবে কিনা সে খবরটাও অম্নি নিয়ে এস।

কিন্তু সংবাদটা বানানো।

ঘোষালকে ক্ষ্যাপানো মাত্র।

সহদেব হাসিয়া বলিল,—রামঃ, আপনাকে বাদ! এই দেখুন ফর্দে আপনার নাম তৃতীয় স্থান অধিকার ক'রে আছে।

* * *

আজ সেই বহু আলোচিত ও প্রতীক্ষিত ভোজ।

উঠানের চারি প্রান্ত জুড়িয়া সামিয়ানা খাটান হইয়াছে। সামিয়ানার কেন্দ্র-স্থলে শালুর রক্তপদ্ম সেলাই করা। চারিকোণে তিনটি করিয়া গোলাপের পাতা, ঐ শালুর, আর সেলাই করা। মাটিতে কি যেন ছিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে, একটা মৃদু সুঘ্রাণ উঠিতেছে। বিন্দুমাত্র অপরিচ্ছন্নতার ভাব কোথাও নাই।

সহদেব সেন কদলীপত্রে আর মেটে গেলাসে ব্রাহ্মণ-ভোজন করায় না; আর পাতের উপর ভাত তরকারী স্তূপীকৃত করিয়া দিয়া, আর ডাল ঝোল টক চাটনী ভাজা সুক্তো দই ক্ষীর বেপরোয়া ঢালিয়া দিয়া বারমিশেলী কটু আস্বাদ আর ভোজনকারীর নিগ্রহের একশেষ করে না।

প্রত্যেক ব্রাহ্মণের জন্যই কাংস্য পাত্রের বন্দোবস্ত, থালা বাটি গেলাস রেকাবী যত লাগে। যেটা ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা, রেকাবীর উপর হ'তে, কি বাটির ভিতর হইতে আঙুলে করিয়া এতটুকু তুলিয়া, কি অঞ্জলি ভরিয়া তুলিয়া, কিম্বা সুবিধা বুঝিলে চুমুক দিয়াই খাও।

পরিবেশনকারী সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘামিতেছে দেখিয়া, আর মনে মনে তাড়না করিতেছে বুঝিয়া, বিব্রত বোধ করিতে হইবে না, তাড়াতাড়ি নাই, না চিবাইয়া গ্রাস নামাইতে হইবে না।

এক কথায় নিশ্চিন্ত তৃপ্তির চূড়ান্ত।

প্রত্যেকের জন্য সুগঠিত মসৃণ কাষ্ঠাসন।

ব্রাহ্মণগণ দৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলেন, যেন ময়দানব স্বয়ং আসিয়া সভা সাজাইয়াছে, এতগুলি কণ্ঠে না হোক, এতগুলি প্রাণে ধন্য ধন্য রব উঠিল, সজ্জিত আসন-পংক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া গললগ্নীকৃতবাস-কুণ্ঠিত বিনয়াবনত সহদেবকে তাঁহারা স্মিতদৃষ্টির দ্বারা অভিনন্দিত করিলেন।

সহদেব যুক্তকরে নিবেদন করিল, ব্রাহ্মণগণ উপবেশন করুন।

ব্রাহ্মণগণ উপবেশন করিলেন।

চারিদিক ঝকমক করিতেছিল।

শুভ্রবসন ব্রাহ্মণগণ আসনে উপবেশন করিতেই স্থানের ঔজ্জ্বল্য আরো বাড়িয়া গেল।

পরিবেশন সুরু হইল, শেষ হইল, থালার চতুর্দ্দিকে বাটি রেকাবীর আর অন্ত রহিল না। দেখা গেল, ভোজনায়োজনের গুজব যা রটিয়াছিল তাহার একটি বর্ণ অতিরঞ্জিত বা একটি অক্ষর অত্যুক্তি নহে।

ব্রাহ্মণগণ আচমন করিলেন।

পরস্পরের অনুমতি লইলেন; ভাতে হাত দিতে যাইবেন এমন সময় বৃদ্ধ কুমারদেব অধিকারী কৌতূহলী হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, সহদেব অদ্ভুত-কর্ম্মা; কিন্তু তার চাইতেও অদ্ভুত ক্ষমতা তার যে রেঁধেছে; রেঁধেছে কে সহদেব? প্রশ্ন করিয়া কুমারদেব প্রথমে সম্মুখস্থ পংক্তির দিকে পরে সহদেবের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

সহদেব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিল।

সবিনয়ে আর সসম্ভ্রমে বলিল,—আজ্ঞে, রেঁধেছেন স্বর্গীয় অনুকূল বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের বিধবা। অন্নপূর্ণা তিনি।

গুণব্যাখ্যামূলক আরো কিছু বলিবার হয়তো সহদেবের ছিল, কিন্তু তার সময় সে পাইল না; মাঝখানে ছিটকাইয়া উঠিলেন সাতকড়ি হালদার।

ঘাড় তুলিয়া সহদেবের দিকে চাহিয়া সাতকড়ি প্রশ্ন করিলেন,– কে? কে রেঁধেছে বললে? কার নাম করলে?

হালদারের প্রবল কণ্ঠের রুক্ষ আওয়াজ সভাস্থলে গম গম করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণগণ থালার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন।

কিছু একটা ঘটিতেছে দেখিয়া তাঁহারা দেহ খাড়া করিয়া চকিত হইয়া উঠিলেন।

সহদেব হালদারের প্রশ্নে পূর্ব্বোক্ত উত্তরটাই দিল, এবং তার পরই চক্ষের পলকে সৃষ্টি ওলটপালট হইয়া গেল। হালদার চোখ লাল করিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট এবং নতচক্ষু নিত্যধন চাটুয্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "প্যাপিষ্ঠা"।

বলিয়া তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর একখানা পা কাষ্ঠাসনে রাখিয়া এবং আর একখানা পা কাষ্ঠ পাদুকায় তুলিয়া দিয়া নিত্যধনের দিকে আঙুল বাড়াইয়া, যে কথাটা সংসারে কেবল তিনিই জানিতেন সেই কথাটা বলিয়া বসিলেন, "এই সেই পাপিষ্ঠ।"

ভোজনায়োজন পণ্ড হইয়া গেল।

আলুনী সাকু

আমি সাকু। আপনাদের দরবারে এসেছি দু'টো কথা কইতে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "আমি রাজপথ", আর একজন কে লিখেছিলেন: "আমি এক মড়ার মাথা।" রাজপথ আর মড়ার মাথা ঢের কথা বলেছে, তা ছাপা হয়েছে, ঢের লোকে তা পড়েছে।

আমি সাকু—অবশ্য আলুনী সাকু—এত আলুনী যে ছেলে-বুড়ো কেহই পাতে নিতে চায় না। আমি কারো ছেলে নয়, আমি একটি মেয়ে। দেড় বছর আমার বয়েস। রাজপথ আর মড়ার মাথা যদি রাশি রাশি কথা কইতে পারে তবে আমিই বা পারব না কেন? রাজপথ পড়েই থাকে; মড়ার মাথা নিজে নড়ে না, শেয়াল-কুকুরের মুখের ঠেলায় কি লাথি খেয়ে পাশ বদলায় খালি, কিন্তু একটা ভারি মজা হয়: বাতাস যখন খুব জোরে তার নাক-কানের ছ্যাঁদার ভিতর দিয়ে ছুটে যায়, তখন সে বাঁশির মতো বাজে। রাজপথে ময়লা জমে, পুকুরের ঘাটে ছাই পড়ে; কিন্তু মড়ার মাথা বাতাসের আক্রমণে ফুকরে উঠে—যেন বলে, আর কেন! পর করে দিয়ে আর বাজিয়ে তোলা কেন? লোকে যে ভয় পায়! ভাবে, আমি যার ঘাড়ের উপর ছিলাম সে বুঝি আমার ঘাড়ে চেপেছে! মানুষকে অকারণে ভয় দেখানো কি ভালো?

আমার বয়েস এখন দেড় বছর; কিন্তু আমি সব বুঝি, যা ভাবি, যা দেখি, যা শুনি, যা বোধ করি, সব বুঝিয়ে দিতে পারি, আকারে ইঙ্গিতে প্রকারান্তরে নয়, কথা বলে। আমার বয়েস দেড় বছর; তা হলেও দেড়-কুড়ি বছরের লোকের মতো আমি কথা বলতে পারি। কিন্তু বলিনে; বললেই এরা বলবে, মেয়েটাকে পেতনীতে পেয়েছে—মারো ওকে; মেরে ওর ঘাড়ের পেতনী ছাড়াও। কাজেই ঠিক দেড় বছরের শিশুটির মতো থাকি। মনে করে দেখুন, দেড় বছরের শিশু কি কি করে—আমিও তাই করি, তেমনি করে করি—এক তিল কম কি বেশী করিনে।

তারপর আর একটা কথা। সে কথার মতো কথা আপনারা খুব বেশী শোনেন নি। পূর্বজন্মের কথা আমার সব মনে আছে, হুবহু মনে আছে—কে ছিলাম, কোথায় ছিলাম ইত্যাদি সব মনে আছে। আমার কথা বলতে হলে আমার সে-কথাও কিছু কিছু বলা দরকার। সে জন্মে আমাদের বাড়ী ছিল নদে' জেলার ওসমানপুর গাঁয়ে—গাঁয়ের পাঠশালা যেখানে সেইখানে—পাঠশালার পুবে, পিছন দিকে। গাছের ছায়ায় আচ্ছন্ন ছোট একখানা খড়ের বাড়ী। একখানা শোবার ঘর, আর রান্নাঘর একখানা, আর স্যাঁতসেঁতে উঠোন। এই বাড়ীর দক্ষিণে ছিল বাবার কামারশাল—হাতুড়ী, হাপর, সাঁড়াশি, চিমটে, নেয়াই আর কয়লার আগুন নিয়ে বাবার কাজ, লোহার গড়ন-পিটন চলত। চলতে-চলতেই একদিন শুনলাম তুমুল কলরব। দৌড়ে গেলাম: দেখলাম, মোছলমান কয়েকজন মারমুখো হয়ে বাবাকে বলছে, 'তুই শালা, মিটমিটে শয়তান; শালা হিঁদুদের তুই অস্তর-শস্তর বানিয়ে বানিয়ে দিচ্ছিস? বর্শার তীরের সড়কির ফলা সব? খুন করবো তোকে জানিস্, ছাইয়ের গাদায় পেড়ে।'

শুনে বাবা ভয়ে আধখানা হ'য়ে গেল; বলল, না, না, তা কি হয়, ভাই! ভুল শুনেছ। তোমাদের ছেড়ে আমি বাঁচি? তোমাদের দা-কাটারি কাস্তে-কুড়ুল গড়ে আর শানিয়েই ত' আমার পেট চলে!

বাবার ভয় দেখে তারা তখন আর কিছু বলল না; শাসিয়ে রেখে চলে গেল।

তারপর দুদিন বাদেই এল দল বেঁধে হিঁদুরা; তারা বলল, তুই নাকি মোছলমানদের তীর-বল্লম করে করে দিচ্ছিস অনুকূল? পয়সার এত লোভ?

হিঁদুকে মারার ফন্দি করছিস ? তোকে খুন না করলে আমাদের আর বাঁচোয়া নাই দেখছি।

মোছলমানদের যা বলেছিল হিঁদুদেরও তাই বাবা বলল। শুনে তারা শাসিয়ে রেখে চলে গেল।

তখন আমাদের উপোস চলছে। আটত্রিশ টাকা চালের মণ। বাবা কোথায় পাবে এত পয়সা। তার উপর ঐ সাংঘাতিক বদনাম আর শাসানি। প্রাণের ভয়ে বাবা রাতারাতি পালিয়ে এল একেবারে কলকাতায় মা আর আমাকে নিয়ে। এই যোগাযোগ ঘটল, কারণ, আমার অদৃষ্টে লেখা ছিল, রাজধানীতে এক ত্রিতল অট্টালিকার চোখের উপর আমার প্রাণবিয়োগ হবে। আসার দু'দিন বাদেই বাবাকে আর পেলাম না—কোথায় গেল কে জানে। আমার হাত ধরে মা ফ্যান চেয়ে চেয়ে রাস্তায় রাস্তায় বাড়ী বাড়ী বেড়াতে লাগল ; ফ্যান কিন্তু পাওয়া গেল না ; কাজেই আমরা না খেতে পেয়ে রাজধানীর বাঁধানো ফুটপাতের উপর ম'লাম। মনে আছে, পরাশর রোডের নরসিংহ ভবনের সামনে আগে মলো মা—তার ঘণ্টাখানেক বাদেই আমি। প্রকাণ্ড একখানা গাড়ীতে মড়ার গাদায় ফেলে আমাকে আর মাকে নিয়ে গেল খুব ব্যস্তসমস্ত কয়েকটা লোক, তাড়াতাড়ি নিয়ে গঙ্গায় ঢেলে দিল।

গঙ্গায় হাড় পড়লে মানুষ উদ্ধার হয়ে যায়, স্বর্গে যায়, কথাটা মিথ্যে নয়। আমি স্বর্গেই এসেছি, সশরীরে, দেব-হৃদয় কয়েকটি নরনারীর অস্তিত্বে পরিপূর্ণ এক সংসারে এবার আমি জন্ম নিয়েছি—সমগ্র দেহটাই, অর্থাৎ আমার অসংখ্য অস্থি গঙ্গায় পড়ায় এই সৌভাগ্য দেখা দিয়েছে।

না খেতে পেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মরার কষ্ট কত তা আমি জেনে নিয়েছি, কিন্তু বলতে চাইনে, জানতে যার কৌতূহল আছে তিনি নিজের গায়ে তা পরীক্ষা করুন। খাওয়া না-খাওয়া সবারই নিজের এক্তিয়ারে।

আমি যে না খেতে পেয়ে ফুটপাথে মরার পর আবার জন্ম নিয়েছি তা কেবল আমি জানি। তাই আমি ভাবতাম ; কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমার এ জন্মের ভানুদা তা টের পেলে কি করে।

আমি সব বুঝি, জানি, টের পাই, অনুভব করি, প্রকাশ করতে পারি ঠিক আপনাদের মতো—যারা সাবালক হয়েছে তাদেরই মতো। কিন্তু আমাকে স্বাভাবিক হ'তে হ'লে আমাকে থাকতে হবে অবিকল দেড় বছরের শিশুর মতো—সেই রকম আচরণ করতে হবে। তাই করি—কান্নাকাটি করা, জিনিসপত্তর নিয়ে টানাটানি করা, যা তা মুখে দেওয়া, দরকারী অদরকারী জিনিস কি তা না বোঝা, যেখানে সেখানে বসে কি দাঁড়িয়ে স্থান নোংরা করা ইত্যাদি সবই আমার শিশুর মতো ; উপরন্তু হ্যাংলামিও করি ; যে যা খায় আমার সামনে, অমনি আমি হাত পেতে গিয়ে দাঁড়াই। কেউ দু'টো মুড়ি দেয় হাতের উপর ; কেউ বলে, কত খাবি ? কেউ বলে, এই ত' ভাত খেলি। কেউ আবার দেয় না কিছু, বলেও না কিছু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। কিন্তু ভানুদার কাছে আমি ভুলেও যাইনে। অন্যের কাছে যাই তাইতেই ভানুদা হাসতে হাসতে বলে, ফুটপাথ থেকে এসেছে…

শুনে আমার একটা নিঃশ্বাস পড়ে। ফুটপাথে যারা না খেতে পেয়ে মরেছে তাদের কষ্টটা ভানুদা অনুমান করতে পারে না, পারেই নাই; আমাকে অবলম্বন করে তাদের যেন সে ঠাট্টা করে। ক্ষুধাতুর আত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ করলে ঠিক এমনিই সে হয়—জেঠা, জেঠি, দাদা, বউদি, দিদি, পিসী, সবারই কাছে সে তার অশেষ ক্ষুধার কথাই জানায়। আমার তা না জানালেও চলে; কিন্তু আমি জানাই, কারণ শিশুদের ভিতরেও যে বৈচিত্র্য থাকে তার অভিনয় আমাকে করতেই হবে।

আমার মা বেঁচে নেই। আমার বয়স যখন ছ'মাস তখন আমার এ জন্মের মা রোগে ভুগে মারা গেল; আমি প'লাম সবার ঘাড়ে। ছ'মাসের শিশু আমি, কিন্তু প'লাম যেন জগৎ জুড়ে। আমার জগৎ অবশ্য একটা বাড়ীর দোতলার খান-পাঁচেক ঘর, আর, গণ্ডা সাড়ে তিনেক ছোট-বড়ো ইত্যাদি হরেক আকারের আর হরেক প্রকারের মানুষ। ঘাড়ের বোঝা যদি পরের বস্তু হয় তবে তা দুর্বহ হ'য়ে উঠে শীগগিরই, আর মানুষ তাকে নামাতে চায় যত তাড়াতাড়ি পারে। এরাও আমায় নামিয়ে দিল এই ছুতোয় যে, আমার মা নাকি বড় মুখরা ছিল; লঘু-গুরু ভেদ না করে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিত। এক তরফা কথার উপর বিচার খাঁটি বিচার নয়। মা কড়া কথা বলত, কারণ পেয়ে কি অকারণে তা প্রকাশ নাই; মা স্বর্গে গেছে—প্রতিবাদ করার সাধ্য তার নাই বলেই আমাকে মাটিতে নামিয়ে দেওয়া সহজ হ'ল। মায়ের উপর রাগ ছিল বলে যারা আমাকে মাটিতে নামিয়ে দিল, তারা জানে না যে, তারা আমায় আনন্দই দিল। মাটিতে ঠাঁই পেয়ে আমি মনে মনে একটু হাসলাম, আর, ভাবলাম, ভালই হ'ল; আর জন্মে মাটিতে পড়ে মরেছিলাম, এ-জন্মেও মাটিতেই থাকি—মাটির মতো উদার আশ্রয় কারো নয়। মাটির হাতে কাজ নাই, তার চির-অবসর; কাজেই সে ঠেলে দেয় না; বলে না, "সর, হাতে কত যে কাজ, তার ভেতর আবার তুই এলি কেন? তোকে দেখি কখন?" মাটির কাছে সবাই সমান, পরেরটা নিজেরটা বলে সে একটাকে অবহেলা করে আর একটাকে বুকে টেনে নেয় না—যেমন করেন আমার মেজ জেঠিমা। একদিন আমি আর তাঁর নাতনী (মেয়ের মেয়ে) পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি—উনি এলেন; এসে নাতনীটির গায়ে মাথায় থুঁতনিতে হাত দিলেন। গভীর স্নেহে তাকে ঐভাবে স্পর্শ করে আর সুখে গদগদ হয়ে আদরের কথা ঢের বললেন; কিন্তু আমাকে তিনি স্পর্শও করলেন না; লক্ষ্যও করলেন না। আমি অন্তর্যামী নই; তা যদি হতাম তবে জানতে পারতাম, কেন তিনি তা করলেন না; কিন্তু তাঁর ঐ অবহেলায় আমার কোন ক্ষতি হল না—ক্ষতি হল তাঁর। সমস্ত বিশ্বের অন্তর যাঁর নখদর্পণে প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হচ্ছে আর বুকে সাড়া জাগাচ্ছে, তিনি তাঁকে অপরাধী করলেন—অপরাধ গ্রহণ করলেন; সর্বংসহা পৃথিবী তাঁকে ভারি ক্ষুদ্র মনে করল। তার সব দিকে হুঁশ আছে, এদিকে নাই, এইটাই আশ্চর্য!

কিন্তু মেজ জেঠিমার ঐ কথাটা আমার দেড় বছর বয়েসের কথা; বলছিলাম তার আগেকার কথা—মা মরার পর জগৎ জুড়ে সাড়ে তিন গণ্ডা লোকের ঘাড়ে পড়ার কথা।

বলেছি ওরা নিজেদের ঘাড় থেকে আমায় মাটিতে নামিয়ে দিল, আর, স্পষ্ট বলে দিল, আমাদের কাজ আছে, তুই থাক এখানে।

জানি, ওদের কাজ আছে ; অফুরন্ত কাজ হাতে। জেঠিমার রান্নাঘর আছে, বউদিরও ঐ রান্নাঘরই আছে ; তার উপর একজনের কোলে ছেলে আছে, ছোট, হেঁটেহুঁটে বেড়ায় ; আর একজনের কোলে মেয়ে আছে, সেও ছোট, বছর আড়াই বয়েস। এদের কাজের যদিও সীমা আছে, সীমা নাই দিদিদের কাজের। কাপড়-চোপড় পরে থেকে কেমন দেখাচ্ছে চুলের ভাঁজ ভঙ্গী অটুট আছে কিনা, পাউডার মেখে রং খুলেছে কিনা, দেখতে দেয়ালের বড় আয়নার কাছে দৌড়ে দৌড়ে এসে দেখা প্রকাণ্ড এক কাজ ; তার উপর তিন-চারটে মেঝেয় মিনিট দুত্তিন করে ফুল-ঝাঁটা বুলনো। সে-ও এক গুরুতর মেহনতের কাজ। একজনের ছোট ভাইটিকে আদর করা আছে, আর একজনের ইস্কুলের পড়ুয়া ছোট ভাইটির সঙ্গে ঝগড়া করা আছে, গল্প আর চিৎকার আর গান করা আছে, রেডিও শোনা আছে।

তা ছাড়া আরও সাংঘাতিক কাজ যা আছে জগতে তার তুলনা নাই—এখন কি করা যায় সেই চিন্তা আছে। এই 'কি করা যায়' প্রশ্ন নিয়ে আর চিন্তায় তারা সর্বদা অস্থির—ছুটে ছুটে বেড়ায়। কাজেই ঐ দুস্তর চিন্তার মধ্যে এই আলুনী সাকুকে একটু সম্ভাষণ করার, একটু তুলে বসাবার, পরিষ্কার করার, সান্ত্বনা দেবার এবং আকাশের চাঁদ হাতে দেবার অর্থাৎ একটু কোলে নেয়ার সময় কই!

তবে ঐ চিন্তার তাড়না ঘুচোবার উপায়ের হদিস ওরা মাঝে মাঝে বেশ পেয়ে যায় ; কোনো দিদি হয়তো আলমারি খুলে পোশাকী কাপড়গুলো নিয়ে বসে গেল ; আমার আর এক দিদিকে ডেকে আনলো। হাজারবার পরা আর লক্ষবার দেখা কাপড় নিয়ে তর্ক জুড়ে দিল শুধু সময় কাটাবার জন্যে। তর্কের বিষয় এই যে, কোন কাপড়খানার রং ভালো। সে তর্কের রকম যদি দেখেন, আর পুরনো কাপড় পছন্দ করা নিয়ে তাদের কলরব যদি শোনেন, তবে আপনার মনে হবে, এমন ন্যাকামি আর দেখি নাই।

ওদিকে মাটিতে পড়ে আমি কাঁদছি। কখনো ক্ষিদের জ্বালায়, কখনো অকারণে মার খেয়ে। আমার আবার ৪।৫টা দাদা আছে কিনা! তারা বড় হয়েছে, আর, তারা ৮।৯ মাসের শিশুটিকে মারে। আমি হয়তো ছিট কাপড়ের ছাঁটা টুকরো পেয়ে গেছি ; তাই হাতে করে পুলকিত প্রাণে দাঁড়িয়ে আছি। এক দাদা আচমকা দৌড়ে এসে কাপড়টুকু ছিনিয়ে নিল ; আমি কেঁদে উঠতেই আমার মাথায় দুই চড় মেরে সে পালিয়ে গেল নীচেয়। ঐ সামান্য ছিট-কাপড়ের টুকরোর প্রতি আমার কত আসক্তি ছিল, খেলার জিনিস হিসাবে সেটা আমার কত দরকার তা সে বুঝলো না। আমার সম্পদ কেড়ে নিয়ে, আর, আমাকে মেরে কাঁদিয়ে সে খেলা করে গেল একটু। এর বাড়া অত্যাচারের কথা আপনারা ভাবতে পারেন?

ঐ রকমই ওরা আমায় মারে—রাগের কারণ নাই, তবু মারে ; কারণ ঘটেছে এই ওজুহাতে রাগের ভান করে মারে ; ব্যথা দিতে ভাল লাগে বলেই মারে ; মারলে কেউ কিছু তাদের বলে না বলেই মারে ; আমাকে কষ্ট না দিতে কেউ তাদের শিখিয়ে দেয় নাই বলেই মারে ; আমি তাদের এক মায়ের পেটের বোন নই বলেও

বোধ হয় মারে। কেউ একটিবার চোখে মমতা নিয়ে কি কাতরতা নিয়ে আমার কাছে দাঁড়ায় না—দাঁড়াতে হয় এ শিক্ষা সূক্ষ্ম বলেই বড়দেরই আয়ত্ত হয় নাই ; শিশুর প্রতি মমতা-প্রকাশের কর্তব্যবোধ তারা তাদের সন্তানদের প্রাণে জাগাবে কেমন করে !

ফল কি দাঁড়িয়েছে জানেন ? আমার পুরনো আত্মা অর্থাৎ স্মৃতির জগৎ হেসে খুন হয়, এ আত্মা একটা শুষ্কতা অনুভব করে। আমি চিৎকার করে উচিত উচিত কথা বলে এদের ঢের আক্কেল দিতে পারি ; কিন্তু তখনই ওরা সবাই মিলে বলবে, ওকে পেতনীতে পেয়েছে - দূর করে দে, ফেলে দে টান মেরে।

টান মেরে ফেলে দিলে আবার ফুটপাথে পড়ে মরব, এই ভয়ে চুপ করে থাকি।

একটা কথা আমার খুব মনে হয়। কথাটার অপরাধ আপনারা ক্ষমা করবেন, ওরাও যেন করে। আমার মায়ের মুখের রাশ ছিল না শুনি, ওরা বলে। তা যদি সত্যি হয় তবে এটাও সত্যি যে মা তার খর মুখখানা খরতর করে দিয়ে গেছে আমার এই টুকুদিদিকে। লোকে বলে "তীরবেগে" অর্থাৎ খুব দ্রুত। ভীষ্ম আর অর্জুন খুব দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন ; তাঁদের তীর খুব দ্রুত ছুটত ; কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁদের তীরের ডবল ডবল বেগে ছোটে টুকুদিদির মুখের কথা—বলতে যতক্ষণ ততক্ষণে টুকুদিদির ১০০ কথা বলা হয়ে গেছে। উত্তাপ আর বেগের দিক থেকে টুকুদিদির জিহ্বা পৃথিবীর অন্যতম অপরাজের আর অদ্বিতীয় এবং অক্ষয় একটি শক্তি।

সে যাই হোক, আমার আরো মনে হয়, আগের জন্মে পাড়াগাঁ ওসমানপুরের অশিক্ষিত লোকের ভিতরেই ছিলাম ভাল—আমাকে তারা ধর্তব্য মনে করত। রাস্তায় বসে কাঁদলে পরিচিত যে-কোনো পুরুষ-মানুষ বলত, বাড়ী যা, বাড়ী যা শীগ্গির। ওরে অনুকূল, তোর মেয়ে এই যে এখানে বসে। গরু-বাছুরের পায়ের তলায় পড়বে। নিয়ে যা।

বাবা বলতো, যাই।

মেয়েছেলেরা কতজন কতদিন কতবার যে আমাকে কোলে করে বাড়িতে দিয়ে গেছে, আর, আদর করেছে তার ইয়ত্তা নাই। কেউ কেউ রাগ করে বলত, চারিদিকে জঙ্গল, শেয়ালের বাস—কোন দিন মেয়েটাকে টেনে নিয়ে যাবে।

মা বলত, বোস এখানে ; বসে থাক। কেবল রাস্তায় যাওয়া হয়েছে ঘুরে ফিরে। মেরে 'হাড় ভেঙে' দেব এখুনি।

মা কোনোদিন হাড় ভাঙতে বসে নাই ; কিন্তু আমার হাড় ভাঙছে এ-জন্মে; হাড় গঙ্গায় পড়ার পর।

পাঠশালায় কত ছেলেমেয়ে পড়তে আসত ; কতজনের সামনে কতবার পড়েছি ; কিন্তু খেলার ছলে কি আমার কান্না দেখে আনন্দ পেতে কেউ কখনো মারেনি আমাকে। যে শিশু কোনো অপরাধ করেনি, কেবল দাঁড়িয়ে আছে আপন মনে, তাকে ব্যথা দিয়ে কাঁদানো এমন একটা মানুষের নিয়ম-বিরুদ্ধ আর ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ, যার দরুন বেশ সাজা পাওয়া উচিত। সাজা দেয়ার কথাটা যে জানে না, জানবার মতো করে মনই যার তৈরি হয়ে ওঠেনি, তাকে আমি নিন্দা আর বিদ্রূপ দুই করি। বই-সংসর্গ আর বয়স তাকে জীবনের প্রাথমিক শিক্ষাই দেয়

নাই। এ-বাড়িতে অর্থাৎ দোতলায় বাস করি বটে, লোকেও দেখে আমার দ্বিতল অট্টালিকায় বাস করার, আর শানবাঁধান মেঝের উপর পা ফেলে ফেলে বেড়ানোর সৌভাগ্য, কিন্তু কোন ঘরেই আমার প্রবেশ করার হুকুম নেই। আমার গত জন্মের বাবা যখন লোহা পুড়িয়ে লাল করে তাতে নেয়াইয়ের উপর বাঁ হাতের চিমটে দিয়ে ধরে রেখে ডান হাতে হাতুড়ি নিয়ে পিঠত, আর ফুলকি ছুটত তখন সেখানে আমায় দাঁড়াতে দিত না—বলত, পালা, পালা, দেখছিসনে আগুন! আমি পালাতাম।

কিন্তু এখানে আগুন আর লোহার ফুলকি নয়, এখানে সাজান ঘর, আর যত আগুন প্রাণে, তত ফুলকি মুখে। দাঁড়াবার জো নেই। সাজান ঘরের ভিতর আমার চেহারাই বে-মানান বলে, কি সাজান জিনিস নেড়েচেড়ে আমি তার বাবুয়ানি ভেঙে দেব এই ভয়ে ওরা আমাকে বার করে দেয় তা ঠিক জানি নে। কিন্তু তাড়াবার রকমটা কিছু রূঢ়: ঘাড় ধরে আমার মুখ দরজার দিকে ঘুরিয়ে নেয়; তারপর ধাক্কা দিতে দিতে দরজার বাইরে আনে, ধাক্কা দিতে দিতে আরো কিছুদূর এগিয়ে দেয়—তারপর ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়, আর যেতে না পারি। মনে হয়, এ-ব্যবহারটা নিদারুণ—যে-কাজটা সহজে নিষ্পন্ন হয়, মনের বক্রতাবশতঃ আর স্নেহের অভাববশতঃ তাকে উগ্র করে তোলা। যে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির কাছে শুনবেন, শিশু যে অবুঝ আর অস্থির, আর, গোছালো জিনিসে হাত দিতে চায় তার ভিতরেও একটা মাধুর্য থাকে। এই মাধুর্য চোখে পড়ে কেবল তার, যার হৃদয় শিশুর প্রতি স্নেহশীল এবং স্নেহশীল বলে সহিষ্ণু। পূর্বজন্মে তা দেখে এসেছি।

শিশু আমরা কয়েকটি আছি এ-বাড়িতে। কিন্তু আমার মতো আর কেউ অবাঞ্ছনীয় নয়। তার কারণ তাদের বাবার হাতযশ। তা আমি বুঝতে পেরেছি।

সব শিশুর মতোই আমি হৃদয়জ্ঞ। মানুষের হৃদয়ের গতি আর বার্তা বিদ্যুতের আলোর মতো সুস্পষ্ট আর তীব্র হয়ে আমার অন্তরের অন্তস্তলে পৌঁছায়। এ বাড়ির কার কার সম্বন্ধে আমার ঐ কথাগুলো প্রত্যক্ষতঃ সত্য তা আমার সত্তার সঙ্গে গাঁথা আছে। তাদের নিত্য ও নিয়মিত উপেক্ষা ও প্রতিকূলতার দিকে ইঙ্গিত করতে হলে তাদের যেটুকু স্মরণ করতে হয় তাতেও আমি ক্রমশঃ এখন নারাজ হয়ে উঠেছি।

আশা করি, আমি বুঝিয়ে বলতে পেরেছি যে, আমি চিরদুখিনী, আর লোকারণ্যের ভিতর আমি মূল্যহীন আর একা। আমি জানি সব, বলতে পারি সব কথাই, কিন্তু পেত্নীতে পেয়েছে মনে করে ওরা যদি মারতে শুরু করে, তবে মারতেই থাকবে……

শুনুন এখন আমার একটু সুখেরও কথা। এই হুল্লোড়, গলাবাজি, আর, হাত-চালানোর মাঝে পড়ে আমি যখন আইঢাই করছি, আর আখের সম্বন্ধে হতাশ হ'য়ে গেছি, তখন হঠাৎ একদিন এসে দাঁড়ালেন এই বাড়িরই গিন্নী-পদবীর একটি বউ। সঙ্গে সঙ্গে, এক মুহূর্ত না যেতেই একটা বিপ্লব ঘটে যুগান্তর এসে গেল—এসে গেল এমন নিঃশব্দে অনাড়ম্বরে আর আনন্দে প্লাবিত হয়ে যে, আজও আমি অবাক হ'য়ে আছি।

তিনি আমাকে কোলে নিলেন, আমি তাঁর কাঁধে মাথা রেখে খুব আস্তে করে ডাকলাম "মা"! ব্যস—একটা স্থানে বিরতির চিহ্ন পড়ে' অন্য স্থান থেকে যাত্রা শুরু হ'ল। বিশৃঙ্খল জনতার উত্তাপের মাঝে এমন একটা স্নেহশীতল আশ্রয় রচিত হ'য়ে গেল যেখানে গেলে সুখ, শুয়ে সুখ, বসে সুখ, খেয়ে সুখ, এসে দাঁড়ানো সুখ, দুষ্টুমি করেও সুখ। আর আস্কারা পাওয়া যে এত সুখের তা আমি জানতাম না।

সব ভালো যার শেষ ভালো—আশীর্বাদ করুন, মায়ের শরীর যেন ভালো থাকে।

চার পয়সায় এক আনা

রোজ আনে, রোজ খায়, এ-কথা এদের সম্বন্ধে বলা চলে; কিন্তু এরা রোজ যাহা আনে তাহা প্রচুর নয়, এবং রোজ যাহা খায় তাহা পুরোপুরি নয়।

দুই ভাই—কাশী আর শশী। শশী ছোট এবং খঞ্জ; সন্তান সংখ্যা তারই বেশী। কাশীর একটি কন্যা, দু'টি পুত্র; শশীর দু'টি পুত্র, দু'টি কন্যা। এই একটি বেশীর দরুন শশীর আন্তরিক লজ্জা কুণ্ঠা কিছু নাই; তবে মনে মনে সে ষষ্ঠীর কৃপা আর চায় না। অভাবের প্রচণ্ড উত্তাপে ইহাদের সংসারসম্ভোগের আনন্দ আর পরিবেশোৎসব নষ্ট হইয়া গেছে। বউয়েরা ত' আছেই—ভগিনীটি বিধবা হইয়া একটি পুত্রসহ ভাইয়েদের আশ্রয়ে আসিয়াছে। তাহারাও খায় এবং পরে—সুতরাং তাহাদের বাবদ খরচ আছে। এই দরিদ্র পরিবারের কর্তা কাশী; সংসার প্রতিপালনের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব তাহারই। প্রতিপাল্য ব্যক্তিগণের সংখ্যার দিকে চাহিয়া ভয়ে তাহার বুক শুকাইয়া ওঠে—অনাহারে ফেলিয়া রাখিবার উহারা কেহই নহে।

একটি গরু ইহাদের ছিল—বেচিয়া দিয়াছে, গর্ভিণী অবস্থায়, ওদের নিষেধ সত্ত্বেও, এবং ছেলেপিলে দুধ একটু পাইতে পারিত কিন্তু পাইবে না জানিয়াই বেচিয়া দিয়াছে। কাশী আর শশী পরামর্শ করিয়া মাত্র দেড়কুড়ি টাকার বিনিময়ে এই অনুচিত কাজটি করিয়াছে—গৃহ-পালিত গাভীর সুস্বাদু এবং সুপুষ্টিকর দুগ্ধে শিশুগণকে বঞ্চিত করিয়াছে—বঞ্চিত করিতে যতটা নিষ্ঠুর হইতে হয়, ভাতের অভাবে কাশী আর শশীকে তাহা হইতে হইয়াছে।

শাকপাতা কুড়াইয়া তাহাদের আংশিক উদরপূর্তি চলে, ইহা মিথ্যা নহে, বিস্ময়ের বিষয়ও নহে। দু'ভাইয়ের যা উপার্জন—ধন এবং ধান্য—তাহা সামান্য—পরিশ্রমের তুলনায় সামান্য, প্রয়োজনের হিসাবেও সামান্য। অনন্ত পরিশ্রমের ফলে যে পরিমাণ ধান্য তাহারা ঘরে তোলে তাহা অত্যন্ত কঠিন কৃপণের মতো বুক দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াও বড় জোর পাঁচ মাস চলে; একটি ধান দৈবাৎ উঠানে পড়িয়া থাকিলে সেই অপচয়ে কাশী আর শশী রাগিয়া আগুন হইয়া যায়; চোখ রাঙাইয়া গাল দেয়ঃ "লক্ষ্মীছাড়ার দল"।

ধন উপার্জন করিতে তাহারা বাহিরে বাহির হয়। বলিতে কি, খঞ্জ শশী দূরবর্তী পল্লী অঞ্চলে যাইয়া দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষাই করে। ভিক্ষার চাল আড়তে বিক্রয় করিয়া ঘরে আনে পয়সা—কাশী ছাড়া আর কেহ তা জানে না। কিন্তু এই চাল বিক্রয়ের ব্যাপারটা বড়ই লোকসানের। আড়তের কয়েল রজনী হাজরা হৃদয়হীন অতিহিসাবী চতুর লোক—ন্যায্য ভাবে ওজন করিয়া সঠিক মূল্যের পুরো প্রাপ্তির জন্যই শশীকে হাত জুড়িতে হয় অনেকবার—অন্নাভাবের অজুহাতে স্বয়ং রজনী কয়েলের এবং তার পরলোকগত বাপ মায়ের দোহাই পাড়িয়া অনেক কাতরোক্তি তোষামোদ করিতে হয়—কিন্তু ফল হয় না ; প্রবঞ্চক আর প্রভুভক্ত রজনী হাজরা যেন পণ করিয়া বসিয়া আছে, খঞ্জ ভিখারী শশীকে সে দামে ওজনে ঠকাইবেই।

যথোচিত প্রাপ্য না পাইয়া আর রজনীর নির্লজ্জতায় শশীর রক্ত বৃথাই উত্তপ্ত হইয়া উঠে—রজনীর তুমুল কর্মতৎপরতায়, অর্থাৎ চিৎকারে তার পাগল পাগল ঠেকে।

লোক-খাটাইবার লোক অনেক আছে, এবং লোক-খাটাইবার লোক খুঁজিবার পথও অনেক আছে—তবু হঠাৎ এমন হয় যে, খাটিবার লোক খাটাইবার লোককে খুঁজিয়া পায় না। এমন বেকার অবস্থা মাঝে মাঝে আসে বলিয়া কাশীদের আয়—আমদানি তেমন ভাবে একটানা আর প্রচুর নহে যাহাতে চাহিদা সম্পূর্ণ মিটিয়া মনে হয় দিন ভালই যাইতেছে।

পাঁঠা কিনিয়া তাহার মাংসের ভাগ এবং চামড়া বিক্রয় দু'একবার করা হইয়াছিল, কিছু লাভ দাঁড়াইয়াছিল ; কিন্তু তাদের এ ব্যবসা শুভক্ষণে শুরু হয় নাই—বাধা পড়িল। তাহাদের বড় আদরের আর মমতার পাত্রী বিধবা ভগিনীটি এই নৃশংসতায় হঠাৎ একদিন আতঙ্কিত এবং ব্যথিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠায় এবং প্রবোধ না মানায় তাহারা ঐ লাভজনক জীবহত্যার পথটা ছাড়িয়া দিয়াছে।

এমনি করিয়া কায়ক্লেশে আর জোড়াতাড়া দিয়া আর ফন্দি ফিকির করিয়া কাশী আর শশী দিনাতিপাত করে।

তাহাদের জীবনে ঘটনা নাই, সুতরাং বৈচিত্র্য কি দিক পরিবর্তন নাই ; কিন্তু একদিন একটি ঘটনা ঘটিল—তাহা বর নয়, অভয় নয়, অভিসম্পাত নয়, নির্জীব স্রোতে কয়েক মুহূর্তের জন্য একটা বুদ্বুদ যেন স্ফীত হইয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল—দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অঙ্গ তাহা নহে।

কাশীর ছেলে বিশু বংশধরগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ—বয়স দশ হইবে ; তার দু'-ভায়ের ছেলে মেয়ে জন্মিয়াছে একবার এ-র একবার ও-র, যেন পালা করিয়া।

ছেলেমেয়েরা দরিদ্রের সন্তান ; তাহাদের খেলাধুলাও দরিদ্রোচিত—একটা কাঠির মাথায় খানিক ন্যাকড়া বাঁধিয়া আকাশের দিকে তুলিয়া ধরিতে পারিলেই তাহাদের খেলা চমৎকার জমিয়া ওঠে। খানিক খানিক ধুলা হাতে করিয়া ছিটাইয়া ছিটাইয়া পরস্পরের গায়ে দিতে পারিলেই তাহাদের মনে হয়, এখেলাও ভালই। ধুলা যদি ঝুরঝুর করিয়া মাটিতে না পড়িয়া বাতাসে উড়িয়া অন্যদিকে যায় তবে ত' আরো আনন্দ।

কাশীর বাড়ির কঞ্চির ফটক খুলিয়া বাহির হইলেই একটু স্বতন্ত্র স্থান পাওয়া যায়—স্থানটি দূর্বামণ্ডিত কিন্তু খুব সংকীর্ণ। তার পরেই কাঁচা পা-পথ—

মানুষ চলে, এবং পাড়ার ভিতর হইতে বহু সংখ্যক গরু-বাছুর ঐ পথে মাঠে চরিতে যায়, এবং চরিয়া ঘরে ফেরে। সুতরাং তাহাদের ক্ষুরের আঘাতে আঘাতে শুকনো মাটি গুঁড়া হইয়া পথের ধুলা বিস্তর—দেড় আঙ্গুল পুরু হইয়া ধুলা আগাগোড়া জমিয়া থাকে।

কাজেই কাশীর এবং শশীর ছেলে-মেয়েদের সুলভে খেলার বেশ সুবিধা আছে। তাহারা পথের ঐ ধুলার উপরেই খেলিতে বসিয়া যায়—ধুলা জড়ো করে, ধুলা উড়ায়, অঞ্জলি ভরিয়া ধুলা তুলিয়া আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া ছাড়িয়া দেয় —নিরবচ্ছিন্ন ধারায় হাতের ধুলা মাটিতে পড়িতে থাকে। এক একবার ধুলা জড়ো করিয়া তার উপর হাত চাপড়াইয়া শক্ত করে, তারপর আঙ্গুল ঢুকাইয়া ঢুকাইয়া ধুলার ঢিপির গায়ে করে অসংখ্য ছিদ্র, চারিদিকে ধুলার বাঁধ দিয়া একটা স্থান পরিষ্কার করিয়া লয়, আর, সবাই মিলিয়া সেখানে করতলের ছাপ বসায়, বাঁধের ধুলায় বটের পাতা গুঁজিয়া গুঁজিয়া দেয়, এবং নিজেরাই সেই কৃতিত্ব আর শোভা অবাক হইয়া দেখে, পথিকের ধমক খায়, গরুর পাল আসিতে থাকিলে পলায়ন করে…

কিন্তু একদিন বড় লাভ হইয়া গেল।

কাশীর ছেলে এবং মেয়ে, যথাক্রমে বিশু ও নারাণী যথারীতি পথের ধুলায় উপস্থিত, শশীর ছেলে এবং মেয়েরা, যথাক্রমে রসো এবং দাসী ও হাসিও আসিয়াছে।

আজ খেলা হইতেছে ধুলা ছাঁকার।

হাসি পথের উপর আড় হইয়া পড়িয়া খেলায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছিল; অধিনায়ক বিশু তাহাকে চপেটাঘাত করিয়া টানিয়া লইয়া তফাতে দুর্বার উপর বসাইয়া দিয়াছে, সেখানে বসিয়া সে এ্যাঁ এ্যাঁ করিয়া থামিয়া থামিয়া আর টানিয়া টানিয়া কাঁদিতেছে।

উহাদের খেলা এখন নির্বিঘ্নে চলিতেছে। ধুলা আঁজলা ভরিয়া তুলিয়া দুই করতলের সংযোগস্থলটি একটুখানি ফাঁক করিয়া ধুলা ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে —ধুলা সমস্তটা মাটিতে পড়িয়া সকলের পরে নিঃশেষ কাহার হয় প্রতিযোগিতা চলিতেছে তারই ·

বিশুই দু'বার জিতিয়াছে, প্রধান বলিয়া কতকটা গায়ের জোরেই।

শশীর পুত্র রসো বলিল,—এখানকার ধুলা ভাল নয়, ভাই।—বলিয়া সে খানিক সরিয়া বসিল। এবার সে যেন একটু নির্লিপ্ত—পাল্লা দিবার উৎসাহ তেমন নাই। আপন মনেই ধুলা ছাঁকিতে ছাঁকিতে তৃতীয়বার ধুলা ঝাড়িয়া ফুরাইবার পরই সে হঠাৎ ডান হাতটা মুঠা বাঁধিয়া ঝাঁ করিয়া ছুটিয়া পলাইল— বাড়ির ভিতর গেল না, গেল অন্য দিকে।

—কি রে?—বলিয়া বিশু যখন লাফাইয়া উঠিল তখন রসো বহু দূরে চলিয়া গেছে, কিম্বা কাছেই কোথাও আত্মগোপন করিয়াছে, অর্থাৎ তাহাকে আর দেখা গেল না।

সূর্যাস্তের তখন বেশী বিলম্ব নাই। ছোট বোন দু'টিকে বাড়ির ভিতর পাঠাইয়া দিয়া বিশু রসোর সন্ধানে গেল; কিন্তু তাহাকে খুঁজিতে হইল ঢের:

সাত আটটা বাড়ির চারিদিক এবং অভ্যন্তর—কিন্তু বৃথা ; রসো কাহারো বাড়িতে প্রবেশ করে নাই। পাড়ারই মথুর এবং তোষিণীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল ; কিন্তু তাহারা বলিল যে, রসোকে তাহারা দেখে নাই।

বিশু বটবৃক্ষের তলায় দাঁড়াইয়া 'রসো' 'রসো' করিয়া চিৎকার করিতে লাগিল—রসোর সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু রসো ত' আকাশে উড়িয়া যায় নাই, বাতাসেও মিলাইয়া যায় নাই, ডোবার জলে ডুবিয়াও লুকাইয়া নাই। এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে হঠাৎ বিশুর নজরে পড়িল, সন্ধ্যামণি বোষ্টমির বাড়ির লাগাও তালগাছটার আড়ালে কে যেন রহিয়াছে—একখানা কালো হাত দেখা যাইতেছে···

বিশু পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তাল গাছের নিকটবর্তী হইয়াই সে ডাকাত পড়ার মতো একটা ভীতিপ্রদ বিকট শব্দ করিয়া রসোর সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল—যেন দৈত্য, রসোকে গ্রাস করিতে আসিয়াছে। সেই শব্দে এবং আবির্ভাবে রসো চমকিয়া উঠিয়াই ডান হাতটা তাড়াতাড়ি পিছন দিকে লইল, যেন পিছন দিকে হাত লইলেই নিস্তার পাওয়া যাইবে—সে হাত সম্মুখে টানিয়া আনিয়া পরীক্ষা করিবার সাধ্য বা বুদ্ধি কাহারও নাই !

বিশু বলিল,—দেখি তোর হাতে কি।

বিশুর পূর্বেই সন্দেহ হইয়াছিল, কিছু প্রাপ্তির ব্যাপার বটে।

রসো বলিল,—কিছুই না ! ঘাঁটিও না বলছি।

বিশু বলিল,—বাড়ি আয়। বাবা তোকে ডাকছে।

—আমি এখন যাবো না।

—তবে দেখা, তোর হাতে কি রয়েছে।

—তোর মাথা ·

—মার খাবি বলছি। বলিয়া বিশু তার লুকানো হাতের দিকে, অর্থাৎ পিছন দিকে যাইতেই রসো ঘুরিয়া দাঁড়াইল ; এবং তারপর ক্রমাগত সেই ডান হাত-খানাকে সম্মুখে আনা আর পশ্চাতে লওয়ার আবর্তন শুরু হইয়া গেল। কিন্তু বিশুর বুদ্ধি তখন সজাগ বেশী। সে একবার কায়দা করিয়া রসোর ডান হাতের উপর ডানা চাপিয়া ধরিতেই তাহা শরীরের উপর আক্রমণে দাঁড়াইয়া গেল ; রসো শরীর মুচড়াইয়া দুমড়াইয়া এমন করিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল যে, সন্ধ্যামণি বোষ্টমি, মথুর গাড়োয়ান, বিরিঞ্চি গরাই প্রভৃতি বৃহত্তর ব্যক্তিগণ তাড়াতাড়ি দেখিতে আসিল, ব্যাপারটা কি ! সন্ধ্যার পূর্বেই ঘরে না যাইয়া ওরা করিতেছে কি !

কিন্তু ঐ মানুষগুলি কাহারো সুহৃদ নহে—তাহারা সান্ত্বনা দিতে জানে না, বিচারের ধার ধারে না, কেবল "কে রে ?" বলিয়া হুংকার ছাড়িয়া ছেলে-মানুষের পেটের প্লীহা চমকাইয়া দিতে পারে। তাহারা করিলও তাই—বিবদমান ছেলে দু'টিকে তাহারা ধমকাইয়া কাবু করিয়া দিল, এবং অভাবনীয় প্রহারের ভয় দেখাইয়া অবস্থা এমন গুরুতর করিয়া তুলিল যে, নিজের কর্তৃত্ব তুলিয়া লইয়া অভিভাবকগণের হাতে মীমাংসার ভার দেওয়া ছাড়া বিশুর গত্যন্তর রহিল না।

রসোর হাত ধরিয়া বিশু অভিভাবকগণের উদ্দেশেই যাত্রা করিল—চলিতে

চলিতে পথে মাত্র একটি কথা হইল : বিশু বলিল,—বল্ না ভাই, তোর হাতে কি ?

বিশুর প্রশ্ন রসো গ্রাহ্যও করিল না।

রসো ক্রোধভরে ঘাড় গুঁজিয়া এবং দুঃখ-ভরে কান্নার একটা ফোঁস্-ফোঁস শব্দ করিতে করিতে দাদা বিশুর আকর্ষণে বাড়িতে প্রবেশ করিল। এখানে তার অভিভাবক ঢের, এবং তাদের শক্তিও ঢের – রসোর বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল··· এখানে আত্মসমর্পণ মৃত্যুর মতো অনিবার্য।

শশী দাওয়ায় বসিয়া এবং ঠেস্ দিয়া হুঁকা টানিতেছিল ; বাতাসের তখন গতি ছিল না—কাজেই মুহুর্মুহু আকর্ষণে ধূম নির্গত হইয়া শশীর সামনেই জড়ো হইয়াছিল ; আর, শশী মনে মনে গাল দিতেছিল কয়েল রজনী হাজরাকে—আজও রজনী পোনে দু'সের চালকে ওজনে এক সের ন'ছটাক দাঁড় করাইয়া নিজের হিসাব অনুসারে দাম দিয়াছে—তার আকুল প্রতিবাদ ফলপ্রদ হয় নাই।

আসামী রসোকে তাহার সম্মুখে হাজির করিয়া বিশু বলিল,—কাকা রসো কি যেন পেয়েছে ধুলোর ভেতর—কিছুতেই দেখাবে না। ঐ দেখ, ওর মুঠোর ভেতর রয়েছে···

এই সংবাদে শশী ফুৎকার দিয়া সম্মুখের ধোঁয়া দিগ্বিদিক উড়াইয়া দিল : তারপর বলিল,—তোর হাতে কি দেখা।

রসো সেই যে মুষ্টি বাঁধিয়াছিল, এক মুহূর্তের জন্যও আর খোলে নাই—হাত ঘামিয়া গরম হইয়া উঠিয়াছে, আঙুলে দারুণ যন্ত্রণাবোধ করিয়াছে, তবু খোলে নাই।

বলিল,—না, আমি দেখাবো না। এ আমার।

শশী অভয় দিল : তোরই থাকবে—দেখা।

কিন্তু, আর কারো নয়, পিতৃদেবের এই প্রতিশ্রুতি পাইয়াও রসোর ভরসা হইল না—মুষ্টি খুলিয়া সে দেখাইল না।

তখন শশী ছেলের অবাধ্যতায়, আর তার দুঃসাহস দেখিয়া অত্যন্ত রাগিয়া গেল ; হুঁকা রাখিয়া সে উঠিয়া আসিল—রসোর একেবারে সম্মুখে দাঁড়াইল, অর্থাৎ রসোকে সম্মুখে করিয়া সে দাঁড়াইয়া গেল ; ভয়ংকর ভ্রূভঙ্গী পূর্বক গর্জন করিয়া বলিল—দেখা।···দেখাবিনে ? তবে দেখ মজা। বলিয়া রসোর যে-হাতে সেই সামগ্রী রহিয়াছে সেই ডান হাতখানা ধরিয়া শশী মুচড়াইয়া দিল।

তাহাতেও রসোর মুষ্টি খুলিল না।

তখন শশী তার মুষ্টিটাই তুলিয়া লইয়া তার উপর ঠক্ ঠক্ করিয়া দু'বার গাঁট্টা মারিল ; এইবার ফল দর্শিল—ক্ষুদ্র রসোর শক্তিতে এবং জিদে আর কুলাইল না—মুষ্টি খুলিয়া হাতের সামগ্রী ছাড়া পাইয়া মাটিতে পড়িল এবং ছাড়া পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গড়াইয়া পড়িল মাটিতেই। তখন স্পষ্ট দেখা গেল জিনিসটা কি। রসো প্রাণপণ করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া যাহাকে ত্যাগ করা নয়, খালি দেখাইতেই রাজী হয় নাই সে-জিনিসটা কি তাহা এখন স্পষ্টই দেখা গেল—শশীও দেখিল, বিশুও দেখিল, তাহা সোনা নয়, রুপা নয়, মোহর নয়, একটা আনি···

কারখানার নূতন আনি—একটুও ময়লা হয় নাই ; জাল জিনিস নয় ; ক্ষয় হয় নাই—একেবারে খাঁটি আনকোরা তরতাজা জিনিস—অত্যন্ত নগদ জিনিস—মূল্য চার পয়সা ; ইহার বিনিময়ে অনেক দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে, এত যে, তার হিসাব করিতে বসাই ভুল।

মাটিতে সেই মহামূল্য জিনিসটি পড়িয়া থাকিবার অবসর পাইল মাত্র দুইটি মুহূর্ত—তার বেশী নয় ; কিন্তু সেই দুই মুহূর্তের মধ্যেই ভাবের যে-বন্যাটি বহিয়া গেল তাহা অত্যন্ত তীব্র···

সবাই আসিয়া ঘটনাস্থলে দাঁড়াইয়াছিল—কাশীর স্ত্রী, কাশী ও শশীর ভগিনী, নারায়ণী, দাসী, হাসি—সবাই ; কি করিয়া যে সেই দুটি মুহূর্ত তাহারা আত্মসংবরণ করিয়া রহিল তাহা ভাবিতেই আশ্চর্য ! সবারই ইচ্ছা হইল, দুরন্ত ইচ্ছা হইল, যে আনিটা তুলিয়া লইয়া নিজের করিয়া লয়—একেবারে নিজের, অবিসংবাদিতভাবে নিজের—অন্যের দাবি একেবারে অগ্রাহ্য হইবে, কিংবা অন্যে দাবি করিতে ভুলিয়া যাইবে, কিংবা দাবি করিতে সাহসই পাইবে না ; আর-সবাইকার নাগালের বাহিরে যাইয়া চিরকালের জন্য তাহা আপনার হইবে···

প্রাণে দুর্বার টান পড়িতে লাগিল—হাত যেন ছুটিবার আগ্রহে অস্থির হইয়া উঠিল···

কাশীর স্ত্রী কাঞ্চনের হইল তাই, শশীর স্ত্রী মোক্ষদার হইল তাই, ভগিনী কুমারীর হইল তাই ; বিশু প্রভৃতির কি হইল তাহা বলাই যায় না। লোভ হইল না কেবল রসোর—সে তখন মৃত্তিকায় শায়িত এবং শোকে অভিভূত।

কিন্তু ইচ্ছাটি কার্যে পরিণত করিল শশী ; তৃতীয় মুহূর্তেই আনিটা নির্বিবাদে কুড়াইয়া লইয়া সে খুঁড়াইতে খুঁড়াইতে যাইয়া দাওয়ায় উঠিয়া বসিল ; আনিটা রহিল তার হাতের ভিতর—তাহার পর সে নির্বিকারের মতো হুঁকা টানিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, মনঃক্ষুণ্ণ হইল সবাই।

কিন্তু যে-জিনিস কাহারও নয়, কাহারও পরিশ্রমের মূল্য হিসাবে যাহা ঘরে আসে নাই, তাহার উপর দাবি করিয়া শশীর এই হস্তার্পণে প্রতিবাদ কেহ করিল না , কাঞ্চন আর মোক্ষদা সরিয়া গেল।

কুমারী বলিল—দাদা, পড়ে-পাওয়া পয়সায় হরির লুঠ দিতে হয়।

শশী বলিল—তুই হলে দিতিস ?

কুমারী সে-কথার জবাব দিল না ; কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, সে অপ্রতিভ হইয়াছে।

শশী পুনরায় বলিল—হরির লুঠের নাম আর করিসনে ! আমরাই কোন হরির লুঠের তার ঠিক নাই।

কুমারী এবার হাসিল ; বলিল—ও-কথা বলতে নেই। হরি আবার দশটা বিশটা আছে নাকি ?

শশী কথা কহিল না। এই আনিটা কি-প্রয়োজনে লাগিতে পারে তাহাই সে চিন্তা করিতে লাগিল : চাল ডালের প্রয়োজন নহে—নিত্যব্যবহার্য এবং স্থায়ী একটি জিনিস ক্রয় করিয়া তাহার মারফত প্রচুর আনন্দ পাইতে হইবে এবং এই প্রাপ্তির সৌভাগ্যটা যাহাতে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে তাহাই অর্থাৎ একটি হুঁকা।

কিন্তু সে-ইচ্ছা সার্থক হইবার পক্ষে বিঘ্ন ইহাই যে, একটা আনি যত মূল্যবানই হোক, তাহাতে পছন্দসই হুঁকা একটি হয় না।

বড় বউয়ের পুণ্য সঞ্চয়ের লোভ আছে; সে ওদিক হইতে বলিল—বামুনকে দাও, পুণ্যি হবে।

শশী বলিল—আর বামুন ডাকতে হবে না; আপনি বাঁচলে বাপের নাম। তোমাদের ত' বেরুতে হয় না—পয়সার কষ্ট তোমরা বুঝবে কি! কেউ বলছেন হরির লুঠ দাও, কেউ বলছেন বামুনকে দাও, পুণ্যি করো—যেন আমাদের আর-কিছু দিয়ে দরকারই নাই। আমি বলছি, এ তোলা থাক; সবারই পারের কড়ি এতে হবে।

তামাক-সেবনের বিলাস থাকা সত্ত্বেও শশী নিজের জীবন দুর্বহ মনে করে—সে বৈতরণীর দিকে তাকাইয়া আছে।

ছোট বউ বলিল—তোলা থাকবে কেন? মুড়ি-বাতাসা আনা হোক, ছেলেরা ফুর্তি করে খাক। ওরাই ত' পেয়েছে আনিটা। ওতে আর-কারো দাবি নাই।

শুনিয়া রসো মাটির উপর পাশ ফিরিল।

শশী ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল—উনি এলেন দাবি দেখাতে। আরে, দাবিই যদি আজকাল দেখানো যেত তবে রজনী হাজরার কাছে আমার ঢের পাওনা হয়।

কুমারী জিজ্ঞাসা করিল—সে কে?

শশী বলিতে লাগিল—কই, তখন ত' হরির লুঠের হরিও আসেন না, পুণ্যির জাহাজ বামুনও আসেন না বিচার করতে। আমাকে সে ফাঁকিই দেয়!—তারপর রাগের মাথায় শশী বলিয়াই ফেলিল—এ পয়সা আমারই হল। আর-একটা আনি পেলেই আমি হুঁকা কিনবো।

এটা শশীর অসম্ভব উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনে করিয়া কুমারী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল—তবে যে বলছিলে, পারের কড়ি হবে?

শশী বলিল—হুঁকোও খানিক দূর সঙ্গে যায়।

শশীর মনের আদত ইচ্ছা হুঁকা কেনাই; কিন্তু তাহাদের আর্থিক অবস্থা যেমন তাহাতে একটা হুঁকা থাকিতেই আর-একটি হুঁকা কিনিয়া নিদারুণ অপব্যয় করিবে এরূপ প্রস্তাব করা ভাল হয় নাই—ইহাই মনে করিয়া শশী একটু ছলনা করিল; বলিল—হুঁকোর কথা আমি মিছে করে বলেছি। দাদা আসুক, সে কি বলে শুনে তবে ব্যবস্থা হবে।

কিন্তু একটা ব্যবস্থা চূড়ান্ত করিয়া এখনই করা হইতেছে না দেখিয়া ব্যবস্থা চূড়ান্ত করিতে বিশু অগ্রসর হইয়া গেল; বলিল—আমাকে দাও কাকা…

—তা হলেই গোল মেটে—না? কি করবি তুই?

—কাজ আছে।—যেন কাজটা এমনই ব্যাপক আর গুরুত্বপূর্ণ যে, বিস্তৃত করিয়া বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়।

কিন্তু শশী তার কথার মর্ম বুঝিল না; করিল বিদ্রূপ; বলিল—উঃ, কি কাজের লোক রে!

ঐ বুঝি পাইয়া যায়! অত্যন্ত আতঙ্কিত আর ব্যগ্র হইয়া আর-আর ছেলে-মেয়েরা সেই দুর্ঘটনা নিবারণ করিতে দৌড়াইয়া আসিল—প্রাণপণে চিৎকার

করিয়া আর হাত পাতিয়া বলিতে লাগিল—ওকে দিও না, ওকে দিও না, আমায় দাও।

শশী তাদের আক্রমণ নিবারণ করিতে চিৎকার করিতেছে, কুমারী তারস্বরে হাসিতেছে, এবং সর্বসমেত গোলমাল যখন চরমে উঠিয়াছে তখন প্রবেশ করিল কাশী।—কাশী অপর কোনো কাজ না পাইয়া রাজমিস্ত্রীর যোগানদারের কাজ লইয়াছে—সুরকি মাখাইতে হয়, ইট টানিতে হয়—মালমসলা সাজ-সরঞ্জাম মিস্ত্রীর হাতের কাছে পেঁছাইয়া দিতে হয়।

সে যাহাই হউক, সেখানে এত কলরব নাই। কাশীকে দেখিয়াই এখানকার কলরব দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। অত অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনার আদ্যোপান্ত কাশীর জানা হইয়া গেল। সবাই মিলিয়া তাহাকে জানাইয়া দিল যে, রসো খেলিতে খেলিতে রাস্তার ধূলার ভিতর একটা আনি পাইয়া গেছে, আনিটাকে রসোর হস্তচ্যুত করিতে বিস্তর বেগ পাইতে হইয়াছে; তাহা এখন শশীর জিম্মায় রহিয়াছে; কি-ভাবে তাহাকে ব্যবহারে লাগানো যায় তাহাই বর্তমানে বিষম চিন্তার বিষয় হইয়া আছে—বিভিন্ন ব্যক্তির মতে বিভিন্ন উপায়ে তাহা খরচ করিয়া ফেলিবার প্রস্তাব হইয়াছে: হরির লুঠ, ব্রাহ্মণকে দান, মুড়ি-ভক্ষণ ইত্যাদি।

বড়বউ কাঞ্চন সবাইকে থামাইয়া দিয়া হঠাৎ প্রবলতর হইয়া উঠিল—তাহার মতে উপযুক্ত ব্যবস্থা যাহা হওয়া উচিত তাহা সে দৃঢ়কণ্ঠেই বলিল; বলিল যে, পয়সা সচল পদার্থ; যাইতেই সে আসে; কিন্তু যাইবার সময় সে যদি মানুষের দেহে কিছু পুণ্য রাখিয়া যায় তবে তাহাই ভবিষ্যতে কাজে লাগে—আর কিছু নয়।

স্ত্রীর মুখে এই পুণ্যপিপাসু কথা শুনিয়া কাশী চটিয়া গেল; এবং দেখা গেল, শশীর সঙ্গে এ-বিষয়ে তাহার মতের মিল আছে। বলিল,—বাহাদুরি রাখো। শশী, তুই রেখেছিস ত' আনিটা? রাখ তুলে।

কুমারী বলিল,—হ্যাঁ, রেখেছে। আর একটা আনি পেলেই হুঁকো কিনবে।

অপরাধী শশী প্রতিবাদ করিল না; কিন্তু বড়বউ স্বামীর কাছেও বাধা পাইয়া সেই রাগে হঠাৎ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। আনিটা তাহার হইল না, আর কাহারও নিজস্ব তা কেন হইবে, এই রাগও তার যথেষ্ট ছিল···

কলহের ভঙ্গীতে সে বলিল,—হুঁকো কিনতে কাউকে আমি দেব না। খেতে পাইনে পেট ভরে ছেলেপিলে নিয়ে, এদিকে বাবুয়ানি করে তামাক খাওয়ার শখ ত' আছে!

বড়বউয়ের ঝাঁজ দেখিয়া শশী ভারি নিস্তেজ বোধ করিল; বলিল,—হুঁকো কেনার কথা আমি বলেছি বটে, কিন্তু তামাশা করে বলেছি। পেটে আমাদের ভাত নাই তা তোমার মতো আমিও জানি, বড়বউ।

সন্ধ্যা তখন লাগিয়া আসিয়াছে।

ছোটবউ একটা কুপী জ্বালিয়া শোবার ঘর দুখানাতে সন্ধ্যা দেখাইয়া রান্নাঘরে যাইতেছিল; দাঁড়াইয়া পড়িল; বলিল,—ঝগড়ায় দরকার কি? ফেলে দিলেই ত' হয় অলক্ষুণে আনি।

—পয়সা হল অলক্ষুণে। এই ভরসন্ধ্যে বাতি হাতে করে অমন কথা বলো না,

ছোটবউ।—বলিয়া কুমারী শশীর মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। শশীও দেখিল, গতিক খারাপ; আনির মায়া ত্যাগ করিয়া স্থানত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ; আনিটা মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া সে-ও ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দূর্বার উপর বসিয়া গা ছাড়িয়া দিল…

ছেলেরা দেখিল আনির দাবিদার আপাততঃ কেহ নাই—বেওয়ারিশ ভাবে তা দাওয়ার মাটিতে পড়িয়া আছে: অভিভাবকগণ নির্লিপ্ত যেন। এ-সুযোগ সুবর্ণ সুযোগ ত্যাগ করিবার মতো নয়। রসো সবার আগে ছুটিয়া যাইয়া তাহাকে অধিকার করিয়াই পলায়ন করিতে উদ্যত হইল…

কিন্তু দাবিদার কেহ নাই ভাবিয়া নিঃসন্দেহ হওয়া রসোর ভুল হইয়াছিল, কারণ, বড়বউ তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, ধমক দিয়া বলিল,—দে পয়সা শীগ্‌গির—নইলে ভাল বে না।

ছোটবউ ভাশুরের সঙ্গে কথা বলে না, কিন্তু ভাশুরের সামনে চেঁচায়—তাহাতে লজ্জা নাই। চেঁচাইয়া সে বলিল,—তোমাকে ও দেবে কেন? আমাকে দেবে না কেন? ও-ই ত' পেয়েছে!

বড়বউ বলিল,—এ যে শরিকের মতো তোমার আমার আলাদা করে ভাগ হল!

তুমিও ত' নিজের কথাই ভাবছ। ওটা তোমার নিজের হোক এ-ই ত' তোমাব মতলব?

—অত মতলববাজ মেয়ে আমি নই। বলিতে বলিতে রসোর হাত হইতে আনিটা ছিনাইয়া লইয়া বড়বউ পার হয় দেখিয়া রাগে দুঃখে ছোটবউ কাঁদিয়া ফেলিল—স্বামীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করিয়া বলিল,—ওগো, একটা বিহিত করো এসে! আমরা যদি কেউ না হই তবে তেমনি ব্যবস্থা আজ থেকে হোক।'

কিছুই আপত্তি নাই। বলিয়া বড়বউ সদম্ভে মাথা তুলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেই তার অতি নিকটেই সহসা গর্জন করিয়া উঠিল কাশী। বলিল,—খবরদার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, তোমাদের বাড় কদ্দুর। ও-আনি আর কারো নয়, আমার। এ-বাড়ির সকলের বড়ো আমি—আমি যাকে দেব এ তারই হবে। আমি খেটে খুটে এসেছি—আমার মেজাজ ভাল নেই! এখুনি ও-আনি আমার হাতে না দিলে ভারি মুশকিল হবে।

মুশকিলের কথায় বড়বউ ভয় পাইল না, কিন্তু অপরিমেয় ঘৃণার সহিত আনিটা স্বামীর সম্মুখে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া সে চলিয়া গেল।

ছোটবউ ছোট্ট করিয়া বলিল,—ও একই কথা হল।

কিন্তু সে-কথা কাশীর কাণে গেল কি না সন্দেহ: বলিল,—এ আনি, চারজনের একবেলার খোরাক—সেদিকে কারো হুঁশ নাই, কেবল পুঁজি করার লোভ। আচ্ছা।—বলিয়া কাহাকে যেন শাসাইয়া কাশী রান্নাঘরে গেল, শিল পাতিয়া আনিটা তাহার উপর রাখিল, তারপর নোড়া তুলিয়া দিল সেই আনির উপর প্রাণপণে তিন ঘা।

ছেলেমেয়েদের চোখ ছলছল করিতে লাগিল, বড়বউ আর ছোটবউয়ের চোখ স্বতন্ত্রভাবে, অর্থাৎ পরস্পরের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হইয়া, এবং নির্নিমেষ হইয়া, জ্বালা করিতে লাগিল।

নিজের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া বড়বউ দানের প্রসঙ্গ তুলিয়াছিল, এবং ঐ কারণেই ছোটবউ চাহিয়াছিল বারোয়ারীভাবে মুড়ি মিষ্টি খাওয়াইতে। কিন্তু প্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হইয়াও দৈবদত্ত সুদর্শন আনিটার এই দুর্গতি কেহ কামনা করে নাই।

কাশী আনিটাকে থেঁতলাইয়া বিকৃত আর অকর্মণ্য করিয়া সেটাকে লইয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহাকে ছুঁড়িয়া দিয়া শূন্যে শূন্যে কোন গহনে পাঠাইয়া দিল তাহার কিছুমাত্র উদ্দেশ রহিল না।

কলঙ্কিত সম্পর্ক

প্রথম ঘটনা

দীর্ঘ দেড় বৎসর পরে কাল সকালে সাতকড়ি বাড়ি ফিরিবে।

সাতকড়ি এতদিন কোথায় ছিল তাহার হিসাব দিতে হইলে মধুডাঙ্গার সেই ঘটনাটা বিবৃত করিতে হয়।

কোন যুগে কার আমলে কি কোন রাজার রাজত্বের সময় মধুর প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল তাহা লইয়া গবেষণা করার প্রয়োজন আছে বলিয়াই আজ পর্যন্ত এদিককার কেহ মনে করে নাই। মধু হিন্দু ছিল কি মুসলমান ছিল, উগ্রক্ষত্রিয় ছিল কি সদগোপ ছিল তাহাও কেহ জানে না—জানে কেবল ইহাই যে, বহুদিন পূর্বে মধু নামে এক দুর্ধর্ষ দস্যু এই স্থানে বাস করিত। স্থানের নাম আগে ছিল পীতাম্বরপুর—তাহার পর মধুর নামে নাম প্রচলিত হইয়া এখন এই পীতম্বরপুরকে সবাই বলে মধুডাঙ্গা।

দিগন্তবিস্তৃত তৃণবৃক্ষহীন দুস্তর এই ডাঙ্গার কোথায় নাকি মধুর দুর্গ ছিল ভূগর্ভে - সরকারী কোনো গুপ্তচর সেই দুর্গ এবং দুর্গেশ্বর মধুকে কোনদিন খুঁজিয়া পায় নাই।

মধু গেছে কিন্তু মধুডাঙ্গা আছে, এবং পথপ্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র এই মধুডাঙ্গা গ্রামে ঝুলনের দিন এক মেলা বসে। কিন্তু মধুডাঙ্গার এই মেলা নামে মেলা -তেমন কিছু নয়। মাত্র দশবারোখানা দোকান বসে, বালতি কড়াই প্রভৃতি রান্নার সরঞ্জাম, হরেক রকমের খেলনা, আরশি-বসানো টিনের কৌটা, কাঠের চিরুণী, কাঠের মালা, ফিতে, ঘুনসি, সূচ, সুতা, পাঁপর ভাজা, ঘুগনি, পান, সিগারেট আর নানান আকারের নানান স্বাদের নানান রঙের, আর নানান গন্ধের বিবিধ মিষ্টান্ন—বালক-বালিকার আর গৃহস্থের লোভনীয় এবং ক্রেয় যা তাহাই কেহ গরুর গাড়িতে, কেহ নিজের মাথায় কি পিঠে চাপাইয়া লইয়া আসে, আর, চট টানাইয়া বসিয়া যায়।

কিন্তু সমারোহটা ভিতরে বেশী।

রাধামাধব বিগ্রহের প্রশস্ত আর উচ্চশির মন্দির, তার সম্মুখেই নাটমন্দির,

তার এদিকে চত্বর, চত্বরের দক্ষিণে অতিথিশালা—সাধ্ন বৈষ্ণবের বিশ্রাম আর ভোজনের স্থান।

সন্ধ্যা লাগিতেই বড় বড় আলো জ্বালাইয়া কীর্তন শ্নর্ন হইয়া গেল। অসংখ্য লোক কীর্তনানন্দ আর কীর্তনরস গ্রহণ করিতে বসিয়া গেছে—দেড়মাসের শিশ্নটিকে লইয়া এক জননীও আসিয়াছেন—শতাধিক বর্ষ বয়স্ক এক অন্ধ বৃদ্ধকে আনিয়া বাড়ির লোকে একেবারে সম্মুখে বসাইয়া দিয়া গেছে। সক্ষম লোকের ত' কথাই নাই।

কীর্তনের আসরে অনেক লোক থাকিলেও সেখানেই সবাই নাই। বাহিরে গাছের তলায় স্থানে স্থানে বৈষ্ণবীগণসহ বাবাজী বসিয়া আছেন—তাঁহাদের কোনো কাজ নাই, গল্প চলিতেছে কেবল। ওদিকে কেউ ইট পাতিয়া আগ্নন করিয়া কড়াইয়ে চাল সিদ্ধ করিয়া লইতেছে - রাধামাধবের প্রসাদ পাইবার নিমন্ত্রণ তাহার হয় নাই, যেমন হইয়াছে বৈষ্ণবীগণসহ ঐ বাবাজীর। ধোঁয়ায় ধ্নলায় স্থানটা বড় অপরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। আরো যাহারা বাহিরে আছে তাহারা সবাই যেন ক্লান্ত—যে বেড়াইতেছে সে গা দ্নলাইয়া বেড়াইতেছে, যে বসিয়া আছে সে ঘাড় গ্নঁজিয়া বসিয়া আছে; যে শ্নইয়া আছে সে পিঠ দ্নমড়াইয়া হাঁটুর সঙ্গে মাথা ঠেকাইয়া শ্নইয়া আছে, একটি ভিখারিণী বসিয়া বসিয়া নির্বিকার চিত্তে তার ছেলেটির দিকে তাকাইয়া আছে—ছেলেটি ধ্নলা লইয়া ম্নখে প্নরিতেছে···

দোকানগ্নলি খোলাই আছে। বাইশ তেইশ বছরের একটি বিধবা মেয়ে একটি মনিহারী দোকানের সম্মুখে বসিয়া কাহারও জন্য যেন ঘ্ননসি বাছাই করিতেছিল, দ্নগাছা বাছিয়া লইয়া আর দাম দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, তার পাশেই একটা অপরিচিত লোক দাঁড়াইয়া আছে।

মেয়েটি সরিয়া গেল।

মেয়েটির অপরিচিত ঐ লোকটিই সাতকড়ি, প্রাণপ্রিয় দ্নইটি বন্ধ্নসহ সে মধ্নডাঙ্গার মেলায় আসিয়াছে, ফ্নর্তি করিতে।

কি রকম ফ্নর্তি সে এতক্ষণ করিয়াছে, এবং কি রকম ফ্নর্তি সে রাতভোর করিত তাহা কেহই জানে না, সে-ও জানে না, কিন্তু যে চরম ফ্নর্তিতে যে প্রচণ্ড বাধা পড়িয়া গেল তাহা সবাই জানে। ফ্নর্তি চরমে তুলিতে যাইয়াই মধ্নডাঙ্গার মেলা হইতে তাহাকে সবান্ধবে যাইতে হইল গিরিধবপ্নরের থানায়—ফ্নর্তি করা শেষ হইল না, গ্নর্নতর একটা অপরাধের দর্নণ আদালতের বিচারে তাহার কারাদণ্ড হইল। সেই কারাদণ্ড ভোগ করিয়া অর্থাৎ ফ্নর্তির শখ নিঙড়াইয়া বাহির হইয়া যাইবার পর, সাতু কাল বাড়ি ফিরিবে। আজ মাসের কোন তারিখ তাহা এ বাড়ির কেহ জানে, কেন জানে না। কিন্তু এত লোকের কে একজন যেন নিঃশব্দে হিসাব রাখিতেছিল; হঠাৎ সে প্রচার করিয়া দিল, কাল সাতু বাড়ি আসিবে। কাল ৭ই।

চারিটি ভাইয়ের ভিতর সাতকড়ি দ্বিতীয়। ছোট দ্নভাই বিদেশে থাকে; তব্ন বাড়িতে লোকের ভিড়, ভিড়ের ভিতর সাতকড়ির স্ত্রীও বর্তমান।

সাতকড়ির স্ত্রী মাখনবালাও দিন গনিতে শ্নর্ন করিয়াছিল, কিন্তু অন্যভাবে;

স্বামীকে পুনরায় চোখে দেখার দিনটি সে দুরুদুরু বুকে ভয়ে ভয়ে গনিতে ছিল—গনিতে গনিতে অবশ হইয়া একদিন সে গনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল—শুরুর সূত্রটা মনে ছিল, আর গণনার শেষ দিনটা বিভীষিকার মতো সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার বুক কাঁপাইয়া তাহাকে জর্জর করিতেছিল ; কিন্তু একটি একটি করিয়া মাঝখানকার অসংখ্য দিন তাহার অসাড়ে উত্তীর্ণ হইয়া গেছে—আর সে ভাবিতে চাহে নাই , মনে মনে চোখ বুজিয়া অন্ধ হইয়া সে সেই অগণ্য দিনের শেষ দিনটাকে প্রাণপণে অনন্ত অন্ধকারে রাখিয়া দিয়াছিল…

ভয়াবহ সেই দিনটা সেই অন্ধকারের ভিতর হইতে হঠাৎ মুখ তুলিয়াছে--মাখন চমকিয়া উঠিল। মাঝখানে ছোট একটা রাত্রি , সূর্য কাল আবার উঠিবে ; তখন স্বামী আসিবেন।

মাখনের জীবন্মৃত শুষ্ক প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। সূর্যের উদয়াস্তব্যাপী জীবন আর দিনগুলিকে এত সংক্ষিপ্ত তার কোনদিন মনে হয় নাই , সাতকড়ি যেদিন যায় সেদিনের তখন কেবল প্রভাত , আজ এই সন্ধ্যা।

মাখনের মনে হইতে লাগিল. মাঝখানে কেবল একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস সে ত্যাগ করিয়াছে , নিঃশ্বাসটি শেষ করিয়া ফেলা হয় নাই , বুক যেন নিঃশ্বাসের ভারে দুর্বহ হইয়া আছে। ইহারই মধ্যে দেড় বৎসর কাটিয়া গেল !

বাড়িতে আরো লোক আছে —সবাই সাতুর আপন , কেউ ভাই, কেউ ভাজ, কেউ মা, কেউ আর কিছু। কিন্তু এতগুলি পরমাত্মীয় থাকিতেও মাখনের মনে হইয়াছে, সমগ্র ব্যাপারের সঙ্গে তাহারই লিপ্ততা যেন সকলের চেয়ে বেশি—সে-ই বেশি করিয়া জড়ানো। সে স্ত্রী , বাহির হইতে আসিয়া স্বামীর কোন ক্ষেত্রটা সে অধিকার করিয়া বসিয়াছে,তাহা অনুমান করিতে কেহ কখনো বোধ হয় মন খুলিয়া বসে নাই ; তবু একটা স্থানে তাহার আধিপত্যের পরাকাষ্ঠা লোকে যেন তাহার কাছে প্রত্যাশা করিয়াছে , একটি স্থানে সে সবস্ব, সর্বগ্রাসী, সতত জাগ্রত ; সে তাহার দাবী পূর্ণতম মাত্রায়, একটি অণুপরিমাণ প্রাপ্যের মায়া ত্যাগ আর, দাবি লঙ্ঘন সহ্য না করিয়া অশেষ শক্তিশালিনী দশভুজার মতো দশ হস্তে কাড়িয়া টানিয়া ছিনাইয়া আদায় করিয়া লইবে—ইহা যেন মানুষের চৈতন্যের মতো যেমন সহজ তেমনি অকুণ্ঠ ব্যাপার।

কিন্তু সে ক্ষমতা সে দেখাইতে পারে নাই , সংসারের প্রত্যেকটি লোকের কাছে এই অক্ষমতার লজ্জায় তাহার মুখ হেঁট হইয়া গেছে। বিবাহের পর শাশুড়ী কতবার আভাসে ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন যে, ছেলের বন্ধন সে-ই, জীবনের শৃঙ্খলা সে-ই—সৌষ্ঠব শ্রী সৌন্দর্য সম্মান একমাত্র তাহারই হাতে। সবারই সেই মত ; বাড়ির বাহিরের লোকেরও সেই ইচ্ছা, সেই জ্ঞান। মাকে ডিঙাইয়া, একটি অগ্রজ, দুইটি অনুজকে অতিক্রম করিয়া সে-ই সব—একটি লোকের জন্য এই সর্বোচ্চ অগ্রগণ্য স্থানটি অকপটে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে কাহারো বাধে নাই , কেহ ইতস্ততঃ সন্দেহ করে নাই , শাশুড়ী যেন পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন , তাহার অস্তিত্বই যেন একটা অপরাজেয় অপরিহার্য শাসনবাণী—তাহাকে লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই।

কিন্তু আজ সে পরাস্ত—শাসনদণ্ড ধূলায় লুটাইতেছে ; সে আজ এত তুচ্ছ

অকর্মণ্য গুরুত্বহীন যে, তাহার থাকা-না থাকার একই মূল্য। দুনিয়ার লোকে কি বলিতেছে কি ভাবিতেছে তাহা সে জানে না ; কিন্তু স্বামীর জীবন হইতে নিজেকে বিচ্যুত করিয়া লইয়া সে ত' সরিয়া স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। তাহার পৃথিবী অতিশয় ক্ষুদ্র ; স্বামীর সত্তার বাহিরে যে জীবন্ত পৃথিবী রহিয়াছে তাহার সঙ্গে সংযোগ তাহার স্বামীকেই বৃন্ত করিয়া স্বামীকেই বৃন্তরূপে পাইয়া সে চারিদিকের আবহমণ্ডলে ফুটিয়া আছে—তাহার পরিচয়ই ঐ।

ঐ পরিচয়ই চলিতেছিল—

কিন্তু হঠাৎ একদিন কি হইয়া গেল—পৃথিবী তাহার পথ ছাড়িয়া উল্টাইয়া পড়িল ; যেখানে যে বস্তুটি সুবিন্যস্ত ছিল বলিয়াই সে সুখে ছিল, স্বাভাবিক ছিল, একটি বার চোখের পলক না পড়িতেই তাহারা মিলিয়া মিশিয়া বিকৃত একাকার হইয়া তাহার সেই পৃথিবী ছন্নছাড়া মৃতের শ্মশানে রূপান্তরিত হইয়া গেল…

স্বামী জেলে গেলেন—

যে-কুঞ্জ মক্ষিকার গীতিগুঞ্জরণে মুখর ছিল, প্রচণ্ড আঘাতে সে এলাইয়া পড়িল ; যে আকাশ আলোর মালা, মেঘের ঢেউ, বায়ুর কম্পন দিয়া সাজানো ছিল, তাহা অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল ; ভাবনার দলগুচ্ছ আর বুকের তৃষ্ণা দিয়া নির্মিত যে নীড় অনন্য ছিল তাহার চিহ্নও রহিল না ; মন্দিরের নিত্য অর্চনোৎসব বন্ধ হইয়া গেল ; ফুলের বুকের মধুরস তিক্ত হইয়া উঠিল ; যে-পথে সে আলো দেখিত, যে পথে সে গান শুনিত, যে-পথে সুধা ঝরিত, চক্ষের নিমেষে সমস্ত পথ রুদ্ধ হইয়া জগতের সঙ্গে তাহার আর কোন সম্পর্ক রহিল না…

কিন্তু তাহার এই চরম দুর্গতির অংশ লইতে কেহ বুক বাড়াইয়া আসিল না ; তাহার মনে হইতে লাগিল, একটা ছি ছি রব তাহাদেরই গৃহকেন্দ্র হইতে উত্থিত হইয়া ছড়াইতে ছড়াইতে যেখানে যতদূরে মানুষ বাস করে, প্রাসাদে কুটিরে পথে পাথারে, পৃথিবী যেখানে সত্যসত্যই আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, সেই শেষতম প্রান্তরেখা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া গেছে—জীবজগৎ শিহরিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া বসিয়া আছে…

এই দুর্বিসহ লজ্জা অখণ্ড গুরুভার আর অন্ধকার একখানা মেঘের মতো কেবল তাহারই বুক জুড়িয়া অক্ষয় হইয়া রহিল—"আমিও তোমার সঙ্গে আছি" বলিয়া ভার বণ্টন করিয়া লইতে কেউ আসিল না !

স্বামীর অপরাধ গুরুতর, এত যে, তাহার চিন্তাই সহ্য হয় না ; মানুষ কোনদিন তাহা সহ্য করিতে পারে নাই—সন্তানের জননী হইয়া, কুলের বধূ হইয়া, স্বামীর স্ত্রী হইয়া, নারী তাহা ক্ষমা করে নাই ; ভগবানের নাম যার বুকে আছে, পশু হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই,—এ-জ্ঞান যার আছে সে তাহা ক্ষমা করে নাই।

স্বামী এমনি অচিন্তনীয় অপরাধ করিয়া জেলে গিয়াছিলেন ; মুক্তি পাইয়া কাল ফিরিয়া আসিবেন। কাল ৭ই।

গৃহের আর সবাই উৎকণ্ঠিত, ভৃত্যটি পর্যন্ত ; বিমর্ষে থাকিয়া থাকিয়া তাহারা শ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল—সেই শ্রান্তির মাঝেই যেন তাহাদের লজ্জাবোধের সমাধি

হইয়াছে ; তাহাদের মনে নাই, কি কারণে তাহাদের সেই পরমাত্মীয়টি এতদিন গৃহে নাই।

কিন্তু কোনদিন একেবারে না থাকিলেই যেন ভাল হইত।

রাত্রি তখন গভীর—

মাখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল—আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া একবার ভগবানকে সে ডাকিল…

এতবড় আকাশের যেখানে যে জ্যোতিঃ-বিন্দুটি ছিল, মেঘের গাঢ় প্রলেপে তাহা একেবারে চিহ্নহীন হইয়া গেছে ; থই থই অন্তহীন কালোর পাথারে পৃথিবী ডুবিয়া গেছে ; তাহার শ্বাস বহিতেছে না।

মাখনের ভয় করিতে লাগিল…

কালোর অতলগর্ভে অবতরণ করিয়া কাহারা যেন মন্থনে রত হইয়াছে—তাহারা তাহাদের হারানো রত্ন খুঁজিতেছে ; তাহাদের হাতের শব্দ নাই, পায়ের শব্দ নাই, মুখে শব্দ নাই—কেবল চক্ষু দু'টি দপদপ করিতেছে ·

তাহাদের নির্মম অবিশ্রান্ত দণ্ডপ্রহারে আবর্তকেন্দ্র হইতে ঢেউ ছুটিতেছে—আগে ধোঁয়া, তাহার পর ফেনমুখী হলাহল উদগিরিত হইতেছে…সেই জ্বালাময় হলাহলের পাত্র হাতে লইয়া কে যেন অগ্রসর হইতে লাগিল ; কালোর মাঝেই কালো মূর্তিটি স্পষ্ট—যেমন নিঃশব্দ তেমনি দৃঢ় তেমনি মন্থর। ঐ হলাহল তাহাকে পান করিতেই হইবে—নিস্তার নাই। কতদূর হইতে কালোর স্তরগুণ্ঠন ঠেলিয়া ঠেলিয়া মূর্তি অগ্রসর হইতেছে—তাহার গতির বিরাম নাই ; অনন্তকাল ধরিয়া সে যেন আসিবেই—পথের শেষ নাই…

কবে একেবারে সম্মুখে পৌঁছিয়া হলাহলের পাত্রটি তাহার হাতে দিবে !

বড় জা গোলাপ সর্বাগ্রে উঠিয়াছিল।

সে উঠানে নামিয়াই চিৎকার করিয়া উঠিল ; এবং সেই চিৎকারে ঘুম ভাঙিয়া শশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া সবাই দেখিল, মাখন মূর্ছিত হইয়া উঠানে পড়িয়া আছে।

শাশুড়ী ছুটিয়া যাইয়া বধূর মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া বসিলেন।

আজ এখনই ছেলে আসিবে যে ! আজ ৭ই।

গোলাপ দু'মিনিটে তিন বালতি জল তুলিয়া ফেলিল ; নিতু মাখনের মুখে হাত দিয়া ডাকিতে লাগিল, কাকীমা ? কাকীমা ?

সাতকড়ির দাদা সতীশ দরজার আড়াল হইতে মুখ বাড়াইয়াই ফিরিয়া গেল।

গোলাপ নিতুকে সরাইয়া দিয়া মাখনের মাথায় জল ঢালিতে লাগিল ; বিরাজ পাখা করিতে লাগিলেন ; এবং অল্পক্ষণ পরেই মাখন চোখ খুলিয়া উঠিয়া বসিয়া মনে করিতে পারিল না যে, যে দৃশ্যটি মনে পড়িতেছে, সে দৃশ্যটি সে স্বপ্নে দেখিয়াছিল, কি সত্যই ঘটিয়াছিল !

বিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—বউমা, কেমন আছ ?

কিন্তু মাখনের মন ছিল কুহেলিকাচ্ছন্ন—শব্দ গঠিত করিয়া উত্তর দিতে তাহার দেরি হইল।

বিরাজ আবারও ঐ প্রশ্নই করিলেন, কিন্তু মাখন কিছু বলিবার পূর্বেই সতীশ নামিয়া আসিল।

বিরাজ বলিলেন,—কোথায় যাচ্ছিস ?

—সাতুকে আনতে যাচ্ছি, মা···

—যা।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল,—বউমা উঠোনে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন কি করে ?

—তা'ই ত' ওকে শুধোচ্ছি। তুই ভাবিসনে, ভালই আছে।

অর্থাৎ সাতকড়িকে আনিতে যাইবার পক্ষে বউমায়ের জন্য উৎকণ্ঠায় কালক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই।

—'যাই' বলিয়া সতীশ বাহির হইয়া গেল।

ধরিয়া আনিবার দরকার সাতুর ছিল কিনা কে জানে, কিন্তু একা একা, যেন অনিমন্ত্রিতের মতো, গৃহে প্রবেশ করিতে সে সংকোচ বোধ করিতে পারে—তাহারই নিবারণকল্পে বিরাজ এবং তাহার বড় ছেলে সতীশ পরামর্শ পূর্বক সহজভাবে একটু চেষ্টা করিলেন—সতীশ আগুয়ান হইয়া তাহাকে আনিতে গেল।

বিরাজ ও বড়বউ তখন মাখনকে লইয়া পড়িলেন—

—অসুখ করেছে ?

মাখন নির্জীবের মতো বসিয়াছিল, বলিল, না।

—তবে, ভয় পেয়েছিলে ?

—না।

—তবে ?

মাখন বলিল—রাত্তিরে ঘুম হল না, বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। কখন কেমন করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছি জানিনে।—বলিয়া মাখন উঠিল।

নিতু তখন মাখনের কাপড় ধরিয়া আহ্লাদে লাফাইতে লাগিল।

অনেক বেলায় সতীশ ফিরিল, কিন্তু একা।

ছোট বউকে সুস্থভাবে চলিতে ফিরিতে দেখিয়া বিরাজ সেদিকে নির্বিঘ্ন হইয়া, পুত্রের আগমন প্রতীক্ষায় দরজায় দাঁড়াইয়াছিলেন—সতীশকে একা ফিরিতে দেখিয়া তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন,—সাতু কই ?

সতীশ ধীরে ধীরে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—সে এল না।

—এল না ? কোথায় গেল ?

এতদিন দর্শন ও প্রাপ্তি আসন্ন হয় নাই—অনিবার্য বিলম্ব সহিতেছিল; কিন্তু আজ সে প্রতি মুহূর্তে নিকটতর হইতে হইতে একেবারে সম্মুখে না আসিয়া সহসা কোথায় অদৃশ্য হইল! বিরাজের বুক ফাটফাট করিতে লাগিল···

সতীশ বলিল,—চলো ভেতরে, বলছি।

ভিতরে আসিয়াই বিরাজ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন: তাকে আনতে পারলিনে কেন ? কোথায় গেল সে ?

—কি জানি কোথায় গেল! জেলের বাইরে এসে সে বলল, একটু দাঁড়াও, আমি আসছি। বলে সে কি কাজে গেল জানিনে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার—

সাতুর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার কি দুরবস্থা ঘটিল তাহা সতীশ বলিল না ; বোধ হয় মায়ের চোখে জল দেখিয়া সে একটু বিব্রত বোধ করিয়াই পাশ কাটাইল।

বিরাজ বলিলেন, সে হয়তো তখুনি এসে তোকে না দেখতে পেয়ে অন্যদিকে চলে গেছে !

বিরাজের এ অনুমান সত্য নিশ্চয়ই নয়—কিন্তু সতীশের নিকট হইতে কোন জবাব আসিল না।

বিরাজের চোখে সেই যে জল দেখা দিল সে-জল নিজেও থামিল না, তিনিও চেষ্টা করিয়া থামাইলেন না—জলের সঙ্গে নিঃশ্বাসও বহিতে লাগিল…

কিন্তু মাখনের সকল দুঃখ আর অসহিষ্ণুতার উপর যেন অধিকতর দুঃসহ হইয়া উঠিল এই বেদনাটাই যে, যে-পুত্র সমুদয় পৃথিবীর সজাগ দৃষ্টির সম্মুখে তাহাদের সবাইকে এমন করিয়া পাঁকে ডুবাইয়া লইয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছে সে-পুত্র কেমন পুত্র ! এই চোখের জল সর্বকালের এবং সর্বদেশের মনুষ্যত্বের অবমাননা—জননীর বুকের স্নেহের অঙ্গে কলঙ্কের কালিমা লেপন। ইহা অভদ্র।

বিরাজের একবার চোখ মুছিবার সময় মাখন বলিল,– পথ চেয়ে আছ বৃথাই মা। দিনের আলোয় মানুষের সামনে দিয়ে আসার উপায় তাঁর নেই। তিনি আসবেন সন্ধ্যের পর।

শুনিয়া বিরাজের পিত্ত জ্বলিয়া গেল। তিনিও বধূর ভাবগতিক লক্ষ্য করিতেছিলেন। ঐ কথায় তাহাকে তিনি তীব্রতর চক্ষে লক্ষ্য করিলেন, বলিলেন, বউমা তোমার মান অভিমান আর রাগের ভঙ্গী আমার ভাল লাগছে না। তোমার মুখ দিয়ে বিষ পড়ছে। অমন বিষমুখ করে থেকো না তুমি, মুখ অমন বিষ করে ছেলের সামনে যেতে তুমি পাবে না শুনে রাখো। তুমি যেমন আছ তেমনি থাকো। আমরা তোমার গুরুজন। আমাদের সামনে—

কিন্তু মাখন হঠাৎ পিছন ফিরিল দেখিয়া বিরাজ যাহা বলিতেছিলেন তাহার গতি অন্যদিকে ফিরাইয়া লইলেন—শেষ কথাটাই অত্যন্ত সংক্ষেপে এবং অত্যন্ত সতেজে বলিয়া দিলেন,—যাও, কিন্তু সাবধান।

একটু নিঃশব্দ হইতেই সতীশ গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি মা ?

—যাই, বলছি গিয়ে।—বলিয়া বিরাজ ছোটবউয়ের আচরণ অর্থাৎ তাহার দুঃখের আর ক্ষোভের কথা, বড় ছেলের কানে ঢালিতে বসিয়া গেলেন, কিন্তু সুখ কি দুঃখ কিছুই পাইলেন না। এই ঘাঁটাঘাঁটিতে সতীশের লজ্জা করিতে লাগিল, বলিল,—বড় বউকে বলো সে-ই বুঝিয়ে বলবে এখন। বলিয়া সে মুখ নামাইল।

মায়ের নিঃশব্দ চোখের জল আর সবার মুখের তাড়নায় অতিষ্ঠ হইয়া সতীশ ভাইকে আর একবার খুঁজিতে বাহির হইল। কিন্তু গম্য-অগম্য ইতর-ভদ্র কোনস্থানেই নিরুদ্দিষ্টের সাক্ষাৎ মিলিল না—কোথায় গেলে সাক্ষাৎ মিলিবে সে সন্ধানও মিলিল না।

এই সংবাদ বিরাজ পাইয়া শুইয়া পড়িলেন, এবং খানিক শুইয়াই রহিলেন, তারপর তিনি মুহুর্মুহু ঘর-বাহির করিতে লাগিলেন, মাখনের রকম দেখিয়া

উৎকণ্ঠার উপর তাঁহার ক্রোধ জন্মিতে এবং জমিতে লাগিল—তথাপি তাঁহার মুখের শব্দ বন্ধ হইয়া রহিল। তাঁহার মুখে আজ ভাত উঠিল না।

কিন্তু ফলিল মাখনের কথাই।

সন্ধ্যার পর বার-দুয়ারের চৌকাঠে ঠাকুরমার কোলের কাছে বসিয়া নিতু বলিতেছিল,—কাকা কখন আসবে ঠাকুমা? কোথায় গিয়েছে কাকা?

বিরাজ বসিয়া যেন বিশেষ ঘোরে ঝিমাইতেছিলেন; বলিলেন, তা জানিনে।

—এতদিন কোথায় ছিল?

বিরাজ মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, কথা কহিলেন না।

নিতু বলিতে লাগিল,—কাকা অনেকদিন বাড়িতে আসেনি, নয় ঠাকুমা? কেন আসেনি? কোথায় ছিল এতদিন? আমার জন্যে কি আনবে?

পরম স্নেহাস্পদ বালক পৌত্রের কৌতূহল নিবৃত্তির দিকে ঠাকুরমার কিছুমাত্র উৎসাহ দেখা গেল না। বালকের এমনিধারা শতেক প্রশ্নে যে মিনতি আর যে আগ্রহ দেখা দেয়, বিরাজের প্রাণের আনন্দপ্রবণ অন্তঃস্রোত তাহার স্পর্শে চিরকাল নাচিয়া উঠিয়াছে, আজ তা তাঁহার অজ্ঞাতেই মুহূর্তের জন্য একবার চোখের পাতা ভারি করিয়া তুলিল মাত্র, কিন্তু মনে পড়িল না যে সবই বিষদৃশ। নিতু চুপ করিবার পর বাড়ি নিস্তব্ধ হইয়া গেল, বিরাজ আনমনা হইয়া রহিলেন।

বিরাজ আনমনাই ছিলেন; হঠাৎ চমকিয়া তিনি দেখিলেন, আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকা একটি লোক তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে—তাহাকে চিনিতে তাঁহার মুহূর্তও বিলম্ব হইল না—"সাতু"? বলিয়া তিনি প্রকৃত সজীব ব্যক্তির মতো লাফাইয়া উঠিলেন, সাতু গায়ে-মাথার আচ্ছাদন খুলিয়া ফেলিয়া জননীকে প্রণাম করিল এবং পরক্ষণেই হৈ চৈ বাধিয়া গেল। নিতু চিৎকার করিয়া সংবাদ রাষ্ট্র করিতে লাগিল, বাবা, কাকা এসেছে, মা, কাকা এসেছে, কাকীমা কাকা এসেছে। বলিতে বলিতে সে কাকার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া আর তার হাত ধরিয়া নাচিতে লাগিল

"আয়"। বলিয়া বিরাজ অগ্রসর হইয়া গেলেন। তাঁহার পিছন পিছন সাতু বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া দেখিল তাহার স্ত্রী ব্যতীত আর সবাই একত্র হইয়া সোৎসুকে দাঁড়াইয়া আছেন। দাদাকে সে প্রণাম করিল, বউদিকেও প্রণাম করিল, দাদার ছোট ছেলেটাকে সে দেখিয়া যায় নাই—"এটা আবার কবে হল?" জিজ্ঞাসা করিয়া সাতু ডান হাতের দুটি আঙুলে তাহার গণ্ড স্পর্শ করিল।

দাদার বিশেষ কিছু বলিবার ছিল না। "আমায় দাঁড় করিয়ে রেখে কোথায় পালিয়েছিলি?" বিস্মিত এই প্রশ্নটি অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকবার তার মনে উঠিয়াছিল; কিন্তু কেন পালাইয়াছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া বোধ হয় চক্ষুলজ্জার বশেই সে নিঃশব্দে সরিয়া গেল; মাকে সন্তুষ্ট করিতেও সে কোনো সম্ভাষণই মুখে ফুটাইতে পারিল না।

বউদি গোলাপ কেবল জিজ্ঞাসা করিল,—ভাল আছ?

সাতু বলিল,—তোমাদের আশীর্বাদে।—বলিয়া হাসিল। হাসিটা হঠাৎ কটু মনে হইয়া গোলাপের মন আরো খারাপ হইয়া গেল। তাহার হেঁশেল ছিল—মুৎফরক্কা অভ্যর্থনার পর সে সেখানেই গেল।

বিরাজ ছেলেকে অবলোকন করিতেছিলেন ; তাঁহার চক্ষুলজ্জাও নাই, হেঁশেল নাই ; ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি বলিলেন,—বড় রোগা হয়ে গেছিল। ভেতরে অসুখ নেই ত' ?

সাতু নিজের গায়ের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল : হাসিয়া বলিল,—না। কিন্তু বড় কষ্ট দিয়েছে, মা !

শুনিয়া মায়ের চোখে জল আসিল—বলিলেন,—আজ সারাদিন খেয়েছিস ?

সাতু তাহাদের আড্ডায় আজ যা খাইয়াছে সে জিনিস এ-বাড়িতে রান্না হওয়া দূরের কথা, প্রবেশই করে না। কিন্তু সে মিথ্যা কথা বলিল : কিছুই খাইনি, মা !

—কিছুই খাসনি ? আ-হা-হা···আর্তনাদ করিয়া বিরাজ হাঁকিলেন,—ছোট বউমা, রান্না হল ?—বলিয়া উত্তরের জন্য একমুহূর্ত সবুর না করিয়া তিনি নিজেই রান্নার তদারক করিতে রান্নাঘরের দুয়ারে যাইয়া দাঁড়াইলেন—এবং রান্না সমাপ্ত হইয়াছে কি না তাহা দেখিবার পূর্বেই তিনি দেখিতে পাইলেন, ছোটবউ ব্যাধিকাতর দুর্বল ব্যক্তির মতো জড়সড় হইয়া এককোণে দেয়ালের সঙ্গে গা ঠাসিয়া বসিয়া আছে···

খুবই লক্ষ্য করা—এ ব্যাপারটা মুলতবী রাখিয়া বিরাজ জানিতে চাহিলেন, —বড়বউমা, রান্না হল ? সাতু সারাদিন কিছু খায়নি ।

"এই হল মা"—বলিয়া বড়বউ হাঁড়ি আর কাঠি লইয়া খুব ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

বিরাজ অবেলায় রান্নাঘরের আমিষ মাটি ভুলিয়াও মাড়ান না ; কিন্তু এখন বড় তাগিদ ছিল ; মুলতবী ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করিতে তিনি আমিষ মাটির উপর দিয়াই ছোট বউয়ের দিকে আরো খানিকটা অগ্রসর হইয়া গেলেন ; গলা খুব খাটো করিয়া বলিলেন,—তুমি অমন করে বসে আছ যে ?

ইত্যবসরে তাঁহার বিরহী ছেলেকে দেখা এবং দেখা দেওয়া বিরহিণী বউয়ের উচিত ছিল বলিয়া বিরাজের মনে হইল।

মাখন কথা কহিল না ; তাহার মাথা মাটির দিকে আরো ঝুঁকিয়া পড়িল।

বিরাজ বলিতে লাগিলেন,—ছেলের শরীরের দিকে চেয়ে আমার মন ভাল নেই, বউমা। এমন সময়ে তুমি আমায় জ্বালিও না বলছি। ওঠো।

মাখন মুখ তুলিল না ; বলিল,—উঠে কি করব ?

—করবে আবার কি ? নেচে বেড়াতে তোমায় কেউ বলছে না। ছেলের সামনে তুমি মুখ অমন বিষ করে থাকতে পাবে না।—বলিয়া মহা রাগতভাবে মাথার মস্ত একটা ঝাঁকি দিয়া বিরাজ প্রস্থান করিলেন ।

সাতু ইত্যবসরে তাহার দেড় বৎসরের পরিত্যক্ত গড়গড়াটা বাহির করিয়া লইয়াছে। কেবল তাহার প্রিয় তরকারিগুলি প্রস্তুত করিতে বধূদ্বয়কে হুকুম করিয়াই বিরাজ কর্তব্য সম্পাদনপূর্বক নিশ্চিন্ত হন নাই, সাতুর শ্রান্তিহারী এবং সুখজনক শৌখিন তামাক আর টিকেও আনাইয়া চাকরটাকে, কি কারণে কে জানে, সে দিনের মতো ছুটি অর্থাৎ বাহির করিয়া দিয়াছেন।

সাতু চটপট তামাক সাজিয়া লইয়া টানিতে বসিল। নিতু তার ছড়ানো পায়ের ফাঁকে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় ছিলে কাকা এতদিন ?

বালকের ঐ একই প্রশ্ন—

কিন্তু একবারও তাহার উত্তরের আশা মিটিল না ; ভূতপূর্ব বাসস্থান সম্বন্ধে সাতু একটা অপ্রকৃত উত্তর গড়িয়া না তুলিতেই বিরাজ রান্নাঘর হইতে সেখানে আসিয়া পড়িলেন ; বলিলেন,—তোর সে কথায় বারবারই কাজ কি রে লক্ষ্মীছাড়া ? পালা এখান থেকে।—বলিয়া নিতুর সোহাগ সুখ ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে তিনি দাঁড় করাইয়া দিলেন।

সাতু চিরদিন সপ্রতিভ—

নিতুর প্রশ্নে, এবং ভৎ'সনা দিয়া মায়ের এই চাপা দিবার চেষ্টায়, তাহার মনে ঘুণাক্ষরেও একটু বিকার উপস্থিত হইল না ; বলিল—আহা, বসুক না। বলিয়া সে নিতুকে হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া বসাইল ; কিন্তু নিতুর তখন আর খবর জানিবার উৎসাহ নাই।

বিরাজ সাতুকে দেশের খবর, অর্থাৎ পরিচিত মানুষের জন্ম মৃত্যু বিবাহের খবর শুনাইতে লাগিলেন ; সাতু তাহা তামাক টানিতে টানিতে শুনিতে লাগিল।

আহারের ঠাঁই হইল দুই ভাইয়ের পাশাপাশি। সাংসারিক কথাই সংসারে বেশী, এবং প্রবল। দাদা সতীশের সঙ্গে, এবং মায়ের সঙ্গেও, সাতু আহারে বসিয়া যথেষ্ট লিপ্ততার সঙ্গে সে আলোচনা করিল এবং অকুণ্ঠিতভাবে আর দীর্ঘ ভাষায় স্বীকার করিল যে, ঋণ যাহা হইয়াছে তাহার কারণ সে-ই।

সতীশ ভাতের থালার দিকে এবং বিরাজ সাতুর মুখের দিকে তাকাইয়া ঋণ সম্বধে তাহার বক্তব্য শুনিলেন—দুঃখের কথা উচ্চারণ করিলেন না।

ভোজনে সাতু বৃক-তুল্য—

কিন্তু আজ তাহাকে অল্পেই তৃপ্ত হইতে দেখিয়া জননী বিরাজ ক্ষুব্ধ হইলেন ; বলিলেন—কই, খেলিনে যে তেমন ?

—পেটের খোল চুপসে গে'ছে, মা, না খেয়ে খেয়ে। ভেবো না, ক্রমশঃ আবার বড় হবে। বলিয়া সাতু মাতৃহৃদয়কে অভয় দিয়া খুব হাসিতে লাগিল।

আনন্দের মাঝেই আহার সমাধা হইল। সাতু তামাক সাজিয়া লইয়া শয়ন-কক্ষে যাইয়া বিছানায় বসিল।

মাখন ভাতের থালা সামনে লইয়া কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া রহিল।

গোলাপ কাতরস্বরে বলিল,—খা···

দু'গ্রাস ভাত মুখে তুলিয়াই মাখন হাত টানিয়া লইল। গোলাপ সে দিকে একবার বিষণ্ণ চক্ষে চাহিয়া দেখিল—আর বলিল না কিছুই।···

বহু যোজন দূরে ঝড় উঠিলে নাকি সমুদ্রের নির্বাত তটেও তাহার ঢেউ আসিয়া লাগে। মাখনের মনের কথা গোলাপের অজানা নাই, মাখনের বুকের বেদনা যেন নিঃশ্বাসবায়ু চালিত হইয়া তাহার বুকে বাজিতেছিল—

তবু সে একবার বলিল, ভাই, আমার মাথা খা'স···

মাখন বলিল,—দিদি, আমায় বিষ দাও।

বড়বউ ছলছল চক্ষে বাম হস্তে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিল।

"ছোট বৌমার খাওয়া হ'ল?"—জানিতে চাহিয়া বিরাজ আসিয়া অদূরে দাঁড়াইলেন—অকারণেই তাঁহার মনে হইতেছিল, ছোটবউ ইচ্ছাপূর্বক বিলম্ব করিতেছে।

বড়বউ বলিল—হয়েছে।

ছোট বউয়ের দিকে তাকাইয়া বিরাজ বলিলেন,—তবে বসে আছ কেন? হেঁশেল বড় বউমা সারবে'খন, তুমি আঁচিয়ে যাও তোমার ঘরে।—বলিতে বলিতে তাঁহার নজরে পড়িয়া গেল সাতুর খাওয়া থালাখানা। থালাখানা তাঁহার সাক্ষাতে তুলিয়া আনা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি সাক্ষাতের উপর ছিলেন না বলিয়াই বোধ হয় সেই উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্রে ছোটবউ ভাত লয় নাই দেখিয়া, অর্থাৎ স্বামীর প্রতি বধূর এই ঘৃণা প্রকাশে, বধূর প্রতি দারুণ অপ্রবৃত্তি জন্মিয়া বিরাজের যে কেমন ঠেকিতে লাগিল তাহা বলা যায় না। কিন্তু সে কথা তিনি মোটেই তুলিলেন না; কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—কথা বলছ না যে?

কি কথা তিনি বধূর মুখে শুনিতে চান তাহা তিনিই ভালো করিয়া জানেন না। কোথায় একটু ধিক্কার যেন ছিল—তাহাকে নির্বিষ করিতেই তিনি তাঁহার ক্ষমার অধিকারের আর আকাঙ্ক্ষার সাথে খুঁজিয়া মরিতেছেন; বধূর মুখের কথায় যদি তাই একটু পান; কিন্তু মুশকিল এই যে, এই কথা লইয়া গলা চড়াইবার উপায় নাই।

আরো মুহূর্ত দুই অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া বিরাজ পুনরায় বলিলেন, মনের ঝাঁজ যেন গলিয়া গলিয়া মুখ দিয়া বাহির হইতে লাগিল: "কথা কইছ না যে তবু? কার হাতে তুমি পড়েছ তা জানো? আমার হাতে। আমায় ঘাঁটিয়ে কেউ নিস্তার পায়নি।"

বলিবার কিছু ছিল না বলিয়াই মাখন তথাপি কিছু বলিল না। বড়বউ মধ্যস্থ হইয়া আসিল; বলিল,—তুমি যাও, মা। আমি ওকে দিয়ে আসছি।

যাওয়া ছাড়া বিরাজের আর গতিই ছিল না। পাথরে আঘাত কে কত করিতে পারে! মনে মনে ছোট বউয়ের মাথা চিবাইতে চিবাইতে তিনি চলিয়া আসিলেন।

বড়বউ যাইয়া মাখনের হাত ধরিল।

বিছানায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে সাতকড়ি মধুডাঙ্গার মেলার ঘটনাই চিন্তা করিতেছিল,—সেখানকার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, আর দুর্বিপাকের বহর ভাবিতেছিল, দৈব নিতান্তই বিমুখ; নতুবা ধরা পড়িবার ত' কোনোই সম্ভাবনা ছিল না। সঙ্গীরা পাকা লোক। সতর্কতা অবলম্বন করিতে কোনোদিকেই ত্রুটি হয় নাই—মেয়েটির সঙ্গ লইয়া পায় পায় তাহাকে অনুসরণ করিয়াছিল—ঘুণাক্ষরেও তাহাকে টের পাইতে দেয় নাই।

দোকানপাট বন্ধ হইয়া মেলার স্থানটা ক্রমে নিদ্রিত নির্জন হইয়া গেল। কীর্তন তখন দুলে চলিতেছে, জমিয়াছে বেশ; কীর্তনওয়ালা ঘামিয়া নাহিয়া উঠিয়াছে—তবু তার বসিবার নামটি নাই; খোলবাদকগণ যেন নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছে...

নাটমন্দিরের ভিতরে বাহিরে একটা টিনের চালার কাঠের খুঁটি ঠেস দিয়া বসিয়া মেয়েটি ঢুলিতেছিল। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা হরিধ্বনিতে চমকিয়া সজাগ হইয়া সে বোধ করি গায়ে হাওয়া লাগাইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দোকানের আওতায় বাতাস ভাল বহিতেছে না, মেয়েটি ধীরে ধীরে গলির মুখে আসিয়া দাঁড়াইল...

তারপর যা ঘটিল তা চক্ষের পলকে—মেয়েটির মুখের উপর কাপড় চাপা পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তার দেহখানা শূন্যে উত্তোলিত হইয়া তীরবেগে চলিতে লাগিল।

অদূরে বিস্তৃত বাগিচা—

কেজো অকেজো ছোট বড় গাছে আর ঝোপ জঙ্গলে বাগিচা পরিপূর্ণ। কিন্তু বিধাতা এমনি অপ্রসন্ন যে, গভীর রাত্রে বনাভ্যন্তরেও তিনি একজন দর্শককে পূর্ব হইতেই স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে ই পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিল।

তারপর মামলা ; অত্যন্ত তোড়জোড় ; অসংখ্য যাতায়াত, অজস্র অর্থব্যয়, কত কি বিশৃঙ্খলা, কিন্তু প্রত্যেক ঘটনা স্বতন্ত্র এবং স্পষ্ট...

তারপর সুদীর্ঘ সশ্রম কারাবাস ; দেহের শক্তি যেন নিঙড়াইয়া বাহির করিয়া লইয়া ওরা কাজে লাগাইয়াছে—নিদারুণ দাসত্ব সহ্য করিতে হইয়াছে।

দুঃসহ পীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে বলিয়া সাতুর কিন্তু নিঃশ্বাস পড়িল না—মেয়েটির মুখখানা তার মনে পড়িল—নয়নাভিরাম : কালোর উপর উলকির ফোঁটা ; স্বাস্থ্য অতি সুন্দর ; চক্ষু দু'টি আয়ত ; সিন্দুর শঙ্খ নাই ; অঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র নাই ; নিতান্তই গেঁয়ো হাবা—দেখিলেই তা বোঝা যায়। মেলায় একা আসিয়াছিল, না, সঙ্গীসাথী কেহ ছিল কে জানে। এখন সে কোথায়, কেমন তার দশা, তাই বা কে জানে !

সাতু উহাই ভাবিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় দরজার খিলের শব্দ পাইয়া সে ধীরে ধীরে চোখ ফিরাইয়া দেখিল, মাখন আসিয়াছে—সে আরো দেখিল যে সে মেয়েটির চেয়ে মাখন সুন্দর...

বলিল,—এতক্ষণে দেখা দিলে। এস।

কিন্তু মাখন স্বামীর আহ্বানে পোষমানা কি মন্ত্রমুগ্ধ মানুষটির মতো সরাসরি শয্যায় না যাইয়া দূরে দেয়ালের দিকে যাইয়া দাঁড়াইল তার সোহাগপূর্ণ সাদর আহ্বান সে শুনিতে পাইয়াছে কিনা তাহাই সাতু বুঝিতে পারিল না।

স্বামীর সঙ্গে মাখনের মিলনেরএকটা সূত্রনা থাকিয়া পারে নাই ; কিন্তু প্রাণের আঁশে আঁশে যোগের স্রোত প্রবেশ করিয়াছিল এ-কথা বলা চলে না। সংসর্গজ স্তিমিত একটা কোমলতা জন্মিয়াছিল—মাঝে মাঝে তা ফুটিত ; তার উপর, কোথায় ভয়াবহ দণ্ডপাণি একজন শাসক বসিয়া আছেন—তিনিও টানিয়া লইয়া প্রকাশ্য একটা স্থানে জোড় মিলাইয়া দিয়াছিলেন—মাখন তা' অস্বীকার করিতে পারে নাই। কিন্তু স্বামীকে মাখন চিনিয়াছিল। মানুষ মানুষের হাসি দেখিয়া চেনে, ভাষা শুনিয়া চেনে, চাহনি দেখিয়া চেনে, চিনিবার দিকে এমন উগ্রভাবে সচেতন প্রাণের কাছে প্রাণের পরিচয় গোপন রাখা যেমন কঠিন, চিনিতে পারিবার

পর সেদিকে চোখ বুজিয়া থাকাও তেমনি কঠিন। সুখের হোক, দুঃখের হোক, তবু স্পর্শ ছিল—সুখে দুঃখে মিশ্রিত হইলেও এবং ইচ্ছা অনিচ্ছায় অনিচ্ছাই প্রবল হইলেও, কর্তব্যের দায় আর প্রেরণা ছিল; অভিমানবোধ ছিল; আছে আর আছি বলিয়া নিরন্তর একটা অনুভূতি ছিল—

সব লুপ্ত হইয়া গেছে—মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর উপর নিপতিত জলবিন্দুর মতো সে এতবড় ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় যাইয়া আশ্রয় লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেছে, তাহার উদ্দেশ নাই।

মাখন স্বামীর চোখের উপর চোখ পাতিয়া রাখিল। সে দৃষ্টির অর্থ কি সাতু তাহা বুঝিল না—সে বুঝিল না যে, দুজনাই মানুষ হইলেও তাহাদের জগৎ বিভিন্ন কোনো অপরিচিত জগতের, অনভ্যস্ত আত্মা যেন এই জগতের আত্মার কাছে বন্দী হইয়া আসিয়াছে পুরুষের দিকে স্ত্রীর এই দৃষ্টি বিভীষিকার সম্মুখে মূর্ছিতার বিহ্বল দৃষ্টি—নিঃশব্দ আর্তনাদ···

সাতু হাসিতে লাগিল, বলিল,—বড়ই অভিমান যে! ডাকছি, তা আসা হচ্ছে না! ঢং দেখলাম বিস্তর। নেও হয়েছে, এস এখন, না, আমাকেই উঠতে হবে!

মাখন চোখ নামাইয়া মাটির দিকে চাহিয়া একবার ঢোক গিলিল—তাহার বুক ধড়ফড় করিয়া সর্বাঙ্গ যেন কাঠ হইয়া যাইতেছে

সাতু উঠিতে উঠিতে বলিল,—উঃ—বলিয়া বিরক্তি আর শ্লেষ প্রকাশ করিয়া সে উঠিল।

মাখন কেবল সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল—কোথায় সে যাইতে চায় সে জ্ঞান তাহার নাই, যাইবার স্থান নাই, তবু নিজেকে আড়ষ্ট করিয়া তুলিয়া সে কেবল সরিয়া দেয়ালের বাহিরে যে অশেষ উন্মুক্ত পৃথিবী, যেন তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া সে চলিয়াছে—তাহার স্থূল অবয়ব কেবল ত্বকের উপর পশ্চাতের কঠিন বাধা অনুভব করিতেছে। দেয়ালের সঙ্গে ঘর্ষণে তাহার পিঠের চামড়া কাটিয়া গেল।

সাতু অগ্রসর হইয়া আসিতেছে—

তাহার স্পর্শটা আসিয়া মাখনের সর্বশরীরে যেন বিষাক্ত হুলের মতো বিদ্ধ হইতে লাগিল···

কিন্তু দেহ সংকোচনের অবকাশ আর নাই—পর মুহূর্তেই তার সঙ্কুচিত আড়ষ্ট সর্বাবয়ব যেন রুদ্ধ বায়ু বাহিরের দিকে নির্গত করিয়া দিয়া বাহিরের চাপ বাহিরের দিকেই ঠেলিয়া দিল—সর্বান্তঃকরণ বিদ্যুতের আগুনে জ্বলিয়া লাল হইয়া সহসা প্রাণপণে আপনাকে বিস্তৃত করিয়া দাঁড়াইল···

সাতু তাহা দেখিল—এমন ব্যাপার না দেখিয়া উপায় নাই; কিন্তু সাতু তাহা গ্রাহ্য করিল না; তা করিবার মতো মন তাহার হইলে সে জেলে যাইত না। বলিল,—সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়, একটা কথা আছে না? অমন করে চাইলে কি হবে। আমার—

বলিতে বলিতে মাখনকে হাত তুলিতে দেখিয়া সাতু থমকিয়া দাঁড়াইল। মাখনের হাত তুলিবার ভঙ্গীটি বড় অসাধারণ—তাহার উদ্দেশ্য যেন শুধু

আত্মরক্ষা নয়, তাহার উপরে মারাত্মকই কিছু। সাতু যতই দুর্জয় হউক, আর, এখানে সেখানে সে যতই ভুল করুক, এবার সে ভুল করিল না, আর, ভয় পাইল ; ছুটিয়া আসিয়া বলিল, মারবে নাকি ?

মাখন বলিল,—আমায় ছুঁও না।

—যদি ছুঁই ?

—ভাল হবে না।

শুনিয়া সাতুর বুক কাঁপিয়া উঠিল।

নিজের হাতে হামেশাই থাকে বলিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহার মনে হইল, তীক্ষ্ণ একখানা অস্ত্র তাহার স্ত্রীর বাঁ হাতে আছে—আঁচলে তা ঢাকা আছে।

সাতু ফিরিল ; প্রাণভয়ে পলাইবার মতো করিয়া ছুটিয়া যাইয়া দড়াম করিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া সে চেঁচাইয়া ডাকিল, মা ?

বিরাজ অবশ্য তখন জাগিয়াই ছিলেন—একডাকেই সাড়া দিয়া ছেলের ব্যাকুলকণ্ঠ কানে বাজিতেই তিনি লাফাইয়া উঠিলেন—"কি রে ? কি হ'ল রে ?"—বলিয়া উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করিতে করিতে তিনি ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

সাতু বলিল,—বউকে বের করে আনো ; ও-ঘরে আমি যাব না। মারবে বলছে।

বিরাজ ঠিকরাইয়া উঠিলেন : মারবে বলছে ?

—তা পারে। ওর কাপড় চোপড় ঝেড়ে দেখ—ছুরি ছোরা বোধ হয় ওর কাছে আছে।

শুনিয়া বিরাজ হতজ্ঞান হইয়া গেলেন। বড় কষ্টে দীর্ঘ দিন তাঁহার কাটিয়াছে ; উৎকণ্ঠায় তাঁর স্নায়ু উঠিয়া পড়িয়া অবিরাম ঝমঝম করিয়া বাজিয়াছে, শ্রান্ত শক্তিহীন হইয়া গেছে, ছেলের ক্লান্ত শীর্ণ চেহারার দিকে চাহিয়া তাঁহার কিছুই ভাল লাগে নাই ; তাহার উপর, এই বধূরই পিছনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিরক্তিতে আর বধূর অমানুষিক একগুঁয়ে আচরণে ক্রোধের তেজে তাঁহার রক্ত তখনো ফুটিতেছিল…

এখন ছুরি লইয়া সেই বধূ তাঁহার পুত্রকে খুন করিতে উঠিয়াছে, আচমকা এই খবর পাইয়া তাঁর মাথার হাড় পর্যন্ত আগুনের জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল—

"কই ?" বলিয়াই যখন তিনি বধূর উদ্দেশে ধাইয়া গেলেন, তখন তিনি উন্মাদ—হিতাহিত ন্যায় অন্যায় বুঝিবার হুঁশ লোপ পাইয়া গেছে…

চোখে পড়িল, বধূ কোণে দাঁড়াইয়া আছে। কেমন করিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে তাহা তাঁহার চোখে পড়িল না ; ছোরা ছুরির ভয়ও তিনি করিলেন না ; লাফাইয়া যাইয়া তাহার সম্মুখে পড়িলেন ; ঘাড়ে ধরিয়া তাহাকে সম্মুখে আনিলেন এবং ঘাড়ে ধাক্কা দিতে দিতেই তাহাকে বারান্দায় আনিলেন, উঠোনে নামাইলেন, উঠান পার করিলেন, বধূর ঘাড় হইতে হাত নামাইয়া সদর দরজার খিল খুলিলেন—

বলিলেন,—যা চুলোয়। বলিয়া ঘাড়ে শেষ ধাক্কা দিয়া তাহাকে সদর দরজার

বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন—তাহার পর খিল আঁটিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

উপরে সতীশের কানে গেল খিলের শব্দটা, জিজ্ঞাসা করিল,—সদর দরজা কে খুলেছে ?

সাতু উত্তর করিল,—মা।—তারপর অত্যন্ত দুঃখিত ভাবে এবং নিম্নতর কণ্ঠে নিজের সম্বন্ধে একটা কথা সে বলিল, বলিল,—জেলই আমার ছিল ভালো।

গণেশ সেনের ক্লেশ ও আয়েশ

শীতকালের প্রাতঃকাল। কিছুক্ষণ হইল সূর্যোদয় হইয়াছে এবং অবারিত ক্ষেত্র পার হইয়া রৌদ্র গণেশ সেনের পূর্বদ্বারী ঘরের পূর্বদিককার বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছে। সেই বারান্দায় রক্ষিত বেঞ্চিখানার উপর গণেশ সেন উত্তর দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন—সর্বাঙ্গে রৌদ্র লাগিতেছে গণেশ সেন রৌদ্রের উত্তাপে দিব্য আরাম উপভোগ করিতেছেন। একবার তাঁহার মনে হইল: রাজারা এ আরাম পাবেন কোথায়। তাঁহারা খালি দামী লেপের উপর আরো দামী লেপ চাপান। রাজাদের অভাবের পরিমাণ এবং তাহা পূরণের বেকায়দা চেষ্টার বিষয় স্মরণ করিয়া গণেশ সেন মনে মনে একটু হাসিলেন ; তাহার পরই তিনি পুনঃপ্রবৃত্ত হইলেন স্বকীয় অভ্যাসের চর্চায়

ডান কি বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠ বাদে চারিটি আঙুল অর্ধেক মুড়িয়া তাহাদের মাথা স্পর্শ করিয়া সবেগে অঙ্গুষ্ঠ চালনা করা তাঁহার বহুদিনের অভ্যাস। কেহ উহা লক্ষ্য করিতেছে বুঝিতে পারিলেই গণেশ বলেন: ওটা জপের মুদ্রা—আমি জপ করি। কেউ বলে: জপের মুদ্রা ওটা নয়—ওটা তোমার মুদ্রাদোষ। কেউ বলে: আয়-ব্যয়ের হিসাব মনে অহরহই চলছে, খুব প্রবলভাবেই চলছে। সেই ব্যাপারে যে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে তা-ই দমন করার উপায় ওটা। ডাক্তার জলধি রায় বলেন: ঘোর স্নায়বিক দুর্বলতা—

রোগবিশেষে—বেলেডোনা থার্টির লক্ষণ। দেখুন না এক ফোঁটা খেয়ে।

শুনিয়া গণেশ একটু হাসেন কেবল—কখনো বলেন: কি করবো বলো।

রাজারা যাহার দেওয়া আরামে বঞ্চিত, আর যাহার পরিবর্তে তাঁহারা লেপের উপর লেপ চাপান, শীতকালীন সেই প্রাতঃ-রৌদ্রে গণেশ একা বসিয়া নাই, তার দুটি পৌত্রীও আসিয়া বসিয়াছে—তাহারা রৌদ্রে তালাই পাতিয়া বসিয়া বসিয়া মুড়ি খাইতেছে। তাহাদের আসন গণেশের আসনের খুব কাছেই আর নিম্নে।

রাজাদের দুর্গতির দরুন মনে মনে একটু হাসিবার পর গণেশ নিজের গতিশীল বৃদ্ধাঙ্গুলিটা অর্থহীনভাবে লক্ষ্য করিলেন—তাহার পর তাকাইলেন নাতনী

দুটির দিকে, তাহাদের বাটির দিকে এবং বাটির ভিতরকার খাদ্যবস্তুর দিকে। মুড়ি আর তার উপরকার গুড়টুকু এক সঙ্গেই তাঁর চোখে পড়িল। বিস্ময়ের বিষয়ও নহে, অবাঞ্ছনীয় কি অহৈতুক ব্যাপারও নয়—গণেশের মনে লিপ্ততা দেখা দিল না ; কিন্তু তা দেখা দিল বেঞ্চিখানার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া—এই আসনে তিনি অনেক দিন অনেকবার বসিয়াছেন, কিন্তু খুঁতটা চোখে ধরা পড়িল আজ যেন একেবারে হঠাৎ।

বাঁশের গোঁজের সাহায্যে দুইখানা তক্তা জুড়িয়া দুই তক্তার মিলের স্থানটা বেমালুম করা হইয়াছিল ; কিন্তু কাঠ ছিল কাঁচা—কাঠ শুকাইয়া কাঠে কাঠে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেছে · মিলের স্থানে চওড়া ফাঁক বহিতেছে—ফাঁক এতটা যে, গণেশের সবগুলি আঙুলই অল্পবিস্তর প্রবেশের পথ পাইল—কনিষ্ঠাঙ্গুলিটা ত' সম্পূর্ণই পার হইয়া গেল।

ফাঁকের ভিতর হইতে আঙুল তুলিয়া লইয়া গণেশ দৃষ্টিপাত করিলেন পৌত্রীদের দিকে, আর সম্বোধন করিলেন একটিকে—বলিলেন : ওরে গিনি, মানুষের কাণ্ডটা দেখেছিস ?

গিনি (৭) মুখ তুলিয়া বলিল : কি কাণ্ড, দাদু ?

—এই যে বেঞ্চিটা দেখছিস, এটা রাধাচরণ মিস্তিরির তৈরী। ভাল কাঠের দাম নিয়ে দিয়েছে খারাপ কাঠ আর ভাল কাজের মজুরি নিয়ে করেছে খারাপ কাজ। ক্ষতি করেছে আমার—ঠকিয়েছে।

গিনি বলিল : ভারি অন্যায় ত'। কি করবে তার, দাদু ?

—কিছুই না। সে মরে গেছে।

—মরে গেছে বেশ হয়েছে। মানুষকে ঠকালে অমনি মরতেই হয়। নয়, দাদু ? বলিয়া গিনি হাতের দু'চারটি মুড়ি মুখে দিল।

ফাঁকিবাজি মিস্তিরি রাধাচরণ ফাঁকি দিবার পর মরিয়া যাওয়ায় একরকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে—উদ্দেশে কটূক্তি করা ছাড়া তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কিছু করিবার নাই ; কিন্তু এই সূত্রে শিশুকে শিক্ষামূলক উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে—গণেশ বলিলেন : শোনো গিনি, ইতি তুমিও শোনো : কদাচ বাবুগিরির দিকে যাবে না—গিয়েছ কি ঠকেছ, ঠিক আমার মতো—যেমন আমি ঠকেছি এই বেঞ্চির ব্যাপারে। তালাইয়ে বসে বেশ চলে যেত, কোনই অসুবিধা হত না—এমনি রোদ পেতাম। কিন্তু ঘটল শৌখিন বাবুগিরির শখ, কি না বেঞ্চিতে বসতে হবে, মানুষকে বসাতে হবে। রাধাচরণ ঠিক করেছে—উচিত শিক্ষে দিয়ে গেছে। তোমরা সাবধান—বাবুগিরির দিকে আদৌ যাবে না—গেলেই খেলো জিনিস বেশী দামে নিইয়ে তবে ছাড়বে। মানুষ ভারি বজ্জাত চিরকাল—আজকাল তার বজ্জাতি আরো বেড়েছে। যার চাইতে খেলো জিনিস নাই তা কিনলে ঠকাবে কেমন করে ?

গিনি বলিল : তুমি বড়ো কেপ্পন দাদু !

ভুরু তুলিয়া গণেশ বলিলেন : ও তাই নাকি। বলিয়া নিঃশব্দ হইয়া গেলেন, আর অঙ্গুষ্ঠ বাম হইতে দক্ষিণে এবং পরক্ষণেই দক্ষিণ হইতে বামদিকে চালনা করিতে লাগিলেন...

খানিক নিঃশব্দ থাকার পর একটা কথা হঠাৎ গণেশের মনে হইল—গিনিদের মুড়ি খাওয়ার রকমটার দিকে তাকাইয়া বলিলেন : ধাত তোমাদেরও কৃপণ বেজায়। ও কি রকম করে মুড়ি খাওয়া হচ্ছে বাপু, সেই তখন থেকে ?

খাওয়ার রকমটা বাস্তবিকই অদ্ভুত, যে দেখে তাহারই পক্ষে যেন ক্লান্তিজনক। অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে হাত তুলিয়া আর হাত নামাইয়া তাহারা মুড়ির গ্রাস মুখে তুলিতেছে প্রতি গ্রাসে থাকিতেছে মাত্র দশ-বারোটা মুড়ি। তারপর বৃদ্ধাঙ্গুলি আর তর্জনীর দ্বারা চিমটি কাটিয়া তুলিয়া লইতেছে একটুখানি গুড়। গুড়টুকু মুখের ভিতরকার মুড়ির উপর ছাড়িয়া দিয়া সমস্তটা চিবাইয়া গিলিতেছে যারপর-নাই ধীরে ধীরে···

দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার মনে হইতেছিল সাপের ব্যাঙ গলাধঃকরণ করার কথা—সাপের নিশ্চলতা আর ব্যাঙের আর্তনাদ। এখানে মুড়ি আর্তনাদ করিতেছে—কিন্তু মুড়ি যারা গিলিতেছে তাহাদের হাতের গতি সাপের নিশ্চলতারই কাছাকাছি। গণেশ কয়েকবার ভ্রূভঙ্গীই করিয়াছিলেন। ইহারা যেন মুড়ির পর্বত ভাঙিয়া ভাঙিয়া পেটে ভরিতেছে–শেষ করিতে কলির শেষ আসিয়া যাইবে। ঐটুকু গুড় আর ঐ কটি মুড়ি মুখভরা খাদ্য নিশ্চয়ই নয় - কিন্তু লাগিতেছে ভাল। তাড়াতাড়ি খাইলে সুস্বাদু বস্তুর স্বাদ গ্রহণ অচিরেই ফুরাইয়া যাইবে, ইহাই মেয়ে দুটির প্রাণের নিদারুণ ভয়। উহাদের কৃপণতার অন্ত নাই।

বলিলেন : কেপ্পন বলে গাল দিলি তোরা আমাকে! ফুস...

গিনি ও ইতি উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল এবং রান্নাঘর হইতে দৌড়াইয়া আসিল সোনা, গিনি ও ইতির দিদি—বলিল : কি রে, তোরা অত জোরে হেসে উঠলি যে ?

গিনি হাসিতে হাসিতে বলিল : দিদি, শোনো দাদু নাকি কৃপণ নয়!

—অমন কথা বলিসনে গিনি ; দাদু চটে যাবে। চটে গেলে দাদুর যা চেহারা হয়। দেখে ভয় করে।

সোনার কথা সত্য—গণেশ সেনের দৃষ্টির বেশ তাৎপর্য আছে—যখন তিনি হাসেন তখন তাঁহার চোখ দেখিয়া মনে হয় না, তাঁহার চক্ষু দুটিও হাসিতেছে—ভারি অস্বাভাবিক মনে হয়, যেন ভাবাইয়া তোলে ; কিন্তু যখন তিনি রাগেন তখন তাঁহার চক্ষু দুটি এমন শাণিত হইয়া ওঠে যে, মনে হয়, যে তাঁহাকে রাগাইয়াছে তাহার রক্ত তিনি দেখিতে চান।

সোনা দাদুকে রাগাইতে বারণ করিল বটে, গিনিকে ভয় দেখাইল—কিন্তু বলিল সে দাদুর রাগের কথাই, ভয় করিল না—মিষ্টিমুখে বলিল : তা দাদু, তুমি একটু কৃপণ ধরনের আছ বাপু! সত্যভামার ঠাকুমা হেসে হেসে কত কথা বললে আমাকে! বনমালী রুজ মরার পর তুমি নাকি প্রথম নম্বরে দাঁড়িয়ে গেছ!

শুনিয়া গণেশের মন ভারি উষ্ণ হইল—চোখ দুটা ঝকঝক করিয়া উঠিল—আবার একটু অপ্রস্তুতেও পড়িয়া গেলেন : মুখে একটু হাসি টানিয়া বলিলেন : বউদি বলে ডাকি কিনা, সেই সম্পর্কে দেওরকে ঠাট্টা করে গেছে···

সোনা তাঁর দেওর-বউদি সম্পর্কের এ ওকালতি কানে তুলিল না—বলিতে লাগিল : বাজারের যত রদ্দি সস্তা বাজে ডাল-তরকারি মাছ এনে এনে আমাদের খাওয়াও ; তামাক খাওয়ার ইচ্ছে হলেই এ-বাড়ি সে-বাড়ি গিয়ে খেয়ে-খেয়ে আসো···

গণেশ আরও উষ্ণ আর অপ্রতিভ হইলেন ; বলিলেন : সত্যভামার ঠাকুমা বলে গেছে বুঝি।

—না, আমিই বলছি—দেখেছি আর ভুগছি যে।

—সেদিন মেলায় তোদের খাওয়াইনি ?

শুনিয়া সোনা হাসিয়া উঠিল, বলিল - হাঁ, খাইয়েছিলে, তিন বোনকে ছ'পয়সার জিলিপী। তারপরই যে মজার ব্যাপার হয়েছিল তা বুঝি তোমার মনে নেই দাদু ? তোমাকে রেখে আমরা গেলাম কুসুমদের ঝিয়ের সঙ্গে কেষ্টনগরের পুতুল দেখতে। ফিরে এসে তোমাকে আর খুঁজে পাইনে—খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম তোমাকে চায়ের দোকানে। গিয়ে শুনি দোকানী বলছে : এক কাপ চা আর চারখানা নিমকি চৌদ্দ পয়সা। তুমি তাকে সিকি দিলে, সে দুটো পয়সা ফেরত দিলে। তারপর আমরা জেনে ফেলেছি দেখে তুমি খুব কলরব করে কি যেন বললে খানিক।—বলিয়া সোনা দাদুর ব্যবহারের প্রতিবাদে গম্ভীর হইয়া রহিল··

গণেশ অধিকতর উষ্ণ আর অপ্রতিভ হইলেন, তাহার পর একটি নিমেষ না কাটিতেই তাঁহার উষ্মা চরমে উঠিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে অপ্রতিভ ভাব তিরোহিত হইল, তাহার ছায়াও রহিল না।

ভোজননিরত গিনি ও ইতির ভোজন যত মন্থরই হোক, হাত ক্রমাগত ওঠায় আর নামায় মুড়ির পরিমাণ হ্রাস পাইতে পাইতে এক সময় মুড়ি খাওয়া শেষ হইয়া গেল—দুজনারই মুড়ির বাটিতে মুড়ির নিচেয় ছিল একখানা করিয়া আটার রুটি—মুড়ি নিঃশেষিত হইতেই তাহা প্রকট হইয়া পড়িল - গণেশ সেনের চোখে পড়িয়া গেল—তাঁহার উষ্মা চরমে উঠিল—অপ্রতিভ ভাব অদৃশ্য হইল—গণেশ লাফাইয়া উঠিলেন, হাঁকিলেন : বউমা ? অদূরবর্তী রান্নাঘরের ভিতর এবং সেখানে উপবিষ্টা স্বর্ণার কান পর্যন্ত ডাকের আওয়াজ গেল—"যাই, বাবা," বলিয়া সাড়া দিয়া স্বর্ণ ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল···

গণেশ বলিলেন : ঐ দেখ। দেখেছ ?

—দেখেছি, বাবা : গিনি আর ইতির বাটিতে একখানা করে রুটি রয়েছে।

—তুমি দিয়েছ, না ওরা চুরি করে এনেছে ?

—আমিই দিয়েছি, বাবা।

—কার হুকুমে এ অতিরিক্ত খরচ ?

—উনি লিখেছেন : মেয়েদের পুষ্টিকর কিছু খেতে দিও রোজ ; তা নইলে শরীর গড়ে উঠবে না। রুটির কথা লিখেছেন—ডিম আর দুধ দিতে পারলে খুবই ভালই হয়।

—বটে। দেওয়ার ব্যবস্থা করছ ?

—না, বাবা ; এখনও করা হয়নি—ওদের জন্যে আলাদা করে কিছু কিছু টাকা পাঠাবেন লিখেছেন।

—লিখে চূড়ান্ত করে দিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে—তার আর আপীল নাই। বাছার আমার জ্ঞান চৈতন্য এত কম যে, নেই বললেই চলে। বাজার করে খেতে হয় না—হোটেলে খান—কত ধানে কত চাল তা জানা নেই। একটা ডিমের দাম দশ পয়সা—তিনটের দাম সাড়ে সাত আনা—তিন পোয়া দুধের দাম বারো আনা—খাওয়াও যত পারো। একশো পঁচাত্তর থেকে এক লম্ফে মাইনে দু'শো পঁচিশ হওয়ায় ছেলে আমার মনে করেছেন রাজা হয়েছেন। তা তিনি হন নাই। মাসে ষাট-পঁয়ষট্টি টাকা পাঠিয়ে মনে করছে বাপসুদ্ধ গুষ্টির খবর খুব নেয়া হচ্ছে—খুব দিচ্ছি—দুধ ঘিয়ের মচ্ছব চালাতে থাকো। তা বাপু এ বাড়িতে এখনই হবে না—তোমরা নাকচ করে দিলেও আমি আছি। আটা দুষ্প্রাপ্য—দুধ. ঘি, ডিমের কথা ভাবতেই পারিনে—ভাবতেও যেন খরচা লাগে। ভেজিটেবলই দুর্মূল্য। মুড়ির ছটাক পাঁচ পয়সা—তিনজনের পক্ষে যথেষ্ট। নোনতা মুড়ির সঙ্গে চোদ্দ আনা সেরের গুড়ই অতিরিক্ত—বাহুল্য ব্যয়। তার উপর রুটি চলবে না, বউমা—মাসে দু'শো টাকা এলেও না। আমার যন্ত্রণা কেউ বুঝলো না। আচ্ছা যাও এখন। একটু সবুর করো। শীত পড়ে অবধি আমার শরীরটা মোটেই ভাল যাচ্ছে না—বিকালের দিকে চোখ জ্বালা করে—গা একটু গরমই হয়।

কোনো ওষুধ খেলে হয় না, বাবা ?—সুবর্ণা জানিতে চাহিল।

—না। রাত্রে ভাত খাওয়া বন্ধ করে দেব—পরোটা খাবো।

—কিন্তু…

—তা জানি। ভেজিটেবিল, আটা আর আলু আমি যোগাড় করে দেবো। আমি বারণ না করা পর্যন্ত পরোটা আর আলুর দম সন্ধ্যার পরই করে দিও আমার কাছ থেকে ঘি আটা চেয়ে নিও—আমার সামনেই তৈরি করে আমাকে দিও।

সুবর্ণা বলিল : তাই করবো, বাবা।

সুবর্ণ এতক্ষণ এক মুহূর্তের জন্যও চোখ তোলে নাই—শ্বশুরের চোখ-মুখের দিকে তাকায় নাই স্থান ত্যাগ করিবার পূর্বে সে চোখ তুলিল—চোখ তুলিয়া সে শ্বশুরের মুখাবলোকন করিল না, মেয়ে তিনটির মুখ খুঁজিল ; কিন্তু দেখা গেল, তারা সেখানে নাই—গিনি আর ইতির বাটিতে তাদের আশার রুটি পড়িয়া আছে।

মহিম সর্বাধিকারীর মন

মহিম সর্বাধিকারী আসিয়া বিখ্যাত জামার দোকান সীবনালয়ে উঠিল।

মহিমের বয়স হইয়াছে—প্রায় চুয়াল্লিশ তাহার বয়স। চুয়াল্লিশকে 'প্রায় পঞ্চাশ' বলা চলে। কাজেই ঐ রকম বয়সে মানুষ অধিকতর বিশ্রাম চায় ; নূতন করিয়া দায়িত্ব লইতে ভয় পায় ; পরকালের ভয়ে, অর্থাৎ স্নায়বিক দৌর্বল্যবশতঃ, সৎপথ আর সদুপায় অনুসন্ধান করে ; মানুষের এই সাবধানতা আর সুবুদ্ধির

কথা যদি সত্য হয়, এবং তা যদি সুখদায়ক হয়, তবে বলিতে হইবে যে, মহিম সর্বাধিকারীর পরকাল উজ্জ্বল নয়, এবং সে দুঃখী।

ও-গুলির নাম যদি স্নায়বিক দুর্বলতাই দেওয়া যায়—তবে সে-দৌর্বল্য যে জগৎবাসী সবারই সাধারণভাবে ঘটিবেই এমন কথা বলা যায় না—সবারই তা ঘটে না—মহিমের তা ঘটে নাই। মহিম বেশ শক্ত আছে—এত শক্ত আছে যে, তাহার বয়সী কাহারো মাথায় টাক দেখিলে তাহার বুক কাঁপে, পরলোক নিকটবর্তী হইতেছে বলিয়া ভয়ে নহে, এই ভয়ে যে, তাহারও যদি পড়ে! তাহা হইলে দেখিতে সে বিশ্রী হইয়া যাইবে। মহিমের মনে সুদৃঢ় এবং অভিজ্ঞতামূলক বিশ্বাস আছে যে, পুরুষমানুষ বুড়ো হয় না—একেবারে কোনোদিনই হয় না তা নয়, সহজে হয় না—দেখিতে যে বুড়ো, অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতই সে বুড়ো নয়। কথাগুলি মনে পড়িলেই মহিম নিজেকে অনুভব করিয়া দেখে, মনে হয় বেশ শক্তি আছে। কাজেই চুল কাটাইতে তাহার যত্ন দেখা যায় বেশ। বাঁধা নাপিতকে অবশ্য যথোচিত উপদেশ দেওয়াই আছে—তৎসত্ত্বেও চুল কাটাইবার পর সুবৃহৎ একখানা আয়না মুখের সামনে ধরিয়া মাথাটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সে অভিনিবেশপূর্বক এবং সমালোচকের দৃষ্টি লইয়া চুল লক্ষ্য করে—ভাল দেখাইতেছে মনে হইলে মহিম প্রফুল্ল হয়। জুতায় পালিশ ও বুরুশ ঘষা তাহার প্রায় দু'বেলার কর্তব্য। কিন্তু নিজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও চুলে পাক ধরা সে নিবারণ করিতে পারে নাই—চুল দু'চারিটি পাকিতেছে। পাকা চুল উপড়াইয়া ফেলা চুল কাঁচা করিবার পথ নয়; কিন্তু ভ্রমবশতঃ মহিম তা করে। জামার ইস্ত্রি ভাঙিলে সে ভ্রূভঙ্গী করিয়া জামার দিকে তাকাইয়া থাকে; জামা-কাপড় ময়লা দেখাইলে সে খুঁত খুঁত করে; তাহার জামার পকেটে রুমাল থাকে, এবং তাতে থাকে সুঘ্রাণ!

এক কথায়, মহিম সর্বাধিকারীকে আধুনিক-রুচিসম্পন্ন 'বাবু' বলা যাইতে পারে।

মল্লিকার সঙ্গে মহিমের বিবাহ হইয়াছিল। ছেলেমেয়ে হইয়াছে। এখন মল্লিকার রূপসৌষ্ঠব লক্ষ্য করার কোনো হেতুই থাকিতে পারে না; তবু কেউ যদি করে তবে সে দেখিবে যে, স্বামীর সঙ্গে বয়সে সাত বছরের পার্থক্য সত্ত্বেও সে-ই যেন অতিরিক্ত বুড়ো! ঐ সাত বৎসরের বয়ো-ব্যবধান অতিক্রম করিয়া সে আরো সাত বৎসর অগ্রসর হইয়া গেছে। মাথাটা বাদ দিয়া দেখিলে মল্লিকার মাংসল দেহ কুৎসিতই দেখায়—দেহ ঢিলা হইয়া বিপুল স্থবিরত্বে পেঁাছিয়া গেছে; তবে তাহার মুখখানার ছাঁদ ভাল, লক্ষ্মীশ্রীর স্নিগ্ধ আভাস আছে; বড় বড় ভাসা ভাসা চোখে একটা হাস্যময় সরলতা সুন্দর হইয়া চোখে পড়ে; ভুরু দু'টি গভীর-অগভীরের মাঝামাঝি; ললাট সুন্দর—এখনো মসৃণ অমলিন আছে। এ-সবই আরো মনোরম ছিল যখন তাহার সামনের চুল ঘন ছিল; এখন চুল পাতলা হইয়া রমণীয় মুখশ্রীর অঙ্গহানি ঘটিয়াছে।

মল্লিকা মোটা করিয়া সিন্দুর পরে—তাহাতে তাহাকে অপরূপ দেখায়; অপরূপত্ব তাহার এইখানেই ফোটে যে, সিন্দুরাভা তাহার সৌন্দর্যপ্রিয়তার প্রদর্শনী আর সুচারু অঙ্গ নয়, সংসারের অতীত স্থান হইতে আহরিত আর কর্ষিত একটা গৌরবের সামগ্রী। মহিম সর্বাধিকারী স্ত্রী মল্লিকার এই অপার্থিব শোভা

কেবল যে নিরীক্ষণই করে এমন নয়, অনুভবও করে ; এবং শুনিতে আশ্চর্য যে নিজেরই এই আয়ু সম্ভোগের অভ্রান্ত নিদর্শনে সে ভারি হতাশ হইয়া যায়। মহিম মনে করে যে, প্রথম যেদিন তাহার তন্বী স্ত্রী সিন্দুরধারণ করিয়াছিল, সেইদিনই স্বামীর সঙ্গে কোথায় সেই সিন্দুর-বিন্দুকে সাধ্বী সংযুক্ত করিয়াছিল তাহা সে জানে—তাহার আয়ুষ্কামনা আর থাকার আনন্দ গৌণ স্থানে তখনই ছিল ; সিন্দুর পরিয়া সংস্কারগত একটা সৌন্দর্যবোধকে—নিজের এবং পরের সৌন্দর্যবোধকে—তৃপ্ত করার অভিপ্রায় ব্যতীত আর কিছু ছিল না ; কিন্তু মহিমের মনে হয়, মজা এই যে, বাধা দিলে প্রসারিত ললাটের শুভ্রতার কল্পনা যারপরনাই ভয়ঙ্কর হইয়া ওঠে।

মহিম একদিন জানিতেই চাহিয়াছিল,—আচ্ছা, সিন্দুর পরো কেন ?

মল্লিকা বলিয়াছিল,—না পরলে বিশ্রী দেখায়।

বিশ্রী দেখায় কেমন করিয়া, ভাবার্থ কি তাহার, তা মহিম জানিতে চাহে নাই। 'বিশ্রী' মানে দুর্ভাগ্যের চিহ্নও ত' হইতে পারে।

বলা অবশ্য বাহুল্য যে, মহিম নিতান্তই গৃহস্থ মানুষ, অর্থাৎ গৃহস্থের পরিচিত পদ্ধতিতে সে জীবনযাপন করে। গৃহস্থের নিত্যকার আর নিমিত্তমূলক সুখ দুঃখ তৃপ্তি অতৃপ্তি যা দেখা যায়—তা মহিমের ছিল, এবং আছে—প্রহেলিকার মতো নাই, বিঘোষিত হইয়া আছে, স্পষ্ট আকারে সর্বজনসমক্ষেই তা আছে। কিন্তু তা ছাড়াও সুখ দুঃখ তৃপ্তি অতৃপ্তির হেতু যাহাদের আরো আছে—নিতান্তই অনুভূতির বিষয় হইয়া অতিশয় গোপনে আছে, তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত একজন সে। এমনি দুঃখ আর অতৃপ্তির হেতু নিরবচ্ছিন্ন হইয়া যদি থাকে—তবে তা মানুষের কানে প্রবেশ করাইয়া চীৎকার করিয়া অভিসম্পাত দিয়া গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া, তাহার নিবৃত্তিও হয় না, মীমাংসাও হয় না। এমনি একটি দুঃখময় অতৃপ্তি মহিমের প্রাণে মগ্নাবস্থায় আছে হঠাৎ সেটা মনের শৃঙ্গে উঠিয়া আসে—অভিভূত করে না, কিন্তু বিদ্ধ করে।

বিখ্যাত জামার দোকান সীবনালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রোপাইটর প্রফুল্ল নন্দী মহিমকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—বসুন ! বলিয়া বসিবার আসন দেখাইয়া দিল। মহিম গা ছাড়িয়া দিয়া সীবনালয়ের চৌকিতে বসিয়া পড়িল। সীবনালয়ের চাল টিনের—চাল ঢাকিয়া চাঁদোয়া টাঙ্গানো আছে ; কাঠের বেড়ায় সবুজ রং গাঢ় করিয়া মাখানো ; বেড়ার গায়ে ব্যবসাদারের বিজ্ঞাপন-সম্বলিত তারিখপঞ্জী, আর চিত্রকরের আঁকা ছবি আছে অনেকগুলি ; মেঝেজোড়া তক্তাপোশ, এবং তক্তাপোশের উপর মোটাবুনুনি শীতল পাটি পাতা ; তিনটি বড় বড় কাঁচের আলমারীতে কাটা পোশাক আর কাপড়ের থান স্তরবন্দী করিয়া সাজানো ; একটি সেলাইয়ের কল কাপড়ঢাকা রহিয়াছে—আর একটিতে কাজ চলিতেছে।

পরিচ্ছন্ন আর কর্মোৎসাহের এই আবহাওয়াটা মহিমের মন্দ লাগিল না। কিন্তু এখানে সে বেড়াইতে আসে নাই ; তাহার মেয়ে সুপ্রভা নিজের গরজে তাহাকে ঠেলিয়া পাঠাইয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি, মহিম একটু বিরক্ত ভাবেই এখানে আসিয়াছে, এবং আসিবার সময় পথে সে মেয়েদের মনস্তত্ত্ব খানিক খানিক

চিন্তাও করিয়াছে—মেয়েদের কেবল কথা, দাও দাও। বাপের নিকট হইতে তাহাদের এই পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আর পাওনার দাবি কখনো যে যন্ত্রণাদায়ক উৎপীড়নে দাঁড়াইয়া যাইতে পারে তাহা ভাবিবার শিক্ষা কি অভ্যাস তাহাদের নাই ; আছে কেবল অভিমান, কোন মেয়ের বাবা কোন মেয়েকে কি দিয়াছে আর কত দিয়াছে তাহারই সন্ধান রাখা, আর, তুলনা করা ; আর, সেই সূত্রেই চালাইয়া যাওয়া বাপের স্নেহের নির্বিচার বিচার আর অফুরন্ত একঘেয়ে বায়না।

সুপ্রভার বিবাহ হইয়াছে—

কিন্তু তাহার আক্ষেপ যেন দিনদিনই বাড়িয়া উঠিতেছে। বেয়াই সন্তুষ্ট, বেয়ান সন্তুষ্ট, জামাই সন্তুষ্ট, প্রতিবেশীরা সন্তুষ্ট—অসন্তুষ্ট কেবল মেয়ে। মহিম সবাইকে যথেষ্ট দিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছে ; কেবল কন্যারই অসন্তোষ ঘুচিতেছে না। অলঙ্কার ভরপুর নয়, পরিমাণে যথেষ্ট হয় নাই। তার কান্না-কাটি মান-অভিমান রাগ-অভিযোগের অন্ত নাই : গয়না ভাঙ্গিয়া নূতন প্যাটার্নে গড়াইয়া দাও, আরো দাও ; পোশাকী কাপড়চোপড় আরো চাই···

সুপ্রভারই অশ্রান্ত তাড়নায়, আর, তাহারই মনের ঝাঁজ নিবাইতে মহিম সীবনালয়ে আসিয়াছে। স্ত্রীর জন্য একজোড়া কাপড় সে অন্য দোকানে, জয়দুর্গা বস্ত্রভাণ্ডারে খরিদ করিয়াছে। খবরের কাগজে মোড়া পুঁটুলিটা হাতে করিয়া যে সীবনালয়ে আসিয়াছে—সুপ্রভার জন্য একটি ব্লাউজ লইতে হইবে। ব্লাউজটি কেমন হওয়া চাই তাহা সুপ্রভা বলিয়া দিয়াছে এবং বুঝাইয়া দিয়াছে—আধুনিকতা কোনোদিকেই ক্ষুণ্ন না হয় তাহাও সে সমঝাইয়া দিয়াছে ; বলিতে কি, সতর্ক করিয়া দিয়াছে। মহিম তাহাতে ভয় পায় নাই, অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

নবদম্পতির—সুপ্রভার আর পরিতোষের—প্রণয় লক্ষ্য করিবার মতো। তাহাতে কন্যার পিতামাতার অকাতরে নির্ভয় হইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেও বাধা নাই। শ্বশুরালয়ের খবর পাইবার জন্য সুপ্রভার ব্যাকুলতা অশেষ—দুদিন খবর না পাওয়া গেলেই দাও লোক ছুটাইয়া, করো টেলিগ্রাম। জামাইয়ের নিকট হইতে চিঠি আসিবার এবং মেয়ের নিকট হইতে চিঠি যাইবার রঙিন ঘটাও দেখিবার মতো। মহিমও তা দেখে, মল্লিকাও তা দেখে···

কিন্তু ঐ ঘটা দেখিয়া মহিম যতটা নিশ্চিন্ত আর খুশী, মেয়ের অবুঝ আবদারে সে বিব্রত তার চতুর্গুণ। সুপ্রভা যেন স্বার্থান্ধ, কেবলি সে সংগ্রহ করিতে চায়। প্রসাধন সামগ্রী, গাত্রবস্ত্র, পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে, এখনই যা দরকার তাহার অনেক বেশীই, সে পাইতে চায়—শ্বশুরালয় হইতে শূন্য বাক্স আনিয়া এখান হইতেই তা পূর্ণ করিয়া লইয়া প্রস্থান করার দিকে তাহার দুর্নিবার আগ্রহ—বাধা দিলে কাঁদিয়া ভাসায় ; বলে—বাবা-মা বিয়ে দিয়েই আমায় পর করে দিয়েছে। কিন্তু আমি পর মনে করিনে তো !

শুনিয়া মহিমের মুখে একটুখানি হাসি মুচড়াইয়া ওঠে যেন। কিন্তু মেয়ের আচরণে অতিশয় তৃপ্ত মেয়ের মা মল্লিকা—পুলকে উজ্জ্বল আর চঞ্চল হইয়া উঠে। কারণ, স্বামীর প্রতি, অর্থাৎ নিজের সংসারের প্রতি, মেয়ের এই উদার-উত্তম মমতা স্বার্থমূলক বা পিত্রালয়কে দোহন করার নামান্তর হইলেও, কন্যার

স্বামী-প্রীতি যথেষ্ট উৎসাহজনক। আশীর্বাদসহ তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতেই হইবে।

মল্লিকা বলে—দাও এনে যা চাইছে। খেয়ে-পরে হেসে-খেলে সাধ পুরিয়ে দিনকতক বাপের বাড়িতে থাকতে চায়—এ ত' ভালই!

মেয়ে বাপের বাড়িতে আনন্দে থাকিতে চায়, ইহা ভাল—মহিম তা স্বীকার করে; তবু মহিমকে বলিতে হয়—কিন্তু আমি যে আর পারিনে। গলায় দম আটকে মলাম।

মল্লিকা স্বামীর শ্বাসকষ্ট অনুভব করে বোধ হয়; বলে—এই দিনকতক। শ্বশুর বাড়িতে চাইতে ওর লজ্জা করে এখন—তা বোঝো না কেন? আমাদের কাছে চাইবে না ত' চাইবে কার কাছে? পরে দেখো আসতেই চাইবে না—চাইতে লজ্জা পাবে। সব মেয়েরই তা হয়; আমারও হত। বাপ-মাকে নেহাত পর মনে করতে যত দেরি হয় ততই সুখ ত' আমাদেরই!

কিন্তু স্ত্রীর এই আনন্দে আর আশ্বাসে, অর্থাৎ পরবর্তী কালে যে নিষ্কৃতি আসিবে তাহার বার্তা স্ত্রীর মুখে পাইয়া, মহিমের অযথা-ব্যয়ের অনিচ্ছা ঘোচে না।

মল্লিকা আরো বলে,—ভারি ভাব দুজনায়।—বলিয়া সে এমন করিয়া হাসে যেন পার্থিব অমূল্য সম্পদ বলিয়া যে-সব প্রাপ্তিকে সম্বর্ধনা করা যায়, মেয়ে-জামাইয়ের অগাধ ভালবাসার পরিচয় পাওয়া তাহাদেরই অন্তর্গত।

সুতরাং মল্লিকার বক্তব্য ইহাই যে, দাম্পত্যপ্রণয়ে সুখী মেয়েকে পিতৃস্নেহ পরিবেশনে কার্পণ্য করা চলিবে না—মুখভার করা অন্যায়…

মল্লিকা থামে না—ঐ সূত্রেই পুনরায় বলে,—আমার শ্বশুর কিন্তু কোনো-দিনই মুখভার করেননি; যা চেয়েছি অমনি এনে দিয়েছেন।—বলিয়া সে উজ্জ্বলতর ভাবে আবার হাসে, যেন দানোল্লাসের দিকে অনিচ্ছুক স্বামীকে লুব্ধ করিতে পূর্বপুরুষের গৌরবকীর্তন আর তজ্জনিত তার হাসি খুব কাজের।

সীবনালয়ের চৌকিতে বসিয়া টিনের চালের গরমে মহিম ঘামিতেছিল। হাত-পাখাখানা তুলিয়া লইয়া সে নিজেকে বাতাস করিতে লাগিল…

সীবনালয়ের স্বত্বাধিকারী প্রফুল্ল নন্দী তখন আলমারী খুলিয়া ব্লাউজ বাছিতেছে—

হাওয়া খাইতে খাইতে মহিম বলিল,—একেলে' যেন হয়।

প্রফুল্ল বলিল,—সেকেলে' আমরা কিছু রাখিনে।

—কাপড়টা দামী যেন হয় না বেশী; চটকদার হলেই হল, আর ছাঁটকাট জুৎসই।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই রকমই দেখছি।

শুনিয়া মহিম নিশ্চিন্ত হইয়া এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল: লম্বমান দেয়ালপঞ্জী তাহার চোখে পড়িল—১৮ই তারিখটা লাল—ছুটির দিন। তাহার পর দেখিল, নিজেদের সুবিখ্যাত বলিয়া ঘোষণা করিয়া এক আয়ুর্বেদ-ফার্মাসী তাহাদের আবিষ্কৃত এবং মথিত সমুদ্রের দান সেই সুধার মতো অলৌকিক গুণ-সম্পন্ন রসায়ন সেবন করিতে বলিতেছে…

তাহার পর মহিম তাকাইল আরো খানিকটা বাঁ দিকে। একখানা বিবিধ জ‍্বলন্ত বর্ণের ছবি তাহার চোখে পড়িল—রবি বর্মার ছবি : দ‍ুর্বাসা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিতেছেন ; দেখিয়াই কেমন করিয়া এবং কি কারণে যে হঠাৎ মহিমের ক্রোধে জন্মিল তাহা সে জানে না ; দ‍ুর্বাসাকে সে মনে মনে গালি দিল : "পাষণ্ড"। দ‍ুর্বাসার জটাজাল কুণ্ডলীকৃত হইয়া ম‍ুকুটের মতো মাথার শোভাদায়ক হইয়া নাই—দ‍ুর্বাসাকে কুৎসিত লক্ষণাক্রান্ত করিয়াছে যেন। সুব‍ৃহৎ চক্ষ‍ু দ‍ুটি ঠিকরাইয়া আছে ; অঙ্গ‍ুলির ক্র‍ুদ্ধ ভঙ্গীটা স্ফীত শিরায় উৎকট হইয়া ফ‍ুটিয়া উঠিয়াছে···

শকুন্তলা নির্বিকারভাবে বসিয়া আছে—দ‍ুষ্মন্তের কথা ভাবিতেছে। উভয়ের এই বিপরীত ধর্মান‍ুগ তীব্রতা চট করিয়া একটা ঘা দিল যেন, আর কোথাও নয়, মহিমের মগ্নচেতন স্ম‍ৃতির জগতে।

শকুন্তলা প্রিয়তমের চিন্তায় তন্গতচিত্ত হইয়াছে ; সম্ম‍ুখে কি ঘটিতেছে, ক্র‍ুদ্ধ দ‍ুর্বাসার মারফৎ অদৃষ্ট কেমন করিয়া তাহাকে বিপর্যস্ত করিবার স‍ুত্রপাত করিতেছে সে হ‍ুঁশ তাহার নাই। ধন্য সেই দ‍ুষ্মন্ত। তাহার পর, মহিমের একটু হাসিই পাইল : দ‍ুর্বাসা আর শকুন্তলার, আর শকুন্তলার অন্তরের মোহাচ্ছন্নতার এই ছবি এই পটভূমিকায় যতই চমৎকার আর অমর হোক, তার সেই মোহাচ্ছন্নতা তন্ম‍ুহ‍ূর্তের ; চিরপ্রবাহিত আর চিরদিনব্যাপী অম্লান উজ্জ‍্বল বিকাশের ছবি এ ত' নয়।···পরে দৈবাৎ স্ম‍ৃতি উদ্ঘাটিত হইয়া দ‍ুষ্মন্ত তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তারপর।

মহিমের মনে হইল মেয়ে সুপ্রভার কথা : এমনি তন্ময়তা, পরকে উৎপীড়ন ক্র‍ুদ্ধ করিয়াও যা নিজেকে চরিতার্থ করিতে চায়—তা মেয়েতে আছে। স্ত্রী-জাতির প্রকৃতিই ঐ।···তাহার পর মহিমের মনে হইল তাহার নিজের কথা : এই তন্ময়তা কত মধ‍ুর ভাগ্যক্রমে সে-আস্বাদ সে পাইয়াছে—নারী তাহার প্রকৃতির প্রেরণায় তাহাকে মাধ‍ুর্য দান করিয়াছে। কিন্তু—

সীবনালয়ের মালিক প্রফ‍ুল্ল নন্দী মহিমের উক্ত চিন্তায় বাধা দিল ; বলিল,—ব্লাউজ এইটে নিন, বাড়িতে যদি পছন্দ না হয়, দ‍ুদিন পরেও আমি বদলে দিতে রাজী আছি।

মহিম সেটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল ; পছন্দ অপছন্দ কিছুই হইল না ; বলিল,—তাই করি। মেহনত করে আমার পছন্দ করতে যাওয়া ব‍ৃথা—বলিয়া তিন টাকা দশ আনা দাম দিয়া ক্যাশমেমো আর ব্লাউজ লইয়া সে উঠিল।

প্রেমম‍ূলক তন্ময়তার অন‍ুষঙ্গ তখনও তাহাকে ত্যাগ করে নাই ; পথে যাইতে যাইতে তাহার মনে হইতে লাগিল, দ‍ু'দিন, মাত্র দ‍ু'দিন, যৌবন যখন তৃষ্ণার্ত হইয়া হাহাকার করিতে থাকে তখন, সেই তৃষ্ণার্ত অসহনীয় যৌবনের খোরাক হয় স্ত্রী-প‍ুর‍ুষ পরস্পরের। প্রেমের আর কোন অর্থ নাই। তাহার পর তাহা স্তিমিত নিশ্চল হইয়া অবল‍ুপ্তির পথে নিমজ্জিত হইতে থাকে···

মহিম ইহাও অন‍ুভব করিল যে, তাহার স্ত্রী এবং সে আর এক নাই—বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। দ‍ুর্বাসার সেই অভিসম্পাত ব্যাপকতর হইয়া এখনো কাজ করিতেছে ব‍ুঝি। অভিজ্ঞান চিরদিনের মতো হারাইয়া গেছে ; দ‍ু'দিনের উত্তাল তরঙ্গের

মাথায় নাচিয়া স্ত্রী আর পুরুষ কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে তাহার উদ্দেশ নাই ; দেহ দেখা যায়, স্পর্শ করাও যায়, কিন্তু অপূর্ব আর উপভোগ্য কিছু থাকে না তা'তে— অন্তরের উত্তাপ আর রাগশূন্য মৃত বস্তু সে—স্মৃতিচিহ্নের প্রয়োজনীয়তা মানুষ অনুভবই করে না। তাহার মনের কথা তাহার মনে পড়িল : সে ভুলিয়া থাকিতে চায়। নারীরও কি তেমনি হয়। হয় দুর্বাসার অভিসম্পাত পৃথিবীর মজ্জায় প্রবেশ করিয়া অসীম শীতল বিস্মৃতি ঘটাইয়াছে, ঘটাইতেছে, ঘটাইবে চিরকাল। অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় ভস্মীভূত হইয়া গেছে...

কিন্তু মানুষের মন ত' নিরাবলম্ব হইয়া বাঁচিতে পারে না! তাই স্ত্রী সন্তান চায়, লঘুচিত্তে স্বার্থ লইয়া কলহ করে, স্বামীকে করে কৃপার পাত্র, প্রয়োজনের ভৃত্য—তাহাতেই তার গর্ব, গৌরব, অস্তিত্ব—সব! সুপ্রভাও তাহাই করিবে।

একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মহিম বাড়ি ঢুকিল ; বলিল,—এই নাও ব্লাউজ। বলিয়া স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া সে মেয়ের দিকে তাকাইল—মনে হইল, কাহাকেও সে ভালবাসে না, নিজেকে নয়, স্ত্রীকে নয়, কন্যাকেও নয়।

আমি ভাবছি

কদিন থেকে আমি খুব ভাবছি। নিজের কথা ভাবছিনে ; কাল কি খাব তা ভাবছিনে ; যে কাপড়খানা সোডায় কেচে কেচে পরছি তা ছিঁড়লে কি হবে তা ভাবছিনে ; বৃষ্টি নামলে এবং ঝড় উঠলে আমার ঘরখানার কি হবে তাও ভাবছিনে ; মা মরলে মা-মরা এই ছেলে দু'টির কি হবে সে-কথা ভাবার ভার ভগবানের উপর ছেড়ে দিয়ে আমি তা ভাবছিনে। আমি কত ছোট, আর জলরাশি-সমন্বিত ও প্রাণীসংকুল এই পৃথিবী কত বড় তা একবার ভাবুন—তা হলেই বুঝতে পারবেন আমি কেন নিজের কথা ভুলে এই পৃথিবীর কথা ভাবছি! পৃথিবীর ভিতর আমি কোথায় তা আপনারা নির্দেশ করতে পারবেন ? পারবেন না। তাই আমি নিজের কথা সরিয়ে রেখে সুবৃহৎ, মূল্যবান এবং পরম আশ্রয় পৃথিবীর কথাই ভাবছি—কদিন থেকেই ভাবছি, আর খুব ভাবছি।

মাঝে মাঝে আমার মনটা কেমন ঝিমিয়ে পড়ে। সেটা দুর্বল মুহূর্ত। তেমনি একটা দুর্বল মুহূর্তে আমি একটা অকেজো কথা বলে ফেলেছি। আমার অবস্থানক্ষেত্র এবং দৈহিক সত্তা আপনারা জায়গায় বসেই নির্দেশ করতে পারবেন না বলে আমি নেই একথা সন্দেহজনক। আপনার মাতলাখালি গ্রামে বসে আপনি হিমালয় পর্বত এবং প্রশান্ত মহাসাগরকে নির্দেশ করতে পারছেন না ত'! কিন্তু তারা আছে, বিরাটের মহিমার মূর্তি ধারণ করে তারা আছে।

এদিকে দেখুন, আপনার পেটে ক্রিমি আছে ; কিন্তু আপনি তাদের দেখিয়ে দিতে পারছেন না! কেচো আছে, উঁই আছে—তারা মাটি খাচ্ছে, মাটি করছে।

তেমনি আমিও আছি—এই ত' বেড়ায় ঠেসিয়ে-রাখা ধূলিলিপ্ত হুঁকোটার দিকে তাকিয়ে তালাইয়ের উপর উবু হয়ে বসে আছি।

তা ত' আছিই; তদুপরি আমি ক্ষমা-প্রার্থনাপূর্বক ঘোষণা করতে চাই যে, আমি আছি বলে সময়-সময় মনে অহঙ্কারই দেখা দেয়। সেই মূঢ় অহঙ্কারের বশীভূত দশায় আমি বলতে চাই যে, এই পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠেছে এবং ঘনিয়ে এসেছে। জ্ঞানী, অভিজ্ঞ এবং ভুক্তভোগী ব্যক্তিগণের মতো আমার এই মতের সঙ্গে মিলে যাবে তা আমি জানি। তাঁরাও স্বীকার করবেন যে, এই পৃথিবীর আয়ুষ্কাল অত্যন্ত দ্রুতবেগে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে—এত দ্রুত সে শেষ মুহূর্তের পানে ছুটেছে যে, মনে হয়, যে ক্রিয়া তাকে ধ্বংসাভিমুখে এমন করে ছুটিয়ে দিয়েছে, না জানি সে কেমন বীভৎস। তাকে নির্মমও মনে হতে পারে, কৌতুকীও মনে হতে পারে; কিন্তু খাঁটি কথা এই যে, তেমন কিছুই নয়; পৃথিবীর এই বিলুপ্তি পৃথিবীরই দুষ্ক্রিয়ার ফল। ব্রহ্মাণ্ডটা জুড়ে ঢেউয়ের পর ঢেউ নিক্ষেপ করতে করতে অনন্ত জলরাশি ছুটতে থাকবে—মনুষ্যকুল ডুবে যাবে, ভেসে যাবে—তাদের চিহ্নও থাকবে না; কিংবা শ্বেত অশ্বের আরোহী হয়ে এবং মুক্ত তরবারি হস্তে কল্কি আসবেন—তিনি মানুষকে কাটতে থাকবেন, ঘোড়া তাঁকে নিয়ে ছুটতে থাকবে; কিংবা দ্বাদশ সূর্য যুগপৎ জ্বলে উঠবে—পৃথিবী যে কোথায় ছিল তা আর বুঝাই যাবে না।

আমি এ-সবের ছায়া দেখছি—ছায়া অগ্রগামী হয়েছে বলে মনে করছি, আর খুব ভাবছি। একথা অকাট্য যে, পাপ বেড়েছে এবং ভগবানের বুকে চাপ পড়েছে। কথাটা অবশ্য আমার কথা নয়; চিন্তাশীল সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং অনুভূতিসম্পন্ন মনীষীবর্গের কথারই পুনরাবৃত্তি করছি। তাঁরাই দেখেশুনে আর ভেবে-চিন্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রাণিজগতে মানুষই সর্বোচ্চ আসন অধিকার করে বসে আছে—নিজের গুণে আর মননশক্তির দ্বারা মানুষ তা করতে পেরেছে।

প্রত্যেকটি মানুষের মর্মস্থানে কৃষ্ণ অবস্থান করেন, তাহার মাঝে মহান সত্য নিহিত আছে, আর আছে প্রেম-মৈত্রীর সম্ভাবনা; মানসচক্ষের পরম পুরুষকে নিরীক্ষণ করার উন্মুখতা—নিত্যই জ্যোতির্লোকে অভিযানের উদ্যম; অপ্রধান সমুদয় স্থূল বাস্তব বস্তুকে পরিত্যাগ করে মানুষের দিবালোকই একমাত্র লক্ষ্য হবে, এই-ই নিয়ম। এই সব গূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটন করে তাঁরা একটা দিব্য জাগরণের মাঝে বিচরণ করতেন এবং পুনঃপুনঃ ডাক দিয়ে তাঁরা মানুষকে সতর্ক করে দিতেন। তখন এক দিন ছিল, কিন্তু এখন অন্য রকম—এখন জগৎ যেমন বধির, তেমনি অধীর, আর তেমনি অসৎ। আগে মানুষ ভাল কথার দাম দিত, এখন তা দেয় না। অজ্ঞানান্ধের প্রেম ঐক্য সত্যের প্রতি এমন অবহেলা সঙ্কটেরই কথা। সেই সঙ্কট আসছে, খুব বেগে আসছে- আর রক্ষা নাই।

তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ যে মানুষকে বিবেচনাধীনে এনে ঐ সব বড় বড় এবং গাঢ় গাঢ় কথা বলেছিলেন, আমি সেই মানুষের সমষ্টির ভিতর অন্যতম। আমি আছি; "ঐ যে তুমি" বলে আমাকে আপনারা দেখিয়ে দিতে না পারলেও আছি—তবে আমি অত্যন্ত গরিব; অর্থাগমের পরিমাণটা উল্লেখযোগ্য নয়।

আমি ব্রাহ্মণসেবায় নিযুক্ত আছি। ভবরাম চতুষ্পাঠী অর্থাৎ ঐ নামীয় টোলে

যে ২১ জন শিক্ষার্থী আপন আপন খরচায় অবস্থান করে, আমি তাদের বাজার-সরকার। প্রত্যহই তাঁরা আমাকে চোর সাব্যস্ত করেন। তাঁদের সেই অভিযোগ শুনে আমি মর্মাহত হই এবং বলি : ব্রাহ্মণের আহারের জিনিস কিনতে গিয়ে পয়সা সরাব এমন অধমতম পাষণ্ড আমি নই, ঠাকুর। ভবরোগের মহৌষধ যে ব্রাহ্মণেরই পদরজঃ, তা কি আমি জানিনে! গুরুদেবের মুখেই কতবার শুনেছি।" শুনে ছাত্রগণ হাসে ; বলে : "সবাই সমান—যেমন তোমার ইয়ে তেমনি তুমি ইয়ে।"

সে যাই হোক, গুরুদেবের অনুগ্রহে আমি রোজ দুবেলা টোলের ভাতই খাই। মাইনের সাড়ে সাতটাকায় ছেলে দুটিকে খাওয়াই। ঐ পর্যন্তই—কাপড়, গামছা, ঘর-মেরামত এবং অত্যন্ত জরুরী অনেক কিছুই তাতে হয় না। তবু চুরি আমি করি না ; চৌর্যের উপর আমার ঘৃণা দুস্তর।

গুরুদেব তাঁর ছাত্রদের কাছে "ইয়ে" হলেও তাঁর কাছে শিক্ষিত লোকের সমাগম হয়। তাঁদের কথাবার্তা শাস্ত্রীয় এবং নীতিমূলক চর্চা, আমি কান পেতে শুনি, আর মনে রাখি। মনে রাখতে রাখতে আমার অসংস্কৃত মনের উপর সুষ্ঠু একটা স্তর পড়ে গেছে ভাবতে শিখেছি যে, আমি একটা মানুষ হয়ে জন্মেছি এবং সেই কারণেই আমি একেবারে নগণ্য যা-তা নই। গুরুদেব শ্রীযুত ত্রৈলোক্য মোহন বিদ্যার্ণব প্রভৃতি কর্তৃক পরিবেষিত ঐ সব গুরুপাক উক্তি, যুক্তি ও মত আমার ভিতরে প্রবেশ করে বাস্তবকে অপ্রধান করে তোলার পরই বদহজমের উদ্গার সৃষ্টি করে নাই—আমার মনটাকে ধ্যানান্বিত করে তুলেছে।

ধ্যানান্বিত শব্দটি ব্যবহার করার পর একটা কথা স্বীকার না করে পারছিনে। বাজারের পয়সা হাতাতে পারলে আমি খুব ভাল থাকতেই পারতাম, চৌর্যে আমার ঘৃণা অত্যন্ত—চুরি আমি করিনে। কিন্তু আফিং আমি খাই—স্বীকারই করছি, খাই। গুরুদেব বিদ্যার্ণব খান এবং তার বন্ধুস্থানীয় কেউ কেউ খান। আমি খাই। সেইজন্যেই টানাটানি আর ঘোচে না, তবু খাই। আফিং যারা খায় তারা স্বভাবতঃই নিরীহ সহিষ্ণু আর কথাবার্তায় ভদ্র, আর অবনতমস্তকেই হামেশা থাকে—পীড়াপীড়িতেও মাথা কচিৎ তোলে। পাপীর প্রাণের আতঙ্ক তার প্রাণে পাবেন না। আফিমের ফলে দেহ ধ্যানের একটা ভঙ্গী নিয়ে স্তিমিত হয়ে থাকে, আর মনে হয়, ধ্যানান্বিত। বেশ লাগে। এই ধ্যানান্বিত অবস্থায় আগে কি ভাবতাম তা মনে করতে পারছিনে, কিন্তু এখন ভাবছি বিরাট এই পৃথিবীর অনিবার্য প্রচণ্ড বেগে ধ্বংসের পথে প্রধাবিত বা আকর্ষিত হওয়ার কথা। পৃথিবী মরলো আর কি।

আফিং আমি খাই—সেটা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নাই, কারণ আফিং খাওয়া পাপের কাজ নয় ; আফিংখোরের প্রতি ভগবান রুষ্ট হন না যেমন হন তিনি চোরের প্রতি—চোরের জন্যই তিনি কুম্ভীপাক, উত্তপ্ত লৌহশলাকা, সকণ্টক আর জ্বলন্ত শাল্মলী-বৃক্ষ প্রভৃতির ব্যবস্থা করে রেখেছেন, বিশেষ করে ছিঁচকে চোরের জন্য। সকল পাপেরই অল্প-বিস্তর ক্ষমা আছে, অর্থাৎ তেমন করে ধরে বসলে অল্পেই রেহাই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ছিঁচকে চুরির তিলমাত্র ক্ষমা নাই—থাকলে পৃথিবী বায়ুবেগে ছুটে ধ্বংসের দিকে যেত না। সে যাচ্ছে—আমি

দিব্যচোখে তা দেখতে পাচ্ছি। ছিঁচকে চুরির প্রাদুর্ভাব আর বাড়াবাড়ির দরুন ভগবানের আসন টলে গেছে ; তাঁর বামহস্তে ন্যায়দণ্ড কম্পিত হচ্ছে—দক্ষিণ হস্তে তিনি মারণাস্ত্র তুলে নিয়েছেন—মারণাস্ত্র সুদর্শন চক্র নয়, শিবের ত্রিশূল নয়, ব্রহ্মার কমণ্ডলু নয়, নিজেরই গদাটা। সেইটা তিনি নিক্ষেপ করবেন।

আফিং আমি খাচ্ছিই, কিন্তু তামাক খাওয়া বন্ধ আছে—হুঁকোর উপর ধুলো জমেছে—নেশা জমছে না। সেই না-জমার কষ্টে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে আমি বলেছি যে, জলের ঢেউ ছুটবে, কিংবা কল্কি আসবেন, কিংবা দ্বাদশ সূর্যের যুগপৎ উদয় হবে। কিন্তু দিব্যচক্ষে এখন আমি দেখতে পাচ্ছি, যে ধ্বংসাত্মিকা শক্তি ক্রিয়াশীলা হয়ে এই পৃথিবীর বিলোপসাধন করবে তা ঢেউ নয়, কল্কি নয়, সূর্য নয়,—গদা। আমি দিব্যচক্ষে আরও দেখতে পাচ্ছি, এ পৃথিবী মাটি নয়, জল নয়, শিলা নয়, ঘুণে জীর্ণ একখানি ঝরঝরে বাঁশ—সামান্য একটা সরু আঁশের সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে…

ভগবানের হস্তনিক্ষিপ্ত গদা এসে পড়বে সেই বাঁশের উপর—আঁশ ছিঁড়ে যাবে—জীর্ণ বাঁশ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে চূর্ণ হয়ে ধুলো হয়ে যাবে—ভগবান তা মুষ্টি ভরে তুলে নিয়ে মহাশূন্যে উড়িয়ে দেবেন।

আর দেরি নাই—গদা বজ্রবেগে আসছে—ছিঁচকে চোর এই পৃথিবীর রাঙা মুখ পাণ্ডুর হয়ে গেছে—সে টের পেয়েছে…

এমনি যে ঘটবেই তা আমি ঠিক জেনেছি। কবে জেনেছি ? যেদিন আমার কল্কে চুরি গেছে।

অসংলগ্ন ভবিষ্যৎ

সরোজাক্ষ সেন বিবাহ করিয়াই আতঙ্কে আপসোসে সারা হইয়া গেল। প্রেমের আকর্ষণ দুর্বার এবং দুরতিক্রম হইয়া তাহাকে দিয়া বিবাহ করাইয়াছে, সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় কথা এই যে, যে-কোনো নামধারী সংকটের আশঙ্কা বিস্মৃত হইয়া মানুষ যে রূপসম্ভোগ করিতে চায়, এই সত্য তার পক্ষেও সত্য। অংশুময়ীর রূপও অসামান্য—তার রূপের তুলনা দুর্লভ—অসংখ্য লোকের পক্ষেই দৃশ্যমান বিষয় হিসেবে তা অপরূপ এবং অনিবার্য লোভের সামগ্রী।

বিবাহের পূর্বে অংশুময়ীর প্রেম এবং রূপের উপর একাধিপত্য স্থাপনের গর্বও তাহাকে যুগপৎ আবিষ্ট এবং আকুল করিয়াছিল, এ কথাও সে মনে মনে বিশেষভাবেই স্বীকার করে। সংখ্যাতীত ব্যক্তিকে হতাশার তিমিরে ডুবাইয়া দেওয়ায় তার নির্মল আনন্দ জন্মিয়াছিল, অর্থাৎ মনে মনে সে নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছিল, ইহাও সে নিজের কাছে অস্বীকার করে না। অপূর্ব তন্ময়তার পর এ- জয়ের মতো উল্লাসকর উপভোগ্য জয় জগতে খুব অল্পই আছে ; পুরাণে এবং ইতিহাসে অনন্ত রূপৈশ্বর্যশালিনী রমণীর রমণীয় দেহ অধিকার এবং হৃদয়

জয় করিবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা আর রক্তপাতের সঙ্গে যত হুলস্থুল ব্যাপার ঘটিয়াছে বলিয়া বর্ণিত আছে, হীরকের খনি অধিকার কিংবা তার স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্যও তেমনটি কখনও হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

হীরকের খনির চাইতেও মূল্যবান এবং লোভনীয় এবং হীরকের চাইতেও অতুলনীয় রূপসমন্বিত যে দেহ তাহাই করতলগত হওয়ায় সরোজাক্ষের অন্ততঃ কিছুদিনও আকাশে উড্ডীয়মান অবস্থায় নির্বিকল্প পুলকে মগ্ন থাকা উচিত ছিল, নতুবা পূর্বরাগের দিনে এত উদ্বেল উত্তেজনার আর একাগ্র আগ্রহের কি কোন অর্থ হয়! অপরাপর অভীপ্সু ব্যক্তিগণকে ঘৃণিত করিয়া দূর দূরান্তে ছিটকাইয়া দিয়া বিশ্বের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে জয়পতাকা উড়াইবার আর সেই সূত্রে মনঃপীড়াক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নিঃশ্বাসের অভিশাপ কুড়াইবারই বা কি দরকার ছিল যদি স্ত্রীকে সহ্য করিবার ক্ষমতাই না থাকে! অংশুময়ী অপরের স্ত্রী হইতে পারিত; স্বামীটা সুখী হইত, সুখে থাকিত, এবং সুখী করিত। কিন্তু তা না হইয়া এ হইল কি? নিজেকে এই দুর্জ্ঞেয় প্রশ্ন করিয়া সরোজাক্ষ ভবিষ্যতের গর্ভে দৃষ্টি প্রেরণ করে, এবং মনে মনে এত সংকুচিত হইয়া উঠে যে তা বলিবার নয়।

অংশুময়ীকে সর্বতোভাবে পাইবার জন্য সে চারিদিক বজায় রাখিয়া বীর্যবান রণকুশল রথীর মতো লড়িয়াছিল নিশ্চয়ই; কিন্তু সেই প্রাণপণ প্রয়াসের কারণটা কি ছিল তাহা সরোজাক্ষ এখন ভাবিয়া পায় না। অন্যান্য প্রেমাকাঙ্ক্ষীগণের পরাজয় উপভোগ করিবার ইচ্ছা তখন খুবই ছিল, এখনো মনে পড়িলে ক্ষীণ একটু আনন্দই জন্মে; কিন্তু সেই সঙ্গেই তার মনে হয়, রূপশালিনী নারীর হৃদয় জয় করিয়াছিলাম—তাহাই পৌরুষের এবং আকাঙ্ক্ষার যথেষ্ট সার্থকতা মনে করা উচিত ছিল। বিবাহ করিতে গেলাম কেন! এমন অবিমৃষ্যকারিতা আর দুর্বুদ্ধি কেন ঘটিল!...সরোজাক্ষের আতঙ্ক আর আপসোসের অন্ত নাই।

সরোজাক্ষের আর্থিক অবস্থা আদৌ গৌরবজনক নয়। তার বাবা ছিলেন অধ্যাপক। অকালে তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। তিনি একখানা বাড়ি এবং অনেকগুলি বই রাখিয়া গেছেন, আর কিছু না। পড়িতেন খুব; নিভৃতে থাকিয়া পড়িবার জন্য তিনি এমন কায়দায় বাড়ির একটা কক্ষ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন যার একটি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেই সংসার হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া যায়—তিনি স্বেচ্ছায় না উঠিলে ডাকিয়া তোলা যায় না। সরোজাক্ষও অধ্যাপক, এবং এই ঘরটিতেই সে বসে, পড়ে, আর বন্ধু-বান্ধব আসিলে বসায়। বোনেরা বলে, দাদার তপোবন। সরোজাক্ষ অধ্যাপক বটে, কিন্তু যথেষ্ট উজ্জ্বল অর্থাৎ মনভরানো ব্যাপার কিছু নয়। বেতন অল্প। মা আছেন; তিনটি ভাই আছে, পড়ে। দুটি বোন আছে, তারাও পড়ে। এ সবের পিছনে খরচ ঢের।

অংশুময়ীর বাবা খুব আধুনিক রুচির লোক হইলেও, অর্থাৎ প্রেমমূলক বিবাহই বিবাহের প্রকৃষ্টতম সংস্করণ মনে করিলেও, সরোজাক্ষকে নানা কারণে জড়িত এবং নানা দিকে দায়গ্রস্ত, অর্থাৎ বহু পোষ্যের জন্য ব্যবস্থা করিতে হয় এবং হইবেও বলিয়া আপত্তি করিয়াছিলেন; ভয় করিয়াছিলেন গরিবানার

কিন্তু অংশুময়ী সে-ভয় করে নাই; সে বলিয়াছিল,—'দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝবার ক্ষমতা আমার হবে, এ-শিক্ষা তোমরা যদি আমায় না দিয়ে থাকো তবে কিছুদ

শেখাওনি। পুঁথির বিদ্যে কতো অনর্থক তা সবাই জানে; পুঁথিগত নীতিমালার কোনো মূল্য নেই। দৈবাৎ কোনো শৌখীন ভাগ্যবান এসে আমার পাণিগ্রহণ করবে আর আমি তৎক্ষণাৎ সুখের স্বর্গ আর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের চাবি হাতে পাবো, এ-আশা যদি করে থাকো তবে অন্যায় করেছ—দূরদৃষ্টির পরিচয় দাওনি।'

তারপর বলিয়াছিল,—টাকার চাইতে সুখ বড়ো। তোমরা আমার সুখই কামনা করো, এটা বোধ হয় আমি মনে করতে পারি।···চপল ব্যক্তিকে আমি যেমন ভয় করি, তেমনি করি খুব সূক্ষ্ম ধারালো বুদ্ধির লোককে; আবার মোটা-বুদ্ধি লোককেও আমি পছন্দ করিনে। সরোজাক্ষবাবু মাঝারি লোক—সত্যিকারের ভালোমানুষ—যতটা বুদ্ধি থাকলে লোকে সংসারী হ'য়ে সুখে থাকতে পারে, ঠকাতে যেমন ঠকাতেও তেমনি গররাজি থাকে, ঠিক তেমনি ধাতের মানুষ। মনটা ভারি কোমল—ভাইবোনগুলিকে আর মাকে সুখে রাখতে তাঁর কি আকুলতা!··· বলিয়া সে বাপের মুখের দিকে অতল একটি দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়াছিল—বাবা সম্মতি দিয়াছিলেন।

অংশুময়ী কোনো প্রলোভনে মুগ্ধ হইল না, অর্থের ঔজ্জ্বল্য, বিস্তৃতি আর সমারোহ তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না—প্রেমেরই জয় হইল। সরোজাক্ষ অপরিসীম প্রেম হৃদয়ে অনুভব এবং অপরূপ সৌন্দর্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধন্য হইল···

একটা প্রকৃত সদনুষ্ঠানের সাহায্যকল্পে কলিকাতাস্থ যাবতীয় কলেজের অধ্যাপক আর অধ্যাপিকা এবং ছাত্র আর ছাত্রী কর্তৃক 'নাট্যাভিনয়ের' সূত্রে যে প্রেমের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা গ্রন্থিবদ্ধ এবং মন্ত্রদ্বারা পবিত্রীকৃত আর অকাট্য, অর্থাৎ যুক্তিদ্বারা অখণ্ডনীয় হইল।

কিন্তু শীঘ্রই মুশকিল হইল সরোজাক্ষের। তার অন্তরের অন্তস্তল যে এমন শিথিল আর দুর্বল তাহা সে নিজেই জানিত না; সেখানে দেখা দিল দুর্নিবার আতঙ্কের কম্পন আর অনুতাপের দাহ; তাহার কেবল মনে হইতে লাগিল, অপরিহার্য কঠোর দায়িত্ব বিবাহের অন্তর্ভুক্ত হইয়া সবারই পক্ষে যেমন সর্বাগ্রবর্তী হইয়া আছে এবং থাকে, তার পক্ষেও তা তেমনি আছে এবং থাকিবে। এই গুরু দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আর নির্দোষভাবে পালন করা যাইবে কেমন করিয়া! ইহাই ভাবিয়া তার বুক দুরু দুরু করে—হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন কষ্টকর হইয়া ওঠে···

নানান ফন্দি আর উপায় আবিষ্কারকরতঃ সুখে অভ্যস্তা সুন্দরী স্ত্রীর মনোরঞ্জন করিয়া তাহাকে চিরকাল কেবল অত্যাজ্যা আর অঙ্কশায়িনী ভোগ্যার মর্যাদা দিয়া বিলাসিনীর আসনে স্থাপিত করিয়া রাখা ত' একটা হাস্যকর চাপল্য, ছেলেমানুষী—তাহাতে কর্তব্যগত দায়িত্বের চাইতে ভোগাকাঙ্ক্ষাদূষিত বিহ্বলতাই বেশী—সেটা উচ্ছৃঙ্খলতারই প্রকারান্তর, বিপাক এবং বিপর্যয়ের আশঙ্কায় তা জ্বালাময়—সরোজাক্ষের আতঙ্ক সে-হিসাবে নয়; তার চিন্তা, খাঁটি ভদ্রলোকে যে-ধারা অনুসরণ করিয়া নিঃশঙ্ক, অবাধ, অভাবশূন্য, শান্তিময় জীবন যাপন করিতে মনে মনে লালায়িত হইয়া থাকে, সেদিক দিয়া সে সফলকাম হইবে কি না।

ভাবিয়া ভাবিয়া সে অবিরাম সিদ্ধান্ত আর অনুভব করে যে, সেদিকে সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে সংশয়শূন্য হওয়া অসম্ভব ; কারণ, সে সামর্থ্যহীন ; সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে কর্তব্য ও দায়িত্বপালন করা তার পক্ষে এমনই কঠিন যে, তাহাকে নিয়তই উপহাসাস্পদ হইতে হইবে—স্ত্রীর বিরাগই সহ্য করিতে হইবে। মা ও ভাইবোন-গুলি যেমন স্বাভাবিক, এবং স্বাভাবিক বলিয়া যেন বৃক্ষের শাখার মতো অজান্তেই জীবনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে, স্ত্রী তেমন নয়—তাহাকে স্বতন্ত্র স্থান হইতে আকর্ষণ করিয়া পরিধির অভ্যন্তরে আনয়ন করা হইয়াছে। কাজেই, কর্তব্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া দায়িত্বসম্পাদনের প্রচেষ্টা যত চরম আর প্রাণান্তকর হইয়া উঠিতে পারে, স্ত্রীর বেলায় ঘটে তা'-ই। স্ত্রী অন্তরের পরম ধন হইয়া আসিতে পারে, কিন্তু নিরঙ্কুশ অন্তরের অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতে তার বিলম্ব ঘটে—ভাই ভগিনী জন্মমাত্রেই তা হয়, জননীর গর্ভচ্যুত হইবামাত্র জননী তা হন, কিন্তু স্ত্রী চক্ষের নিমেষে তেমন কিছুই হয় না, দেখিতে দেখিতে একেবারে মিশিয়া সে একাকার হইয়া যায় না। স্ত্রী খণ্ড বস্তু, অংশ এবং অংশীদার ; সুতরাং তার সম্বন্ধে দায়িত্ব-পালন যে কেমন গুরুতর কঠোর ব্যাপার তা নিঃশেষে ধারণা করিতেই পারা যায় না—তাহাতে কত যে দূরদর্শিতা চক্ষুষ্মত্তা আর অবিরাম সূক্ষ্ম সতর্ক মনঃসংযোগ প্রয়োজন, তাহারও ইয়ত্তা নাই। তার উপর, সন্তানাদি জন্মিবে। স্ত্রী স্বামীর চাইতে সন্তানের সুখান্বেষণ করে অধিকতর একাগ্রতা আর অনমনীয় দৃঢ়তার সহিত, ইহা খুব সত্য। এখনকার গুরুভার দায়িত্ব তখনকার গুরুভার দায়িত্বের সহিত সংযুক্ত হইয়া যোগজনিত একটা অসহনীয় সঙ্কটের উদ্ভব অবশ্যই হইবে—না হইয়া পারে না⋯ ⋯

সুতরাং সরোজাক্ষের মনে হয়, এ করিয়াছি কি ! স্ত্রী সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু সে যে নির্বিবাদী অমায়িক শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকের পক্ষে এমন নিদারুণ সমস্যা তা আগে মাথায় আসে নাই কেন। সরোজাক্ষের নিজেকে খুব বিপন্ন ক্লান্ত অসহায় আর হঠকারী মনে হয়—তার আতঙ্ক আর আপসোসের অন্ত থাকে না। ⋯স্ত্রীর কাছে মান মর্যাদা, যা মানুষ বলিয়া পরিচিত ব্যক্তির চিরদিন অটুটভাবে রক্ষণীয় তা কিছুমাত্র বজায় রাখা যাইবে না ; কারণ, দায়িত্ববোধ সত্ত্বেও হাতে কলমে ষোল-আনা, অর্থাৎ যতটা স্ত্রী প্রত্যাশা করে নিক্তির ওজনে ঠিক ততটা, দায়িত্বপালন দুঃস্বপ্নের মতো অস্বস্তিকর আর আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো অসম্ভবই হইবে। ফলে স্ত্রী অপদার্থ লঘু খর্ব মনে করিবে এবং অনুতপ্ত হইবে⋯⋯ইহার চাইতে যন্ত্রণাপ্রদ দুর্গতি কোনো ভদ্রলোকের আর কি ঘটিতে পারে। সরোজাক্ষ মনে মনে হাঁসফাঁস করে।

অংশুময়ী উপর্যুক্ত সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির বিষয় বিন্দুবিসর্গও অবগত নয়—সে ফুর্তিতেই আছে।

সরোজাক্ষের শ্বশুর অর্ধেন্দুবাবু খুব পরিচ্ছন্ন লোক ; তিনি নিজেও চমৎকার পরিচ্ছন্ন এবং পরের পরিচ্ছন্নতার দিকে তাঁর এমন স্পষ্ট লক্ষ্য যে, মাত্র তিন দিনের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দাড়ি লইয়া কেহ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে তিনি ঐ অশোভন দাড়ি দৃষ্টেই তার প্রকৃতির বিচার করেন, এবং বিতৃষ্ণার দ্বারা তাহাকে গভীর ও

গূঢ়ভাবে চিহ্নিত করিয়া রাখেন। তাঁর মতে আত্মমর্যাদাবোধ আর সুশিক্ষা কার কতটা আছে তারই মাপকাঠি হইতেছে পরিচ্ছন্নতা ; এবং গভীরতর কথা হইতেছে ইহাই যে, অপরিচ্ছন্ন লোকের মন ধর্মানুগ নহে। তৃতীয়তঃ, ইহাও তাঁর গভীরতম চিন্তার আবিষ্কার যে, অসবর্ণ এবং স্বগোত্রে বিবাহ প্রকৃতিগত পরিচ্ছন্নতার দিক হইতেই নিষিদ্ধ হইয়া আছে—রক্তের তেজস্করতা ক্ষুণ্ন করে বলিয়া উহা সামাজিক একটা পাপ ; সে-পাপের ফল অবশ্যই খারাপ ; চন্দ্রে রাহুর স্পর্শ যেমন পৃথিবীর আবহাওয়াকে দূষিত করে তেমনি। ঐরূপ বিবাহ মনকে কলঙ্কযুক্ত করে।

সরোজাক্ষ তাঁর স্বজাতি এবং স্বগোত্রীয় নহে, তার সঙ্গে অংশুময়ীর বিবাহ এই কারণেও অনেকটা সহজ হইয়া আসিয়াছিল।

সে কথা থাক্—

এদিকে নিখুঁত পরিচ্ছন্ন অভ্যাসের দরুণ প্রতিবেশী পঙ্কজ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় —প্রতিবেশী যুবকগণের মধ্যে সেই তার সর্বাপেক্ষা পছন্দসই, এবং তাঁর আদরণীয়। অর্ধেন্দুবাবুর বাড়ির দু'টি বাড়ির পরই তৃতীয় বাড়িটা পঙ্কজদের ; সুতরাং উভয়ের অবস্থানে নৈকট্য যথেষ্ট। পঙ্কজ খুব যায় আসে—খুব গল্প করে ; অন্তঃপুরে যাইয়া জ্যাঠাইমার সঙ্গে এমন ছেলেমানুষী করে যে, মনে থাকে না, ছেলেটা এত লেখাপড়া জানে। জ্যাঠাইমা যত হাসেন তত করেন স্নেহ। অংশুময়ীও তাঁর হাস্য-পরিহাস সর্বান্তঃকরণ দিয়াই উপভোগ করে, পাল্টা-জবাবও না দেয় এমন নয়।...এ-বাড়িতে নানা দিক হইতেই পঙ্কজের আদর যথোচিত।

পঙ্কজ পড়াশুনাতে প্রকৃতপক্ষেই প্রশংসনীয় ক্রমোন্নতি দেখাইয়াছে ; আরোহণের পথে একটিবারও পা না পিছলাইয়া সে শিখরে পৌঁছিয়াছে—এম্-এ পাশ করিয়াছে—তারপর 'ল' পাশ করিয়াছে, এবং তারপর আরও কৃতিত্ব ইহাই যে, সে এখন শিক্ষানবিশ মুনসেফ—দুর্লভ বিচারাসনের অধিকারী সে! কিন্তু ঘনিষ্ঠতর ব্যক্তিগণের মত এই যে, পঙ্কজ যতট শিক্ষাপ্রাপ্ত তার চাইতে চতুর সে বেশি, এবং যতটা চতুর সে, তার চাইতে সে যোগাড়ে বেশি। সে এতগুলি পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে এবং দেওয়ানী হাকিম হইয়াছে কেবল যোগাড়পটুতায়। এইখানেই তার বাহাদুরী ; এবং তার অনিন্দ্য পরিচ্ছন্নতা আর সুচারু বাক্যচ্ছটা অর্থাৎ সমগ্রভাবে একটা অভিজাত বাবুয়ানির ঘটা সেই যোগাড়ের অঙ্গ, 'ভেক নইলে ভিখ্ মেলে না' যেমন তেমনি একটা বাহ্য ব্যাপার, ভড়ং।

পঙ্কজ না জানে এমন বিষয় নাই—অক্সন ব্রিজ্ হইতে জ্যোরোঅ্যাস্ট্রিয়ানিজ্ম্ পর্যন্ত তার নখ-দর্পণে—কোন্‌টাকে কি বলিলে কি বুঝায়, এবং কি ভাবে কে বলিলে কোন্ কথা কেন শ্রোতব্য হয়, তাহাও সে জানে আর বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারে। মুনসেফী পাওয়ার পর হইতে সে লোক-চরিত্র সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞ হইয়াছে। সে এখন শিক্ষানবিশ হাকিম ; মাস আড়াই হরিসাগর চৌকির হাকিমের আসন অলঙ্কৃত করিয়া, অর্থাৎ জটিল মামলা মুলতুবী রাখিয়া এবং একতরফা মাম্‌লায় ডিগ্রী দিয়া, বাড়ির ছেলে বাড়ি আসিয়াছে—আবার কবে ডাক আসিবে সেই আশায় সে পথ চাহিয়া আছে......

বাড়ি আসিলে সে শ্রদ্ধাস্পদ অর্ধেন্দুবাবুর সহিত দেখা করিবেই—এবারও করিয়াছে, এবং প্রায় দু'বেলাই করিতেছে। এবার তার অধিকাংশ গল্পই জজসাহেব, নামজাদা উকিল, বইয়ের আইন আর বিচারের আইনের পার্থক্য, সাক্ষীদের দিগ্‌ভ্রম প্রভৃতি বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া ফুটিতেছে ভালো। অর্ধেন্দুবাবু তার রসিকতায় কখনো হাসিয়া অস্থির হইয়া যান, কখনো তার মেধার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন। এবং এই সময়েই তিনি এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন—তাঁর মনে, অর্থাৎ তাঁর সংস্কারাত্মক বিবেচনায়, হঠাৎ একটা পরিবর্তন দেখা দিল তাহারই বশে তিনি একদিন অংশুময়ীকে সম্মুখে পাইয়া বলিয়া ফেলিলেন,—স্বজাতি নয় এই ওজরে পঙ্কজের প্রস্তাবে কর্ণপাত না করাটা বোধ হয় ঠিক হয় নাই, অংশু।

অংশুময়ীর পাণিপ্রার্থী হইয়া পঙ্কজ একদা, হাকিম হইবার পূর্বে, অর্ধেন্দু-বাবুর অন্তঃপুরে ঘটকী পাঠাইয়াছিল; কিন্তু পঙ্কজকে পরিচ্ছন্ন এবং গুণালংকৃত জানিয়াও তিনি সে প্রস্তাব হাসিয়া উড়াইয়া দেন নাই, যথোপযুক্ত গম্ভীরভাবে নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন, কারণ সে স্বজাতি নহে।

এখন সরোজাক্ষের সঙ্গে অংশুর বিবাহের পর তাঁর মন সময় সময় প্রচণ্ড দোল খাইতেছে - তুলনা স্বতঃই আসিয়া পড়িতেছে…

কিন্তু অংশুময়ী পিতার ঐ অসমঞ্জস কথার উত্তরে সঙ্গে সঙ্গেই বলিল—তুমি কর্ণপাত করলেও, আমি করতাম না—মহিমময়ী জজগিন্নী হবার লোভেও না। পঙ্কজের সঙ্গে লুডো খেলা চলে, হাসি-তামাশা গল্প-গুজব করা চলে, সিনেমা থিয়েটারে যাওয়াও চলে, কিন্তু গৃহস্থালী করা চলে না। আমি জাঁক কি সেলাম চাইনে, আমি চাই শান্তিতে সংসার করতে। সুস্থ পারিবারিক জীবনই চাই—ফ্যাসানও চাইনে, লেডি হতেও চাইনে। পঙ্কজ যতই গুণান্বিত পরিচ্ছন্ন হোক, আর তার ভবিষ্যৎ গৌরবময় হওয়ার যত সম্ভাবনাই থাক, অনিবার তার মতিগতির অনুসরণ করা আমার দ্বারা চলত না। মানুষের গাম্ভীর্যের সঙ্গেই প্রগাঢ়তা থাকা উচিত—পঙ্কজের তা নাই। সময় সময় হঠাৎ তার আকর্ষণে মন অবশ হলেও চিরদিনের সঙ্গী হিসাবে সে অবিশ্বাস্য আর অযোগ্য। আমাকে ক্ষমা করো—তোমার অনুতাপ অকারণ বলেই অন্যায়, বাবা!—বলিয়া অংশু একটু হাসিল।

সমুদয় অকপট উক্তির মূলে থাকে একটি পরিচ্ছন্ন মন। কাজেই অর্ধেন্দু-বাবু কন্যার উক্তি শুনিয়া খুশীই হইলেন; কিন্তু কন্যা অংশুময়ীর কল্যাণকামী পিতা হিসাবে অর্ধেন্দুবাবুর উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাহাকে দমিত এবং অনুতাপ বিদূরিত হইল কি না, তা বুঝা গেল না।

পঙ্কজের সঙ্গে সরোজাক্ষের পরিচয় হইয়াছে, শ্বশুরালয়েই হইয়াছে—অর্ধেন্দু-বাবু পঙ্কজকে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন এমন স্তুতিস্ফীত ভাষায় আর গদগদ স্বরে যেন সে আকাশস্থ জ্যোতিষ্ক একটি, বহু সাধ্য সাধনায় তাহাকে প্রসন্নকরত আকাশ হইতে অবতরণ করাইয়া দেওয়ানী হাকিমের পদ গ্রহণ করিতে সম্মত করানো হইয়াছে, এবং এক্ষণে এই বৈঠকখানায় ঐ চেয়ারে বসানো হইয়াছে! কিন্তু

কেবল অর্ধেন্দুবাবুর বর্ণনায় মুগ্ধ হইয়া নয়, নিরপেক্ষভাবেই উহাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা অনুরাগ জন্মিয়াছে ; এবং ঐ শ্রদ্ধার দরুণ এই বন্ধুত্ব স্থায়ীই হইবে, ইহাও উভয়েই অনুভব করিতেছে।

পঙ্কজ আজ পর্যন্ত সরোজাক্ষের বাড়িতে আসে নাই—পূর্বেই সংবাদ দিয়া অনুরাগবশতঃ আজ আসিয়াছে। তার অভ্যর্থনায় ত্রুটি ঘটিল না—সরোজাক্ষ অকপটভাবে আর গাঢ়ভাবে এবং অংশুময়ী অকপটভাবে আর সহজভাবে তাহাকে সংবর্ধনা করিল…

কিন্তু মুশকিল এই যে, দুই বন্ধু এক ঠাঁই হইলেই আমরা তর্ক করিতে শুরু করি—সরোজাক্ষ এবং পঙ্কজও তর্ক করিতে শুরু করিয়াছে।

বিষয়—ইংরেজি বনাম বাংলা ভাষা।

শিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরেজি ভাষা আপত্তিকর এবং অচল, কারণ, তাহা শিক্ষাকে অস্পষ্ট, আড়ষ্ট, বিলম্বিত এবং কষ্টকর কঠোর করে, পঙ্কজ এই মত প্রকাশ করায় সরোজাক্ষ প্রতিবাদ করিল, বলিল—উঁহু, মোটেই নয়। প্রথম থেকে, অর্থাৎ বর্ণপরিচয় থেকে, শুরু করে একেবারে শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, অর্থবিদ্যা, মনোবিদ্যা ইত্যাদি বিবিধ বিদ্যা ইংরেজির সাহায্যে অধিকার করা সহজ। তারপর হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল,—বলুন দেখি, বলবিদ্যা মানে কি ?

পঙ্কজ বলিতে পারিল না, হাসিতে লাগিল।

সরোজাক্ষ বলিল, বলবিদ্যা মানে আর্ট অব রেসলিং নয়, মেক্যানিক্স। দেখুন ত' কত সহজে বুঝে ফেললেন ! সংস্কার বা অভ্যাস কত দৃঢ়মূল দেখুন। ইংরেজির চর্চা যেখানে বহুদিন থেকে হয়ে আসছে সেখানে ইংরেজির তরজমা-করা দুরূহ বাংলা চালানো যেমন পণ্ডশ্রম, তেমনি ক্ষতিকর আর অবিচার।

পঙ্কজ কথা কহিল না—দ্বিবিধ ভঙ্গীতে মাথা নাড়িয়া বোধ হয় যৌক্তিকতা স্বীকার অস্বীকার দুইই করিল।

সরোজাক্ষ বলিতে লাগিল,—তারপর দেখুন, যে ছেলে কি মেয়ে ক খ পড়ছে তাকে দিয়ে উচ্চারণ করাতে হবে মূর্ধণ্য ণ, মূর্ধণ্য ষ ; তালব্য শ ; অন্তঃস্থ য। আজ পর্যন্ত আমি ত' মূর্ধণ্য ণ খুব অবাধে উচ্চারণ করতে পারিনে, অসংকোচে লিখতে ত' পারিই নে। বলিয়া হাসিল। পঙ্কজও হাসিল, অংশুময়ীও হাসিল।

অংশুময়ী বলিল, কিন্তু বাংলা আমাদের মায়ের মুখের ভাষা।

—তা হোক ; মায়ের মুখের ভাষায় আমরা তেমন কিছুই শিখিনে। চাল ডাল হাঁড়ি সরা মুড়ি সন্দেশ প্রভৃতি কতকগুলি বস্তুর নাম শিখি, গাল শিখি, আর নানাবিধ পূজার্চনায় কি কি সামগ্রী প্রয়োজন তারই ফর্দ শিখি। বর্ণনীয় জ্ঞেয় বা অনুভবনীয় বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে আমাদের শব্দ সংগ্রহ ঐটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ; তা ছাড়া ঈশ্বর বলতে যে অনির্ণেয় সত্তাকে বুঝায় মায়ের মুখ থেকে আমরা ক'জন তার আভাষ পাই। কিন্তু ওদের পারিবারিক উপাসনা—

অংশুময়ী প্রবাহে বাধা দিল ; বলিল,—'কি কথায় কি কথা বলছ !'

—বলছি, মাতৃভাষা পাঠ যেখানে শুরু হবে তার সঙ্গে যোগ রেখে মাতৃভাষার ব্যবহার আর উৎকর্ষ আমাদের বাড়িতে ঘটে না। ইংরেজদের তা চলে। আমাদের

ভাষা এবং ভাষাশিক্ষা তাইতেও কিছু খাটো হয়ে থাকে। ইংরেজি আমাদের যতটা অপরিচিত, অনেক ক্লেশের পর অনেকটা দূরে এগিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বাংলা ভাষাও ঠিক ততটাই অপরিচিত। সংস্কারগত সহজ বাহন বর্তমানে ইংরেজিই। হায়েস্ট কমন ফ্যাক্টর বুঝি কিন্তু গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বুঝিনে; কোইনসিডেন্স—সমাপতন; মোমেন্টাম—ভরবেগ; গ্র্যাভিটি—অভিকর্ষ; হরিজনট্যাল—অনুভূমিক; প্লেজ—চিক্কণলেপ; ওয়াটারপ্রুফ—জলাভেদ্য, ভার্টিক্যাল – উল্লম্ব; লঙ্গিটিউড্—দ্রাঘিমা; সাবম্যারীন - অন্তঃসাগরীয়; কমপ্লেক্স্—গূঢ়ৈষণা; সার্টিফিকেট—শংসালেখ, ইত্যাদি পরিভাষার উচ্চারণকষ্ট আর শব্দগঠনের জটিলতা একবার অনুভব করুন…

কিন্তু পঙ্কজ তা অনুভব করিয়া কষ্ট পাইতেছে বলিয়া মনে হইল না সে অন্যমনস্কের মতো বলিল,—অভ্যাসে ক্রমশঃ সহজ হয়ে আসবে। ঐ শব্দগুলো এবং অনুরূপ শব্দ যত আছে সব অপরিচিত বলে প্রথম প্রথম ভয়ংকর মনে হবেই।

সরোজাক্ষ বলিল,—তা হতে পারে; কিন্তু আবার দেখুন, কেবল অক্ষর পরিচয় হল, একটি একটি করে সবগুলি অক্ষর লিখতে শিখলাম আর তখনই নিষ্কৃতি পেয়ে কেবল ভাষা শিক্ষাই চলতে লাগল, বাংলাভাষা তেমন নয়। অ থেকে ঔ পর্যন্ত স্বরবর্ণকে ক থেকে হ পর্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণে জুড়তে হলেই তাদের রূপান্তর আর নূতন করে পরিচয়ের প্রয়োজন পুনঃপুনঃ ঘটতে লাগল; তারপর ফলা ইত্যাদি আছে। ক-এ র-ফলা দিলে, ত যুক্ত করলে ক-এর আর ক-এর আকার কিছুই রইল না—এই রকম অনেক ঝঞ্ঝাট যুক্তাক্ষরের…

তারপর হাসিমুখে জানিতে চাহিল—যাঞ্ছা, অঞ্জন, সঞ্চয়, শশাঙ্ক, রসজ্ঞ, ব্রহ্ম শব্দগুলো ঠিক ঠিক রেখা-বিন্যাস করে লিখতে পারেন ?

পঙ্কজ বলিল, পারিনে।

—তুমি পারো ?

অংশুময়ী বলিল, আমিও পারিনে।

—তা হলেই দেখা যাচ্ছে স্থানে স্থানে ব্যাপার খুবই গুরুতর। ইংরেজিতে কিন্তু এমন নয়; বানান জানিনে, লিখতে পারলাম না, ইংরেজির কাঠিন্য এই পর্যন্ত। বাংলার কাঠিন্য আর-একটু অগ্রসর হল—বানান জানি কিন্তু অক্ষর বিশেষের হুবহু ছাঁচটা জানিনে বলে যথাবৎ আকার দিয়ে লিখতে পারলাম না—এ কি কম কষ্ট, আর তা রপ্ত করাও কি কম অধ্যবসায়ের কাজ। বর্ণ-পরিচয়ের পর এ-গুলোর সঙ্গে পরিচয় করতে হবে। ইংরেজি যে শিখেছে তার চাইতে কত বেশি বাধা ঠেলতে হল, আর কত পিছিয়ে পড়লাম তা একবার ভাবুন দেখি। তারপর দেখুন, সদ্যপ্রসূত, বিসর্গ নেই; সদ্যঃস্নাত, বিসর্গ আছে; সদ্যোজাত, বিসর্গ ও হল…

পঙ্কজ এই সময়ে হঠাৎ একবার হাই তুলিল; বলিল—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভারি আপত্তি প্রকাশ করেছেন; বলেছেন, ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন করায় শিক্ষার্থীর মাথা খাওয়া যাচ্ছে।

—যাদের তা যাচ্ছে মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হলেও তাদের তা যেত।

রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি লিখতেন চমৎকার; ভাষার অধিপতি হবার কৌশল তিনি জানতেন—তাঁর যত্নও ছিল অসাধারণ। যাদের তা নেই তারাই কঠিন মনে করে। একবার ভাবুন দেখি, আপনাদের আইনে সব বই বাংলায় লেখা—পারেন মুখস্থ করতে ?

পঙ্কজ হাসিয়া ফেলিল ; বলিল, ভাবতে সেটাকে কেমন বিসদৃশ লাগে যেন।

অংশুময়ী বলিল,—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন কি কেবল ব্যাড বয়দের পক্ষাবলম্বন করে ?

—কি কি যুক্তি তিনি দেখিয়েছিলেন তা মনে পড়ছে না। প্রবন্ধটা আছে ?—সরোজাক্ষ জানিতে চাহিল।

—আছে।

—নিয়ে আসি। ও-ঘরে আছে বুঝি ?

হ্যাঁ, আলমারীতে।

সরোজাক্ষ উঠিয়া গেল—এতই তার তাড়াতাড়ি যে জুতা পায়ে দিবারই সময় তার হইল না। সরোজাক্ষ ও-ঘরে যাইয়া দেখিল, আলমারীতে তালা দেওয়া আছে ; চাবি তাহার পকেটে আছে ; যে-জামার পকেটে সেই চাবি আছে সেই জামা আছে ঐ ঘরে—যে-ঘর হইতে সে আসিয়াছে। সুতরাং তাহাকে ফিরিতে হইল ; এবং সেই ঘরের জানালার কাছে আসিয়াই যে-দৃশ্য তার চোখে পড়িল সে-দৃশ্যের স্বপ্নও সাংঘাতিক ; দেখিল, পঙ্কজ এবং অংশুময়ী টেবিলের উপর দিয়া পরস্পরের দিকে ঝুঁকিয়া আছে—পঙ্কজের বাঁ হাতখানা অংশুময়ীর গ্রীবা বেষ্টন করিয়া আছে—উভয়ে চুম্বনরত···

মাত্র একটি মুহূর্তের জন্য সরোজাক্ষের মনে হইল, ফিরিয়া যাই ; পরক্ষণেই সে নিঃশব্দে প্রবেশ করিল···

পঙ্কজ আনত চক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অংশুময়ী আনতচক্ষে বসিয়া পড়িল।

সরোজাক্ষ বলিল, কত সুখী হলাম তা বলতে পারিনে। বিয়ে করবার কিছুদিন পর থেকেই কেবল একই চিন্তায় আমার মনে তিলমাত্র শান্তি ছিল না : আমি আমার ঠিক মনের মতো করে স্ত্রীপালনের গুরুদায়িত্ব পালন করবো কি করে। ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখছিলাম। আমি নিষ্কৃতি পেয়েছি—অংশুময়ী আমার নয়, আপনার। আমার দায়িত্ব নেই।—বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল।

যাহা ঘটিল তাহাই সত্য

রাধামাধববাবুর হিন্দুজ্যোতিষে অগাধ বিশ্বাস। নিজেও একখণ্ড জ্যোতিষ-তত্ত্ববারিধি ক্রয় করিয়া কিছুদিন তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র অনুশীলন করিয়াছিলেন, সুতরাং শুদ্ধিদীপিকা, জ্যোতিষতত্ত্ব, জ্যোতিষপ্রকাশ, জ্যোতিষরত্ন, জাতকচন্দ্রিকা, খনা বরাহ-মিহির, বৃহৎপরাশরী প্রভৃতি জ্যোতিষগ্রন্থের যা সারভাগ তার সহিত তিনি অল্পবিস্তর পরিচিত। উপরন্তু তিনি শুদ্ধিদীপিকাও স্বতন্ত্রভাবে পাঠ করিয়াছেন। জ্যোতির্বিদগণ নিশ্চয়ই পরিজ্ঞাত আছেন যে, এই পুস্তকই জ্যোতিষশাস্ত্রের আদি প্রামাণিক গ্রন্থ। গোবিন্দানন্দ ও রাঘবাচার্যকৃত দুইটি টীকা এবং প্রাণতোষ বিদ্যানিধিকৃত সরল বঙ্গানুবাদ থাকায় শুদ্ধিদীপিকা খুবই সহজবোধ্য হইয়াছে। রাধামাধব সতৃষ্ণচিত্তে এবং প্রবল অনুসন্ধিৎসা লইয়া মাঝে মাঝে এই রাশীকৃত প্রাঞ্জলতার ভিতর নিমগ্ন হইয়া যান……

রাধামাধবের ছোট দুভাই, বেণীমাধব আর কুঞ্জমাধব, বন্ধুবর্গের কাছে দাদার প্রজ্ঞা ও জ্যোতিষবিদ্যায় পারদর্শিতার গল্প করে, কিন্তু সেই গল্প শুনিয়া হাত বা কোষ্ঠী দেখাইয়া ভবিষ্যতের ছায়া দেখিতে কেহ কখনও তাঁর কাছে আসে না। আসে না, ভালই করে, আসিলে তিনি মুশকিলে পড়িতেন; কারণ গণনার সাহায্যে যবনিকা বিদীর্ণ করিয়া অনাগত কালের অভ্যন্তরটা দেখাইয়া দেওয়া শ্রমসাধ্য ব্যাপার—তাহাতে তিনি রাজী নন। দ্বিতীয়তঃ, নিজের গণনা অভ্রান্ত হইবেই বলিয়া তিনি সাহস দেখাইতে পারেন না

সে সাধ্য আছে কেবল জ্যোতিষার্ণব শ্রীপ্রেমনিবাস ভট্টাচার্যের। তাঁর কথাই বলিব।

রাধামাধব সসম্মানে বি-এ পাশ করিয়া অল্প বেতনে ব্যাঙ্কে ঢুকিয়াছিলেন—এখন পান এক শত টাকা। ছোট ভাই দুটি কলেজে পড়ে। মা বর্তমান। বিবাহ তিনি যথাসময়ে এবং যথারীতি নিশ্চয়ই করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারী, একেবারে অভাবনীয়, সংকট উপস্থিত হইল একটি বিষয়ে। বধূ চন্দ্রিকার বয়স মধুর পনর হইতে সুউচ্চ তেইশে উঠিয়া গেল, কিন্তু ছেলে হইল না। শাশুড়ী এবং তাঁর সুখাকাঙ্ক্ষিগণ প্রতীক্ষায় থাকিয়া থাকিয়া ক্লান্ত হইয়া উঠিলেন এবং রাধামাধব বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন: চন্দ্রিকার সন্তান না হওয়া ভয়ংকর অন্যায়—জ্যোতিষশাস্ত্রমতে অসম্ভব অন্যায়, অবিশ্বাস্য ঘটনা, বিবাহের লগ্ন প্রভৃতি হইতে আদ্য ঋতুর বার-তিথি-মাস উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, চন্দ্রিকার গর্ভে সন্তান-সঞ্চার অবশ্যম্ভাবী।……কিন্তু তার সময় যে যায় যায়!

রাধামাধব তাঁর জ্যোতিষতত্ত্ব-বারিধি এবং সটীক ও সানুবাদ শুদ্ধিদীপিকা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন কি না, আক্রোশে অস্থির হইয়া তাহাই ভাবিতেছেন, এমন সময় একদিন তিনি চমকিয়া উঠিয়া দেখিলেন যে, তিনি অসংশোধনীয়ভাবে অপরাধী হইতে হইতে ভাগ্যবশতঃ বাঁচিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি জানিলেন যে, চন্দ্রিকা অন্তসত্ত্বা হইয়াছে।

চতুর্দিকে অপরিসীম উল্লাসের মাঝে চন্দ্রিকা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল……

জ্যোতিষার্ণব উপস্থিত ছিলেন—

জাতকের ভাগ্য গণনা করিলেন : প্রচুর আয়োজনপূর্বক এবং প্রভূত রেখা ও অঙ্কপাত করিয়া তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন এবং পরিশ্রমের ফল প্রকাশ করিলেন সুদীর্ঘ বাক্যবিন্যাসে…সংক্ষেপে তার মর্ম এই যে, জাতক পুণ্যবান, নিরীহ এবং ধনশালী হইবে…

—আয়ুটা ? রাধামাধবের কণ্ঠে উদ্বেগ এবং আগ্রহ ধ্বনিত হইল।

স্তবে তুষ্ট দেবতা যেমন করিয়া ভক্তকে বরদান করেন তেমনি তৃপ্তিপ্রদ প্রসন্ন হাস্যের সহিত জ্যোতিষার্ণব বলিলেন,—বিস্তর আয়ু। আশীর ঊর্ধ্ব।

রাধামাধবের চিন্তা দূর হইল।

কিন্তু জ্যোতিষার্ণবের গণনা অভ্রান্ত কি না, তাহা প্রমাণিত হইতে বিলম্ব আছে। ছেলেটির বয়স এখন মাত্র আঠারো মাস। তবে ছেলেটি নিরীহ তেমন নয়—চুরি করিয়া বাতাসা খাইতে শিখিয়াছে।

শ্রদ্ধার সহিত আহূত হইয়া জ্যোতিষার্ণব আঠারো মাস পরে আজ পুনরায় আসিয়াছেন। ঐ সময়ের মধ্যেই চন্দ্রিকা দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হইয়াছে—এমন কি, ঠিক এই মুহূর্তেই সে প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে…

রাধামাধব পরমাণুর গোঁড়া ; তিনি সূক্ষাতিসূক্ষ্ম গণনা সত্য-সত্যই চান,—তাহার জন্য পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় করিতে তিনি প্রস্তুত ; সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া এবারও তিনি কোন দিকেই আয়োজনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি রাখেন নাই—এমন কি, জ্যোতিষার্ণবকে তিনি উপবাসী রাখিয়াছেন এবং শুভ্র বস্ত্র পরিধান করাইয়াছেন : কারণ জ্যোতিষ শাস্ত্র বলিতেছে : দৈবজ্ঞঃ সোপবাসন্তু শুক্লাম্বরধরঃ শুচিঃ। এই অনুরোধ রক্ষা করার জন্য অর্থাৎ উপবাস-ক্লেশের বিনিময়ে জ্যোতিষার্ণব অতিরিক্ত এবং সন্তোষজনক দক্ষিণা পাইবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি তাঁহাকে সবিনয়ে প্রদান করা হইয়াছে।…একটি নয়, দুটি নয়, তিনটি ঘড়ি রাধামাধব সংগ্রহ করিয়াছেন ; একটি তাঁর নিজের ; খুব মূল্যবান নহে বলিয়া নিজের ঘড়িটাকে তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই—বিশ্বাস করিতে পারা যায় এমন একটি পকেট-ঘড়ি তিনি জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়াছেন—প্রায় তিন শত টাকা মূল্য তার ; কিন্তু আরো আবশ্যক ; আবশ্যকতা অনুভব করিতেই তিনি প্রতিবেশীর দেওয়াল-ঘড়িটা আনিয়াছেন—সেটাও বেশী দামের এবং সে সময় ঠিক রাখে বলিয়া তার মালিক পুনঃ পুনঃ অভয় দিয়াছেন…স্টেশন এবং ডাকঘর হইতে ঘড়ি মিলাইয়া আনিয়াছেন…পুনঃ পুনঃ তাঁর সন্তোষ জন্মিতেছে ইহাই লক্ষ্য করিয়া যে, তিনটি ঘড়িই এক সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় সময় রাখিয়া চলিতেছে। ঘড়ি না হইয়া মানুষ হইলে এমন কঠিন পরীক্ষায় পড়িয়া তারা বোধ হয় কুণ্ঠিতই হইত এবং বোধ হয় বারবার অমন করিয়া তাকাইতে রাধামাধবকে তারা নিষেধই করিত।

জ্যোতিষার্ণবের একেবারে চোখের উপর রহিয়াছে সর্বাপেক্ষা দামী ঘড়িটা—জ্যোতিষার্ণব সময়টা তৎক্ষণাৎ দেখিবেন।

প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার সময়েও রাধামাধব সমুদয় ব্যবস্থা ঠিক এমনিই করিয়াছিলেন—সময় সম্বন্ধেও ঠিক এমনি সতর্ক ছিলেন। এবারেও জ্যোতিষার্ণবের সম্মুখে ঘড়ি ছাড়া তাঁর একেবারে হাতের কাছে কাগজ পেন্সিল তিনি রাখিয়া দিয়াছেন…

খবরটি পাইবামাত্র ঘড়ি দেখিয়া যাহা কর্তব্য জ্যোতিষী তাহা করিবেন – উপকরণ অভাবে তাঁর অসুবিধা না হয়।

দাইকে বলা আছে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র জানাইবে, মুহূর্ত বিলম্ব করিবে না।

রাধামাধবের উদ্যম প্রশংসনীয়।

জ্যোতিষার্ণব পতাকীচক্র অঙ্কিত করিয়া স্থিরচিত্তে অপেক্ষা করিতেছেন। …জাতকের জন্মকালীন রাশিচক্রে যে-যে রাশিতে গ্রহ ও লগ্ন অবস্থিত আছে সেই সমস্ত গ্রহ ও লগ্ন পতাকীচক্রে সেই সেই রাশিতে সংস্থাপিত করিয়া তিনি জাতকের শুভাশুভ চিন্তা করিবেন…রাধামাধব দৈবজ্ঞের এই অঙ্কনকার্যে বিশেষ মনোযোগের সহিত এবং যেন ধৃষ্টতার জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী এমনি সবিনয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্যও করিয়াছেন।

সবাই নিঃশব্দ—খালি ঘড়িগুলি শব্দ করিতেছে…আর প্রসবাগারের ভিতর হইতে যন্ত্রণায় অল্প অল্প গোঙানির শব্দ আসিতেছে: কিন্তু তাহাতে কাহারও দুঃখ নাই।

"ছেলে গো।"

সংবাদ পৌঁছিতেই একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল—রাধামাধব নড়িয়া উঠিয়া প্রসবাগারের দিকে এবং জ্যোতিষার্ণব চোখ তুলিয়া তাঁর সম্মুখস্থ ঘড়ির দিকে তাকাইলেন – আটটা আঠারো ঠিক। রাধামাধবও সেই ঘড়ি আর তাঁদের টাইমপিসের দিকে তাকাইলেন—আটটা আঠারো ঠিক। শঙ্খ বাজিয়া উঠিল।

মৃদু একটা কলরব উঠিল—

কিন্তু জ্যোতিষার্ণব তখন গণনায় মগ্ন হইয়া গেছেন – উদ্বিগ্ন রাধামাধব তাঁর দিকে ঝুঁকিয়া আছেন।

পঞ্জিকায় সন্নিবেশিত জ্যোতিষ বচনার্থঃ অর্থাৎ তদন্তর্গত যাবতীয় ব্যবস্থা, কথন, প্রকরণ, নিয়ম, নিরূপণ জ্যোতিষার্ণবের কণ্ঠস্থ হইয়া আছে—তাহাদিগকে তিনি প্রত্যক্ষ মূর্তি দান করিলেন রেখায় রেখায় আর বর্ণ ও অঙ্ক প্রয়োগে…কত যে রেখা তিনি অঙ্কিত করিলেন, আর কত যে অঙ্ক আর বর্ণ তিনি ছড়াইয়া দিলেন তার ইয়ত্তাই নাই…

দীর্ঘ চিন্তা এবং কঠিন নির্ণয় চেষ্টার পর জ্যোতিষার্ণব বলিলেন,—শুভ।

বেণীমাধব জিজ্ঞাসা করিলেন– গণ্ডদোষ ?

—কিছু না।

—মাতৃরিষ্টিঃ।

দাঁতে জিব কাটিয়া জ্যোতিষার্ণব বলিলেন,—সর্বনাশ, অমন বাক্য উচ্চারণ করতে আছে ? পাপগ্রহের স্পর্শও নাই।…ওঁ সহস্রাক্ষেণ শতশারদেন শতায়ুষা হবিষা হবিষমেনং শতং যথেমং…

তারপর তিনি ঐ সহস্রাক্ষ মন্ত্রের অবশিষ্ট ভাগ নিঃশব্দে আবৃত্তিপূর্বক গাত্রোত্থান করিলেন···রাধামাধব প্রণাম করিয়া আর যথোচিত দক্ষিণা দিয়া এবং সম্ভ্রম সহকারে অনুগমন করিয়া তাঁহাকে রাস্তায় তুলিয়া দিলেন—

"এখনই তো সব জানানো সম্ভব নয়—কোষ্ঠী তো প্রস্তুত হবেই। দেখিয়ে বুঝিয়ে দেব সব তখন।" বলিয়া জ্যোতিষার্ণব প্রস্থান করিলেন।

জ্যোতিষে বিশ্বাস এবং জ্যোতিষার্ণবেও বিশ্বাস রাধামাধবের পক্ষে নূতন নয়, অনেক দিন হইতেই তা আছে, সুতরাং বলা বাহুল্য, রাধামাধবের প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ও ঠিক এইরূপভাবেই আচার প্রতিপালিত এবং এইরূপ সব ঘটনাই—যাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে তাহাই ঘটান হইয়াছিল। ঘণ্টু বা যশোদারঞ্জনের কোষ্ঠীও জ্যোতিষী প্রস্তুত করিয়াছেন। সে ভারি সুখদ ব্যাপার—জ্যোতিষী দেখাইয়াছেন যে, মহামানবের প্রতিভা আর ব্যক্তিত্ব লইয়া যশোদারঞ্জন জন্মগ্রহণ করিয়াছে সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া অতটা উচ্চেই যে শেষ পর্যন্ত উঠিবে, জ্যোতিষার্ণবের কোষ্ঠী সে বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ।

রাধামাধবের মা মহামায়া বিবেচক মানুষ; প্রচলিত রীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি চলেন; কাজেই কিছু সন্দেশ এবং বাতাসা উপঢৌকন বা উৎকোচ তিনি আনাইয়া রাখিয়াছিলেন– ওদিককার উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি হইলে তিনি এদিকে আসিলেন জ্যেষ্ঠ পৌত্র ঘণ্টুকে সাদরে কাছে ডাকিয়া লইয়া তিনি তাকে ঘুষ দিলেন– সেই সন্দেশ আর বাতাসা তাহাকে খাইতে দিলেন; বলিলেন, ভাই এনেছে তোমার জন্যে।

ঘণ্টু বলিল, ভাই এনেছে আমার জন্যে? খাই। বলিয়া খাইতে লাগিল।

মহামায়া জানিতে চাহিলেন, ভালবাসবে ত' ভাইকে?

—বাসব।

—কেমন ভালবাসবে ?

—খুব।

—খুব ?

—হ্যাঁ।

—আমার কাছে থাকবে ত' রাত্তিরে ?

সন্দেশের সুস্বাদ ভুলিয়া ঘণ্টুর মুখখানা একটু বিষণ্ণ হইল, বলিল, হুঁ।

—মায়ের জন্য মন কেমন করবে না ত'?

এবার যেন ঘণ্টুর প্রশান্ত চোখে একটু জলই দেখা দিল; বলিল,—না।

—লক্ষ্মীছেলে। বলিয়া মহামায়া পৌত্রের মুখচুম্বন করিয়া ছেলেদের ডাকিলেন—সবাই মিলিয়া সেই কথা লইয়া বিস্তর কোলাহল, আনন্দ প্রকাশ এবং আদর সোহাগ করিলেন।···ঘণ্টুকে সতর্ক করিলেন, লোভ প্রদর্শন করিলেন, প্রবোধ দিলেন। ব্যাপারটা বিস্তারিতভাবে তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন—তাহাকে ঘিরিয়া সকলে মিলিয়া যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন···এবং তাহার প্রতিশ্রুতিতে কেহ বিশ্বাস স্থাপন করিলেন না। এবং করিতে যে পারা গেল না তাহা লইয়াও তাঁহারা সাহ্লাদে বিস্তর বাক্যব্যয় করিলেন এবং বিস্তর গণ্ডগোল করিবে বলিয়া

দুশ্চিন্তাও ব্যক্ত করিলেন—অর্থাৎ ঘণ্টুকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের পারিবারিক প্রীতি ও আনন্দ আবর্তিত হইতে লাগিল।

কিন্তু মাত্র আঠারো মাসের ছেলে ঘণ্টু এতগুলি লোককে একেবারে অবাক করিয়া দিল—সবাই অবাক হইয়া গেলেন তার ধৈর্য দেখিয়া···মায়ের কাছে সে একবারও যাইতে চাহে না—কান্নাকাটি মুখভার অবুঝপনা সে কিছুই করে না··· তবু মা যে শীঘ্রই ঐ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাহাকে কোলে লইবেন এ-ভরসা তাহাকে পুনঃ পুনঃ দেওয়া হয়···তার কাকারা তার কষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনুকম্পাবশতঃ তাহাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইয়া আনে, নানা জায়গায় নানা প্রকারের কৌতুক সে দেখে: কাকাদের কোলে সে প্রায়ই চাপিয়া থাকে—প্রচুর খেলনাও সে পাইয়াছে।

মায়ের গল্প ঠাকুরমার সঙ্গে সে করে: তখন তার বেশ পুলক দেখা যায়: আঁতুড় ঘরের দুয়ারে আনিয়া তাহাকে ভাই দেখান হয়: ছুঁইয়া সে আদর করিতে গেলে ভাইকে সরাইয়া লওয়া হয়; বলা হয়, ছুঁসনে।

আঁতুড় ঘরের ভিতর হইতে চন্দ্রিকা ডাকে, ঘণ্টু!

—যাই।

—আসতে হবে না। শোন ঐখান থেকেই। খোকার আনা সন্দেশ খেয়েছিলি?

—হ্যাঁ।

—কেমন?

—ভাল।

—আরো এনেছে, খাবি?

—না।

এই ইচ্ছা ঈর্ষারই দরুন মনে করিয়া চন্দ্রিকা হাসিয়া ওঠে; বলে, কেন রে? খাবিনে কেন?

—ক্ষিদে পায়নি।

—ঠাকমার কাছে রাখা আছে। ক্ষিদে পেলে চেয়ে নিয়ে খাবি। কেমন?

—আচ্ছা।

- মা, শুনলে?

মা মহামায়া হাসিয়া বলেন, শুনেছি।

সুন্দর ছেলেটুকু, যেন মাখনের ডেলা। বড় ছেলে ঘণ্টুও দেখিতে ভারি সুন্দর। চন্দ্রিকার পেটের ছেলে বাড়ির শোভা আর সম্পদ—এমনি তাদের সুকোমল সুপুষ্ট আর সুশ্রী চেহারা—দেখিলেই বুকে চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা না হয় এমন মানুষ নাই।

বাড়িতে উৎসব যেন লাগিয়াই আছে ···নবজাত শিশুর তত্ত্বাবধান করিতে আর যত্ন লইতে ত্রুটি অবহেলা অন্যমনস্কতা কাহারো নাই—সবাই বিভোর হইয়া আর যেন পাল্লা দিয়া সেই কাজে লাগিয়া গেছেন।···জ্যোতিষতত্ত্ববারিধি এবং শুদ্ধিদীপিকা গ্রন্থদ্বয় আলমারীতে তুলিয়া রাখিয়া রাধামাধব তাঁর পিতৃহৃদয় আরও বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন—সেখানে বাৎসল্যের সুকুমার স্বর্গীয় চর্চা অবিরাম চলিতেছে।

দেড় মাস অতীত হইয়াছে। চন্দ্রিকা এখন বাহিরে বিচরণ করে এবং ভাল আছে। ঘণ্টুকে লইয়া তার ব্যস্ততার অন্ত নাই···ঘণ্টুকে তুষ্ট রাখিতে হইবে, আর দেখাইতে হইবে যে, তাকেই সে বেশী ভালবাসে। নতুবা ঘণ্টুর মন আর শরীর ভাল থাকিবে না।

—কোলে নেবে ভাইকে?

ঘণ্টু উৎসাহিত হয়; বলে, নেব, মা।

—তবে বোস পা জড়ো করে।

ঘণ্টু কোল পাতিয়া পা গুটাইয়া বসে; চন্দ্রিকা ছোটটাকে তার কোলের উপর ধীরে ধীরে রাখিয়া দেয়। আর পাহারা দেয়। ঘণ্টু অতিরিক্ত আদর করিবার স্বাধীনতা লইতে গেলেই বাধা দেয়, আর হাসে··

রাধামাধব প্রভৃতি ভ্রাতাগণ এবং তাদের মা মহামায়াও ইহা দেখিয়া খুশী হইয়া যান···আর মনে হয় সংসার অতীব সুখের স্থান।

কোনো কোনো বিষয়ে রাধামাধবের মতামত ভারি মৌলিকতাসম্পন্ন। মলিন কাপড় জামা চাদর বিছানা তিনি ভারি অপছন্দ করেন। ইহা নিশ্চয়ই মৌলিকতা নহে; কিন্তু এই অপছন্দের কারণ যাহা তিনি নির্দেশ করেন, বলিতে চাই যে, তাহা মৌলিকই। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি অপরিষ্কার, হিন্দুভাবে ঈশ্বরানুরাগ তার জন্মিতেই পারে না—হিন্দু সংস্কৃতি অভিমুখী হইয়া এবং তদ্গতভাবে ভাবাপন্নতা তার ঘটে না। কেন ঘটে না? কারণ প্রাচীন ভারতের পরমাণুতুল্য সূক্ষ্মতার বোধ জন্মগত অধিকারী হিসাবে সংস্কারের ভিতর হইতে আমরা পাইলেও পরিণামে তাহা দ্রুতবেগে নষ্ট হইয়া যায়, ঐ অপরিষ্কার অভ্যাসের ফলেই।

বিশেষ করিয়া শিশুদের সম্পর্কে রাধামাধবের মতামত আরও উগ্র, আরও অসহিষ্ণু; তাদের গায়ের রঙিন জিনিসই ময়লা মনে হইয়া তিনি সহ্য করিতে পারেন না—আর্তনাদ করিতে থাকেন; বলেন, রঙটাই ময়লা জিনিস, অস্বাভাবিকতা, আর বাহিরের ময়লা ঢাকিয়া রাখিবার ঘৃণ্য কৌশল মাত্র—সুতরাং চলিবে না···রাধামাধবের ধোপার খরচ ঢের।

ছোটখোকার জন্য কাঁথা প্রস্তুত করিয়াছিলেন রাধামাধবের মা নিজে—সাদা কাপড়ের উপর কালো সুতার সেলাই দিয়া; হঠাৎ সেটা চোখে পড়ায় রাধামাধব ভয়ে চোখ বুজিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, মা, এ করেছ কি! কাঁথার উপর যেন কেঁচো বেড়াচ্ছে। ফেলে দাও, ফেলে দাও।

রাধামাধবের ঐরকম সব আদেশে রঙিন কাপড় এবাড়ি হইতে নির্বাসিত হইয়াছে।··তিনি আরো বলেন, রঙ বিলাসের উপকরণ—সে বিভ্রম ঘটায়। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণগণ মনস্বিতায় এত উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন কেমন করিয়া তা জানো? এই কারণেই যে, তাঁহারা শ্বেতবর্ণের আদর করিতেন বেশী—শুভ্র উপবীতের সঙ্গে শুভ্র বসন এবং শুভ্র উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন এবং শুভ্র পুষ্পে দেবার্চনা করিতেন বলিয়াই উদ্বুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রেরণায় তাঁহারা অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—

কিন্তু এখন সবই ময়লা।

রাধামাধবের ঐ সব বাচনিক পরিপক্কতা এবং বিঘ্ন কাহারো মনে সুখের ক্ষতির কারণ হয় না—সুখের কারণ এঁদের অনেকই আছে; এমন কি, ছোটখোকা যে ঘুমাইয়া থাকে তাহা তাকাইয়া দেখাও সুখের।

উপরের ঘরে সেদিন ছোটখোকাকে শোয়াইয়া চন্দ্রিকা তার কাছেই শুইয়াছিল—বেলা তখন সাড়ে নটা বাজে। ঘুমন্ত শিশুর মুখে যেন পৃথিবীর মধু আর আকাশের জ্যোৎস্না পুঞ্জীভূত হইয়া আছে···আবেশে প্রাণ পূর্ণ করিয়া দিয়া যে ঘ্রাণ একটু তার নাকে আসিতেই সে ঐ মধুর আর জ্যোৎস্নার···ঘণ্টু তার পাশেই বসিয়া খবরের কাগজ ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া টুকরা করিয়া খেলা করিতেছে।

নীচেয় রাধামাধব অফিসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন···এক গ্লাস জল লইয়া মহামায়া আসিলেন—অফিসে বাহির হইবার আগে একটি সিগারেট শেষ করিয়া এক গ্লাস জল খাওয়া রাধামাধবের অভ্যাস

মায়ের দিকে তাকাইয়া রাধামাধব বলিলেন,—মা, বোধহয় মাইনে কিছুটা বাড়বে শীগ্‌গিরই।

শুনিয়াই মহামায়ার মনে পড়িয়া গেল, নবাগতের কথা—তারই পয়ে বেতন বাড়িবে···

মাহিনা বাড়া এবং ছেলের পয়, এ দুটি বিষয় সম্পর্কেই অপরূপ এক যোগাযোগের আনন্দে বিগলিত হইয়া মহামায়া বিস্ময়সূচক কিছু বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—কিন্তু সেই সময়ে হাঁকিলেন জ্যোতিষার্ণব শ্রীপ্রেমনিবাস ভট্টাচার্য,—মা—আনন্দ পরে করিবেন—

"এই যে, বাবা।" বলিয়া মহামায়া সে আনন্দ স্থগিত রাখিয়া বাহির হইয়া আসিলেন—গলবস্ত্র হইয়া জ্যোতিষার্ণবকে প্রণাম করিলেন এবং দেখিলেন যে, জ্যোতিষার্ণবের মুখচোখ অতিশয় উজ্জ্বল·····

—তোমার পৌত্রের কোষ্ঠী প্রস্তুত করে এনেছি, মা। এমন নিখুঁত কোষ্ঠী প্রস্তুত করবার সৌভাগ্য আমার বহুদিন হয়নি। একবার করেছিলাম একটি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের; দেখিয়েছিলাম, রাজা হবে। শুনে তার বাপ-মা খুব ক্ষুণ্ণ হল; বললে, বিদ্রূপ করা কি উচিত ঠাকুর?···কিন্তু হ'ল সে রাজাই!

—কেমন ক'রে?

কথাবার্তার আওয়াজ উপরে চন্দ্রিকার কানেও গেল; ভবিষ্যৎ নখদর্পণে পাইতে কার না আগ্রহ হয়। সেও নামিয়া আসিল; বলিয়া আসিল; ঘণ্টু, বাবা, তুমি এখানে থাকো, ভাইয়ের মুখে মাছি বসলে তাড়িয়ে দিও। কেমন?

ঘণ্টু ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—আচ্ছা।

চন্দ্রিকা নামিয়া আসিয়া দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া শাশুড়ীর পাশে দাঁড়াইল···

জ্যোতিষার্ণব তখন বলিতেছিলেন, এক জমিদার তাকে পোষ্যপুত্র নিলেন··· সেই জমিদার পরে রাজা খেতাব পেলেন—খেতাব বংশ পরম্পরা চলবে। সে জমিদারের মৃত্যু হয়েছে; কিন্তু ছেলেটি এখন নাবালক, সাবালক হইলেই রাজা উপাধি তাকে বর্তাবে। বলিয়া প্রেমনিবাস ভট্টাচার্য চক্ষু এবং চিত্ত একই সঙ্গে

ঊর্ধ্বমুখী করিলেন এবং তার সঙ্গে প্রফুল্লভাবে হাস্যও করিলেন—তাঁর বিশ্বাস, তিনি কিছুই করেন নাই, ঈশ্বরের ইচ্ছায় ইহা ঘটিয়াছে…

বলিলেন, ভগবান করান, মা। সর্বময় কর্তাই তিনি। মহামায়া তাহা স্বীকার করিলেন—না করিলে ভগবান রুষ্ট হইবেন—

চন্দ্রিকাও মনে মনে তাহা স্বীকার করিল—

সভ্রাতা রাধামাধবও তাহা স্বীকার করিলেন—কারণ, জ্যোতিষার্ণবের গণনা যে অভ্রান্ত তাহা ঐ উপাখ্যানের দ্বারা দ্বিগুণ চিত্তহারী হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাহাতেই বিশ্বাস দ্বিগুণ দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে…

মহামায়া বলিলেন, আপনার কথাই ঠিক, ঠাকুর। রাধার মাইনে বাড়বে শীগ্‌গির।…মহামায়ার কণ্ঠে আনন্দের আর অবধি নাই।

—ভারি পয়মন্ত ছেলে হয়েছে। আয়ু সুদীর্ঘ; বিদ্যায়, দানে চিত্তের নির্মলতায়, সেরা মানুষ হবে এই ছেলে—দেখে নিও।…সূক্ষ্মভাবে সব উল্লেখ করা আছে। কিন্তু রাধা ত' এখন বেরুচ্ছে—বুঝিয়ে বলবার সময় নেই এখন।

কোট প্যান্টালুন পরা রাধামাধব ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, আমি এখন বেরুচ্ছি, ঠাকুরমশায়। সন্ধ্যার পর একবার দয়া করে আসবেন—আলোচনা করা যাবে।

—আসব…এই নাও মা, রামায়ণ, তার মানে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কি ঘটবে না ঘটবে তা লিপিবদ্ধ করেছি। কিন্তু তখন কোথায় থাকব আমি, আর কোথায় থাকবে তুমি! বলিয়া মৃত্যু যে মুক্তি সেই ধারণায় প্রেমনিবাস জ্যোতিষী পুনরায় হাসিতে লাগিলেন।

এক দিনের অনিবার্য মৃত্যুর আশঙ্কায় মহামায়াও কাতর হইলেন না; বরং আনন্দে গদগদ হইয়া গেলেন…পৌত্র-পৌত্রী পরিবেষ্টিত হইয়া আর শোকহীন অবাধ প্রাণে একদা তিনি স্বর্গারোহণ করিতেছেন, এই কল্পনা করিয়া তাঁর ভারি উল্লাস জন্মিল…হাত বাড়াইয়া কোষ্ঠীখানা লইয়া তিনি তাঁর লেখককে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন: বলিলেন, আশীর্বাদ করুন।

—করেছি।

ঘণ্টু আসিয়া তার মায়ের কাছে দাঁড়াইয়াছিল—চন্দ্রিকা হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল,—খোকাকে একলা রেখে এলি? বলে এলাম যে বসে থাকতে।

ঘণ্টু বলিল, খোকা ঘুমুচ্ছে।

রাধামাধব বলিলেন, শীগ্‌গির যাও কেউ ওপরে। বেড়াল ফেড়াল ঢুকবে! সেদিন কাগজে পড়ছিলাম, কাদের একটা কচি ছেলেকে হুলো বেড়ালে কামড়ে খেয়ে ফেলেছে।

জ্যোতিষী বলিলেন, তা অসম্ভব নয়। বিড়াল হিংস্র জন্তুই বটে।

আতঙ্কিতা হইয়া চন্দ্রিকা দৌড়াইয়া উঠিয়া গেল এবং যাইয়াই যা দেখিল তা ভয়ঙ্কর। চীৎকার করিয়া উঠিল, মা, মাগো, এস শীগ্‌গির।

আর্তনাদে মনে হইল, একটা মৃত্যুই যেন ঘটিয়াছে।

—কি হল? বলিয়া রাধামাধব, মহামায়া এবং জ্যোতিষার্ণবও ছুটিয়া গেলেন…যাইয়া দেখিলেন চন্দ্রিকা দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে—তার

চোখে জল···ছোট খোকা শুইয়া আছে, কিন্তু তার চক্ষু উন্মীলিত আর নিষ্পলক —বুকে নিঃশ্বাসের সাড়া নাই···আর তার বুকের উপর যে সাদা কাঁথাখানা রহিয়াছে তার উপর ছোট দুটি পায়ের দাগ—ঠিক ঘণ্টুর পায়ের মাপের।

প্রথম মুহূর্তটায় কাহারো মুখেই শব্দ ফুটিল না—কানে শুনিতে লাগিলেন, সিঁড়িতে ঘণ্টুর পায়ের শব্দ উঠিয়া আসিতেছে।

নিরুপম তীর্থ

পায়ের চটির একটা হুটোপাটি শব্দ করিতে করিতে ত্রিলোকপতি গুরুদাসের বৈঠকখানার দরজায় পেঁছিয়াই থমকিয়া গেল।

প্রত্যহ সন্ধ্যার পর যে উদ্দেশ্যে সে আসে, আজও সে সেই উদ্দেশ্যেই আসিয়াছে; কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবার আশা বৈঠকখানার দুয়ারেই অন্তর্হিত হইয়া গেল।

গুরুদাস আর সে এই সময়ে এখানে বসিয়া দাবা খেলে। গুরুদাস যথারীতি বৈঠকখানায় উপস্থিত আছে বটে, কিন্তু দেখা গেল, একটি অপরিচিত ভদ্রলোকও সেখানে বসিয়া আছেন, শুদ্ধমাত্র ভদ্রলোক যে তিনি নন, তিনি যে একজন অবস্থাপন্ন, বিশিষ্ট ভদ্রলোক, তাহা তাঁহার অঙ্গ-অবয়ব চোখে পড়িতেই এক নিমেষেই স্পষ্ট বুঝা গেল। বসিয়া তিনি আছেন, কিন্তু যেমন-তেমন করিয়া বসিয়া নাই, এমন ভঙ্গীতে বসিয়া আছেন, যাহা সহজ অথচ গম্ভীর এবং শিষ্ট; পরিচ্ছদে একটা শুভ্র সমারোহ আছে। পরিচ্ছদ মূল্যবান নয়, কিন্তু শোভন। নিজেকে কি পোশাকে মানায়, বিকৃত রুচির দরুণ অনেকেই তাহা বুঝিতে পারে না, কিন্তু ইনি বেশ পারিয়াছেন বলিয়া ত্রিলোকপতির মনে হইল।

ভদ্রলোকের আগমনের কারণ, অর্থাৎ অতিথিসমাগমের ব্যাপারটা যে সাধারণ নয়, তাহাও ত্রিলোকপতি বুঝিল। গুরুদাসের সেই সর্বোৎকৃষ্ট লণ্ঠনটি বৈঠকখানায় আনা হইয়াছে, যাহা আনাইতে ত্রিলোকপতি ও অন্যান্য বন্ধু রাগে চিৎকার করিয়াও পারে নাই—লণ্ঠন চুরি যাওয়ার ভয় দূর করা যায় নাই। ফরাশের সেই ধূলিপূর্ণ পুরাতন, বিবর্ণ শতরঞ্চির উপর পরিষ্কার চাদর বিছানো হইয়াছে; গড়গড়াটা মাজা হইয়াছে; সটকাটাও নূতন; কলিকাটি সুবৃহৎ। গন্ধে বুঝা গেল যে-তামাক আজ পুড়িতেছে, তাহা নিত্যসেব্য ছ' আনা সেরের তামাক নহে—ইঁহারই তুষ্টির জন্য এবং সম্মানার্থে আনাইয়াছে। তাহার উপর ত্রিলোকপতি লক্ষ্য করিল যে, গুরুদাস নিজে খালি গায়ে নাই, জামা পরিয়া নিজেরই বৈঠকখানায় আসিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, সে বিশেষ উৎসাহিত কৃতার্থ এবং বিনীতভাবাপন্ন হইয়া মাত্র বসিয়া নাই, যেন অনুগ্রহ পাইবার আশায় দরবারে হাজির আছে।

ঐ সব দেখিতে এবং হৃদয়ঙ্গম করিতে ত্রিলোকপতির বেশীক্ষণ লাগিল না।

গুরুদাস যখন অত্যন্ত সম্ভ্রান্তভাবে বলিল : "এসো ত্রিলোক বসো।"—তাহার পূর্ব্বেই সে গুরুদাসের নিজের এবং তাহার বৈঠকখানার এই রূপান্তর—আলোর দিকে পরিবর্ত্তনটা—দেখিয়া লইয়াছে।

ফরাশে স্থান সংকীর্ণ বলিয়া এবং ভদ্রলোকটিকে যথেষ্ট ব্যবধানে রাখিতে হইবে বলিয়া ত্রিলোকপতি অদূরবর্তী চেয়ারখানায় বসিল, বসিয়া সে গুরুদাসের তেঁতুলে-মাজা গড়গড়ার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, যেন গড়গড়ারও একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা অবশ্যই প্রাপ্য।

গুরুদাস খুব আভিজাত্যের সহিত বলিল : "ইনি রঘুনাথগঞ্জ থেকে এসেছেন, শিউলিকে দেখতে।"

রঘুনাথগঞ্জের নাম ত্রিলোকপতি শুনিয়াছে, কিন্তু শিউলি ব্যক্তিটা কে, তাহা ত্রিলোকপতি ঘূণাক্ষরেও জানে না ; কিন্তু বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সম্মুখে অজ্ঞতা প্রকাশ করা চলিবে না—বিজ্ঞভাবে বলিল : "ও"।

কিন্তু ঘটনাটা এই যে, শিউলি আর কেহই নয়, গুরুদাসের সহোদরা।

ত্রিলোকপতি এদেশে কর্ম্মোপলক্ষে মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে আসিয়াছে ; এখানকার কোনো কোনো মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব জন্মিলেও কাহার জ্ঞাতি-আত্মীয়-কুটুম্ব-স্বজন-ভাই-ভগিনী প্রভৃতি কোথায় কে বাস করে, সে খবর সে এখনও পায় নাই।

তবে রঘুনাথগঞ্জ হইতে ইনি শিউলিকে দেখিতে আসিয়াছেন শুনিয়া হাত তুলিয়া সে ভদ্রলোকটিকে নমস্কার করিল—তিনিও প্রতিনমস্কার করিলেন, কিন্তু কথা হইল না।

ত্রিলোকপতি একটু লাজুক স্বভাবের লোক। এদিকে চিন্তাশীল আর ভক্তিপরায়ণ এবং ওদিকে দাবার চালে প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন হইলেও অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে অবান্তর কথা তুলিয়া আলাপ জমাইতে সে ভাল পারে না।

রঘুনাথগঞ্জে ইলিশমাছ সস্তা কিনা, কবিরাজী ঔষধালয় প্রচুর কিনা, গঙ্গা তার কোন দিকে, এখানকার মতো সেখানেও পথে ধূলা যথেষ্ট কিনা, ডাক দুবেলা কি একবেলা বিলি হয়, পাকা বাড়ীর সংখ্যা বেশী—কি কাঁচা বাড়ীর সংখ্যা বেশী, বালাপোষের কারখানা রঘুনাথগঞ্জে আছে কিনা, গুটিপোকার আবাদ ওদিকে কোথায় কোথায় হয়, এ স্থান হইতে যাতায়াতের রেলভাড়া কত,—ইত্যাদি বিষয় সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করা যাইত, কিন্তু বিশিষ্ট ভদ্রলোকটি বাজে কাজে এখানে আসেন নাই, গুরুদাসের বাড়ির—বোধ হয় গুরুদাসের পরমাত্মীয়াই—শিউলিকে দেখিতে আসিয়াছেন এবং দায়িত্বপূর্ণ আর গুরুতর চিন্তার একটা ব্যাপার উভয় পক্ষেই ঘটিতে যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ ভদ্রলোকটির চোখের দিকে তাকাইয়া মনে হয়, ইঁহার প্রভুত্বশক্তি অত্যন্ত প্রবল, সুতরাং বিবেচনাপূর্ব্বক ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইবে, ইহাই মনে করিয়া ত্রিলোকপতি একটা নমস্কারেই কর্ত্তব্য শেষ করিয়া চুপ করিয়া রহিল...

একটা দেনা-পাওনা, পছন্দ-অপছন্দের দ্বন্দ্বও ভিতরে ভিতরে পীড়িত না

করুক, ভিতরে আছে —চুপ করিয়া বসিয়া ত্রিলোকপতি তাহাই অনুভব করিতে লাগিল।

আগেই অনেক কথা নিশ্চয় হইয়াছে—

গুরুদাস এখনও খুব উদাত্ত কণ্ঠে বলিল: "আগেও আপনাকে বলেছি, আবারও বলছি, আমি দরিদ্র, কিন্তু উচ্চাভিলাষী। আপনার ছেলের সঙ্গে আমার সহোদরার বিবাহ দিতে চাই, এতেই আমার উচ্চাভিলাষ যে কত, তা বুঝবেন।"

গুরুদাসের উচ্চাভিলাষের কথাটা বলিবার ভঙ্গীর দরুন, কতকটা দম্ভের মতো শুনাইল এবং ত্রিলোকপতি বুঝিয়া লইল যে, গুরুদাস ইঁহার কাছেও নির্বিবাদে খাটো হইতে চায় না।

ভদ্রলোকটি মৃদু একটু হাসা করিলেন।

ত্রিলোকপতির মনে হইল, ইনি চট করিয়াই হাসেন না; হাসির ভাণ্ডার হইতে হাসি যেন চুয়াইয়া বাহির হয়, এমনি ধীরে ধীরে হাসেন। বলিলেন: "বেশ, ছেলেটাকে এখনো তো দেখেন নি।"

শুনিয়া গুরুদাস খুব মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে একটু হাসিল; বলিল: "সে আমার দেখাই। পিসিমা যা লিখেছেন, তার একটি বর্ণও যে মিথ্যা নয়, তা আমি জানি। আর একটি কথা—ছেলে যে আপনার!"—বলিয়া গুরুদাস আনন্দে গদগদ হইয়া খানিকটা গা দুলাইল…

ত্রিলোকপতির মনে হইল, মানুষকে স্তবে তুষ্ট করার কৌশল গুরুদাস বেশ জানে, এবং ঐ কথার দ্বারাই তাহা সে পরম সুষ্ঠুভাবে করিয়াছে; যেটুকু বাকি ছিল, গুরুদাস যেন তাহা শেষ করিয়া আনিয়াছে, অর্থাৎ এ-বিবাহ হইবেই। কিছু বাদ-ছাদ দিতে চাহিলেও রঘুনাথগঞ্জের ইনি আস্কারা না দিয়া পারিবেন না।

"তামাক খান।"—বলিয়া সেই ভদ্রলোকটি অঞ্চলভাবে গড়গড়ার নল নামাইয়া রাখিতেই গুরুদাস হঠাৎ যত লজ্জিত, তত বিহ্বল হইয়া গেল; গড়গড়ার উপর হইতে সন্তর্পণে কলিকাটি তুলিয়া লইয়া এবং তাড়াতাড়ি নিজের হুঁকাটি ঘরের কোণ হইতে সংগ্রহ করিয়া ঘরের বাহিরে অর্থাৎ বারান্দায় গেল…

সহোদরার শ্বশুর যিনি হইবেন, তিনি এখন হইতেই গুরুজন বই কি!

বারকতক হুঁকা টানিয়া গুরুদাস ডাকিল: "ত্রিলোক, শোনো।"

ত্রিলোক শুনিতে গেল—

কিন্তু অবনতমস্তকে লোহার চেয়ারে বসিয়া তাহার মনে হইতেছিল, বিবাহ-ব্যাপারে, সুকোমল, শুভদ আর সুখদ বিবাহ-ব্যাপারে, দেনাপাওনার কথাগুলি বড় কর্কশ—অসুন্দর লাগে; নানাপ্রকারের দেনাপাওনার উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাহা আদায় করা, আর তার পৌনঃপুনিক প্রতিবাদ—মানুষের ভালো লাগার কথা নয়। সানন্দে নয়, স্বেচ্ছায় নয়, বাধ্য হইয়া টানাটানিতে অবসন্ন বোধ করিতে করিতে, দুঃসাধ্য বিবাহ-ব্যাপার চুকাইতেই হইবে—ইহাতে মনটা বড় ধিক ধিক করে। যাহার নাম বিবাহ, অর্থাৎ

দীর্ঘজীবী একটা মিলন, তাহারই সূত্রপাতে এই বাজার-দর-কষাকষি কেমন যেন কটু লাগে ; মনে হয়, বিবাহের সম্ভ্রমহানি ঘটিতেছে, তার মাধুর্যের চমৎকারিত্ব নষ্ট হইতেছে।

গুরুদাস চুপি চুপি বলিল : "পঁচিশ ভরি সোনা চায়, দু'ভরি কমিয়ে তেইশ ভরিতে রাজী করেছি—অনেক কেঁদে কেটে। হাজার এক নগদ, তার উপর খাট-বিছানা, ঘড়ি, বাসন ইত্যাদি। প্রায় আড়াই হাজার কেবল দিতে হবে।"

শুনিয়া ত্রিলোকপতি যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল : "বাবা!"···তারপর বলিল : "তোমার সহোদরা আছে—তা তো জানতাম না। তা আবার বিয়ের উপযুক্ত ! বয়স হ'ল কত তাঁর ?"

"পনরো চলছে নির্বিবাদে। তুমি ভেবেছ বুঝি যে, তাড়াতাড়ি গৌরীদান করছি ! তা নয়। তবে ছেলেটি ভালো, এম-এ পড়ে ; দেখতে শুনতে চমৎকার —লম্বা-চওড়া, সুপুরুষ—পয়সাওলা। এটাকে কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাইনে।"—বলিয়া গুরুদাস হুঁকা লইয়া উঠিল।

ত্রিলোক বলিল : "আমি যাই।"

"আচ্ছা এস। কাল এসো কিন্তু। আজ আর খেলাটা ফলাফল কাল শুনো।"

ত্রিলোকপতি রাস্তার জ্যোৎস্নায় নামিয়া তার মেসের দিকে চলিতে লাগিল ; কিন্তু তৎপূর্বেই একটা কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে ; ফুলের কোরকের অভ্যন্তরে যেমন পরাগ থাকে, তেমনি একটি সূক্ষ্ম সুকোমল বস্তুকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়া তাহার হৃদয় যেন মুদিত হইয়া গিয়াছে···

পথে চলিতে চলিতে ত্রিলোকপতির সেই কোরকসদৃশ্য, পেলব অন্তরের অভ্যন্তর হইতে বিচিত্র রসস্রোত নির্গত হইতে লাগিল, অর্থাৎ সে ভাবিতে লাগিল সর্বস্ব নগদ দিয়া কে নিঃস্ব হইতে যাইতেছে—সে কথা নয়, গুরুদাসের সহোদরা শিউলির বিবাহের কথা ·

শুধু শিউলির বিবাহের কথাই নয়, পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধের কথাও। পুরুষ আসিয়া মেয়েটিকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইবে। নির্বোধ ব্যক্তির হঠাৎ মনে হইতে পারে, মেয়েটির বিবাহের বয়স হইয়াছে, অতএব মন্ত্রশক্তির দ্বারা জীবনে একটা অকাট্য গ্রন্থি দিবার অভিনয় করিয়া পুরুষটি মেয়েটিকে লইয়া যাইবে সন্তানার্থে, নিতান্তই একটা স্থূল ব্যাপার, যাহার নাম হইবে স্বামী-সেবা এবং গৃহস্থালী। অনেকেরই ধারণা, এই নিয়মেই অর্থাৎ ধাপ্পা-বাজির উপরেই জগৎ চলিতেছে। ত্রিলোকপতি চাঁদের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল।

কি আশ্চর্য, আজও কাহারও কাহারও এই কুসংস্কার আছে যে, বিবাহ আর কিছুই নয়, উভয় পক্ষেরই অর্থাৎ নারী ও পুরুষের জীবনযাপন-বিষয়ক একটি সুবিধাজনক চুক্তিমাত্র—অন্য অর্থ টানিয়া আনিয়া যদি কেহ ভাবোন্মত্ত হন, তবে তিনি তাহা হইতে পারেন, কিন্তু ব্যাপার ঐ। পুরুষের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়া স্ত্রী থাকিবেন পোষা এবং উপযুক্ত ব্যবহার আর অন্নবস্ত্র না পাইলে স্ত্রী করিবেন গোঁসা। আবার কি চাই ?

গোঁসা করিবার অনুমতি স্ত্রীকে দেওয়া আছে।

ত্রিলোকপতি আবার একটু হাসিল।

ঐ ধৃষ্ট লোকগুলির প্রজ্ঞার ঐখানেই শেষ—তাহার বেশী অগ্রসর হইতে তাহারা শিখে নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখা যায়, অনেকেই আছে ভালো, পরস্পরে মিলও আছে—স্বামীর প্রতি স্ত্রী এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামী অনুকম্পা-সম্পন্ন।

তারপর ত্রিলোকপতির মনে হইল, বিবাহের এটা নিতান্তই ঘরোয়া, অপরিণত আর রূঢ় দিক—স্থূল উদ্দেশ্যকে সার্থক করা মাত্র; কিন্তু বিবাহের গভীর তাৎপর্য রহিয়াছে; তাহার দিকে দৃষ্টি অধিকাংশেরই নাই, তবু তাহা আছে—স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলা হয়—মিথ্যা বলা হয় না, স্বামী পতি ইহাও মিথ্যা নয়; বিবাহকে—দৈহিক সুখের আর স্বপ্ন-সুখের দ্বারোদ্ঘাটনের মতো ব্যবহার করার মনোবৃত্তিই বেশির ভাগ লোকের, ইহাও সত্য। কিন্তু ইহা একেবারেই ভুল—মানুষ ভারি ভুল করে, শোচনীয়ভাবে ঐখানটায় ভুল করিয়া সে বসিয়া আছে। বিবাহ ঐহিকও নয়, দৈহিকও নয়,—বিবাহ পারত্রিক এবং আত্মিক। ইহা যে মানিতে না চায়, সে উৎসন্নে গিয়াছে।

বিবাহের পরই নবদম্পতির চেহারার জৌলুস খুলিয়া যায়, ইহা সবাই জানে। লোকে বলে বিয়ের জলের গুণ। কিন্তু তাহা নয়। সত্তার গভীরতম আনন্দানুভূতির সঙ্গে তাহারা যে জগতে চক্ষুরুন্মীলন করে, সেখানে আত্মাই কর্তা—দেহ নয়; প্রকৃতি সুপ্তির শেষে সবগুলি দল উন্মোচিত করিয়া পূর্ণতম আনন্দে বিকশিত হইয়া উঠে—ঐ শ্রী তাহারই। উভয়ের গভীর অন্তরগত মিলন যেমন কামনাকে অভূতপূর্ব অনির্বচনীয় করিয়া তোলে, তেমনি দেহকে করে সুন্দর, মনকে করে পবিত্র, আত্মাকে করে অন্তর্মুখী। কাজেই দু'জনারই চেহারা হয় এমন নবীন, যেন এক রাজ্য ছাড়িয়া অন্য রাজ্যে তাহারা নূতন করিয়া জন্ম নেয়। কেবল একটা লৌকিক স্থূল অনুষ্ঠানের পুনরাবর্তন ঘটে, অন্তরগত কোনো নবতর পরিবর্তন ঘটে না বলিয়াই দ্বিতীয় বার বিবাহের সম্মান নাই—শাস্ত্রেই তার মর্যাদা খুবই কম।

সংসারের যাবতীয় বিবাহিত ব্যক্তিকে এবং অন্যান্য অবুঝ লোকগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া ত্রিলোকপতি অতঃপর গুরুদাসের সহোদরার কথা, তাহার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিতে লাগিল···

এ বিবাহ নিশ্চয় হইবে এবং ইহাদের বনিবনাও নিশ্চয়ই হইবে; সবারই হাতে কুমারীর হৃদয়-অমরাবতীর দ্বার খুলিবার চাবি নাই, তবু মেয়েটি সুখী হইবে; সবারই নিঃশ্বাসে মুকুল চোখ মেলে না, তবু মেয়েটি সুখী নিশ্চয়ই হইবে।

বন্ধু গুরুদাসের সহোদরা বলিয়া ত্রিলোকপতি যে শিউলির সুখাশঙ্কা করিতেছে—এমন নয়, সুখ তাহার পক্ষে স্বাভাবিক এবং অনিবার্য বলিয়াই ত্রিলোকপতির মনে হইতেছে।

শুনা যায়, পুরুষ নারীর প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন, নারীকে সে অবজ্ঞা করে; বর্বর যুগে পুরুষ নারীকে ভয় করিত—তাহার মৃদুতা, কোমলতা আর দুর্বলতাকে সে ভয়ের চক্ষে দেখিত; সেই ভয় এখন অবজ্ঞায় রূপান্তরিত হইয়াছে। পৃথিবীর

অন্যায় উক্তি আর গর্হিত আচরণের দ্বারাই মৌলিক ও উন্নত হইয়া উঠিতেছে।…
আশ্চর্য!…

আশ্চর্য হইয়াই ত্রিলোকপতি মেসের বাসায় পেঁাছিয়া গেল—জিজ্ঞাসা করিল: "ঠাকুর, ভাত হয়েছে?"

"একটু দেরি আছে, বাবু।"

"তা থাক, একটু জিরুই"।—বলিয়া ত্রিলোকপতি উঠানে ঠাকুরেরই খাটিয়ার উপর বসিল

তখন তাহার মনে হইল, মেয়েটি বাড়ির ভিতরেই মানুষ হইয়াছে; আজ পর্যন্ত বাড়ির বাহিরে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে নাই—জ্ঞান অল্প হওয়া সম্ভব; কিন্তু ঠিক ঐ কারণেই অন্যদিকে নিষ্কৃতি পাওয়া গিয়াছে বোধ হয়। আজকাল বিবাহের পবিত্র বন্ধনের মর্যাদা মেয়েদের তরফ হইতেই সর্বত্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত হইতেছে না—অনেকেই বন্ধন শিথিল করিয়া আনিতেছে; কেহ কেহ বন্ধন কাটিবার জন্য ছুরিও শানাইতেছে দেখা যায়। কোনো মেয়ে হয়ত শিক্ষায়তনের উচ্চ চূড়া হইতে অবতরণ করিয়া পাঁচ-সাত বৎসর কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছেন, নিজের রুচি-অনুযায়ী অবসর যাপন করিয়াছেন, নিজের অভীষ্ট সাধনের উপায় নিজেই করিয়াছেন, জীবনের সুখোপকরণ নিজেই সংগ্রহ করিয়াছেন, ইত্যাদি।

তাঁহাকে, ধরুন, বিবাহবন্ধন স্বীকার করিতে হইল…

তারপর হঠাৎ একদিন ধরা পড়িল যে, তিনি ভুল করিয়াছেন; যাহা আশা কিংবা অনুমান করিয়াছিলেন, ইহা তাহা নহে; কর্মময় জীবনের বহির্মুখী অভিসারই ছিল ভাল—এখন যেন সবই উলটাপালটা, অস্বস্তিকর লাগিতেছে—মনের স্বাধীন স্ফূর্তি ব্যাহত হইতেছে…

অথচ স্বামীকে তিনি ভালবাসেন এবং ইহাও জানেন যে, চক্ষুলজ্জা বলিয়া ভয়ংকর একটা জিনিস আছে—লোকে মনে করিতে পারে, তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া এ কথা উঠিতে পারে যে, পারিবারিক শৃঙ্খলা ও শান্তি যে নষ্ট করে, তার শিক্ষা নিষ্ফল, বুদ্ধি অল্প, মন দুর্বল, নৈতিক জ্ঞান নাই…

কাজেই বিক্ষোভ একটা চলিতেই থাকে, কিন্তু ভিতরে; বাহিরে তাহার প্রকাশ থাকে না। স্বামীকে ভালোবাসেন বলিয়াই নিজের মনের প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া তাঁহাকে আঘাত দিতে চান না মহিলাটি—অপ্রত্যাশিত দিকে তৎপরতা দেখাইয়া বিরোধের সৃষ্টি করিতে চান না—নিঃশব্দে তিনি একটি অশান্তি ও অসন্তোষের যন্ত্রণা বহন করিতে থাকেন…

এরূপ পরিস্থিতি অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়।

কিন্তু ইহাদের তেমন কিছু ঘটিবে না। মাকড়সা যেমন দেহাভ্যন্তরের তন্তু বাহির করিয়া জাল প্রস্তুত করে, তেমনি ইহারা—শিউলি আর তার এই 'সুপুরুষ' স্বামী—নিজেদের অন্তরের সূক্ষ্ম সমুজ্জ্বল পরিবেশে শ্রী-অলংকার সমন্বিত করিয়া সসাগরা পৃথিবীব্যাপী একটি কাল্পনিক আবাস নির্মাণ করিবে, যাহাকে কখনো মনে হইবে কুটীর, কখনো মনে হইবে প্রাসাদ, কখনও উপবন, কখনও উদ্যান, কখনো স্বর্গ, কখনও জ্যোৎস্নাময়, কখনও সূর্যদীপ্ত এবং সর্বদাই চমকপ্রদ আর সুখদ।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিল : "ভাত দেব, বাবু ?"

ত্রিলোকপতি বলিল : "দাও।"

আহারান্তে ত্রিলোকপতি একটি সিগারেট ধরাইল ; বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া আর বালিশ লইয়া সে শুইল…

চাঁদের আলো সমগ্র বারান্দায় পড়িয়াছে—ত্রয়োদশীর চাঁদ, অত্যন্ত উজ্জ্বল।

শুইয়া শুইয়া ত্রিলোকপতির মনে হইতে লাগিল, রঘুনাথগঞ্জের ঐ বিশিষ্ট ভদ্রলোকটির পুত্রের সহিত শিউলির বিবাহ হইবেই ; গুরুদাসের যেরূপ আগ্রহ দেখা গেল—তাহাতে মনে হয়, ক্ষতিকে ক্ষতি মনে না করিয়া এ-বিবাহ সে দিবেই আরো সস্তায় কোথাও পাত্র পাওয়া যায় কিনা, তাহা সে অনুসন্ধান করিবে না।

কিন্তু ত্রিলোকপতি শিউলিকে দেখে নাই—সে আছে বলিয়াই ত্রিলোকপতি জানিত না। বরটি ত' একেবারেই অজ্ঞাত—তাহার নামই জানা নাই। কিন্তু তাহাতে ত্রিলোকপতির বিঘ্ন কিছুই ঘটিল না ; সে অবলীলাক্রমে এখানকার শিউলির এবং রঘুনাথগঞ্জবাসী সেই যুবকটির অনুপম মূর্তি কল্পনা করিল · পাশাপাশি স্থাপিত করিয়া নয়, পৃথক ভাবে। তাহার মনে হইল, গুরুদাসের সহোদরা দেখিতে ভালই—ভাল না হইয়া সে পারে না ; তাহার চক্ষু দুটি গভীর, প্রশান্ত ও স্নিগ্ধ। বর্ণ খুব গৌর নয়, কিন্তু অত্যন্ত উজ্জ্বল - এত উজ্জ্বল যে, মনে হয়, তাহার ত্বকের যেন চেতনা আছে, স্বতন্ত্র এমন একটা চেতনা, যা অপর চেতনাকে অভিভূত করে ; তাহার কাছে যাইয়া যে দাঁড়ায়, তাহার মুখে চোখে চেতনাময় সেই ঔজ্জ্বল্যের সুপ্রসন্ন আভা পড়ে।…একটুখানি লম্বাটে গড়ন—পরিপূর্ণতায় আর পরিমাণ-পারিপাট্যে তাহার দেহের অনিন্দ্য আনন্দসুষমা যেন উৎসের মতো ঝরিতেছে ; গতিতে একটা মৃদু লীলা আছে…

কিন্তু সর্বাপেক্ষা সুন্দর সে তখন, যখন সে স্নানান্তে ভিজা চুল পিঠের উপর ছাড়িয়া দেয়। তখনই সে অপূর্ব-কুমারী আর স্বভাব-কুমারী—সুকুমার আর ধৌত কুমারীদেহে জলকণা আর রৌদ্রের আভা ঝলমল করিতে থাকে—চোখের পাতায় জল থাকে বলিয়া চোখ বড় করুণ দেখায়। কিন্তু কথায় তাহাকে পাওয়া ভার—ভারী কৌতুকপ্রিয়।

সর্বোপরি এমন একটা শিষ্টতা আর শালীনতা তাহার প্রত্যেকটি আচরণে আছে, যাহার জন্য তাহার বাড়ির লোকের গর্বিত হওয়া উচিত।

গুরুদাস নিশ্চয়ই গর্বিত, নতুবা সে অত টাকা খরচ করিয়া অসাধারণ উৎকৃষ্ট পাত্রের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে বদ্ধপরিকর হইবে কেন।

কিন্তু সেই ছেলেটি ইহাকে কি চোখে দেখিবে। খুব প্রেমের চক্ষে দেখিবে সন্দেহ নাই। ইহার লজ্জায়, ইহার সংকোচে, ইহার রূপে, ইহার বাক্যে, ইহার হাসিতে, ইহার অভিমানে, ইহার গুণে—এক কথায়, ইহাকে পাইয়া সে জীবনের স্বাদ পাইতে শুরু করিবে এবং নিজেকে ধন্য মনে করিবে। ইহার অতি সরল অন্তঃকরণের আত্মদান হইবে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। আর, সেই ব্যক্তি, রঘুনাথগঞ্জের সেই যুবকটি, সব এবং সর্বস্ব পাইয়াও অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিবে ঐ অন্তরের দিকে ; সেই অন্তরের অপরিমেয় রহস্য হইবে তাহার নিরন্তর

অনুধ্যানের বিষয়, আর, নিরতিশয় তৃষ্ণার আকর্ষণ। সে সন্দেহ করিবে, ঐ হৃদয় দূরবর্তী নয়, একেবারে ঢালিয়া দিয়া সমর্পণ করিয়াছে, তবু ঐ হৃদয়েরই অন্তস্তলের কি একটা বস্তু সে যেন উদ্ঘাটিত করে নাই—সেই বস্তুটি পাইতেই হইবে…

এই আশঙ্কায় শিউলিকে সে আরও ভালবাসিবে; আরও কাছে পাইতে চাহিবে; কেবল গভীর চাহনির মাদকতা নয়, দেহের সুষমা, যৌবনের উন্দামতা নয়, তাহাকে বন্দী করিবে শিউলির মনের লাবণ্য…

মনের লাবণ্য বলিয়া একটা জিনিসকে কল্পনা করিয়াই ত্রিলোকপতির সন্দেহ হইল, মনের লাবণ্য বলিয়া কিছু আছে কি? আছে—যেমন ফুলের লাবণ্য, চাঁদের লাবণ্য, তেমনি আছে শিউলির মনের লাবণ্য; আর তাহা অসীম, এক মুহূর্তও তাহা লুকানো থাকিবে না—মানুষটি প্রতি মুহূর্তে তাহা দেখিতে পাইবে। সুতরাং শিউলির সঙ্গ হইবে তাহার আত্মার অবগাহন, প্রাণময় গভীরতার মাঝে তাহারা পরস্পরকে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে…

বরটি দেখিতে কেমন হইবে? কার্তিকের মতো। মনে হইতেই ত্রিলোকপতির হাসি পাইল। মানুষের রূপ কার্তিকের মতো!

সুপুরুষ যাহাকে বলে, সে তাই, আর সে অত্যন্ত প্রাণময়; শিউলিকে অত্যন্ত ভালবাসিবে।

এখন ত্রিলোকপতির অলস আর অবিরাম চিন্তায় একটু ব্যাঘাত ঘটিল—মেসের বাবুরা আসিয়া পড়িলেন…

ত্রিলোকপতিকে বারান্দায় নিশ্চেষ্ট অবস্থায় শায়িত দেখিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিলেন: "স্ত্রীলোকপতি, জ্যোৎস্না খাচ্ছ?"

তাঁহারা ত্রিলোককে স্ত্রীলোক বলিয়া ডাকেন।

ত্রিলোক একটু হাসিল।

"ভাত খেয়েছ?"

ত্রিলোক বলিল: "খেয়েছি।"

"আমরাও খাইগে। ঠাকুর ভাত দাও…আজ কে হারলে?"

"বাজি চটে গেছে।"

"তা, বুঝি চাল ভাবছ শুয়ে শুয়ে?"

"হুঁ।"

বাবুরা হাত মুখ ধুইতে গেলেন…ত্রিলোকপতি তখন ভাবিতে লাগিল, ইহারা পরস্পরকে ভালবাসিবে—অনায়াসে অবাধে ভালবাসিবে; সে ভালবাসার তুলনা নাই; সেই মুহূর্ত হইতে তাহারা পরস্পরকে ভালবাসিবে—সহজাত এবং সদ্যজাগ্রত একটা ঐশী আকর্ষণ দুর্নিবার হইয়া তাহাদের হৃদয় দুইটিকে সংযুক্ত করিয়া দিবে। মানুষের এই ভালবাসাই সংসারকে অলৌকিক করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া ত্রিলোকপতির মনে হইল। মানুষের জীবনে আর আছে কি! এই প্রেমই তাহার জীবন—জীবন বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহারই সমষ্টি এই প্রেম। লোকে বলে, প্রণয়ী-প্রণয়িনীদের একজন ভালবাসে, আর একজন ভালবাসিতে দেয়। হয়তো এই সত্যই সাধারণ, কিন্তু তখনই পৃথিবীর পুনরাবর্তন অভিনব

উৎসবময় আর রসাভিষিক্ত হইয়া চোখে পড়ে, যখন দুইজনেই দুইজনকে ভালবাসিতে দেয়।

এইখানে ত্রিলোকপতি খচ্‌ করিয়া একটা যন্ত্রণা অনুভব করিল : যদি তাহা না হয়! কিন্তু না,—তাহা হইবে না,—হইতে পারে না। ইহাদের ভালবাসার ইতিহাস কেবল এইটুকু যে, তাহারা পরস্পরকে ভালবাসিবে।

ত্রিলোকপতি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত অনুভব করিল যে, ইহাদের প্রেমে কলুষ থাকিবে না, কারণ, কলুষ অপ্রসন্ন,—আর জ্বালাময় ধ্বংস তাহার ভাগ্যে ঘটে; দ্বিতীয়তঃ কলুষের তীব্র একটা উদ্দীপনা আছে—সেই উদ্দীপনা বেদনা বহন করে আর, অবসাদ আনয়ন করে। সে দুর্ভাগ্য ইহাদের ঘটিবে না; ইহারা ভালবাসিবে আর মনে করিবে, আত্মার মণিকোঠায় বসিয়া দেবতা স্বয়ং তাহা গ্রহণ করিতেছেন। ইহারা এ-কথাটাও ভুলিবে না যে, প্রেম অর্জন করা মানেই প্রেমের অনশ্বরত্ব উপলব্ধি করা।

তারপর ইহাদের কি বিরহ ঘটিবে না। নিশ্চয়ই ঘটিবে—সংসারীর পক্ষে তাহা অনিবার্য, বিরহ না ঘটিলে চলে না। বিরহের গভীর আর্তা তাহাদের চোখে ফুটিবে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ত্রিলোকপতি স্পষ্টই অনুভব করিল, এই আর্তার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যে-সুখ অনুভব করিবে, তাহার সীমাপরিসীমা নাই —তখন একটা অনাহত মধ্যাহ্নের উদয় হইবে; তাহার আলোকে তাহারা দেখিবে অন্তরের দিগন্ত পর্যন্ত অত্যন্ত উজ্জ্বল,—সেই উজ্জ্বলতাকে মহিমায় মণ্ডিত আর সৌন্দর্যে পুলকিত করিয়া বিরাজ করিতেছে একটিমাত্র মূর্তি। সেই মূর্তি শিউলির বেলায় হইবে সেই ছেলেটির, এবং সেই ছেলেটির বেলায় হইবে শিউলির। ইহাদের প্রেমে দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ নাই। আত্ম-বিলোপের ভিতর দিয়া সার্থক সে প্রেম।

কিন্তু মানুষের প্রেমের ট্র্যাজেডি বিরহে নয়, অবসাদে আর ক্ষুদ্রতার পরিচয়ে, আর উদাসীনতায়…

ত্রিলোকপতি মনে মনে একটু বক্র হাসি হাসিল—নিজেরই উদ্দেশ্যে…

খারাপ হালকা আয়নার ভিতর ছায়া যেমন বিকৃত, অদ্ভুত দেখায়, এ-ও তেমনি অর্থাৎ তাহার নিজের মন অতিশয় ক্রূর বলিয়া প্রেমের এই অসম্ভব বিকৃতির কথা সে ভাবিতে পারিয়াছে।

সে যাহা হউক, যে স্থানে তাহারা পরস্পরকে ভালবাসিবে, সে স্থান হইবে তীর্থতুল্য; সে-স্থানটি কি এবং কেমন তাহা ত্রিলোকপতি আগেই ভাবিয়া রাখিয়াছে—সে স্থানটি তাহাদের হৃদয়ের রাসমন্দির—এই স্থানের অনন্ত রূপান্তর কেবল তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া আসিবে যাইবে এবং আবর্তিত হইবে। ঐ স্থানটা মানুষের চোখে পড়িবে না, কিন্তু মনে জাগিবে—নির্নিমেষ অপলক হইয়া জাগিবে, মানুষের শ্রদ্ধার প্রণিপাতের স্পর্শে তাহাদের প্রেমের ঐতিহ্যের সৃষ্টি হইয়া সে স্থান হইবে অক্ষয়, আর চিরস্মরণীয়। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ইহাই।

এই তীর্থ-আবিষ্কারের পর ত্রিলোকপতি অতিশয় মুগ্ধ হইয়া শয়ন করিতে

গেল।...সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিল, চিরআকাঙ্ক্ষিত আরাধ্য বস্তুকে লাভ করিয়া মনটা যেন গ্লানিহীন পরম তৃপ্তির মধ্যে ডুবিয়া আছে।

বিকালে গুরুদাস বলিল : "বুড়ো ভারী ঠ্যাটা হে। কিছুতেই বাগ মানতে চায় না—কিছুতেই কমালে না। কি করি, তাতেই রাজী হয়েছি। ৭ই বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে।"

ত্রিলোকপতি বলিল : "বাঁচলাম।"

ত্রিলোকপতির ভয় হইয়াছিল, পাছে এই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু গুরুদাসের মনে হইল, ত্রিলোকপতি ঠাট্টা করিল। তাহার কি দায় যে, শিউলির বিবাহের দিন স্থির হইয়া যাওয়ায় সে বাঁচিয়া গেল। সে কেমন করিয়া জানিবে যে, এই বিবাহ হইবেই মনে করিয়া ত্রিলোকপতি কত মাথা ঘামাইয়াছে, আর, হওয়াটা দেখিবার জন্য সে কত উদগ্রীব হইয়াছে!

৭ই তারিখ শীঘ্রই আসিয়া পড়িল।

ত্রিলোকপতি বাজার করিল, শামিয়ানা খাটাইল, শামিয়ানার বাঁশ ভাঙ্গিয়া আছাড় খাইল, এবং আরও কত কি কাণ্ড করিল, তাহার হিসাব নাই। বরযাত্রিগণ আসিবার পূর্বে যে গোলমাল, আর খাটুনি, আর ব্যতিব্যস্ততা ছিল, তাহারা আসিবার পর তাহা চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল—সবাই পরিশ্রম করিতেছে। কিন্তু দেখা গেল, ত্রিলোকপতি করিতেছে সকলের চতুর্গুণ। মসলা-পেষা, শিল-নোড়া ধোয়া হইতে জনৈক বরযাত্রীর জন্য সেতার-সংগ্রহ সে-ই করিল। বরযাত্রীদের জল, পান, তামাক, চা দিল; বরকে বাতাস করিল। বরের বাবা সেই বিশিষ্ট ভদ্রলোকটিকে কর-জোড়ে নমস্কার করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল : "ভাল ছিলেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার খবর ভাল?"

কিন্তু জবাব দেওয়ার সময় ত্রিলোকপতি পাইল না। কে একজন চায়ে আরো খানিক চিনি চাহিলেন—ত্রিলোকপতি চিনি আনিতে দৌড়াইল।

ত্রিলোকপতি উঠান ঝাঁট দিল, পাতা করিল, জল দিল ইত্যাদি সে না করিল কি! সে মানুষকে খাওয়াইল, সমাদর করিল, যত্ন করিল, উৎসাহিত করিল, আপ্যায়িত করিল—একটি ভৃত্য গুরুদাসের ধমক খাইয়া রাগ করিয়াছিল, ত্রিলোকপতি হাতে ধরিয়া তাহার রাগ ভাঙ্গাইল...

প্রীতি-উপহার-বিতরণও সে-ই করিল—

এবং সম্প্রদানের পর বরকন্যা বাসরঘরে গেলে ত্রিলোকপতি খালি একটা রসগোল্লা মুখে দিয়া মাত্র এক গ্লাস দধি পান করিল।

কৃতজ্ঞ গুরুদাস উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল : "আর কিছু খাবে না?"

"না। ক্ষিদে নাই।"

"অত খাটা-খাটনি আর ঘাঁটাঘাঁটির পর খেতে রুচি নেই, কেমন?"

"তা-ই।"

"বর কেমন দেখলে?"

"চমৎকার, চমৎকার, চমৎকার!"—বলিয়া ত্রিলোকপতি তাহার তীর্থের দিকে চাহিল—তাহার মনে হইল, কিছুই ভুল করি নাই।

গুরুদাস বলিল: "শিউলির সঙ্গে মানিয়েছে বেশ!"

"আমি তা জানতাম।"

"হিতৈষী তুমি, খুশী ত' হবেই।"

ত্রিলোকপতি বলিল: "আসি এখন..."

"এস। ভারী খেটেছ। আচ্ছা, এর পুরস্কার তুমি পাবে।"—বলিয়া গুরুদাস পুলকিত কণ্ঠে হাসিতে লাগিল।

ত্রিলোকপতি তাহার মেসের বাসার দিকে চলিতে লাগিল, কিন্তু এত ক্লান্তির পরও যেন পথ দিয়া নয় আকাশ দিয়া—চরিতার্থ হইয়া। তাহার মনে হইতে লাগিল, আমিই পথ করিয়া দিলাম।

পুত্র এবং পুত্রবধূ*

সুজাতপুরের অক্ষয়ানন্দ তাঁর পুত্রবধূকে, অর্থাৎ তাঁর পুত্র অমৃতানন্দের স্ত্রীকে আনিতে গেছেন। পুত্রবধূ মায়া স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া চলিয়া গেছে; এবং তাহার বীতশ্রদ্ধার কথা সে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া গেছে।

অল্পদিন হইল বিবাহ হইয়াছে, মাস তিনেকও হয় নাই—ইহারই ভিতর এত কাণ্ড!

পুত্র অমৃতকে সৎপথে আনিতে অক্ষয় তার বিবাহ দিয়াছেন সুন্দরী মায়ার সঙ্গে। অমৃতের স্ত্রী মায়ার রূপ নিখুঁত; চন্দ্রের মতো অশেষ তার দেহের লাবণ্য, অঙ্গের প্রভা; মুখের শ্রী আর গঠনসুষমা অতুলনীয়। অত্যন্ত সচেতন মনে সে রূপ বেশীক্ষণ দেখা যায় না।

ফাল্গুনের শুভ গোধূলি-লগ্নে বিবাহ—

উভয় পক্ষই ধনী, এবং জাঁক খুব—

কিন্তু সকল শোভা উৎসব হাসি আনন্দের অনতিক্রম্য ঊর্ধ্বলোকে স্থান পাইয়াছিল বধূ মায়া, তার রূপের জ্যোতিঃসিংহাসনে! সম্প্রদানের পর কন্যা-পক্ষীয় পুরোহিত জয়রাম স্মৃতিতীর্থ "মাকে আপনারা আশীর্বাদ করুন" বলিয়া অবগুণ্ঠন তুলিয়া ধরিতেই সভা থমকিয়া গিয়াছিল—এত কলরব চঞ্চলতা এক নিমেষে নিঃশব্দ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল; এত সজ্জা এত আলো এত বর্ণ এত স্পন্দন অনিন্দনীয়তা অতিক্রম করিয়া সভার সম্মুখে বিরাজ করিয়াছিল আনত-আননা কন্যার মুখের সেই পেলব পুলকশ্রীটি—তাহা অনুপম! ক্ষণেকের জন্য সকলেরই মনে হইয়াছিল, এই কন্যা ভুবনমোহিনী কমলার অবিরামবাহী

['গতিহারা জাহ্নবী'র অংশবিশেষ। শুধু চরিত্রের নামগুলি আলাদা।]

আশীর্বাদের যে বিত্ত মুখশ্রীতে বহন করিয়া আনিয়াছে তাহাই আমরা নতশিরে গ্রহণ করিলাম…

তারপর বোধ হয় সেই রূপের সঙ্গেই কৃতজ্ঞ হৃদয় হইতে আশীর্বাদ উত্থিত হইয়াছিল : "বধূ, তুমি সুখে থাকো"…তারপর আরো মনে হইয়াছিল, যাহার আচরণে এই রূপের উপর ছায়া পড়িবে তাহার অপরাধ হইবে ক্ষমার অযোগ্য।

সেদিনকার সেই বিস্মৃত স্মৃতিটি, একটা আঘাতের মতো, অনেকের মন হইতে আজও মুছিয়া যায় নাই।

কিন্তু অমৃত তার মর্যাদা রাখিল না—সে যেন বিকৃত-মস্তিষ্ক! পৃথিবীর জীবনের জীবন যে রূপ, সেই রূপের নাগাল পাইয়াও সে যেন উন্মীলিত চক্ষুর দৃষ্টির দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চাহে না…

বন্ধুরা মনে মনে ভারি ক্ষুণ্ণ হয়—

কল্পনায় নিজেকে মায়ার মতো সুন্দরীর প্রিয়তমের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঈর্ষায় তাহাদের অনন্ত গাত্রদাহ ধরিয়া যায়। অমৃতের তরফ হইতে স্ত্রীর সম্বন্ধে একটা প্রবল উল্লাস আর উচ্ছ্বাস দেখিবার আশা লইয়া কথাটা তারা তোলে…

কিন্তু অমৃত বলে,—ও আর কত দিন। পানসে পুরনো হ'ল বলে'।… আরো বলে,—ভালবাসা আদায় করা, আর, তাই নিয়ে মাথা ঘামানো আর ওলট-পালট হওয়া আমার ধাতে মেজাজে পোষায় না।

শুনিয়া বন্ধুবর্গের মনে হয়, মায়া তার স্বামীর নীরস ধর্ম আর ভাববস্তুহীন বর্বরারণ্যে নির্বাসিতা হইয়াছে। তাহারা ক্ষুব্ধ হইয়া ও-প্রসঙ্গ ত্যাগ করে; কারো কারো নিশ্বাসই পড়ে।

মায়ার আগমনে অক্ষয়ানন্দের অন্তঃপুরের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। অপরিচ্ছন্নতা আগেও ছিল না, এখনও নাই, কিন্তু তাহারও অতিরিক্ত একটা স্থানে সবারই অন্তরসত্তার অস্বচ্ছতা কাটিয়া যেন শরৎ-জ্যোৎস্নায় আগমনীর একটা সুনির্মল মিষ্ট সুর সেখানে বাজিয়া উঠিয়াছে। মায়ার সর্বাঙ্গে শরৎ-লক্ষ্মীর ঝলমল দীপ্ত রূপ—অতুল আলোক আর ভরণাভরণের সম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছে বলিয়া সে যেন জগদ্ধাত্রীর মতো পূজার পাত্রী।

শাশুড়ী কল্যাণীর ইচ্ছা করে, বধূকে তিনি বুকে করিয়া রাখেন; বলেন,—"বউমা আমার লক্ষ্মী"…

কথাটা সত্য—শুধু রূপে নয়, গুণেও। মায়া তার মুখের হাসি কি হাতের স্পর্শ দিলেই তুচ্ছতম বাক্যটি আর বস্তুটি সম্পদে স্বাদে বর্ণে রমণীয় হইয়া ওঠে, তাহাতে সন্দেহ কাহারো নাই।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মায়ার সঙ্গে এক থালায় ভাত খাইবার জন্য ঝগড়া করে। মায়া ভাতে হাত দিলেই ভাতের স্বাদ না কি ভালো হয়!

তাহাকে লইয়া এমনি কাড়াকাড়ি।

কিন্তু অমৃত সে-সব কিছু বোঝে না, সে-সবের তোয়াক্কাও রাখে না।

মনের কোন্ কথাটা আবরণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে বেশি করিয়া ফোটে, কোন্ কথাটার জবাব দিতে যাইয়া সেই কথাটাই ভুলিয়া যাইতে হয়; কোথায় অকারণ কথাটাই গোপন কারণে ভরপুর হইয়া দেখা দেয়—এ-সব সূক্ষ্ম রুচি নিগূঢ় ব্যাপার ঘটোৎকচের শাস্ত্রজ্ঞানের মতো, অমৃতানন্দের অন্তরলোকের একেবারে বাহিরে, তার মনে যেমন ক্রীড়াশীলতা নাই, তেমনি ব্রীড়াময়তাও নাই—উহাদের অভাবে সে এত স্থূল যে তার তুলনা নাই···

শয্যার ধার ঘেঁষিয়া মায়া শুইয়া থাকে—কেবল তার পদতল দুটি শয্যার প্রান্তে দেখা যায়, কিন্তু তার পা দুখানির দিকে অমৃত একবার চাহিয়াও দেখে না; কোনো সূত্রেই এ-কথাটি তার মনে পড়ে না যে, ঐ আবরণের নিম্নে যে নিস্পন্দ হইয়া শুইয়া আছে, মনে মনে সে চুপ করিয়া নাই—খনিতে হীরার মতো তার সুকুমার হৃদয়-আধারে অতি উজ্জ্বল কত স্বপ্নের মুহুর্মুহুঃ উদ্গত; আর, স্বপ্নে স্বপ্নে কত আলিঙ্গন ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই···

প্রভাত হইতে এখন পর্যন্ত মনে মনে সে কত প্রশ্ন সৃষ্টি করিয়া, তার কত উত্তর সাজাইয়া সাজাইয়া, ভাঙিয়া আবার গড়িয়া, কত হাসি হাসিয়াছে··· আর, সেই প্রশ্নোত্তরের জটিল গ্রন্থিমালার দিকে চাহিয়াই তার মন দু'চোখ মেলিয়া জাগিয়া বসিয়া আছে···

অমৃতের মনে আসে না, সে তাহারই প্রিয়তম। প্রিয়তমার অভিসারের পদধ্বনি তার কানে পেঁছায় না। মায়া দিবাস্বপ্নে অভিসারে যাত্রা করিয়া নীরব নিভৃত নিশীথে তার একান্ত সন্নিকটে আগমন করে—কুঞ্জে কুঞ্জে সে কুসুম বিকশিত দেখে···

কল্পনায় অমৃত তা দেখিতে পায় না—প্রতীক্ষার আর প্রত্যাশার মর্ম উদ্ঘাটিত করিবার মতো সূক্ষ্ম রসবোধ তার নাই···

সে কত স্থূল, আর কত নিরঙ্কুশ অমৃত তাহা একদিন বুঝাইয়া দিল।

মায়া স্বামীর রকম, অর্থাৎ অর্থহীন বাগাড়ম্বর আর শুষ্ক প্রসঙ্গে সজীবতা দেখিয়া কেবল বিস্মিতই হয় নাই, অতৃপ্তি বোধ করিতেছিল; এমন সময় এক-দিন স্বামীর বিদ্যা-বুদ্ধি অর্থাৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়া গেল।

অমৃত বলিল,—তোমার দাদা বিদ্যে জাহির করার আর স্থান পেলেন না; বিদ্যে ফলিয়ে ইংরিজিতে চিঠি লিখেছেন আমাকে! আরে ইংরিজি আমরাও জানি।—বলিয়া সিগারেট ধরাইল।

স্বামী ইংরেজী জানেন এ সুসংবাদে সুখ-বোধ করিবার বয়স মায়ার হইলেও, কেবল সেই সুখটিকেই অনন্যশরণ হইয়া উপভোগ করিবার সময় সেটা নয়। নিজের ইংরেজি জানার খবরটা এত আক্রোশ সহকারে দিবারই বা মানে কি! কারণ না বুঝিতে পারিয়া মায়ার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল···

সে ত' জানে না যে, 'ইংরিজি জানা' এই মানুষটি ইংরেজি জানা না-জানা উপলক্ষে অত্যন্ত অপদস্থ হইয়াছে, আজই। আড়ম্বর করিয়া সে শ্যালকের পত্র লইয়া বন্ধুবর্গকে দেখাইতে গিয়াছিল; তখন নব-কুটুম্ব কর্তৃক বিদ্যা জাহিরের ধৃষ্টতায় অমৃতের অসন্তোষের কারণ ঘটে নাই, বরং পত্রলেখক নিজের লোক বলিয়া সে গর্বই অনুভব করিয়াছিল···

কিন্তু কে জানিত, বন্ধুরা ইংরেজি পত্র দেখিয়া বিস্মিত এবং সন্তুষ্ট না হইয়া তাহাদের সমক্ষে সেই পত্র পড়িতে এবং ব্যাখ্যা করিতে তাহাকেই বলিবে, এবং সে তাহা পারিবে না।

তাহা সে পারিল না দেখিয়া বন্ধুরা জানিতে চাহিয়াছিল,—কি বলেছিলি শ্বশুরবাড়িতে?

কিসের কথা?

—ইংরেজি জানার কথা।

—কিছুই বলিনি।

—তবে ভদ্দর লোক এব্যাপার করলেন কেন?

—তা তিনিই জানেন।

—তবে ফেরত পাঠিয়ে দে এ-চিঠি তাঁর কাছে; আর, লিখে দে—"গোটা গোটা অক্ষরে বাংলা করে পাঠাও"—

ঐটুকু শুনিয়াই এবং বাকি বক্তব্য না শুনিয়াই অমৃত শ্যালকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, এবং কৃতবিদ্য আপনার লোক বলিয়াও শ্যালকের প্রতি তার মার্জনার ভাব এখন পর্যন্ত নাই।

মায়ার সঙ্গে উগ্রতর বা কালোপযোগী কথা তার বিশেষ কিছু হয় নাই; সুতরাং গণপতির উপর রাগ করিয়া গণপতির ভগিনীকে ইংরেজি জানার কথাটা সে জোরের সঙ্গেই জানাইয়া দিয়া মন হাল্কা করিল।

তারপর খানিক হুশ-হুশ করিয়া সিগারেট টানিয়া অমৃত অনতিপুরাতন স্মৃতির ভাণ্ডার হইতে এবার অন্য কথা আনিয়া ফেলিল; কথাটা সুখদ; কাজেই এবার সে হাসিল, আর বলিল,—বাসর-ঘরে তোমার ঠিক বাঁ পাশেই যে-মেয়েটি বসেছিল সে কে?

খবর হিসাবে মায়া বলিল,—আমার সই।

উৎফুল্ল কণ্ঠে অমৃত বলিল,—তা হলে ত' আমারও সই! সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে বুঝি?

—হ্যাঁ।

মায়া বুঝিল না, কিন্তু সইয়ের যার সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে ঈর্ষা-পরবশ হইয়া অমৃত তাহারই উদ্দেশ্যে বলিল,—শালা।...বলিয়া একটু হাসিল—তারপর জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার বড় না ছোট?

—সে আর আমি দু'মাসের ছোট-বড়। সে-ই বড়।

অমৃত আর প্রশ্ন করিল না; বলিল,—বেশ চোখ দুটি।

ইন্দিরার চোখ দু'টি বাস্তবিকই ভাল।

গল্পচ্ছলে বা প্রশংসাচ্ছলে ভাল চোখকে ভালো বলা অবৈধ না-ও হইতে পারে—সে চোখ পরস্ত্রীর হইলেও। কিন্তু অমৃতানন্দের কণ্ঠস্বরে কি যেন ছিল, মায়ার চোখ তাহাতেই সজল হইয়া উঠিতে চাহিল। মায়া স্বামীর মুখ দেখিতে পায় নাই, কল্পনায় পরস্ত্রীর দেহ ঘনিষ্ঠতার সহিত স্পর্শ করিতে থাকিলে মুখের চেহারা কেমন হয় তাহা মায়ার চোখে পড়িল না; কিন্তু যে-সুরে চোখের প্রশংসা উচ্চারিত হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট—সে-সুরে যেন প্রাণ আছে, আর, সে প্রাণ তৃষ্ণাতুর...

মায়ার প্রাণ কেমন করিতে লাগিল তাহা সে-ই জানে—কথা কহিবার সামর্থ্য তার রহিল না।

উত্তর যে পায় নাই তাহা অমৃতের মনেও হয় না—সে বিভোর হইয়া ভাবে সেই মেয়েটির কথা—হাসি-কৌতুকে ঝলমল, আর, চমৎকার তার চক্ষু দু'টি। মায়ার বর্ণ উজ্জ্বল বেশী, তাহাতে অসাধারণত্ব কিছু আছে বলিয়া অমৃতের মনে হয় না; কিন্তু ইন্দিরার চক্ষু দু'টি অতি কোমল, ঢলঢল · এমন অসাধারণ যে, এই শহরে কই, তেমনটি ত' দেখা যায় না। অমৃতের ক্ষোভ জন্মে। এ, অর্থাৎ মায়া ত' আছেই, কিন্তু সে কেন একেবারেই পরের হইয়া গেল! অমৃতের জীবনে বিতৃষ্ণা ধরিয়া যায়, মনে হয়, তাহাকে এখনই যদি কেহ জবাই করে তবে দুঃখ নাই।

—রাত্তিরে কি গল্প হ'ল বউয়ের সঙ্গে বল্।—বলিয়া সুধীর, সত্যেন, ইত্যাদি সবাই অমৃতকে ধরিয়া বসে।

অমৃত ভ্রূভঙ্গী করে, বলে,—কথার জবাবই পাইনে তা গল্প কি করব।

সুধীর হাসিয়া বলে,—কি কথার জবাব পাসনি?

অমৃত তখন সেই মেয়েটির কথা বলে—যে তার স্ত্রীর সই, আর যার নাম ইন্দিরা, আর যার চোখের কথা ভোলা যাইতেছে না···অমৃত তার মনের কথা এমন করিয়া লালসা দিয়া ফলাইয়া গাল ভরিয়া বলে যেন মায়ার সঙ্গে বিবাহ না হইয়া সেই মেয়েটির সঙ্গে হইলেই আক্ষেপের কিছু থাকিত না এবং আরো যা ইঙ্গিত করে তা না বলাই উচিত ·

শুনিয়া সত্যেন বলে, পাঁঠা।

—কেন, কেন, পাঁঠা বলছ কেন?

বুদ্ধিতে আর আদিরসে। ওরে নির্বোধ, ওদের প্রাণে কি ও-কথা সয়! তুই ও-কথা তুললি কেমন করে?

—ক্ষমতা থাকলেই পারা যায়। বলিয়া অমৃত এমন শক্তিশালী ভাব ধারণ করে যেন গ্রাহ্য করিবার মতো বিরুদ্ধ পক্ষ সংসারে নাই।

কিন্তু অমৃত একেবারে তাজ্জব হইয়া গেল, তার পরদিনই; ঘুণাক্ষরেও সে ভাবে নাই যে, তাহার কেবল ঐ কথাটাতেই সমগ্র পাড়াটা দু'বাহু তুলিয়া একেবারে নাচিয়া উঠিবে।

অমৃতের বন্ধু সুধীরও নব-বিবাহিত; নব এই হিসাবে যে, বিবাহ করা উচিত হইয়াছে কি না এ-প্রশ্ন এখনো তার মনে ওঠে নাই; আর, সে অপরের চোখে এমন কিছু দেখে নাই যে, স্ত্রীকে সরাইয়া দিয়া অপরূপনয়নাকে সম্মুখে বসাইয়া রাখিবে। অমৃত স্ত্রী পাইয়াছে অদ্বিতীয়া সুন্দরী; তদুপরি চোখের দরুন স্ত্রীর সইকে ফাউস্বরূপে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা অমৃতের পক্ষে বাতুলতা না হোক্, মানুষের পক্ষে গল্পের বিষয় বটে।

সুধীর বলিল,—আমাদের বন্ধুটি বড় রসিক লোক!

—কার কথা বলছ?

—অমৃতর কথা। বাসর-ঘরে তার স্ত্রীর সইকে সে দেখে এসেছে। বলিয়া সুধীর হাসিল।

দেখাতেই যে কাহিনী শেষ হইয়া যায় নাই অম্বা তাহা বুঝিল; বলিল,—বলছিলেন না কি?

—হ্যাঁ।

—তার পর?

—তার পর আর কি। মন পড়ে আছে সেখানে। অমৃত মন খুইয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে।

এই কথারই প্রতিধ্বনি লইয়া সুধীরের স্ত্রী অম্বা আসিল মায়ার কাছে—

কানে কানে জিজ্ঞাসা করিল, সইটা কে, ভাই?

প্রশ্নটা শুধুই কৌতুক—

কিন্তু মায়া চমকিয়া মুখ টানিয়া লইল। অম্বার ঐ তরল প্রশ্নে অনাবশ্যক কৌতূহল, অর্থাৎ অনধিকারের অপরাধ হয়তো ছিল; কিন্তু সেটা তেমন মর্মান্তিক নয়; মর্মান্তিক অবস্থায় ছিল মায়ার মন; তার মন পূর্ব হইতেই ঐ সম্পর্কে বেদনায় ভারাক্রান্ত ছিল বলিয়াই কৌতুকটা সে সহ্য করিতে পারিল না।...কথাটা রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে—পরিহাস কৌতূহল হাসি-টিটকারির সৃষ্টি করিয়াছে; এ-সব চিন্তা কঠিনই বটে; আর, কঠিনতর কথা ইহাই যে, তার সইয়ের কথা বলিয়া বেড়াইয়াছেন তার স্বামী নিজে—স্ত্রীর সইয়ের প্রতি লুব্ধতায় কুৎসিত উক্তি করিয়া আপন স্ত্রীকেই তিনি অপমান করিয়াছেন...

তার উপর, এই কথার সঙ্গে সে এমন ভাবে বিজড়িত যেন তাহাকে অধঃস্থলে নামাইয়া দিয়া স্বামী তাহাকে লাঞ্ছিত করিতেই চান—

মায়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল—

এবং সঙ্কট তৎক্ষণাৎ গুরুতর হইয়া উঠিল এই কারণে যে, মায়ার এই অশ্রু-সঙ্কটের সময় শাশুড়ী কল্যাণী ঘটনাস্থলে আসিয়া দেখা দিলেন, এবং জানিতে চাহিলেন, বধূর এই অশ্রুপাতের কারণ কি?

জানিতে চাহিয়া তিনি অম্বাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন—

অম্বা থতমত খাইয়া প্রথমে কিছুই বলিতে পারিল না, কিন্তু কল্যাণী তাহাকে ছাড়িলেন না, এবং তাঁহারই তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর প্রশ্নমালার উত্তর-পরম্পরায় অম্বা সমুদয় কাহিনী উদ্ঘাটিত করিয়া দিল...

শুনিয়া কল্যাণীর ধৈর্যচ্যুতি এবং কণ্ঠনিনাদ একই সঙ্গে না ধ্বনিয়া পারে নাই; অবশ্য অম্বাকে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি কিছু বলিলেন না; সাধারণ ভাবে জানিতে চাহিলেন, পাড়ার বউ-ঝিদের পরের ব্যথায় এই মাথা টিপ্‌টিপ্ কিসের জন্য? নিজের নিজের কর্ম লইয়া স্ব স্ব স্থানে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করাই কি তাহাদের কর্তব্য নহে? এবং তাহার ব্যতিক্রম কি অতিশয় ঘৃণ্য নির্লজ্জতা নহে?

এমনি আরও কত প্রশ্ন কল্যাণী করিলেন; কিন্তু তার একটিরও সদুত্তর না থাকায় অম্বা চুপ করিয়া রহিল; এবং সুবিধা বুঝিয়া যখন সে গাত্রোত্থান করিল, তখন মায়া লজ্জার উপর লজ্জা পাইয়া মুখ তুলিতে পারিতেছে না;

আর পুত্রবধূর সমক্ষে নিজের স্বরূপ উন্মোচিত করিতেছে দেখিয়া কল্যাণীর মনস্তাপের অন্ত নাই।

পরমা সুন্দরী নূতন একটি বউয়ের বল্লভ হিসাবে অমৃত মানুষের কিছু মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল—স্ত্রী-পুরুষ অনেকেরই; সেই নূতন বউ নির্যাতিতা হইয়াছে শুনিয়া অনুকম্পা বশতঃ প্রবীণা প্রতিবেশিনী কেহ কেহ দেখা করিতে আসিলেন—

হরিপ্রিয়া আসিলেন; কল্যাণীকে খুব গোপনে কাছে ডাকিয়া বলিলেন,—কথাটা বলতেও পারি নে, না বলেও পারি নে; সত্যি কি মিথ্যে তা ঈশ্বর জানেন। শুনলাম, ছেলে না কি বাসর-ঘরে কাকে দেখে ভালবেসেছে?—বলিতে বলিতে হরিপ্রিয়ার মুখমণ্ডল দুর্ভাবনায় কালো হইয়া উঠিল।

কল্যাণী বলিলেন,—তোমার সে-কথায় কাজ কি দিদি? আর, ছেলে কাকে ভালবেসেছে তা-ই বা তুমি জানলে কি করে! বউকে সে শুধিয়েছিল তার সইয়ের কথা।

অমৃতকে না চেনে এমন মানুষ এ-দিকে নাই সুতরাং হরিপ্রিয়া মনে মনে হাসিয়া তৎক্ষণাৎ সে-কথায় সায় দিলেন; বলিলেন,—আমিও ত' তা-ই বলি। অমৃত ত' তেমন ছেলে নয়! কিন্তু লোকে যে বড়ো বলছে, বোন; বড়ো কুৎসো করছে!

—করলে কি আর করব বলো? তুমিও ত' লোকেরই এক জন! অমৃত তেমন ছেলে নয় যদি জানো তবে করুক না লোকে কুৎসো, তুমি চুপ করে থাকলেই পারতে।

হরিপ্রিয়াকে ঐ ভাবে বিদায় করা হইল। সন্ধ্যার পর আসিলেন কাত্যায়নী। তাঁহাকেও কল্যাণী ঐ ভাবেই বিদায় করিলেন, আর, ছটফট করিতে লাগিলেন—

ছেলে তাঁদের বুকেই বাস করে; তাকে তাঁরা জানেন; তাহাকে স্মরণ করিয়া তাঁহারা শোকাশ্রু মোচন করিয়াছেন—তাহাকে সৎপথে আনিতে তাহার বিবাহ দিয়াছেন; কিন্তু এমন করিয়া চারি দিক আঁধার করিয়া সে যেন আগে কখনো কষ্টদায়ক হইয়া ওঠে নাই। মাতৃ-হৃদয়কে সন্তান আচ্ছন্ন করিয়াই থাকে—স্বচ্ছ উজ্জ্বল অমৃতময় সে অনুভূতি; প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম দান, অনুভব করিতেই হইবে। কিন্তু আজ সে যেন নিশ্বাসে উদ্‌গীরিত বিষে দৃষ্টিকে অন্ধ, আর অন্তরের সমস্ত মুখরতা ও তন্ময়তাকে নিরোধ করিয়া অস্বাভাবিক জড়বস্তুর মতো চাপিয়া বসিয়াছে…

তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। তিনি জননী—তাঁর তা নাই; কিন্তু বধূটি! ছেলেকে বধূ চিনিয়া ফেলিলে কি দশা তার আর এই সংসারের হইবে, এবং কেমন করিয়া তাহাকে নিরাপদে অন্তরালে রাখিবেন, এ চিন্তায় বিবাহের পূর্বেই তাঁর অন্তর নিয়ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে

কিন্তু আজ আর ঢাকিবার কিছু বোধ হয় নাই—

কল্যাণীর চোখে জল আসিল।

বধূর জীবনের এই সবে ঊষা—হৃৎকমল স্ফুটনোন্মুখ; জীবনের যত হর্ষ, আলো, মধু সবই এখন অনাগতের গর্ভে লুক্কাইত। কিন্তু যে একটি পরম শুভ

মুহূর্তে আত্মসমর্পণের পূর্ণতায়, সমগ্রতায়, আর রসপ্রবাহে প্রাণ তার নিজস্ব লোকে বিকশিত হইয়া ওঠে, সেই মুহূর্তকে ধরা দিতে আসিয়াই পলায়ন করিয়াছে, যাহার উপর চিরসুন্দর আর চির-তন্ময় সুখের সৌধ গঠিত হইয়া ওঠে, সেই মুহূর্তটি সেই জিনিস ; কিন্তু সেই অমূল্য অমর মুহূর্তটির সশঙ্ক সচকিত পলায়নের নিরাশ্বাস বেদনার একটি পিণ্ড বধূর বুকের চারি প্রান্ত জুড়িয়া বসিয়াছে···এই পরম সত্যটি সর্বান্তঃকরণ দিয়া কল্যাণী অনুভব করিতে লাগিলেন —তাঁর নারী-হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

কিন্তু আরো ব্যাপার ঘটিল আরো পরে। হরিপ্রিয়া, কাত্যায়নী প্রভৃতি কল্যাণীর সঙ্গে দেখা করিয়া যাওয়ার পর মূল কথাটা ক্রমশঃ অধিকতর পল্লবিত এবং পত্রোল্লাসে অধিকতর রম্য হইয়া রটিতে রটিতে এই রূপের কমনীয় আকার ধারণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গেল।

অমৃত বাসর-ঘরে পরের মেয়ের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল ; তাহার ফলে সে প্রহার খাইতই, কিন্তু নিতান্তই বাসর-ঘরের জামাই, আর, সেই মেয়ের বাবা তার শ্বশুরের বিশেষ বন্ধু বলিয়াই বাঁচিয়া গেছে। সেই মেয়েটির ধারালো নখের দাগ অমৃতের ডান হাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে—ইত্যাদি।

অক্ষয়ানন্দ ঘটনা অস্বীকার করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া উঠিলেন ; তাঁর দুঃখেরও অবধি রহিল না ; কিন্তু অমৃতের সবই বিপরীত ; গ্লানিকর এ অবস্থায় অপর লোকের বোধ হয় মাথা হেঁট হইয়া যাইত - কিন্তু অমৃতের পুলক স্ফূর্তি দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল—

বলে, "এই দেখ তার কামড়ের দাগ"—বলিয়া সে-কালের একটা কাটা দাগ মানুষকে ডাকিয়া দেখায়, আর দাঁত মেলিয়া হা হা করিয়া হাসে।

পাড়ার বনেদি ঠানদিকেও দাগটা সে দেখাইল—

ঠানদি বলিলেন, দূর শালা বেহায়া।

অমৃত বলিল,—তুমি তো বেটাছেলে নও ; বেহায়াপনার মজা তুমি বুঝবে কি?—বলিয়া চোখ ঠারিল. যেন অতীত হইতে বর্তমান পর্যন্ত যাবতীয় বেহায়াপনার গৌরব তার অদৃষ্টের হিসাবের খাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে ; আর, ভবিষ্যতের কাছেও এই গৌরবের সমর্থন তার প্রাপ্য।

খাটে বসিয়া পা দুলাইতে দুলাইতে অমৃত বলিল,—একটা পান দাও দিকি। তুমি পান সাজো বেশ।

মায়া তখন পানই সাজিতেছিল—মাথা হেঁট করিয়া তখনই সে পানের দিকে তাকাইয়া সদ্যসাজা পানে একটি লবঙ্গ গুঁজিয়া দিল।—একটি রৌদ্ররেখা ঊর্ধ্বের ক্ষুদ্র একটি ছিদ্রপথে অবতরণ করিয়া মায়ার কানের দুলের উপর পড়িয়াছে ; দুলের মৃদু মৃদু আন্দোলনে অপরূপ রৌদ্রদ্যুতি মুহুর্মুহুঃ ছিটকাইয়া চলিয়াছে···

অমৃত বলিল,—চমৎকার! দাও একটা পান।

মায়া খিলিটি হাতে করিয়া উঠিয়া আসিয়া অমৃতের হাতে দিল ; খপ-করিয়া খিলিটি গালে পুরিয়া অমৃত বলিল,—শুনছ সব লোকের কথা?

নূতন বউয়ের সর্বদাই ভয়, পাছে লোকে কিছু বলে ; মনে মনে সে চমকাইয়া

উঠিল ; কিন্তু পরক্ষণেই প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, লোকের কথা তাহার সম্পর্কে নয়।

অমৃত বলিতে লাগিল,—তোমার সইকে না কি আমি বেইজ্জত করে এসেছি—লোকে তা-ই বলছে। হি হি হি…

অমৃত মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া হি হি করিয়া অকাতরে অনর্গল হাসিতে লাগিল ; মায়া তার নিবিড়কৃষ্ণ চক্ষু দু'টি মেলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—অপার লজ্জায় আর বেদনায় উদভ্রান্ত হইয়া সম্বিৎ তার স্বামীকে এবং তার নিজেকেও অতিক্রম করিয়া কোন শূন্যে নিরুদ্দেশ হইল তাহা কেউ জানে না ··

অমৃত বলিতে শুরু করিল,—মাইরি, লোকের আক্কেল দেখ! বিয়ের রেতে—

কিন্তু হঠাৎ বাধা পাইয়া তাহাকে কথা বন্ধ করিতে হইল ; মায়া বসিয়া পড়িয়া দুহাত দিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—চুপ করো, তোমার পায়ে ধরছি।—বলিয়া মায়া যখন কাঁদিয়া ফেলিল তখনও অমৃত হাসিতেছে। তাহার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই নিছক হাসি-মস্করা তামাশার কথা— কথাটার শেল কোথায় তাহা তার জানা নাই।

কল্যাণীর অনুমান ঠিক—মায়ার হৃদয় নিরাশ্বাসে বেদনায় পূর্ণ হইয়া গেছে ; কিন্তু সেই বেদনার বশেও যে-কথাটা তার মনে হয় নাই তা মনে হইল সেই দিনই সন্ধ্যার পর।

কল্যাণী রাত্রের রান্না চাপাইয়াছেন ; মায়াকে তিনি কাছে ডাকিয়া লইয়াছেন, সে তাঁর হাতের কাছে বসিয়া 'মাল-মসলা' যোগাইয়া দিতেছে।

—আর একটু নুন দিই? ধনে-বাঁটা এইটুকুতেই হবে?—ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া কল্যাণী মায়াকে প্রকারান্তরে শিক্ষা দিতেছেন—

এমন সময় উঠান হইতে কে যেন ডাকিল, মা?

অপরিচিত নারী-কণ্ঠের ডাক শুনিয়া কল্যাণী উনানের জ্বাল কমাইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। চাঁদের অল্প আলোকে আবছায়া মূর্তি'টি দাঁড়াইয়াছিল।

কল্যাণী তাহাকে প্রশ্ন করিলেন,—কে তুমি?

মেয়েটি বলিল,—আমায় তোমরা চেন মা, আমি বাগদী-পাড়ার। বলিয়া মেয়েটি আঁচলে চোখ মুছিতে লাগিল।

মায়া আসিয়া শাশুড়ীর পাশে দাঁড়াইয়াছিল—

মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতেই জিজ্ঞাসা করিল,—এ বউটি কে?

কল্যাণী বলিলেন,—আমার বেটার বৌ।

তারপর তিন জনই নিঃশব্দ, অকারণে সময় নষ্ট হইতেছে বলিয়া কল্যাণী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন—তাঁর আঁচ বহিয়া যাইতেছে—

বলিলেন,—খামকা এসে কাঁদতে বসলে—কি হয়েছে তোমার? এখানে কেন?

মেয়েটি বলিল,—আমি আর বাঁচিনে, মা ; আমায় বাঁচাও।

অকস্মাৎ বিভ্রম বিস্ময় দূর হইয়া কল্যাণীর আত্মা ধড়ফড় করিয়া উঠিল ;

যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল—তাহারই খর আলোকে তিনি সব দেখিলেন ; কি কারণে মেয়েটি এমন অসময়ে, এবং এত বাড়ি থাকিতে কেন তাঁহারই বাড়িতে কাঁদিয়া পড়িয়াছে তাহা জানিতে তাঁর বিন্দুমাত্র ভুল হইল না। বুঝিতে পারিয়াই তিনি মায়াকে একবার চোখের কোণে লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ অতিশয় ক্রোধের অভিনয় করিলেন ; চিৎকার করিয়া বলিলেন,—এ বালাই আমার দুয়োরে মরতে এল কেন ! চলে যা, চলে যা।—বলিয়া তিনি এমন দ্রুতবেগে হাত নাড়িতে লাগিলেন যেন হাতের হাওয়া দিয়াই মেয়েটিকে উড়াইয়া দিতে চান !

এখানে আসাও ভুল হইয়াছে মনে করিয়া মেয়েটি বলিল, "যাই"। বলিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল ; এবং সে ফিরিয়া দাঁড়াইতেই যে কাণ্ডটা চোখের নিমিষে ঘটিয়া গেল, কল্যাণী তাহার জন্য ঘুণাক্ষরেও প্রস্তুত ছিলেন না—মেয়েটিও না ; মায়া ছুটিয়া যাইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল ; বলিল,—তুমি যা বলতে এসেছিলে আমায় বলে যাও।

মেয়েটি অবাক হইয়া মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল…

—বল। বলিয়া মায়া তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

—না। বলিয়াই সেই মেয়েটি উঠানের মাটিতে বসিয়া পড়িয়া এমন করিয়া কাঁদিতে লাগিল যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়াই সে তাহার পরমায়ু নিঃশেষিত করিয়া দিতে চায়…

কল্যাণী প্রাণের দুরন্ত আবেগে মায়াকে প্রাণপণে ডাকিতে লাগিলেন,—বউমা, এস।—এবং এমন জ্বলন্ত ভাবে ভ্রূভঙ্গী করিয়া রহিলেন যেন অস্পষ্ট আলোকেও মায়ার তা চোখে পড়ে, এবং সে ভয় পায়।

কিন্তু তাঁর আশা আর উদ্যম নিষ্ফল হইল ; মৃদু কণ্ঠে মায়া বলিল,—যাই, মা। কথাটা শুনে যাই। আপনার ঢাকতে যাওয়া বৃথা ; আমি বুঝেছি সব, তবু শুনি।

রাগ না করিয়া, না চেঁচাইয়া, কত দৃঢ় অবিচল হওয়া যায়, আর, অন্যকে বিচলিত করা যায়, মায়ার শান্ত কণ্ঠস্বরে তাহারই মুখোমুখি সাক্ষাৎ পাইয়া কল্যাণী সরিয়া দাঁড়াইলেন ; আর, তাঁর ইচ্ছা করিতে লাগিল, বাগদী-পাড়ার যে মেয়েটি 'মা' বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, টুঁটি ছিঁড়িয়া দিয়া তার কথা বলার ক্ষমতাই নষ্ট করিয়া দেন।

তার পর উঠানে বসিয়া ভুবন মায়ার কাছে সব কথাই বলিল—নিজের জন্ম-কলঙ্কটা পর্যন্ত সে গোপন করিল না ; ঐ কলঙ্কটাই অত্যাচারের সুযোগ দিয়াছে—

এবং অন্যান্য সব কথাই সে বলিল…

তাহাদের পাড়ায় গিয়া অমৃতের আচরণ, তার কতগুলি প্রেয়সী সেখানে আছে ; তার প্রতি অমৃতের লোভ ; খঞ্জ অকর্মণ্য স্বামীর অগাধ নির্লিপ্ততা ; তার প্রত্যাখ্যান ; তারপর পাড়ারই মেয়েদের ষড়যন্ত্রে তাহাকে কৌশলে ঘরে আবদ্ধ করা ; অমৃতের আগমন ; অমৃতকে মারিয়া ধরিয়া তাহার পলায়ন—এবং তার পর অভিযোগ লইয়া এখানে আসা—

ভুবনের একান্ত সন্নিকটে আর একবারে সম্মুখে বসিয়া আর নির্নিমেষ চক্ষে

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মায়া সব শুনিল ; কল্যাণী অদূরে দাঁড়াইয়া বোধ হয় কতক শুনিলেন, কতক শুনিলেন না।

মায়া তার পরও বসিয়াই রহিল।

কল্যাণী নিঃশব্দে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, কাঠের জ্বাল জল হইয়া গেছে।

ভুবন বলিল,—এখন আসি। তুমি কানে শুনলে, বউ?—বলিয়া মায়ার রক্তহীন বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সে-ও কিছুক্ষণ আবিষ্টের মতো অবশ হইয়া রহিল...

মায়া বলিল,—শুনলাম ভালই হল। আচ্ছা এস এখন।

ভুবন চলিয়া গেল।

কল্যাণী রান্নাঘরের ভিতর হইতে গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করিলেন,—বউমা চান করো। বাগদী-মাগীকে ছুঁয়েচ।

মায়া বলিল,—"করি।"—তারপর তার মনে হইল বলে, জননি, কত বার কত জলে স্নান করিলে তোমার পুত্র শুচি হইতে পারে? কিন্তু বলিল না; বলিল না ঘৃণা করিয়া, বাক্যব্যয়ের অরুচিতে।

ইহার পর বাড়ির আবহাওয়া থমথম করিতে লাগিল; এবং সাংঘাতিক ব্যাপার যা ঘটিল তাহা এই যে, বলির পরই জীবটির মুণ্ড আর দেহ যেমন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এই পরিবারের ভিতর হইতে ঠিক তেমনি ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া মায়া যাইয়া শয্যায় আশ্রয় লইল; কল্যাণী ক্ষণে ক্ষণে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই স্বরচিত অন্ধকারে যেন নিজেকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

অক্ষয়ানন্দ পশ্চাৎ বিবরণ জ্ঞাত হইয়া অনেকখানি বাতাস টানিয়া লইয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন মাত্র।

ভুবন নালিশ করিতে তাদের বাড়িতে গিয়াছে শুনিয়া সে-রাত্রে অমৃত বাড়ি আসিল না, অবশ্য বাড়ির কাহারো ভয়ে নহে, বাড়ি বলিয়া সুখের বিঘ্ন রহিয়াছে এই রাগে। তার পরের দিনেও তার পাত্তা পাওয়া গেল না—

তৃতীয় দিনে যখন সে দেখা দিল তখন ব্যাপার কতক চুকিয়া গেছে, অর্থাৎ মায়া তখন পিত্রালয়ে। পুরা দুটি দিন মায়া জলস্পর্শ করে নাই; প্রাণী একটা অনাহারে সম্মুখেই শেষ হয় দেখিয়া অক্ষয় তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

অমৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিল,—বাপ্‌স! রাগ কি!

অসহায় মনের ঘূর্ণিত অবস্থায় অক্ষয়ানন্দ বধূকেই দোষী করিলেন—তাঁহাকে নিদারুণ অপদস্থ এবং লোকসমক্ষে হেয় সে করিয়াছে। বধূর জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত না হইয়া তাহাকে তাহার বাপের বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন, তখন তাহাকে আপদ মনে করিতে তাঁর বাধিল না। নিজেই গরজ করিয়া তাড়াতাড়ি মায়াকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, মায়াই তাঁহাদের যেন পায়ে ঠেলিয়া গেল; অন্নজল গ্রহণ বিষয়ে শ্বশুর, শাশুড়ী এবং প্রতিবেশিগণের প্রবোধ ও সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করার মধ্যে তিনি বধূর অপরিসীম যথেচ্ছাচারিতা এবং স্পর্ধা দেখিতে

পাইলেন, তাঁহাদের প্রতিও বধূর অশ্রদ্ধা এবং তাঁহাদের মানহানি করিবার ক্লেশজনক প্রবণতাও লক্ষিত হইল—

কেলেংকারী করিয়া সে গেছে—একটু সহ্য করিয়া থাকিলে তাঁর মুখ রক্ষা হইত…

অক্ষয়ানন্দ ক্রুদ্ধ হইলেন ; কিন্তু কল্যাণী তা হইলেন না—বধূটির স্মৃতি তাঁর মনের আকাশ প্লাবিত করিয়া বড় উজ্জ্বল হইয়া আছে…তার আচরণে তিলমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি কি বিকৃত ভাব কোন দিন তিনি পান নাই, পদে পদে পরিচয় পাইয়াছেন অতিশয় ভদ্র শ্লীল কোমল একটি অন্তরের, ভুলচুক দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা অপরাধ নয় ; অস্পষ্টতা, মনে মুখে দুই কখনো দেখেন নাই ; বাধা তিনি পান নাই—বধূর বধূত্বে নিরাশ তিনি হন নাই…মনে মনে সহস্র বার চমকিয়া তিনি দাঁতে জিব কাটিয়াছেন ; ছেলের স্বরূপটি বধূর চোখের আড়ালে রাখিবার চেষ্টায় তাঁর অহোরাত্র বিশ্রাম ছিল না, মন অনুক্ষণ টনটন্ করিত ; সে ক্লেশ অল্প নয়, ভুলিবার নয়।…কল্যাণী ইহাও উপলব্ধি করেন যে, তাঁর নারীত্ব কেবল পাতিব্রত্য রক্ষা করিয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই, চিরকাল একটা সম্মান চাহিয়া ফিরিয়াছে—নির্ম্মলতার সম্মান, স্বাতন্ত্র্যের সম্মান, যাহা ভেলকি নয়, ভাল নয় ; ভীতি লালসা লোভ ধর্ম্ম কাল অনুগ্রহ নিন্দা প্রশংসা নিরপেক্ষ সম্মান—সম্মানের প্রতি সমানের সম্মান—মাধুর্যময় রসমূর্তির প্রতি রসিকের সম্মান…

কিন্তু এই বধূ মায়া বড় অসম্মানিত হইয়া গেছে—খুবই আঘাত সে পাইয়াছে।

কিছু দিন পরে ঘটনার আবর্ত নিস্তেজ হইয়া গেলে অক্ষয়ানন্দের এক দিন মনে হইল, পুত্রের পিতা হিসাবে তিনি যতটা অসহায়, বধূর কাছে ঠিক ততটাই অপরাধী। তাঁর আরো মনে হইতে লাগিল, বধূ তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া যত দিন দূরে দূরে থাকিবে, তাঁহার অপরাধের মাত্রা তত বাড়িবে। বধূকে তিনি স্নেহ করেন, ইহাও মিথ্যা নয়।

সুতরাং তাহাকে আনিতে তিনি রওনা হইয়া গেলেন ; কল্যাণী বাধা দিলেন না। মায়াকে তিনি চিনিয়াছিলেন—ডাক দিলেই আসিবার মেয়ে সে নয়। আত্মপ্রীতি বেশি থাকিলে তিনি বোধ হয় অভিমান করিতেন ; কিন্তু বধূকে পুরুষের স্ত্রী হিসাবে তিনি নিজের স্থান-মর্যাদা বাহিরে আনিয়া স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারিলেন না—পুরুষের স্ত্রী হিসাবে প্রত্যেক নারীর যে সংস্থাপন ঘটে তাহা একই—সর্ব ক্ষেত্রেই তাহা একই নিয়মের অধীন।

বৈবাহিক রসিকলাল অক্ষয়ের বাল্যবন্ধু, সে একটা মস্ত সুবিধা ; তার সম্মুখে অতিরিক্ত চক্ষু-লজ্জা পাইতে হইবে না বলিয়াই অক্ষয়ের মনে হইল ; কিন্তু যাইতেছেন বলিয়া সংবাদ তিনি দেন নাই, কারণ, রসিক উৎকৃষ্ট নিরীহ ব্যক্তি হইলেও ক্রূরস্বভাব পরামর্শদাতার অভাব নাই।' বাল্যবন্ধু বলিয়াই রসিক বিবাহের পূর্বে খোঁজ-খবর লন নাই—ভদ্র-সন্তানের স্বভাব ভদ্রই হইবে, এই বিশ্বাসও তাঁর ছিল…

কিন্তু শিক্ষা পাইয়া তার মেজাজ এখন যেমনই হউক, তাহাকে ঠাণ্ডা করা

যাইতে পারিবে মনে করিয়া অক্ষয় নিজের উপর নির্ভরশীল হইয়া যাত্রা করিলেন।

অভ্যর্থনা যথারীতি লাভ করিয়া অক্ষয় পরিতৃপ্ত হইলেন।

প্রচুর আহারের পর খানিক নিদ্রা উপভোগ করিয়া বৈকালের দিকে অক্ষয় বলিলেন,—চলো বাড়ির ভেতর শুনে আসি। তোমার ত' মতামত কিছুই নেই দেখছি। কাল ১৮ই, দিন ভাল আছে। কালই যেতে চাই।

বৈবাহিকদ্বয়ের মিষ্টালাপ শুনিয়া আর শিষ্টাচার দেখিয়া ইহা বুঝাই যাইতেছে না যে, মাঝখান দিয়া এমন দুঃসহ একটা দুর্যোগ বহিয়া গেছে।

কালই যাইবার কথায় রসিক বলিলেন,—এলে, দু'দিন থাকো।

অক্ষয় রহস্য করিয়া বলিতে পারিতেন, "যে-রকম অমৃতোপম আহারের জুৎ তোমার বাড়িতে, তা'তে দু'দিন কেন দু'মাস থাকতে পারি।" কিন্তু তিনি তা বলিতে পারিলেন না—অনিশ্চয়তার একটা কম্পনশীল আবহাওয়ায় পড়িয়া তিনি সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছেন—মন ভালো লাগিতেছে না—রসিক কেমন যেন নির্লিপ্ত—অবান্তর ঢের কথা বলিয়াছে, কিন্তু মেয়ে-জামাইয়ের কথা তোলেই নাই—

বলিলেন,—সে আর এক যাত্রায়। চলো।

রসিক এবং তাঁর পশ্চাৎ অক্ষয় আসিয়া উঠানে দাঁড়াইলেন—অক্ষয় দু'পা আগাইয়া গেলেন; ডাকিলেন, বউমা, শোনো।

মায়া আসিয়া দাঁড়াইল; তাহার দিকে চাহিয়া অক্ষয় বলিতে লাগিলেন,—বড় আনন্দ পেলাম, মা, তোমাকে দেখে। তুমি চলে আসার পর থেকে আমি আর তোমার শাশুড়ী যে কত কষ্ট পেয়েছি তা ভগবান জানেন। তার পর একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া, অর্থাৎ দুঃখ যে সত্য এবং এখনো যে আছে তাহারই প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া, অক্ষয় বলিলেন,—তার পর ভাবলাম, মায়ের আমার যেমন রূপ, তেমনি গুণ; রাগ করে সে থাকবে ক'দিন। বৌটি আসবেই আবার এই ছেলেটাকে মানুষ করতে···

লঘু স্বরে আদরের ঐ কথাগুলি বলিয়া অক্ষয় আড়ালে যেখানে বেয়ান অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দিকে একবার এবং বেয়াইয়ের মুখের দিকে একবার চাহিলেন। ওদিক অদৃশ্য—এদিকে বেয়াইয়ের মুখে কোনো ভাবই লক্ষণযুক্ত নয়—সে যেন নিঃস্বার্থ তৃতীয় ব্যক্তির মতো বাক্যহীন হইয়া অভিনয় দেখিতেছে···

এই নিরাসক্ত স্তিমিত মতি-গতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া অক্ষয়ের হঠাৎ মনে হইল, তাঁহাকে ভুল বুঝিয়া সবাই পরিত্যাগ করিয়া গেছে; তিনি সম্পূর্ণ নিরুপায়; তাঁর একমাত্র অবলম্বন ঐ মেয়েটি; ওরা পর, বধূ আপনার জন, সে-ই যদি করুণা করে···

রসিক তখন কথা কহিলেন; বলিলেন,—আমাদের বক্তব্য মাত্র এইটুকু যে, মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়াব না। সে যদি যেতে চায় ভালো—যদি না যেতে চায় তা'তেও আমাদের আপত্তি নেই।

কান পাতিয়া অক্ষয় ঐ কথাগুলি শুনিলেন; তারপর হাতের উল্টা দিক

দিয়া অকারণেই কপালটা একবার মুছিয়া লইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে বলিলেন,—বউমা, কালই যাবো।

মায়া বলিল,—আমি যাবো না।

যেন তীরে আসিয়া বুকে বিঁধিল—সে কি?—বলিয়া ঐ দু'টি একাক্ষরিক শব্দে অক্ষয় যে বেদনা আর বিস্ময় নিনাদিত করিয়া তুলিলেন তাহার বর্ণনা নাই।

মায়া বলিল,—তিনি যেদিন ভালো হবেন, সেই দিন এসে আমায় নিয়ে যাবেন, তার পূর্বে নয়। গিয়ে আপনার বাড়ীতে দাসী হ'য়ে থাকব, বউ হ'য়ে নয়।—বলিয়া মায়া বিদায় লইতে গেলে, অথাৎ হেঁট হইয়া পদধূলি লইতে গেলে, অক্ষয় লাফাইয়া পিছাইয়া গেলেন: বলিলেন,—উঁহু।

আর পদধূলি দিতেই তিনি রাজী নন।...

মায়া ধীরে ধীরে যাইয়া ঘরে উঠিয়া গেল; এবং অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রসিকের মমতাই জন্মিল; বলিলেন,—এস।

অক্ষয় চলিতে লাগিলেন, কিন্তু যেন বেহুঁশ অবস্থায়। তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন বলিলে কিছুই বলা হয় না, তিনি আশাহত হইয়াছেন বলিলেও অল্প বলা হয়; তিনি আজন্ম যে সংস্কারটিকে দম্ভের সঙ্গে লালন করিয়া প্রাণের সঙ্গে আর সত্তার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া লইয়াছিলেন সে-ই যেন মুমূর্ষু হইয়া উঠিল; সে-ই যেন তাঁর বুকের ভিতর লুটাইয়া লুটাইয়া রক্তবমন করিতে লাগিল; তিনি যে পুরুষ,—পুত্রের পিতা, বধূর শ্বশুর, স্ত্রীর স্বামী, আর মনুষ্যসমাজে বাস করেন, এই গর্ব-গৌরব আর আনন্দ ধূলিসাৎ হইয়া ত' গেলই—তিনি যে মানুষ এই জ্ঞানটাই অসহ্য উত্তপ্ত একটা নিশ্বাসে পুড়িয়া এক নিমিষে যেন ছাই হইয়া গেল।

উভয়ে গিয়া বৈঠকখানায় বসিলেন। ভৃত্য তামাক দিয়া গেল। অক্ষয় তাহা স্পর্শ করিলেন না।

রসিক বিষণ্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "আমি, ভাই, নিরুপায়!"

অক্ষয় কথা কহিলেন না।—তারপর রসিক তাঁর প্রস্থানের উদ্যোগের দিকে ম্লান চক্ষে চাহিয়া রহিলেন—থাকিতে থাকিতে এক সময় বলিয়া উঠিলেন, "এ-বেলাটা থেকে যাও, ভাই।"

অক্ষয় কেবল বলিলেন,—না।

•

অক্ষয় স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কুটুম্ব গৃহ হইতে অনেকেই প্রত্যাবর্তন করে, এবং অন্যান্য স্থান হইতেও করে; সর্বনাশের পর শ্মশান হইতে প্রত্যাবর্তন করে; সর্বস্ব পরের হাতে তুলিয়া দিয়া আদালত হইতে করে; তবু তারা যেন স্বাভাবিক একটা সীমার বাহিরে যায় না – অপমানের দুয়ারে মনুষ্যত্ব রাখিয়া দিয়া তাহারা প্রত্যাবর্তন করে না—কিন্তু তিনি করিয়াছেন তাই।

অক্ষয় আসিয়া বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন—সেইখানেই তিনি শুইয়া পড়িলেন।

ভৃত্য তাঁর আগমনবার্তা অন্তঃপুরে রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছিল; সে-ই তামাক সাজিয়া আনিয়া খবর দিল,—বাবু, মা ডাকছেন।

—যাই। বলিয়া অক্ষয় উঠিলেন, এবং পা বাড়াইয়াই অনুভব করিলেন, পা চলিতে চাহিতেছে না···

—কি হ'ল?—কল্যাণী অনাবশ্যক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন।···অক্ষয় স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিছুই বলিলেন না এবং তার পরই স্ত্রীকে অতিক্রম করিয়া শয়নকক্ষের দিকে চলিতে লাগিলেন···খানিক দূরে যাইয়া বলিলেন,—বউমা এল না।

কল্যাণী বলিলেন,—আসবে বলে' আমি আশাও করিনি।

অক্ষয় দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—তুমি দেখছি বউয়ের দিকে। কিন্তু আমাকে যে অপমানটা হতে হ'ল তার দাম দেয় কে?

—কার জন্যে হ'তে হল? তোমার ছেলে যে তোমাকে আমাকে উঠতে বসতে অপমান করছে তার দাম চাইবে তুমি কার কাছে?

নিদারুণ অভিমানে অক্ষয় বলিলেন, আমি মরব। বলিয়া তিনি ঘরে উঠিয়া গেলেন।

স্বামীর কুশল-সমাচার লইতে কল্যাণী সেখানে আসিলেন; দেখিলেন, তিনি চেয়ারে বসিয়া আছেন, এবং সত্যই তাঁহাকে ভারী নির্জীব দেখাইতেছে·· জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার শরীর ভাল আছে ত'।

—আছে বই কি।

—কি হ'ল সেখানে?

—পুতুল-নাচ! বউমা বললে "আমি যাবো না।"

—তার বাপ-মা রাজী ছিল?

—জানি নে ঠিক। ছিল বোধ হয়।

—মন খারাপ করে থেক না। বুঝে দেখ সমস্তটা। আমার মন ত' কিছুই খারাপ লাগছে না।

—তুমি বোধ হয় সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রীর অংশ—অল্পে টলো না।—বলিয়া অক্ষয় মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। এই অনাবশ্যক বিদ্রূপে কল্যাণী একটু হাসিলেন মাত্র।

অক্ষয়ের এই দুঃখই সকলের বড় হইয়া উঠিল যে, তাঁহার অন্তরের নিশ্বাসটি কেবল তাঁহারই কাছে যেমন সত্য তেমনি মর্মান্তিক হইয়া রহিল—পৃথিবীর আর কেহই তাহাকে জানিতে চাহিল না, এমন কি স্ত্রীও না।···পুত্রবধূকে তিনি লক্ষ্মীস্বরূপিণী মনে করেন, এ-কথাটি অত্যন্ত জাগ্রত কথা; তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন—এত স্নেহ করেন যে, বউমা মাটিতে পা দেয় এ-ইচ্ছা তাঁর নয়। পুত্রবধূ করিয়া যাহাকে গৃহে আনিবেন, পুত্রকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার একটি আদর্শ তিনি নিজের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন বহু দিন পূর্বেই; মায়াকে পুত্রবধূরূপে পাইয়া এক দিকে তাঁহার কন্যা সন্তানাকাঙ্ক্ষার এবং অন্য দিকে তাঁহার আদর্শের প্রতি লুব্ধতার পরিতৃপ্তি ঘটিয়াছিল—এ-সব কথা তিনি ভাবে আভাসে প্রকাশই করিয়াছেন; তবু কেহই তাঁহাকে বুঝিতে পারে নাই—বধূ পারে নাই, স্ত্রী পারে নাই।

অক্ষয় যন্ত্রণায় ঝিমাইতে লাগিলেন, এবং সকলের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া রহিলেন।

কিন্তু কল্যাণী বুঝিলেন অন্য রকম—বধূ না আসায় দুঃখিত হইবার কারণ তিনি দেখিতে পাইলেন না, বরং একটা নিষ্কৃতির সুখেই তিনি মায়াকে আশীর্বাদ করিলেন। পুত্রকে তিনি বহু পূর্বেই নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন ; সে এমনি যে, পারিবারিক মান-মর্যাদার বিচার এবং রক্ষার চেষ্টা যেন তাহাকে বাদ দিয়াই করিতে হইবে। কল্যাণীর মনে হইল, এ-হিসাবেও বধূ ঠিক কাজই করিয়াছে—আসা তার উচিত হইত না। সে আসিলে তার আসার সঙ্গে সঙ্গেই এমন একটা ইতরতার স্তরে সবাইকে নামিয়া যাইতে হইত যাহার ভিতর হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার সাধ্য কাহারো নাই। তাঁহারা ভদ্র আখ্যার বহির্ভূত হইয়া যান নাই—বধূ তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে ধারণ করিয়া আছে। বধূ তার স্বামীকে, তাঁহাদের পুত্রকে ত্যাগ করিয়াছে—সমাজে অপাংক্তেয় হইবার ভয় তাহাতে নাই ; যদি তাঁহাদিগকে অপাংক্তেয় করিবার বুদ্ধি সমাজের মস্তিষ্কে কখনো জাগ্রত হয় তবে তাহা পুত্রের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়াই হইবে, বধূর ব্যবহারে নয়। অতএব সতী মেয়ে চিরজীবিনী হোক।

বলা বাহুল্য, অক্ষয়ের মর্মবেদনার কথা জানাজানি হইয়া গেছে। বউ আসে নাই, অক্ষয়ের এই দুঃখ অনুকম্পা জ্ঞাপন এবং সুপরামর্শ দান প্রতিবেশীর কর্তব্য, ইহা অনেকেই উপলব্ধি করিলেন, এবং বৈকালের দিকে কয়েক জন দেখা দিলেন।

অক্ষয় কাহারো নিন্দা করিলেন না ; তিনি কেবল আক্ষেপ করিলেন ইহাই বলিয়া যে, মানুষের ইয়ত্তা পাওয়া সত্যই কঠিন ; পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণই তাঁর অদৃষ্টের কঠিনতম দুঃখ, এবং যত বিড়ম্বনার হেতু ; তিনি সত্বরই মারা যাইবেন।

শুনিয়া অনেকেই যা বলিলেন তার সুর আর ভাব একই প্রকার এবং সময়োপযোগী, এবং অবস্থামূলক ব্যবস্থাগত ; কেবল অক্রূর দত্তের ব্যতিক্রম দেখা দিল ; অক্রূর বলিলেন,—তোমার উচিত ছিল এমন ঘরে বিয়ে দেয়া যারা কিছু বোঝে না, অনুভব করে না।—সমান ঘর মানে এ নয় যে, আর্থিক অবস্থা একই রকম—চরিত্রেরও প্রকর্ষগত সামঞ্জস্য থাকা চাই। তোমার ছেলে তোমাকে নামিয়ে এনেছে ঢের। তার বিষয়ে যা শুনি তার সিকিও যদি সত্য হয় তবে তার মারফত কোনো ভদ্র-পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক-স্থাপন দূরের কথা, তাকে অতিথি হিসাবে গ্রহণ করাই কঠিন। বিবাহ স্থির করেছিলে তুমি খুব গোপনে। কথাবার্তার সময় আমি উপস্থিত থাকলে বাধা দিতাম।

শুনিয়া কথাগুলি অক্ষয়ের বড় কঠিন মনে হইল। কথাগুলি দরদের নয়, কিন্তু সত্যে উজ্জ্বল—অক্ষয়ের সহ্য হইল না—তিনি কাতরোক্তি করিলেন : বলিলেন,—আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না।

—তবে ছেলেকে ত্যাগ করো, আর বউয়ের আশা ত্যাগ করো। বৈবাহিকের গৃহে তোমার অপমান হয়েছে যদি মনে হ'য়ে থাকে, তবে তার জন্যে দায়ী করো নিজেকে।—বলিয়া অক্রূর দত্ত উঠিলেন।

অক্ষয় যেন কাহারো সঙ্গে কলহ করিতে উদ্যত হইয়া অন্ধভাবে আর দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—আবার—আবার বিয়ে দেব ছেলের।

মায়ের মৃত্যুর দিনে

কেশবলাল দত্ত ভারি ছটফট করিয়া বেড়াইতেছে।

কেশবলাল একটু ছটফটে স্বভাবের লোকই। দশটার গাড়ি সাড়ে নটায় আসিয়া দশটার পূর্বেই ছাড়িয়া যাইতে পারে, দশটার গাড়িতে কোথাও যাইবার দিন এই আশঙ্কায় সে ছটফট করিবেই। কারণ, রেল-কোম্পানীর পক্ষ হইতে গাড়ির যাতায়াত সম্বন্ধে সুবন্দোবস্তের অভাব আজ কাল খুবই দেখা যাইতেছে। এই অসম্ভব ধারণা কেশবলালের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে—বাড়ির বা বাহিরের কেহ, কোনো ওআকিবহাল ব্যক্তি, তাহার প্রতিবাদ করিলে কেশব সেই ব্যক্তিকে সর্বজ্ঞ বলিয়া বিদ্রূপ করে, আর, রাগে আরো ছটফট করিতে থাকে।

কিন্তু এ গেল সামান্য ব্যাপার—অসময়ে গাড়ি আসিবার এবং তাহাকে না লইয়াই ছাড়িয়া যাইবার সন্দেহটাকে অমূলক প্রতিপন্ন করিবার নিরীহ প্রয়াস মাত্র। কেশবলাল তাহাতে, শুভাকাঙ্ক্ষীদের ঐ কথায়, রাগ করে আর ছটফট করে, কিন্তু বিষাক্ত হইয়া ওঠে না। বিষাক্ত হয় সে তখন যখন সে দেখে, পয়সা কিছু খরচ না করিলে আর চলিতেছে না—কার্যোপলক্ষে অর্থব্যয় যখন অপরিহার্য হইয়া ওঠে। সংসারে পয়সা খরচের ব্যাপারই সব; কাজেই কেশবলালের ছটফটানি থামিতে চাহে না। পয়সা খরচ করিতে হইলেই তাহার মনে হয়, যতটা ন্যায্যতঃ দেয় অযথা তার বেশী লাগিতেছে। দুধের দাম চড়ে নামে, নামিলে সে কথা বলে না; কিন্তু আধ আনা বাড়িলেই যেন কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়া দুগ্ধবতী গাভী, গোপালক, দুগ্ধ বিক্রেতা, এবং যাহাদের জন্য দুগ্ধের প্রয়োজন তাদের সে উচ্চকণ্ঠে এমন ভাষায় গালি দেয় যাহাকে বিশ্রী বলা যাইতে পারে।

চাকর মাহিনা চাহিলে অনেকদিন আগেকার একটা ত্রুটির কথা তুলিয়া সে মারিতে ওঠে—তাহার মনে হয়, ধাপ্পা দিয়া টাকা লইতে আসিয়াছে; বলে, গেল সব—নিলে সব লুটেপুটে।

কেশবলাল অবশ্য সংসার করে, অর্থাৎ তার আছে সবই: স্ত্রী আছে, একটি পুত্র আছে, দুটি কন্যা আছে, আর আছেন মা। বড় কন্যাটির বিবাহ সে দিয়াছে, এবং সে জন্য সে রাগিয়া আছে। কন্যার বিবাহ ব্যাপার সমাধা করিতে নানা কারণে আর নানা ওজুহাতে ফর্দ অনুযায়ী এবং তাহার বাহিরেও যে টাকাটা তাহাকে দিয়া খরচ করানো হইয়াছিল তাহা সবই অপব্যয়, তাহার ভিতর মানুষের কূটবুদ্ধি আর নির্যাতনের অভিসন্ধি ছিল। উৎপীড়নের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সে করে, এবং ইহাও সে বলে যে, অতগুলি টাকা একেবারে জলের মতো খরচ করা কেবল তাহারই দ্বারা সম্ভব; এবং ঘাড়ে ধরিয়া পয়সা খরচ করাইলেও অকাতরে বশ্যতা স্বীকারপূর্বক নিঃশব্দ থাকিতে পারে কেবল সে-ই···

শুনিয়া কেশবলালের স্ত্রী সরোজবাসিনী অল্প অল্প হাসে; কিন্তু কেশবলালের পক্ষে তাহা হাসির কথা মোটেই নয়। কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে,—এই প্রথা প্রচলিত করিয়া যে ব্যক্তি জাত যাওয়ার ভয় দেখাইয়া রাখিয়াছে, সরোজ-

বাসিনীর হাসিতে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কেশবলাল সেই ব্যক্তির উদ্দেশে আরো কটূক্তি প্রয়োগ করে।

তাহার উপর, পণ যে ব্যক্তি লয়, অর্থাৎ কানে ধরিয়া আদায় করে, আর যাহারা বিবাহোপলক্ষে নিমন্ত্রণ খাইয়া ঢেকুর তুলিতে তুলিতে গা দুলাইয়া প্রস্থান করে তাহাদেরও, সেই চক্ষুলজ্জাহীন পরিতৃপ্ত লোকগুলিকে সে গালি দেয়; নাপিত, পুরোহিত, মালাকার, ঢুলি প্রভৃতি নিদারুণ একগুঁয়ে অর্থলোলুপ অবিবেচক ব্যক্তিগণও বাদ যায় না। কি বলিয়া তাদের সে গালি দেয় তাহা না বলাই ভালো। কেশবলালের এ-রাগের নিবৃত্তি দুবৎসরেও হয় নাই।

আর একটি মেয়ে, সুলোচনা, দ্রুতবেগে বড় হইতেছে! রাগ আর সহ্য হয় না বলিয়া কেশবলাল সুলোচনার দিকে তাকায় না।

মাস কাবারে ছেলে ইন্দ্রনাথ ইস্কুলের মাহিনা যখন চাহিয়া বসে তখনও ব্যাপার দাঁড়ায় সাংঘাতিক, কেশবলালের মুখ দিয়া তখন আগুন ছোটে: প্রবঞ্চনাপরায়ণ আর ষড়যন্ত্রকারী ইস্কুল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে এবং বেতনভুক অথচ ফাঁকিবাজ অলস আর নিদ্রালু শিক্ষকগণকে লক্ষ্য করিয়া যে ভাষা সে ব্যবহার করিতে থাকে তাহা তাঁহাদের, সেই বিদ্যোৎসাহী আর জ্ঞানদানব্রতী ভদ্র ব্যক্তিগণের প্রাপ্য নয়। মাহিনার টাকা সে ছেলের হাতে দেয় না, তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দেয়।

কিন্তু ছটফটে কেশবলাল অধুনা ছটফট করিতেছে উল্লিখিত বা তদ্রূপ কোনো কারণে নয়—সদ্যসদ্যই কাহাকেও কিছু দিতে হইতেছে, অর্থাৎ প্রবঞ্চনাপূর্বক কেহ কিছু আদায় করিতেছে, বলিয়া নয়। সাম্প্রতিক কারণ আরো গুরুতর। কেশবলালের মা আজ দিন দশেক সম্পূর্ণ শয্যাশায়িনী; খুবই অসুখ তাঁর; তিনি বাঁচিবেন না; বার্ধক্যবশতঃ তাঁর স্নায়ুমণ্ডলী অসাড় এবং যান্ত্রিকক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। প্রকৃতির গতিরোধ করা যাইবে না, মৃত্যু অনিবার্য; কাজেই চিকিৎসা বিশেষ কিছু হইতেছে না—শুধু বলকারক পথ্য দেওয়া হইতেছে, অবশ্য চিকিৎসকেরই উপদেশে। সাবাড়ে ডাল ভাত মা খাইতেছেন না—সাবাড়ে ডাল ভাতে খরচ কম। তিনি খাইতেছেন ফলের রস; কিন্তু কেশবলালের ছটফটানির হেতু ফলের দরুন অপব্যয় নয়।

আসন্ন মাতৃবিয়োগ একটা বিপদ বটে; মাতৃদায়ও একটা অসুবিধাজনক, অর্থাৎ খরচ-করানো, দায় বটে; কৃপণ এবং ছটফটে লোকের পক্ষে এরূপ দুহাতে খরচের সম্ভাবনা অসহনীয় হইতে পারে; কিন্তু সমগ্র ব্যাপারের সৌন্দর্য এইখানে যে, মায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রাদ্ধাদির কথা সে ভাবিতেছে না; ভোজ খাইয়া যাহারা উদ্গার তুলিতে তুলিতে প্রস্থান করিবে তাহাদের কথাও নয়, পুণ্যের লোভ দেখাইয়া ভিখারীরা লুচি-মিষ্টির দাবি করিবে, আর তা দিতেই হইবে; এবং একাধিক পুরোহিত অনেক মূল্যের জিনিস ঘাড়ে করিয়া প্রস্থান করিবে, ইহা ভাবিয়াও আজ সে বিচলিত নয়; তাহার অস্থিরতার কারণ রহিয়াছে অন্যত্র। সাংসারিক সকল অন্যায় অবিচার

নির্যাতন চাহিদা রীতি প্রয়োজন আর উপলক্ষ অতিক্রম করিয়া সমস্যা দাঁড়াইয়াছে মাত্র একটি।

মা খুব বুড়ো হইয়াছেন; তাঁহার যে বয়স হইয়াছে তাহাতে তাঁহার পক্ষে মৃত্যু মুক্তি ছাড়া কিছু নয়; মায়ের নিজের বাঞ্ছাও অচিরেই সেই মুক্তিলাভ— মৃত্যুকে তিনি আহ্বান করিতেছেন।

কিন্তু অপরিসীম কষ্টের কথা দাঁড়াইয়াছে ইহাই যে তাঁহার ছোট ছেলে রামলালের আজও দেখা নাই—ছোট ছেলে—রামলাল এবং ছোট বউ সুরবালাকে দেখিবার জন্য তাঁহার মাতৃ-হৃদয় ব্যথিত ব্যাকুল হইয়া আছে…

ক্ষণে ক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতেছেন : ওরা এল রে?

যে কাছে তখন থাকে সে-ই জবাব দেয় : না, আসেননি ত'!

মা বলেন : তবে আর এল না; দেখা হ'ল না বুঝি!

কেশবলালের অনুজ রামলাল—মায়ের ছোট ছেলে—পশ্চিমে এক শহরে কাজ করে। সেখানে চিঠি গেছে, পৌত্র ইন্দ্রনাথকে দিয়া মাই-ই লিখাইয়াছেন : দিদিমার খুব অসুখ; বোধ হয় বেশি দিন বাঁচিবেন না। শীঘ্র আসিবেন।

পত্র রামলাল পাইয়াছে; কিন্তু মা কি করিয়া জানিবেন যে, ঐ পত্র পাইয়া রামলাল ছুটি মঞ্জুর করাইবার জন্য কিরূপ অশ্রান্তভাবে আর আকুল হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে; মনিবের কত হাতে পায়ে ধরিতেছে, এবং মায়ের সঙ্গে দেখা হইল না ভাবিয়া কত কাঁদিতেছে! দেখা হইল না ভাবিয়া মায়ের চোখ দিয়াও জল পড়ে।

কেশবলাল পত্র লিখিয়া ভাইকে আসিতে বলিবে না, এ-সন্দেহ মায়ের মনে ছিল কি না তাহা বলা যায় না; তবে এত বড় অবিশ্বাস মা যদি পুত্রকে করিয়া থাকেন তবে সে বড় আপশোসের কথা, এবং সত্যই যদি অবিশ্বাস করিবার কারণ মা পাইয়া থাকেন তবে তাহার অধিক বেদনাজনক কিছু তাঁহার পক্ষে নাই, এবং কেশবলালের পক্ষে তাহা অমার্জনীয় অপরাধ। মা ছেলেকে চেনেন না, এমন অনুচিত কথা কেহই বলিবে না। মা বোধ করি উপরন্তু সেই পত্রখানি লিখাইয়াছিলেন; আশা করিয়াছিলেন, পর পর দু'তিনখানা পত্র পাইলে রামলাল এক মুহূর্তও সেখানে বিলম্ব করিবে না—রওনা হইবে।

কিন্তু রামলালের ছুটি পাইতে দেরি হইতেছে, আর, মায়ের লিখানো পত্রে আর কেশবলালের স্বহস্তে লিখিত পত্রে গরমিল ঘটিয়া গেল। কেশবলাল স্বহস্তে যে পত্র লিখিয়াছে তাহার মর্ম এইরূপ : মায়ের অসুখ হইয়াছে; বেশি কিছু নয়; তবে তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে, এ-যাত্রা তিনি বাঁচিবেন না। তোমার সঙ্গে দেখা হয়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা; কিন্তু আমার মনে হয়, চাকরির অসুবিধা ঘটাইয়া তোমার তাড়াতাড়ি করিবার কিছুমাত্র দরকার নাই। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ যদিই আমরা তাঁহাকে হারাই তবে সেদিনের বিলম্ব আছে। তুমি বিশেষ ব্যস্ত হইবে না। কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন, এ-যাত্রা বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন।

কবিরাজ মহাশয় তাহা বলেন নাই; সুতরাং স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতেছে যে, মৃত্যুর পূর্বে মায়ের সঙ্গে রামলালের দেখা হয়, এ-ইচ্ছা কেশবলালের নয়।

কিন্তু কেশবলালেরও অসুখ অস্বস্তি অনন্ত। ঐ পত্র লিখিয়া ডাকে দিবার পরই তাহার স্বাভাবিক ছটফটানি বাড়িয়া দ্বিগুণ হইয়াছে; কারণ, মানুষের অনুমান করিবার সাধ্যই নাই, অপরে তাহার পত্রের কি অর্থ করিবে। রামলালকে সে একপ্রকার নিশ্চিন্ত থাকিতেই উপদেশ দিয়াছে; কিন্তু সে-ও যদি ছটফট করে। দাদার উপদেশ অমান্য করিয়াই যদি সে তাহা করে! কেশবলাল আজ হঠাৎ অনুভব করিল যে, সব বিষয়েই অতিরিক্ত ছটফটানি আর ছুটাছুটি একটা মহা দোষ—করিতে নাই। কেশবলাল তাই ছটফট না করিয়া স্তিমিত অবয়বে স্ত্রীর এবং কন্যা সুলোচনারও অনুমান অনুসন্ধান করিতেছে এই সাংঘাতিক বিষয়ে যে, মা মরিবার পূর্বেই রামলালের আসিয়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না!

কিন্তু তাহাকে চূড়ান্ত করিয়া নিশ্চিন্ত করিবে কে। সবাই দুলিতেছে…

কেউ বলিল, আছে—

কেউ বলিল, নাই—

আবার যে বলিল, আছে, সে-ই বলিল, নাই, এবং যে বলিল, নাই, সে-ই বলিল, আছে।

সরোজবাসিনী একেবারে শেষ সীমায় পেঁছিয়া বলিল, ভগবানের হাত—তাঁকেই ডাকছি। কিন্তু তাহাতেও মীমাংসা কিছু হইল না—ভগবান ডাক শুনিয়া তাহারই দিকে ঝুঁকিবেন এই ভরসাতেও কেশবলালের প্রাণান্তকর উৎকণ্ঠার কণ্টককাঠিন্য বিন্দুমাত্র ঘুচিল না—শুষ্ক কণ্ঠ সিক্ত হইল না।

"মা আজ কেমন"?—দরদী প্রতিবেশী বিরামবাবু বেলা দশটায় আসিয়া ম্লানকণ্ঠে জানিতে চাহিলেন।

কেশবলাল জানাইল: ভাল তেমন কই? এখন মুহূর্ত গুনছি।—বলিয়া মুখের সমগ্র পরিমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া এমন কাতরতা সে ঘনাইয়া তুলিল যে, সেইদিকে চাহিয়া বিরামবাবুর বুক কাঁপিতে লাগিল; বলিলেন,—বয়সও ত' ঢের হয়েছে।

—হ্যাঁ, প্রায় আশী। বলিয়া দীর্ঘজীবী লোক যে বাড়ির একটা গৌরব তাহা কেশবলাল অনুভব করিল; মুখের পরিমণ্ডলে যে অসম্ভব দুঃসহ কাতরতা ঘনীভূত হইয়াছিল তাহা কমিয়া গেল।

—রামলালের খবর কি? মায়ের খবর দিয়েছ?

কেশবলাল রাগিয়া উঠিল; বলিল—হ্যাঁ, একশোবার। খানতিনেক চিঠি লেখা হয়েছে; টেলিগ্রামও করেছি; কিন্তু, কর্তার দেখা নেই। বলিয়া সে রামলালকে নির্মমতর ব্যক্তি এবং জননীর পরম অকৃতজ্ঞ সন্তানরূপে দাঁড় করাইয়া একটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমক্ষে ভারি রক্তবর্ণ চক্ষে অভিযুক্ত করিল।

বিরামবাবু নিশ্চয়ই জানেন না যে, টেলিগ্রাম করার কথাটা ঘটনাকে মর্মন্তুদ করিবার উদ্দেশ্যে সাজানো হইয়াছে। তিনি অভিযোগ নির্বিবাদে গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার নিজের মর্মকথা প্রকাশ করিলেন একটিমাত্র শব্দ একটা বিশিষ্ট ভঙ্গীর সহিত উচ্চারণ করিয়া; বলিলেন, আশ্চর্য!

বলিতে বলিতে নিকটেই সাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; ও'রা সেইদিকে

দৃষ্টিপাত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিল টেলিগ্রাম-পিয়ন, এবং পরক্ষণেই কেশবলালের হাতে আসিল রামলালের প্রেরিত টেলিগ্রাম।

প্রাপ্তির রসিদ সহি করিয়া দিবার পর খুলিয়া দেখা গেল, বার্তা আসিয়াছে —রামলাল দ্রুত পাঠ্য দুটি শব্দে দাদাকে জানাইয়াছে, রাত্রে পৌঁছিব।

রামলাল আজ রাত্রে পৌঁছিবে···সংবাদের এই মর্মটি বুঝিয়া ফেলিতে কেশবলালের এক মুহূর্তও বিলম্ব হইল না—

বিরামবাবুও ঝুঁকিয়া আসিয়া টেলিগ্রাম পড়িলেন; কিন্তু তিনি ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলেন না যে, প্রচণ্ড হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়া বন্ধু কেশবলাল পাণ্ডুর হইয়া উঠিয়াছে।

তিনি মায়ের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ খুশি হইয়া বলিলেন, আসছে।

কেশবলাল অত্যন্ত তীব্র কণ্ঠে বলিল,—কিন্তু বিলম্বে। দেখা হয় কিনা সন্দেহ। আজ ভোর থেকে বেশ একটু নাভিশ্বাস দেখা দিয়েছে।

ভিতরের কথা বিরামবাবু কিছুই জানেন না—তিনি আরও জানেন না যে, তিনি এখন যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিতেছেন। নাভিশ্বাসের কথা শুনিয়াও তিনি কেশবলালকে ভরসা দিলেন; বলিলেন,—তা উঠুক। নাভিশ্বাস ওঠবার পরও বুড়োমানুষ সাত আটদিন সজ্ঞানে বেঁচে থাকেন, এ দেখা গেছে। জ্ঞান আছে ত'?

জ্ঞান আছে, এবং জ্ঞান আছে বলিয়াই কেশবলালের হৃদয়ে তখন এত দাহ যে, বিরামবাবুকে দু'হাতে ঠেলিয়া তফাতে সরাইয়া দিয়া তাহার লাফাইতে ইচ্ছা হইতেছে—

বলিল,—আছে। সব বুঝতে পারছেন। আচ্ছা, আমি ভিতরে যাই একবার; সবাই ভারি ব্যগ্র হয়ে আছেন।—বলিতে বলিতেই তাহার এতক্ষণের প্রাণপণে দমন করা ছটফটানি দুরন্ত হইয়া দেখা দিল তাহার পায়ে।

কেশবলালের মুমূর্ষু মায়ের জ্ঞান থাকায় দর্শনাকাঙ্ক্ষিনী মা আর দর্শনাকাঙ্ক্ষী রামলালের পক্ষ হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিবার অবসর বিরামবাবু পাইলেন না। ভিতরের সবাইকার ব্যগ্রতার কথায় তিনিও ব্যগ্র হইয়া তাড়াতাড়ি অনুমতি দিলেন, হ্যাঁ, যাও, যাও। ব্যগ্র হয়ে থাকারই ত' কথা। মাকে খবরটা দাও গিয়ে।

—যাই। বলিয়া কেশবলাল তৎক্ষণাৎ ভিতরমুখী হইল—বার্তাবাহী কাগজখানা হাতে করিয়া দ্রুতপদে সে ভিতরে আসিলও; কিন্তু বিরামবাবু যেমনটি বলিয়াছিলেন তেমনটি আদৌ ঘটিল না—কেশবলাল দ্রুতপদে আসিয়া উঠিল মাকে সুখবর দিতে মায়ের শয্যাপার্শ্বে নয়, রান্নাঘরে-দুঃসংবাদ দিতে সে দৌড়াইয়া উঠিল রান্নাঘরে, যেখানে ছিল তাহার সহধর্মিণী সরোজবাসিনী। কেশবলাল হাঁপাইয়া যাইয়া সেখানে পড়িল; বলিল,—টেলিগ্রাম এল। আসছে।

সরোজবাসিনী অন্যমনস্ক ছিল; শব্দগুলি তার কানে গেল, কিন্তু শব্দ-সংযোগের ভঙ্গী আর অর্থগুরুত্ব ষোল আনা হৃদয়ঙ্গম সঙ্গে সঙ্গেই হইল না; উনুনের ধার হইতে উঠিতে উঠিতে সে বলিল,—কে?

কেশবলালের মেজাজ তখন যারপরনাই রুক্ষ; মেজাজের রুক্ষতা মুখ দিয়া

বাহির হইল ; মুখ বিকৃত করিয়া সে বলিল,—ন্যাকা ! কে আবার ? শ্রীমান রাম…

সরোজবাসিনীর অন্যায়ের যেন অন্ত নাই ; পুনশ্চ সে জানিতে চাহিল,—খবর এল ?

—কান থাকে তোমার কোথায় ? বললামই ত' টেলিগ্রাম।

এবার আর গোল ঘটিল না, এবং ধমক খাইয়া ভয়ে নয়, খবর শুনিয়া খবরের গুরুত্বে সরোজবাসিনীর মুখও শুকাইয়া উঠিল। অন্যান্য ক্ষেত্রে মতান্তর যতই থাক, এইরূপ লাভ-লোকসানের ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীর ঐক্য এবং পরস্পরের প্রতি অনুকম্পা অতুলনীয়।

অনূঢ়া কন্যা সুলোচনাও সেখানে ছিল ; কাকা আজ রাত্রেই আসিতেছেন সংবাদে তাহার মুখ শুকাইয়া কেমন হইয়া উঠিল। রামলালের আসার কথায় সবারই যেন একটা চরম দুঃসময় পড়িয়া গেছে।

এই দুঃসময়ে, আর, এই অপরিসীম আর সুবিস্তৃত শুষ্কতার মাঝে কেশবলাল খানিক বিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ চোখ পাকাইয়া বলিয়া উঠিল,—ননসেন্স। বলিয়া ফিরিতে উদ্যত হইল ; বলিল,—মায়ের পেয়ারের নাতিটিকে এ-খবর দিও না যেন। বলিয়া সে কন্যা সুলোচনাকেও সাবধান করিয়া দিলঃ বুঝলি ?

বুঝিয়াছে সবাই—দেয়া যে ক্ষতিকর তা ওরা জানে—অন্তরের লোলুপ চাহিদায় নিজের নিজের সম্বিতে ওরা তা সকাতরে আর পুরামাত্রায় অনুভবই করিতেছে।

কেশবলালের স্ত্রী ও কন্যা সমস্বরে প্রতিশ্রুতি দিল ; বলিল,—না।

কেশবলালের এখন আর সন্দেহ রহিল না যে, দীর্ঘকালব্যাপী মানসিক উদ্যোগ আর উদ্যমের পর একেবারে শেষ করিয়া কাজ নিষ্পত্তির একটা চরম মুহূর্ত সহসা সমুপস্থিত হইয়াছে—অত্যন্ত বেগে সে আসিয়াছে ; অবিসম্বাদিত-ভাবে তাহার নিঃশেষে শেষ এখনই না হইলে সে দম ফাটিয়া মারা যাইবে—এই মুহূর্তটিকে এখনই উত্তীর্ণ করিয়া দিতেই হইবে ·

সুতরাং সমাগত চরম মুহূর্তের ঐ অনুভূতি, আর, সুদৃঢ় একটা সংকল্প লইয়া কেশবলাল রান্নাঘর ত্যাগ করিয়া মায়ের কাছে আসিল ; আসিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল ; দেখিল, মায়ের আর পদার্থ নাই, তিনি শরীরে এখন মৃতই ; কেবল অতিশয় দুর্বল জিহ্বা অতি কষ্টে একটি আধটি শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে ; আর হৃৎপিণ্ডে নিগূঢ় একটু নিঃশ্বাসস্পন্দন এখনো বহিতেছে—অচল যন্ত্রের কি প্রক্রিয়া-কৌশলে এই সজীবতাটুকু এখনো স্ফুট হইয়া আছে তাহা ভাবিতেই আশ্চর্য।

—মা ?

কেশবলাল ডাকিতেই মা এক নিমেষের জন্য চোখ খুলিলেন।

ইন্দ্রনাথ তখন পাহারায় ছিল—

কেশবলাল তাহাকে বলিল,—তুই বাইরে যা খানিক ; আমি বসছি।

ইন্দ্রনাথ উঠিয়া গেল ; কেশবলাল তাহার জায়গায় বসিয়া পড়িল। ভারি

গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব তখন হইয়াছে। বসিয়া কেশবলাল মায়ের ডান হাতখানা অত্যন্ত সন্তর্পণে কোলের উপর হাতের ভিতর তুলিয়া লইল ; এবং ইহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির দরুন অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মিথ্যা উক্তি তাহার মনে সাজিয়া উঠিয়া ভারি উন্মুখ হইয়া উঠিবে। যে চরম মুহূর্ত সম্মুখে সহসা সমুপস্থিত হইয়াছে, এবং যাহা তাহার সম্বিৎকে মুচড়াইয়া পেষণ করিতেছে তাহাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে সেই মিথ্যাগুলি মাকে শুনাইয়া সে উচ্চারণ করিবে—কেশবলাল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে...

ডাকিল, মা ?

—উঁ।

মা তাহার কথা শুনিতে প্রস্তুত।

কেশবলাল মায়ের নির্বাপিত মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—ওরা ত' এল না। তুমি ভারি কষ্ট পেলে, মা। ওরা তোমায় ভারি কষ্ট দিলে।

এ-কথার উত্তর কিছু আসিল না ; মা কি অনুভব করিলেন, কিংবা কিছু করিলেন কিনা, তাহা বুঝা গেল না।

কিন্তু কেশবলালের আকাঙ্ক্ষা নানান দিকে ; জিজ্ঞাসা করিল,—মা, তোমার কি ইচ্ছে হ'চ্ছে ?

মায়ের শেষ-ইচ্ছা পূর্ণ করিতে যথার্থ মাতৃ-ভক্ত ছেলের মতো সে প্রাণপণ করিবে, ইহাই যেন তাহার জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য।

মা কেবল মাথাটা দক্ষিণে বামে ঈষৎ সঞ্চালিত করিলেন ; বুঝা গেল, কোনো ইচ্ছা পূর্ণ করিবার আকাঙ্ক্ষা ঠিক এই মুহূর্তে তাঁহার প্রাণে দুঃসহ হইয়া নাই।

কেশবলাল মায়ের কপালে একবার হাত বুলাইল ; বলিল, রাম আর তার স্ত্রী তোমাকে বড় কষ্ট দিলে, মা ! রাম চিরকালই আমায় বড়ভাই বলে মান্য করেনি ; তোমার একটি দিনের সুখের কথা সে এ-জীবনে একটিবারও ভাবল না। বউমা ত' আমাকে আর বড় বউকে স্পষ্ট অপমানই করেছে বহুবার···

বলিতে বলিতে কেশবলাল হঠাৎ একটা চমক খাইয়া নড়িয়া উঠিল—মায়ের কণ্ঠে স্পষ্ট শব্দিত হইয়াছে : উঁ-হুঁ।

কেশবলালের মুখ খানিক লাল হইয়া রহিল। মুমূর্ষু জননী জীবনের এই দুর্বলতম ক্ষণেও তাহার অভিযোগ এবং হৃদয়গত বেদনা স্পষ্ট উচ্চারিত শব্দদ্বারা অস্বীকার করিবেন, আর, এমন অকপট চাতুর্যের সহিত তাঁহার অপর পুত্রকে অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুর প্রতিপন্ন করিবার তাহার এই প্রয়াস এমন করিয়া পণ্ড হইয়া যাইবে, এ-আশঙ্কা কেশবলাল স্বপ্নেও করে নাই। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খাইয়া সে দেয়ালের দিকে চোখ তুলিল : তাহারই কোন সন্তান দেয়ালে পেন্সিলের দাগ টানিয়া ছবি আঁকিয়াছে। সেই অক্ষমতার দিকে সে মূঢ়ের মতো তাকাইয়া রহিল···

তারপর বলিল,—সত্যই বলছি মা, তারা আমাদের দু'চক্ষে দেখতে পারে না— আমার ছেলে-মেয়েকেও না। পুজোয় কখনো ভালো একখানা কাপড় কাউকে দিয়েছে দেখেছ ?

মা এ-প্রশ্নের জবাব দিলেন না। অনুপস্থিত পুত্রের বিরুদ্ধে তাঁহাকে উত্তেজিত এবং ক্রোধে রক্তচক্ষু করিতে পারা গেছে বলিয়াও মনে করিতে পারা গেল না ; অথচ, কেশবলাল খুব অনুভব করিতে লাগিল, মা কথা বলিতে অক্ষম নন।

"কি বলছ ?"—জানিতে চাহিয়া কেশবলালের স্ত্রী সরোজবাসিনী আসিয়া দাঁড়াইল। এখন এখানে কি ঘটিতেছে তাহাই সে দেখিতে আসিয়াছে। সুলোচনা কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিল না ; কিন্তু কি ঘটিতেছে তাহা দেখিতে সে-ও মায়ের সঙ্গে আসিয়া অকুস্থলে দাঁড়াইল।

চির-অপরাধী রামলাল কর্তৃক অনুষ্ঠিত নির্মমতায় কেশবলালের মন উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল - উগ্রতা এত যে তাহা প্রকাশ করিতে ভাষায় কুলায় না। কিন্তু রামলালের অপরাধ কাল্পনিক, আর, কেশবলালের উগ্রতা উদ্দেশ্যমূলক, মাকে দেখানো ; কিন্তু যাহা মোটেই লোকদেখানো ব্যাপার নয়, সত্যকারের সম্বন্ধযুক্ত অত্যাজ্য প্রদাহের ব্যাপার, তাহা এই যে, মাতৃসমীপে অভিযোগ বৃথা হইতেছে—

সে ধমকাইয়া উঠিল : বলছি আমার মাথা। রামলাল কি কাণ্ডটা করছে আর এযাবৎ করেছে তাই বলছি।—বলিতে বলিতে অসহিষ্ণুতায় অস্থির হইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মা চিরকাল অবুঝ, এখনো তাই।

কিন্তু তখনই ঘটিল এক কাণ্ড। ঠাকুরমার দৈহিক দুর্গতির দিকে চাহিয়া সুলোচনা কষ্ট পাইতে পাইতে সহসা সশব্দে ফুঁপাইয়া উঠিল। আবহাওয়া কেশবলালের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল—মায়ের গোঁ ভারি কঠিন ; কিন্তু সুলোচনার ঐ ক্রন্দনশব্দে সমুদায়টা যেন সহ্যের সীমার মধ্যে চলিয়া আসিল—তাহার মনে হইল, মায়ের প্রতি তাহাদের অপরিসীম মমতা প্রকাশ পাইয়াছে। উহার ফল ভাল হইতেও পারে।

জিজ্ঞাসা করিল—মা, একটু লেবুর রস দেব ?

মা মাথা নাড়িয়া অসম্মতি প্রকাশ করিলেন।

তারপর যাহা ঘটিল তাহা বেশ সুদৃশ্য।

মুদিত চক্ষু আর অসাড় অবয়ব মায়ের সম্মুখে উহাদের ইশারায় খানিক ভাববিনিময় চলিল—

মা সমস্ত পৃথিবী হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছেন, স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছেন ; তাঁহার দিকে চাহিয়া মানুষের বুঝিবার উপায় নাই তাঁহার মনে কোন চিন্তাধারা বহিতেছে কি না, সংসারের কোনো-কিছুর প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র স্পৃহা আছে কি না, ভিতরে যন্ত্রণা হইতেছে কি না, পার্শ্ববর্তী পুত্র পৌত্রী পুত্রবধূর সম্বন্ধে তিনি সচেতন কি না, কোনো অপরাধের গুরুত্ব অনুভব করিতে তিনি সক্ষম কি না। তথাপি নিঃশব্দে ইশারাই করিতে হইল। যে চরম মুহূর্তের আবির্ভাব কেশবলালকে বেপরোয়া করিয়া তুলিয়াছিল তাহাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেও সে মায়ের কানে যায় এমনভাবে শব্দ করিয়া কথাটা বলিতে পারিল না।

কেশবলাল চোখের ইশারায় মাকে দেখাইয়া দিয়া মাথা নাড়িয়া স্ত্রীকে ইঙ্গিত করিল।

তাহার অর্থ এই যে, মাকে কথাটি তুমিই বলো।

সরোজবাসিনী তাহাতে অসম্মত ; সে-ও মাথা নাড়িয়াই অস্বীকার করিল, এবং ইঙ্গিতেই জানাইল, তুমিই বলো।

পরামর্শ করাই ছিল ; কিন্তু কথাটা কে বলিবে তাহার মীমাংসা পরামর্শের সময় হয় নাই।

এই ঠেলাঠেলিতে অসহিষ্ণু হইয়া কেশবলাল ঘোরতর ভ্রূভঙ্গী করিয়া রহিল ; তারপর কথাটা সে বলিয়াই ফেলিল—না বলিয়া পারিল না—চরম মুহূর্তটার চাপে প্রাণ তাহার কণ্ঠাগত হইয়া আসিতেছে যেন! বলিল, মা, তোমার গয়নাগুলো—

খুব ক্ষীণকণ্ঠে মা বলিলেন, কিন্তু বেশ স্পষ্ট শুনা গেল, তিনি বলিলেন : রামের অর্ধেক, তোমার অর্ধেক। আমার সঙ্গে তার দেখা না হ'লে অর্ধেক তাকে দিও।

চেষ্টা বৃথা হইল। এত যন্ত্রণাদায়ক সেই চরম মুহূর্তটি মায়ের ঐ কথায় এক মুহূর্তেই অতীত হইয়া গেল, এবং কেশবলাল সেই মুহূর্তেই মানসিক যে অবস্থায় উপনীত হইল তাহা কেবল অবর্ণনীয় নয়, অসহ্যও। প্রথমে সে বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল : এত কথা একসঙ্গে বলিতে মা এখনও সক্ষম? অথচ নাভিশ্বাস সম্বন্ধে সন্দেহ বাতুলেও করিবে না! শুনা গেছে, অহেতুক, এমন কি অন্যায় একটা কিছুর উদ্দেশে প্রাণচেতনা প্রাণপণে নিজেকে উন্মীলিত রাখে, মৃত্যুকে ঠেলিয়া দেয়। কেশবলালের মনে হইল, মায়ের তা'ই হইয়াছে ; রামের হাতে ঐ অর্ধেক অর্পণ করিবার অপরাজেয় দুরন্ত ইচ্ছায় মা নিঃশ্বাসকে ফুরাইতে দিতেছেন না। কেশবলালের সন্দেহ রহিল না, রাম আসিয়া তাহা গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিঃশ্বাস ফুরাইবে। কেশবলালের এত ঈর্ষা জন্মিল যে তাহা বলিবার নয়।

তারপর তাহার মনে হইল, এ যেন ঠিক যক্ষের ব্যাপার ; যাহার জিনিস তাহাকে তাহা না দিয়া যক্ষের মুক্তি নাই।

পাগল পাগল ঠেকিয়া কেশবলাল ঘোরতর হইতেও ঘোরতর ভ্রূভঙ্গী করিল ; তাহার সমগ্র আত্মা চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ করিতে হা হা করিয়া উঠিলেও সে তাহা করিল না—হাল ছাড়িয়াও ছাড়িল না ; তেমনি মোলায়েম মৃদুকণ্ঠে অভিমান মিশ্রিত করিয়া তর্কের সুরে সে বলিল : কিন্তু সে যে তোমায় শেষ দেখা দেখতে এল না, মা।

মা কোন সাড়া দিলেন না। কেশবলাল তবু ছাড়িবে না ; বলিল, তোমার সুলোচনাকে আলাদা কিছু দেবে না?

মা বলিলেন, তোমার অর্ধেক, রামের অর্ধেক। অর্থাৎ মা বলিতে চান যে, তোমার অর্ধেকের ভিতর হইতেই সুলোচনাকে কিছু দিও। কিন্তু মায়ের এ জবাবও তর্কাতীত চরম বলিয়া কেশবলালের মনে হইল না ; বলিল, তোমার নাতবউ হ'য়ে যে আসবে তার নামে রামের অর্ধেক থেকে আলাদা করে কিছু দিয়ে যাও।

এই অনুরোধের পরও মা নিঃশব্দ রহিলেন…

অকৃতজ্ঞ হৃদয়হীন বলিয়া অভিযুক্ত এবং প্রমাণিত পুত্রের প্রতি জননীর এই বিচারহীন অবোধ আকর্ষণ, অর্থাৎ এই জিদ, কেবল তাহারই মাকে সাজে—অন্য মা হইলে…

কেশবলাল মায়ের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। কেশবলাল ও রামলালের জননী আজীবন কেবল অলংকারই প্রস্তুত করাইয়াছেন—কেবল নিরেট সোনা। আজকালকার বাজার দরে সেই নিরেট সোনার মূল্য পাঁচ হাজারের কম নয়। তিনি এই সোনা লইয়া মুশকিলেও কম পড়েন নাই—চিরকাল এই সঞ্চিত স্বর্ণ কেশবলালের প্রলুব্ধ উদ্যম হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইয়াছে—কেশবলালের নানান অজুহাতে হাত বাড়াইয়া সোনার অংশ টানিয়া লইবার চেষ্টা তাঁহাকে প্রতিহত করিতে হইয়াছে বহুবার। কেশবলালের চাতুরী আর অভিনয় আর অনুপস্থিত অনুজকে কালিমালিপ্ত করিয়া জননীকে বিমুখ করিয়া তুলিবার চেষ্টা ইহার পূর্বেও বহুবারই বৃথা হইয়াছে, আজও তাহাই হইল। মা যে বাঁচিবেন না, এ খবরটি স্পষ্ট করিয়া রামলালকে সে ঐ সোনার লোভেই জানায় নাই। কিন্তু আর আশা নাই, রাম সস্ত্রীক আসিতেছে; আর, মা চমৎকার সজ্ঞান মস্তিষ্কে ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশের অটুট শক্তিসহ জীবিত রহিয়াছেন! ইহাও যদি মানুষকে হতজ্ঞান না করে তবে কিসে করিবে?

সরোজবাসিনী এবং সুলোচনাও প্রায় হতজ্ঞান হইয়া চলিয়া আসিল।

জনপ্রিয় হইতে নয়, হৃদ্যতা প্রদর্শনের অন্য পাত্র না পাইয়া নয়, পয়সা কিছু কম লাগিতে পারে কেবল এই আশায় কেশবলাল ডাক্তার ও কবিরাজ মহাশয়গণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। পয়সা আদায় করিবার বেলাতেও চক্ষুলজ্জা একটা প্রকাণ্ড বাধা কেশবলাল তাহা জানে। কেশবলালের বন্ধুত্ব লাভ করিয়া যে চিকিৎসকগণ কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ বিজ্ঞ আর খ্যাতিসম্পন্ন হইতেছেন কবিরাজ অমূল্যরতন দাশগুপ্ত মহাশয়। নাড়ীজ্ঞান তাঁহার অশেষ। ইহার সঙ্গে অসুখ-বিসুখের খবরাখবর আর আর্থিক দুর্গতির আলাপ কেশবলালের খুব ঘনিষ্ঠভাবেই চলে।

কেশবলাল অমূল্য কবিরাজকে খবর দিয়াছিল। কবিরাজ আসিয়াছেন। বলিতে বাধা নাই, কেশবলাল কৌশলে জানিতে চায়, মায়ের প্রাণবায়ু কেন নির্গত হইতেছে না। যে প্রাণ নির্গমোন্মুখ হইয়া আছে, আর, নির্গত হইয়া যাইবেই, সে অযথা আবদ্ধ কেন আছে এবং আরো কতক্ষণ থাকিতে পারে, অধীর হইয়া তাহা জানিতে চাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব কিনা জানি না; জানিতে চাওয়া পাপ কিনা তাহাও জানি না; কিন্তু এক্ষেত্রে সত্য কথা তাহাই।

কেশবলাল ভারি চালাক, অসীম বিষণ্ণ কণ্ঠে সে বলিল, মায়ের কষ্ট আর দেখতে পারা যাচ্ছে না। মনে হয়, রামকে দেখার জন্যেই প্রাণটা এখনও বইছে; বেরিয়েও বেরুচ্ছে না। কি বলেন?

কবিরাজ তখনও নাড়ী পরীক্ষা করেন নাই; বাহিরে বসিয়া পান চিবাইতেছেন: বলিলেন, সম্ভব।

কেশবলাল বলিল, এ-অবস্থায় দেহশুদ্ধি করতে একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে না ?

কবিরাজ বলিলেন, আছে।

—হাতটা একবার দেখবেন দয়া করে ? রামলাল আজ রেতেও যদি আসে তবে তার সঙ্গে দেখা কি কথাবার্তা হতে পারে কি না ? এখনও বেশ সজ্ঞান আছেন।

—দেখিগে চলুন। বলিয়া কবিরাজ গাত্রোত্থান করিলেন।

কবিরাজ যাইয়া নাড়ী দেখিলেন। একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে তাঁহাকে বহুক্ষণ নাড়ী ধরিয়া থাকিতে হইল—বাহিরে আসিয়া বলিলেন, আজ রাত কাটে কি না সন্দেহ···

লাফাইবার মতো করিয়া কেশবলাল চমকিয়া উঠিল : বলেন কি !

—তাই দেখলাম। বেশিক্ষণের জন্য কাছ ছাড়া হয়ে থাকবেন না। বলিয়া কবিরাজ পুনরপি একটা পান মুখে দিলেন।

কেশবলাল বন্ধুবরকে ভিজিট দেয় না, কিন্তু পান খাওয়ায় খুব ; এখন কেশবলালের দুরন্ত অভিলাষ জন্মিল, কবিরাজকে চারিটি টাকা ভিজিট দিয়া তখনই পুরস্কৃত করে। কিন্তু মাথা ভারি খারাপ হইয়া গেলেও তাহা সে করিল না—চতুর্গুণ বিমর্ষ হইয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল : বলিল, রামের সঙ্গে দেখা তা হলে হ'ল না ! রাম রাম করে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। পাষণ্ড রাম !

নিবিড় বন্ধুত্ব থাকিলেও ভদ্রলোকে গালাগালির সায় বড় একটা দেয় না ; কবিরাজও দিলেন না ; পান চিবাইতে চিবাইতে তিনি নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন।

বৈকালে ঐ কথার পর সন্ধ্যা লাগিল। রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় মনে হইল, মায়ের অবস্থা দ্রুতবেগে খারাপ হইয়া আসিতেছে—নাভিশ্বাস আরও প্রকট হইয়াছে, আসন্ন মৃত্যুর যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, মায়ের মুখে চোখে নাকে কপালে তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে—চুপ্সিয়া ঝুলিয়া পড়িতেছে যেন !

সবাই নিঃশব্দে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে ; দীর্ঘদিন বিলম্বিত এই অবসান মর্মান্তিক কিনা তাহা যেন সর্বান্তঃকরণে অনুভূত হইতেছে না।

হঠাৎ মা চোখ খুলিয়া বলিলেন, তোমাদের সবাইকার খাওয়া হয়েছে ?

কেশবলাল বলিল,—হয়েছে, মা।

শুনিয়া মা সম্ভবতঃ নিশ্চিন্ত হইলেন।

সময় নিঃশব্দে বহিতে লাগিল। কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি গভীর হইয়া উঠিতেছে। অন্ধকার নিবারণের জন্য কেশবলাল, অতিরিক্ত ব্যয় হইতেছে জানিয়াও অনেকগুলি লণ্ঠন জ্বালিয়া, আর লণ্ঠনের তেজ যথাসম্ভব বাড়াইয়া দিয়া সমস্ত বাড়ী আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। জননীর জীবনের পথ সে কখনো আলোকিত করিয়াছে কি না, এবং বেশি করিয়া লণ্ঠন জ্বালিলে সে আলোয় নিজেদের বিভীষিকার খানিক অপনোদন ছাড়া মুমূর্ষুর পথ স্বচ্ছ হয় কিনা কেশবলাল তাহা ভাবিতে জানে না।

প্রতিবেশী নিত্যনারায়ণ আর বিরামবাবুকে ইন্দ্রনাথ ডাকিয়া আনিয়াছে। তাঁহারা ওঘরে অপেক্ষা করিতেছেন।

মায়ের নিঃশ্বাস নাভি-আশ্রয় ত্যাগ করিয়া ঊর্ধ্বগামী হইতেছে—স্পষ্টই তাহা দেখা যাইতেছে। মা একবার হাত তুলিয়া কি বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন—তৎক্ষণাৎ তাহা অনুমান করা গেল ; তিনি বাহিরের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

তখনই চক্ষের পলকে নিঃশ্বাস-স্পন্দন কণ্ঠে উঠিয়া আসিল ; কেশবলাল হাঁকিল, নিত্য

নিত্য ও বিরামবাবু দৌড়াইয়া আসিলেন। "ধর, ধর" বলিয়া কেশবলাল মায়ের মাথার নীচে হাত দিল ; তিন জনে তাঁহাকে শূন্যে তুলিয়া বহন করিয়া লইয়া চলিল···বহন করিয়া আনিতে আনিতে বাহকগণের হাতের উপরই মায়ের শেষ-নিঃশ্বাস নির্গত হইয়া গেল। মৃতদেহ উঠানে নামাইয়া দিয়া প্রতিবেশীদ্বয় প্রস্থান করিলেন।

কাঁদিল সবাই। ইন্দ্রনাথ ইহাদের দলভুক্ত নয়—সে মাটিতে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কেশবলালও না কাঁদিল এমন নয় ; কিন্তু তাহার আচরণ হইল অতিশয় অদ্ভুত ঠিক তখনই, সেই সাশ্রু শোকোচ্ছাসের ভিতরেই : চোখের জল তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া সে দৌড়াইয়া ঘরে উঠিয়া গেল—যে ঘরে মা ছিলেন সেই ঘরে।

কেবল তাই নয়—ব্যস্তভাবে আরো অনেক-কিছু কাজ সে করিল : মা যে-বালিশটা মাথায় দিয়া শুইয়া থাকিতেন, ঘরে ঢুকিবার পর সর্বাগ্রে সে সেই বালিশটা উল্টাইয়া দিল ; দেখা গেল, একটা রিংএ চারিটি ছোট চাবি রহিয়াছে ; চাবি হস্তগত করিয়া সে ছুটিয়া গেল মায়ের ট্রাঙ্কের কাছে। মা তাঁহার এই স্ট্রীলট্রাঙ্কটি খুব সাবধানে চোখে চোখে রাখিতেন। ট্রাঙ্কের দুই কড়ার সঙ্গে শিকল জড়াইয়া জানালার শিকের সঙ্গে তাহাকে অনড় করিয়া আবদ্ধ করিয়াছিলেন —সিঁদেল চোর তাহা স্থানান্তরিত করিতে না পারে।

কিন্তু তাঁহার সকল সতর্কতা আজ ব্যর্থ হইয়া গেল—সম্পত্তি স্থানান্তরিত হইল। কেশবলাল ট্রাঙ্ক খুলিয়া অলঙ্কারের কৌটাটি টানিয়া বাহির করিল ; দেয়ালের গা-আলমারী খুলিয়া কৌটাটি তাহার ভিতর রাখিয়া দিল···

এবং যখন সে ভাবিতেছে, সুলোচনা আর তাহার মাকে শিখাইয়া রাখিতে হইবে যে, যদি কথা ওঠে তবে তাহারা যেন বলে, মা স্বহস্তে আমাদেরই সব দিয়া গিয়াছেন, আর, তোমাদের উপর ভারি অভিমান লইয়া তিনি পরপারে চলিয়া গিয়াছেন, তখনই ঘোড়ার গাড়ী একখানা আসিয়া বাড়ির সম্মুখে থামিল।

তিন লাফে কেশবলাল বাহির হইয়া আসিল ; বস্ত্রাবৃত মাতৃদেহের পাশে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল : বলিল, এসেছে ওরা।

শুনিয়া সরোজবাসিনী আর্তনাদ করিয়া উঠিল : ঠাকুরপো, এখন এলে ? এই যে মা এখানে শুয়ে ; এইমাত্র সব শেষ হয়ে' গেল। রাম রাম করে মায়ের···

রাম রাম করিয়া ডাকিতে ডাকিতে রামের দর্শনবুভুক্ষু প্রাণটি কত কষ্ট পাইয়া বাহির হইয়াছে তাহা এখনই সে বলিল না, পরে বলিবে।

সত্যশিবের বিয়ে ও বৌ

আণুবীক্ষণিক বীজ হইতে বনস্পতির উদ্ভব—এ তুলনাটা সুশীলাসুন্দরীর কাজের সঙ্গে খাটে না। বৃন্তচ্যুত ফলের বৃক্ষ হইতে মৃত্তিকায় পতনের সূত্রে মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কার—এই তুলনাটা কিছু খাটে। মাধ্যাকর্ষণের অর্থাৎ দুইটি পদার্থ বস্তুর পরিমাণানুসারে এবং দূরত্বের বর্গবিপর্যয়ে পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এই তথ্যের সন্ধানলাভের ফলে বিজ্ঞানজগতে ব্যাপার তুমুল হইয়া উঠিয়াছিল। এ প্রাচীন কথা সবাই জানে; কিন্তু সবাই জানে না যে, আরাম পাওয়ার উপায় দৈবাৎ আবিষ্কার করার আগে সুশীলাসুন্দরীর সংবিতে এবং পরে তাঁর সংসারে বিপ্লব দেখা দিয়াছিল, ইহা আধুনিকতম একটা ঐতিহাসিক ঘটনা।

সুশীলাসুন্দরীর একটি পুত্র, একটি কন্যা, অর্থাৎ কয়েকটি সন্তান কালগ্রাসে পড়ার পর ঐ দু'টি এখন বর্তমান; সুতরাং উহারা প্রাণাধিক প্রিয়।

ছেলে সত্যশিবের বয়স তেরো; ইস্কুলে পড়ে।

মেয়ে কিরণের বয়স পনর চলিতেছে—ইস্কুলে পড়ে না। কীর্ণাহারের সন্তোষবাবুর পুত্র শৈলেশ্বরের সঙ্গে কিরণের বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছে—খুব হৃদ্যভাবেই চলিতেছে। সন্তোষবাবু নির্লোভ ব্যক্তি সন্দেহ নাই। বি-এ পড়া ছেলের পিতা হইয়াও তিনি পণ এবং বরাভরণ সম্বন্ধে এমন নিস্পৃহ যে, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। কিরণের বাবা রাখাল ভট্টাচার্য সেই কারণে খুব অবাক হইয়া থাকেন, এবং গল্প আর প্রশংসা করিয়া অনেককেই খুব অবাক করিয়া দিতেছেন। এই নিষ্ঠুর ব্যবসায়ে, অর্থাৎ কন্যার পিতাকে নিঙড়াইয়া কে বেশী আদায় করিতে পারে ইহারই প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, সন্তোষবাবু অলৌকিক সংযম প্রদর্শন করিয়াছেন—রাখাল ভট্টাচার্যের বিশ্বাস তা-ই। চার শত টাকা নগদ, আর সোনা মাত্র দশ ভরি। আর কিচ্ছু না। রাখালবাবুর হিসাবে কিরণের বিবাহে যৌতুকের বরাদ্দ ছিল 'সর্বাসাকুল্যে' ইহার চতুর্গুণ। সুতরাং রাখালবাবু গদগদ হইয়া আছেন—সুশীলাসুন্দরী গদগদ হইয়া আছেন, কিন্তু তাহা কেহ জানিতে পারিতেছে না। তাঁহাদের মেয়ে পছন্দ হইয়াছে, ইঁহাদের ছেলে পছন্দ হইয়াছে; সুতরাং এ-বিবাহ হইবে; দিন-স্থির করিতে রাখাল ভট্টাচার্য সন্তোষ-বাবুকে বিনম্র পত্র দিয়াছেন।

পূর্বে যে বিপ্লবজনক আবিষ্কারের কথা বলিয়াছি তাহা এখনকার।

স্ত্রীলোক বুদ্ধিমতী যতই হউন, অন্তর্দৃষ্টি তাঁর যত গভীরই হোক, গৃহকর্মের চক্রে বাঁধা পড়িয়া তাঁর মৌলিক চিন্তার অবসরই থাকে না, যেমন নিম্নের মৃত্তিকা আর সম্মুখের বেড়া ছাড়া অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি চলে না ঘানির বলদের। বিশেষ করিয়া সুশীলাসুন্দরীর সম্বন্ধে এই তত্ত্বটি নির্ভাজ সত্য; তিনি ভাবেন অনেক, কিন্তু তা কেবল স্থূল ঘরের কথা; আরাম যে কত প্রকারের হইতে পারে

তাহা তিনি চিন্তা করেন নাই, অর্থাৎ তাঁর মাথায় আসে নাই···আসিয়া গেল দৈবাৎ একদিন যখন কন্যা কিরণের এ-গৃহ ত্যাগ করিয়া স্বামিগৃহে যাইবার দিন নিকটবর্তী হইয়াছে।

সুশীলাসুন্দরীর কাজ অনেক, অফুরন্ত, সুতরাং পরিশ্রম করিতে হয় খুব; এবং দ্বিপ্রহরে আহারান্তে তিনি কিছুক্ষণ না শুইয়া পারেন না—শুইলে তাঁর 'হাড়ের ব্যথার' লাঘব হয়।

সেদিন শনিবার। সত্যশিব ইস্কুলে গিয়াছে। সুশীলাসুন্দরী বালিশটি মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন; অল্প শীতের দরুন একখানা চাদর কেবল গায়ে দিয়াছেন; পা ঢাকিলে পা জ্বালা করে বলিয়া পা খোলাই আছে। তাঁর পায়ের কাছে প্রচুর স্থান আছে, এবং জানালা দিয়া প্রচুর আলো আসিতেছে বলিয়া কিরণ তার 'সেলাই' লইয়া সেখানেই বসিয়া গিয়াছে···

বসার কিছু পরেই ঘটিল এক দৈব ঘটনা—বিপ্লবজনক সেই আবিষ্কার। সীবন প্রয়োজনে কিরণের হাত এ-দিক ও-দিক ওঠা-নামা করিতে করিতে হঠাৎ একবার ঠেকিয়া গেল তার মায়ের পায়ের তলার সঙ্গে—সঙ্গে সঙ্গে সুশীলাসুন্দরী অনুভব করিলেন, ভারী সুন্দর অব্যক্ত একটু আরাম—

বলিলেন—পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দে ত' মা।

সেলাই রাখিয়া পায়ে হাত বুলাইয়া কিরণ দিত না, যদি এই অনুরোধ আর কিছুদিন পূর্বে আসিত। কিন্তু শীঘ্রই সে বাপ-মাকে ছাড়িয়া যাইবে, এবং সেই বেদনায় ম্রিয়মান হইয়া মা দুধের সর আর মাছের বড় পেটিটা সত্যকে না দিয়া তাহাকেই দিতেছেন...

কিরণ নিমকহারামি করিল না, সেলাই সরাইয়া রাখিয়া সে মায়ের পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল...সুশীলাসুন্দরীর আরামের অন্ত রহিল না। কিন্তু শুষ্ক পায়ের সঙ্গে শুষ্ক হস্তের ঘর্ষণে শীঘ্রই একটি তেজ উৎপন্ন হইল।

সুশীলা বলিলেন,—জ্বালা করছে বড়ো, হাতে একটু তেল দিয়ে নে।

কিরণ হাত তৈলাক্ত করিয়া আনিল।

তৈলাক্ত হাত পায়ে বুলাইতে শুরু করিলে সুশীলাসুন্দরীর আরামের আর অন্ত রহিল না।

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, অল্প খরচে এবং অল্প পরিশ্রমে এমন সুন্দর আরাম পাওয়া যায়, একথা তিনি আগে ভাবেন নাই! আশ্চর্য কিন্তু! প্রত্যহই তিনি এই ভাবে আরাম গ্রহণ করিবেন।···ভাবিতে ভাবিতে সুশীলাসুন্দরীর চিন্তা-মৃত্তিকার সরসতা ফুলের কুঁড়ির মতো বিস্তার লাভ করিতে লাগিল · মেয়ের যতদিন বিবাহ না হইতেছে ততদিন সে তাঁর এই রকম সেবা-পরিচর্যা করিবে, কিন্তু তার পর? তার পর বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেলেই নিশ্চিন্ত—কীর্ণাহারে যাইয়া মেয়ে শাশুড়ীর পায়ে তেল মাখাইতে থাকিবে। কন্যার অভাব তখন পূরণ করিবে কে? আরামে বিঘ্ন ঘটিবে মনে হইয়া সুশীলাসুন্দরী তখনই কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইলেন।···কন্যার স্থান গ্রহণ করিতে পারে পুত্রবধূ। সত্যশিবের বিবাহ দিলে কেমন হয়?

বোঁটার ফল মাটিতে পড়িল—আবিষ্কৃত হইল মাধ্যাকর্ষণ; কিরণের হাত

পায়ে ঠেকিল সুশীলাসুন্দরীর—আর তাঁর মাথায় আসিল পুত্রবধূ আনয়নের সুবৃহৎ চিন্তা।

তার পর তাঁর মূল চিন্তার সহিত শাখা-প্রশাখা যুক্ত হইতে লাগিল।

মানুষ এই আছে এই নাই। জীবন পদ্মপত্রে জলবিন্দু বৈ ত' নয়। পাতা একটু কাত হইলেই বিন্দু সিন্ধুতে মিশিয়া যাইবে। সেদিন মহেশ মোড়ল মাঠ হইতে আসিয়া বারান্দায় বসিয়া মুখ ধুইতে ধুইতে ঠাস হইয়া নীচে পড়িয়া গেল—বাড়ির লোক দৌড়াইয়া আসিয়া দেখিল, মহেশ মরিয়া গেছে। এই ত' জীবন! হাসিও পায়, কান্নাও পায়। ভাবিয়া দেখিতে গেলে, এ জীবনের মূল্য কি? তার স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করিতে পারা যায় কী? পরে করা হইবে বলিয়া সাধ-আহ্লাদের কোনো কাজ অনিশ্চিত কালের জন্য মুলতুবী রাখা বুদ্ধির কাজ কি?

ভাবিতে ভাবিতে এখানকারই অপরাজিতার মতো রূপবতী আর অমনি ছোট্ট একটি মেয়েকে বধূ করিয়া আনিতে তাঁর এমন দুর্জয় লালসা জন্মিল যে, তখনই, শুইয়া শুইয়াই, তিনি যেন যাবতীয় প্রতিকূল উক্তির সম্মুখে উগ্র, আর যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন…

অমনি একটি মেয়েকে যদি বউ করা যায়, তবে জীবন সফল হয়। বিবাহ দিতেই হইবে সংকল্প করিয়া সুশীলাসুন্দরী কিরণের আরামপ্রদ হাতের ভিতর হইতে পা টানিয়া লইয়া একেবারে উঠিয়া বসিলেন।

কিরণ বলিল,—মা, উঠ্‌লে যে? এখনো বেলা আছে।

সুশীলা বলিলেন,—সত্যের বিয়ে দেব।

কিরণ সীবননিপুণা হইলেও, এবং আধুনিক বই খানকতক তার পড়া থাকিলেও, একেবারে সেকেলে ধরন তার—বিশেষ অবাক হইলে চট করিয়া গালে হাত দেয়। অত্যাশ্চর্য কথা হঠাৎ শোনা এ বাড়ির কিরণের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এ যে বেজায় আশ্চর্য! কিরণ বিশেষ অবাক হইয়া চট্ করিয়া গালে হাত দিল; বলিল,—ও মা, সে কি কথা!

—হ্যাঁ দেব! আমি মরব চিরকাল খেটে খেটে উপায় থাকতে? টুক্‌টুকে বউ আনব; বাড়ির ভেতর লক্ষ্মীঠাকরুণটির মতো থাকবে, জ্বল্‌জ্বল করবে—পায়ে পায়ে ঘুরবে আটপহর—দেখে চোখ জুড়োবে। আমি শুয়ে থাকব—পায়ে সে হাত বুলিয়ে দেবে। আমাকে মা বলে ডাকবে, ওঁকে বলবে বাবা।—বলিতে বলিতে ক্ষুদ্র বধূর এই মধুর আহ্বানের অপরিমেয় উল্লাসে সুশীলাসুন্দরী এমন বিগলিত হইয়া গেলেন, যেন কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কিরণ বলিল,—বাবা দিলে ত'।

—দেবে, ঘাড় হেঁট করে দেবে; না দিলে আমি বুঝি তাকে সোয়াস্তি দেব ভেবেছিস?

শুনিয়া কিরণ বিশেষ অবাক হইয়া আবার গালে হাত দিল, আর হাসিতে লাগিল।

বই হাতে করিয়া সত্যশিব আসিয়া উপস্থিত হইল। শনিবারে 'হাফ ইস্কুল' হয়; সত্য সকাল সকাল ফিরিবে বলিয়া সুশীলাসুন্দরী বিশ্রাম করিতে আজ

কোঠায় ওঠেন নাই, বৈঠকখানার বাহির-দরজায় খিল দেন নাই—বইয়ের 'বোঝা' নামাইতে বিলম্ব হইলে সত্যশিবের রাগ হয়।

পড়িয়া না হোক, পথশ্রমে সত্যশিবের মুখ ঘামিয়া উঠিয়াছিল, সুশীলাসুন্দরী তার হাত হইতে বই লইয়া আলমারির মাথায় তুলিয়া রাখিলেন; তাহার মুখের ঘাম আঁচলে করিয়া মুছিয়া দিতে দিতে কষ্টানুভব করিয়া বলিতে লাগিলেন,—ইস্কুল হয়েছে এক ইয়ে, দেশছাড়া জায়গায়। কাছে-পিটে করলে ওদের কি হ'ত। তুই বাড়িতে পড়িস্, সত্য, ইস্কুলে তোকে যেতে হবে না। ইস্কুলে যেতে-আসতেই যদি ছেলে পুড়ে শেষ হয়, তবে সেই ইস্কুলে মানুষ আবার ছেলে পাঠায়!

সত্য বলিল,—বাবার শখ, আমার মরণ।

কিরণবালা সেলাই করিতে করিতে বলিয়া উঠিল,—সতে, তোর বিয়ে।

—কবে?

শুনিয়া কিরণ অবাক হইয়া গালে হাত দিল, সুশীলাসুন্দরী হাসিয়া উঠিলেন। অবাক হওয়ার আর হাসির কারণ ছিল বই কি? সত্য ত' বয়ঃক্রম হিসাবে যোগ্য হয় নাই; কিন্তু তার প্রশ্ন শুনিয়া মনে হইল, নিজেকে সে উপযুক্ত মনে করে, বলিয়াই ঐ সরল প্রশ্ন করিতে পারিয়াছে যেন সে বলিতে চায়, এত দিনে হুঁশ হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম।

কিরণ বলিল,—বেহায়া ছেলে। জিজ্ঞাসা করছে, কবে?

—কি এমন অন্যায় করেছি? তোরও ত' বিয়ে হবে—নিয়ে যাবে চ্যাংদোলা করে। আমার বেলাতেই বুঝি বেহায়াপনা হ'ল। নিজের বিয়ের কথা তুই কেমন কান পেতে শুনিস তা বুঝি আমি দেখিনি? নিজের ইয়ে টুকু দিদি বেশ বোঝে···বলিয়া সত্যশিব যুগপৎ আহত ও প্রবীণ ভাব ধারণ করতঃ জননীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিরণ বলিল,—অতটুকু ছেলের বজ্জাতি, কম নয়।

সত্য এ-কথারও জবাব দিল, বলিল,—মা, আমি কিছু বলেছি? তুই-ই ত' বললি আমার বিয়ের কথা। আমি বলতে গিয়েছিলাম, না, শুধিয়েছিলাম? না বললেই পারতিস? বললেই শুনতে হবে।

পুত্র ও কন্যার কলহে জননী কৌতুকানন্দ অনুভব করিতেছিলেন, হাসিয়া বলিলেন,—গাছে কাঁটাল, গোঁপে তেল—তা-ই হয়েছে তোদের! আসুক তোদের বাবা—

কিন্তু সত্যশিব বাপের মতামত অপেক্ষায় দেরি করিতে পারিল না, বলিল, আমি বিয়ে করব না, মা, এখন। দিদির বিয়ে হ'য়ে যাক তার পর করব।

—কেন রে?

সত্য বলিল—"বউয়ের সঙ্গে ত' ঝগড়া করবে কেবল।"

কল্পিত দোষারোপে ক্রুদ্ধ হইয়া কিরণ কি যেন প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু কিছুই তার বলা হইল না—জননীর তুমুল হাসির উত্তাল উতরোলের নিম্নে সে সহসা চাপা পড়িয়া গেল।

সুশীলাসুন্দরীর এই প্রবল হাসি, বাপের জামা-জুতা-পরা ছেলের মতো অবুহতের সুবৃহৎ রূপ দেখিয়া নয়—বধূ একেবারে মূর্তি ধরিয়া দেখা দিয়াছে ; বধূ-ননদের সনাতন কলহের চিত্র যাহা ভাবিতে মধুর কিন্তু ভোগে অমধুর তাহাই রসে ঢলঢল পরম উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে ছেলে আর মেয়ের কথায় অর্থাৎ তিনি নিজেই গোঁপে তেল দিয়েছেন, কাঁটাল কিন্তু গাছে !

সত্যশিব হাত-পাখা নাড়িয়া হাওয়া খাইতেছিল।

হাসির বেগ থামিলে সুশীলাসুন্দরী তাহার মাথায় হাত রাখিয়া তার ক্ষোভ নিবারণ করিলেন। বলিলেন,—আমি থাকতে ? আয়, তোকে খাবার দিইগে। —বলিয়া বিবাহে সম্প্রতি অনিচ্ছুক সত্যশিবকে লইয়া তিনি রান্নাঘরের দিকে গেলেন।

রাখালবাবু কাজ করেন 'সাব পোস্টাফিসে' দশটা-পাঁচটা ডিউটি। এখন কেবল তিনটে পঞ্চাশ—তাঁর ফিরিতে দেরি আছে···

সুশীলাসুন্দরী মনে মনে ছটফট করিতে লাগিলেন।

কিরণের হাত দৈবাৎ পায়ে ঠেকিয়া যাওয়ায়, ঐ সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বন করিয়া ছোট্ট রাঙা একটি বউ আনিবার কথা তাঁর মনে আসিয়াছে, কিন্তু আসিয়া সে বসিয়া নাই—প্রাণপণে কাজ করিতেছে। স্বামী, অর্থাৎ তথাকথিত মালিক যিনি তিনি, কথাটা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহা জানা নাই—সুশীলাসুন্দরী তা যত শীঘ্র সম্ভব জানিতে চান ; এবং তদনুযায়ী যে সমুদয় কথা যথাযোগ্য মেজাজের উপর বলিতে হইবে, তাহাও যত শীঘ্র সম্ভব তিনি বলিয়া শেষ করিয়া ফেলিতে চান।

সত্যের বিবাহ দিলেই সুখের গঙ্গা যে কলনাদে ছুটিয়া আসিবে সে বিষয়ে তাঁর অনুমাত্র সন্দেহ নাই ; কিন্তু ঐ লোকটিকে বিশ্বাস নাই ; কথা বুঝিবে না, অথচ মনে করিবে, বুঝিয়াই সব বলিতেছি। অখণ্ডনীয় কর্তৃত্ব তাঁরই, অর্থাৎ ঘোড়ার লাগামটি তিনিই হাতে ধরিয়া বসিয়া আছেন ; যান আর আরোহী খানায় পড়িয়া খুন হউক, চুরমার হউক, তাহাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই—তিনি করিতে চান কেবল বিবেচনা। এমন ধারা লোকের সঙ্গে অত বড়ো একটা কথা লইয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন বোধ যখন শাণিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন যদি সুশীলাসুন্দরী স্বামীর পথ চাহিয়া ছটফট করিতে থাকেন তবে তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

সত্যশিব আহারান্তে মার্বেল লইয়া বাহির হইয়া গেল। কিরণবালা 'কাপড় কাচিতে' নামিল। তাহার পর সে চুল আঁচড়াইয়া খোঁপা বাঁধিবে। বেলাবেলি প্রস্তুত না হইলে প্রদোষান্ধকারে দর্পণের ভিতর মুখচ্ছবি স্পষ্ট ফোটে না বলিয়া টিপ পরিতে অসুবিধা হয়।

সুশীলাসুন্দরী নিত্য-নৈমিত্তিক গৃহকর্মে নিযুক্তা হইলেন, কিন্তু তাঁর প্রাণ পড়িয়া রহিল একজোড়া জুতার শব্দের উপর। কূপের ভিতর দড়ি-বালতি নামাইতে নামাইতে সুশীলাসুন্দরী একটা খটখট শব্দ শুনিয়া চমকিয়া দড়ি নামানো বন্ধ করিলেন—

কিন্তু কে যেন রাস্তায় বলিয়া উঠিল,—ধর্, ধর্, বাছুরটা পালিয়ে গেল।

সুশীলাসুন্দরী অসন্তুষ্ট হইয়া দড়ি নামাইতে লাগিলেন; জলে ভরিয়া বালতি তুলিলেন—টাটকা-তোলা ঠাণ্ডা জলে রাখালবাবু মুখ ধুইতে ভালবাসেন—তা-ই ঘটিতে করিয়া সেই জল বারান্দায় রাখিয়া দিলেন।

কিন্তু এবার বাছুর নয়, জুতার শব্দ করিতে করিতে রাখালবাবুই আসিয়া পড়িলেন—ঝরঝরে হাসিমুখে তিনি প্রবেশ করিলেন…জামা গেঞ্জি খুলিয়া ফেলিয়া চেয়ারে বসিলেন।

কিরণবালা তাঁহাকে পাখার বাতাস সেবন করাইতে লাগিল…

সুশীলাসুন্দরী বলিলেন,—ঘেমেছ বড়ো।

—যা গরম। বলিয়া রাখালবাবু বলিলেন,—কিরণ, মা, পাখা রেখে এক কলকে তামাক খাওয়াও। অপিসে বিড়ি খেয়ে খেয়ে তেতো হয়ে গেছি।

কিরণ পাখা রাখিয়া তামাক সাজিতে বসিল; সুশীলাসুন্দরী পাখা তুলিয়া লইয়া নিজেকে বাতাস করিবার ছলে স্বামীকে বাতাস করিতে লাগিলেন। বাতাস করিতে করিতে তিনি ঘুরিয়া আসিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন—তাঁহার চোখের উপর চোখ রাখিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন—নিজেকে…

হাওয়া খাইতে খাইতে রাখালবাবু আরামের একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, আঃ ·

সুশীলাসুন্দরী হুবহু প্রতিধ্বনির মতো নিষ্কপটে বলিলেন,—গা-টা এতক্ষণে জুড়লো?

—হুঁ্যা। বলিয়া রাখালবাবু হুঁকা লইতে কিরণবালার দিকে হাত বাড়াইলেন, আর সুশীলাসুন্দরী হাসিলেন—সে হাসির দ্বারা পুরুষকে ত্বরিতে আত্মবিস্মৃত করা যায় তেমনি একটু হাসিলেন, এবং হাসিতে হাসিতেই বলিলেন,—তোমাকে আমি অবাক করে দেব।

কিরণবালার হাত হইতে হুঁকা লইয়া রাখালবাবু ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—কি বরাত? কি রকম?

—হুঁ্যা, সতের বিয়ে দেব ঠিক করেছি।

শুনিয়া বুকে যেন অতর্কিতে তীর বিঁধিয়া রাখালবাবু তাঁর চেয়ারের উপর লাফাইয়া উঠিলেন।

—একেবারে ঠিক?—প্রশ্ন করিয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া বাকপটু রাখালবাবু জীবনে আজ প্রথম হতবাক্ হইয়া রহিলেন, মনে রহিল না যে তিনি তৃষ্ণার্ত।

সুশীলাসুন্দরী সেই অবসরে তার আরজি পেশ করিতে লাগিলেন;—তা-ই ইচ্ছে করেছি! আমার বুঝি সাধ-আহ্লাদ করতে ইচ্ছে যায় না! মানুষের কথা তো বলা যায় না; কবে আছি কবে নেই। কবে মরে-ধরে যাবো—বউটিকে দেখে যাই।

মরার কথাই চূড়ান্ত কথা।

চিরকাল দেখা যাইতেছে, রাখালবাবুর স্ত্রীই অগ্রগণ্যা, আত্মসুখ নহে। স্ত্রীর বিষণ্ণতাই তাঁর কিশোর বয়স হইতে একেবারেই সহ্য হয় না—পাগলের

মতো কারণ খুঁজিয়া বেড়ান। স্ত্রীর হতাশা আরো কঠিন কথা—মরার কথা ত' বজ্রতুল্য। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া রাখালবাবু বলিলেন,—মরার কথা বলো না, ওতে আমার কতো কষ্ট হয় তা কি জানো না? তুমি মরে গেলে আমার রইল কে? আমার দশাটা তখন কি হবে? ভিজিঘিজি ব্যাপার চার দিকেই, একা আমি সামলাবো কেমন করে! তুমি রয়েছ বলেই আমি এক দিকে নিশ্চিন্ত। না, না, মরার কথা মুখেও এনো না। শতবর্ষ তোমার পরমায়ু। দৈবজ্ঞ বলেছেন, আমিও বলি।—বলিয়া সেই সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রসারিত স্ত্রীর সাহচর্য এবং সহায়তালাভের আনন্দে রাখালবাবু বিহ্বল হইয়া রহিলেন…তারপর বলিলেন,—তা বেশ।

মনে হইল, স্বামী এক কথাতেই রাজী হইয়াছেন—সত্যশিবের বিবাহ দিতে তাঁর আপত্তি অনিচ্ছা একটুও নাই। কিন্তু স্বামীর স্ত্রী হিসাবে না হোক, নিজের পক্ষেরই সুচতুর উকিল হিসাবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে যে বিধান আছে তদনুসারে, সুশীলাসুন্দরীর কর্তব্য, অত বড়ো কথাটার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিবিধায়ক একটা অকাট্য শপথ আদায় করিয়া লওয়া।

বলিলেন,—তোমার বিয়েও ত' প্রায় ঐ বয়সেই হয়েছিল, মনে নাই?

—মনে আবার নাই!—মনে রাখালবাবুর ছিল, আছে এবং থাকে; সেই দিন হইতে পত্নীলাভের সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া তিনি তাঁর ভাগ্যবিধাতাকে অফুরন্ত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আসিতেছেন; আর, সেই বয়সেই বিবাহিতা পত্নী যখন দিবারাত্রি সম্মুখেই দেদীপ্যমানা, তখন প্রাপ্তির সেই শুভদিনটিকে স্মরণ না রাখিয়া উপায় কি?

ভাবাকুল কণ্ঠে রাখালবাবু বলিলেন—মনে আবার নাই! তা আবার জিজ্ঞাসা করছ!

রাখালবাবুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তিনি যেন স্ত্রীকে এই উপলক্ষে "অয়ি নিষ্ঠুরে" বলিয়া সম্বোধন করিতে চান।

তার পর একটু থামিয়া রাখালবাবু বলিলেন,—আমি বলিনি যে, তোমায় পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি! "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি"—এ-কথা একশো বার সত্যি। তোমার মতো স্ত্রী পেয়েছি বলেই ত' কুপিত শনি কিছু করে উঠতে পারছেন না—লক্ষ্মীর তেজে তিনি পিছিয়ে আছেন। বলিনি?—বলিয়া লক্ষ্মীস্বরূপিণী স্ত্রীর জোরে শনির সঙ্গে সংগ্রামে জিতিয়া গেছেন মনে করিয়া রাখালবাবু সুখে হাস্য করিতে লাগিলেন।

"স্ত্রীরত্নং" তিনি, এই ঘোষণায় সুশীলাসুন্দরী সন্তুষ্ট হইলেন। "দুষ্কুলাদপি" শব্দের অর্থ তাঁর জানা ছিল না; সুতরাং বলিলেন,—বলেছ। কিন্তু তা আর আমি শুনতে চাইনে। আমি বলছি, সত্তে'র বিয়ের কথা। ষেটের বাছা ত' তেরো বছরের হ'ল। বলিয়া সুশীলাসুন্দরী এমন করিয়া তাকাইয়া থাকিলেন, যেন অবোধ ব্যক্তিকে তিনি শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত হইতেছেন।

রাখালবাবু হুঁকা কিরণবালার হাতে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন,—কিন্তু মুশকিল কি জানো, অতটুকু মেয়ে তুমি কোথায় পাবে? ছোট ছোট মেয়ের বিয়ে দেওয়া নেই আজকাল।

অবোধ ব্যক্তিকে শায়েস্তা করিবার ইচ্ছা সুশীলাসুন্দরী আপাততঃ দমন করিলেন, শান্তস্বরে বলিলেন,—এই ত' উলটো গাইছ। দুধে-গন্ধওলা ছোট মেয়ে কে চাইছে তোমার কাছে? আট-নয়-দশ-এগারো কি ছোট হ'ল?

কিরণবালা লজ্জিত হইয়া তফাতে সরিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু এ বড় গুরুতর সমস্যা—সুশীলাসুন্দরী যাহাকে ছোট বলিয়া স্বীকার করিতে চান না, রাখালবাবুর তাহাকে মনে হয় ছোট। কিন্তু দুর্নীতি আর দারিদ্র্যের মতো দ্বন্দ্বকেও রাখালবাবু ভয় করেন; বলিলেন, তা নয়; তবে লোকের কি মত হয়েছে আজকাল—এই ধিঙ্গি ধিঙ্গি মেয়েগুলোকে বলে কুমারী।

বলিতে বলিতে রাখালবাবু কিরণবালার নিকট হইতে হুঁকাটা আবার চাহিয়া লইলেন; বলিতে লাগিলেন,—"বলে কুমারী আর খুকু। কলকাতায় দেখে এলেম সেদিন, তাদের বড়ো হ'তে কিছু বাকি নেই—অথচ বিয়ে হয়নি। —বলিয়া কলিকাতার ধিঙ্গি ধিঙ্গি মেয়েগুলা কত বড়ো, হাত উত্তোলিত করিয়া তাহা দেখাইতে যাইয়া তিনি কলিকার আগুন খানিকটা মাটিতে ফেলিয়া দিলেন।

—ও মা, গায়ে পড়েনি ত'?—সুশীলাসুন্দরী শঙ্কাত্বরিত প্রশ্ন করিলেন।

রাখালবাবু বলিলেন,—না; মাটিতে পড়েছে।

—আচ্ছা, জলটল খাও। হবে এখন কথা।

'জলখাবার' খাইতে খাইতে রাখালবাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সতে গেছে কোথায়?

—খেলতে বেরিয়েছে। সে ত' রেগে খুন।

—কারণ?

—কিরণ শ্বশুরঘরে না গেলে সে বিয়ে করবে না।

—কেন?

—বলে, দিদি বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করবে।

শুনিয়া রাখালবাবু 'জলখাবার' অর্থাৎ মুড়ির গ্রাস তাড়াতাড়ি ঢোক গিলিয়া নামাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে আসনের উপর হইতে প্রায় অর্ধেক বাহির হইয়া গেলেন···তার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন,—আমার ছেলে ত'! খাঁটি বামুনের রক্ত নেওড়ানো সেরা ছেলে; বুদ্ধি ওর রগে রগে। তা-ই বললে বুঝি?

জননীকে বাদ দিয়া জনকের বুদ্ধির ধার ছেলে পাইয়াছে, এই অন্যায় উল্লাসে স্বামী আত্মহারা হওয়ায় সুশীলাসুন্দরী বিরক্ত হইলেন; বলিলেন,—শুনলেই ত'! এক কথাই বার বার শুনতে চাওয়া কি?

কুঁদুলী বলায় করণেরও রাগ হইয়াছিল; ভ্রূভঙ্গি করিয়া সে বলিল,—ওই রকম!

রাখালবাবু বলিলেন,—আচ্ছা, আমি মেয়ে খুঁজতে লাগলাম। দুই বিয়ে একসঙ্গে লাগিয়ে দেয়া যাক। তোমার ইচ্ছা আমি চিরকাল পালন করে এসেছি—ধর্মপত্নীর মর্যাদা রেখেছি প্রাণপণে—এবারও রাখব। খরচেরও সাশ্রয় কিছু হবে।—বলিয়া তিনি জলযোগ সমাপ্ত করিয়া উঠিলেন।

রাখাল ভট্টাচার্য কাজ করেন সাব-অফিসে; আর, সঞ্জীব সান্যাল কাজ করেন ব্রাঞ্চ অফিসে। সঞ্জীবের একটি মেয়ে আছে। তাহার বিবাহ দিবার জন্য, সঞ্জীব উৎসুক নয়, অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। পিতা পুত্রীকে আপদ মনে করিয়া তাড়াইতে চান, কথাটা শুনিতে বড়ো অকরুণ; কিন্তু নেহাত নাচার হইলে অকরুণ কথা উচ্চারণ এবং অকরুণ কাজ সম্পাদন করিতেই হয়। সঞ্জীব তা-ই উদ্যোগী হইয়াছেন। মন্দাকিনী সঞ্জীবের প্রথমা স্ত্রীর কন্যা—দেখিতে সুশ্রী কিন্তু কলহপ্রিয়া। প্রথমা স্ত্রী ঐ কন্যাটি দিয়া গিয়াছেন, আর রাখিয়া গিয়াছেন পিত্রালয় হইতে সংগৃহীত দুই শত টাকা এবং তিন দফা অলংকার। স্বামীর নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইয়া গিয়াছেন যে, ঐ টাকা আর অলংকার মন্দার বিবাহ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে ব্যয় করিবেন না। সুতরাং কিছু মূলধন সঞ্জীবের হাতে আছে।

কিন্তু মূলধন হাতে থাকাই বড়ো কথা নয়, বড়ো হইয়া উঠিয়াছে এই কথাটাই যে, সৎমা মন্দাকিনীর সঙ্গে আর পারিয়া উঠিতেছে না—মন্দাকিনী হামেশাই তাঁহাকে চোখের জলে নাকের জলে একাকার করিয়া দিতেছে—সঞ্জীব নিজেও থই পাইতেছেন না। সৎমা কথাটাই এমন যে শুনিলেই মনে হয় সে পূর্বপক্ষের সন্তানগুলিকে যন্ত্রণা দিতেই আসে এবং লোকে মনে করে, বাপটাও যায় বউয়ের পক্ষে—সন্তানগুলিকে দেয় ভাসাইয়া।

সুতরাং সঞ্জীব সান্যাল বিপন্ন, সন্দেহ নাই এবং অতিষ্ঠ হইয়া মেয়ের বিবাহের কথা চিন্তা করিতেছেন—এমন কি, মাঝে মাঝে সশব্দে প্রকাশও করিতেছেন…

ধর্মপত্নীর অলঙ্ঘনীয় অভিলাষ পরিপূর্ণ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছেন, অর্থাৎ পুত্র সত্যশিবের জন্য একটি কনে তাঁহার চাই, রাখালবাবুও তাহা যথেষ্ট ব্যাপক ভাবে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন; কেহ অবাক হইয়াছে, কেহ বিদ্রূপ করিয়াছে কেহ নিষেধ করিয়াছে; কিন্তু ধর্মপত্নীর পাশে সে-সব লোক তুচ্ছ; রাখালবাবু তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

দেখুন একবার কার্যকারণ, আর যোগাযোগের ব্যাপারটা।

গঙ্গাধর বাগদী 'রাণার'। বল্লমের মাথায় ঘুঙুর বাজাইয়া প্রত্যহ সে সাব-অফিস হইতে ডাকের ব্যাগ লইয়া ব্রাঞ্চ-অফিসে যায়। এই গঙ্গাধর বাগদী করিল ঘটকের কাজ, অবশ্য গল্পচ্ছলে; সাব-অফিসে সে গল্প করিল যে, ব্রাঞ্চ-অফিসের সঞ্জীববাবু মেয়ের বিয়ের পাত্র খুঁজিতেছেন—মেয়ের বয়স মাত্র দশ; আর, ব্রাঞ্চ-অফিসে সে গল্প করিল, সাব-অফিসের রাখালবাবু পুত্রের জন্য পাত্রী খুঁজিতেছেন—ছেলের বয়স মাত্র তেরো।

ইহার পর পালা জমিয়া উঠিতে বিলম্ব হইল না, উভয় পক্ষই লালায়িত—গঙ্গাধর কথার বাহক হইয়া যাতায়াত করিতে লাগিল।

সুশীলাসুন্দরী বলিলেন,—কেমন হবে বলো দেখি?—আনন্দে তাঁহার গলা ধরিয়া আসিল।

রাখালবাবু বলিলেন,—লক্ষ্মীনারায়ণ…

—শিব আর সতী।—ঐ তুলনা দেওয়ায় স্বামীর উপর, অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণের উপর 'টেক্কা দেওয়া' হইয়াছে মনে করিয়া সুশীলাসুন্দরী হাসিয়া

ফেলিলেন, বলিলেন,—কিরণ যাবে ভেবেই আমার বুক হু-হু করছে দিন-রাত ; খাওয়া ঘুম আমার একরকম নেই। বউমাকে, সেই সঙ্গে মেয়েকেও চিরদিনের তরে ঘরে ফিরে পাবো। আমার যে কি করতে ইচ্ছে হচ্ছে তা আমি জানিনে।

রাখালবাবু বলিলেন,—খুবই আনন্দের কথা বটে, কিন্তু মেয়ে-পক্ষ টাকা-কড়ি তেমন খরচ করবে না। জানি ত'! অবস্থা ভালো নয় ; করতে পারেই না। ছোট ছোট বর-কনে'র খরচও কম কম। কিরণের বিয়ের খরচ বলে তোমার মামারা কিছু কিছু দিতে চেয়েছেন বটে ; কিন্তু আমারও খরচ হবে মেলা। সঞ্জীবকে কি জবাব দেব? তোমার কি মত?

শুনিয়া সুশীলাসুন্দরীর মুখ দিয়া উত্তাপ নির্গত হইল ; বলিলেন,—এই ন্যাকামি শুরু হ'ল। আমার মত আমি লুকিয়ে রেখেছি না কি যে টেনে বার করতে চাইছ? মেয়ে দেখতে যাবার দিন ঠিক করে চিঠি লিখে দাও।

সত্য মায়ের কানে কানে বলিল,—মেয়ের রং কালো হলে কিন্তু আমি পছন্দ করবো না।

- কি বলছে?—রাখালবাবু সোৎসুকে জানিতে চাহিলেন।

—কালো মেয়ে পছন্দ করবে না। তা তোকে করতে হবে না। গঙ্গাধর বলেছে, মেয়ে পরমা সুন্দরী।—বলিয়া সুশীলাসুন্দরী খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

রাখালবাবু বলিলেন,—সুন্দর রুচির জন্য আমাদের বংশ চিরকাল প্রসিদ্ধ। আমার বিয়ের সময় তোমাকে কত বার দেখা হয়েছিল মনে আছে?—বলিয়া রাখালবাবু তখনকার কর্তা ব্যক্তিদের সুরুচি আর নির্বাচন-শক্তি স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতার আনন্দে গা দোলাইতে লাগিলেন।

নাক তুলিয়া সুশীলাসুন্দরী বলিলেন,—তা আবার নেই? জ্বালিয়ে তুলেছিল। বড় মামা ত' রেগে লাল।

শুনিয়া রাখালবাবু বলিলেন,—আমার মা-ও খুব সুন্দরী ছিলেন ; ঠাকুমার নাম ছিল তিলোত্তমা ; রূপেও তা-ই ছিলেন। তাঁর রূপ দেখতে দেখতে ঠাকুর্দা না কি কিছু দিন পাগল হয়ে গিয়েছিলেন! কিন্তু আমি—

—তুমি ছিট পেয়েছ। যাও, আর দাঁড়িয়ে ঢং করো না। পাঁজি দেখে দিন-টিন ঠিক করে ফেলো।

—হ্যাঁ, মেয়ে দেখার দিন একটা ঠিক করিগে। বলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রাখালবাবু পুত্র সত্যশিবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—সত্য, পড়াশুনো করিস বাপু মন দিয়ে। দায়িত্ব পড়ল ঘাড়ে। আমার ছেলে হয়ে যদি মূর্খ হয়ে থাকো, আর, ছেলে-পিলেকে খেতে দিতে না পারো তবে সে বড়ো ঘেন্নার কথা হবে। বুঝলে?

সত্যশিব ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—বুঝেছি।

যে-তারিখে কিরণবালার বিবাহের কথা হইয়াছিল সেই তারিখই স্থির হইল সত্যশিবের বিবাহের। কীর্ণাহারের সন্তোষবাবু পত্রে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার অনুজ পরিতোষবাবু কলিকাতার হাটখোলার বাসায় 'সংশয়াপন্ন পীড়িত' হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি সুস্থ হইয়া উৎসবে যোগদান করিতে সমর্থ না

হওয়া পর্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিতে হইবে—উপায়ান্তর নাই। পণ বাবদ যখন টাকা কিছু 'অগ্রিম লওয়া' হইয়াছে তখন বিবাহ 'অবশ্যম্ভাবী'…ইত্যাদি।

কিরণবালা খুশী হইয়া উঠিল।

ওঁরা, স্বামী-স্ত্রী, একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং ঐ দিনেই রাখালবাবুর গৃহে বিয়ের বাঁশী বাজিয়া উঠিল।

বর রেল-গাড়ীতেই উঠিবে; কারণ সঞ্জীববাবু জানাইয়াছেন যে, বিবাহ তাঁহার দাদার বাসায় রামসুন্দরপুরে হইবে—শহর জায়গা, বাড়িটা বড়ো, রেলের ধারে; 'বরপক্ষীয় মহোদয়গণের' যথোচিত অভ্যর্থনার আয়োজন করা সেইখানেই সহজ—উঁহাদের যাতায়াতও সহজসাধ্য হইবে; গোযানে আট মাইল আসা অপেক্ষা রেলগাড়ীতে চাপিয়া সাত-আটটি স্টেশন অতিক্রম করাই কম কষ্টকর—দাদার বাসাটাও রামসুন্দরপুর স্টেশনের 'অতি নিকটেই'।

খুশী হইয়াই রাখালবাবু সম্মতি দিয়াছেন।

স্ত্রী-প্রাপ্তির উপরেও গাড়ীতে উঠিয়া ঘটা করিবার সুযোগ পাওয়ায় সত্যাশিবও যে কত পুলকিত হইল তাহা বলিবার নয়…

বরবেশে ক্ষুদ্র সত্যাশিব চমৎকার হইয়া উঠিয়াছে। 'মায়ের দাসী' আনিতে হাওয়া-গাড়ীতে চাপিয়া আর ব্যাণ্ড বাজাইয়া সে স্টেশনে যাইয়া উঠিতেই তাহার চতুর্দিকে দর্শকবৃন্দের ঠেলাঠেলি লাগিয়া গেল…

গলায় ফুলের মালা, গায়ে গরদের কোট, পরনে চেলী, পায়ে পাম্পসু আর লাল রেশমী মোজা, কপালে শ্বেত-চন্দনের ফোঁটা, আর, তাহার হাসি-হাসি মুখ দেখিয়া অনেকে বাহবা দিল যত, জাতিতে ব্রাহ্মণ শুনিয়া কেউ কেউ অবাক হইল তত।

একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভিড় ঠেলিয়া কাছে আসিয়া সত্যাশিবকে খানিক নিরীক্ষণ করিলেন; তারপর অযাচিত ভাবে আশীর্বাদ করিলেন; 'বেশ থাকবে, বাবা। আমারো ঐ বয়সেই বিয়ে হয়েছিল; বেশ আছি আজ পর্যন্ত। কাঁচা বাঁশে বাঁধন কষলে বাঁশ শুকিয়ে বাঁধন ঢিলে হয়ে যায়, এ সত্যি। কিন্তু বিয়ে করবে ত' এই বয়সে। কাদায় কাদায় বেমালুম মিশ খেয়ে যাবে; তরল প্রাণের সে-আলিঙ্গন আলগা হবে না কখনো। আশীর্বাদ করছি, সুখী হবে।'

—মহাশয়ের নিবাস?—জিজ্ঞাসা করিয়া রাখালবাবু এবং তাঁহার সঙ্গে তাঁর 'দক্ষিণহস্ত' ভোলানাথবাবু অগ্রসর হইয়া আসিলেন…

—নিবাস এই কাছেই, বিনোদনগর।

—মহাশয়েরা?

—ব্রাহ্মণ।

—সত্য, প্রণাম করো।

সত্যাশিব খুব গম্ভীরভাবে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিল।

ওদিকে ঢুলি তিন জন এই নাবালক গৃহস্থের ছেলের বিবাহে এমন উৎসাহের সঙ্গে লাফাইয়া লাফাইয়া কাঠির ঘা মারিয়া ঢোল বাজাইতে লাগিল যে, তাহাদের ভিতরকার ঐ মেডেলধারী লোকটাও সাবালক রাজপুত্রের বিবাহে তত উৎসাহের সঙ্গে অবিরাম কাঠির ঘা মারে নাই।

সে যাহাই হউক, গাড়ী আসিল, এবং গাড়ীতে চাপিয়া বর যাত্রা করিল।

স্টেশনে গাড়ী দাঁড়াইলেই লোকে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া সত্যশিবকে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। মতিপুর স্টেশনে মতিপুরের কয়েকটি যুবক হুলুধ্বনি করিল।

সারাটি পথ এইভাবে অযাচিত অজস্র আনন্দ দান করিতে করিতে বর, পিতা এবং সঙ্গিগণকে লইয়া কন্যাগৃহে উপনীত হইল…স্ত্রী-আচার হইতে কুশণ্ডিকা পর্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান এবং আদর আপ্যায়ন 'আহারাদি' একেবারে অক্লেশে সুনির্বাহ হইয়া গেল…রাখালবাবুর 'দক্ষিণহস্ত' হিসাবে ভোলানাথবাবু এত পরিশ্রম আর মোড়লী করিলেন যে, বৈবাহিক-গৃহের লোকের মনে শ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল।

রাখালবাবুর সহকর্মী তারাপতি সেন গান গাহিয়া সে-দেশের লোকের মন হরণ করিলেন।

কিন্তু এ-বধূর রূপের বোধ হয় বর্ণনা নাই—পিতৃগৃহের কুমারী কন্যার শ্রী বর্ণনীয় হইলেও, মতান্তরে বধূ হিসাবে তাহা বর্ণনীয় না-ও হইতে পারে। মন্দাকিনী সুন্দরী; কিন্তু রূপের পুরামাত্রার বর্ণনাকে তেমন প্রাণবন্ত করিয়া তোলা যাইবে না; কারণ, সে-রূপ এখন যেন নিরাকার। মন্দাকিনী এখন বধূ বলিয়াই বলিতে হয় যে, রূপ বলিতে যাহা বুঝি, দেহের সেই অর্চনাভিলাষ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া দুর্বার হইয়া ওঠে নাই—সম্ভাবনা যতদূর পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা মনোরম। কিন্তু বালিকা বধূর রূপ নাই; রূপের যে প্রধান ধর্ম, অপরিমেয়তার ইঙ্গিত, বালিকার তাহা নাই; সুতরাং কন্যারূপ ছাড়া বধূরূপ তাহার নাই।

মন্দাকিনীর বর্ণ গৌরাভ, উজ্জ্বল, চক্ষু আয়ত, হাতের পায়ের গড়ন ভাল, চুল দীর্ঘ ইত্যাদি।

সত্যশিব 'মায়ের দাসী' আনিয়া মায়ের হাতে অর্পণ করিল; সুলক্ষণযুক্তা রূপবতী বউ দেখিয়া সুশীলাসুন্দরী গলিয়া গেলেন…

কিন্তু রাখালবাবু গলিতে লাগিলেন অন্যদিক দিয়া; বৈবাহিক-গৃহে অনভ্যস্ত জলে স্নান করিয়া জলটা হঠাৎ সহ্য করিতে পারেন নাই—তাঁহার সর্দি করিয়াছে। সব ভাল'র মধ্যে ঐটুকু মন্দ।

স্টেশনে বর দেখিতে ভিড় জমিয়াছিল।

বাড়িতে বউ দেখিতে আহূতের উপর রবাহূতের ভিড় লাগিয়া গেল।

মুখ দেখাইবার সময় চোখ বুজিতে হয়—নববধূর পক্ষে এ নিয়ম অপরিহার্য; কিন্তু মন্দাকিনী তাহা জানিয়া শুনিয়াও মাঝে মাঝে ভুল করিতে লাগিল; আর অদৃষ্টের এমনি ফের যে, পাড়ার শ্রেষ্ঠা নারী এবং নারী-সম্প্রদায়ের অভিভাবিকা কুসুম ঠাকুরাণী যখন তাহার মুখের কাপড় তুলিলেন তখনো সে চোখ বুজিতে ভুলিয়া গেল…

কুসুম তাহার চোখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—ওমা, এ যে প্যাট প্যাট করে মুখের পানে তাকিয়ে রয়েছে!

শুনিয়া মন্দাকিনী তাড়াতাড়ি চোখ বুজিল; কিন্তু কৃতকর্মের ত্রুটি সংশোধন তাহাতে হইল না।

কুসুম তাহার মুখের উপরকার কাপড় মুখের উপর ছাড়িয়া দিয়া সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; ডাকিলেন,—সুশী কই রে ?

—কি বলছেন, মাসীমা ?—বলিয়া সাড়া দিয়া সুশীলাসুন্দরী ছুটিয়া আসিলেন।

—তোর বউয়ের ত' পয় ভালো নয় রে। প্যাঁট প্যাঁট করে মুখের পানে তাকিয়ে দেখছে !—বলিয়া ভবিষ্যতের করাল মূর্তি' যাহা তিনি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা বধূর শাশুড়ীকে দেখাইয়া দিলেন, বলিলেন,—ছেলেকে ও-মেয়ে গিলে খাবে।

কুসুম ঠাকুরাণী সকলের মাসী—সকল কালের মাসী। কেশব মীন-শরীর ধারণ করিবার পূর্বে নাকি কুসুমকে মাসী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন ; সত্যসন্ধ লম্বোদর বিশ্বাস তাঁহার আশী বছরের প্রাচীনত্বের দোহাই মানাইয়া এই বার্তা রাষ্ট্র করিয়াছেন।

সে যাহাই হউক, মাসী হাঁ করিয়া রহিলেন···মাসীর দাঁত নাই ; থাকিলে হাঁ এমনধারা অবাধ গুহার মতো দেখাইত না !

'ছেলের হাড় ক'খানা টিকলে হয়।' বলিয়া তিনি নিজেই বালকের অস্থিখাদিকা একটি কল্পিতা রাক্ষসীর অনুকরণে সুবৃহৎ হাঁ সুশীলাসুন্দরীর সম্মুখে, এবং তাহাকে আতঙ্কিতা দেখিয়া যাহারা ছুটিয়া আসিয়াছিল তাহাদেরও সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া রাখিলেন···

মাসীর মুখের অভ্যন্তরের দিকে চাহিয়া সুশীলাসুন্দরী ইহা বলিলেন না যে, প্রবেশপথ যাহার এত প্রশস্ত, না জানি, তাহার ভিতরের ঠাঁই কত বড়ো !—বলিলেন,—সে কি বলছেন, মাসীমা ! আজ ও-সব কথা বলতে নাই।

মাসী তাঁহার স্বচ্ছ এবং স্বচ্ছন্দ ভবিষ্যদ্দর্শনের বলেই মানুষের শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিয়াছেন ; বৃষ্টিপাত সম্বন্ধেও তাঁহার ভবিষ্যদ্‌বাণী খনাকে, অন্ততঃ এ পাড়ায়, বাতিল ও না-মঞ্জুর করিয়া দেয়।

তাঁহার ভবিষ্যদ্‌বাণীর বিরুদ্ধবাণী সুশীলাসুন্দরীর মুখে শুনিয়া তাঁহার হাঁ বুজিয়া গেল—পৃথিবীর রাহুগ্রাসের ভয় ঘুচিল ; কিন্তু তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া গেলেন ; বলিলেন,—তবে আমার কথা মিথ্যে—সবাই যা বলছে তাই সত্যি ; বউ তোমার লক্ষ্মী ভাঁড়ার ভরে দেবে, দু'হাতে খেও।—বলিয়া তিনি পূজারিণীর মতো অঞ্জলি রচনা করিয়া পাদমূলে ঢালিয়া দিবার একটা ভঙ্গী করিলেন, এবং কাহারও নিষেধ না মানিয়া সে-স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন।

কিরণবালা সেইখানেই বসিয়াছিল—গালে হাত দিয়া সে আদ্যন্ত দেখিল এবং শুনিল ; কুসুম ঠাকুরাণী চলিয়া গেলে সে বলিল, কেমন যেন !

কিন্তু কুসুম ঠাকুরাণী একা অশুভ বিপরীত কথা বলিলে কে শুনিবে ? আর দশজনেরও ত' চক্ষু আছে, পয়া অপয়া বুঝিবার বুদ্ধি আছে ! তাহারা সবাই বলিতেছে, "অতি সুশ্রী বউ আসিয়াছে। লক্ষ্মীশ্রী বউয়ের আপাদমস্তকে।"

আরো অনেক কথা জন্মিল, মরিল।

স্নেহ, সখিত্ব, আশীর্বাদ এবং হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়া মন্দাকিনী এই পরিবারে ভর্তি হইয়া গেল ; তার কাঁখ জুড়াইল ; বিমাতার মেয়ে টানিয়া টানিয়া সে ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

বউ পরিষ্কার মা বলিয়া ডাকে—সুশীলাসুন্দরীর কর্ণে অমৃত বর্ষিত হয়। শ্বশুরকে সে মুক্তকণ্ঠে বাবা বলিয়া ডাকে; শুনিয়া রাখালবাবুর মুখ দিয়া শব্দ বাহির হয় না, এত আনন্দ জন্মে; 'দক্ষিণহস্ত' ভোলানাথ বাবুকে সে বলে জ্যাঠামশায়, শুনিয়া ভোলানাথ তাহাকে অশেষ সৌভাগ্যলাভের সুদীর্ঘ আর সারগর্ভ আশীর্বাদ করেন।

হাঁচি টিকটিকি পড়ে না।

মন্দাকিনী ঘুরিয়া ফিরিয়া কাজ করে—'বুঝিয়া সুঝিয়া' লইয়াছে। শ্বশুরের সেবা করে: তামাক সাজে, ঘটিতে গাড়ুতে জল দেয়, যখন যাহা প্রয়োজন…

সুশীলাসুন্দরী অপলক চক্ষে তাহার কর্মচঞ্চলতা নিরীক্ষণ করেন, আর, কুসুম ঠাকুরাণীর দন্তহীন মুখখানা মনে পড়িয়া তাঁহার অষ্টাঙ্গ জ্বলিতে থাকে।

কিরণবালা সেই অবসরে গল্প আর সেলাই করিতেছে ঢের।

মুখ টিপিয়া হাসিতে সত্যশিব কোথায় শিখিল কে জানে; কিন্তু সে মুখ টিপিয়া হাসে আর আড়চোখে চায়। মন্দাকিনী স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া দ্রুত হস্তে ঘোমটা টানিয়া দেয়।

সত্য বলে,—লাজ দেখে আর বাঁচিনে! মা, শুদোও ত', আমার পেনসিলটা দেখেছে কি না?

মন্দাকিনী মাথা নাড়ে—সে দেখে নাই।

সুশীলা বলেন,—তুই ঘোমটা টেনে মুখ আড়াল করিসনে, মা। তোদের দু'জনের মুখ একসঙ্গে দেখতে দে: দেখে আমার চোখ জুড়োক।

বলিতে না বলিতে সত্যশিব তড়াক করিয়া লাফাইয়া আসিয়া বউয়ের ঘোমটা তুলিয়া দেয়; বলে,—মায়ের কথা শুনতে হয়। সৎমা'র কথা ত' নয়! এ একেবারে আদৎ মা।

শুনিয়া সে-দিন সুশীলাসুন্দরী চীৎকার করিয়া উঠিলেন: ওগো, কোথায় গেলে সত্য'র বাবা? শুনে যাও।

রাখালবাবু বৈঠকখানায় ছিলেন চীৎকার তাঁহার কানে গেল। অন্তঃপুরে অকস্মাৎ দুর্ঘটনা ঘটিবার আশঙ্কায় শশব্যস্ত হইয়া রাখালবাবু খালি পায়েই দৌড়াইয়া আসিলেন; স্ত্রীর কণ্ঠের অতখানি উচ্চধ্বনি যে বিপদে সাহায্যার্থে নয়, অপার আনন্দের অভিব্যক্তি তাহা তিনি কেমন করিয়া বুঝিবেন?

—কি হ'ল?—সংবাদ জানিতে চাহিয়া রাখালবাবু ব্যস্ত ভাবে আসিয়া দাঁড়াইলেন…

সুশীলা বলিলেন,—ছেলে কি বলছে শোনো।

শুনিবার পূর্বেই স্ত্রীর মুখে হাস্যবিকাশ দেখিয়া রাখালবাবুর দুশ্চিন্তা দূর হইল; তখন তিনিও হাসিতে লাগিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলছে?

—বলব রে? বলিয়া জননী কৌতুকে স্নেহে উদ্বেল হইয়া পুত্রের মুখের দিকে নেত্রপাত করিলেন…

সত্যশিব সলজ্জ মুখে ঈষৎ হাসিয়া আর মাথা নাড়িয়া অনুমতি দিল।

সুশীলা বলিলেন,—আমি বললাম বউকে, মা, তুই ঘোমটা দিসনে—তোদের দু'জনার মুখ একসঙ্গে দেখতে দে ; দেখে আমার চোখ জুড়োক।

রাখালবাবু বলিলেন,– তা বটেই ত'! আমারও সেই ইচ্ছে রয়েছে বরাবর। তারপর?

—তাতে ছেলে বউয়ের মুখের কাপড় তুলে দিয়ে বললে, মায়ের কথা শুনতে হয় ; সৎমায়ের কথা ত' নয়। এ একেবারে আদৎ মা। শুনলে কথা? দেখলে বুদ্ধি?

কথা যে শুনিয়াছেন, বুদ্ধি যে দেখিয়াছেন তাহার লক্ষণ রাখালবাবুর মুখের রেখায় আর চোখের দীপ্তিতে অসাধারণ আর অপার হইয়াই দেখা দিল—শব্দ উচ্চারণ তিনি করিলেন না।

তিনি যে সৎমা নন, আদৎ মা, এই আনন্দে, আর, পুত্র তাহা অতুলনীয় ভাবে প্রকাশ করিয়া মায়ের মর্যাদা মা-কে দিয়াছে, এই আরো আনন্দে বিহ্বল হইয়া সুশীলাসুন্দরী পুনরায় সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন,—দেখলে বুদ্ধি?

কিন্তু গৌরব যেন একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য এমনিভাবে রাখাল বলিলেন, আমারই ত' ছেলে!

—খালি তোমারই ছেলে? আমার নয়?

—তোমারও। রাখালবাবু গৌরব বণ্টন করিয়া দিয়া হাসিতে লাগিলেন—তাহাতে সুশীলাসুন্দরীও হাসিতে লাগিলেন, সত্যও হাসিতে লাগিল···

হাসিল না কেবল কিরণ।

সে বলিল,—ঐটুকু ছেলের পাকা পাকা কথায় রাগ হয় আমার।

মন্দাকিনী শাশুড়ীর বড়ো অনুগতা হইয়াছে ; আজ পর্যন্ত গরমিল হয় নাই। বৈষম্য কেবল এইটুকু যে, শ্বশুরের প্রতি শাশুড়ী যে বাক্য প্রয়োগ করেন তাহা শুনিয়া মন্দাকিনীর মনে হয়, ঝাঁজ আছে।

সুশীলার আশা সে সফল করিয়াছে—যে ঘটনায় বিবাহের চিন্তা অঙ্কুরিত হইয়াছিল সেই ঘটনার কথা মনে পড়িয়া সুশীলা মনে মনে হাসেন।

দ্বিপ্রহরে তিনি শয়ন করিলে মন্দা তাঁহার পায়ে তৈলাক্ত হাত বুলায়; সুকোমল হস্তের মৃদু মৃদু স্পর্শে সুশীলাসুন্দরীর দেহ কখনো রোমাঞ্চিত কখনো অবশ হইয়া নিদ্রাকর্ষণ হয় ; এই বিশ্রামকে কুসুমিত করিয়া জীবনব্যাপী একটা সুখস্বপ্ন গড়িয়া ওঠে···

বউকে তিনি আশীর্বাদ করেন।

কিন্তু ঐ যত্ন আর পরিচর্যা আর আদর কি একতরফাই চলে কেবল। তাহা নয়—

সুশীলাসুন্দরী বধূমাতার কবরী রচনা করিয়া দেন ; বলেন, মেঘবরণ চুল; রাজকন্যার চুল ; যমের চোখ-ধাঁধানো ডগডগে সিঁদুরের টিপ তাহার কপালে দেন, বলেন, পাকা চুলে সিঁদুর পরো ; আঙুলের সিঁদুর তাহার শাঁখায় লাগাইয়া দেন ; তাহার হাতে সিঁদুর লন ; ভিজা গামছায় তাহার মুখ মুছিয়া দিয়া তাহার মুখ-চুম্বন করেন—

মন্দাকিনী তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে ; সুশীলার সুখের সাগর চন্দ্রকিরণে স্ফীত হইতে থাকে।

—বউমা ?

—যাই, বাপু, যাই। অত করে বউমা বউমা করলে চলবে কেমন করে। এ যে আদৎ মা আমার সৎমায়ের বাড়া হ'ল ?

—সৎমায়ের বাড়া হ'লাম না কি ? তুমি যে সতীনের বাড়া হয়েছ আমার !

—তা যদি হয়ে থাকি ত' হয়েছি। তাড়াতে ত' পারছ না !

—অমন ছোকরা ইয়ে আমাদের একদিন ছিল ; কিন্তু অমন গিদের করি নাই কোনো দিন।

—করলেই পারতে।

—তুমি বাপু ভালো লোকের মেয়ে নও।

—বাপ তুলে কথা কয় ছোটলোকের মেয়েরাই।

—আমার বাবাকে তুই ছোটলোক বললি ?

—বললেই শুনতে হবে।

সময় বৈকাল।

অনেক কাজ বাকি—

কেশ-রচনায় একটু ত্বরান্বিতা হইবার আদেশ সুশীলাসুন্দরীর ঐ 'বউমা' সম্বোধনে ছিল। কিন্তু আজ না হয় উহাই ছিল ; অসহ্য হইয়াছে ; কিন্তু তাহার পূর্বদিন ? পুনরায়, তাহারও পূর্বদিন ? আবার পুনরায়, তাহারও পূর্বদিন ? এবং ঐভাবে কয়েকটা বছরই ? মোট কথা, কলহ বাধিবেই—তার আবার সময় অসময়, কাজ অকাজ, কারণ অকারণ কি ?

মন্দাকিনী গৃহের শান্তি নষ্ট করিয়াছে—শাশুড়ীর পায়ে তেলমাখা হাত বুলানো সে ছাড়িয়া দিয়াছে কবে তার ঠিক নাই—কিরণের বিবাহের পূর্বেই। অশান্তির অভিযোগ শুনিতে শুনিতে গৃহকর্তা রাখালবাবুর প্রাণ গেল।

চারটে বছর আর কটা দিন। যেন পাখায় ভর করিয়া দেখিতে দেখিতে চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সুশীলাসুন্দরী অনুতাপের জ্বালা আর সহিতে পারেন না—তাঁহার মনে হয়, পায়ে তেল মাখাইতে বউ তিনি আনেন নাই, নিজের হাতে খাল কাটিয়া ঘরে কুমীর আনিয়াছেন।

সত্যশিব ইস্কুল ত্যাগ করিয়াছে।

নূতন হেড-মাস্টার রাখালবাবুকে ডাকিয়া একদিন বলিয়া দিয়াছিলেন, আপনার ছেলেকে ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিন, ছেলেগুলোকে ও খারাপ করছে ; স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারের আলোচনা করে। বছর দুতিন করে এক ক্লাসে থেকে ছেলে যথেষ্ট যোগ্য হয়েছে ; আর কেন ?—বলিয়া হেড-মাস্টার ঘৃণায় অধরোষ্ঠ ধনুকের মতো বক্র করিয়া তুলিয়াছিলেন।

সেদিন সত্য ইস্কুল হইতে ফিরিল শূন্যহস্তে।

মা জানিতে চাহিলেন, বই কোথায় ?

সত্য বলিল, ইস্কুলের পুকুরের জলে সরস্বতীর বিসর্জন দিয়েছি।

তা সে দিক ; কিন্তু পরম কষ্টের কথা এই যে, রাখালবাবু এখন বৈকালিক জলযোগের পর বাহির হইয়া যান—যেখানে সেখানে বসেন, যেখানে সেখানে বেড়ান ; সময় কাটাইয়া ফেরেন সেই রাত দশটায়।

সুশীলা বলেন,—তুই শেষকালে লোকটাকে ঘরছাড়া করলি ? রাক্ষুসী ত' সর্বনাশী···

মন্দাকিনী বলে,—ভেবে দেখ, আমি করি নি ; ঘরছাড়া তিনি যদি হয়ে থাকেন তবে তুমিই করেছ।

সত্যাশিব মাঝে মাঝে অর্ধরাত্রে উঠিয়া বলে,—মা, ভালো হবে না বলছি। গজগজ করো না অত। আমাদের হাতে একদিন তোমাকে পড়তেই হবে।

বৈধব্যের এবং তখনকার অসহায় অবস্থার কল্পনা করিয়া সুশীলা আঁতকাইয়া ওঠেন না—ছেলের কটূক্তি তাঁহাকে তেমন আঘাত করে না ; বলেন,—সে তখন দেখা যাবে। রাত জেগে তা জানিয়ে কি হবে !

রাখালবাবুর নাসিকা তখন দ্বিগুণ বেগে গর্জন করিতে থাকে।

সে যাহাই হউক, আজিকার কথাই বলিতেছিলাম।

আজ বৈকালে মন্দাকিনী বেণী-বয়ন এবং কবরীবন্ধন সমাপ্ত করিয়া পরিপাটি হইয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল,—কি বলছ ?

সুশীলা বলিলেন,—বলছি, ঝি আসে নাই আজ। ঘর-দোর-উঠোনটা ঝাঁটপাট দাও, আমি লণ্ঠনে তেল ভরি। আবার কি বলব তোমাকে !

মন্দাকিনী বলিল,—আমিই বরং লণ্ঠনে তেল ভরি ; তুমি উঠোন-টুঠোন ঝাঁটপাট দাও। আমার আলিস্যি লাগছে বড়ো।—বলিয়া সে আর দাঁড়াইয়া না থাকিয়া লণ্ঠন লইয়া ওদিকে চলিয়া গেল।

সুশীলা বলিলেন,—আমি গা ধুয়েছি, তা দেখছিসনে চোখে ? তোর কথাই হ'ল ষোল আনা ; আমি কেউ নই না কি ? আমাকে দাসী-বাঁদী পেয়েছিস যে পায়ে ঠেলতে চাস ?

মন্দাকিনী উত্তর করিল,—বউকে তুই-তুকারি করে কারা জানো ?

ফাটিয়া পড়িবার পূর্বে সুশীলাসুন্দরী জানিতে চাহিলেন,—কারা ?

—আমাদের দেশের হাড়ি-বাগদীরা।

—কি, আমাকে বললি হাড়ি-বাগদী ?

—যেমন আচরণ—

—হাড়ি-বাগদীর আচরণ আমার ? ওরে, আমি হাড়ি-বাগদী, না, তোর বাবারা হাড়ি-বাগদী ? তোরা চামারের জাত—তোর বাবার ঠিক নাই।—বলিয়া বধূর ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িবেন, কি, ছুটিয়া বাড়ির বাহির হইয়া যাইবেন, সুশীলাসুন্দরী যখন এই দ্বিধায় পড়িয়াছেন ঠিক তখনই দুর্বহ দেহখানাকে কোনো প্রকারে টানিতে টানিতে রাখালবাবু প্রবেশ করিলেন···

স্বামীকে সম্মুখে পাইয়া সুশীলাসুন্দরীর বধূর ঘাড়ে লাফাইয়া পড়া হইল না, বাড়ির বাহির হইয়া যাওয়াও হইল না—তাঁহাকেই তিনি বলিতে লাগিলেন : 'এই আমার অদেষ্টে ছিল। বউয়ের হাতে এত অপমান রোজ রোজ ! তুমি তো গোবরগণেশ, পাথর ; চোরের মতো চুপ করে মার খাচ্ছ। তুমি আবার মানুষ !

গলায় দড়ি দিয়ে তোমার মরা উচিত।'—বলিয়া সুশীলাসুন্দরী দড়ি দেখাইয়া দিলেন না, চোখের জলে ভাসিতে লাগিলেন…

লণ্ঠনে তেল ভরা শেষ হইয়াছিল—মন্দাকিনী নিঃশব্দে 'কোঠায়' উঠিয়া গেল।

রাখালবাবু বলিলেন,—আমি আর পারিনে। চারিদিকেই অশান্তি আর 'ভিজিঘিজি' ব্যাপার। সত্যেটা মানুষ হল না, করল কেবল ফেল। এদিকে বাড়িতেও অশান্তি, তুমি যা বলেছ তা ঠিক—রোজ রোজ অশান্তি।

—বউকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। চাইনে আমি অমন বউ, বউকে আমি ত্যাগ করলাম।

—তুমি ত্যাগ করলে হবে না—আইন তা নয়। স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে, শাশুড়ী বউকে পারে না। আমি যদি এখন বউকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিই তবে সত্যে তোমার মাথা ভাঙবে বাড়িতে, আমার মাথা ফাটাবে রাস্তায়। তার এখন নবীন যৌবন, নতুন সুখ; উপায় কি করি! নিত্যি নিত্যি তাড়াবার কথা বলাও দোষ। তোমার তাতে দোষ নাই—তুমিই বা সইবে কত! সে যা-ই হোক, বউমাকেও বলি, ভদ্দরের ঘরে কেন এ-সব ঘটে! শত্রু হাসছে।—বলিতে বলিতে রাখালবাবু যেন শত্রুর হাসিতে আরো হতাশ হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন…

বলিলেন,—কিছু খাবার টাবার দাও—খেয়ে-দেয়ে বেরুই।

জামা-জুতা ছাড়িয়া নিজেই জল তুলিয়া হাত-মুখ ধুইয়া রাখালবাবু অন্যমনস্কের মতো পুনরায় চেয়ারে বসিতে যাইতেছিলেন; হঠাৎ তামাকের কথা মনে পড়িয়া তামাক সাজিতে গেলেন।

ইত্যবসরে খাবার আসিল।

তামাকের হাত ধুইয়া আসিয়া রাখালবাবু জলযোগে বসিলেন; খাইতে খাইতে নিম্নস্বরে বলিলেন,—সত্যে'টা হয়েছে স্ত্রৈণ…

—একেবারে ভেড়া।—সুশীলা বলিলেন।

—কিন্তু এমন যে হবে তা কখনো ভাবি নাই—ঘুণাক্ষরেও ভাবি নাই। সত্যে যে লেখাপড়া শিখবে না, দুর্মুখ দুর্বৃত্ত হবে, গ্রাহ্য করবে না তোমাকে আমাকে, এ ত' স্বপ্নেও কখনো দেখি নাই। ইস্কুলের বেয়াড়া ছেলেদের সঙ্গে মিশেই সে বজ্জাতি শিখেছে—অশান্তিরও একশেষ। তারপর বাড়িতেও যা তা 'ভিজিঘিজি' ব্যাপার। এখন আমাদের সংসারে বাস বিড়ম্বনা; কণ্টকর হয়ে উঠেছে; কিন্তু কোথায়ই বা যাই! চাকরিটা রয়েছে—যেমন তেমন চাকরি, দুধ-ভাত…

—যাবে কোথায়? যেতে চাও কোথায় তুমি? কার ভয়ে যেতে চাও? বউয়ের ভয়ে? ধিক্ তোমাকে।—সুশীলাসুন্দরীর চোখে আগুন দেখা দিল।

—তা সত্যি; তুমি অন্যায় কথা বলবে না, তা আমি জানি। বিয়ে দিয়েই এত কাণ্ড…

—একশো বার, হাজার বার, লক্ষ বার—আমি ঘাট মানছি।—সংখ্যাবাচক শব্দগুলির উপর অনন্ত কণ্ঠশক্তি প্রয়োগ করিয়া সুশীলাসুন্দরী তাঁহার অপরাধ এবং ভ্রম স্বীকার করিলেন।

রাখালবাবুর জলযোগ শেষ হইল।

তামাক খাইয়া তিনি ছাতার বদলে এবার লাঠি লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পুত্র এখন, এই বয়সে, মিত্র হইয়া উঠিবার কথা। মিত্রত্বের সন্ধান করিয়া রাখালবাবু পুত্রকে নিজের দিকে টানিতে চেষ্টাও করিয়াছিলেন ; কিন্তু সত্যশিব অসাধারণ তেজস্বী আর প্রভুধর্মী বলিয়া বাপের নিস্তেজ মিত্রত্ব তাহার ভাল লাগে নাই—আপন রজোগুণে সে শাসনকর্তা হইয়া উঠিয়াছে ; ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করিয়া অতিশয় স্পষ্ট বাক্যে সে নিজের মতামত ঘোষণা করে—তাহার ইচ্ছাই আইন ; লঙ্ঘন করিবার দুঃসাহস যদি কাহারো হয় তবে সে তাহা করুক—দেখা যাইবে পরে। জননীর আর স্ত্রীর বিরোধে সে স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করে—করিবেই···

সুশীলা বলেন,—তুই বউয়ের হ'য়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করছিস ?

সত্য বলে,—তুমি শাশুড়ী হ'য়ে বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করছ ?

—আমি তোকে দশ মাস দশ দিন পেটে ধরি নাই ? নোংরা ঘেঁটে মানুষ করি নাই ?

সত্যশিব হাসিয়া বলে,—সে কি আমার অনুরোধে করেছিলে ? সে সব উপকার যা করেছ তার উল্লেখ না করলেই ভালো হয়।

সুশীলাসুন্দরীর মুখ দিয়া এবার চূড়ান্ত কথাই বাহির হয় : তুই মর। তুই একেবারে গোল্লায় গেছিস।

সত্য বলে,—ঐ জন্যেই ত' আমি বউয়ের পক্ষে। সে আমাকে ও-সব কথা কখনো বলে না। আমি ম'লে বউ বিধবা হবে, একবেলা খাবে, খরচ কমবে—তোমার সুখ হবে ; সেইজন্যেই তুমি আমাকে মর বলছ। তবে আর দশ মাস দশ দিন পেটে ধরার গর্ব কি করছ ?—বলিয়া মন্দাকিনীর দিকে তাকাইয়া সত্যশিব দেখে, সে হাসিতেছে—অপরূপ সে হাসির ভঙ্গী, আর দেখে, তাহার সর্বাঙ্গে যৌবন থই-থই করিতেছে, নয়নপল্লব স্থির, কিন্তু মনে হয়, যেন নাচিতেছে।

—তোমার গুণগ্রামের কথা সব বলেছি ও'কে ; শুনে উনি আগুন হয়ে গেছেন। পুত্রকে নিরস্ত্র করিতে একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র হিসাবে স্বামীর আগুন হওয়ার কথাটা সুশীলাসুন্দরী জানান।

কিন্তু সত্যশিবের ভয় নাই বলিলেই চলে।

মন্দাকিনীর সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করিয়া হাসিতে হাসিতে সে বলে : 'আগুন হয়ে গেছেন। ভাগ্যি তাঁর গা চালে ঠেকে যায় নাই। খড়ের চাল পুড়ে যেত।' তারপর তাহার মনে পড়ে, জলে অগ্নি নির্বাপিত হয়, বলে : 'এক গামলা জল ও'র মাথায় ঢেলে দিলেই পারতে !'—বলিয়া উঠিয়া যায় ; মন্দাকিনীকে উপরে ডাকিয়া লয়, দুজনে নিরিবিলি গল্প করিতে বসে—তাহাদের তুমুল আনন্দের শব্দ করকা-ধারার মতো সুশীলাসুন্দরীর কানে প্রবেশ করিতে থাকে।

আর তিনি বসিয়া বসিয়া ভাবেন, কুসুম ঠাকুরাণী প্রাতঃপ্রণম্যা। তাঁহার ভবিষ্যদ্‌বাণী ফলিয়াছে।

সবার শেষে গয়া

গয়ামণি ও রামের পুত্র লব যখন মাত্র তিন বৎসরের শিশু তখন লবের বাবা রাম মারা গেল। রাম ছিল দিন-মজুর। মজুরের কাজে খাটিতে যাইয়া রাম একদিন উঠিয়া গেল সুউচ্চ এক আম্রবৃক্ষে, তাহার শাখা ছেদন করিতে। তখন আষাঢ় মাস; বৃষ্টির পর গাছ ছিল ভিজা আর পিছল; রাম পা পিছলাইয়া পড়িল মাটিতে; আঘাত লাগিল খুব; তারপর পাঁজরে দারুণ ব্যথার সঙ্গে জ্বর হইয়া সে মারা গেল—মৃত্যুকালে লবকে সে সমর্পণ করিয়া গেল লবের মা গয়ামণির হাতে।

যেদিন লব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল সেইদিনটা তাহাদের চিরস্মরণীয়; সাগর মন্থন করিবার সময় যে-দিনটাতে অমৃত পাওয়া গিয়াছিল এবং লক্ষ্মী উঠিয়াছিলেন তেমনি স্মরণীয় সেই দিনটি। সকল দিনের চাইতে সেই দিনটি উজ্জ্বল—ঊর্ধ্বের ঐ বিরাটায়তন সস্মিত আকাশের মতো সেই দিনটি তাহাদের মনশ্চক্ষুর পুরোভাগে চিরস্থির আর উদ্ভাসিত হইয়াছিল; সংখ্যাতীত আর বিরামহীন দিন-প্রবাহের মাঝে ঐ দিনটি জ্বলন্ত একটি বুদ্বুদের মতো উত্থিত হইয়াছিল—হীরকের মতো তাহা দিবারাত্র জ্বলজ্বল করিত।

লব জন্মগ্রহণ করিয়া বাড়িতে লাগিল। উহাতে রাম আর গয়ামণির শারীরিক ও মানসিক উৎসাহের অন্ত রহিল না।

নিজেকে নিশ্চিন্ত আর নির্বিঘ্নে রাখিতে মানুষ শক্তির সন্ধানে অহরহ দিকে দিকে দৃষ্টি হানিয়া ফিরিতেছে—দৈবের বিরুদ্ধে তাহার সতর্কতার শেষ নাই। যাহার হাতে মজুত টাকা ঢের, হিসাবের দিকে চাহিয়া তাহার আর ভয় থাকে না। তেমনি ঐ ছেলেটি যেন দরিদ্র রামের গৃহে সেই অঙ্কুরের উদ্গম যে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া অপরিমেয় মজুত টাকার কাজ দিবে—একেবারে নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্ন অকুতোভয় করিয়া দিবে। ঐ সুখ-কল্পনা আর চিন্তা আর আলাপ করিয়া রাম আর গয়ামণি আনন্দে বিহ্বল হইয়া যায়।

ছেলে বাড়িতেছে—দিন দিন তিল তিল করিয়া তাহার চৈতন্যের উদয় হইতেছে, মুষ্টিবন্ধ হাত আর মুদিত চক্ষু খুলিয়া যাইতেছে। ছেলে হাসে—গয়ামণির আনন্দ ধরে না; ছেলে হাসিতেছে দেখিয়া ছেলে ও ছেলের মায়ের দিকে তাকাইয়া রামও হাসে।

ছেলের অসুখ হইল; গয়ামণি কাঁদিয়া ভাসাইল অসুখ ভাল হইয়া গেল; গয়ামণি অবিলম্বে দেবতার দুয়ারে যাইয়া ঋণ পরিশোধ করিয়া আসিল।

ছেলের দাঁত উঠিতেছে—

ছেলের ঐ দাঁত ওঠাই এক মহা উন্মাদনার ব্যাপার। গয়ামণি অঙ্গুলির অগ্রভাগে তাহাকে স্পর্শ করিল যত, ছেলের ঠোঁট তুলিয়া তুলিয়া সেই ক্ষুদ্র শুভ্র উদ্গমটুকু অতৃপ্ত চোক্ষে নিরীক্ষণ করিল তত। ছেল শান্ত হইয়া ঘুমাইলে

গয়ামণির মনে হয়, এমন শান্ত দুনিয়ার কোনো ছেলে নয়—দৌরাত্ম্য করিলে তার মনে হয়, এমন দুরন্ত ছেলে দুনিয়ায় আর নাই ; কথা রাখিলে মনে হয়, মায়ের বাধ্য এই ছেলে যেমন, তেমন আর কারো ছেলে নয়—না রাখিলে মনে হয়, এমন অবাধ্য ছেলে যেন কোনো মায়ের পেটে না আসে ! নক্ষত্রের গণনায় যেমন শেষ আসে না, আর, ভুল হইবেই, ছেলেকে মূলধনের স্থানে স্থাপিত করিয়া রামের আর গয়ামণির তেমনি ক্ষণবিহারী খণ্ড খণ্ড সুখ-চিন্তার শেষ থাকে না, আর, মাঝে মাঝে তেমনি সব হিসাব চূড়ান্ত হইয়াও কেন যেন চূড়ান্ত হয় না। "ভগবানের ইচ্ছা" বলিয়া রাম নিরস্ত হয়।

এমন সুন্দর বাৎসল্য—সুখ আর আনন্দটুকু ত্যাগ করিয়া রাম একদিন পরলোকে চলিয়া গেল। এই অশেষ আর উদ্‌ভ্রান্তকর হাসি-সোহাগের ব্যাপারটাকে কে যেন একদিন ছিঁড়িয়া মুড়িয়া তাল পাকাইয়া দিল—সূর্য যেখানে উদিত হইয়া অস্তে যায়, নক্ষত্রপুঞ্জ অন্ধকারে দেখা দিয়া আলোকে অদৃশ্য হইয়া যায়, একদিন যেন চক্ষের নিমেষে রাম সেই সুদূরতম স্থানে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তাহার চিতাভস্ম বর্ষণস্ফীত ফুল্লরার স্রোতে ভাসিয়া গেল।

গয়ামণি অনাথা হইল।

রামের কর্তব্য ছিল স্ত্রী পুত্রকে পালন করা—তাহা সে করিত। তাহার অভাবে গয়ামণির কর্তব্য হইল লবকে পালন করা—সে তাহা করিতে লাগিল ; মানুষের দুয়ারে দাসীত্বের প্রার্থী হইয়া সে দাঁড়াইল। ভগবান তাহাকে সেখানে স্থান, আর আসান দিলেন।

লব এখন সাত বৎসরের। লব বড় মাতৃবৎসল ; এই বয়সেই সে মায়ের ব্যথা বোঝে।

গৃহিণী বলেন, তোর লব বড় ভাল ছেলে, গয়া! তোর অনেক কাজ ত' ও-ই করে দেয়।

—তা দেয়, মা। মাজা ধোয়া বাটি থালা গেলাস কেমন একটি একটি করে নিয়ে ওখানে রাখছে দেখ। বাড়িতেও খাটে ; খুঁটিনাটি কত কাজ যে করে তার ইয়ত্তা নেই ; বলে, তুমি ত' দিনরাত খাটছই, মা। একটু বোসো। আমি কাজগুলো করি, ঝাঁটপাট দিই, তুমি দেখো।

গৃহিণী হাসেন।

গয়া বলে, আবার কি করে জানো, মা ?

—কি করে ?

খিদে চুরি করে ; বলে, পেট ভরে উঠেছে একেবারে ; ও ভাত ক'টি তুমি খাও, আমি আর খাবো না। আমি যদি বলি, মিছে কথা বলো না, বাবা ; তোমার পেট ভরে নাই। তোমার পেটের ওজন আমি জানি। ছেলে তখন বলে, আমি ত' কেবল খাচ্ছিই মা ! সকালে মুড়ি খেয়েছি ; আবার বিকেলে মুড়ি খাবো—তুমি ত' খাও না ভাত ছাড়া কিছুই। এখন কম খেলেও আমি আর একটু পরেই মুড়ি খেয়ে পেট খুব ভরে নেব। শুনলে, মা, কথা ?

শুনিয়া গৃহিণীর অন্তঃকরণ দ্রব হইয়া যায়। গয়ার অন্তর উদ্বেল হইয়া ওঠে। কিন্তু দুঃখিনী বিধবা গয়ার দিন এমনিভাবেও চলিল না; এই লব একদিন তাহার মাকে যে আঘাত করিল, কাহারো পরম শত্রুতেও তাহা করে না।

একদিন শেষ রাত্রে সহসা মস্তিষ্কে এবং সর্বাঙ্গে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিয়া লব চীৎকার করিয়া উঠিল: মা?

গয়ামণির ঘুম তরল হইয়া আসিতেছিল: আহ্বান কানে পাইয়া সে বলিল,—কি রে?

লব বলিল, আমাকে কিসে কামড়ালে।

কামড়ালে?—বলিতে বলিতে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই গয়ার চোখে পড়িল, চৌকাঠের ফাঁক দিয়া সুদীর্ঘ কাল সাপ তীরের মতো দ্রুতবেগে নির্গত হইয়া যাইতেছে···

লব বলিল, মা, জ্বলছে বড়ো। ত্রাসে গয়ার সমগ্র চেতনা হঠাৎ ঝিমাইয়া পড়িয়াই যেন কতকাল পরে জাগিয়া উঠিয়া যার মতো ভয়ংকর আর কিছুই নয় তাহারই কোলের ভিতর টলিতে লাগিল। এক মুহূর্ত দিশেহারা হইয়া থাকিয়া গয়া লাফাইয়া উঠিল; ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল; রাস্তায় দাঁড়াইয়া সে মুহুর্মুহু আর্তনাদ করিতে লাগিল: কে কোথায় আছ, এস শীগ্‌গির; আমার লবকে সাপে কেটেছে···

বেঁধেছ?—জিজ্ঞাসা করিয়া রাস্তার ওদিক হইতে একটি লোক ছুটিয়া আসিল।

না, বাঁধি নাই ত'। ইনু বাঁধি নাই ত'। কি হবে আমার। কি আছে অদেষ্টে।—বলিতে বলিতে গয়ামণি যেন পাগল হইয়া লবের কাছে দৌড়াইয়া আসিল। লব তখন ছটফট করিতেছে।

সে-লোকটা এ-বাড়িতে দড়ি খুঁজিয়া না পাইয়া দৌড়াইয়া গেল রাস্তার ওপারের এক বাড়িতে। ডাকাডাকি করিয়া সেই বাড়ির লোককে সে বাহিরে আনিল; সর্পাঘাতের কথা বলিল; জানাইল যে, শক্ত দড়ি খানিক চাই। শক্ত দড়ি খুঁজিতে সে ভিতরে গেল—দড়ি আনিয়া দিল; এবং সেই দড়ি লইয়া যখন সে বাঁধিতে আসিল, আর, কোথায় দংশন হইয়াছে তাহা দেখিয়া লইয়া হাঁটুর নীচের উপরে বাঁধন কষিল তখন বাঁধার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—লব তখন নিস্তেজ।

গয়ামণি মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িয়া পুনঃপুনঃ তীব্র আর্তনাদে যেন নিজের বুক ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ছড়াইতে লাগিল। তাহাই শুনিয়া যখন গয়ার গৃহ ইতর ভদ্রে পূর্ণ হইয়া গেল, তখন আর আশা নাই। বিষহর অব্যর্থ মন্ত্র জানে বলিয়া প্রকাশ এমন লোকও একজন আসিল; কিন্তু এই ব্যক্তি পেঁছিবার পূর্বেই লবের ওষ্ঠাধর নীল হইয়া গিয়াছে, নাক দিয়া রক্ত পড়িয়াছে, দেহ অবশ হইয়া আসিয়াছে।

মন্ত্রপ্রয়োগের মধ্যেই লব প্রাণত্যাগ করিল। লোকে অজস্র জল আনিয়া মৃত লবের মাথায় ঢালিতে লাগিল; মানুষের পায়ে পায়ে জল কাদা হইয়া উঠিল; কিন্তু লব আর চোখ খুলিল না। গয়া লবের দেহ আবৃত করিয়া তাহার বুকের উপর পড়িয়া রহিল···

অবশেষে বেলা যখন দেড় প্রহর তখন লবের দেহ তাহার মায়ের বুকের ভিতর হইতে কাড়িয়া লইয়া ফুল্লরার তীরে লইয়া গেল ; তারপর ভেলার উপর তুলিয়া শোয়াইয়া লোকে খরস্রোতা ফুল্লরার অগাধ জলে লবের দেহ ভাসাইয়া দিল। ওস্তাদ তাহার জটা সমেত মাথা নাড়িয়া আর ললাট দেখাইয়া চলিয়া গেল।

গয়ামণিকে দুই ব্যক্তি ধরিয়া আনিয়া বাড়িতে রাখিয়া গেল। গয়ামণি একবার খালি বলিল,—'আমি বাঁধি নাই। বাঁধলে সে বাঁচত'।—তার চোখ তখন শুষ্ক।

যে-গর্ত দিয়া সাপ উঠিয়াছিল, ঘরের ভিতরকার সে-গর্তটা লোকে দেখিয়া গিয়াছে—গয়ামণিও দেখিয়াছে। সেই গর্তের দিকে চোখ পড়িলে শিহরিয়া উঠিতে হয় ; কিন্তু গয়ামণি সে-গর্ত বুজায় নাই, বুজাইতে দেয় নাই। সেই গর্তের ধারে মাথা রাখিয়া গয়ামণি শুইয়া থাকে ; অন্ধকারে সুদীর্ঘ সুযোগদান বৃথা হইয়া যায়, তাহার মস্তকে দংশন করিতে সাপ সে-পথে আর আসে না আসে নাই দেখিয়া গয়া সে-গর্তের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আর্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠে।

রোগে নয়, বিষে জর্জরিত হইয়া সে গিয়াছে ; সেই হলাহল এখনো সেই যমের দাঁতে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে—তাহারই আর-একটি বিন্দু সে কেন তাহার ব্রহ্মরন্ধ্রে ঢালিয়া দিয়া যায় না। অর্ধ ঘণ্টা না যাইতেই শিশুর সুকোমল দেহ তেমনি সুঠাম নিটোল থাকিতে থাকিতে নীল হইয়া শীতল হইয়া গিয়াছিল !

আষাঢ় মাসেও কেন প্রচুর আম পাওয়া যায় না, শুইবার পর এই প্রশ্ন করিয়া লব আমের প্রতি লোভ এবং আমের অভাবের দরুণ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া মাকে হাসাইয়াছিল ; তারপর সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল···

তারপর তার সেই নিদ্রা ভাঙিয়া দিয়াছিল, আর, তাহাকে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল রক্তে বিষ ঢালিয়া দিয়া—এত দ্রুত আর এত তীব্র সেই বিষ! আর, এমন অমোঘ তাহার ক্রিয়া আর এমন হঠাৎ !

গয়ামণি সেই গর্তটার দিকে নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া থাকে—এই বিবরের অভ্যন্তরে কোথাও সে বাস করে···

একদিন রাত্রিশেষে ভগবান তাহাকে আদেশ করিলেন, 'সাপ, তুমি গয়ামণির পুত্র লবকে দংশন করিয়া আইস ; তাহার আয়ুষ্কাল শেষ হইয়াছে।'

এই আদেশে পাতালপুরীর অনন্ত অন্ধকারে নিদ্রিত সাপের কুণ্ডলীকৃত অলস দেহের অভ্যন্তরে চেতনা তরঙ্গিত হইল ; কুণ্ডলী খুলিয়া খুলিয়া দীর্ঘ দেহ ধীরে ধীরে সচল হইয়া উঠিল ; তাহার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে তাহার সম্মুখের মাটি ঝরিয়া ঝরিয়া অবাধ সরল একটি পথ প্রস্তুত হইল ; সর্বাগ্রে তাহার সদন্ত মাথাটা বিবরের বাহিরে আসিল ; যেখানে লব নিদ্রিত ছিল সেইদিকে তাহার মুখ ফিরিল ; ধীরে ধীরে সমগ্র মসৃণ দেহটা অতি নিঃশব্দে নির্গত হইল।

ঘর অন্ধকার।

কিন্তু তাহার পথ চিনিতে ভুল হইল না ; যাহাকে তাহার চাই তাহাকেও চিনিয়া লইতে তাহার ভুল হইল না ; দংশন লক্ষ্যচ্যুত হইল না—বিষ পড়িল। নিশ্চয়ই ভগবানেরই আদেশ সে প্রতিপালন করিয়াছে, নতুবা সামান্য বুকে-হাঁটা

সরীসৃপ এত তেজ আর এমন নির্ভুল গতি আর এমন অব্যর্থ লক্ষ্য কোথায় পাইবে!

ভগবানকে গয়ামণির অত্যন্ত ক্রূর মনে হয়—নিষ্পাপ শিশুর দেহে অসহ্য জলন্ত বিষ ঢালিয়া দিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া কাহার কি মঙ্গল তিনি করিয়াছিলেন!

তারপর তাহার মনে হয়, আমি বাঁধি নাই—বাঁধিলে সে হয়তো বাঁচিত! এমন ভুল তাহার কেমন করিয়া হইল! ভগবানের কারসাজি নিশ্চয়ই। তিনিই ভুলাইয়া দিয়াছিলেন যে, সাপের কামড়ে আগে বাঁধিতে হয়। বাঁধিলে সে বাঁচিতে পারিত বলিয়াই তিনি বাঁধিতে দেন নাই—'বাঁধলে সে বাঁচত'।

সেদিন সকালবেলা মনিববাড়ি হইতে গয়াকে ডাকিতে আসিল, কাজের জন্য নয়, একটু বসিবার জন্য, আর অন্য কথা কহিবার জন্য। গয়া গেল না।

একটি ১৩।১৪ বছরের ছেলে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছিল; গয়া তাহাকে বলিল, 'আমি যাবো না, বাবা, আমার মুখ দেখাবার উপায় নেই। আমি বাঁধি নাই; বাঁধলে সে হয়তো বাঁচতো'।

—ঠিক সময়ে বাঁধন পড়ে নাই, তাই ত' সবাই বলছে। বলিয়া ছেলেটি চলিয়া গেল।

গয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—লব, বাবা আমার, তোর মা তোকে মেরেছে; সে বাঁধে নাই; বাঁধে নাই।

দ্বিপ্রহরে গৃহিণী ঠাকুরকে দিয়া ভাত পাঠাইয়া দিলেন; ঠাকুর বলিল, গয়া, কদিন কিছু খাসনি, আজ দু'টো খা, মা; না খেলে কি বাঁচবি!

গয়া বলিল, ঠাকুর, আমার কি হবে! আমি নরকে যাবো। লবকে আমি মেরেছি—আমি বাঁধি নাই; বাঁধলে সে হয়তো বাঁচত।

—অদেষ্ট মা, অদেষ্ট। চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই ত'!

—কিন্তু বাঁধি নাই যে! বলিয়া গয়া উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিল।

—খা দুটো। বলিয়া ঠাকুর ভাত রাখিয়া চলিয়া গেল। গয়ামণি উঠিল না—ভাত স্পর্শও করিল না···

গয়ামণি গর্তের ধারে মাথা রাখিয়া শুইয়া ছিল; অল্পে অল্পে এক সময় তাহার চোখ বুজিয়া আসিল; তারপর তন্দ্রাবেশে মূর্ছার মতো একটা অসাড়তার মাঝে সে স্বপ্ন দেখিল—স্পষ্ট একটা কঠিন স্বপ্ন। দেখিল, আকাশে মেঘ করিয়া আছে—তাহাতে বিদ্যুৎ নাই, সে গর্জন করিতেছে না, কেবল ক্রমান্বয়ে যেন আরো কালো আরো স্ফীত দুর্বহ হইয়া উঠিতেছে; অত দূরে রহিয়াছে বলিয়াই তাহার চাপ সহ্য করা যাইতেছে; নামিয়া যদি কাছে আসিয়া দাঁড়ায় তবে বুক ফাটিয়া খান খান হইয়া যাইবে।

গয়ামণি স্পষ্ট দেখিল, মানুষ যেমন করিয়া ঘরের বন্ধ-করা দরজা খোলে ঠিক তেমনি করিয়া যেন দুইখানি মুখে-মুখে-লাগিয়া-থাকা মেঘ অত্যন্ত ধীরে ধীরে ফাঁক করিয়া ষোল-কলায় পরিপূর্ণ অতি উজ্জ্বল সকলঙ্ক পূর্ণিমার চাঁদ

দেখা দিল ; কিন্তু মেঘের রং বদলাইল না, অন্ধকার ঘুচিল না। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল, চাঁদ যেন চাঁদ নয়, রুপার একটি টাকা ; তাহার দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া আছে—চাঁদের কলঙ্করেখা যেখানে দেখা যাইতেছিল সেখানে রাজার মুখচ্ছবি রহিয়াছে। গয়ামণি সেইদিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতেই আবার একটা রুপান্তর ঘটিয়া গেল ; টাকা আর রাজার মুখ অন্তর্হিত হইয়া আর একখানি মুখ—শুধু মুখখানা—ফুটিয়া উঠিল ; হাস্যোজ্জ্বল মুখখানিতে চক্ষুযুগল কৌতুকে হাসিতেছে—অত দূরে রহিয়াছে, তবু তার প্রত্যেকটি রেখা ভারি জীবন্ত, আর, সে এমন পরিস্ফুট যেন গয়ার চক্ষু আর সেই মুখের মাঝে স্থানের ব্যবধান নাই—হাত বাড়াইলেই স্পর্শ করা যায়...

মুখখানা কার তাহা যেন মনে পড়িতেছে না, অথচ বেদনায় বুক টনটন করিতেছে ·

হঠাৎ মনে পড়িল, মুখ লবের।

তৎক্ষণাৎ ঘুমের ঘোরেই গয়া হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া ব্যগ্র ব্যাকুল দুই বাহু বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে উঠিতেই সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেল ; একটা দুঃসহ ঝাঁকি খাইয়া গয়া জাগিয়া উঠিল ; কাঁদিতে কাঁদিতেই সে একেবারে উঠিয়া বসিল—বসিয়া সে কাঁপিতে লাগিল ; দুই হাত দুপাশে মাটির উপর চাপিয়া রাখিয়া সে সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে দুলিতে লাগিল...

বহুক্ষণ এমনি করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া আর দুলিয়া দুলিয়া গয়া যখন একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল তখন সূর্যাস্তের পর রাত্রি আসিতেছে ; তখন আকাশে ক্ষণজীবী একটা অপ্রফুল্লতার সঞ্চার হইয়াছে—সেদিকে চাহিলে নিঃসঙ্গতার বেদনা হঠাৎ নিবিড় হইয়া ওঠে—তখন একটি মাত্র নক্ষত্র দেখা দিয়াছে, একটি বায়স ডাকিয়া গেল ; একটি বাদুড় উড়িয়া গেল, একখানি মেঘ ভাসিয়া আসিল···

দিবসের নিষ্পলক প্রহরা শেষ করিয়া বিশ্রামে বসিবার পূর্বে ক্লান্ত অর্ধমুদিত নয়নের একটি স্তিমিত দুর্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কে যেন বিষণ্ণ মুখে বিদায় লইতেছে : তাহার স্থানে যে আসিবে সে আসিয়া পেঁাছায় নাই। আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে নিঃশব্দ গয়ার চোখে জলের ধারা বহিতে লাগিল···

হঠাৎ কে যেন নিঃশ্বাস ছাড়িল। একটা স্থূলপল্লব বৃক্ষ খর্ খর্ করিয়া উঠিল—সে যেন কাহাকে কি ইঙ্গিত করিয়া অব্যক্ত একটা কথা কহিল, সে কথা বৃক্ষান্তরে পেঁাছিল, দ্রুতবেগে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লাফাইয়া লাফাইয়া সে কথা পশ্চিম দিগন্তের দিকে ছুটিতে লাগিল···

গয়ামণি বলিল,—আমি বাঁধি নাই, বাঁধলে সে হয়তো বাঁচতো। বলিয়া সে দাওয়ায় বসিল।

রামের চিতার অঙ্গার ফুল্লরার স্রোতে ভাসিয়া যেদিকে গিয়াছে, এবং ভেলা স্রোতে ভাসিয়া পুত্র লবকে লইয়া যেদিকে গিয়াছে, গয়ামণি নদীতীরে যাইয়া একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে।

নদীর গতি ওই দূরে বনান্তরালে বাঁক ফিরিয়াছে। ফুল্লরার ধারা তারপর

আর চোখে পড়ে না, কিন্তু নদীর শেষ ওখানেই হয় নাই—কত পল্লী, কত নগর, জত জনপদ হাট ঘাট বাজার বন্দর, কত ক্ষেত্র, কত অরণ্য, দুধারে দেখিতে দেখিতে এই ফুল্লরা আকাশের সীমান্ত ছাড়াইয়া গিয়াছে—ভেলাটাকে সে বুকে করিয়া ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে···

কত লোকে সেই ভেলাটার পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছে; ভেলা যাহাকে বহন করিতেছে তাহাকে দেখিয়াই লোকে বুঝিয়াছে; মনে মনে হয়ত বলিয়াছে, আহা, কার কচি ছেলেটি এমন!

ভাবিতে ভাবিতে গয়ামণির হঠাৎ মনে হইল, কিন্তু এমন কোনো গুণীর চোখে কি সেই ভেলা পড়ে নাই যে মরা মানুষ বাঁচাইতে পারে—এ-দেশে না হোক, অন্য দেশে, কিম্বা আরও দূর দেশে, আরো দূরে, আরো দূরে, যেখানে মানুষ সবাই গুণী!

গয়ামণির মনে হইল, নিশ্চয় সেই দেহ গুণীর চোখে পড়িয়াছে। নদীতীরে বসিয়া গয়ামণি প্রাণপণে চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল, সকল-গুণীর দেশে ভেলা পৌঁছিয়া সকলের সেরা গুণী যেখানে প্রাতঃকালে মুখ হইতে আসেন সেই ঘাটে যাইয়া লাগিল। প্রাতঃকালে ঘাটে মুখ ধুইতে আসিয়া গুণী দেখিলেন, একটি ভেলার উপর একটি কিশোর বালকের মৃতদেহ রহিয়াছে। মুখ ধোয়া তাঁর হইল না; দুহাতে করিয়া তিনি সেই দেহটাকে তুলিয়া ঘরে আনিলেন, স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন: তোমার জন্যে সুন্দর একটি ছেলে এনেছি গো!—বলিয়া ছেলেকে ছায়ায় নামাইয়া রাখিলেন।

কই, দেখি! বলিয়া গুণীর স্ত্রী তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিল; বলিল, ওমা, এ যে মরা ছেলে! আহা, কার সর্বনাশ হয়েছে গো!

গুণী হাসিয়া বলিলেন,—এখনই বাঁচিয়ে দিচ্ছি দাঁড়াও। বলিয়া তিনি কোথায় যেন গেলেন; তাঁহার চেনা, পৃথিবীর আর সকলের অচেনা একটা লতার শিকড় সেখান হইতে আনিয়া ছেঁচিয়া রস এক-ঝিনুক বাহির করিলেন; মাথার চামড়া চিরিয়া সেই রস একটু লাগাইয়া দিলেন; পায়ের তলায় আর হাতের তলায় আর জিহ্বায় মাখাইয়া দিলেন, নাকে দুফোঁটা দিলেন; তারপর তাহার দুই কানে দুই ফোঁটা রস দিয়া তিনি দূরে বসিয়া একদৃষ্টে রোগীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে শরীরের রং বদলাইতে লাগিল—জলের পাণ্ডুরতা ঘুচিয়া রক্তের আভা দেখা দিল; স্পন্দনহীন চোখের পাতা ঈষৎ স্পন্দিত হইল, ওষ্ঠাধর যেন মুহূর্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল···

আবার সেই রস, সেই সেই স্থানে···তারপর আবার। জীবনের লক্ষণ স্ফুটতর হইতেছে; বুকের উত্থান পতন যত অল্পই হউক, তাহাতে এখন আর সন্দেহ নাই।

গয়ামণির চক্ষু বিস্ফারিত আর নিস্পলক হইয়া রহিল

গুণী স্তব্ধ হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন: ছেলে এখন চোখ খুলিলেই হয়!—গুণীর প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে; কিন্তু তখনো তাঁহার দৃষ্টি নিবন্ধ ঐ ছেলের দিকে···

গুণী লোক ভালো। কতদিনের সঞ্চিত ক্ষুধা আর তৃষ্ণা লইয়া বালক পরলোক

ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছে তাহার ঠিক কি! স্ত্রীকে তিনি দুধ গরম করিতে পাঠাইয়া দিলেন—যেন ছেলে ঘুমাইয়া উঠিয়া খাইবে।

গুণী তখনো ছেলের দিকে চোখ রাখিয়াছেন ··

বারান্দার উননে দুধ গরম করা হইয়াছে।

গুণীর স্ত্রী বলিল, "দুধ আনব?"

"সবুর।"—গুণীর মুখ দিয়া ঐ কথাটা বাহির হইতে না হইতে ছেলে "মা" বলিয় কাঁদিয়া উঠিয়া একেবারে উঠিয়া বসিল।

উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে গয়ামণি উঠিয়া দাঁড়াইল···

তারপর সম্মুখে অপরিচিত গৃহ এবং অপরিচিত দুটি লোক দেখিয়া ছেলে কান্না ভুলিয়া অবাক হইয়া রহিল। মহাদেবের মতো কান্তিযুক্ত সেই গুণী বলিলেন,—বাবা, আমিও তোর বাবা; এই তোর আর-এক মা।

শুনিয়া ছেলে ছুটিয়া যাইয়া গুণীর স্ত্রীকে দুহাতে জড়াইয়া ধরিল, ছেলের মুখ-চুম্বন করিয়া আর তাহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া গুণীর স্ত্রী তাহাকে দুগ্ধ পান করাইতে বসিল—লক্ষ্মীর মতো চুপ করিয়া বসিয়া ছেলে দুধ খাইল। গুণী এখন ছেলের হাত ধরিয়া যাত্রা করিবেন, যে মা তাহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিল সেই মায়ের কোলে তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে। গুণীর গুণবতী স্ত্রী নূতন ছেলেকে ছাড়িয়া দিতে নারাজ হইয়া কত যে কাঁদিল, আর, কতবার যে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল তাহার ইয়ত্তা নাই। গুণী এই অপরূপ মায়া দেখিয়া প্রশান্ত চিত্তে হাসিতে লাগিলেন।

গয়ামণির চোখ ছলছল করিতে লাগিল।

ছেলের হাত হাতের মধ্যে লইয়া গুণী যাত্রা করিলেন—এই নদীর ধার দিয়া, এই নদীর বাঁকে বাঁকে ঘুরিয়া, নদীর তীরের বন ভেদ করিয়া, শ্মশান ডিঙাইয়া, নদীর শাখা-স্রোত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

মায়ের কাছে আসিতেছে বলিয়া ছেলের মুখে হাসি ধরিতেছে না। তাহার বুকের ভিতর কেমন করিতেছে কে জানে! ছটফটানির কি অন্ত আছে! পা আস্তে পড়িতে চাহিতেছে না—গুণী তাহাকে কোমল কণ্ঠে নিবারণ করিতেছেন।

পথের লোক প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে: এ কাহার ছেলে প্রভু?

গুণী বলিতেছেন: সাকুলীপুরের গয়ামণির ছেলে।

"কোথায় লইয়া যাইতেছেন?"

"এই ছেলের মা গয়ামণির কাছে।"

ছেলের মনে কৌতূহলের উদয় হইতেছে। একবার হয়তো জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল: "আমি তোমার বাড়িতে এলাম কেমন করে?"

গুণী দিব্যচক্ষে ছেলের আর তাহার মায়ের অন্তরের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—ভগবান তোমার হাত ধরে আমার বাড়িতে রেখে এসেছিলেন, যেমন আমি তোমার হাত ধরে তোমার মায়ের কাছে রেখে আসতে চলেছি।

গয়ামণির হঠাৎ মনে হইল, আমি যদি আগাইয়া যাই তবে ক্ষতি কি! মধ্য পথেই হয়তো দেখা হইয়া যাইবে।

সূর্যোদয়ের পূর্বেই নদীতীরে দাঁড়াইয়া গয়ামণির আগাইয়া যাইবার ইচ্ছা দুর্দম হইয়া উঠিল।

আষাঢ়ের নদীর স্রোত খরবেগে যেদিকে বহিতেছে, আর, সেই স্রোতে ভাসিয়া ভেলা যেদিকে গিয়াছে, এবং যেদিক হইতে ছেলের হাত ধরিয়া গুণী এদিকে আসিতেছেন সেই পূর্ব দিকেই সে যাত্রা করিল।

কিন্তু কোথাও না পৌঁছিতেই গয়ামণিকে ফিরিতে হইল; পরিচিত এক ব্যক্তি তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে জানিতে চাহিল, রামের বউ এদিকে এত সকালে একা একা কোথায় চলিয়াছ?

গয়ামণি বলিলেন—কেন, ছেলেকে আনতে! ছেলেকে সেই গুণী আনছে যে!

যেন সেই গুণীর কথা আর গুণীর কীর্তি-মহিমা এতক্ষণে সকলেরই জানা হইয়া গেছে!

লোকটি বলিল—ছেলে আসছে না। ঘিরে ঘরে চলো।

গয়া ভ্রূভঙ্গী করিল, বলিল—দূর মিথ্যুক! আমি বাঁধি নাই; বাঁধলে সে হয়তো বাঁচত। কিন্তু গুণী তাকে বাঁচিয়েছে; নিয়ে আসছে এই নদীর ধার-বরাবর, তার হাত ধরে…

—না, না।—তারপর কি ভাবিয়া লোকটি বলিল,—যদি আনে ত' তোমার ঘরেই আনবে। তোমার যাওয়ার কি দরকার? চলো ফেরো।

—আমি না গেলেও আনবে ত'?

—হ্যাঁ।

—কখন।

—এই এল বলে।

গয়ামণি বলিল,—তবে ফিরি। —বলিয়া সে ফিরিল না; নির্বাক হইয়া পূর্বাকাশের লোহিতোচ্ছ্বাসের দিকে চাহিয়া রহিল।

সূর্য তখন উদিত হইয়াছেন। বনরেখার অন্তরাল হইতে স্রোতের উজান বহিয়া তাঁহার লোহিত কিরণ জলের উপর ঢলিয়া পড়িয়াছে; তার প্রতিবিম্ব বহু দূরে জলতলে কাঁপিতেছে…

—দেখছ কি? ফেরো। বলিয়া সেই হিতৈষী লোকটা ধমকাইয়া উঠিল।

গয়ামণি নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত ফিরিল। তাহাদের বাড়ির ঘাটে তাকে পৌঁছাইয়া দিয়া সে লোকটি তাহার নিজের পথে চলিয়া গেল।

ঘাট তখন নির্জন।

গয়ামণি জলের ধারে যাইয়া পা ছড়াইয়া বসিল।

নদী শান্ত—মাতৃক্রোড়ে নিদ্রিত কিশোরী কন্যার মতো সৌম্য নীলিমার স্নেহ-স্নিগ্ধ দৃষ্টির নীচে সে যেন সুপ্তিমগ্ন; আনন্দোজ্জ্বল পিতৃরূপী সূর্য তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া মনোহর লাবণ্যধারা কন্যার সর্বদেহে মাখাইয়া দিয়াছেন; দূর বনানীর নিস্পন্দ শ্যাম লেখাবিন্যাস যেন কিশোরীর অচঞ্চল বেণীর মতো অলস হইয়া উপাধানে পড়িয়া আছে। বর্ষার জল কানা ছাপাইয়া এখনো তীরভূমি প্লাবিত করে নাই; স্রোতের তীক্ষ্ণ চুম্বনরেখা মৃত্তিকার অঙ্গে কাটিয়া বসিতেছে।

একখানা ছোট নৌকা মাঝ নদী দিয়া স্রোতের টানে, আর, তিনখানা দাঁড়ের ঠেলায় তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে—গয়ামণি চেঁচাইয়া বলিল,—মাঝি, আমায় নিয়ে যাও ; ছেলের সঙ্গে যেখানে দেখা হবে সেখানে আমায় নামিয়ে দিয়ো।

নৌকা চলিয়া গেল।

গয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এক ঝলক হাওয়া লাগিয়া তার রুক্ষ কেশ পিঠের উপর ছড়াইয়া গেল। দূরগত নৌকার দিকে চাহিয়া গয়া আপন মনেই বলিল : নিলে না। ওরা আমায় ডাঙা দিয়ে যেতে দেবে না, এরা নৌকায় নেবে না ; জলে-জলেই আমি যাবো ; নৌকার মতো শীগ্‌গির পেঁছে যাবো।—বলিয়া সে জলে নামিল, "জয় মা" বলিয়া পতিতোদ্ধারিণীকে স্মরণ করিয়া সে আরো খানিকটা আগাইয়া গেল ; তারপর আরো খানিকটা—সেখানে জল অতল।

আষাঢ়ের বেগবতী ফুল্লরার অগাধ জলরাশি অবিশ্রান্ত সেই দিকেই বহিতে লাগিল যেদিকে রামের চিতাভস্ম, আর, যেদিকে লবকে লইয়া সেই ভেলা গিয়াছে।

পর্বত ও পার্বতী

খণ্ডগ্রাম—

গ্রামের ঐ নামটি জানে পৃথিবীর মুষ্টিমেয় লোকে, তথাকার দিনপতি রায়কেও চেনে মুষ্টিমেয় লোকে ; কিন্তু তফাত এই যে, 'আছি' বলিয়া একটা বিঘোষিত অপরাজেয় সত্তা গণ্ডগ্রাম খণ্ডগ্রামের নাই, সেখানকার অন্য কাহারও তাহা আছে বলিয়া অনুভূতি গ্রামবাসীর নাই, কিন্তু দিনপতি রায়ের তাহা, ঐ বিঘোষিত অপরাজেয় সত্তা, আছে।

মাথা বলো, মান বলো, হৃদয় বলো, আদর বলো, শক্তি বলো, দিনপতি রায় জীবিত থাকিতে খণ্ডগ্রাম, ওরফে খাঁড়গাঁয়ের তাহা থাকিবেই, নষ্ট হইবে না—দিনপতি রায় দেহে প্রাণ থাকিতে তাহা কদাচ নষ্ট হইতে দিবে না। দিনপতি রায়ের এ সংকল্প আজ পর্যন্ত অটুট আছে।

দিনপতি রায় যে গ্রামের প্রবলতম অদ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার আরও প্রমাণ এই যে, সে নিজের কথা বলিতে বলে না যে, "আমি"—বলে, "দিনপতি রায়", যেন "দিনপতি রায়" বলিয়া নিজেকে উল্লেখ, আর, নিজের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেই অলঙ্ঘনীয় আর অতি উৎকৃষ্ট একটি সত্তার উপর স্বর্ণাক্ষরের ছাপ পড়ে।

শুনিতে অদ্ভুতই লাগে, গ্রামের প্রাতঃস্মরণীয় যাঁহারা, অর্থাৎ বাস্তুগৃহসম্পন্ন অধিবাসিগণের নাম করিতে বসিলেই সর্বাগ্রে আসিয়া দাঁড়াইতে পরস্পরের ভিতর ঠেলাঠেলি লাগাইয়া দেয় যাঁহাদের বৃহৎ বৃহৎ নাম, তাঁহারা সংখ্যায় কেবল একাধিক নন, বহু। চিনাইবার পরিচয় পাত্র হিসাবে ইঁহারা খুবই

বড় ; প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে জ্বলন্ত চিহ্ন দিয়া ক্ষুদ্র খণ্ডগ্রামের ক্ষুদ্রত্ব আর অন্ধকার ঘুচাইয়া দিয়াছেন ; গ্রামের নামের সঙ্গে ইঁহাদের নামের, কেবল নামেরই, অবারিত অস্তিত্ব আর অতুলনীয় গৌরব মৌখিকভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা বিদেশে—নিজ খণ্ডগ্রামে তাহার প্রভাব নাই। ইঁহারা যে-কেহ খণ্ডগ্রামের গুরু, নেতা, অভিভাবক, পরামর্শদাতা, হিতৈষী, উন্নতি-বিধায়ক আতঙ্ক ইত্যাদি যাহা কিছু এবং সব কিছু অবসর পাইলেই হইতে পারেন, কিন্তু ইঁহাদের ছুটি নাই, এবং এইখানে তাঁহাদের বিস্তৃত বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া লাভ নাই।

ওঁরা বিদেশে থাকেন ; কিন্তু অত্যন্ত নিকটে, একেবারে অভ্যন্তরে, প্রত্যক্ষ দরদ আর জাগ্রত শুভবুদ্ধি লইয়া অবস্থান করিতেছে দিনপতি রায়, অষ্টপ্রহর বারমাস—গ্রাম একেবারে নিরাশ্রয় অভিভাবকশূন্য হইয়া যায় নাই—দিনপতি রায় জীবিত থাকিতে গ্রামের তেমন দুরবস্থা হইবেও না।

দিনপতি রায়ের চক্ষু ক্ষুদ্র, কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ; মাথায় চুল আছে, কিন্তু অপ্রচুর ; গোঁফ আছে, কিন্তু ছাঁটিয়া খুব খাটো করা ; নাকের অগ্রভাগ লাল, কিন্তু প্রতিভার পরিচায়ক ; কানে চুল জন্মিয়াছে ; হাতের পায়ের নখ এখন সে বাড়িতে দেয়, আর কাঠি দিয়া চাঁচিয়া তার ভিতরকার ময়লা তুলিয়া ফেলে ; কথা কয় সে ভারি সপ্রতিভ ভাবে—এমনি অবাধে যে প্রতিবাদ করিবার দুঃসাহস যাহার হইবে সে যেন ভাবিয়া দেখে !

দিনপতি রায় আরও অপরাজেয় এই কারণে যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে যখন দণ্ডায়মান হয় তখন চারিদিকে তাকাইয়া বলে : "এই দাঁড়িয়ে গেল পর্বত"···

কিন্তু বলিয়া রাখা উচিত, দিনপতির পল্লীস্বামিত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহার অধিকাংশই দিনপতিরই মত, উক্তি, এবং বিশ্বাস—অন্যে কোথায় কি মনে করে, আর, সত্য সত্যই সবাই কতখানি তাহার মুখাপেক্ষী তাহা জানি না।

কিন্তু হাসির অন্ত থাকে না যখনই মনে হয়, এই দুর্দান্ত পল্লীপতি দিনপতি রায়কে মুখে থাবড়া মারিয়া জব্দ করিয়া দিল পার্বতী—দরিদ্রা গৃহস্থবধূ, একেবারে নগণ্য মানুষ একটি !

পার্বতী ঐ গ্রামেরই ভুবনেশ্বরের স্ত্রী।

শহরের, অতএব ধনী আর সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের দাম্পত্য সুখদুঃখের পরিমাণ কত, রকম কি, আর তাহা কোন সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম দৃষ্টি, দাবি, আকাঙ্ক্ষা, আর, অনুভূতির উপর নির্ভর করিয়া উন্মীলিত নিমীলিত হয়, আর, কি প্রকারে সেই জীবন অহোরাত্র রাগযুক্ত সজাগ থাকে, তাহা ভুবনেশ্বর জানে না। গ্রাম্য, নিরীহ, আর, চিন্তাপূর্বক রসসৃষ্টি করিতে অক্ষম লোকের দাম্পত্যজীবন মোটামুটি একটা হিসাবের ধারা লইয়া, আর, স্থূলচিত্ত আকর্ষণের বশে, এবং তদুপরি একটা কর্তব্যজ্ঞানের টানে অগ্রসর হয়—মাঝে মাঝে থমকিয়া যায়, বিরক্তও হয়, কিন্তু নাটকীয় ভাবে উদ্বেল, কি, সমূলে ছিন্ন কখনই হয় না।

নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়, ঐ স্থূলত্বের উপরেই ভুবনেশ্বর আর পার্বতী পরস্পরের প্রেমে বিভোর হইয়া দিনযাপন করিতেছে, তাহারা দাম্পত্যজীবনের অশেষ সুখোপভোগে রত, এবং কামিনীর ভয়ে 'টটরস্ত'···

পার্বতী বলেই তাই ; বলে, মায়ের ভয়ে আমি টটরস্ত।

ভুবনেশ্বরও তাই ; বলে, আমিও—

বলিয়া পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া ওরা, যুবক ও যুবতী, পুলক-বিগলিত প্রাণে হাসে।

শাশুড়ী কামিনীকে পার্বতীর ভয় করিবারই কথা। কামিনী বেআদবি দেখিলে আগুন হইয়া যায়, আলস্য দেখিলে রুখিয়া ওঠে, কাজে আচরণে খুঁত পাইলে অনুচিত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অতিরিক্ত ভর্ৎসনা করে, এবং শীঘ্রই ক্ষান্ত হয় না।

কিন্তু পার্বতী নয়, ভুবনেশ্বরই এক দিন যে রকম রাগে দুঃখে শোকে লজ্জায় পাগলকরা কাণ্ড ঘটাইয়াছিল তাহার তুলনা কামিনী অন্যত্র পায় নাই, নিজের জীবনে পায় নাই, পাইবে না—অত বড় মাতৃলাঞ্ছনা তাহার এবং স্বাভাবিক মানুষের স্বপ্নাতীত ব্যাপার।

ব্যাপার এই :

পার্বতী তখন পিত্রালয়ে।

সন্ধ্যার পর ভুবনেশ্বর প্রত্যহই আড্ডা দিতে বাহির হয়—তাসটাস খেলে, কীর্তনের দোয়ারকি করে, বন্ধুবান্ধবের কাছে দু'চারটি সুখদুঃখের কথাও কয়। রোজকার মতো আজও সে বাহির হইয়াছিল। তাহার এই অনুপস্থিতি দুর্ভাবনার কারণ কোনদিনই হয় নাই ; কিন্তু আজ হইল।

কামিনী রোজই রাঁধিয়া-বাঁড়িয়া ছেলের অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে থাকে ; ছেলের সাড়া পাইয়া সজাগ হয়, আর, তাহাকে খাইতে দেয়। রাত ন'টার বেশী হয় না।

কিন্তু আজ ঢুলিতে ঢুলিতে ঘুমের অসাড়তায় বাধ্য হইয়া এক সময় সে শুইয়া পড়িল, তখনই ভুবনেশ্বরের ফিরিবার নিয়মিত সময় অতীত হইয়াছে।

তারপর কামিনীর ঘুম ভাঙ্গিল কুকুরের উচ্চ চীৎকারে, আর, সেই সঙ্গে চৌকিদারের হাঁকে।

কামিনী স্বপ্ন দেখিতেছিল, একটি পৌত্র জন্মিয়াছে—দিব্য নধর চেহারা ; কিন্তু বেয়াড়া সেই ছেলে তাহার কোলে কিছুতেই আসিবে না ; কামিনী লাল একখানা গামছা তাহার সম্মুখে ধরিয়া আছে, লাল গামছার লোভেও ছেলে তাহার কোলে আসিতে চাহিতেছে না—তামাশা দেখিয়া সে হাসিতেছে যত, তত হাসিতেছে ও-বাড়ির মনোরমা···

কিন্তু জাগিয়া উঠিতেই একটা গভীর নিস্তব্ধতার ভিতর তাহার বুক ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। রাত্রি তখন গভীর—লোকালয় অন্ধকার আর নিঃশব্দ হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু ভুবনেশ্বর আসে নাই। অন্য জননী হইলে কি করিত জানি না ; কিন্তু কামিনী অঞ্চলশয্যা গুটাইয়া লইয়া অকস্মাৎ মড়াকান্না কাঁদিয়া উঠিল চৌদ্দ বৎসর পূর্বে পরলোকগত স্বামীর শোকে।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে বলিল যে, কেবল দগ্ধ করিতেই তাহাকে 'সেই শত্রু' সংসারে ফেলিয়া গিয়াছে, তাহার প্রমাণ এখনই সে দেখিতে পাইবে যদি সে আসে।

তারপর সে উঠিল ; বাহিরের দরজা খুলিয়া সে বাহিরে আসিল এবং অনর্থক

চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া ডাকিতে লাগিল নিরুদ্দিষ্ট পুত্র ভুবনেশ্বরকে। ভুবনেশ্বর তখন কোথায় তার ঠিক নাই—মায়ের ডাক তাহার কানে পেঁাছিল না।

কিন্তু কানে পেঁাছিল কাছের লোকের। কামিনীর চীৎকারে প্রতিবেশী কয়েকজনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; এবং তাহাদের কেহ শয্যা হইতেই উচ্চৈঃস্বরে জানিতে চাহিল : ঘটিয়াছে কি?

কামিনী জানাইল : দুষ্ট পুত্র ভুবনেশ্বর এত রাত্রিতেও বাড়ি আসে নাই, এবং তাহার জন্য বাড়া ভাত শুকাইয়া কড়কড়ে হইয়া উঠিয়াছে।

ভুবনেশ্বরের সংবাদ একজন ছাড়া অন্য কেহ জানিত না। যে জানিত সে তাহার সংবাদ দিল; শুইয়া শুইয়া সে কাতর কণ্ঠে বলিল যে, ভুবনেশ্বর শ্বশুরালয়ে গিয়াছে। তাহার সঙ্গে পথে ভুবনেশ্বরের দেখা হইয়াছিল এবং মাকে খবর দিতে ভুবনেশ্বর তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিল, কারণ, মা চিন্তিতা হইবেন; কিন্তু সে ঐ বার্তা কামিনীকে জানাইতে বিস্মৃত হইয়াছে মাথার যন্ত্রণার দরুন—মাথা এত ধরিয়াছিল যে, মাথা ছাড়া অন্য দিকে তাহার হুঁশই ছিল না। তারপর সেই সংবাদদাতা আরও জানাইল যে, তাহার মাথাধরা এখনও ছাড়ে নাই।

সেই কখন মাথা ধরিয়াছে, এই এখনও সেই মাথাধরা ছাড়ে নাই, ইহা কষ্টের কথা নিশ্চয়ই; কিন্তু কে না জানে, কষ্ট সবারই নিজের নিজের। কামিনী যন্ত্রণাকাতর ব্যক্তির প্রতি কিছুমাত্র দরদ দেখাইল না, দেখাইতে পারিল না উগ্র মাথাধরার ব্যাপারটাকে বহু নিম্নে রাখিয়া তাহার ব্রহ্মাণ্ড কেমন করিতে লাগিল তাহা কেবল সে-ই জানে; জ্বলন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জ্বালায় ক্ষিপ্ত হইয়া সে সেই দ্বিপ্রহর রাত্রে, এবং সেখানে দাঁড়াইয়াই, আর, পৃথিবীকে শুনাইয়া পুত্র ভুবনেশ্বরকে অভিসম্পাত দিল ইহাই বলিয়া যে, যেই পুত্র মাকে লুকাইয়া আর মাকে যন্ত্রণা দিতে শ্বশুরগৃহে যাইয়া স্ত্রীর পদতলে লুটাইয়া পড়ে, আর, মায়ের চাইতে স্ত্রীকে যে-হতভাগ্যের মধুরতর মনে হয়, পরিণামে তাহার, সেই নির্লজ্জ মাতৃঘাতী স্ত্রীলোভীর, চরম দুর্গতি ঘটিবেই—কলিকালেও তাহা ঘটিয়াছে, কারণ, এখনও চন্দ্র সূর্যের উদয় আর অস্ত-গমন বন্ধ হয় নাই। কামিনী আরও বলিল যে, বিবাহ করিয়াছে বলিয়াই দুর্বৃত্ত ভুবনেশ্বরের রাজা হইতে বিলম্ব আছে—হতভাগ্য পুত্র তাহা জানে না: মনে করিয়াছে, রাজা হইয়া অক্লেশেই সে দুর্মূল্য অন্ন নষ্ট করিতে পারে।

ঐ সব কটূক্তি করিয়া এবং অনেকখানি চোখের জল ফেলিয়া কামিনী যাইয়া শুইল—আর সুখস্বপ্ন দেখিল না।

জননীর অভিশপ্ত শ্বশুরালয় হইতে ভুবনেশ্বর ফিরিল তিনদিন পরে, অত্যন্ত স্ফূর্তির সঙ্গে—

তাহাকে সম্মুখে পাইয়া কামিনী যাহা বলিল তাহা পুত্রের অশ্রাব্য, ভারি জ্বালাপ্রদ, আর, ভারি ভীতিজনক; ডাইনী বধূর প্রতি যে বিদ্বেষ সে দেখাইল তাহাও প্রচুর, এমন কি প্রায় সর্বনেশে। কিন্তু শুনিতে আশ্চর্য, এত তিরস্কার, কটু বাক্য, দুর্নাম, আর বিমুখতা, ভুবনেশ্বর যেন ভাল করিয়া অনুভবই করিল না—পার্বতীর স্মৃতির প্রলেপে নির্বিষ আর নির্বাপিত হইয়া তাহা তাহার সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া গেল কেবল।

পার্বতী মাস তিনেক পরেই আবার পিতৃগৃহ হইতে শ্বশুরালয়ে আসিল। দেখা গেল, এই অল্প কয়েকদিনেই তার দেহে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, অর্থাৎ চমৎকার পরিপুষ্টির মাঝে চমৎকার লাবণ্যযুক্ত হইয়াছে। এমন একটা অপারিমেয়ের আভাস আগে দেখা যায় নাই; কিন্তু এখন যেন না দেখিয়া পারাই গেল না। তবে তাহাতে বিস্ময়াপন্ন হইবার কিছু নাই—সকল মেয়েরই একদিন অমন হয়।

কিন্তু কামিনী ত' তাহা চায় না, সে চায় নাতি। বউ আসিল; কিন্তু ঘটনা যদি এমনি হইত যে, বউ ছেলে হইতে মায়ের কাছে গিয়াছিল ছেলে কোলে লইয়া এখন শাশুড়ীর কাছে আসিয়াছে, তবে সে ঘটনা সুখের হইত কত। কামিনীর চক্ষু, হৃদয়, জীবন, পরমাত্মা, ইহকাল এবং পরকাল যুগপৎ প্রসন্ন আর সার্থক হইয়া যাইত।

কামিনী বলিলও তাই—মনোরমাকে ডাকিয়া পৌত্রতৃষ্ণা জ্ঞাপন করিল, এবং সেই সঙ্গে একটা সন্দেহও প্রকাশ করিল; বলিল,—ছেলে হবে না লো। মুটিয়েছে কত দেখেছিস ?

মনোরমা বলিল,—কই আর মুটিয়েছে! বয়সে অমনি হবেই।

—চোখের মাথা খেয়েছিস একেবারে? মাস থপ থপ করছে গায়ে। আর, বয়সের দেমাকেই ত' গেল! বুঝিনে কিছু! বলিয়া কামিনী কলুষিতভাবে একটু হাসিল।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, শুদ্ধমাত্র পুত্র এবং পুত্রবধূকে অবলম্বন করিয়া কামিনীর পারিবারিক সুখ ষোলকলায় পূর্ণ হয় নাই—অধিকতর বিস্তৃতি চাই। কামিনী ঘোরে ফেরে আর তার মনে হয়, ছেলেকে পেটে ধরিয়াছি, তাহাকে মানুষ করিয়াছি, তার বিবাহ দিয়াছি, অতএব এখন পৌত্রলালসায় আমি অস্থির হইয়া উঠিব···

অস্থির হইয়াই সে পৌত্রকামনা মনে মনে প্রাণপণে আর দেবতার কাছেও করিতেছে, আর, তার তাড়নায় প্রতিবেশীরাও অস্থির হইতে শুরু করিয়াছে, এমন সময় আসিল বর্ষা। বর্ষা বড় দুরন্তকাল, আর, শরৎকাল অশুভ—অশুভ এই হিসাবে যে, ম্যালেরিয়ায় ধরে ঠিক তখনই।

এই নিয়মের অধীনে পড়িয়া বর্ষার পর শরতের প্রারম্ভে একদিন পার্বতী বলিল—মা, শীত করছে বড়। বুঝি জ্বর এল।

কামিনী বলিল,—শুনে কিতার্থ হলাম। যাও শোওগে।

পার্বতী যাইয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইল···

এবং অল্প দিনেই তার শয্যা হইল দুস্তর, আর, লেপ হইল অত্যাজ্য। তারপর পুনঃ পুনঃ জ্বরের আক্রমণে তার দেহ হইল রক্তশূন্য, হাত পা হইল কাঠি-কাঠি, প্লীহা-যকৃৎ বাড়িয়া হইল পেটজোড়া, এবং আরো গুরুতর কথা এই যে, দিনপতি রায়ের সঙ্গে পার্বতী প্রভৃতির সংঘর্ষের হইল হেতুর উদ্ভব।

•

বিন্দুর জ্যামিতিক সংজ্ঞার মতো ডাক্তার শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ রাহা এল্‌ এম্‌ এফ্‌ এর ডাক্তারী বুদ্ধির স্বতন্ত্র একটা সংজ্ঞা আছে। শূন্যের ভিতর নিরাকার অস্তিত্ববিশিষ্ট ঐ বস্তুটি, অর্থাৎ বিন্দু, কল্পনায় দেখাও কষ্টকর; কিন্তু তার শক্তি

খুব—কেবল তার নিরাকার সত্তাকেই অবলম্বন করিয়া কত যে সত্য প্রমাণিত হইয়া গেছে তার ইয়ত্তা নাই।

হরেন্দ্র ডাক্তারের ডাক্তারী বুদ্ধি ঐ বিন্দুর মতো—ভাবিয়া ধরিবার উপায় নাই; কিন্তু সে আছে; এবং রোগীর কাছে আসিলেই সেই বিন্দু হইতে জ্যোতিঃরাশি নির্গত হইতে থাকে। সেই আলোকের মাঝে রোগের হেতু ও লক্ষণ এবং তার প্রতিকার আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে না—ধরা পড়ে।

গ্রামের ভিতর হরেন্দ্র ডাক্তারের ভিজিট মাত্র এক টাকা, সময়ে তারও কম; ধরাধরি করিলে আরও কম। তবে ঔষধের দাম স্বতন্ত্রভাবে দিতে হয়।

মায়ের আদেশে ভুবনেশ্বর দৌড়াইয়া যাইয়া ডাকিয়া আনিল এই হরেন্দ্র ডাক্তারকে। ডাক্তার আসিয়া রোগিণীর কাছে বসিল। রোগপরীক্ষা বলিতে নিরাকার শক্তির ক্রিয়ামূলক যে গভীর গবেষণা বুঝায় হরেন্দ্র সেই গভীরে এক নিমেষেই উপনীত হইল; জিব আর নাড়ী দেখিল—বলিল,—'সামান্য ব্যাপার হে! দেখছি, ম্যালেরিয়ায় ধরেছে। এ্যাতোদিন কি করছিলে। দুর্বল খুব; পিলে লিভার খুব বেড়েছে নিশ্চয়ই, ম্যালেরিয়া যখন। এখন দেখছি জ্বর খুব সামান্যই আছে। ভয়ের কারণ নেই বলতে পারিনে। রোগ পুষে রেখেই তোমরা মরো। অনেক আগে আমাকে ডাকা উচিত ছিল। তবে সম্পূর্ণ ভাল হবে ফাল্গুনে—তার আগে নয়।'—বলিতে বলিতে ডাক্তার উঠিল; বলিল,—'ভুবন, আয় আমার সঙ্গে…'

ভুবনেশ্বর ব্যস্ত হইয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—মা, শিশি?

ডাক্তার বলিল,—'শিশির দরকার নেই হে। শিশিতে ওষুধ দেওয়া আজকাল উঠে গেছে—সেকেলে চিকিৎসে ওটা। বিলাতের খুব আধুনিক ডাক্তারদের মত এই যে, জল গিলিয়ে কি হবে! বুঝলে, ভুবনের মা?'

ভুবনের মা বলিল,—বুঝলাম, বাবা।

—জ্বরের কাঁপুনির সময় জল খেয়ে কাঁপুনি বেড়ে যায়, তা ত' তোমরা দেখেইছ। তাই তারা খালি বৈজ্ঞানিক বড়ি দিচ্ছে। টক করে অক্লেশে গিলে ফেল; পেটে গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে কাজ করবে। হাজার তেতো বা কটু হলেও টেরই পাবে না তেতো কি না। জল শুপুরী মৌরীর দরকার হবে না; বমি হয়ে দামী ওষুধ উঠে যাবে না। আয়, ভুবন। —বলিয়া ডাক্তার পা বাড়াইল!

ভুবনেশ্বর সেই তখন হইতে উসখুস করিতেছে—ডাক্তারকে কিছু জিজ্ঞাস্য তার আছে। জিজ্ঞাসা করিবার ব্যগ্রতায় তার অস্থির ঠেকিতেছে—কিন্তু প্রশ্নটা উচ্চারণ করিতে সে কিছুতেই পারিতেছে না, সময় পাইতেছে না বলিয়া নয়, সে ভাবিতেছে, কথাটা যদি খারাপ শুনায়! ডাক্তারবাবু যদি অপরাধ নেন!

কিন্তু আর ইতস্ততঃ করা কিছুতেই চলে না—ডাক্তারবাবু পা বাড়াইয়াছেন…

হঠাৎ তার মনে হইল ডাক্তারকে লজ্জা কি! হুঁশ জন্মিতেই দ্বিধা-সংকোচ প্রাণপণ চেষ্টায় কাটাইয়া উঠিয়া সে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল:- ডাক্তারবাবু, বুকে কোনো দোষ-টোষ নেই ত'?

—না রে পাগলা! থাকলে আমি জিব দেখেই টের পেতাম। আয়।

পার্বতী হরেন্দ্র ডাক্তারের আধুনিকতম পিল গলাধঃকরণ করিতেছে; কিন্তু ডাক্তারের ব্যবস্থামতো পথ্যগ্রহণ সে করে না। ডাক্তার বলিয়াছেন, সাগু কি বার্লি খাইতে, বড়জোর খই কি মুড়ি; কিন্তু তা সে খায় না। সে খায় ভাত; পান্তা তার আরো ভাল লাগে; একটু তেঁতুল চটকাইয়া লইলে অরুচির বালাই আর মোটেই থাকে না—বলে: ভাত না খেলে আমি মাথা তুলতেই পারব না।

কাজেই ভাত সে খায়, মাথা সে তোলে; আর, একাদশী আর পূর্ণিমা আর অমাবস্যার আগে তোলে হাই, তারপর বসে রোদে, এবং তারপর খাইয়া শোয়। ডাক্তারের বৈজ্ঞানিক শক্তিসম্পন্ন বড়িতে রোগের উপশম বিশেষ হয় নাই; গায়ে রক্তবৃদ্ধি হয় নাই, পেটের প্লীহা যকৃৎ ছোট হয় নাই; জ্বর তার ধাতে থাকেই, চোখ জ্বালা করেই। কিন্তু ঐ অবস্থাতেই ঘটিয়া গেল এক কাণ্ড।

গৃহস্থ-বধূর প্রথম সন্তানসম্ভাবিতা হওয়া সকলের সঙ্গে তার নিজের পক্ষেও একটা যুগান্তকারী তুমুল ঘটনা—জীবন সার্থক হওয়ার আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা পূরণের তৃপ্তি, নারীত্বের পূর্ণবিকাশ, আর, উল্লাস-উৎসবের মাঝে ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধি ঘটিতে থাকে…

বহু ক্লেশ সহিয়া, আর, বহু বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া মানুষ করা প্রাণাধিক একমাত্র পুত্রের সন্তানলাভের সুখস্বপ্ন সফল হইতে যাওয়া আরো স্বর্গসুখকর। পৌত্র যার আসিতেছে সে যদি অকালবিধবা হয় তবে তা চতুর্গুণ ঐ রকম। কামিনীর পক্ষে ত' তা চরম। মানুষের আনন্দ উপভোগ করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছার উপরে আর একটা স্থান আছে—সেটা হইহুল্লোড়ের পাশবিক স্তর। কামিনীর আনন্দ সেই স্তরের। পার্বতীকে সন্তান-সম্ভাবিতা দেখিয়া সে পাশবিক উল্লাসে নৃত্য শুরু করিয়া দিল…

সন্দেহ নাই যে, পার্বতী অসুস্থ শরীরেই গর্ভবতী হইয়াছে। জ্বর এখন তার হয় না—বসন্তের বাতাস আসিতেই তার জ্বর বন্ধ হইয়াছে; কিন্তু শরীর নিস্তেজ এখনও আছে—রক্তাল্পতা সম্পূর্ণ ঘোচে নাই।

মাগুর মাছের ঝোল খাইলে রক্ত বাড়ে। মাগুর মাছ সংগ্রহ করিবার তাড়নায় অস্থির হইয়া ভুবনেশ্বর দিকবিদিকে ছুটাছুটি করে। মাগুর মাছ না পাইলে কামিনী ভুবনেশ্বরকে বাপ তুলিয়া গাল দেয়; বলে,—ছেলে যদি না বাঁচে তবে তোকেও আমি মারব।

কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম কে উলটাইবে। গর্ভস্থ সন্তানের উদ্দেশে ধাবমান আর সংসারব্যাপী এই আনন্দ পণ্ড করিয়া দিতে উদ্যত হইল গর্ভস্থ সন্তানই। প্রকৃতির নিয়মে সে গর্ভধারিণীর রক্তশোষণ করিতেছে। ম্যালেরিয়ার বিষে পার্বতীর গায়ের রক্ত জল হইয়া গিয়াছিল আগেই। সেই নিস্তেজ রক্ত তাজা না হইতেই তার শরীরের সারাংশ গর্ভের সন্তান টানিয়া লইতে শুরু করিয়া দিয়াছে—সারাংশ দিন দিন পরিমাণে কমিয়া কমিয়া পার্বতী ক্রমে পাণ্ডুরতর হইয়া উঠিতেছে—রক্তশোষী ভ্রূণ তাহাকে গুরুভারাক্রান্ত করিয়া জীর্ণ অচল করিয়া তুলিতেছে। অল্পদিনের মধ্যেই পার্বতীর চেহারা হইল ভয়ংকর আর শরীর হইল এত দুর্বল যে, মনে হয়, বাঁচিবে না।

কামিনী ভ্রূণের পরিণাম চিন্তা করিয়া চোখের জল ফেলে—অশুভ ঘটনার আশঙ্কা করিয়া তার ব্যাকুলতার অন্ত থাকে না।

সংকীর্তনের দল গান গাহিতে গাহিতে পথ দিয়া চলিয়া গেলে কামিনী সেই পথের ধুলো, হরিনামের স্পর্শপূত আর অশুভহর সেই রজঃ মুষ্টি ভরিয়া আনিয়া পার্বতীর মাথায় কপালে পেটে মাখাইয়া দেয়—বারবার করিয়া বলে: ভাল করো বাবা।—অনেক দেবতাকে সে রক্ষার্থে আহ্বান করিল; আর, আহ্বান করিল হরেন্দ্র ডাক্তারকে। ডাক্তার বলিল, ছেলে না হওয়া পর্যন্ত এমনি ধিকি-ঝিকি চলবে। হয়ে গেলেই তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। তবে, দুর্বলতা নিবারণের জন্যে ওষুধ দিচ্ছি।- বলিয়া ঔষধ দিল, কয়েকবারই দিল।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

মাটির নীচে যে-বৃক্ষের মূল নষ্ট হইয়া গেছে তার পাতা সজীব রাখার চেষ্টার মতো কামিনীর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। দীর্ঘ সাতটি মাস অতিশয় অসুস্থ দেহে অসহনীয় সেই গর্ভ বহন করিয়া, আর, নিজেকে তিলে তিলে দান করিয়া সাত মাসের শেষে পার্বতী একটি অপুষ্ট মৃত সন্তান প্রসব করিয়া অজ্ঞান হইয়া রহিল···

সন্তানটি কন্যা নয়, পুত্র।

দেখিয়া আসিয়া কামিনী উঠানে আছাড় খাইয়া পড়িল আর, সঙ্গে সঙ্গে বলিতে শুরু করিল যে, বধূকে সে আর চাহে না। পুত্রবধূকে লইয়া আহ্লাদ করিবার সাধ তার ঘুচিয়াছে; বধূ মানবী নয় রাক্ষসী—রাক্ষসী পেটের ছেলেকে ভক্ষণ করিয়াছে, দ্বিতীয় একটি বধূকে সে অবিলম্বেই আনয়ন করিবে। পুত্র প্রসব করা এ বধূর কর্ম নয়। এ-বধূ যদি এখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে সে কালীঘাটে যাইয়া মাকে যুগল ছাগের রক্ত দান করিবে।

শুনিয়া প্রতিবেশিনী মনোরমা শিহরিয়া উঠিয়া স্থিরচক্ষে কামিনীর দিকে চাহিয়া রহিল।

ভুবনেশ্বর তখন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে···

কামিনীকে যারপরনাই বিমুখ নারাজ দেখিয়া মনোরমা অযাচিতই পার্বতীর শুশ্রূষার ভার হইল; এবং তাহাকে সাহায্য করিতে আরো দুজন প্রতিবেশিনীকে সে ডাকিয়া আনিল। মানুষকে মরিতে দিতে সকলে পারে না।

দিনপতি রায় গ্রামেই আছে—এইবার সে পটে দেখা দিবে—তার অস্তিত্ব অনুভূত হইবে।

কামিনী বউয়ের দিকে তাকায় না—যা করিতেছে মনোরমা; কিন্তু নিজের গৃহস্থালি সামলাইয়া তারই-বা অত সময় কই, এবং কামিনীর দায় ঘাড়ে লইয়া কামিনীর সঙ্গে ঝগড়া করিবে কত!—ভুবনেশ্বর দেখিল, মায়ের এই উপেক্ষার ফলে বউ যায় যায়।

মায়ের নির্মমতায় বউ মরে দেখিয়া, এবং নিজেকে মায়ের সম্মুখে আর বিরুদ্ধে নিতান্ত অশক্ত অসহায় মনে করিয়া ভুবনেশ্বর সকাতরে শরণাপন্ন হইল দিনপতি রায়ের···

বিবরণ অবগত হইয়া দিনপতি রায় বলিল,—বটে। পেটের ছেলে বাঁচল না, তা হল বউয়ের অপরাধ। জ্বরের ভেতর পান্তা খেয়ে নিজের দোষে মরতে যে বসে তাকে তোমার মা ফলের রস আর বার্লি খাওয়াবে না। মরতে বসেছে বলে তাকে মারতে সে চায়। দিনপতি রায় গ্রামে থাকতে আর বেঁচে থাকতে তা ঘটবে। ঘটতে পারে। বিকেলে যাব। বাড়িতে থাকিস।

ভুবনেশ্বর বলিল,—আমি তোমাকে ডাকলাম তা যেন মাকে বলো না।

দিনপতি বলিল,—ধেৎ।

বিকালে দিনপতি আসিল। অন্যায়ের গতিরোধ করিতে পর্বত আসিবেই। মাদুরে তাহাকে বসাইয়া ভুবনেশ্বর তামাক সাজিয়া আনিল। দিনপতি সহসাই বাক্যব্যয় করে না—এখনও করিল না। হুঁকা টানিতে টানিতে খানিক পরে সে জিজ্ঞাসা করিল,—তোর মা কই, ভুবন?

—আছে ওদিকে।

—বউ কেমন আছে আজ?

—তেমনি…

বলিতেই কামিনী আসিয়া দাঁড়াইল—বলিল—কখন এলে?

—এই এখনই। তোমার কাছেই এসেছি।

—বেশ, বসো।

—বসে ত' আছি, ভুবনের মা। পরস্পর শুনলাম, বউয়ের উপর অযথা রাগ করে তুমি তার যত্ন করছ না; অথচ তার অবস্থা নাকি কঠিন! এ কেমন কথা!

কামিনী বলিল,—যার ব্যথা সে-ই জানে।

—তাই নাকি? কিন্তু তুমি আইনের চোখে অপরাধ করছ তা জানো? তোমার রাগের ফলে যদি বউ মরে তবে পুলিস তোমাকে ধরবে খুনী বলে—আমি ধরিয়ে দেব।

কামিনী কথা কহিল না—বুঝা গেল, যে-কারণেই হউক, তার রসনা অচল হইয়াছে।

মনোরমা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—নির্ভয়ে সে ফোড়ন দিল; বলিল—মেয়ের মাকে খবর দাও, এসে নিয়ে যাক। ফাঁসী-যাওয়ার চাইতে সে ভাল। বলিয়া দুর্বৃত্তকে শাসনের ভঙ্গীতে সে কামিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। দিনপতি রায়ের আওতায় আসিয়া সে কামিনীকে এই মুহূর্তে ভয় করিতেছে না।

দিনপতি বলিল,—দিনকতক পরে…

কামিনী বলিল,—দে তুই খবর। আমার অত সাধও নাই, দয়াও নাই। অদৃষ্টে যার মরণ আছে, পুলিস এসে তাকে বাঁচাক, তাতেও আমার আপত্তি নাই। মা এসে মেয়েকে যদি বাড়ির দিকে কি শ্মশানের দিকে নিয়ে যায়, তাতেও আমি রাজী।—বলিয়া কামিনী সে-স্থান ত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেই দিনপতি তাহাকে ডাকিয়া থামাইল, বলিল,—আমি অষ্টপ্রহর খোঁজ নেব, বুঝলে, ভুবনের মা? যদি শুনি যথার্থ সেবা-যত্ন হচ্ছে না তবে ভাল হবে না। দারোগাকে আমি খবর দিয়ে রাখব যে, খুন হচ্ছে গাঁয়ে। তাই বুঝে কাজ করো…

ঐ সব মিথ্যার পর দিনপতি ভুবনেশ্বরের হিতার্থে আরও একটা মিথ্যা কথা বলিল : ভুবন, তুমিও সাবধান

বলিয়া সে এমন ভাবে পা ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া গেল যেন পদশব্দেই বুঝা যায়, দিনপতি রায় চলিয়াছে। দিনপতি রায় চলিয়া গেল বটে, অপরাজেয় ভাবেই গেল, কিন্তু বুঝিয়া গেল না যে, আজ সে নিজের অজয়ত্বের সম্ভ্রম বিপন্ন করিবার আয়োজন নিজে আসিয়া করিয়া গেল।

হরেন্দ্র ডাক্তার যতই গবেষণা করুক, আর, বিন্দুটি তার যতই নিরাকার হোক, একটা কথা সে ঠিকই বলিয়াছিল। বলিয়াছিল যে, কালে হোক অকালে হোক, সন্তান গর্ভচ্যুত হইবার সময় গর্ভিণী যদি না মরে তবে ধীরে ধীরে সংকট উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে।

পার্বতীর ধাত আর জীবনের আশা ছিল না—আশা এখন যেন কিছু হইয়াছে। পুত্রবধূর প্রাণের প্রতি মমতায় যা হয় নাই, পুলিসের ভয়ে তাহা অকাতরে হইতেছে—কামিনী পার্বতীকে দেখা-শুনা করিতেছে। দিনপতির জোরে ভুবনেশ্বরও একটু বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে—ঔষধ পথ্য শুশ্রূষা যোগাইতে তার আর ভয়-ভয় ভাবটা নাই···

এমন সময় আসিয়া গেল পার্বতীর মা দক্ষবালা। কামিনীর উপর রাগ করিয়া মনোরমা নিজের দেবরকে পাঠাইয়া দক্ষবালাকে খবর দিয়াছিল। সে সেইদিনই গরুর গাড়িতে চাপিয়া জামাইয়ের বাড়িতে আসিয়া উঠিল; এবং মেয়ের দশা দেখিয়া মেয়ের শিয়রে দাঁড়াইয়াই এমন হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল যে, কামিনীর মনে হইল যে, বউয়ের জীবনের আশা হঠাৎ বুঝি আবার ছাড়িতেই হইল; আর, যে অমন করিয়া কাঁদে সে ছোটলোক···

মেজাজ ঠাণ্ডা রাখিয়া সে বলিল,—গা ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে বসলি, মাগি, এখন এসে! আমার উপর দিয়ে যা গেল তা জানেন ঈশ্বর। আশা হয়েছে; কাঁদিসনে এখন।

কামিনীর মমতাপূর্ণ এ-কথা শুনিলে কেহ অনুমান করিতে পারিবে না যে, তার পুলিসের ভয় কখনো জন্মিয়াছিল।

তারপর বলিল,—হাত মুখ ধুয়ে মুখে একটু জল মিষ্টি দাও, বেয়ান। ভগবান বাঁচিয়েছেন। তুমি আমি কে!—বলিয়া ভগবানের হাতে সমুদয় ক্ষমতা অর্পণ করিয়া কামিনী রাগ চাপিয়া হাসিতে লাগিল···

রাগের কারণ যে-কত ঘটিয়াছে তার ইয়ত্তা কে করিবে! দক্ষবালার ঐ কান্নাই একটা নিদারুণ রাগের কারণ। তাহার বাড়িতে ঢুকিয়া অক্ষণে আর অকারণে কাঁদিতে বসা তাহারই সংসারের অকল্যাণ ডাকা ছাড়া আর কি হইতে পারে! তার উপর, ঐ মাগীর মেয়ের জন্য তাহার মতো অবলার হাতে দড়ি পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল—সে-মেয়ে আবার এমন অলক্ষ্মী যে, অনেক কষ্ট দিয়া গর্ভধারণ করিল ত' প্রসব করিল সাত মাসে এক মরা ছেলে! তারও উপর, যমে-মানুষে যখন টানাটানি চলিতেছিল সেই দুঃসময়ে তার মানসিক যন্ত্রণা কি কাহারো চাইতে কম ছিল?

সব যখন ভালয় ভালয় চুকিয়া গেছে তখন আসিয়া ঢং করিয়া কাঁদিতে বসিল ঐ বদচেহারা মাগীটা!

কামিনী রাগ চাপিয়া হাসিল।

বলিল,—কেঁদো না বোন ; ডাক্তার ওষুধ দিচ্ছে ভারী ভারী—সেরে উঠলো বলে।

দক্ষবালা বলিল, আমি নিয়ে যাব।

—তা যাও নিয়ে ; কেউ তোমার পথ আগলে নাই। আমার বেটার বউ, তোমার পেটের মেয়ে ; রক্তের টান তোমারই। নিয়ে যাও ; তোমার কাছেই থাকবে ভাল—যত্ন আত্তি পাবে…

গরুর গাড়ির ভিতর পুরু করিয়া খড়ের বিছানা বিছাইয়া তাহার উপর পার্বতীকে শুয়াইয়া দক্ষবালা রওনা হইল। যাইবার সময় পার্বতী কাঁদিতে লাগিল ; শাশুড়ীকে বলিল,—মা, আমায় আবার শীগ্‌গিরই নিয়ে এস। আমারই অদৃষ্ট মন্দ ; তোমার নাতিকে তোমার কোলে দিতে পারলাম না। আমি ভাল হয়ে উঠলেই খবর দেব, মা। তখন নিয়ে এস।

কামিনী বলিল,—আচ্ছা…

তারপর বলিল,—আমাদের তোমার বিশ্বাস হল না, বেয়ান। ভাবলে, বুঝি তোমার মেয়েকে আমরা ঠাঁই দিতে চাইনে ; বুঝি মেরে ফেলতে বসেছিলাম। তা এখন ভাল হোক তোমার—বউকে ফিরিয়ে দিতে পারো ভালই, না পারো তো তাতেও দুঃখু নাই।—বলিয়া সে দাঁড়াইল না বাড়ির ভিতর চলিয়া আসিল।

মেয়েকে জল খাওয়াইতে খাওয়াইতে, আর, তার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আর, অন্য হাতে নিজের চোখের জল মুছিতে মুছিতে দক্ষবালা মেয়েকে বাড়িতে আনিয়া তুলিল।

পার্বতীর এখন জ্বর হয় না—গোলমালের ভিতর জ্বর কবে বন্ধ হইয়া গেছে তাহা টেরই পাওয়া যায় নাই। কিন্তু পেটের সন্তানই তার শরীরের সর্বনাশ করিয়াছে। পার্বতীর মুখের ভিতর ঘা হইয়াছে ; অজীর্ণের দোষ বেশ আছে, হাত-পায়ের ফুলায় আঙ্গুলের চাপ দিলে গর্ত হইয়া যায়—শীঘ্র ভরিয়া ওঠে না।

এখানকার ডাক্তার যোগেশ দত্ত, এম. বি. বলিল,—একেবারে নিকেশ করে এনেছ দেখছি! তবু ভয় নেই বিশেষ ; সেরে উঠবে ; তবে সময় লাগবে ঢের—ছমাসের কম নয়।

এত ?

ডাক্তার বলিল,—রোগ পুরনো, আর জটিল হয়ে উঠেছে। এখন চমকালে কি হবে! এতদিন করেছিল কি ?

—আমি কিছু করি নাই, বাবা ; খবরই পাই নাই। যা করেছে ওর শাশুড়ী।

—সাবধানে রেখো।

সাবধানে রাখায় পার্বতী ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু এদিকে তখন বিচ্ছেদযন্ত্রণা অনুভব করিতেছে কামিনী। সাক্ষাতে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই যেন অবিরাম একটা ঘর্ষণ অনুভব করিয়া কামিনী বধূর

প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া থাকে—বধূর অনেক চুটি বিরাট অমার্জনীয় হইয়া তার চোখে পড়িতে থাকে; কিন্তু অনেকদিন, প্রায় দুমাস, না দেখিয়া আপনার জন হিসাবে তাহাকে কাছে আনিতে কামিনীর ইচ্ছা জন্মিল…

কামিনী তিন ক্রোশ পথ পায়ে হাঁটিয়া একদিন তাহাকে দেখিতেই আসিল। পার্বতী উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়ায়। দেখিয়া আসিয়া কামিনীর মনে হইল, বৃউকে এখন আনা যাইতে পারে। প্রস্তাবটি সে ভুবনেশ্বরের কাছে উপস্থিতই করিল; বলিল,—বউকে আনবি কবে? সে-নামই যে নাই তোর মুখে?

ভুবনেশ্বর বলিল,—তুমি থাকতে আমি কে?

—অভিমান হয়েছে দেখছি! যা, কালই যা। বলবি, আমি পাঠিয়েছি তোকে। —বলিয়া কামিনী আরাধ্যার আসনের উপর দুস্তর হইয়া রহিল।

মায়ের আদেশ ভুবনেশ্বর লঙ্ঘন করিতে পারে না; আবার, ইহাও সে ঘুণাক্ষরেও জানে না যে, তার অনুপম আনন্দের ক্ষেত্র সম্প্রতি সম্পূর্ণ অনুর্বর হইয়া আছে। যাত্রা করিবার সময় পার্বতী প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া বলিয়াছিল: "মা, আমায় আবার শীগ্‌গির নিয়ে এস"…

ওটা তার মুখের কথা মাত্র—বলিতে হয় বলিয়া বলিয়াছিল; না বলা কেমন দেখায়, নিজেকেই লজ্জায় ফেলা হয়, ক্রোধের চিহ্ন রাখিয়া আসা হয় বলিয়া বলিয়াছিল—অন্য অর্থ তার ছিল না। তার উপর, তার শরীর এখন ভারি অশক্ত; মুখের ভিতরকার ক্ষতগুলি শুকাইয়া গেছে, রক্তহীনতার দরুন ফুলাটা দশ-আনা কমিয়াছে; কিন্তু স্বাভাবিক স্বাস্থ্য বলিতে শোধিত রক্তের যে প্রাচুর্য বুঝায় তা আসিতে এখনও বিলম্ব আছে; এখনও তার ত্বক তেমনি ফ্যাকাশে দেখায়।

নির্বিঘ্নে ভুবনেশ্বর যাইয়া শ্বশুরালয়ে উঠিল। আদর অভ্যর্থনা জামাইয়ের যেমন পাওয়া উচিত তেমনই সে পাইল। সেটুকু দিতে ও-তরফের কুণ্ঠা আপত্তি বিন্দুমাত্র দেখা গেল না: এমন কি, গাওয়া ঘিয়ে সুজি ভাজিয়া এবং জলের বদলে দুধ দিয়া সেই সুজির মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া দক্ষবালা তাহাকে খাইতে দিল; কিন্তু দিল না কেবল নিখরচার সম্মতি জননীর প্রতিনিধি হিসাবে এবং নিজের তরফ হইতে যে-প্রস্তাব সে আনিয়াছে তাহা খুবই সঙ্গত এবং নিরীহ—ভুবনেশ্বর ভাবিয়া রাখিয়াছিল তাই। কিন্তু বেচারা জানে না যে, সুস্বাদু মোহনভোগ খাইতে দিতে কুণ্ঠা আপত্তি না থাকিলেও অপরাপর বিষয়ে ওদের আপত্তি থাকিতে পারে; এবং সেই আপত্তি প্রকাশের ভাষার খোঁচা অপ্রত্যাশিতভাবে তীক্ষ্ম হওয়াও অসম্ভব নয়। ভুবনেশ্বর মোহনভোগ খাইয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছিল; তারপর পার্বতীর নিজের হাতে সাজা আর এলাচের দানা দেওয়া পান মুখে দিয়া ভাবিতেছিল, সংসারে ইহার বাড়া সুখ আর নাই…

কিন্তু কোথায় ছিল দুর্বিপাক আর ঘূর্ণী, ভুবনেশ্বর প্রস্তাবটি পাড়িতেই তা হুহু শব্দে আসিয়া পড়িল—ভুবনেশ্বরের মুখে ছিল আনন্দোজ্জ্বল একটু হাসি—দপ্ করিয়া তা নিবিয়া গেল।

রা রা করিয়া উঠিল মা আর মেয়ে।

পার্বতী বলিল,—নিতে এসেছ? এ-দাসী নইলে বুঝি ঘর চলছে না তোমাদের?

দক্ষবালা বলিল,—মায়ের হাত সুড়সুড় করছে বুঝি। দেখছ না মেয়ের শরীর।

শরীর ভুবনেশ্বর অবশ্যই দেখিয়াছে; কিন্তু শাশুড়ীর কথায় তখন তা লক্ষ্য করিবার পূর্বেই পার্বতী বলিয়া উঠিল,—মারধোর খেয়ে মরতে আমি শীগ্‌গির আর যাচ্ছিনে।

মা ও মেয়ের এই উগ্রতা যত অপ্রত্যাশিত, তাহাদের অভিযোগ তত মর্মান্তিক—অসহনীয়ভাবে মর্মান্তিক—আর, একেবারে মিথ্যা।

ভুবনেশ্বর ভারি অবাক আর কাতর হইয়া উঠিল; বলিল,—সে কি কথা! মারি আমি?

পার্বতী বলিল,—লাঠি দেখাও না? ঠেলে দাও নাই কতবার? একবার ত' দরজার উপর পড়েই গিয়েছিলাম হুড়মুড়িয়ে···

ভুবনেশ্বর হাঁ করিয়া শূন্যের দিকে তাকাইয়া রহিল যেন শূন্য হইতে ধর্মরাজ অবতরণ করিয়া পার্বতীর মিথ্যাভাষণে বাধা দিবেন।

পার্বতী তখন বলিতেছে,—আমি মরি, এ-ই তোমাদের ইচ্ছে।

ভুবনেশ্বর উচ্চারণ করিল,—তোমাকে আমরা মেরে ফেলতে চাই!

—চাও বই কি। চেয়েছিলে। মরতেই আমি বসেছিলাম তোমাদের অত্যাচারে —বলিয়া পার্বতী থামিতেই দক্ষবালা শুরু করিল,—তা তোমরা চাও, বাপু, মিথ্যে নয়। মেয়েকে গিয়ে যে-অবস্থায় পেয়েছিলাম তাতে ভাবতেই পারিনি, তাকে আবার ফিরিয়ে পাবো। মেয়ে আমার মরুক বাঁচুক কিছুই তাতে যায় আসে না, তোমার মা ত' তা স্পষ্ট বলেই দিল আসার সময়!

—কিন্তু আমি মারধোর করি, এ-কথা ত' সত্যি নয়!

—এ দাগ ত' সত্যি?—বলিয়া পার্বতী তৎক্ষণাৎ, বিন্দুমাত্র ইতস্তত: না করিয়া, একটা দাগ দেখাইল—কনুইয়ের সেই দাগ পাঁচড়ার কি পোড়ার কি কাটার তাহা ভুবনেশ্বর ঠাহর করিতে পারিল না—কদর্য মিথ্যাপবাদে দ্বিগুণ মর্মাহত হইয়া বসিয়া রহিল কেবল···

পার্বতী বলিতে লাগিল,—মরতে আমি বসি নাই? ওষুধ দিয়েছিলে এক ফোঁটা? মারতে ওঠো নাই হাত তুলে? সে-হাত গায়ে পড়লে ফিরে আমি ধানের ভাত খেতে পারতাম? এখন না বললে কে শুনবে। আমি এখন তোমার ওদিকে যাব না। মোটাসোটা সুস্থ সবল হই, তখন যাবো—বলিয়া সে চলিয়া গেল—যেন দুস্তর একটা ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া সে প্রস্থান করিল।

স্ত্রী পার্বতী তাহাকে আপন কোঠায় পাইয়া তাহাকে অকারণে অপদস্থ আর ভৎসনা করিতেছে, ইহার চাইতে অভাবনীয় আর ক্রূর নিষ্ঠুরতা, আর স্ত্রী-চরিত্রের বীভৎসতা কি হইতে পারে!—নাঃ আর না.

মনে হইতেই ভুবনেশ্বর ছিটকাইয়া উঠিল; চীৎকার করিয়া বলিল,—আমি চললাম। বলিয়া দ্রুতপদে নির্গত হইল—তাহার শাশুড়ী দক্ষবালা, এবং শ্যালক কেশব প্রাণপণে ডাকাডাকি করিয়াও তাহাকে ফিরাইতে পারিল না।

কেশব বলিল,—ও-গাঁয়ের লোকগুলোই অভদ্দর।

বেলা তখন প্রায় এগারটা—ভুবনেশ্বর বাড়ি ফিরিল, কিন্তু যেন আধখানা

হইয়া। ভুবনেশ্বর ঘরের বারান্দায় উঠিল; জুতা জামা খুলিয়া ফেলিল; তারপর পাটি একটা টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল—তার মানসিক যন্ত্রণা আর শারীরিক ক্লান্তি তখন সমান দুঃসহ।

কামিনী আড়চোখে চাহিয়া পুত্রকে লক্ষ্য করিল—ভিতরে তেজ ফুটিতে থাকিলেও, পুত্রের অবস্থা দেখিয়া সে তেজ সে সংবরণ করিল—কেবল বলিল: বিয়ে করেছিলি কেন, হতভাগা, যদি বউয়ের লাথি খেয়ে এসে শুয়ে পড়বি?

ভুবনেশ্বর অনুভব করিল, বউয়ের লাথি সে খায় নাই; কিন্তু মা যেন সেই পদাঘাততুল্য মর্মান্তিক আচরণ দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছে।

কামিনী বলিতে লাগিল,—আসবে না, তা আমি জানি। চিরকাল দেখছি বিজবিজে শয়তান মেয়ে। তুই বউয়ের হয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস পোড়ারমুখো! তেমনি দিয়েছে থোঁতা মুখ ভোঁতা করে। থাক শুয়ে এখন, বউয়ের লাথি হজম কর…

ভুবনেশ্বর উঠিয়া বসিল, বলিল,—চললাম আমি দিনপতি রায়ের কাছে।

—না, খা, তারপর যাস। বলিয়া কামিনী প্রখরতর দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

দিনপতি রায় কান পাতিয়া বৃত্তান্ত শ্রবণ করিল, তারপর বলিল,—তোমার ইচ্ছে হয় না মাঝে মাঝে যে, ঘর ছেড়ে পালাই?

ভুবনেশ্বর বলিল —তা হয়।

—তুমি পারো না তাই পালাও না; বউ পেরেছে তাই পালিয়েছে। তোমার মায়ের মুখ বড় কড়া। আমি তোমাদের কথার ভেতর নাই, যা জানো করো তোমরাই।

—তা হয় না। আমরা বড় দুর্বল যে! লোকে বলছে, বউ ত্যাগ করেছে সোয়ামীকে—ভিতরে কথা নিশ্চয়ই আছে। চলো, তুমি একবার—লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করো। তারা তোমার নাম শুনেছে…

শুনিয়া দিনপতি পুলকিত আর উৎসাহিত হইল। বলিল,—যাবো। পরশু যাব সদরে। তিনদিন সেখানে থাকব। তারপর এসে দুদিন বিশ্রাম করে যাবো তোমার শাশুড়ীর কাছে দরবারে। দেখিয়ে আসব, খণ্ডগ্রাম মৃত নয়। সকালে, খুব ভোরে রওনা হব। বৈষ্ণবচরণকেও সঙ্গে নেব।

আটদিন পরে যথাসময়ে তিনজন রওনা হইল। ভুবনেশ্বরের মনে হইল, তাদের মিছিল দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে—দিনপতি রায় যে মিছিলের সর্বাধিনায়ক ভয় তার ত্রিসীমানায় আসিতে পারে না।

রওনা হইবার পর তিন মাইল পথ হাঁটিয়া মিছিল ভুবনেশ্বরের শ্বশুরালয়ে যাইয়া উঠিল। অনেক অতি সহজ নিরীহ ব্যাপার জটিল করিয়া ঘুরাইয়া বলিয়া অনায়াসে সাংঘাতিক করিয়া তোলা যায়; এমন কি, ঐ কথা সাজাইবার কৌশলে, অর্থাৎ কৌশলে কথা সাজাইয়া, ফৌজদারী মামলা পর্যন্ত দায়ের করা যাইতে পারে। যেমন এই ব্যাপারটা। এই ব্যাপারটা দুরকমে বিবৃত করা যাইতে পারে; বলা যাইতে পারে যে, ভুবনেশ্বর ছড়ি ঘুরাইতে

ঘুরাইতে যাইয়া সবান্ধবে তার শ্বশুরালয়ে উপনীত হইল, আবার এইভাবেও বলা যাইতে পারে যে, ভুবনেশ্বর লাঠি লইয়া সশস্ত্র হইয়া এবং লোকজন লইয়া অবৈধ জনতা সৃষ্টিপূর্বক শ্বশুরালয় আক্রমণ করিল…

কি গুরুতর অবস্থা দাঁড়ায়, আর, কি ব্যবস্থা তার করিতে হয়, যদি কেউ ঐ আর্জি লইয়া আদালতে হাজির হয়।

কিন্তু ভাবিতেই সুখ দুর্ধর্ষ দিনপতি রায় প্রভৃতি এখনই কাহারো মিত্রও নয়, শত্রুও নয়—ঐ দুরকমের মাঝামাঝি একটা মেজাজ আর অঙ্গভঙ্গী লইয়া উহারা ভুবনেশ্বরের শ্বশুরবাড়ির বহিরাঙ্গণে দাড়াইয়া পড়িল। দিনপতি রায় চারিদিকে তাকাইয়া বাড়ির চৌহদ্দিটা দেখিয়া লইল—মনে হইল, চৌহদ্দি প্রশস্ত, এবং অবস্থা নেহাত মন্দ নয়।

বৈষ্ণবচরণ বলিল,—লক্ষ্মীশ্রী আছে। ঢুকেই একটু আরাম পেলাম।

চৌহদ্দির প্রশস্ততা এবং গৃহের লক্ষ্মীশ্রী ভুবনেশ্বর আগেই দেখিয়াছে; সুখের বা ব্যস্ততার কারণ তাহাতে আর নাই, সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, সঙ্গে আনীত, এবং বিশিষ্ট ভদ্র, এবং উপকারেচ্ছু দিনপতি আর বৈষ্ণবচরণকে লইয়া। দিনপতিকে ছাড়াইয়া সে খানিকটা আগাইয়া গেল— চকিতে হাঁকিল—ক্যাশব কই হে? ক্যাশব?

—ক্যা হে? বলিয়া ভিতর হইতে সাড়া দিয়া কেশব বাহির হইয়া আসিল, এবং নেহাত গ্রাম্য বলিয়াই ভুবনেশ্বরের সঙ্গীদ্বয়কে অভিজাত মনে হইয়া সে যেন একটু ব্যাহত হইল, অবাক হইয়া বলিল, এস, ভাল আছ? এ'রা কারা?

—আমার বন্ধু। বসতে দাও।

—দি, বলিয়া কেশব তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল; তাড়াতাড়ি মাদুর আনিয়া বাহিরের ঘরের বারান্দায় বিছাইয়া দিল, বলিল—বসো উঠে। বসুন আপনারা।

সবাই উঠিয় বসিল। তামাকের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া কেশব আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিল; বলিল, তারপর, কি কাজে হে জামাই?

ভুবনেশ্বর চটপট উত্তর করিল,—জামাই কি আর অমনি আসে হে? কাজ অবশ্যই আছে।—বলিয়া সে দিনপতির মুখের দিকে তাকাইল, দেখিল মুখ বিকৃত নয়—তার মানে, বেফাঁস কিছু বলা হয় নাই।

কিন্তু কেশব একটু উপর দিয়া গেল; বলিল,—দিদির ভারি অসুখ গেল সম্প্রতি। তুমি সেদিন যাবার পরই জ্বর হয়েছিল। তিন তিনেক হল পাঁচদিনের দিন ভাত খেয়েছে। ডাক্তার বলল, তাকে রাগিয়ে তোলায় ওর জ্বরটা হয়েছে।—বলিযা সে সকলেরই মুখের দিকে তাকাইল, যেন ভুবনেশ্বর যেমন, তেমনি তার সঙ্গী-সহযোগীদ্বয়েরও জ্ঞাতার্থে ঐ সংবাদটি প্রদান করা হইল।

দিনপতি রায় এতক্ষণ কিছুই বলে নাই, অনুগ্রহপূর্বক অভ্যর্থনা গ্রহণ করিবার পর অত্যন্ত নিঃশব্দ হইয়া ও-পক্ষের সৈন্যসমাবেশ নয়, গতিবিধি আর ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিল। এখন কেশবের সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই তার মনে পড়িয়া গেল যে, এই অভিযানের অধ্যক্ষ ভুবনেশ্বর নয়, সে, আর,

কেশবকে তার অত্যন্ত চতুর মনে হইল—ভুবনেশ্বরকে আর বিশ্বাস করিতে পারা গেল না। বলিল—খুব ধীর জ্ঞান-গম্ভীরভাবেই দিনপতি বলিল: অসুখ-বিসুখ সবারই হয়; এই দেহধারণ করতে গেলে তা আছেই। কিন্তু তাই বলে সবাই শুয়ে নাই: একদিন অসুখ হলে তিরিশ দিন শুয়ে থাকতে হবে এমন কথাও নাই। কি বলো বৈষ্ণব?

বৈষ্ণব বলিল,—শুয়ে থাকতে পেলে কে আর উঠতে চায়! তবু লোকে শুয়ে নাই—উঠে হেঁটেই বেড়াচ্ছে। কি বলো ভুবন?

ভুবন বলিল,— তা সত্যি।

কেশব পাশেই ছিল। ভুবনেশ্বরের পর দিনপতির কথার সমর্থন করিতে তাহাকেই আমন্ত্রণ করিবার কথা; কিন্তু ভুবনেশ্বর বা অন্য কেহ তা করিল না—কেশব ও-পক্ষের লোক।

কিন্তু কেশব কিছু না বলিয়া ছাড়িল না। কেবল ভগিনীপতি ভুবনেশ্বরকেই লক্ষ্য করিয়া সে বলিল,—মাকে বলি গিয়ে তোমরা দিদিকে নিতে এসেছ।

জনবল সঙ্গে আছে—ভয় নাই; কাজেই খুব সাহসের সহিত ভুবনেশ্বর বলিল,—হ্যাঁ; বলে এস তৈরী হতে।

ভুবনেশ্বরের কণ্ঠস্বরে একটা অটলনীয় সংকল্পই প্রকাশ পাইল; তারপর বলিল,—তবে তার পূর্বে আমাকে লজ্জা দিও না, ভাই, এই মানী লোকদের কাছে! এঁদের তুষ্ট করো আগে—জলযোগটোগ করাও।

—তা করাব বই কি। সে-শিক্ষেও নাই নাকি ভেবেছ? বলিয়া কেশব উঠিয়া গেল।

দিনপতি বলিল,—ছেলেটা ছেলেমানুষ হলে কি হয়, কথাবার্তার রকম ভাল নয়, বিলক্ষণ ঠ্যাঁস আছে। অল্পে কাজ মিটবে বলে মনে হয় না। কি বলো, বৈষ্ণব?

বৈষ্ণব বলিল,—বেশ ঠ্যাঁস আছে। কিছু লড়তে হবে। তুমি কি বলো, ভুবন?

ভুবন সঙ্গে সঙ্গে বলিল,—তাতে রাজী আছি। হকের ব্যাপারে ভয় পাবার ত' কিছু নেই। ন্যায্য কাজেই এসেছি।—বলিয়া সে এবং দিনপতি ও বৈষ্ণবচরণ তিনজনই নির্ভয়ে বসিয়া রহিল; কারণ, মনে যাদের গ্লানি বা বিবেকদংশন নাই তাহারা সততই, শত্রুর সমক্ষেও, অকাতরে উচ্চশির, নির্মল এবং ভয়হীন।

মানী লোকদের সম্মানদান, অর্থাৎ জলযোগের আয়োজন হইল অন্তঃপুরেই। আয়োজন এইরূপ: তিনখানি শালপাতা পড়িয়াছে; প্রত্যেকটি পাতায় সের আড়াই করিয়া মুড়ি ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে; এবং তাহা ভিজাইয়া লইবার জন্য দেওয়া হইয়াছে ঘটিতে জল, এবং তাহা মিষ্ট করিয়া লইবার জন্য দেওয়া হইয়াছে বাটিতে করিয়া গুড়, এবং অতিথি বলিয়া সম্মানার্থে দেওয়া হইয়াছে পাতার উপরেই চারিখানা করিয়া বাতাসা; জলের গ্লাসও দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ভুবনেশ্বরের জন্যও ঐ ব্যবস্থা।

কেশব আসিয়া ডাকিয়া লইয়া গেল। ওরা কূপের ধারে দাঁড়াইয়া হাত মুখ আর পা ধুইয়া আসিয়া ঐ আয়োজন সম্মুখে লইয়া বসিল। তারপর যথারীতি আহার করা শুরু হইয়া গেল।

আহার চলিতেছে···

ভুবনেশ্বরের শাশুড়ী দক্ষবালা প্রাচীনা নয়, তবে দয়ানন্দ আর বৈষ্ণবচরণের মতোই তার প্রথম ছেলেটির বয়স হইত যদি সেই ছেলেটি আজ বাঁচিয়া থাকিত। সুতরাং বিশেষ লজ্জা না করিয়া দক্ষবালা তিনজনের আহারের তদারক আর আহারে আদর আপ্যায়ন করিতে আসিয়া সম্মুখেই খাটো একটু ঘোমটার আড়ালে দাঁড়াইয়াছে।

দিনপতি রায় খাইতেছে, আর, মনে মনে হাসিতেছে : কথাটা ওরাই তুলুক ; তাহাতে আক্রমণের সুবিধা হইবে। ঝগড়া যদি বাধে তবে দ্বিগুণ রাগে বলা যাইতে পারিবে, ঝগড়া উহারা বাধাইয়াছে—আমরা রা-টি কাড়ি নাই!

দিনপতির অভীষ্ট অচিরেই সিদ্ধ হইল—দক্ষবালা ওদের খাওয়া দেখিতে দেখিতে জামাইয়ের উদ্দেশে বলিল, কেশব বললে, পার্বতীকে তুমি নিতে এসেছ, ভুবন ; কিন্তু তাকে আমি এখন পাঠাবো না, সে-ও যাবে না ।

দিনপতি মনে মনে শরসন্ধান করিতেছিল ; দক্ষবালার কথার উত্তরে সে শরাগ্র একেবারে দেখাইয়া দিল ; মুড়ির পাতার উপর হইতে ক্ষিপ্রবেগে চোখ তুলিয়া ভ্রূভঙ্গীপূর্বক সে জানিতে চাহিল : কেন ?

শর কখনো বৃহৎ হয় না—দিনপতি রায় কেবল ঐ একটি অবৃহৎ শব্দই উচ্চারণ করিল। স্বর বৃহৎ না হইলেও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।

কেন'র উত্তর না দিয়া দক্ষবালা খানিকক্ষণ প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ; তারপর বলিল : তুমি কিছু মনে করো না, বাবা : তোমাকে আমি কিছু বলছিনে—বলছি আমার আপনার লোক, জামাই ভুবনকে। ঘরোয়া ব্যাপারের ভিতর লোকজন সাক্ষীসাবুদ নিয়ে এসে না উঠলেই ঠিক হত, ভুবন—একা এলেই পারতে! ওকালতি কথা ত' বিশেষ কইতে হবে না । তা কি পারতে না তুমি!

শুনিয়া দিনপতি রায়ের কালো রং বেগুনে হইয়া উঠিল ; কিন্তু সে থামিয়া রহিল। এটা তার নিজের গাঁ নয়, নিজের গাঁয়ের মাথায় বসিয়া সে আস্ফালন আর অন্যায়ের প্রতিবাদ যেমন করিয়া চলে, এখানে তা চলিবে না, হঠাৎ তার সেই রকমই একটা উপলব্ধি দেখা দিল—চালাইতে গেলে ইহারা এত বাধা দিবে যে, নিজের মানরক্ষা করাই অসম্ভব হইয়া উঠিবে, তাহাও সে স্পষ্ট অনুভব করিল ; ফুঁ দিয়া দীপ নিবাইয়া দিলে দুর্গন্ধযুক্ত ধোঁয়া ওঠে। দিনপতির ভিতরটা তেমনি একটা অশরীরী জিনিসে পূর্ণ হইয়া উঠিল ; সেটাকে নির্গত করিয়া দেওয়াই আবশ্যক ; কিন্তু দিনপতি তাহা করিল না—বেগুনে রং ধারণ করিয়া কেবলই জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল···

অল্প কথায় ব্যাপার এই যে, দক্ষবালা তাহাকে একেবারে দাবাইয়া দিয়াছে। সে যে অনধিকারচর্চাপ্রয়াসী অনাবশ্যক ব্যক্তি তাহা দক্ষবালা চমৎকার দক্ষতার সহিত তাহাকে সামান্য দুটি কথায় বেশ হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছে। কিন্তু দিনপতি শরণাপন্নকে ত্যাগ করিবে না—ভুবনের মুখ চাহিয়া সে নিজের কথা ভুলিয়া থাকিবে ; সহস্র অপমানেও ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতে দিবে না···

শান্তকণ্ঠে বলিল,—ভুবন লোকজন সঙ্গে নিয়ে এসেছে বলছ। তাতেই

তোমার আপত্তি আর রাগ। কিন্তু লোকজন কই? দুটি হিতৈষী বন্ধুকে নিয়ে এসেছে— তাতে ভয় দেখানো কিছু হয় না। —তারপর সে হাসির দ্বারা দংশন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—তবে, গুড়-মুড়ির খরচের কথা যদি বলো তবে সে আলাদা কথা—তোমার জামাই তা দিক? বলিয়া মুখে আরো খানিক হাসিয়া মনে মনে সে আরো গর্জন করিতে লাগিল…

দক্ষবালা বলিল,—তোমরা ছেলের পক্ষ বলেই তোমাদের জোর বেশী, বাবা। মুড়ির দাম যদি জামাইয়ের দিতে ইচ্ছে হয় দিয়ে যাবে; তাতে আমাদের কোনই হানি হবে না; হানি হবে জামাইয়েরই। লোকে বলবে—

—কি বলবে লোকে?—খুব প্রত্যক্ষভাবে ভুবনেশ্বর জানিতে চাহিল—জানিতে চাহিয়া শাশুড়ীর চোখের দিকে সে খরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল…

দক্ষবালা একটু হাসিল; বলিল, লোকে বলবে, ভুবনের বুদ্ধি অল্প, আর সে ব্যবহার জানে না।

সমুচিত একটা জবাব দিবার উদ্দেশ্যে ভুবন হাঁ করিয়াছিল; তার উদ্যম ব্যাহত করিয়া দিয়া দক্ষবালা বলিল,—সে-কথা যাকগে। যদি নিতে এসে থাকো তবে তোমাদের, বাবা, ফিরতে হবে

ভুবনেশ্বর বলিয়া উঠিল,—বললেই হল।

ভুবনের গলায় ঝগড়ার বেগ বেশ স্পষ্ট। উত্তরে দক্ষবালা কি ইঙ্গিত করিল তাহা সে-ই জানে; বলিল,—বলা ছাড়া আর কি করতে পারি! করতে যা ইচ্ছে হয় তা করতে গেলে অনেক ঝঞ্ঝাট বাধে।

দয়ানন্দ চমকিয়া মুখ তুলিল।

দক্ষবালা বলিতে লাগিল,—তোমার বন্ধুরা তোমার দরদ বোঝেন খুব; কিন্তু আমার মেয়েকে তুমি মারবার সময় ও'রা ঢাল নিয়ে কি তার সামনে দাঁড়াতে রাজী আছেন?

বৈষ্ণবচরণ হঠাৎ বলিয়া বসিল,—তা সত্যিই।

ভুবনেশ্বরের কানে সে কথাটা গেল না।

আহত প্রাণে সে রাগিয়া রাগিয়া শাশুড়ীর উদ্দেশে বলিতে লাগিল: আপনারা খালিই বলছেন; মারি, মারি; মেরে ফেলতে চাই আপনার মেয়েকে। আমি মারিনে। আনুন তামা তুলসী গঙ্গাজল কি শালগ্রাম, ছুঁয়ে বলছি, আমরা মারিনে। কাজের ক্ষতি হলে রাগ করে বকি, কিন্তু মারিনে। মারার কথা বলে আগেও আমাকে যাচ্ছেতাই ভৎ'সনা করেছেন—এখনো তাই করছেন।—বলিতে বলিতে মিথ্যার বিরুদ্ধে নিষ্ফল আক্রোশে তার কান্না পাইল—বলিল,—সে কথা যে মিথ্যে তা এরাই বলবে।

এদের বিশ্বাসযোগ্যতা অস্বীকার করিবার প্রশ্ন যেন উঠিতেই পারে না।

প্রধানতম বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি আর প্রস্তুততম সাক্ষী দিনপতি বলিল,—শুনি নাই কোনদিন। কি বলো, বৈষ্ণব?

বৈষ্ণবও বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রস্তুত; বলিল: ঘটলে শুনাই যেত।

কিন্তু দক্ষবালা ভারি মজবুত—সাক্ষ্য সে ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিল; অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল,—তোমাদের কারো কথা আমি বিশ্বেস করিনে।

দিনপতি রায়কে চেনেন না তাই অমন কথা মুখে আনতে পারলেন ; কিন্তু কেশবের কথা ত' বিশ্বেস করেন ?—বলিয়া কেশবের সন্ধানে এদিক ওদিক তাকাইয়া ভুবনেশ্বর বলিল,—কই সে ?

দক্ষবালা তার ঠিকানা দিল ; বলিল,—সে একটু বেরিয়েছে। গাঁয়ের কয়েকজন মাতব্বরকে ডাকতে গেছে।

ইহা হইতেই পারে না যে, দক্ষবালার কথাগুলি দিনপতির কানে যাইবে না - কানে তা অখণ্ডভাবেই গেল ; কেবল তাই নয়, দিনপতির স্নায়ুমণ্ডলীতে তার প্রতিক্রিয়া ঘটিল। স্নায়ুবিক দৌর্বল্য দিনপতির আছে বলিয়া কেহ জানে না— স্বীয় গ্রামে তা কখনো দেখা যায় নাই ; কিন্তু হঠাৎ তা দেখা দিল, এবং দেখা দিল এমন বেগে যে, তাহার ফলে দিনপতির বুকে একটা দুরুদুরু স্পন্দন উঠিল।

দিনপতি এতক্ষণ চিন্তা করিতেছিল ভয়াবহ অগ্নিগর্ভ রোমাঞ্চকর সব কথা ; খাওয়া শেষ করিয়া যাইবার সময় সেগুলি সে বলিয়া যাইবে—গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়া যাইবে যে, নির্ভয়ে তাচ্ছিল্য করা যায়, আর, ইচ্ছা করিলেই ছাঁটিয়া বাদ দেওয়া যায়, আর মিথ্যুক বলা যায়, হেন মানুষ সে নয়—অত ক্ষুদ্র সে নয় ; আরও দেখাইয়া দিয়া যাইবে যে, আগুনে হাত দিলে হাত পোড়েই…

কিন্তু আগুনে জল ঢালিয়া দিল দক্ষবালা—মাতব্বরগণ আসিতেছেন। দিনপতির অস্থির ঠেকিতে লাগিল - মুড়ি চিবাইয়া আর গিলিয়া যেন শেষ করিতে পারা যাইতেছে না।

অপদস্থ সে নিশ্চয়ই হইয়াছে, কিন্তু তা অন্তঃপুরে, নিভৃতে— রাষ্ট্র হইবার সম্ভাবনা নাই। মাতব্বরগণ আসিয়া সোরগোল শুরু করিলে, এবং সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলে সে সংবাদ গ্রামে পৌঁছিতে দুদিনও লাগিবে না। নিয়ম ইহাই যে, খবর ছড়ায় যত, পল্লবিত আর বিকৃত হয় তত। তাই যদি হয় তবে গ্রামে অভ্রভেদী উচ্চতা আর অবিসম্বাদিত প্রতিপত্তি কি আর থাকিবে !

ভারি ভয় পাইয়া দিনপতি বলিল,—আমাদের এমন কি ডাকাত ভেবেছ যে, লোক ডেকে জড়ো করতে ছেলেকে পাঠিয়েছ ? তুমি বলছিলে, জামাই লোকজন নিয়ে এসেছে কেন ! তুমিও ত' ভয় দেখাতে ছাড়ছ না !

দক্ষবালা বলিল,—আমরা যে মেয়েমানুষ, আর, কেশব ছেলেমানুষ। তোমরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকলে আটকাতে আমরা পারি ? নতুন কথা কিছু নয়, বাবা ; নিজেকে বাঁচাতে সবাই চায়।

তা সত্যই ; সৃষ্টির শুরু হইতে ঐ প্রচেষ্টাই চলিতেছে ; নিজেকে বাঁচাতে সবাই চাহিতেছে ;— এবং পরক্ষণেই এই সত্য দৃষ্টান্তের সাহায্যে আরো প্রবল অনিবার্য হইয়া উঠিল।

কেশব আসিয়া দাঁড়াইল ; খবর দিল : "আসছেন তাঁরা"।

বৈষ্ণবচরণ বলিল,—ছি ছি।

এবং তাহার পর এই দৃশ্যে যা ঘটিতে লাগিল তা অতিশয় দ্রুতগতি— দিনপতি প্রভৃতির আহার-ব্যাপার অতিশয় দ্রুতগতি শেষ হইয়া গেল—মুখ ধোয়াও শেষ হইল দ্রুতগতি। কেশব পান দিতে গেলে মাথা ঝাঁকাইয়া দিনপতি দ্রুতকণ্ঠে বলিল—পান আমরা কেউ খাইনে। চললাম। যা ভেবে নিয়েছ তা আমরা

নই—গুণ্ডামি করতে আসি নাই। বুঝিয়ে বলতে এসেছিলাম যে, কেলেংকারি ঢের হয়েছে, আর যা'তে তা না বাড়ে তা'ই করাই কর্তব্য। কিন্তু তোমরা ভাবলে, বুঝি ডাকাত পড়েছে। আমরা ভদ্দরলোক বলেই আগে আমাদের মনে পড়ে নাই; কিন্তু এখন দেখছি ভুল করেছি, ডাকাতের মতো বাড়িতে পড়েই কাজ হাসিল করা উচিত ছিল। তোমরা সেই ধরনের লোক, যারা মা'র না-খেলে কাজের দিশে পায় না—তারপর দিনপতি শেষ করিল ও-পক্ষের অতিবুদ্ধি একেবারে ভাঙিয়া দিয়া—বলিল, কিন্তু শুনে রাখো, আমরা মনে করি, ভুবনেশ্বর একা এলে তোমরা তা'কে খুন করতে।

কথাগুলি বলিয়াই পিছন না ফিরিলে দিনপতি দক্ষবালার হাসিটা দেখিতে পাইত; তাহা সে পাইল না—কিন্তু তার কথা দিনপতির কানে গেল: "কিছু মনে করো না বাবা; মেয়ে আমার ভারি রোগা; ঝঞ্ঝাট তার বরদাস্ত হবে না। রোগ যদি সারে একদিন যাবেই"।

আর যেয়ে কাজ নাই।—বলিয়া দিনপতি আকাশে মাথা তুলিয়া চলিতে শুরু করিল।

ভুবনেশ্বর একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল; বৈষ্ণব রাগও করিল না, নিঃশ্বাসও ছাড়িল না; খানিক নিঃশব্দে অগ্রসর হইবার পর পথে পাঁচ সাত জন লোকের সঙ্গে দেখা হইলে নিজে সসম্ভ্রমে তাঁদের পথ ছাড়িয়া দিয়া বলিল,—এঁদের যেতে দাও।

এঁরাই সেই আহূত মাতব্বরগণ।

মামলায় দিনপতি কখনো হারে নাই এমন নয়, কিন্তু এমন অপদস্থ সে কখনো হয় নাই—এত ক্রোধান্বিতও সে জীবনে হয় নাই। পৃথিবীতে আগুন ধরাইয়া দিয়া সেই আগুনের সামনে দাঁড়াইয়া প্রলয়ংকর অগ্নিকাণ্ডের মাঝে যাবতীয় প্রাণীর ছটফটানি দেখিতে পাইলে, দিনপতি অনুভব করিতে লাগিল, তবেই তার ক্রোধের উপশম হইতে পারে; কিন্তু তাহাতেও পরিপূর্ণ তৃপ্তি বোধ হয় না। এই ঘটনা ঘটিবার পূর্বে, অর্থাৎ পতঙ্গতুল্য ক্ষুদ্র আর কীটতুল্য নগণ্য আর ঘৃণ্য একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে সংঘর্ষে পরাজিত হইবার পূর্বে সেই আগ্নেয় ব্যাপার ঘটাইতে পারিলে ভাল হইত…

কিন্তু তা হয় নাই; কাজেই দিনপতি নিজেই অন্তরব্যাপী আগুনে পুড়িতে পুড়িতে চলিতে লাগিল। সর্বাগ্রবর্তী হইয়া আর মৌনাবলম্বন করিয়া পথ চলিতে চলিতে দেড় মাইলের মাথায় দিনপতি অকস্মাৎ একবার বলিল—হুঁ…

তারপর বহুক্ষণ পরে আবার বলিল,—আচ্ছা। বুঝা গেল, দিনপতির মনে সংকল্প এবং শক্তি পুঞ্জীভূত আর দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে—থাকিয়া থাকিয়া তাহা আলোড়িত হইতেছে, এবং তাহারই উদ্গার ঐ দুটি শব্দ।

গ্রামে প্রবেশ করিয়া তিনজন তিন দিকে গেল। দিনপতি বলিল,—দেখা করব আবার।

ভুবনেশ্বর বলিল,—আচ্ছা। বৈষ্ণবও এসো। তারপর বলিল,—ওরা মানুষ না জানোয়ার, ভেবে পাচ্ছিনে।

ভুবনেশ্বরের মা কামিনীর ক্রোধ আর কণ্ঠের কথা আর বলিব না—দিনপতির কথাই চলিবে—সে অবতীর্ণ হইবার পর আর কারো কথাকে প্রধান করিয়া তোলা সাজে না।

দিনপতি কথা রাখিল—ভুবনেশ্বরের সঙ্গে সে দেখা করিতে আসিল; বসিল, বসিয়া হুঁকা টানিয়া লইল; কিন্তু কথা কহিল না—গভীর জলের রোহিত মৎস্য পুচ্ছ নাচাইয়া উপর-উপর বেড়ায় না। দিনপতি কলিকায় কয়েকবার ফুৎকার দিয়া আগুনটা তাজা করিয়া লইল। বলা অবশ্য বাহুল্য যে, কলিকার ঐ আগুন প্রজ্বলিত ব্রহ্মাণ্ডের টুকরা নয়, রান্নাঘরের কাঠের।

মন্ত্র বা মন্ত্রণা গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ভুবনেশ্বর চিন্তামগ্ন দিনপতির মুখের দিকে শিষ্যের মতো তাকাইয়া রহিল।

নীরবে খানিক হুঁকা টানিয়া দিনপতি মুখ তুলিল, তারপর মৌনাবস্থা ত্যাগ করিল; বলিল,—কিছু খরচ করতে পারবি?

—খরচ? করা মুশকিল। বলিয়া ভুবনেশ্বর খরচ কিসে হইবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।

করা যে মুশকিল দিনপতি তা জানিয়াই জিজ্ঞাসা করিয়াছে—বলিল,—মুশকিল বললে শুনবো না; করতেই হবে—পরিবারকে উদ্ধার করতে হলে খরচ করতেই হবে। মানই যদি না রইল তবে রইল কি!—তারপর সে ভুবনেশ্বরকে লজ্জাহত করি া ভুবনেশ্বরেরই উক্তি ভুবনেশ্বরেরই প্রতি প্রয়োগ করিল; বলিল,—তুই মানুষ না জানোয়ার?

আক্রান্ত হইয়া ভুবনেশ্বর ভারি কুঁকড়াইয়া গেল। মানের দায়ে বলিল—করব।

কত খরচ করিতে হইবে তাহা সে জানিতে চাহিল না; বলিল,—কি করতে হবে বলো।

ভুবনেশ্বর যেমন, যদি সে তেমন না হইয়া আরো উচ্চস্তরের ব্যক্তি হইত তবু সে অনুমান করিতে পারিত না, দিনপতি রায় তাহার 'কি করিতে হইবে' প্রশ্নের কি জবাব দিবে।

—বলি।—বলিয়া দিনপতি আরো খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল,—নালিশ করতে হবে দেওয়ানী আদালতে।

ব্যাপার চরম হইয়া উঠিবার যেন হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে! দিনপতি ক্রোধে এত উত্তপ্ত কোনো দিন হয় নাই যেমন হইয়াছে সম্প্রতি; কামিনী কোনোদিন এত লাফায় নাই যেমন লাফাইতেছে আজকাল; ভুবনেশ্বরও এত বিস্মিত জীবনে হয় নাই যেমন হইল এখন। সে জানিত, খাজনা খৎ স্বত্ব আর খাতারই নালিশ দেওয়ানী আদালতে করিতে হয়; কিন্তু স্ত্রী…

চোখ বড়ো করিয়া ভুবনেশ্বর বলিল,—এ-রও নালিশ চলে নাকি?

—সুন্দর চলে। বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে আটকে রেখেছে, আসতে দিচ্ছে না; নালিশ চলে তার। হাকিম হুকুম দেবে, ছেড়ে দাও। পেয়াদার ভয়ে তখন পথ পাবে না ছেড়ে দিতে। আমাদের কেবল সাক্ষী সংগ্রহ করতে হবে। সে-ভার আমি নিলাম। রাজী আছিস্?

—আছি। এ-রকম মামলা আর কখনো হয়েছে?

প্রশ্নের নিবর্‍ুদ্ধিতায়, এবং তাহার কথায় সন্দেহ করার ধৃষ্টতায় দিনপতি রায় ধৈর্য‘হারা হইয়া গেল ; কঠিন কণ্ঠে বিদ্রূপ করিয়া বলিল,—না, তুমিই নতুন পথ দেখাচ্ছ সংসারকে। তুই একটা ভূত। ওরে নির্বোধ, লাখ লাখ হয়েছে। আদালতে কেবল প্রমাণ করতে হবে যে, তোমরা ভাতকাপড়ের কষ্ট দিতে না, আর, মারধোর করতে না।

—তা প্রমাণ হবে।—বলিয়া ভুবনেশ্বর যেন অনাদিকালের শোকের পর আজ একটু হাসিল। ও-পক্ষকে দ‍ুর্গম আদালত এবং দ‍ুর্দান্ত পেয়াদার সাহায্যে এমন জব্দ করা যাইবে যে, তাহারা চোখের সম্ম‍ুখে কেবলই সরিষার ফ‍ুল দেখিতে থাকিবে।

দিনপতি উঠিতে উঠিতে বলিল,—তোর টাকা, আমার মাথা ; দেখি কি দাঁড়ায়। আচ্ছা, আসি। মন ঠিক কর।

—ঠিক আছে। বলিয়া ভুবনেশ্বর আবার একটু হাসিল।

আনন্দিত মনে আর হাল‍্কা প্রাণে ভুবনেশ্বর আজ বাড়ির ভিতর গেল ; বলিল,—মা, ওদের নামে নালিশ করব।

কামিনী বলিল,—বউয়ের কথা আমার স‍ুম‍ুখে বলবি ত' ঝাঁটা খাবি হারামজাদা।

ম‍ুল ব্যক্তি ভুবনেশ্বরকে বাঁ দিকে সরাইয়া দিয়া দিনপতি রায় মামলা-য‍ুদ্ধে অবতীর্ণ হইল—সশব্দেই সে অবতীর্ণ হইল, যেন ধন‍ুকে টঙ্কার দিয়া।

বাদী শ্রীভুবনেশ্বর দে—

বাদীর উকিল বাদী শ্রীভ‍ুবনেশ্বর দে-র ম‍ুখের দিকে তাকাইয়া আর্জি প্রস্তুত করিয়াছেন। দিনপতি রায়ের উক্তি-অন‍ুর‍ূপ, এবং স‍ুললিত প্রাঞ্জল ভাষায়, বিবাদিনী শ্রীমতী পার্বতী দাসীর চরিত্রালোচনাও তিনি তাহাতে বিশদভাবেই করিয়াছেন ; এবং বিচারযোগ্য নানান ঘটনার কসরত দেখাইয়া সর্বশেষে "দাম্পত্য স্বত্ব সাব্যস্তপ‍ূর্বক স্ত্রী দখলের" প্রার্থনা তিনি ম‍ুনসিফী আদালতকে কাতরস্বরে জানাইয়াছেন।

দাবীর পরিমাণ মাত্র পাঁচ টাকা। দাবী মোতাবিক কোর্টফি দিয়া আর্জি র‍ুজ‍ু করা হইল।

দেওয়ানী কার্যবিধি অন‍ুসারে শ‍ুনানিপ‍ূর্ব প্রাথমিক তদ্বিরাদি ও কার্যসম‍ুদয় স‍ুসম্পন্ন হইলে দেখা গেল, ভ‍ুবনেশ্বরের পাঁচ সাত টাকার ঢের বেশীই খরচ হইয়াছে, এবং আরও আশ্চর্যের বিষয় ইহাই যে, দেখা গেল, বিবাদিনী শ্রীমতী পার্বতী দাসীও উকিল নিয‍ুক্ত করিয়া আর্জির জবাব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দাখিল করিয়াছে।

মামলা দোতরফা হইবে—দিনপতির বীরহৃদয় রণোন্মাদনায় লাফাইতে লাগিল। ভ‍ুবনেশ্বরের ম‍ুখের দিকে তাকাইয়া সে বলিল,—লড়তে চায়। বলিয়া খ‍ুব প‍্যাঁচ খেলাইয়া একটু হাসিল।

দিনপতি হাঁটাহাঁটি করিয়া উকিল আর তাঁহার ম‍ুহ‍ুরির কত যে পরামর্শ গ্রহণ করিতেছে আর, কত যে পরামর্শ তাহাদের হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

আদালতের আমলাবর্গের মরসুম পড়িয়া গেল। ভুবনেশ্বরের পক্ষ হইয়া তাহার কিছু ঋণপ্রাপ্তির ব্যবস্থাও দিনপতি করিয়া দিল। কিন্তু একটা বিষয়ে দিনপতি বিস্মিত না হইয়া পারিল না। দেখা গেল, মামলা যতটা সম্ভব দ্রুতগতিতে শেষ করিবার জন্য বিবাদিনীপক্ষ অতিশয় আগ্রহ দেখাইতেছে। দিনপতির বিস্ময়ের উত্তরে উকিল বলিলেন, বিবাদিনীর রোগা আর অক্ষম চেহারাটা বিচারকের সম্মুখে যত শীঘ্র ধরা যায় ও-পক্ষের জয়ের আশা তত বেশী।

শুনিয়া দিনপতি একটু চমকিয়া গেল। ও-পক্ষের তদ্বিরকারক মাখন মণ্ডলকে ঘুষে বশীভূত করিবার কথাও সে ভাবিয়া দেখিল; কিন্তু ভুবনেশ্বর বলিল,—টাকা কই অত!—বলিয়া হতাশ দৃষ্টিতে দিনপতির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

"দাম্পত্য স্বত্ব সাব্যস্তপূর্বক স্ত্রী দখলের" মামলা লক্ষ লক্ষ হইয়াছে—দিনপতি ভুবনেশ্বরকে বলিয়াছিল। দেখা গেল, আদালতের বাহিরেও একটা সাড়াই পড়িয়াছে। শুনানির ধার্য দিনে সেই সাড়া প্রবলতর হইয়াছে মনে হইল। আদালতে লোক ধরিতেছে না; রঙ্গ দেখিতে কাজের ভিতরেই ফুরসত করিয়া লইয়া নিঃস্বার্থ লোক ঢের আসিয়াছে।

উকিলগণ সাজিয়া আসিলেন; মামলার শুনানি শুরু হইল; গলাখাঁকারি দিয়া পেশকার তটস্থ হইল।

পেয়াদা হলপ পড়াইয়া সাক্ষীদের কাঠ-গড়ায় ভরিতে লাগিল···

বাদীপক্ষের একাধিক সাক্ষী শপথপূর্বক একবাক্যে বলিল যে, প্রহারের অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা ও কাল্পনিক; সত্য হইলে তাহারা আর্তনাদ এবং জনরব শুনিতে পাইত; কারণ, বাদীর একেবারে গৃহসংলগ্ন প্রতিবেশী তাহারা—তাহাদের স্ত্রী পুত্র কন্যাদের বাদীর বাড়িতে যথেষ্ট যাতায়াত আছে। বাদী ভুবনেশ্বর তাহার স্ত্রী পার্বতী দাসীকে, বিবাদিনীকে, সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিয়াছিল, এবং এখনও রাখিতে অতিশয় ইচ্ছুক।

বাদীর ৩নং সাক্ষী শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ রাহা এল্‌ এম্‌ এফ্‌

ডাক্তার বলিল যে, বাদীর স্ত্রী পার্বতী দাসীকে সে দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিয়াছিল; তখন সে বাদী ভুবনেশ্বরের স্ত্রী-প্রীতি এবং স্ত্রীর অসুখের জন্য উৎকণ্ঠা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিল; এমন কি, বাদীকে সে অনেকবার অশ্রুমোচন করিতেও দেখিয়াছে, এবং সাক্ষী বিস্তর অভয় ও প্রবোধ দিলেও বাদী তাহা মানে নাই।

৪নং সাক্ষী স্বয়ং শ্রীদিনপতি রায়। নাম ধাম পেশা বয়স প্রভৃতি ফর্মে খুব সপ্রতিভভাবে লিখাইয়া দিয়া দিনপতি বলিল যে, সে বাদী ভুবনেশ্বরের পক্ষ হইয়া এবং তাহার অনুরোধে বিবাদিনীকে স্বামীগৃহে ফিরাইয়া আনিতে বিবাদিনীর মাতার কাছে উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু বিবাদিনীর মাতা ও ভ্রাতা অন্যায় ও দুঃসাহসিক ষড়যন্ত্রপূর্বক লোকজন আনয়ন করিয়া মারপিটের উপক্রম করায় তাহারা বিবাদিনীর মাতা দক্ষবালা দাসীকে ঘটনা, উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যৎ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিবার অবকাশই পায় নাই···

এই কথায় আদালত মৃদু হাস্য করিলেন, এবং তাঁহার সেই হাসি সমগ্র এজলাসে অতিশয় স্বচ্ছভাবে প্রতিবিম্বিত হইল।

দিনপতি আরো বলিল, বাদী অতিশয় নিরীহ ঠাণ্ডামেজাজী বিবাদভীরু লোক। বিবাদিনীর গার্হস্থ্য আচরণে ক্ষতিগ্রস্ত, বিরক্ত এবং নিরুপায় হইয়া সে কখনো-কখনো উত্তেজনাপূর্ণ কথা বলিয়াছে, কিন্তু কখনও প্রহার করে নাই, ইহা সে তদন্তপূর্বক বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছে; কারণ, গ্রামের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি, নিরপেক্ষ মাতব্বর এবং নীতিরক্ষক হিসাবে উহা তাহার কর্তব্য। সে শিক্ষিত এবং ভদ্রসমাজভুক্ত।

জেরায় সে স্বীকার করিল, একবার সে ফৌজদারী মোকদ্দমায় আসামী হইয়াছিল; কিন্তু সে-মোকদ্দমা আপসে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছিল…শাস্তি কিছু পায় নাই।

বৈষ্ণবচরণ দিনপতির উক্তি সমর্থন করিল, অর্থাৎ বলিল যে, বিবাদিনীর মাতা দক্ষবালা স্ত্রীলোক হইলেও অত্যন্ত দুর্ধর্ষ লোক; সে ভীতিপ্রদর্শন করায় তাহাদের দৌত্য এবং শুভেচ্ছা কার্যকর হয় নাই…তাহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

ভুবনেশ্বরও তাহাই বলিল—

সে স্বীকার করিল যে, স্ত্রীর অবাধ্যতার দরুন সে তাহাকে ভৎর্সনা করিত; কিন্তু প্রহারোদ্যত কোনদিন হয় নাই।

দিনপতির মুশকিল হইয়াছিল কামিনীকে লইয়া - কামিনীকে থামাইয়া রাখিতে তাহাকে গলদঘর্ম হইতে হইয়াছিল—খুব কড়া করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিল, আদালতে কামিনী যেন মেজাজ খারাপ না করে—করিলে হাকিমের ধারণা হইবে যে, বউয়ের উপর অত্যাচার হইত; এবং তাহা ছাড়া আদালত যদি তাহার কথার ভঙ্গীতে অপমান বোধ করেন তবে জরিমানা দিয়া তাহাকে হাজতে যাইয়া ঘানি ঘুরাইতে হইবে।

কামিনী হাকিমের সম্মুখে উতরাইল ভালই। দিনপতি পুলকিত হইয়া উঠিল। সূত্রপাত শুভসূচক; ফল নিশ্চয়ই ভাল হইবে।

তারপর সাক্ষী আসিবে বিবাদিনীর পক্ষের। এজাহার যাহারা দিবে তাহাদের মধ্যে বিবাদিনী প্রধান। তাহার 'ডাক' পড়িতেই তাহার পক্ষের উকিল আদালতকে নিবেদন করিলেন যে, গোযানে দীর্ঘপথ অতিক্রম করায় ঝাঁকানির দরুন অসুস্থা বিবাদিনী অত্যন্ত অস্থির বোধ করিয়া শয্যায় পড়িয়া আছেন অতএব তাঁহার পূর্বে তাঁহার পক্ষীয় অন্যান্য সাক্ষীর এজাহার লওয়া হউক।

আদালত নিবেদন গ্রাহ্য করিলেন।

প্রথম সাক্ষী ডাক্তার যোগেশচন্দ্র দত্ত, এম. বি.। এম. বি. বলিল যে, সে বিবাদিনীর চিকিৎসা করিতেছে। অসুখ জটিল এবং দীর্ঘস্থায়ী। যদিও বিবাদিনী তাহার চিকিৎসায় অধুনা কতকটা সুস্থ হইয়াছেন, তথাপি তাঁহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং শ্রমসাধ্য সাংসারিক কার্যের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে এখনও পুরা তিনটি মাস সময় লাগিবে।

জেরার উত্তরে ডাক্তার বলিল যে, সে গ্রামে ডাক্তারী করিলেও খাঁটি ঔষধপত্র সে যথেষ্টই রাখে ; এবং বিবাদিনীর জন্য সে যে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছে যে-কোনো ডাক্তার সেই ঔষধেরই ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া তাহার বিশ্বাস।

পার্বতীর মা দক্ষবালা বলিল, মেয়ের প্রতি জামাই অকথ্য অত্যাচার করে, ইহা সে মেয়ের মুখে, প্রতিবেশীগণের মুখে, এবং বাদীর গ্রামস্থ লোকের মুখে পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছে। অবগত হইয়া সে যারপরনাই ভীতা হইয়াছে। সে বিশ্বাস করে যে, বাদী এবং তাহার মা বিবাদিনীকে যদিচ্ছা ভৎ‍র্সনা করে ; এমন কি, প্রহারও করে। একদিন বাদীর মা কামিনী বিবাদিনীর ঘোরতর অসুখের সময় এমন জোরে গাল টিপিয়া ধরিয়াছিল যে, দাঁত দিয়া রক্ত পড়িয়াছিল , এই ঘটনার বিষয় সে সুভদ্রানাম্নী প্রতিবেশিনীর মুখে অবগত হইয়াছে। বিবাদিনী পার্বতী বহুদিন সাক্ষীর সমক্ষে প্রহারের কথা বলিয়াছে, এবং বলিবার সময় ক্রন্দন করিয়াছে ; সে আরো বলিয়াছে যে, অসুস্থ শরীরে কাজ করিতে না পারাই এই দুর্ব্যবহারের কারণ। তাহার রোগের চিকিৎসা আদৌই হয় নাই।

জেরার উত্তরে দক্ষবালা বলিল, সুভদ্রা তাহার প্রতিবেশিনী ; বিপদে আপদে দৌড়াইয়া আসে ; গার্হস্থ্য কর্মে তাহারা পরস্পরকে যথেষ্ট সাহায্য করে।

তারপর কেহ না জানিতে চাহিলেও দক্ষবালা হাকিমকে শুনাইয়া বলিল, ঢেঁকি পাড়াইয়া যাহাদের ধানকে চাল আর চিড়ে করিতে হয় তাহারাই জানে গৃহস্থালির ঠ্যালা। বিবাদিনী তাহা এখন পারিবে না।

দক্ষবালার অকারণ এই গার্হস্থ্য ক্লেশের কথায় আদালত স্বয়ং এবং উকিল মুহুরিরা ও দর্শকগণ হাস্য করিলেন।

এইবার বিবাদিনী আসিবে।

জানাজানি হইয়া গিয়াছে যে, বিবাদিনী পার্বতী দাসীর বয়স কুড়ির বেশী নয় ; একটিমাত্র সন্তান তাহার হইয়াছিল, এবং বর্ণ উজ্জ্বল। সুতরাং সে আসিতেছে শুনিয়া দর্শকগণের ভিতর একটা ঔৎসুক্যপূর্ণ চাঞ্চল্য দেখা দিল…

পার্বতী প্রবেশ করিল। দর্শকগণ খুশী হইল সর্বাগ্রে ইহাই লক্ষ্য করিয়া যে, বিবাদিনী শ্রীমতী পার্বতী দাসী মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখে নাই। তাহার ভাই কেশব তাহাকে ধরিয়া আনিয়া কাঠগড়ায় ভরিয়া দিল।

হাকিম বিবাদিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন : চেহারা রুগ্ন ও বিবর্ণ, কিন্তু মাতৃক্রোড় ত্যাগ করিয়া স্বামীগৃহে আসিয়া কেন সে থাকিতে পারিবে না ? যত্ন লওয়া হইয়া থাকে বলিয়া হাকিমের ধারণা জন্মিয়াছে।

জবানবন্দী শুরু হইল—

পার্বতী স্বীকার করিল যে, অসুখের সময় সে ঔষধ পথ্য শুশ্রূষা একেবারেই পায় নাই এমন নয় ; কিন্তু তাহার মনে হয়, অতিশয় অনিচ্ছার সহিত সেই অনুগ্রহ তাহাকে করা হইয়াছে, এবং তাহা যৎকিঞ্চিৎ ; প্রয়োজনের পক্ষে তাহা কিছুই নয়। গর্ভের সন্তানটি গর্ভেই মরিয়া গিয়াছিল তাহার অসুস্থতার দরুনই।

বাদীর মাতা তাহাকে অকারণেই উৎপীড়ন ও নির্যাতন করে, এবং স্বামী গালিগালাজ ও মারধোর করে। স্বামীর প্রহারের উদ্যম মাঝে মাঝে এমনই প্রচণ্ড ভাব ধারণ করে যে, নিজের জীবনরক্ষা সম্বন্ধে সে হতাশ হইয়া যায়। প্রাণের

ভয়েই সে স্বামীর কাছে যাইতে চাহে না। তাহাকে মারিবার জন্য প্রকাণ্ড একখানা বাঁশের লাঠি বাদী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে।

শুনিয়া ভুবনেশ্বর দাঁতে জিব কাটিল, এবং স্ত্রীজাতির প্রতি নিদারুণ অভক্তি জন্মিয়া তাহার দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার সাম্প্রতিক ইচ্ছাটা তখনকার মতো লুপ্ত হইয়া গেল।

বাদীর উকিল জেরা করিতে উঠিলেন—

চোখের চশমা নাকের ডগার দিকে টানিয়া নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

"তুমি চ্যাঁচাতে যখন বাদী তোমায় মারত ?"

"হ্যাঁ।"

"লোকজন কেউ ছুটে আসত ?"

"না।"

"বাদীর বাড়ির খুব কাছেই অনেক লোক বাস করে ত' ?"

"হ্যাঁ।"

"কোনোদিনই তারা কেউ আসে নাই ?"

"মনে নাই।"

"তারা অন্য সময় বেড়াতে কি ঘরের কাজে আসে ?"

"আসে।"

"তোমার ভাই যখন তোমাকে দেখতে আসত তখন তাকে মারধরের কথা বলতে ?"

"না।"

"কেন ?"

"তা জানিনে।"

"এমন মার একদিন বাদী তোমাকে মেরেছিল যে তোমার ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়েছিল, আর তুমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে ?"

"হ্যাঁ।"

শুনিয়া দর্শকবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ রুষ্ট চক্ষে ভুবনেশ্বরের দিকে তাকাইল—অমন ঠোঁটে অস্ত্রাঘাত! লোকটাই পাজি।

জেরা চলিতে লাগিল :

"মারের ঘটনা কতদিন আগে ? ছেলে হওয়ার আগে না পরে ?"

"আগে।"

"তারপর তুমি মায়ের কাছে গিয়েছিলে ?"

"হ্যাঁ।"

"আবার বাদীর বাড়িতে এসেছিলে ?"

"হ্যাঁ।"

"মায়ের কাছেই থেকে গেলে না কেন ?"

"তা' জানিনে।"

"ভাই এসেছিল তার আগে না পরে ?"

"আগেও একবার এসেছিল, পরেও একবার এসেছিল।"

"তাকে বলেছিলে ?"

"না।"

"কেন ?"

"তা জানিনে। একটু জল খাবো।"

পার্বতীর উকিল শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ; জেরা স্থগিত থাকিল। দর্শকগণ সেই সুযোগে পার্বতীর রূপ এবং চরিত্র সম্বন্ধে আর তার স্বামীর পশুত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা, অনুমান আর আশা করিল তাহা অলিখিত থাকাই ভাল।

পার্বতীর উকিলের মুহুরি সাতকড়ি জল আনিতে দৌড়াইয়াছিল—জল লইয়া দৌড়াইয়া ফিরিল। পার্বতী মুখ ফিরাইয়া তাহা পান করিবার পর পুনরায় প্রশ্নোত্তর শুরু হইল :

"দুর্বাক্য বলত তোমার স্বামী—সে তোমার দোষ না তার দোষ ?"

পার্বতী জবাব দিল না।

"তোমার স্বামী কিম্বা শাশুড়ী যে কাজ করতে তোমায় বলত তা করতে ?"

পার্বতী চুপ করিয়া রহিল।

উকিল বলিলেন—"বলো। করতে ?"

"পারলে করতাম, না পারলে করতাম না।"

"তা' হলে করতেও না মাঝে মাঝে ?"

পার্বতী নিরুত্তর রহিল।

"বলো, হ্যাঁ কি না ?"

"না।"

"কেন ?"

"তা জানিনে।"

ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অনেক প্রশ্নোত্তরের পর প্রায় পনরো আনা পরিষ্কার হইয়া গেল যে, অস্বাভাবিক অত্যাচার বিশেষ হয় নাই। দিনপতিকে প্রফুল্ল এবং মাখনকে বিমর্ষ দেখাইতে লাগিল।

হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"স্বামীর ঘরে যেতে চাও ?"

"—না।"

শুনিয়া দর্শকবৃন্দের ভিতর দণ্ডায়মান গুপী সরকারের মনে হইল, তার শূন্য ঘরে ঠাঁই ঢের আছে।

হাকিম বলিলেন,—কিন্তু যেতে তোমাকে হবে। সেখানেই তোমার সেবা-শুশ্রূষা চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত যাতে হয় আমি হুকুম দিয়ে তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" বলিয়া তিনি বাদীর উকিলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

উকিল বলিলেন,—হ্যাঁ, হুজুর, আমার মক্কেল তা করবে··

বলিতে বলিতেই কান্নার শব্দে সচকিত হইয়া সকলেরই উৎকণ্ঠিত আর উৎসুক দৃষ্টি যাইয়া পড়িল বিবাদিনীর উপর—দেখা গেল, সে মুখের উপর আঁচল চাপা দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে···

হাকিম বলিলেন, "কেঁদ' না ; তোমার ভয়ের কারণ কিছু নেই।"

কিন্তু হাকিমের অভয়দান শেষ না হইতেই যা ঘটিল তেমনটি ঘটিতে অনেক

মামলা নিষ্পত্তিকারী হাকিম, আর, যাবতীয় উকিল, আর মামলাবাজ মক্কেল, এবং আদালতে বিচরণকারী দর্শক কেহই দেখেন নাই। বিবাদিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল, "সব মিছে কথা, হুজুর। আমাকে কোনোদিন ওরা মারে নাই।"

শুনিয়া দিনপতি রায় নাচিবার এবং মাখন মণ্ডল কাঁদিবার উপক্রম করিল।

বিচারাসনকে টলিতে নাই—

নির্বিকার কণ্ঠে হাকিম বলিলেন,—তবে যে জবাবে বলেছ, "মারাত্মক বংশ-যষ্টি লইয়া নিদারুণ প্রহার করিত। স্বামীর গৃহে যাইলে প্রাণ সংশয় হইবে?"

"মিছে কথা সব। মায়ের কাছে আমি মিছে কথা বলেছিলাম। গালমন্দ করত; মারে নাই কোনোদিন।"

সবাই অবাক হইয়া রহিল। দিনপতি পর্যন্ত নাচিতে নাচিতে অবাক হইয়া গেল। মাখন ভাবিতেছিল আপীল করার কথা—সেও অবাক হইয়া গেল। এমন তোড়জোড় জিদের মামলা—বিবাদিনী স্বয়ং সজ্ঞানে পণ্ড করিতেছে, এরূপ ঘটনা আদালতের ইতিহাসে বিরল—সংসারে ঘটিলেও আদালতে ঘটিতে পারে, মানুষগুলি তাহা কল্পনাও করিতে পারিল না। কারণটা কি?

হাকিম বলিলেন,—"তবে আর কি? যাও।"

"না, হাকিম; আমি সেখানে এখন যাবো না।"

হাকিম তখন একটা ধমক দিলেন: "কি বলছ তুমি তার ঠিক নাই।"

হাকিমের দিকে তাকাইয়া পার্বতী বলিল,—"অসুখের সময় ছেলে পেটে এসেছিল; মরতে বসেছিলাম। এ শরীরে আমি আর ছেলে চাইনে। ছেলে আমি পেটে ধরতে পারব না। রক্ষে করো আমাকে তোমরা।" বলিয়া পার্বতী আবার ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সমাপ্ত